ষাণ্মাসিক সূচী

শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৬৮—আশ্বিন ১৩৬৮

সম্পাদক : শ্রীসজনীকান্ত দাস

চি ঠি

৩২শ বর্ষ,
৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

সংবাদ-সাহিত্য

রাজশেখর বসু

বিগত ১৪ই বৈশাখ, ২৭ এপ্রিল ১৯৬০ দিবাদ্বিপ্রহরে বাংলাসাহিত্যের পরশুরাম ও বাংলাদেশের প্রবীণ মনীষী রাজশেখর বসুর মৃত্যু হইয়াছে। তিরোধান, তিরোভাব, পরলোকগমন, নশ্বর দেহত্যাগ, পঞ্চভূতে বিলীন ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অধিক সম্ভ্রমাত্মক ভাষা তাঁহার বেলায় প্রয়োগ করিলাম না, কারণ, তিনি অন্ততঃ বাহিরে মৃত্যুকে নিঃশেষ সমাপ্তি হিসাবেই দেখিতেন, তাঁহার একান্ত বৈজ্ঞানিক মনে মৃত্যুপরপারের কোন মোহ প্রকাশ্যতঃ স্থান পাইত না।

গত ১৬ই মার্চ তিনি জীবনের আশি বর্ষ পূর্ণ করিয়া একাশিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখনই তাঁহার দেহ অপটু হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু মন ছিল সজাগ। বাঁচিবার কোনও আকর্ষণ তাঁহার ছিল না, সেই কথাই বারংবার চিঠিতে ও মুখে প্রকাশ করিতেন। আমরা যাহাকে সিদ্ধ সাধু পুরুষের মৃত্যু বলি তাঁহার প্রাণ সেইরূপ সহজ শান্ত নিরুদ্বেগ অবস্থার মধ্যেই জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া গিয়াছে। নিজ পরিবারের (কন্যা ও সহধর্মিণী) একান্ত নিজস্ব প্রায় ইচ্ছামৃত্যুর সৌভাগ্য হইতে তিনিও বঞ্চিত হন নাই।

রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের পর বাংলাসাহিত্য, ভাষা, শিক্ষা ও সমাজের ভালমন্দের উপর একমাত্র তাঁহারই তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি ছিল। কোথাও কোনও অনাচার দেখিলে তিনি সহজ অথচ অপূর্ব ভঙ্গিতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেন। তাঁহার বিয়োগে হিতৈষীর খবরদারির সুযোগ বাংলা দেশ হারাইল।

'শনিবারের চিঠি'র সহিত তাঁহার সম্পর্ক বহু দিনের। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে (১৯২৭ খ্রীঃ) যখন মাসিকরূপে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হয়, পরশুরামের রচনা তখন হইতেই ইহাকে গৌরবান্বিত করিতে থাকে। গত মাসের বিশেষ 'রবীন্দ্রসংখ্যা'য় তাঁহার একটি রচনা প্রার্থনা করিলে ৯ই এপ্রিল, ১৯৬০ তারিখে স্বহস্তলিখিত একটি পত্রে আমাদের লেখেন—

"প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ৩।৪এর চিঠি। কয়েক মাস যাবৎ আমি পীড়িত, লেখবার শক্তি নেই, সেকারণে আপনার অনুরোধ রাখা আমার অসাধ্য। সম্প্রতি যা ছাপা হয়েছে তা অসুখের আগে লেখা।

শুভার্থী—রাজশেখর বসু"

ঠিক আঠার দিন পরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই শেষ রচনাটুকু সংগ্রহ করাতে 'শনিবারের চিঠি'র

সহিত তাঁহার চৌত্রিশ বৎসরের সম্পর্ক ঘটিল। বাংলা-সাহিত্যের পরশুরামের সর্বপ্রথম সচিত্র জীবনী প্রকাশের গৌরবও 'শনিবারের চিঠি' দাবি করিতে পারে। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার ৪৫৭-৪৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় "পরশুরাম" প্রবন্ধ বাহির হয়। সেই প্রবন্ধে আমরা তাঁহার পিতা চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের কীর্তি গোড়ায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাজশেখর বসুর জন্ম, বাল্যপরিবেশ, স্কুল-কলেজের শিক্ষা ও কর্মজীবনের পরিচয় দিয়া শেষে লিখিয়াছিলাম :

"যে কারণে রাজশেখরের জীবনী আমাদের আলোচনার বিষয় হইয়াছে, এবারে তাহার কথাই বলিব। সে ইতিহাসও অতিশয় সংক্ষিপ্ত এবং তাঁহার মন্ত্রগুপ্তির জন্ম অসম্পূর্ণ। সাহিত্যের আকর্ষণ তাঁহার কর্মজীবনের আকর্ষণ হইতে কখনই প্রবলতর হয় নাই ; অত্যন্ত লঘু-ভাবেই তিনি এই গুরু কার্য করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই বাংলা দেশে সাহিত্য-চর্চা সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন জীবিত এবং রবীন্দ্রনাথ প্রায় মধ্যগগনে উঠিয়া প্রখর তাপ বিকিরণ করিতেছেন। হাম-বসন্তের মত কবিতা লেখাটাও সে যুগের বাঙালীর বালব্যাধিতে দাঁড়াইয়াছিল। এই ব্যাধির প্রকোপে রাজশেখরও কিছুদিন ভুগিয়াছিলেন। তিনি 'সিন্‌থেটিক' কবিতা লেখা অভ্যাস করিতেছিলেন। তাঁহার মধ্যে যে ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান মানুষটি বাস করেন, তিনি কবিতা রচনা ব্যাপারটাকেও একটা যান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে ফেলিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু ১৬ বৎসর বয়সে এই হামরোগ তাঁহাকে ছাড়িয়া যায়। পরবর্তী কালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, কাব্য-মার্গে তাঁহার সাধনার ইহাই একমাত্র মুদ্রিত পরিচয়।

সাহিত্য-রচনার গুজুহাতে যে ভাবের আবেগের উল্লেখ সাহিত্যিক মাত্রই করিয়া থাকেন, রাজশেখরে তাহার একান্ত অভাব ; তিনি বাহিরেও যেমন গম্ভীর প্রকৃতির মুখচোরা লোক, ভিতরেও তেমনই সর্বপ্রকার আতিশয্য এড়াইয়া চলেন। সেরূপ লোকের পক্ষে সাহিত্যসৃষ্টি একটা অভাবনীয় ব্যাপার। তাঁহার দ্বারা এই অঘটন কি করিয়া সংঘটিত হইল, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর গিরীন্দ্রশেখর হয়তো চেষ্টা করিলে তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন। আমরা দেখিয়াছি, তিনি নির্বাক শ্রোতা হিসাবে আড্ডায় বসিয়া আছেন ; "হাঁ"ও বলিতেছেন না, "না"ও বলিতেছেন না ; ঠোঁটের হাসি দরিদ্রের মনোরথের মত একটুখানি চমক দিয়াই মিলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদের অজ্ঞাতসারে তাঁহার শিল্পী মন যে সেই অবসরে সাহিত্যের রসদ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইয়াছে, হঠাৎ এক একটা "লম্বকর্ণ," "বিরিঞ্চি-বাবা" অথবা "কচি-সংসদে" তাহার পরিচয় পাইয়া চমকাইয়া উঠিয়াছি। ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানও যে সর্বোচ্চ শ্রেণীর শিল্পী হইতে পারেন, পরশুরাম-রূপী রাজশেখর বসু তাহার প্রমাণ।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে এই গুরু শান্ত নিরীহদর্শন বিসুবিয়সে প্রথম অগ্ন্যুৎপাত দৃষ্ট হয় ; তিনি "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" গঠন করিয়া বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক নূতন সম্ভাবনার কথা জ্ঞাপন করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র দশ বৎসরে আমরা এই সম্ভাবনার যে পরিণতি দেখিয়াছি, তাহাকে অত্যাশ্চর্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই দশ বৎসরেই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের পূর্ণ বিকাশ ; অতি অল্প আয়োজনে কোনও প্রকার উদগ্রতা অথবা বাতুল্যের সাহায্য না লইয়া তিনি বাংলা সাহিত্যে আপনার আসনখানি দখল করিয়া বসিয়াছেন ; তাঁহার এই বিজয় তাঁহার স্বভাবের অনুযায়ীই হইয়াছে।

১৯৩২ সালের পর তাঁহার সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। 'চলন্তিকা' তৎপূর্বেই বাহির হইয়াছে, তিনি উহার পরবর্তী সংস্করণ প্রস্তুতে মনোনিবেশ করিয়াছেন ; 'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প' যদিও ১৯৩৭ সালে বাহির হইয়াছে, গল্পগুলির প্রত্যেকটিই কিন্তু ১৯৩২ সালের পূর্বের রচনা। 'লঘুগুরু'র শেষ তিনটি ছাড়া বাকি সবগুলি প্রবন্ধই ১৯৩২ সালের পূর্বের রচনা। অর্থাৎ বিসুবিয়স আবার শান্ত হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে আর বুঝিবার জো নাই যে, একদিন 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলী'র লাভাস্রোত এখান হইতেই উদ্গত হইয়াছিল।

ইহাতে আমাদের দুঃখ নাই। দাতা যখন আত্ম-গোপন করিয়া দান করেন, তখন পরিমাণের দিকে আমরা লক্ষ্যই করি না; কারণ জানি, বিনিময়ে যশ-সম্ভারের প্রতি তাঁহার মোটেই আগ্রহ নাই। কিন্তু পরিমাণে অল্প হইলেও পরশুরামের দান যে ওজনে বেশী, তাহাও তো প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। সারা বাংলা দেশের চিত্ত তিনি অধিকার করিতে পারিয়াছেন—স্ত্রী-পুরুষ উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে। হালকা রসের পরিবেশন করিয়া এমনটি বাংলা দেশের আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ইহার জন্য দায়ী পরশুরামের ভাষা, পরশুরামের সংযমনীয়তা। পরশুরামের বর্ণিত ঘটনা নিত্য বর্তমান—ইহাই পরশুরামের পরশুরামত্ব।”

১৩৪৬ পৌষের প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে ১৩৬০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে আমরা সাহিত্যশিল্পী পরশুরামকে বাদ দিয়া সাহিত্যকর্মী রাজশেখর বসুর কীর্তিকথা আলোচনা করিয়া লিখিয়াছিলাম:

“শ্রীরাজশেখর বসু অতখানি সৌভাগ্য অর্জন করেন নাই, চলন্তিকার সাতটি সংস্করণ হওয়া সত্ত্বেও। তাঁহার খ্যাতি বিদগ্ধজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ‘চলন্তিকা’ যে কত বড় একটা “অ্যাচিভমেন্ট” তাহা বুঝিতে হইলে বাংলা ভাষার পূর্বাপর ইতিহাসের সহিত পরিচয় আবশ্যক। রামকমল-গিরিশ-যোগেশ-জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে তিনি যে প্রতিভাবলে অতিক্রম করিয়াছেন তাহা ধরা সহজসাধ্য নহে। তবে ফলেন পরিচীয়তে; ফল অতি স্পষ্ট। আজ ‘চলন্তিকা’ ভাষা, বানান ও পরিভাষার সংশয় সমাধানে আমাদের একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের অর্থাৎ সাধারণ লেখক সম্প্রদায়ের মাত্র সাড়ে ছয় টাকাতেই সর্ববিধ কাজ হইতেছে। শব্দ নির্বাচনে এবং ক্রমিক শব্দার্থ-নির্ধারণে যে বিবেচনা ও বিচক্ষণতার পরিচয় ‘চলন্তিকা’য় আমরা পাই তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। এইখানেই শ্রীরাজশেখর বসুর কৃতিত্ব। এইখানেই তিনি বৈজ্ঞানিক অভিধানকার। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক গোড়াপত্তন করিয়াছেন এবং বাঙালীর ঢিলাঢালা এলোমেলো প্রকৃতিতে একটা বাঁধন আনিয়া দিয়াছেন। অথচ এই বাঁধনে কষ্ট নাই, অপমান নাই। ‘চলন্তিকা’ মারফৎ আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই ভাষার শৃঙ্খলা শিখিতেছি। সাহিত্যকর্মী রাজশেখরের ইহা একটি বিপুল কীর্তি।

তাঁহার দ্বিতীয় কীর্তি রামায়ণ-মহাভারতের সারানুবাদে। ‘লঘুগুরু’র আলোচনা বাদ দিতেছি শুধু এই কারণে যে ইহা সমস্যাসমাকুল। আমাদের সমাজে, আমাদের ভাষায়, আমাদের সাহিত্যে নানা দিক দিয়া যেসকল সমস্যার উদ্ভব প্রতিনিয়ত হইতেছে বসু মহাশয় তাঁহার নিজের মত ও ধারণা অনুযায়ী তাহার সমাধান দিতে চেষ্টা করিয়াছেন; বিতর্কের অবকাশ আছে, ইহা সর্ববাদিসম্মত নয়। ইহাতে জিজ্ঞাসুজনের প্রশ্নের জবাব আছে, সর্বসাধারণের উপভোগ্য রস নাই। রামায়ণ-মহাভারতের সারানুবাদে যাহা পরিবেষিত হইয়াছে তাহা সর্বজনগ্রাহ্য, বাঙালীমাত্রেরই অবশ্যগ্রাহ্য। রামায়ণের হেমপণ্ডিতকৃত অনুবাদ আছে, বর্ধমান রাজবাটী ও পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ আছে, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বর্ধমান রাজবাটী এবং পঞ্চানন-কৃত মহাভারতেরও অনুবাদ আছে, কিন্তু এইগুলি আয়তনের বিপুলতায় ও ভাষার দুরূহতায় সাধারণ বাঙালীর অন্তঃপুরে ও অন্তঃকরণে প্রবেশলাভ করে নাই; বহির্বাটীর পুস্তকাধারেই সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। অমরেশ্বর ঠাকুরের রামায়ণ এবং মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহাভারত আরও বিপুলকায়; শেষেরটি এখনও অসম্পূর্ণ। লঘু রামায়ণ, লঘু মহাভারত সংস্কৃতে আছে কিন্তু বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায় না। শ্রীরাজশেখর বসু প্রত্যেক ভারতীয়ের অবশ্যপাঠ্য এই দুই মহাগ্রন্থের সার বাঙালীদের জন্য প্রস্তুত ও পরিবেষণ করিয়া ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সুযোগ তাহাদের দিয়াছেন। নির্যাস বাহির করিতে তাঁহাকে যে কি পরিমাণ বিচার ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে যাঁহারা মূলের সহিত মিলাইয়া পড়িবেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। তিনি নিজে সুরসিক ও সুসাহিত্যিক বলিয়া খণ্ডিত অবস্থাতেও কাহিনীর ধারাবাহিকতা ও বর্ণনার রস বজায় রাখিতে পারিয়াছেন, চিরন্তন

উক্তিগুলির কোনটিই বাদ দেন নাই। মূলের সৌন্দর্য বজায় রাখিতে তৎসম শব্দ বহুল ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু অর্থগ্রহণের পক্ষে সেগুলি বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে না। এই সারানুবাদ-দুইটি বাঙালীর জ্ঞানভাণ্ডারে চিরদিনের সঞ্চয় হইয়া রহিল। বাঙালী ছেলেদের ভাষাশিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের মহাভারতের অনুবাদকে 'কুরু-পাণ্ডব' নামে মার্জিত করিয়া পরিবেষণ করিয়াছিলেন। রাজশেখরের সারানুবাদ-দুইটি সমগ্র বাঙালীজাতির শুধু জ্ঞানার্জনের নয়, ভাষা-শিক্ষারও বাহন হইবে।

'মেঘদূতে'র অনুবাদও কেবলমাত্র সাহিত্যকর্ম নয়, স্থানে স্থানে সাহিত্যসৃষ্টির পর্যায়ে উঠিয়াছে; ব্যাখ্যার সাহায্যে মূলের রসগ্রহণের এমন সুযোগ অন্য কোনও মেঘদূতের সংস্করণে পাওয়া যায় না, অথচ রাজশেখরের সংস্করণ কত সংক্ষিপ্ত ও নিরাভরণ। তাঁহার কৃত 'গীতা'র অনুবাদও আমরা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, এমন সংস্কারবাহুল্যবর্জিত অথচ সরল অনুবাদ আর হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় তাঁহার 'গীতা' তিনি প্রকাশ করিতে নারাজ।

'কুটিরশিল্প' ও 'ভারতের খনিজ' বই দুইখানির বিষয়বস্তু নামেই প্রকাশ; এগুলি সাহিত্যকর্ম না হইলেও অতিশয় প্রয়োজনীয় কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে।

'হিতোপদেশের গল্প' শিশুদের জন্য লিখিত। হিতোপদেশের অতিপ্রসিদ্ধ শ্লোকগুলির বাংলা কাব্যানুবাদে তাঁহার কবিপ্রতিভার নিদর্শন আছে। অবশ্য অন্য কবিতা যে তিনি একেবারেই রচনা করেন নাই তাহা নহে তবে তাঁহার গদ্যকীর্তির সঙ্গে তাহা তুলনীয় নহে।"

তাহার পর বিগত সাত বৎসরে তাঁহার কয়েকটি গল্পের বই ও দুইটি প্রবন্ধ-পুস্তক বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত 'চলচ্চিন্তা' এখনও দেখিবার সুযোগ হয় নাই। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রকাশিত 'বিচিন্তা'য় তাঁহার শেষ জীবনের সামাজিক ও সাহিত্যিক চিন্তাধারা ১৯টি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি" প্রবন্ধে তাঁহার যুক্তিপ্রবণ বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পাই; যে মনের শেষ কথা:

"যিনি বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক তিনি ধীরভাবে ভ্রমপ্রমাদ যথাসাধ্য পরিহার ক'রে সত্যের সন্ধান করেন, প্রবাদকে প্রমাণ মনে করেন না, প্রচুর প্রমাণ না পেলে কোনও নূতন সিদ্ধান্ত মানেন না, অন্য বিজ্ঞানীর ভিন্ন মত থাকলে অসহিষ্ণু হন না, এবং সুপ্রচলিত মতও অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকেন না, উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই বিনা দ্বিধায় মত বদলাতে পারেন। জগতের শিক্ষিত জন যদি সকল ক্ষেত্রে এইপ্রকার উদার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করতে শেখেন তবে কেবল সাধারণ ভ্রান্ত সংস্কার দূর হবে না, ধর্মান্ধতা ও রাজনীতিক সংঘর্ষেরও অবসান হবে।"

এই গ্রন্থে "সাহিত্যিকের ব্রত" প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের যে চরম নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণে রাখিলে দেশের কল্যাণ হইবে। তিনি বলিয়াছেন:

"ব্যক্তিগত রাজনীতিক মত যাই থাকুক, আমাদের সকল লেখকই তাঁদের রচনা দ্বারা দেশব্যাপী মোহ আলস্য আর দুষ্প্রবৃত্তি দূর করার চেষ্টা করতে পারেন। এর চেয়ে বড় ব্রত এখন আর কিছু নেই। জনকতক রাজনীতি নিয়ে বিতণ্ডা করুন, কিন্তু রাজনীতির চেয়ে মনুষ্যত্ব আর সমাজধর্ম বড়। দেশের সাহিত্যিকরা সামাজিক কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত করার চেষ্টা করুন। আমাদের প্রয়োজন—হ্যারিয়েট বীচার স্টো এবং দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় শক্তিশালী বহু লেখক—যাঁরা সামাজিক পাপের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে পারবেন।"

তেত্রিশ বৎসর পূর্বে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে পর পর যে দুইটি প্রবন্ধের দ্বারা তাঁহার যোগসূত্র স্থাপিত হয় সেই প্রবন্ধ দুইটি আজও গ্রন্থাকারে অমুদ্রিত আছে। ইহার পূর্বে তিনি মাত্র তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন—১৩৩১-এ "নামতত্ত্ব", ও "ডাক্তারি ও কবিরাজি" এবং ১৩৩২-এ "ভদ্রজীবিকা"। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার চতুর্থ ও পঞ্চম প্রবন্ধ দুইটি পুরাতন 'শনিবারের চিঠি' হইতে আধুনিক কালের পাঠকদের উপহার দিয়া পরশুরাম-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি:

সাহিত্য-সংস্কার

সব দিকে শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে। হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মিটিয়াছে, মিস মেয়ো অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান বর্জন ও ইংলিশম্যানের অর্জন জোরে চলিতেছে, রিফর্ম কমিশনও নিশ্চয় বয়কট হইবে। কিন্তু আসল কাজই বাকি রহিয়াছে,—খুড়ার গঙ্গাযাত্রা।

সজ্ঞানে তীরস্থ করার উপযোগী খুড়া পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু বিস্তর লেখক আছেন, ছোট বড় মাঝারি,—তাঁদের দুরস্ত করাই এখন মস্ত কাজ। লেখকগণের নিজের চরিত্র সংশোধনের কথা বলিতেছি না। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার চরিত্র, তারা কি বলে কি করে, তাহা উপেক্ষার বিষয় নয়।

গীতায় ভগবান একটি খাঁটি কথা বলিয়া গেছেন—কিং কর্ম কিং অকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ—অর্থাৎ, কি কর্ম আর কি অকর্ম সে বিষয়ে কবিদের কাণ্ডজ্ঞান নাই। এই কাণ্ড-জ্ঞানের অভাবে যে সব অনর্থ ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে তার প্রতিকার আবশ্যক। আমাদের

প্রথম কর্ত্তব্য—বড় বড় লেখকগণ যা লিখিয়া ফেলিয়াছেন তার একটা গতি করা। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—ভবিষ্যতে যাঁরা লিখিবেন তাঁদের জন্য একটা আদর্শ-নির্দ্দেশ।

ছোটো-খাটো লেখকগণ ধর্ত্তব্য নন, কারণ তাঁদের লেখা কালক্রমে আপনিই মুছিয়া যাইবে। কিন্তু যাঁরা সম্রাট, তাঁদের লেখা আবশ্যক মত সংস্কার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শুনিয়াছি রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা দূরে থাক তাঁর গানের সুরেও কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিতে চান না। যদি সত্য হয় তবে দুঃখের বিষয়। ষ্টিফেনসন প্রথমে যে রেলগাড়ীর এঞ্জিন সৃষ্টি করেন তার চিমনি ছিল চার হাত, হেলিয়া দুলিয়া কোনো গতিকে গজেন্দ্র-গমনে ঘণ্টায় পাঁচ-দশ মাইল চলিত। আর এখনকার পঞ্জাব বম্বে মেলের এঞ্জিন দেখ, কি পরিবর্ত্তন। কিন্তু ষ্টিফেনসনের মর্য্যাদা কিছুই কমে নাই। যদি রবীন্দ্রনাথের বাউলের সুর ওস্তাদ-পরম্পরায় সংস্কৃত হইয়া বাগেশ্রী-চৌতালে পরিণত হয়, তবে তাঁর ক্ষুন্ন হওয়া অনুচিত, [illegible] ক্রমোন্নতিই জগতের নিয়ম। যদি কোন দক্ষ ব্যক্তি গোরার উন্নত সংস্করণে পরেশ বাবুর বড় মেয়ে লাবণ্যর সঙ্গে পানুবাবুর বিবাহ দেয়, তবে দেখিতে শুনিতে ভালই হয়। অধিকন্তু, যদি রেল-লাইনের উপরেই সানাই বাজাইয়া মোটর চালানো যায়, অর্থাৎ নরেশচন্দ্রের কমলের সঙ্গে যদি শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীর শুভবিবাহ সংঘটিত হয় এবং তদুপলক্ষে যতীন্দ্র সিংহ মহাশয়ের চকার-ভার্ট সাহেব সঙ্গীত রচনা করেন, তবে মস্ত একটা সামাজিক সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। এই উপায়ে প্রবীণ নবীন সমস্ত বড় বড় লেখকদের রচনা অদল বদল করিয়া ছাঁটিয়া জালি দিয়া নির্দ্দোষ চিরস্থায়ী সাহিত্যে পরিণত করা যাইতে পারে।

আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—ভবিষ্যতের জন্য আদর্শ নির্দ্দেশ। এই আদর্শ এমন হওয়া চাই যাতে আর্ট ও সমাজ দু-ই বজায় থাকে।

আর্ট কি? এক কথায় বলা যাইতে পারে—যা ভাল লাগে তাই আর্টের অঙ্গ বা রস-বস্তু, এবং তা ভদ্র-জনের মুখরোচক করিয়া পরিবেশন করাই আর্ট। অবশ্য একই বস্তু সকলের ভাল না লাগিতে পারে, অতএব আর্টের সৃষ্টি ও উপভোগ কতকটা ব্যক্তিগত। কিন্তু এমন জিনিষ অনেক আছে যা অনেকেরই ভাল লাগে কেবল মাত্রার তারতম্য লইয়াই বিবাদ। সকলেই বলে—দুধ অতি উপাদেয় বস্তু, কিন্তু কেউ ঢকঢক করিয়া খায়, কেউ একটু-আধটু খায়। পেঁয়াজের দুর্গন্ধ প্রসিদ্ধ, অথচ মাত্রা-ভেদে ভদ্র-অভদ্র অনেকেরই রুচিকর। অতএব দুধ ও পেঁয়াজ দু-ই অপরিহার্য্য রসবস্তু। তথাপি, সমাজ মনে করে—দুধ যত খাওয়া যায় ততই বলবৃদ্ধি হয়, কিন্তু পেঁয়াজ বেশি মাত্রায় বিকট। তাই আমরা গতানুগতিক ভাবে দুধ-খোরকে বলি সাত্ত্বিক, পেঁয়াজ-খোরকে বলি নেড়ে। ইহা অন্ধ সমাজের কথা, আমাদের অন্তরের কথা নয়। দয়া দাক্ষিণ্য ভক্তি প্রীতির কথা শুনিতে আমাদের বেশ ভাল লাগে তা অবশ্য মানি; কিন্তু কেচ্ছা কেলেঙ্কারি, খুনোখুনি ব্যভিচার, নরমাংস নারীমাংস—এ সকলও উপযুক্ত অনুপানের সহিত কম উপভোগ্য নয়।

সর্ব্বভুক্ পাঠক হাঁ করিয়া আছে, ওস্তাদ রসস্রষ্টা কাহাকেও বঞ্চিত করিতে, কিছুই বাদ দিতে পারেন না। তিনি শান্ত করুণ রসের স্রোত বহাইবেন, আবার ষড়রিপুর বিচিত্র খেলা দেখাইয়াও তাক্ লাগাইয়া দিবেন। কিন্তু নিন্দুকের মুখ বন্ধ করিবেন কোন্ উপায়ে? পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহা দেখাইয়া গেছেন। ভারতচন্দ্র পায়সান্ন পরিবেশনের সঙ্গে কালীনামের গরম মশলা দিয়া সুঁটকী মাছ চালাইয়াছিলেন। কিন্তু এ যুগে তাহা চলিবে না, কারণ উক্ত মাছের নূতনত্ব নাই, কালীনামেরও আর তেমন হজম করাইবার ক্ষমতা নাই। মনীষী রেনল্ড্‌স্ ও তাঁর ভারতীয় শিষ্যগণ উৎকৃষ্টতর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন,—তাঁরা যথাসাধ্য আর্টের কেরামতি করিয়া অবশেষে দেখাইয়াছেন ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়। ইহাই নিন্দুকের প্রকৃষ্ট প্রত্যুত্তর। এখন আর্টের সীমা আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে, প্রাচীন লেখকগণ যা স্বপ্নেও ভাবেন নাই এমন নব নব রসবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে,—আলকাতারা হইতে স্যাকারিন্, বানরের অঙ্গে নব যৌবনের গ্রন্থি, ছাগলের মনের গোপন কোণে উদ্দাম প্রেমের আদিধারা। কিছুই বাদ দিবার দরকার নাই, যা কিছু ব্যাপার হইয়া থাকে বা ঘটিতে পারে তা-ই আর্টের গণ্ডীতে পড়ে। কিন্তু শেষ রক্ষা চাই। যত ইচ্ছা নরক মন্থন করিয়া রত্ন উদ্ধার কর, কিন্তু উপসংহারে সমস্ত পাপাত্মার নাক কাটিয়া দাও।

একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিব, কিন্তু প্লট মনে আসিতেছে না। অপরের প্লট যে আত্মসাৎ করিব তার যো নাই,—আজকালকার ছোকরারা অতি চালাক, রুশিয়া হইতে চুরি করিলেও ধরিয়া ফেলিবে। অতএব ঋণ স্বীকার করিয়াই চন্দ্রশেখর হইতে দু-একটি চরিত্র লইব। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে মন্দ আঁকেন নাই, তবে প্রায়শ্চিত্তটা বেশী হইয়াছে,—আজকাল অত না হইলেও চলে। কিন্তু আধুনিক আর্টের বাণী না জানায় প্রতাপকে তিনি একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রতাপের চরিত্র আমূল সংশোধিত করিয়া কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাইতেছি।—

প্রতাপ রায় মরে নাই। ঘা সারিবামাত্র সে চন্দ্রশেখরের বাড়ি আসিয়া হাঁকিল—ভট্‌চায, ও ভট্‌চায।

চন্দ্রশেখর নামাবলী গায়ে খড়ম পায়ে আসিয়া বলিলেন—কে ও, প্রতাপ যে। বেশ সেরেচো বাবা?

প্রতাপ একটি তাড়ি-রঙের ধুতির উপর তাড়ির ভাঁড়ের রঙের মেরজাই পরিয়া আসিয়াছে। তার চোখ লাল, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। টলিতে টলিতে বলিল—শৈবলিনীকে ডেকে দিন।

চন্দ্রশেখর মাথা নীচু করিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন—নাই বা দেখা করলে।

—দেখা করতে আমি আসিনি, একেবারে নিয়ে যেতে এসেচি। ডাকুন শীগ্‌গির।

—সে কি প্রতাপ? তিনি যে কুল-বধূ।

—হলেনই বা, এক কুল ছেড়ে অন্য কুলে যাবেন, আমি ত আর লরেন্স ফষ্টর নই। সব ঠিক করেচি, তোকি খাঁ প্রস্তুত, আজই শৈবলিনীকে মোছলমান বানিয়ে দেবে,—তারপর আপনাকে তাল্লাক, আমার সঙ্গে নিকে। আমার নাম এখন আফ্‌তাব খাঁ। ভয় নেই ঠাকুর, জাত যাবে না, কালই আবার রামানন্দ স্বামীকে ধ'রে দুজনে শুদ্ধি নিয়ে নেব।

চন্দ্রশেখর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—তুমি কি জাল-প্রতাপ?

প্রতাপ বজ্র-নিনাদে বলিল—আমি জাল! মূর্খ ব্রাহ্মণ, কাহার সম্পত্তি তুমি ভোগ করিতে চাও? এক বৃন্তে দুটি ফুল, কে ছিঁড়িয়াছিল? (মূল গ্রন্থ দেখ) ভণ্ড জ্যোতিষি, শৈবলিনীর অন্তরের কথা বিবাহের পূর্ব্বে গণিয়া দেখ নাই?

চন্দ্রশেখর কাতর কণ্ঠে কহিলেন—খুবই অন্যায় হ'য়ে গেছে বাবা। স্ত্রী-চরিত্র ত জ্যোতিষে গণা যায় না। এই কলিকালে যে বিবাহের পূর্ব্বে প্রেম হ'তে পারে তা জানতুমই না। যেতে দাও বাবা, যেতে দাও,—যা হবার হ'য়ে গেছে। বেচারী এখন শান্তিতে আছে, সংসারধর্ম্ম করচে, পুরাণো কথা সব ভুলেচে। আহা, আর তাকে উদ্‌ব্যস্ত কোরো না।

প্রতাপ উন্মত্তের ন্যায় হাসিয়া বলিল—এই বিদ্যে নিয়ে তুমি পণ্ডিতী কর? যে অন্তরে অন্তরে আমারই, তাকে তুমি কোন্ অধিকারে আটকে রাখ্‌বে? বল ব্রাহ্মণ, বল বল। যে আমার শৈশব-সঙ্গিনী, সে আজ কাঁহা মেরী হৃদয়কী-ঈ ঈ—(ষ্টার থিয়েটার দেখ)।

চন্দ্রশেখর ভীত হইয়া বলিলেন—একটু ঠাণ্ডা হও বাবা। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।—পাপের স্পর্শ হ'তে কেউ রক্ষা পায় না, শৈবলিনীও ছেলেবেলায় পাপে পড়েছিলেন—

—অ্যাঁ! পূর্ব্বরাগ পাপ?

—সর্ব্বত্র পাপ নয় বাবা। কিন্তু যেখানে স্বাধীন বিবাহ চলিত নেই, সেখানে পূর্ব্বরাগের ফলে পরে শান্তিভঙ্গ হ'তে পারে সেজন্যই পাপ।

—তবে পাপিয়সীকে ছেড়ে দাও না ঠাকুর।

—খাপ্পা হয়ো না বাবা। পাপ হ'লই বা—ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনি,—অমন একটু আধটু পাপ আমরা সবাই ক'রে থাকি। কিন্তু সেটা নির্ম্মূল করাও যায়। শৈবলিনী মন্ত্রলাভ করেচেন, যে মন্ত্রবলে চিরপ্রবাহিত নদী অন্য খাতে চালানো যায়—(মূল গ্রন্থ দেখ)

—বুঝেচি বুঝেচি, বুজরুকি ক'রে তাকে আটকে রাখ্‌তে চান! ও চল্‌বে না ঠাকুর, তুমি তাকে আট্‌কাবার কে? আমার শৈবলিনীকে চাই, এক্ষুনি এক্ষুনি। উচাটন মন যারে ধরিবারে ধায়, তারে কেন-কানন-কেন নাহি পায়! (ষ্টার থিয়েটার দেখ)

চন্দ্রশেখর খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিলেন—ক্যানন্ নাহি পায় তা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। রামচরণ অ রামচরণ—

রামচরণ এখন ভট্চায-বাড়িতেই কাজ করে। সাড়া দিল—আজ্ঞে।

—ওরে নিয়ে আয় ত আমার ছড়িটা, সেই বেতের লিক্‌লিকে ছড়ি। বাঁশের লাঠিটা নয়, বুঝেচিস্?

প্রতাপ বলিল, ছড়ি কি হবে, ভট্চায?

—তোমায় লাগাব। দু-এক ঘা খেলেই বুদ্ধি সাফ হ'য়ে যাবে। রামচরণ, জল্‌দি—

প্রতাপ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—অ্যাঁ, মারবে? প্রতাপ রায়ের গায়ে হাত! তবে রে পাজি, শুয়ার—

—অ রামচরণ, বেতের ছড়িতে হবে না রে, বাঁশের লাঠিটাই আন্—

প্রতাপ সদর্পে পলায়ন করিল। আর্ট ও সমাজধর্ম্ম দু-ই বজায় রহিল, অথচ লাঠি ভাঙিল না। [অগ্রহায়ণ ১৩৩৪]

তামাক ও বড়-তামাক

মানুষ ও জন্তুর মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই, যে মানুষ নেশা করিতে শিখিয়াছে, জন্তু শেখে নাই। বিড়াল দুধ মাছ খায়, অভাবে পড়িলে হাঁড়ি খায়, ঔষধার্থে ঘাস খায়, কিন্তু তাকে তামাকের পাতা বা গাঁজার জটা চিবাইতে কেউ দেখে নাই। মানুষ অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে, ঘর-সংসার পাতে, জীবন-ধারণের জন্য যা-কিছু আবশ্যক সমস্তই সাধ্যমত সংগ্রহ করে, কিন্তু এতেই তার তৃপ্তি হয় না—সে একটু নেশাও চায়। অবশ্য, গম্ভীর-প্রকৃতি হিসাবী লোকের কথা আলাদা। তাঁদের কাছে নেশা মাত্রই অনাবশ্যক; কারণ, তাতে দেহের পুষ্টি হয় না, জ্ঞানেরও বৃদ্ধি হয় না, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে অপকারই হয়। তথাপি বহু লোক কোনো অজ্ঞাত অভাব মিটাইবার জন্য নেশার শরণাপন্ন হয়।

নেশা বহু প্রকার, যথা তামাক গাঁজা মদ সঙ্গীত কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি। সকলগুলির চর্চার স্থান এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় নাই, সুতরাং তামাক ও গাঁজা সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

তামাক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিন্দুক জুটিয়াছে। তামাক খাইলে ক্ষুধা নষ্ট হয়, বুদ্ধি জড় হয়, হৃৎপিণ্ড দূষিত হয়, ইত্যাদি। কিন্তু কে গ্রাহ্য করে? জগতের আবাল-বৃদ্ধ তামাকের সেবক, বনিতারাও হইয়া উঠিতেছেন। তামাকের বিরুদ্ধে যে-সব ভীষণ অভিযোগ শোনা যায়, তামাক-খোর তার খণ্ডনের কোনো প্রয়াসই করে না, শুধু একটু হাসে ও নির্বিকার-চিত্তে টানে। কিন্তু তাদের অন্তরে যে জবাব অস্ফুট হইয়া আছে, আমরা তার কতকটা আন্দাজ করিতে পারি।—মশায়, তামাক জিনিসটা স্বাস্থ্যের অনুকূল না হইতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যই কি সব চেয়ে বড়? একটু না হয় ক্ষুধা কমিল, চেহারায় [illegible] ধরিল, হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করিল,—কিন্তু আনন্দটা কি কিছুই নয়? মোটের উপর লাভটাই আমাদের বেশি। লোকসানের মাত্রা যদি বেশি হইত, তবে আপনিই আমরা ছাড়িয়া দিতাম, উপদেশের অপেক্ষা রাখিতাম না। আমাদের শরীর মন বেশ ভালই আছে, ভদ্র-সমাজে কেউ আমাদের অবজ্ঞা করে না। হাঁ, কোনো কোনো অর্বাচীনের তামাক খাইলে মাথা ঘোরে তা মানি; কিন্তু দু-এক জনের দুর্বলতার জন্য আমরা এত লোক কেন এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইব?

এই সময় গঞ্জিকাসেবীর বাজখাই গলার আওয়াজ শোনা গেল—ভায়া, আমরাও আছি। আমাদের তরফেও কিছু বল।

তামাক-খোর ধমক দিয়া বলেন—দূর হ লক্ষ্মীছাড়া গেঁজেল! তোদের সঙ্গে আমাদের তুলনা?

গাঁজা-খোর ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—সে কি দাদা? তোমাতে আমাতে ত কেবল মাত্রায় তফাৎ। তুমি খাও তামাক, আমি খাই বড়-তামাক। তোমরা সৌখিন বড়লোক, তাই বিস্তর আড়ম্বর,—রূপার ফরসি, জরির সটকা, সোনার সিগারেট-কেস, কলের চকমকি। আমরা গরীব, তাই তুচ্ছ সরঞ্জামের বড়-বড় নাম রাখিয়াই সখ মিটাই। গাঁজা কাটিবার ছুরিকে বলি রতন-কাটারি, কাঠের পিঁড়িকে বলি প্রেম ভক্তি, ধোঁয়া ছাকিবার ভিজা ন্যাতাকে বলি আমিয়ার, গাঁজা জ্বলিবার সময় মন্ত্র বলি—বোম্ শঙ্কর কঙ্কড় কি ভোলা। আমাদের নেশার আয়োজনেই কত কাব্য-রস,—তোমরা ত পরের প্রস্তুত জিনিষ টানিয়াই খালাস। আর, আনন্দের কথা যদি ধর, তবে তোমরা বহু পশ্চাতে। অমিতানন্দ জানো? আমরা তাই উপভোগ করি। স্বাস্থ্য? তার জবাব ত তোমরা নিজেরাই দিয়াছ। আমরা স্বাস্থ্যের উপর একটু বেশি অত্যাচার করি বটে, কিন্তু আনন্দটি কেমন? না হয় গলাটা একটু কর্কশ হইল, চোখ একটু লাল হইল, চেহারাটা একটু চোয়াড়ে হইল, কিন্তু মোটের উপর শরীর মন ঠিকই আছে।

হিসাবী সমাজ-হিতৈষী দুই তরফের কথা শুনিয়া বলিলেন—তোমাদের বচসা মিটানো বড়ই শক্ত কাজ। আমি বলি কি—তোমরা দু-দলই বদ অভ্যাস ত্যাগ কর। সরবৎ খাও, ভাল ভাল জিনিষ খাও—যাতে গায়ে গত্তি লাগে, যথা লুচি-মণ্ডা। প্রকৃত আনন্দ তাতেই আছে।

তামাক-খোর বলিলেন—সরবৎ খুব স্নিগ্ধ, লুচি-মণ্ডাও খুব পুষ্টিকর, সুবিধা পাইলেই আমরা তা খাই। কিন্তু এ সব জিনিষে আত্মা তৃপ্ত হয় না, আড্ডা জমে না। কিঞ্চিৎ নেশার চর্চা না করিলে মানুষে মানুষে ভাবের বিনিময় অসম্ভব। তামাক অবশ্য চাই, এইটিই নিরীহ প্রকাশ্য নেশা, আর সব নেশা অপ্রকাশ্য।

গাঁজা-খোর বলিলেন—ঠিক কথা। নেশা চাই বই কি, কিন্তু গাঁজাই পরাকাষ্ঠা। তোমাদের পাঁচ জনের উৎসাহ পাইলেই আমরা ভদ্র সমাজে চালাইয়া দিতে পারি।

সমাজ-হিতৈষী চিন্তিত হইয়া বলিলেন—তাই ত, বড় মুস্কিলের কথা। দেখিতেছি তোমরা কেউ-ই ধোঁয়া না টানিলে বাঁচিবে না। আচ্ছা, অক্সিজেন শুঁকিলে চলে না?

তামাক-খোর গাঁজা-খোর অবজ্ঞাব হাসি হাসিয়া সমস্বরে কহিলেন—আজ্ঞে, ওটা অন্তিম কালে, হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে। আপাতত কিছু সাকার সুগন্ধি সুস্বাদ মনোহারী ধোঁয়ার ফরমাস করুন।

হিতৈষী নাচার হইয়া বলিলেন—তবে ঐ তামাক অবধি বরাদ্দ রহিল। তার উপর আর উঠিও না, ঐখানেই গণ্ডি টানিলাম।

গাঁজা-খোর অট্টহাস্যে বলিলেন—খুব বুদ্ধি আপনার! নেশার তত্ত্ব আপনি কিছুই বোঝেন না। ঐ তামাকই ত একটু একটু করিয়া বেমালুম ভাবে গাঁজায় পরিণত হইয়াছে—তামাক-তামা-তাজা-গাঁজা। 'মৌচাক'এর শিশু পাঠকরাও এই তত্ত্ব জানে। কোথায় গণ্ডি টানিবেন?

সমাজ-হিতৈষী মহাশয় হতাশ হইয়া বলিলেন—তবে মর তোমরা পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা। দিন কতক যাক, তারপর বুঝিব কার পরমায়ু কত কাল। [পৌষ ১৩৩৪]

স্বতঃসিদ্ধ সত্য

গোপালদা লিখিয়াছেন,

"ভায়া হে, চীন অভিযাত্রীদলের এভারেস্ট-বিজয় সংবাদে আজ তোমরা চমৎকৃত ও পুলকিত হইতেছ, কেহ

কেহ আবার সন্দিগ্ধচিত্তে সন্দেহও প্রকাশ করিতেছ কিন্তু ইহা যে একটা স্বতঃসিদ্ধ অবশ্যম্ভাবী সত্য ঘটনা তাহা যেদিন স্বর্ণকিরীটী রংবাক মন্দির চীনারা দখল করে সেই দিনই আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম। উত্তর কলের (North Col) পথে এভারেস্ট আয়ত্ত করিতে গেলে শেষ মনুষ্যাবাস এই মন্দিরটি। এই স্থানের মনুষ্যদের সম্পূর্ণ নিজস্বীকৃত না করিতে পারিলে এভারেস্ট-বিজয় খণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা। চীনারা বুদ্ধিমান, আটঘাট বাঁধিয়াই কাজ করে। যে মৃতদেহটি এই অভিযাত্রীদল এভারেস্টশৃঙ্গে আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা যে বেচারা ম্যালরির (Malory) তাহাও তাঁহারা অচিরাৎ প্রমাণ করিবেন এবং তোমরা একটু ধৈর্য ধরিয়া থাকিলেই শুনিতে পাইবে এই অভিযাত্রীদল হিমালয়চূড়া হইতে একটি আস্ত জীবন্ত ইয়েতিকেও কায়দা ও কব্জা করিয়া সঙ্গে আনিয়াছেন। ভায়া হে, শনৈঃ পন্থাঃ। গোয়েবেল্‌সের এইখানেই ভুল হইয়াছিল, আক্রমণ-প্রণালী হিসাবে ব্লীৎজক্রীগ ভাল কিন্তু প্রচার-পদ্ধতি হিসাবে নয়। এখানে স্লো অ্যাণ্ড স্টেডি থাকাই বিধেয়। বাবা হিমালয়ের যখন আর শিরে পদাহত হইলে লাঞ্ছনার ভয় নাই তখন তোমরা ইহা লইয়া বিচলিত হইও না।

কৈলাস ও মানসসরোবর তীর্থযাত্রার প্রতিবন্ধকতার কথাও ভাবিও না বৎস। মহাকাল স্বয়ং যখন সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, মনে রাখিও ইহার পিছনেও তাঁহার কোন মতলব আছে। কৈলাস-মানসসরোবর তো তিব্বতেই, সুদূর দক্ষিণ তামিলনাদ হইতেও যে চীনারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন সে খবর কি রাখ? তোমাদের আক্রাম খাঁ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র খয়রুল আনাম খাঁ সাহেবের কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'পয়গাম' অর্ধ সাপ্তাহিকের গত ১১ই নবেম্বর তারিখের সংখ্যায় সুকৌশলে প্রচারিত এই সংবাদটি কি তোমাদের কর্তারা দেখিয়াছেন?

"আমাদের দুর্ভাগ্য হইল এই যে, চীনারা এখনও পর্যন্ত তামিলনাদে প্রবেশ করে নাই। আমি [কাজাগাম-নেতা ই. ভি. রামস্বামী] চাই যে চীনারা তামিলনাদ দখল করুক। তাঁহারা এখানে আসিলে জাতিভেদ দূর হইয়া যাইবে এবং আমরা সকলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিব।"

সুতরাং ভায়া হে, এভারেস্ট, কৈলাস, মানসসরোবর লইয়া এখন আর বৃথা মাথা ঘামাইও না, কন্যাকুমারী সামলাও।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

বিগত ১০ই জুন কলিকাতার সংস্কৃতি পরিষদ্ ভারতীয় শাস্ত্রে ও সাহিত্যে পারঙ্গম মহাভারত-বিজয়ী সব্যসাচী সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয়কে সম্বর্ধিত করিয়া সমগ্র দেশের পক্ষে একান্ত কর্তব্য পালন করিয়াছেন। ভারত-সরকার ইতিপূর্বেই তাঁহাকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনার ফল, মহাভারত—মূল টীকা ও অনুবাদ, তিনি দেশবাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন, তাঁহার প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতার অবধি নাই। দেশের কল্যাণার্থে তিনি শতায়ু হউন, আমাদেরও সেই প্রার্থনা।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

এই বৎসরে অক্ষয়কুমার বড়াল ও জলধর সেন—বাংলাদেশের একজন কবি ও একজন কথাসাহিত্যিকের শতবার্ষিক জন্মদিনোৎসব হইয়া গেল। আগামী ১৯৬১ সন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক উৎসবে আমরা ব্যাপৃত ও মত্ত থাকিব। কিন্তু যে মহাপ্রাণ বাঙালী সন্ন্যাসী সর্বপ্রথম বাংলার রবীন্দ্রনাথকে "বিশ্বকবি" বলিয়া অভিনন্দিত করেন, যিনি 'সন্ধ্যা'র সাহায্যে ভারতের প্রভাত আনিবার প্রয়াস করেন, সেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৮৬১ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারি হুগলী খন্যানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কথা আমরা যেন হট্টগোলে বিস্মৃত না হই।

এনার (ENAR) স্টোভ

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলাদেশকে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-সচেতন করিতে চাহিয়াছিলেন। নিজে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে প্রকৃত তত্ত্বগত পাণ্ডিত্যসত্ত্বেও ব্যবহারিক বিজ্ঞানে যে কিছু আবিষ্কার করেন নাই সেজন্য তাঁহার ক্ষোভ ছিল। তাঁহার দৌহিত্র শ্রীনির্মলকুমার রায় দাদামহাশয়ের সেই ক্ষোভ এতদিনে নিবারণ করিয়া এদেশের গৃহস্থদের জ্বালানির জ্বালা প্রশমনার্থ এই স্টোভ আবিষ্কার ও নির্মাণ করিয়া দেশবাসীর হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। অবশ্য এই জ্বালানির মূল উপাদান বিদ্যুৎ। যেখানে বিদ্যুৎ-সরবরাহ আছে সেখানকার মানুষ সহজেই উনান ধরাইবার হাঙ্গামা ও কয়লা ও কাঠের ধোঁয়ার হাত হইতে যে বাঁচিতে পারিবেন 'এনার স্টোভ' ব্যবহার করিয়া আমরা সে সাক্ষ্য দিতেছি। এই ইলেকট্রিক হীটারের সর্বাধিক সুবিধা এই যে গরম বা ঠাণ্ডা কোনও অবস্থাতেই প্রয়োজন ঘটিলে তার (Element) বদলের কোনও অসুবিধা বা বিপদ নাই। এ. সি. ও ডি. সি. দুই এলাকার পক্ষেই এ কথা খাটে।

তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা

পবিত্রকুমার ঘোষ

প্রথমেই একটি সুস্পষ্ট অভিযোগ দিয়ে আমি শুরু করব। এমন সময় ছিল যখন বাংলা ভাষায় কোন রচনাই ুরুষরা পড়ত না। স্ত্রীপাঠ্যতাই তখন বাংলা ভাষায় য কোনো লেখার পাঠ্যতার একমাত্র মাপকাঠি ছিল। ংলাদেশে তখনও মহিলা সাহিত্যিকরা কলম ধরেন নি তে বেশী, কিন্তু মহিলাদের কাছেই শুধু ছিল বাংলা াহিত্যের সমাদর। আমার বিশ্বাস, সে যুগ আজ আর নই। কিন্তু সম্প্রতি হুজুগ উঠেছে—লেখায় বিষয়বস্তু ক্তব্য তথ্য ও বিশ্লেষণের সমৃদ্ধি কিংবা উপলব্ধির ঐশ্বর্য া সমস্তই অপ্রয়োজনীয়, লেখার রমণীয়তাই লেখার ারাৎসার, তাতে আর কিছু থাকাই অবান্তর। এবং মণীয়তা ও রমণীপ্রিয়তা নাকি সমার্থক এ কথাও শুনছি। াজকের এলোমেলো আবহাওয়ার সুযোগে সাহিত্যক্ষেত্রে া বেনোজল ঢুকে পড়েছে তার ধাক্কায় যদি সত্যিই মণীপ্রিয়তাই হয়ে ওঠে সাহিত্যের সার্থকতার শেষ কথা, বে সেই বেনোজলের বিরুদ্ধেই আমি প্রথম বিক্ষুব্ধ হব। ংলা ভাষার প্রধান প্রধান সংবাদপত্র ও সাময়িক ত্রিকাগুলি এদেশে একশ্রেণীর টেডি বয়দের প্রশ্রয় দিয়ে েছে—সাহিত্যের আসরে যত দুরাচার ও বিকৃতরুচি আমপানির উল্লাসে যারা মেতে উঠেছে জানি। আজকাল সরকার রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কতকগুলি সাহিত্য-পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। আকাদমী, রবীন্দ্রপুরস্কার ছাড়াও আরও বহু সুযোগ-সুবিধা ক্রমেই বেশী করে দিতে উদ্যত হয়েছেন তাঁরা। এবং সরকারের তরফ থেকে সাহিত্য-বিচার ও পুরস্কার দানের যে নমুনা আজ দেখা যাচ্ছে তাতে তদ্বিরের জোরে সাহিত্যের টেডি বয়রাই হয়তো পুরস্কৃত হবে আসন্ন ভবিষ্যতে। কিন্তু তাকেও সাহিত্যের শেষ বিচার বা চরম সার্থকতা বলে মানবে না কেউ। সংবাদপত্রের রবিবাসরীয়-সাময়িকী-সম্পাদক এবং বার্তা-সম্পাদকের ঘরে বসে দিনের পর দিন চাটুকারিতার সাধনায় নিমগ্ন হয়ে আজ যারা সাহিত্যের আসরে ছাড়পত্র পায়, কফিহাউসে কফির কাপে ঝড় তুলেই তারা ক্ষান্ত হবে না, মন্ত্রী বা মন্ত্রীর আত্মীয়ের বাড়ি পর্যন্ত তারা ছুটবে। ধরে নেওয়া যাক তাতে বিড়ালের ভাগ্যে শিকেও ছিঁড়বে। কিন্তু তারপর? সম্ভবতঃ আর কোন 'তারপরে' এরা বিশ্বাসই করে না। কিন্তু বিশ্বাসের চেয়ে বাস্তব বড়। সেই বাস্তবে আমি আস্থা রাখি। আজ চাটুকারিতার অপবিচ্ছন্নতায় যারা জন্মলাভ করছে, আমি

কামনা করি তারা পদ্মের মত হেসে উঠুক, সূর্যের পানে মুখ ফেরাক ; সুনিশ্চিত বিনষ্টির পথ থেকে তারা ফিরে আসুক। এ কালের টেডি বয়দের মুখে যিনি ভাষা দিয়েছেন, তাদের হৃদয়যন্ত্রণা যিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন সেই জন অসবোর্নের নাটকেও দেখছি এই বিকৃতি এবং নষ্টামিও ওদের মুখোশমাত্র, এর আড়ালে গুমরে গুমরে কাঁদছে ওদের আসল মানবসত্তা। 'লুক ব্যাক ইন অ্যাংগার' নাটকে অসবোর্ন জিমি পোর্টারের চরিত্র এঁকেছেন। পৃথিবীর কোন-কিছুতেই তার কিছু এসে যায় না। প্রেম সৌন্দর্য সততা এ সব কোন-কিছুতেই তার বিশ্বাস নেই, এ সমস্তকেই সে উপহাস করে। মিথ্যা জোচ্চুরি বদমায়েশি, নারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, নিজের সন্তানদের প্রতি চরম ক্রূরতা—কোন-কিছুতেই তার অতৃপ্তি নেই। জীবন নয়, জীবন সম্পর্কে তার যে কুৎসিত ধারণা তাই ছিল তার কাছে বড় আর তাতেই মাথা গুঁজে যত পাপ সে করে গিয়েছে উৎফুল্ল চিত্তে। নাটকের শেষে সেই জিমি পোর্টারের সামনে এসে দাঁড়াল জীবন সম্পর্কে তার বানানো সব ধারণাকে চুরমার করে দিয়ে স্বয়ং জীবন। রুক্ষ বাস্তব এক মীমাংসা-অসম্ভব প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে এল তার কাছে তার বিতাড়িত স্ত্রী অ্যালিসনের রূপে। অ্যালিসন জিমিকে ভালবেসেছিল পাগলের মত, তার জন্ম অপমান, আঘাত যন্ত্রণা দারিদ্র্য গ্লানি সব কিছুই সয়েছে সে এতদিন। তার গর্ভে যখন সন্তান এল তখন অসহ্য দুঃখ মাথায় নিয়ে সে বিতাড়িত হয়ে জিমির ঘর থেকে বেরিয়ে পিতৃগৃহে চলে গিয়েছিল। পিতৃগৃহে সে শুনেছে জিমি হেলেনার সঙ্গে ঘর করছে। কিন্তু তাতে ক্ষুব্ধ হবার অবস্থা থেকে অনেকদিন আগেই সে পার পেয়ে গেছে। অবশেষে একদিন অভিযোগহীন চিত্তে শুধু কৌতূহল-বশবর্তিনী হয়ে সে জিমির ঘরে এসে পৌছল। সন্তসন্তান-বিয়োগবেদনাবিধুর রুগ্ন পাণ্ডুর অ্যালিসন—পৃথিবীর সব আশা বিশ্বাস তাকে ছেড়ে গিয়েছে। সে শুধু, বলতে হয়, একখণ্ড নগ্ন বাস্তব। তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, কোন সংঘর্ষ ছাড়াই, হেলেনা পালিয়ে গেল। এবং তার মুখোমুখি হতে হল জিমিকে। অ্যালিসনের নয়—জিমিরই জীবনের চরমতম সঙ্কটময় মুহূর্ত তখন ঘনিয়ে এল।

অ্যালিসন বলছে :

তুমি কি বোঝ না? সে চলে গেছে! সে গেছে! সেই—সেই অসহায় মানবসত্তাটি যে ছিল লুকিয়ে আমার শরীরের ভিতরে। আমি ভেবেছিলাম সে নিরাপদে আর নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আছে সেখানটায়। কেউই তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে। সে ছিল আমার, আমারই দায়িত্বে গড়া। কিন্তু সে হারিয়ে গেল। [মেঝের টেবিলের পায়ার কাছে সে বসে পড়ে] আমি শুধু চেয়েছিলাম মরতে, আমি কখনও জানতুম না যে সে কী অবস্থা! আমি যন্ত্রণায় ডুবে গিয়েছিলাম এবং শুধু ভাবতে পারতুম তোমাকেই, আর ভাবতুম কী আমি হারিয়েছি। [সে প্রায় কথা বলতে পারছে না] আমি ভেবেছিলাম, যদি শুধু—যদি শুধু এখন সে আমাকে দেখতে পেত, এই নির্বোধ কুৎসিত হাস্যকর আমাকে। আমি এ রকম অবস্থায় পড়ি এই তো সে এতদিন চেয়েছে। এই দেখেই মজায় মেতে উঠতে চেয়েছে সে এতদিন। আমি আগুনে পুড়েছি, আমি জলে যাচ্ছি, এবং আমি এখন চাই শুধু মরে যেতে। আমাকে এ অবস্থায় ফেলার জন্ম তাকে হারাতে হল তার একটি সন্তান এবং আরও যে সব শিশু আমার গর্ভে আসতে পারত তাদেরও সে হারাল! কিন্তু কী এসে যায় তাতে—সে তো আমার কাছ থেকে এই চেয়েছিল!

[অ্যালিসন তার মুখ জিমির দিকে তুলে ধরে]

তুমি কী দেখতে পাচ্ছ না! আমি যে শেষ পর্যন্ত কাদার মধ্যে পড়েছি! আমি কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছি! আমি হামাগুড়ি দিচ্ছি! হায়, ভগবান—

[অ্যালিসন জিমির পায়ের কাছে ভেঙে পড়ে। জিমি দাঁড়িয়ে থাকে, এক মুহূর্তের জন্ম সে যেন বরফ হয়ে গিয়েছে ; তারপর সে নত হয় এবং অ্যালিসনের

কম্পিত শরীরটাকে নিজের দু বাহুর মধ্যে তুলে নেয়। সে মাথাটা নাড়ায় এবং ফিসফিস করে বলে :]

জিমি : আর বল না, লক্ষ্মীটি আর বল না……আমি পারছি না—

এর পরের অংশ আপাততঃ উদ্ধৃত করার দরকার নেই। নাটকের এই শেষ অংশে আমরা লক্ষ্য করি বিকৃত বীভৎস একটি যুবকচরিত্রের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক শাশ্বত মানুষ, এক সুন্দর প্রেমিক।

আমি আধুনিক যুগের তরুণ স্যাভেজেকচুয়েল, বিশ্বাস ও বাস্তব সম্পর্কে বলেছি। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে এই তরুণ স্যাভেজেকচুয়েলদের মধ্যে দুটি প্রবণতা অতীব প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রথমতঃ, এরা কোনও মহান্ আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে ভুলে গেছে। দেশপ্রেম, দরিদ্র মানুষের দুঃখ দূর করার বাসনা, সমাজ-সংস্কার বা রাজনৈতিক বিপ্লব এসব আদর্শ দু-দশক আগেও, এমন কি এক-দশক আগেও যেভাবে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের আলোড়িত করত, বহুজন এই সব আদর্শ অনুসরণ করার জন্য জীবনের সর্বস্ব পণ করে বসত— আজ অবস্থা ঠিক তার বিপরীত, আজ এসব আদর্শ নেহাতই হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কফিহাউসের চার দেয়ালের মধ্যে এই তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মনোযোগের জগৎ সীমিত হয়ে এসেছে এ কথা যদি নাও বলি, তবু দেশের জন্য সমাজের জন্য চিন্তিত হওয়া, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে এই সব স্বীকৃত মানবাদর্শের জন্য কিছু করতে যাওয়া আজ তাদের কাছে উপহাসের বিষয়। এবং যদি কেউ এখনও এসব আদর্শে বিশ্বাস করে, এমন কি বিশ্বাস করে প্রেমিক বা প্রেমিকার প্রতি প্রেমের একনিষ্ঠতায়, তা হলে তাকেও তারা গ্রাম্য মফস্বলের লোক বলে ঠাট্টা-তামাশা করে। কিন্তু এই সব সনাতন স্বীকৃত আদর্শ বাদ দিয়ে আর কোন্ আদর্শে বিশ্বাস করে তরুণ বুদ্ধিজীবীরা? কোন আদর্শেই তাদের আস্থা নেই, সব বিশ্বাসই প্রায় তাদের মন থেকে মুছে গেছে। অসবোর্নের জিমি পোর্টার বলছে : কেউ ভাবে না, কেউ কিছু নিয়েই মাথা ঘামায় না। কোন বিশ্বাস নেই, কোন আদর্শ নেই, এতটুকু উৎসাহ নেই।

জিমির আর একটি কথায় আরও বিশদ হয়েছে আধুনিক তরুণদের মনোভাব :

> I suppose people of our generation aren't able to die for good causes any longer. We had all that done for us, in the thirties and the forties, when we were still kids. ...There aren't any good, brave causes left. If the big bang does come, and we all get killed off, it won't be in aid of the old-fashioned, grand design. It'll just be for the Brave New-nothing-very-much-thank-you. About as pointless and inglorious as stepping in front of a bus.
>
> (Look Back in Anger, pp. 84-85)

বিশ্বাস ও আদর্শ হারানো আজকের দিনের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক অবস্থা। আমাদের দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবীরা চোখের সামনে দেশের জনসাধারণের বহু দুঃখ দেখছে— তাদের নিজেদের অবস্থাও প্রায়ই ভাল নয়। ইংরেজ আমলে কল্পনা করা যেত যে সব দুঃখদুর্দশার মূল এক সাধারণ শত্রু—ইংরেজ। দেশে ধানের চাষ ভাল না হলে এমন কি অতিবৃষ্টি বা স্বল্পবৃষ্টি হলে সেজন্যও দায়ী করা হত ইংরেজকে, চোর-পকেটমারের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যও দায়ী ইংরেজ, বেকারসংখ্যা বাড়ার সব দায়িত্বও ইংরেজের। সত্য মিথ্যা বিচারের দরকারও হত না, আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট অভাব ও বাস্তব জীবনের যা কিছু তিক্ততার জন্য ইংরেজকে দায়ী করে খুশী থাকা সম্ভবপর ছিল। এই ইংরেজ ঘরের লোক ছিল না। সে দূরের মানুষ, তাকে আমরা চিনি না, অপরিচয়ের বেড়া দিয়ে সে ঘেরা। ইংরেজের প্রতি আমাদের ক্রোধ ছিল তীব্র, অথচ মনের গোপন কোণে আমরা তাকে ঈর্ষা করতুম, তার অজস্র গুণে মুগ্ধ হতুম, তাকে অজানতেই

অনুকরণ পর্যন্ত করতুম। ভারত শাসনের দায়িত্ব নিয়ে যেসব ইংরেজ আসত ভারতে তাদের প্রতি যেমন অসম্ভব তীক্ষ্ণ বিদ্বেষ ছিল আমাদের, তেমনি সাগরপারে তাদের স্বদেশেই যে ইংরেজ বাস করে তার সাহিত্য তার সংস্কৃতি তার বিশ্ববিদ্যালয়, অজানা অদেখাকে আয়ত্ত করার তার তীব্র নেশা, আবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর বাস্তববোধ ও সংযম আমাদের মুগ্ধ করেছে। এই মুগ্ধতা প্রকাশ করতেও আমাদের কোনও লজ্জা বা কুণ্ঠা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ছোট ইংরেজ ও বড় ইংরেজের কথা বলেছেন ও এদেশে আগত ছোট ইংরেজদের প্রতি তাঁর বিমুখতার সঙ্গে সঙ্গে ওদেশের বড় ইংরেজদের তিনি তাঁর মনের সকল শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে আমরা এইভাবে তীব্র ঘৃণা ও গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছি ইংরেজের প্রতি। এবং তার ফলে যে ইংরেজ ছিল আসলেই আমাদের অচেনা, যার রীতিনীতি সভ্যতা সংস্কার প্রথা বিশ্বাস, যার সমাজ রাজনীতি সবই আমাদের থেকে ভিন্ন বলে সে দূরের মানুষ, যে অসীম ক্ষমতার অধীশ্বর বলে আমাদের কাছে প্রতীত অথচ যে আমাদের চিরন্তন শত্রু বলে ঘৃণিত—তাকে ঘিরে তার চারদিকে একটি রহস্যের পরিমণ্ডল গড়ে উঠবেই। এইভাবে ইংরেজের চারপাশে একটি বাস্তব-অতিশায়ী রহস্যময় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে আমাদের মনের রোমান্টিক প্রবণতা ও মোহকাতরতা অবাধ স্ফুরণের সুযোগ পেয়েছে।

আঁতেলেকচুয়েলদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে রোমান্টিক যন্ত্রণা; তারা বাস্তব-অতিশায়ী কল্পিত রহস্যময় জগতে ডুবে থাকতেই ভালবাসে। তারা অস্থির, সাদামাঠা তথ্যের চেয়ে রঙিন কল্পনাকে সত্য করে বিশ্বাস করতে তাদের ভাল লাগে—রোমান্টিক বিষাদ, নিঃসঙ্গতাবোধ, রহস্যের প্রতি উন্মুখতা ছাড়া কে কবে প্রকাশের সমস্যা নিয়ে বিচলিত হয়েছে? জীবনে যখন কেরিয়ার তৈরির পথ এত খোলা তখন কে নিজের বক্তব্য অনুভূতি বা উপলব্ধি সর্বজনীন ভাষায় প্রকাশের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে রাজী হয়? টাকা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন বা হয়তো খবরের কাগজে নাম ছাপার ব্যবস্থা করার মত বুদ্ধি যার আছে, যে মানসিক ক্ষমতায় গড়পড়তা মানুষের চেয়ে বেশ উপরে—সেই লোক সেসব বিবেচনা গৌণ করে রেখে কেন আত্মপ্রকাশের তাগিদে নিজের মর্মকোষ পর্যন্ত কুরে কুরে খেতে রাজী হয়? রোমান্টিকতা, রহস্যের প্রতি দুর্বার টান, সাদা বাস্তবের প্রতি বিমুখতা ও অতৃপ্ত অন্তর্বেদনা যার আছে সেই কেবল পারে শুধু এই প্রকাশের সমস্যা নিয়ে মগ্ন হতে এবং তাই আমি বলেছি আঁতেলেকচুয়েল মাত্রই রোমান্টিক। বিশেষতঃ তারা যখন তরুণ, জীবনের ব্যর্থতাবোধ যখন তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে নি, যখন তারা রঙিন সমুদ্রে উথাল-পাথাল করে অবগাহন করতে পারার অসীম আনন্দে আর সবকিছু সম্পর্কেই অবুঝ থাকতে ভালবাসে—তখন সেই রোমান্টিকতার স্ফূর্তি যেখানে অসম্ভব সেখানে তাদের মাথা ঘামাবার অবকাশ কোথায়?

পরাধীনতার আমলে ইংরেজকে ঘিরে রোমান্টিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, ইংরেজকে নিয়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের তাই চিন্তার শেষ ছিল না। কী করে এই ইংরেজকে নাজেহাল করা যায়, তাকে অস্বীকার করা যায়, তার সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা লড়া যায়, এসব কথা ১৯৪৭ সনের আগে পর্যন্ত ভাবা যেত, আর ইংরেজই যখন আমাদের যাবতীয় দুঃখের মূল রূপে প্রতীত হয়েছিল তখন ইংরেজকে এদেশ থেকে দূর করা, সমস্ত বিশ্বে ইংরেজের যে সাম্রাজ্য ছিল প্রসারিত তা ভেঙে চুরমার করা এই ছিল এমন এক চরম আদর্শ যা সহজেই বরণ করা যেত ও তার জন্য এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া যেত।

রোমান্টিকতা ও ইংরেজ তাড়ানোর আদর্শ ওতঃপ্রোত ভাবে মিশেছিল এবং যেহেতু রোমান্টিকতা সৃষ্টিশীল তরুণদের স্বাভাবিক প্রবণতা, আর ইংরেজ তাড়ানোর ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে এই প্রবণতাটিই উদ্দাম হয়ে উঠতে পেরেছিল অতএব একটি জলন্ত আদর্শ খুঁজে পেতে ১৯৪৭ সনের আগে পর্যন্ত ভারতীয় তরুণদের কোনও অসুবিধা হয় নি।

আজও আমাদের দেশে মানুষের দুঃখের শেষ নেই,

বরং মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ও নিষ্ঠুরতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। লাঞ্ছিত বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষের মর্মন্তুদ কাহিনী আমাদের অন্তরকে নিশ্চয়ই আলোড়িত করেছে; রাজনৈতিক দুরাচার, অর্থনৈতিক সঙ্কট আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে, বহির্বিশ্বে দুই মহাশক্তির লড়াই, সুয়েজ, হাঙ্গেরি, তিব্বত, দ্য'গলের ও আয়ুবের আবির্ভাব, স্পুটনিক লুনিক এ সবই আমাদের সত্তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে। এ সমস্ত আলোড়নকারী ঘটনার প্রতি আমরা সচেতনতা ও অনুভূতিকাতরতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু তবু কোনও মহান্ কর্তব্য, আদর্শ বা উদ্দেশ্য আমরা আজ আর খুঁজে পাচ্ছি না। এত গ্লানি ও ক্লেশ যখন চতুর্দিকে তখনও সত্যিই যেন আমাদের করণীয় কিছু আছে বলে ভাবতেও পারছি না।

তার কারণ আছে। দেশের ভিতরে তাকিয়ে দেখুন। আমাদের সব দুঃখের মূল কংগ্রেস, কংগ্রেসকে তাড়ালেই সব সমস্যার সমাধান হবে বা কংগ্রেসই আমাদের প্রধান শত্রু—এ রকম কোনও সরলীকৃত বিশ্বাস রাখা আজ আর সম্ভবপর নয়। কংগ্রেস সম্পর্কেও যেমন, আর সব রাজনৈতিক দল সম্পর্কেও তেমনি মানুষ আস্থা হারিয়েছে। রাজনীতিতেই আধুনিক তরুণদের আর বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া, কংগ্রেসের লোকরা আমাদের অপরিচিত নয়, তারা আমাদেরই সমাজের আপন জন—তাদের চারপাশে রহস্যের পরিমণ্ডল গড়ে উঠতে পারে না। আজ যাঁরা কংগ্রেসের প্রধান স্তম্ভ—তাঁদের ঘিরে মায়াময় মোহময় আধো-চেনা আধো-অচেনা রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি কিছুতেই হতে পারে না। তরুণদের রোমান্টিক প্রবণতা এ রকম ঠাণ্ডা সাদা অনুজ্জ্বল পরিবেশে তৃপ্ত হবে কেমন করে? বহির্জগতে মহামতি স্তালিনকে কেন্দ্র করে আমরা বহু স্বপ্ন দেখতুম, বহু আশা বিশ্বাস খুঁজে পেতুম—এ যুগের সবচেয়ে রহস্যময় পুরুষ ছিলেন স্তালিন, তাঁকে আমরা কেউ দেখি নি জানি নি, অথচ কত সব অসম্ভব অবাস্তব কথা তাঁর সম্পর্কে শুনেছি, বিশ্বাস করেছি। অনুভূতিকাতর যুবকরা সহজেই স্তালিনের ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে রোমান্টিক বাসনাগুলিকে মেলে দিতে পেরেছিল। গত দশকের প্রথমেই নিষ্ঠুর ক্রুশ্চভ এক আঘাতে আমাদের সেই আশ্রয়টুকুও ভেঙে দিলেন, আমরা জানতে বাধ্য হলুম স্তালিন ছিলেন একজন পাকা বদমায়েশ। এবং সঙ্গে সঙ্গে রহস্যময় রাশিয়াও দেখা গেল এক ব্যুরোক্রেসী-শাসিত ভারীশিল্প-প্রধান আদর্শচ্যুত দেশ মাত্র। এইসব দাগা দিয়েই খুশী তখনও যেন যথেষ্ট হচ্ছিল না, বিধাতা আর একটু বিদ্রূপভরা হাসি হাসলেন। গত দশকের শেষ দিকে দেখা গেল কমিউনিজম ও গণতন্ত্রের যে বিরোধ নিয়ে আমরা উত্তেজিত চঞ্চল ও কল্পনাপ্রবণ হতে পারছিলুম সে বিরোধও যেন শেষ হয়ে এল—ক্রুশ্চভ ও আইসেনহাওয়ারের মিলনদৃশ্যও অভিনীত হয়ে গেল। এবং আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি আমরা এই দেখে যে কমিউনিস্ট শিবিরে ফাটল ধরেছে, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে (ভারত-সীমান্তের ব্যাপার একটি দৃষ্টান্ত), হাঙ্গেরি ও রাশিয়ার মধ্যে গোলমাল বেধেছিল, তেমনি গণতন্ত্রের শিবিরেও ফাটল কুৎসিতভাবে বেরিয়ে পড়েছে, ইংরেজরা আমেরিকানদের মুরুব্বীয়ানা সহ্য করতে পারছে না, অ্যাডেনয়ার ও দ্য'গলের মধ্যে মিল নেই, 'ন্যাটো'র বন্ধুদের সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করেই ম্যাকমিলান রাশিয়ায় আলাপ-আলোচনা করে এসেছিলেন, আইসেনহাওয়ার ঘোষণা করেছেন আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বাধে গভর্নমেন্ট যারা দখল করে আছে তারাই তা দখল করে থাকতে চায় বলে, এর সঙ্গে কমিউনিজম ও গণতন্ত্রের সংঘাত বা আদর্শগত বিরোধের প্রশ্ন আদৌ জড়িত নয়। আমাদের উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের পরিচিত সব উৎস এইভাবে নিঃশেষ হয়ে আসছে—রোমান্টিকতার উৎসবের দিনও তাই ফুরিয়ে এল।

আমাদের তরুণ বুদ্ধিজীবীরা এখন তাই কল্পনাপ্রবণতা, আদর্শবাদ, ভাবুকতা বাদ দিয়ে কেরিয়ার তৈরি করা বা বৈষয়িক উন্নতিলাভের চেষ্টাই একমাত্র কাম্য মনে করছে। বৈষয়িক উন্নতি অর্থাৎ আর্থিক উপার্জন বাড়ানো ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করা একান্ত দরকারও হয়ে

পড়েছে। কেন না, অল্প বয়সেই তারা প্রেমিকা বা গৃহিণীদের দ্বারা অধিকৃত হয়ে পড়ছে। প্রেমে পড়া ও ঘর বাঁধার সুযোগ এখন অনেক বেশী—ঠিক এক দশক আগেও এ সুযোগ এত ছিল না। প্রেম অথবা দাম্পত্যসুখ উভয়ই নির্ভর করে—কে না জানে, অর্থোপার্জনের ক্ষমতার ওপর। রোমান্টিক অতৃপ্তি নিয়ে জীবনের দুই প্রান্তকে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে সৃষ্টির উল্লাসে মেতে থাকবার সময় কোথায় আজকের যুবকের? রোমান্টিকতার অবক্ষয় যে আমাদের জীবনে ধ্রুব হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কারও মনে সংশয় নেই। তাই আদর্শ ও মহৎ বিশ্বাস নিয়ে মাথা ঘামাতেও আমরা ক্রমেই বিরক্তবোধ করছি।

কিন্তু আমি এ কথা বলি নি যে আধুনিক তরুণরা খুব শান্তিপ্রিয়, পরিতৃপ্ত বা অবসাদগ্রস্ত জীবন যাপন করছে। মোটেই তা নয়—বরং অবস্থা তার বিপরীত। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করছে না, কেন না, কোনও মহৎ আদর্শে বিশ্বাস ছাড়া বিদ্রোহী হওয়া যায় না। কিন্তু প্রচলিত পরিস্থিতি, রীতিপ্রথা আচার-নীতি মূল্যবোধ সবকিছুতে তারা বিক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। কোনও কিছুই তাদের ভাল লাগছে না। পরাধীনতার আমলে তখনকার তরুণরা ব্রিটিশরাজকে তাড়িয়ে স্বদেশী রাজপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মহারা চিত্তে যোগ দিত, কিন্তু আজ এক ব্যবস্থাকে পালটে আর এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তরুণরা মোটেই আসতে চায় না। তারা সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক বা দার্শনিক কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন ব্যবস্থা আনার কথা আন্তরিকভাবে ভাবছে না। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই প্রচলিত ব্যবস্থায় তারা সন্তুষ্টও থাকতে পারছে না। কফিহাউসে রেস্তরাঁয় পার্কে ট্রামে বাসে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার পাতায় কেবলই শুনছি ও পড়ছি—"ভাল নয়, ভাল নয়, কোন কিছুই ভাল নয়, সমস্তই corrupted হয়ে গেছে, পচন ধরেছে। দক্ষিণ ও বাম—কোন পন্থী রাজনৈতিক পার্টিই ভাল নয়, এই পরিকল্পনা, মূল্যবৃদ্ধি, করভার, পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্পপ্রসার, এসব কোনটাই ভাল নয়, জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষা খাতে সরকারের স্বল্প খরচ, মানুষের জনতাধর্মিতা, অসামাজিক নিঃসঙ্গ মানুষ এ সবই খারাপ, বিজ্ঞানে অতিরিক্ত বিশ্বাস, বিজ্ঞানের বদলে ধর্মে বিশ্বাস এ সবও নিন্দনীয়। এক কথায়, আমাদের সমস্ত পরিবেশটিই হয়ে উঠেছে কুশ্রী, অশ্লীল, ভালগার। সমারসেট মম তৃতীয় শ্রেণীর লেখক, আলবের কামু নীরক্ত প্রাণহীন বাজে রচনা লিখতেন, সার্ত্র অস্থির-মস্তিষ্ক, অপরিণত। রবীন্দ্রনাথ জীবন-সম্পর্কিত কোন গভীর উপলব্ধিতে পৌঁছন নি র‍্যাঁবোর মত, রিলকের মত। জওহরলাল নেহরু ভাল সাহিত্যিক হয়তো হতে পারতেন কিন্তু রাজনীতি তিনি কিছুই বোঝেন না। হিউম্যানিজম নিয়ে অনেক নাচানাচি করা গেছে কিন্তু এ রকম অন্তঃসারশূন্য দর্শন আর দুটি নেই। আজকের তরুণদের মুখে যে-সব কথা সততই উচ্চারিত হয় আমি বেছে বেছে তার কয়েকটি তুলে দিলাম। এতেই স্পষ্ট হবে যে যুদ্ধোত্তর যুগের বা গত এক দশকের তরুণরা সমস্ত কিছু সম্পর্কে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

তরুণ চিন্তাশীল ও লেখকদের কথা হচ্ছিল। এরা অধিকাংশই সাধারণ পরিবারের ছেলে—দারিদ্র্যের সঙ্গেও যথেষ্ট পরিচয় তাদের আছে। কিন্তু দারিদ্র্যকে তারা ঘৃণা করে, সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র পিতামাতাকেও। আমাদের রাষ্ট্রীয় স্থায়িত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা অব্যাহত আছে; রাষ্ট্র আমাদের দিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার। তার ফলে স্বাধীন চিন্তা ও নির্ভীক সমালোচনার সুযোগ তরুণরা পেয়েছে। কিন্তু সেজন্য রাষ্ট্রের প্রতি কোনও কৃতজ্ঞতাবোধ তাদের নেই। তারা মনে করে রাষ্ট্র অন্যায়ভাবে তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কুচিত করে আনছে। তারা এমনও মনে করে যে রাষ্ট্র আমাদের জীবনে যে সমৃদ্ধি এনে দেবে বলে প্রত্যাশা করা গিয়েছিল রাষ্ট্র তা আনে নি, বরং আমাদের দরিদ্রতর করে দিয়েছে।

তরুণ চিন্তাশীলদের ক্ষোভ ক্রোধ ও অস্থিরতার একটি কারণ হয়তো এই। আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার

আগের চেয়ে বেশীমাত্রায় হচ্ছে, পাঠকের সংখ্যাও বাড়ছে। কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণে বাড়ছে না, অথবা শিক্ষার মান বা পাঠকদের উৎকর্ষও সেই পরিমাণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না যা হলে আমাদের তরুণ লেখকরা খুশী হতে পারত। তারা প্রকাশ করতে চায় তাদের মনের সব ক্ষোভ, জ্বালা, যত জটিল চিন্তা—কিন্তু তারা জানে তা প্রকাশ করলে বোঝবার মত, গুণগ্রাহী হবার মত লোকের সংখ্যা এদেশে এত কম যে সারাজীবন অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত থেকে যেতে হবে। তাই আত্মপ্রকাশের সততা এই তরুণ চিন্তাশীলরা প্রায় বিসর্জন দিয়েছে। তারা বুঝে নিয়েছে তারা যদি মনের কথা মনের মত করে লেখে তবে দৈনিক সংবাদপত্রের বার্তাসম্পাদক ও রবিবাসরীয় সম্পাদক তাদের লেখা ছাপবেন না, এবং কোনও প্রকাশক যদি তাদের বই প্রকাশও করেন তা হলেও বই বিক্রি হবার আশা নেই। অথচ বাস্তব সাফল্যের দরকার—যে বাস্তব সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে টাকা। প্রচুর টাকার দরকার, কিন্তু বার্তা ও রবিবাসরীয় সম্পাদক বা দেশের সাধারণ লোক বা পাঠকরা কত টাকা দেয় লেখককে? সেই টাকার পরিমাণ এত কম—প্রয়োজনের তুলনায় তা এত কম যে সেকথা ভাবলে লেখকদের হাসি পায়, গ্লানি ও লজ্জা অনুভব করে তারা। আজকের চিন্তাশীল লেখকরা তাই সিনিক হয়ে ওঠে। জনপ্রিয়তা ও টাকার আশায় তারা তাদের লেখাকে যতদূর সম্ভব জটিলতা-বর্জিত রমণীয় বা রমণীপ্রিয় করে তোলবার চেষ্টা করে—এবং এই চেষ্টায় তারা নিজেরাই আহত হয় সবচেয়ে বেশী। তারা তাদের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রেখে কোনও মূল্য পায় না বাজারে, স্বরূপকে বিকৃত ও বীভৎস করে তুলে যে মূল্য পায় তাও কত সামান্য! দেশের মানুষরা কেউ যে কোনও গভীর সৎ জটিল চিন্তাধারা বোঝে এ কথা আমাদের লেখকরা কোনদিন ভাবতেই পারে না—জনসাধারণের থেকে নিজেদের বিচ্ছেদ তারা তাই অনুভব করে অত্যন্ত তীব্রভাবে। তারা নিজেদের তাই বাস্তব-ভিত্তিচ্যুত, বিশ্বাসরিক্ত, অসহায় মনে করে—এবং তার ফলে আরও বেশী তিক্ত ক্রুদ্ধ ও রুক্ষ হয়ে ওঠে। সমাজপ্রবাহে যেন তাদের কোনও স্থান নেই, এদেশে ও এযুগে জন্মে তারা যেন ভুল করেছে। ধনী ও রাজনৈতিক প্রভুদের মত তারা উদ্ধত হতে পারে না; কফিহাউসের গোষ্ঠীগুলির সঙ্গেও তাদের পুরোপুরি বনিবনা করে নেবার মত প্রবৃত্তি নেই। তারা যে তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পরিবেশকে, আপন যুগ ও দেশকে মেনে নিতে পারে নি এজন্য অন্তরে অন্তরে তারা গ্লানি অনুভব করে, অপরাধ-বোধ তাদের পীড়া দেয়—অথচ তাদের কেন্দ্র করে তাদের নিজেদের পারিবারিক প্রত্যাশা যা গড়ে ওঠে সেই সব প্রত্যাশা ও তাদের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়স্বজনদের চিন্তা-ভাবনাকে তারা ঘৃণা না করে পারে না।

এ রকম বৈষম্যপূর্ণ স্ববিরোধী ও দ্বন্দ্বজটিল অবস্থার চাপে আমাদের তরুণ চিন্তাশীলরা ক্রমেই ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হবে সেটা স্বাভাবিক।

কিন্তু এত ক্রোধ এত ক্ষোভ এত অভিমান এত অবিশ্বাস আমাদের বাস্তব পরিবেশ আমাদের যুগ ও আমাদের সমাজ সম্পর্কে পোষণ করা সত্ত্বেও যুদ্ধোত্তর যুগের তরুণরা বর্তমানকালের প্রধান ও আসল সমস্যাগুলি, সেই সব সঙ্কট যা সমাজের অন্তস্তল থেকে আমাদের সমস্ত জীবনপ্রবাহকেই বিষাক্ত পঙ্কিল ও দুর্গন্ধময় করে তুলছে সেসব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব, চিন্তা করতেও পরাঙ্মুখ, তাদের অস্তিত্ব আছে বলেই মনে করতে নারাজ। বিশ্বযুদ্ধ আমাদের দেশের ওপর ততটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে নি যতটা পড়েছিল পশ্চিমী দেশগুলি, জাপান বা চীনের ওপর। কিন্তু যুদ্ধের আগুন আমাদের অনেক কিছুই পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। যুদ্ধ কালোবাজার, ভেজাল ও অবাঞ্ছিত কাঁচা টাকাই বাজারে চালু করে নি শুধু, নারীমেধযজ্ঞ সেই যে তখন শুরু হল তা আর থামল না। এবং শুধু তাই নয়—আমাদের সমস্ত সনাতন ব্যবস্থা, প্রচলিত মূল্যবোধ, বিশ্বাস সবই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের ধাক্কায়। চুরমার তারা হতই একদিন, কিন্তু ভাঙন যদি আসত ধীর পায়ে তা হলে আমরা নতুন

কুণ্ঠিত হন নি যাঁরা একদিন লিখেছিলেন মানুষের সংগ্রামের কাহিনী, ক্রন্দনমথিত বাস্তব একদিন যাঁদের বেদনাহত করেছিল, এবং আজও সম্ভবতঃ যাঁরা বাস্তবের অভিঘাতে চঞ্চল, অতৃপ্ত। তবু পুরস্কার নিতে এঁদের দ্বিধা দূরের কথা, বরং তদ্বিরে এঁরা সদা ব্যস্ত। বাংলাদেশে এঁরা একদা বিদ্রোহের প্রতীক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন; বিদ্রোহ ও পুরস্কার গ্রহণ যে একই সঙ্গে চলে না এ বোধ পর্যন্ত আজ তাঁদের অবলুপ্ত।

যুদ্ধোত্তর যুগে বা পঞ্চাশ দশকে যে তরুণরা আত্মপ্রকাশ করেছে তারা এসব দেখেছে। তারা এখন থেকেই হিসাব করছে, উন্মুখচিত্তে প্রতীক্ষা করছে কবে সরকারপ্রদত্ত সুযোগ সুবিধা তাদের ভাগ্যেও জুটবে। রেডিও, অধ্যাপনা, আকাদেমির প্রকাশনা বিভাগ ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় চাকরির মাধ্যমে সরকার এদের কাউকে কাউকে এখনই সেসব সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেনও। যারা তা পায় নি তাদের এ একটা প্রচণ্ড মনঃক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক তরুণ বুদ্ধিজীবীই ভাবে—ভাবাটাও স্বাভাবিক যে, যোগ্যতায় সে-ই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং অন্যদের প্রাপ্তিযোগ ঘটলে ও নিজের সে তুলনায় কম ঘটলে বা না ঘটলে মর্মপীড়া অনুভব করা তরুণ বুদ্ধিজীবীর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী।

গত এক দশকের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি। এরা এদের পা[illegible]শে ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট; কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই পরিবেশকে যাচাই করে দেখা ও মূল মানবিক সমস্যাগুলির মুখোমুখি হওয়ার কোন প্রবৃত্তি এদের নেই। এদের ক্রোধের যথেষ্ট কারণ আছে, কিন্তু সে কারণ সাধারণতঃ ব্যক্তিগত ব্যর্থতাবোধ ও তিক্ততা-অনুভবের মধ্যেই নিহিত। হয়তো পারিবারিক তিক্ত স্মৃতি অথবা কোন শিক্ষক বা সহপাঠীর দুর্ব্যবহারও এই ব্যর্থতাবোধের পিছনে থাকতে পারে—সামাজিক জীবনে দৈনন্দিন ব্যর্থতাবোধগুলি তো আছেই। এই ক্রোধে তীব্রতা আছে, কিন্তু তা ব্যক্তিক বলেই তার তাৎপর্য কম। আজকের তরুণরা আদর্শ খুঁজে পায় নি বলে তাদের ক্রোধ বিদ্রোহে রূপান্তরিত হতে পারে নি। তারা তাই দুরাচার ও চৈতি-বয়সুলভ অশিষ্ট রুক্ষ বিরক্তি প্রকাশেও মেতে উঠতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না যাচ্ছই। তাদের ক্রোধ হয়তো সমাজের অন্তর্লীন কোনও দুষ্টশক্তির অস্তিত্বকে প্রমাণ করে, কিন্তু সে বিষয়ে তারা নিজেরা সচেতন হতেও ভয় পায়। বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি তারা দ্রুত সাড়া দেয়, কিন্তু সেই সাড়া যুক্তিশোধিত ও প্রত্যয়ে গভীর নয়। তা অনেকটাই সহজাত প্রবৃত্তিসঞ্জাত মাত্র। এই ক্রোধ এই অসন্তোষ এই তীব্র ব্যর্থতাবোধ নতুন সৃষ্টির উৎস হয়ে উঠবে কোনোদিন এ আশা আপাততঃ করার কোনও কারণ তাই নেই।

আগামী সংখ্যা (আষাঢ়, ১৩৬৭) হইতে শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী রচিত বহুখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনী 'রম্যাণি বীক্ষ্য'র "মধ্যভারত পর্ব" ধারাবাহিকভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইবে।

"রবির পূর্ণ উদয়"

শ্রীসজনীকান্ত দাস

নিতান্ত শৈশবকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তাঁহার খ্যাতি পারিবারিক গণ্ডী ছাড়াইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে বিস্তার লাভ করে। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে (পৃ. ৬৭৪) "পিতৃস্মৃতি" প্রবন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সৌদামিনী দেবী লিখিয়াছেন: "রবির গান শুনিতে তিনি [মহর্ষি] ভালবাসিতেন। বলিতেন রবি আমাদের বাঙ্গালাদেশের বুলবুল।" এই বুলবুলকে ১২৯২ সালে পঁচিশ বৎসর বয়সে সেই বৎসর মাঘোৎসব উপলক্ষে রচিত ও গীত "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে" প্রভৃতি গানের জন্য মহর্ষি কি ভাবে পাঁচ শত টাকার একটি চেক দিয়া পুরস্কৃত করেন সে কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে-কাজ করিতে হইবে।"

বাহিরের খ্যাতি তখনই কবি রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিয়াছে। উপরোক্ত ঘটনার সাড়ে চার বৎসর পূর্বেই ১২৮৯ সালের শ্রাবণ মাসে (১৮৮২ জুলাই) কৃতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসুর সহিত রমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলার বিবাহ-সভায় 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র কবিকে বঙ্কিমচন্দ্র-কর্তৃক নিজের গলার মালা দিয়া স্বীকৃতিদানের ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটিয়া গিয়াছে। সঙ্গীতের জন্য শ্রোতারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনা ও অভিনয়ের জন্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি রাজকৃষ্ণ রায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অযাচিত অকুণ্ঠ প্রশংসাও কবি লাভ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতিও বালক ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ রচিত কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা লইয়া কবিকে কম প্রশংসা করেন নাই।

১২৯০ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ রবিবার (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩) মহর্ষির এস্টেটের কর্মচারী খুলনা দক্ষিণডিহির বেণীমাধব রায়চৌধুরীর দশ বর্ষীয়া কন্যা ভবতারিণীর সহিত বাইশ বৎসর সাত মাস বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। কন্যার নাম পাল্টাইয়া মৃণালিনী করা হয়। এই বিবাহ-সম্বন্ধ যে অন্ততঃ আট মাস পূর্বে স্থির হইয়াছিল ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী'তে (পৃ. ৬২-৬৬) প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "যৌতুক কি কৌতুক" কবিতার পরিশিষ্ট "ছদ্ম-বেশধারী উৎসর্গ—এক কথায়—উপসর্গ"ই তাহার প্রমাণ। পরিশিষ্টটি এই—

> "'শর্বরী গিয়াছে চলি'! দ্বিজ-রাজ কুঞ্জে একা পড়ি
>   প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ উদয়।
> গন্ধহীন দু-চারি রজনীগন্ধা লয়ে তড়িঘড়ি
>   মালা এক গাঁথিয়া সে অসময়
> সঁপিছে রবির শিরে এই আজ্ঞ আশিষিয়া তারে
>   'অনিন্দিতা স্বর্ণমৃণালিনী হোক
> সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার!' মস্ত্রজার কারে
>   যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক।'"

এই আশীর্বাদী কবিতায় রবীন্দ্র-ভবতারিণী-বিবাহে কেহ যে বাদ সাধিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আমার আলোচনা সে প্রসঙ্গে নয়। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ পূর্ণ বাইশ বর্ষ বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবির পূর্ণ উদয় প্রতীক্ষা করিতেছেন, শর্বরী অতিক্রান্ত হইয়াছে—এই অধ্যায়ে সেই আলোচনাই করিব।

ঠিক এই কালে "রবির পূর্ণ উদয়" একটা প্রচণ্ড আলোড়ন ও আঘাতের অপেক্ষায় ছিল। বিবাহের মাত্র সাড়ে চার মাস পরেই ১২৯১ সালের ৮ই বৈশাখ তারিখে অতর্কিতে সেই "দুঃসহ আঘাত" আসিল—নতুন বৌঠান।

কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক আত্মঘাতে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :

"জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না ; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা।...এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারিদিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনই নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল—এমন কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়া অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল* তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন !...

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিন রাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল...কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে। তবু এই দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম।... জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।"

এই আলোড়ন-আঘাতের পরেই মেঘমুক্ত রবির বিস্ময়কর প্রকাশ। এই ১২৯১ সালেরই চৈত্র সংখ্যা 'ভারতী'তে "বিদায়" ('কড়ি ও কোমলে' কবিতাটির নাম হয় "পুরাতন") কবিতায় কবির নিজের প্রশ্ন—

"উঠেছে প্রভাত রবি, বারেক যে চলে যায়,
আঁকিছে সোনার ছবি, তারে ত কেহ না চায়,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া। তবু তার কেন এত মায়া !"

ধীরে ধীরে নিজের মনেই মিলাইয়া যায়। কবি ঘোষণা করেন—

"আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।... শানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে।... জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে।......

'কড়ি ও কোমল' মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

"বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্রজীবনের এই আত্মনিবেদন" দুঃসহ মৃত্যুশোকের আঘাতেই আরম্ভ হইয়া যায়।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কিছুকাল পূর্বেই হইয়াছিল। কিন্তু প্রবাহ একটা দুরন্ত ঘূর্ণির মধ্যে পড়িয়া যে আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছিল প্রিয়জনবিরহের এই বেদনা-আলোড়ন সাময়িক স্তম্ভিত ভাব কাটাইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া সাগরমুখী করিল ; "নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।" ১২৯১ হইতে ১৩০০ সাল, এই নয় বৎসরে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচিত্র স্ফুরণ বিস্ময়কর। কবি যেন সহসা আপনাকে আবিষ্কার করিলেন। যাহা একান্ত নিজের কথা ছিল তাহাই সম্পূর্ণ নিজের ভাষায় সকলের কথা হইয়া উঠিল। কাব্যে, গানে, ছোটগল্পে, চিন্তাশ্রয়ী প্রবন্ধে, হেঁয়ালিনাট্যে, ব্যঙ্গ-হাসি-কৌতুকে, নাটকে, প্রহসনে, উপন্যাসে এমন কি বক্তৃতায় ও বিতর্কে রবীন্দ্র-প্রবাহ কূল ছাপাইয়া উদ্বেল হইয়া উঠিল। এই নয় বৎসর কালের মধ্যেই 'ভারতী',

* 'বলাকা' কাব্যের "তুমি কি কেবল ছবি" কবিতা দ্রষ্টব্য। এই কবিতার লক্ষ্য কে সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই।

‘বালক’, ‘হিতবাদী’ ও ‘সাধনা’য় “রবির পূর্ণ উদয়ে”র সুস্পষ্ট লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

১৩০০ বঙ্গাব্দের প্রায় সমাপ্তি মুখে ছাব্বিশে চৈত্রের সায়াহ্নে বঙ্গসাহিত্যাকাশ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাব ঘটিল, এবং ঠিক এক মাস ১৫ দিন পরে ১৩০১, ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। বাংলা-সাহিত্য-সাধনায় এই দুই জনই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধেয়—সাহিত্যগুরু ও “কাব্যগুরু”। এই দুইজনের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্য-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার একা রবীন্দ্রনাথে বর্তাইল। এগার বৎসর পরে দ্বিজ-রাজ দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতীক্ষা সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল—“রবির পূর্ণ উদয়” ঘটিল।

উত্তরাধিকারসূত্রে উভয়ের শ্রাদ্ধ যথোচিত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত একা রবীন্দ্রনাথ সম্পন্ন করিলেন। ১৩০১ বৈশাখের গোড়ায় চৈতন্য লাইব্রেরির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শোকসভায় সুবিখ্যাত “বঙ্কিমচন্দ্র” (‘আধুনিক সাহিত্য’ প্রথম প্রবন্ধ) পাঠ এবং আষাঢ়ের ‘সাধনা’য় সুপরিচিত “বিহারীলাল” (‘আধুনিক সাহিত্য’ দ্বিতীয় প্রবন্ধ) প্রকাশের দ্বারা তিনি উত্তরাধিকার কায়েম করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিলেন :

“বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল। পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি,...কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য।...বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।”

“বিহারীলাল” প্রবন্ধে লিখিলেন :

“বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না...কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সঙ্গীত-কাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তাহাদের নিকটে আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।...‘বঙ্গদর্শন’কে যদি আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন [বিহারীলালের] ‘অবোধ বন্ধু’কে প্রত্যূষের শুকতারা বলা যাইতে পারে। সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের। ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।”

রবীন্দ্রনাথে এই দুই শক্তি—বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলাল—একাধারে একত্র সংহত হইয়াছে। বঙ্কিমের ‘বঙ্গদর্শন’ বঙ্গ-সাহিত্যকে যেমন বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের ‘সাধনা’ তেমনই তাহাকে পূর্ণ যৌবনে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। আধুনিক বঙ্গ-কাব্য-সাহিত্যের প্রত্যূষে বিহারীলাল নিজের অস্ফুট ভাষায় কাকলী তুলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ দিনের প্রহরে প্রহরে স্বকীয় প্রদীপ্ত কণ্ঠে ছয়রাগ ছত্রিশরাগিণীর লহর তুলিয়া বিশ্বভুবন পরিপ্লাবিত করিয়া দিলেন। যে ‘সোনার কাঠি’র আভাসমাত্র বিহারীলালে দেখা গিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে তাহারই জাগ্রত “স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ” করিয়াছে।

অর্থাৎ “রবির পূর্ণ উদয়” ঘটিল। ইতিপূর্বে ‘মানসী’, ‘চিত্রাঙ্গদা’ ও ‘সোনার তরী’ প্রকাশিত হইয়াছে। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, “সাহিত্য-সেবক” নিত্যকৃষ্ণ বসু, বন্ধু প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি এই সকল কাব্য লইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি সর্বপ্রথম দেখিতে পাই সেকালে বাংলাসাহিত্যের দিক্‌পাল চন্দ্রনাথ বসুর একটি পত্রে। সামাজিক আচার-বিচার-ব্যবহার লইয়া তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের বিরোধ সর্বজনবিদিত। তৎসত্ত্বেও এই বৃদ্ধ সাহিত্যিক অনুজ রবীন্দ্রনাথকে যে স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন তাহাকে বাংলাসাহিত্যে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলা চলে। ১৩০২ ফাল্গুনে ‘চিত্রা’ বাহির হইয়াছে। ‘কণিকা’ বাহির হইল ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬ এবং তাহার পর, পরে পরে ‘কথা’—১লা মাঘ ১৩০৬, ‘কাহিনী’—২৪ ফাল্গুন ১৩০৬, ‘কল্পনা’—২৩ বৈশাখ ১৩০৭ এবং ‘ক্ষণিকা’—শ্রাবণ, ১৩০৭ বাহির হইলে প্রবীণ চন্দ্রনাথ বসু সেগুলি পাঠ করিয়া কতখানি বিস্ময়বিমুগ্ধ হইলেন নিম্নলিখিত পত্রখানি তাহার সাক্ষ্য হইয়া আছে। পত্রটি অংশত উদ্ধৃত করিতেছি :

কলিকাতা
৫নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্ট্রীট।
৩০এ শ্রাবণ, ১৩০৭

রবীন্দ্রনাথ

তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই—তোমার গতি এতই দ্রুত, এতই বিদ্যুৎবৎ। তোমার প্রতিভার পরিমাণ নাই—উহার বৈচিত্র্যও যেমন, প্রভাও

তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত। 'কণিকা', 'কথা', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা'—বলিতে গেলে চারিমাসের মধ্যে চারিখানা—পারিয়া উঠিব কেন? প্রকৃতপক্ষেই পারি নাই। 'কণিকা' ছাড়িতে না ছাড়িতে 'কথা' আসিল—'কথা' দিয়া তুমি আমার হইতে 'কণিকা' কাড়িয়া লইলে—'কণিকা'র ভোগ ত আমাকে পূর্ণ করিতে দিলে না। এমনি করিয়া 'কল্পনা' দিয়া 'কথা' কাড়িয়া লইয়াছিলে আমার ভোগে আবার বাধা দিয়াছিলে। এবার 'ক্ষণিকা'য় চমৎকার করিয়াছ। আমার ভোগে বিরাগী হইয়াছি। আমি ক্ষুদ্র—সুতরাং আমার গতি বড় ধীর—আমি তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। পিছাইয়া পড়িতেছি—কিন্তু তোমার গতি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছি—এ গতি যথার্থই বিদ্যুতের গতি,—যেমন দ্রুত, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি সুন্দর। এ গতি এখানকার নয়, ঊর্দ্ধদেশের—মহাকাশের। রবীন্দ্রনাথ, তোমার পরিমাণ করিতে পারি, যথার্থই এমন শক্তি আমার নাই।

ইতি
শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

এই অপূর্ব উদার প্রশস্তি ঊনবিংশ শতকের শেষ বৎসর অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তারিখের ঘটনা। পুরাতন শতাব্দী সমাপ্ত হইবার ঠিক চার মাস পূর্বে অর্থাৎ এই ১৯০০ সনেরই ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গের আর এক মনীষী সন্তান, রবীন্দ্রনাথেরই সমবয়সী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিশ্বভাষায় অর্থাৎ ইংরেজীতে সর্বপ্রথম বাংলার কবিকে বিশ্বকবি বলিয়া সম্বোধিত করেন। উপাধ্যায়-সম্পাদিত অধুনা দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী সাপ্তাহিক *Sophia*র ১লা সেপ্টেম্বর ১৯০০ সংখ্যায় "The World-Poet of Bengal" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

Rabindra Nath is the youngest son of the Brahma patriarch, Devendranath Thakur. He is about forty years old, but he looks as youthful as a fresh-blown *champa*. His raven locks, lotus-petalled eyes, pencilled eyebrows, chiselled nose, swan-like neck, and the majesty of his tall figure illumined by a marigold complexion, would make a subject worthy of the canvas of a Raphael or an Angelo.

But his poetry is greater, better and immeasurably higher than his person. In his youth he warbled, like a sweet little birdie, strains of love inspired by the sensuous beauty of nature. He soared with the dewy lark to bathe in the flood light of the morning sun; he flew with the *chatak* to drink of the rain-clouds; he revelled with the *chakor* in the moonbeam overflowing the earth with molten silver. He wandered in bowers of roses resonant with the pipings of feathery songsters; played with the shiny shingles of the brook and gazed and gazed at the eddying rainbows formed in its bosom by the golden darts of the sun. In fact there was no beauty in nature which he did not woo and win over to his youthful self.

But in all his revellings on rose-banks and wallowings in beds of lilies there is a spirit of sadness which restrains the extravagance of joy, chastens the coarseness of the senses, and stands as a shade obscuring, yet beautifying, the exuberance of light which informs his passionate lyrics. He sings; his voice pierces the mid-sky and smites the very vault of heaven, but falls down, at last, on the earth like a shower of bewailing, tremulous tear-drops. His song is more like the cooing of a dove pouring out its heart to one that is absent than the self-sufficient strain of the cuckoo filling the woodlands with its luxurious richness.

This sadness about him has made him a master in the art of portraying human passions. Who has read his description of a *sannyasi's* struggle ['প্রকৃতির প্রতিশোধ'] to put out the flame of paternal affection towards an orphan girl, and not shed hot tears? Who is there so hardhearted as not to melt in pity at the sight of his picture of a burly *Cabuli* fruit-seller ["কাবুলিওয়ালা"] transformed into tenderness itself by the majestic charms of the blossom of a Bengali girl? And one would not mind to be disengaged from Tennyson's "In Memoriam" and Shelly's "Epipsychidion" to sympathise and grieve with him in his outbursts of pain—the excruciating pain of an unrequited love.

Rabindra is not only a poet of nature and love but he is a witnes to the unseen. Revelation apart, Kant, Tennyson and Newman are considered to be three modern witnesses to the invisible world. Poor Bengal has produced another and it is Rabindra Nath.

When we were young, full of ardour love and warmth, we were one day reading his "World-Current" ["স্রোত" —'প্রভাত সঙ্গীত' *] We were carried on and on by the "current" till we felt ourselves lost in a shoreless ocean of beauty and love. Tedious time with its painful divisions appeared to us but a speck, in the colorless bosom of eternity. Our individuality lost its isolatedness and was joined to the all. We could not live apart We were *obliged* to live as a part of the whole. We were made partakers of the symphonies of the spheres. We hovered from flower to flower with the honey-sipping bee. We sang with the happy and wept with the sorrowing. We drank of the mother's heart and ran after children in love. We realised that we were living with all but not with ourself. And this "World-Current" is but a small poem written at random. Whenever he sing, whether it be of beauty that pervades the world, or of love that makes man semidivine, he takes us to the region of the infinite. The heavens with their luminous orbs, the earth with its flora and fauna, man with his reason and love, have been transformed by his magic wand into ripples of an eternal beauty that lies outstretched beyond space, unruffled and serene. He is verily a mystic beholder of the invisible regions.

If ever the Bengali language is studied by foreigners it will be for the sake of Rabindra. He is a world-poet. He is like the Devadaru which has its roots deep down, down the lowlands but which threatens to pierce the sky—such is its loftiness. He will be ranked amongst those seers who have come to know the essence of beauty through pain and anguish.

ইতিমধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর দুই হস্তক্ষেপের মধ্যে অজ্ঞাতে দিয়া বাংলার রবিকে মধ্যাহ্ন দীপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। নূতন শতাব্দীর প্রথম বৎসরের মাঝামাঝি জুন-জুলাই ১৯০১, 'নৈবেদ্য'র প্রকাশ বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠাকে আর এক ধাপ অগ্রসর করিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত *The Twentieth Century* মাসিকপত্রের ৩১ জুলাইয়ের সংখ্যায় নরহরি দাস ছদ্মনামে 'নৈবেদ্য'র এক দীর্ঘ প্রশংসামূলক পরিচয় লিখিয়া বাঙালী কবিকে স্বদেশের অন্তরে এবং বিদেশে পরিচিত করিলেন। তিনি লিখিলেন :

'*Naivedya* is the essence of *Bhakti* made compatible with the knowledge of the transcendent Reality before whose splendour the shadow of relationship is changed into light. The sonnets are like so many brilliant pearls illuminated with Divine grace."

বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর নির্মম উক্তি সম্পূর্ণ ফলিতে বিলম্ব হইল না। ঠিক এক বৎসর তিন মাস ২৩ দিন পরে ১৯০২ সনের ২৩ নবেম্বর ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯ তারিখে রবিমণ্ডলের নিকটতম স্নেহঘন ছায়াটি অপসারিত হইল। প্রচণ্ড দীপ্তিতে বিশ্বভুবন পরিপ্লাবিত করিবার জন্য মধ্যাহ্ন গগন হইতে প্রতীচীর পথে নিঃসঙ্গ রবির জয়যাত্রা আরম্ভ হইল।

* কবিতাটির শেষাংশ এই :—

"জগৎ হতে রব আমি একেলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা।
আমার নাহি সুখ দুখ পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হয়ে যাই।
তপন ভাসে, তারা ভাসে, আমিও যাই ভেসে
তাদের গানে আমার গান, যেতেছি এক দেশে।
প্রভাত সাথে গাহি গান সাঁঝের সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি তারার সাথে যাই।
ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি!
মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই।
দুখীর সাথে কাঁদি আমি সুখীর সাথে গাই।
সবার সাথে আছি আমি আমার সাথে নাই।
জগৎ-স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই!"

উইলিয়ম হিকি (৬)

তখনকার কালের কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের ব্যক্তিগত স্বভাবচরিত্রের কথা কিছু বলব। (আজকের দিনের বিচারকদের কাছে তো বটেই, সাধারণ নাগরিকদের কাছেও তা নানাদিক দিয়ে উপভোগ্য হবে—বি.)

সার্ রবার্ট চেম্বার্স

সেসন্সের বিচার আরম্ভ হল গ্রীষ্মকালে, জুন মাসে। তারিখ পড়ল ১০ জুন (১৭৮৪ সন)। সকাল ৮টায় কোর্ট বসবে, জুরিদেরও তাই জানানো হয়েছে। অন্যান্য বিচারকরা ও জুরিরা সকলেই সময়মত কোর্টে এসেছেন, কেবল সার্ রবার্ট আসেন নি। সব ব্যাপারেই তিনি অত্যন্ত ঢিমেতালে চলেন, এবং দু-চার ঘণ্টা পর্যন্ত দেরি হওয়া তাঁর পক্ষে আদৌ অস্বাভাবিক নয়। বেলা ১টা নাগাদ তিনি এসে পৌঁছলেন, নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ ঘণ্টা পরে। জুরিদের শপথ করিয়ে তাঁদের মামলা বুঝিয়ে দিতে বেলা তিনটে বেজে গেল। তারপর আর বিচার আরম্ভ করা যায় না বলে সেদিনের মতন শুনানি মুলতুবী রইল।

পরদিন সকাল ৯টার সময় হাইড ও জোন্স কোর্টে উপস্থিত হলেন, এবং জুরিদের শপথ গ্রহণের কাজ শেষ করে আসামীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে, চেম্বার্সের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কারণ, রীতি হল, চীফ বা সিনিয়র জজ উপস্থিত না থাকলে বিচারের কাজ আরম্ভ হতে পারে না। জাস্টিস হাইড ও উইলিয়ম জোন্স চুপ করে চেয়ারে বসে হাত কচলাতে লাগলেন। বেলা যখন ১১টা বেজে গেল তখন হাইড রীতিমত বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে রবার্টের কাছে চিঠি লিখতে বসলেন। তিনি লিখলেন, "আমি ও জোন্স সাহেব বেলা ৯টা থেকে কোর্টে এসে বসে আছি, বেলা ১১টা পর্যন্ত আপনার দেখা নেই। অনুগ্রহ করে জানান, কোর্টে আসা আপনার পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে কি না।" চাপরাসী দিয়ে সার্ রবার্টের বাড়ি পাঠাবেন বলে চিঠিখানা যখন তিনি ভাঁজ করছিলেন, ঠিক সেই সময় রবার্ট এসে উপস্থিত হলেন। হাইডের হাতে ভাঁজ-করা চিঠিখানা দেখে রবার্ট একগাল হেসে বললেন, "ভ্রাদার হাইড, আমি যখন এসেই পড়েছি তখন অতদূরে কষ্ট করে চিঠি পাঠাবার আর দরকার নেই। ওটা এবারে ছিঁড়ে ফেলুন।" হাইড গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "ছিঁড়ে লাভ কি বলুন; আবার তো কালকেই দরকার হবে!"

চেয়ারে উপবেশন করে সার্ রবার্ট প্রথমে তাঁর প্রাইভেট মিনিট-বুকে জুরিদের নাম লিখতে লাগলেন।

নামের তালিকা করতে একঘণ্টা কেটে গেল। তারপর কাঠগড়ার আসামীর দিকে চেয়ে তিনি বললেন যে আজ তার বিচারের দিন নয়, অন্য একজন সিঁদেল চোরের বিচারের দিন। অবশেষে সেই চোরটিকে এনে হাজির করা হল। এতেও বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। তারপর যা শুরু হল তা আরও চমৎকার। আসামীর নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বেশ কায়দা করে উচ্চারণ করে বলল 'পিটার কার্ল'। আসামী জাতিতে আইরিশম্যান শুনে রবার্ট তার নামের ভাষাতাত্ত্বিক রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, এবং এ বিষয়ে উইলিয়ম জোন্সকে কাছে পেয়ে নানারকম প্রশ্ন করে উত্ত্যক্ত করে তুললেন।

রবার্ট। "আচ্ছা মিঃ জোন্স, নামের বানানটা কি তা হলে 'K' দিয়ে হবে, না 'C' দিয়ে হবে?"

জোন্স। "'K' দিয়ে কেন হবে বুঝতে পারছি না, 'C' দিয়েই তো হওয়া উচিত।"

রবার্ট। "উচ্চারণ তা হলে কি হবে?"

জোন্স। "C A R L L—কার্ল।"

রবার্ট। "আপনি তো আইরিশ ভাষা জানেন?"

জোন্স। "আজ্ঞে হাঁ জানি।"

রবার্ট। "বেশ, বেশ! তা হলে অনুগ্রহ করে বলুন, এ নামের অর্থ কি?"

জোন্স। "অর্থ আর কি? নামের অর্থ নাম; অর্থাৎ কার্ল মানে কার্ল। এ ছাড়া আর কি অর্থ হতে পারে বুঝতে পারছি না।"

দুই বিচারকের এই প্রশ্নোত্তরে আদালত-গৃহের লোকজন সকলে হো-হো করে হেসে উঠলেন। সার্ রবার্ট কিন্তু তাতে আদৌ বিচলিত হলেন না। হাইডের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, "আজ ১৬ জুন, ওয়েস্টমিনিস্টার ও ইংলণ্ডের অন্যান্য পাবলিক স্কুল আজকের তারিখ থেকে গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সেই পুরনো স্মৃতি আমার মনে পড়ছে।"

হাইড। "তাই না কি? আপনার স্মৃতিশক্তির তারিফ না করে পারা যায় না।" হাইডের কথার সঙ্গে একটু বিরক্তি ও বিদ্রূপের সুর মেশানো ছিল।

সার্ রবার্টের মতন একজন বিচক্ষণ বিচারক যে আদালতে বসে এ রকম অবিবেচকের মতন আচরণ করতে পারেন—সামনের কাঠগড়ায় আসামীকে দাঁড় করিয়ে রেখে—তা কল্পনাই করা যায় না। তাঁর মতন একজন অসাধারণ পণ্ডিতের চরিত্রে এই বালসুলভ চাপল্য মোটেই খাপ খেত না। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত স্কলার ও ভাইনেরিয়ান প্রফেসর ছিলেন। পরিশ্রমী ছিলেন, সমস্ত ছোটখাট কাজ এত নিখুঁতভাবে তিনি করতেন, যার সত্যি কোন তুলনা হয় না। সামান্য কিছু একটা লিখতে হলে তিনি প্রত্যেকটি কথার অর্থ যাচাই করে ব্যবহার করতেন। একই অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দ নিয়ে, জনসন ও অন্যান্যদের অভিধান দেখে বিচার করে, তার মধ্যে একটিমাত্র শব্দ তিনি নির্বাচন করতেন। এটা তাঁর একরকমের বাতিক ছিল—যে-কোন ভাব-প্রকাশের জন্য সঠিক শব্দ প্রয়োগের বাতিক। তাঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এইজন্য সার্ রবার্টের কথা উঠলে তাঁকে পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে অভিধানের সঙ্গে তুলনা করে বলতেন, অভিধান বটে, কিন্তু পাতাগুলি এলোমেলো করে সাজানো এবং অক্ষরবিন্যাসেও গণ্ডগোল। অর্থাৎ এমন অভিধান যার অবিন্যস্ত পৃষ্ঠা ও অক্ষরের ভিতর দিয়ে কোন শব্দের বা তার অর্থের হদিস পাওয়া কঠিন। সার্ রবার্ট চেম্বার্স সম্বন্ধে সত্যিই এ কথা বলা চলে। চরিত্রের দৃঢ়তা ও চিন্তার সংযমের অভাবে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সমুদ্রের মতন গভীর না মনে হয়ে, গহন অরণ্যের মতন পথশূন্য মনে হত।

জাস্টিস হাইড

সার্ রবার্টের চরিত্রের এই দোষত্রুটি সত্ত্বেও জাস্টিস হাইড তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর প্রতি গভীর অনুরাগও ছিল হাইডের, যা অবশ্য সকলের ছিল না। চেম্বার্সের মতন হাইডের চরিত্রেও অনেক অসঙ্গতি ছিল। হাইড ছিলেন উদারপ্রকৃতির হৃদয়বান্ ব্যক্তি, কিন্তু এমন কতকগুলি চারিত্রিক দুর্বলতা তাঁরও ছিল যার জন্য তিনি অনেকবার বিপদে পড়েছেন। অত্যন্ত

বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে ঝোঁকের মাথায় এমন সব কাজ তিনি করে বসতেন যার মধ্যে কোন বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত না। তাঁর গৃহের দ্বার সর্বদাই সকলের পানভোজনের জন্য উন্মুক্ত থাকত। পানের জন্য নানারকমের দামী মদ, এবং ভোজনের জন্য উপাদেয় সব খাদ্যদ্রব্যও মজুত থাকত তাঁর ঘরে। স্বভাবতঃই তার আকর্ষণে অতিথি ও বন্ধুবান্ধবদেরও ভিড় হত খুব তাঁর বাড়িতে। বিনা পয়সায় সুরাপানের সুযোগ এবং তার সঙ্গে বিবিধ চর্বচোষ্য আহারের সুবিধা, কে না গ্রহণ করতে চাইবে বলুন? সপ্তাহে দু তিনদিন করে এমন সব লোক আসতেন, যাঁদের ভাগ্যে বছরে একটি ডিনারের নিমন্ত্রণও জোটার কথা নয়। হাইডের উদার আতিথেয়তার অপব্যবহার করতেন এইভাবে সকলে। কত লোককে যে তিনি মাসিক ভাতা দিতেন তার হিসেব নেই। প্রতি মাসে ১০০৲ টাকা থেকে ২০৲ টাকা, ৩০৲ টাকা পর্যন্ত মাসহারা পায়, এ রকম অভাবগ্রস্ত লোকের সংখ্যা যে তাঁর তালিকায় কত হয়েছিল তা বলা যায় না। যে যে-রকম লোক তার সে-রকম মাসহারার ব্যবস্থা ছিল। এইজন্য বছরে ৮০০০ পাউণ্ড স্টার্লিং তাঁর বেতন বা আয় হওয়া সত্ত্বেও, তিনি টাকায় কুলোতে পারতেন না। টাকার টানাটানি তাঁর সর্বদাই লেগে থাকত। দশ বছর ভারতবর্ষে বাস ও চাকরি করার পর তিনি দেখলেন যে দেনায় তিনি ডুবে গিয়েছেন। এত দেনা তাঁর হয়েছিল যে তা শোধ করার জন্য বিলেতের পৈতৃক সম্পত্তি বেচে তাঁকে প্রায় ১২,৫০০ পাউণ্ড স্টার্লিং, অর্থাৎ প্রায় একলক্ষ সিক্কা টাকা নিয়ে আসতে হয়। এইরকম তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের বহর ছিল। বাস্তবিকই জাস্টিস হাইডের মতন হৃদয়বান্ ব্যক্তি তখনকার কালের কলকাতা শহরে খুবই দুর্লভ ছিল।

এবারে তাঁর উদারতার ও হঠকারিতার কয়েকটি কাহিনী উল্লেখ করব। টমাস মট (Thomas Motte) নামে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। শোনা যায়, সারা এশিয়ার মধ্যে, তাঁর মতন বড় ব্যবসায়ী দু-চারজন ছিলেন কিনা সন্দেহ। একবার একটি বড় কারবারে অনেক টাকা বিয়োগ করে তাঁর লোকসান হয়ে যায়। টাকার দায়ে এবং জেল খাটার ভয়ে তিনি ব্রিটিশ এলাকা ছেড়ে ফ্রেডারিক নগরে (শ্রীরামপুর) ড্যানিশদের অধীনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আর্থিক দুরবস্থাও তাঁর এমন চরমে পৌঁছয় যে বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য ছাড়া তাঁর পক্ষে বাঁচাই মুশকিল হয়ে ওঠে। একজন ধনিক ব্যবসায়ীর হঠাৎ এই আপদবিপদে পরিচিত সকলেই তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। তাঁরা প্রস্তাব করেন যে কয়েকজন বন্ধু মিলে চাঁদা তুলে তাঁকে মাসিক অর্থ-সাহায্য করা হোক। প্রস্তাবকারীদের মধ্যে জাস্টিস হাইডও একজন ছিলেন। তাঁদেরই ইচ্ছায়, মটের শ্যালক পিটার ট্রেচেট প্রস্তাবটি কাজে পরিণত করার ভার নেন। তিনি ঠিক করেন যে মাসিক ৬০০৲ টাকা হলেই চলবে এবং তার জন্য ছজন বন্ধুর কাছ থেকে ১০০৲ টাকা করে তিনি চাইবেন। প্রথমে নিজের নামের পাশে ১০০৲ টাকা তিনি লিখে রাখেন। দ্বিতীয় বন্ধু জন ডসনও তাই করেন। তারপর চাঁদার খাতা যখন হাইডসাহেবের কাছে যায়, তিনি তাঁর নামের পাশে ২০০৲ টাকা লিখে দেন। চতুর্থ ব্যক্তি পিটার স্পীকের কাছে যখন চাঁদার জন্য যাওয়া হয় তখন তিনি হাইডের টাকার অঙ্ক দেখে তার পাশে লিখে মন্তব্য করেন: "ছজন বন্ধু যখন সমান-ভাবে সাহায্য করবেন ঠিক হয়েছে, তখন হাইডসাহেবের বেশী টাকা দেওয়া অর্থহীন।" ব্যাপার হল, পিটার স্পীকেরও তখন দানধ্যানে খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। হাইড তাঁর উপর টেক্কা দিয়ে যাবেন, এ বোধ হয় তাঁর সহ্য হল না। যাই হোক, মন্তব্যসহ যখন চাঁদার খাতা পুনর্বার হাইডসাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, তখন তিনি তা দেখে রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যার উপর তিনি ক্রুদ্ধ হতেন, তাকেই 'গর্দভ' বলা তাঁর অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্পীকের মন্তব্য দেখেও তাই বললেন তিনি। তারপর যে-ব্যক্তি খাতা নিয়ে এসেছিল তাকে বললেন, "আপনি ফিরে গিয়ে মিঃ স্পীককে বলবেন যে অন্যের টাকার ব্যাপার নিয়ে অকারণে তাঁর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। আমার টাকা যে-ভাবে

ছুঁড়ে মেরে আরদালিকে ডাক দিয়ে হাইড সাহেব বললেন, "এই যে-আজ্ঞে হুজুর গর্দভটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কোর্টের বাইরে বার করে দিয়ে এস।"

কলকাতা শহরে যখন পুলিস ছিল না তখন একজন বিচারক নিয়মিত চেম্বারে বসতেন, শহরের দৈনন্দিন অভিযোগ, বিবাদ-বিসংবাদ ইত্যাদি নিষ্পত্তির জন্য। চেম্বার ছিল লালবাজারের কাছে। একবার দুজন হিন্দু ভদ্রলোক সামান্য একখণ্ড জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদ করে হাইডের চেম্বারে নিষ্পত্তির জন্য আসেন। হাইড দুজনের অভিযোগ শুনে সালিসির দ্বারা ব্যাপারটা মিটমাট করে নিতে বলেন। প্রস্তাবে একজন রাজী হলেন, অন্যজন হলেন না। হাইড বারবার তাঁকে অনুরোধ করলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি তা শুনলেন না। তিনি হাইডকেই বিচার করে দিতে বললেন। কিন্তু হাইডও নাছোড়বান্দা, এবং তাঁর জিদ হল, যেহেতু তিনি নিজে প্রস্তাব করেছেন, সেই হেতু তা মানতেই হবে। হিন্দু ভদ্রলোকটিও কম জেদী ছিলেন না। তিনি সাফ বলে দিলেন, "সালিসি আমি মানব না, বিচার আপনাকেই করতে হবে।" হাইড বললেন, "কি করতে হবে না-হবে তা আমি বুঝব, আপনাকে উপদেশ দিতে হবে না। পাঁচ মিনিট আপনাকে ভাববার সময় দিলাম—ভেবে বলুন সালিসি মানবেন কিনা।" হিন্দু ভদ্রলোকটি একই ভাষায় উত্তর দিলেন, "এক মিনিটও ভাববার প্রয়োজন নেই, আপনাকে আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে সালিসি আমি মানব না।"

"বেশ, ভাল কথা, আপনার একগুঁয়েমিকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমি জানি।" এই কথা বলে হাইডসাহেব একজন ক্লার্ককে ডেকে সেই হিন্দু ভদ্রলোকটিকে জেলখানায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে বললেন।

এই হুকুম দিয়ে যখন তিনি শমন লিখতে আরম্ভ করলেন, তখন সেই হিন্দু ভদ্রলোকের কোন একটি ভৃত্য দৌড়ে গিয়ে তাঁর অ্যাটর্নিকে খবর দিল। অ্যাটর্নি কাছেই থাকতেন, খবর পেয়ে তিনি ছুটে এলেন হাইডের চেম্বারে। অ্যাটর্নিকে দেখে হাইডের মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। পারতপক্ষে কাজের সময় তিনি কৌতূহলী লোকের উপস্থিতি সহ্য করতে পারতেন না। অ্যাটর্নিদের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল সবচেয়ে বেশী। সুতরাং তাঁকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চান আপনি? হঠাৎ কি কারণে সন্ধ্যার সময় এখানে আপনার আসার প্রয়োজন হল?"

অ্যাটর্নি বললেন, "হুজুর, আমার নিজের ইচ্ছাতেই আমি এখানে এসেছি, সেজন্য মাফ করবেন। আমার একজন বিশিষ্ট মক্কেলের ভৃত্যের মুখে খবর পেলাম যে বিনা অপরাধে আপনি তাঁকে জেলখানায় বন্দী করে রাখার হুকুম দিয়েছেন। সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে বলে আমি এসেছি।" হাইড বেশ ধমকানির সুরে বললেন, "আপনার ইচ্ছা হল বলেই আপনি সোজা এখানে ওকালতি করতে চলে এলেন, এতটা স্বেচ্ছাধীন আপনি হলেন কি করে? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি আমার চেম্বার ছেড়ে চলে যান, তা না হলে মুশকিলে পড়বেন।"

অ্যাটর্নি বললেন, "আমার মক্কেল কলকাতা শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক। অর্থ ও প্রতিপত্তি দুদিক থেকেই তাঁর সমকক্ষ লোক খুব অল্পই আছেন। জাতিতে তিনি হিন্দু, এবং হিন্দুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বর্ণের লোক, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। জেলখানায় হীন বর্ণের নানা জাতের লোকের সঙ্গে থাকলে তিনি জাতিচ্যুত হবেন, এবং তাঁর সামাজিক মর্যাদাহানি হবে। যত টাকারই হোক, আমি তাঁর জন্য জামিন হতে রাজী আছি। আমার আবেদন, আপনি তাঁকে জামিনে মুক্তি দিন।"

এই কথার উত্তরে হাইড বললেন, "আমি আপনার জামিন বা প্রশংসা কোনটারই ধার ধারি না। আপনার মক্কেলের কত টাকা আছে, বা জাতিতে তিনি কত উচ্চস্তরের লোক, এসব সার্টিফিকেট দেবার জন্য আপনাকে এখানে ডেকে আনা হয় নি। অতএব আপনি আপনার নিজের কাজে যান, এখানে ঝামেলা করবেন না।"

অ্যাটর্নি সাহেব বেশ একটু মেজাজ দেখিয়ে বললেন, "আমার মক্কেলের অ্যাটর্নি হিসেবে আমাকে যা করতে হবে তা আপনাকে জানাচ্ছি। বাধ্য হয়ে আমাকে অন্য

বিচারকের কাছে হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন করতে হবে।"

অ্যাটর্নির এই উদ্ধত উক্তিতে হাইড ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জন করে উঠলেন: "এতবড় স্পর্ধা আপনার যে আইনের হুমকি দিয়ে আমাকে কাজ করাতে চান? আপনি এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যান, তা না হলে আপনার সম্মানিত হিন্দু মক্কেলের মতন আপনারও অবস্থা হবে, এবং কেবল মক্কেলের জন্য নয়, আপনার নিজের জন্যও হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন করতে হবে।"

এই কথা শোনার পর অ্যাটর্নি হাইডের চেম্বার থেকে বিদায় নিলেন। হাইডও বুঝতে পারলেন যে কাজটা তাঁর আদৌ আইনসঙ্গত হচ্ছে না। সুতরাং অ্যাটর্নির প্রস্থানের পর তিনি তাড়াতাড়ি একজন হরকরা পাঠিয়ে দিলেন জেলখানায়, হিন্দু ভদ্রলোকটির মুক্তির আদেশ দিয়ে।

আর একটি ছোট্ট ঘটনার কথা আমি জানি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে। ঘটনাটি এই: একদিন সন্ধ্যাবেলা বিশেষ কাজের জন্য হাইডের চেম্বারে বসে ছিলাম, এমন সময় হ্যামিলটন নামে একজন অ্যাটর্নি, হাগিন্স নামে তাঁর একজন মক্কেলকে নিয়ে হাইডের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর মৃত পিতৃব্যের বিপুল সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হয়েছেন, এবং তা যথারীতি দখল করে দেখাশুনা করার জন্য কোর্টের অনুমতিপত্র নিতে এসেছেন। হ্যামিলটনের মক্কেল হাগিন্স মোটেই প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। অত্যধিক মদ্যপান করার ফলে তাঁর অর্ধেক চেতনা প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বলে জাস্টিস হাইড চার্টার ও পার্লামেন্ট অ্যাক্ট পাঠ করে দেখছিলেন, বিষয়টি তাঁর কোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত কি না। হাইড যখন বইপত্র ঘেঁটে দেখছিলেন তখন হ্যামিলটনের মাতাল মক্কেল টলতে টলতে তাঁর সামনে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি এইসব বড় বড় অপাঠ্য আইনের বই ঘাঁটবেন, আর আমি কি আপনার সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব?"

ভদ্রলোক যে মাতাল তা হাইড এতক্ষণ বুঝতে পারেন নি। কথাগুলি শুনে তাঁর খেয়াল হল, তিনি তাকিয়ে দেখলেন যে মক্কেলের অবস্থা একেবারে কাহিল। সুতরাং তিনি অ্যাটর্নিকে বললেন, "আপনার মক্কেল তো দেখছি একটি আস্ত জানোয়ার, ওকে এখনই কোর্ট থেকে বার করে নিয়ে যান।" অ্যাটর্নি অনেক কষ্টে তাই করলেন, টানতে টানতে মক্কেলকে আদালতের বাইরে নিয়ে গেলেন।

কয়েকদিন পরে আবার একদিন অ্যাটর্নি ও মক্কেল দুজনেই এলেন। সেদিন অবশ্য মক্কেল প্রকৃতিস্থ ছিলেন। হাইডসাহেব তাঁকে অনুমতিপত্রটি দিয়ে বললেন, "আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, আপনি এই বিপুল সম্পত্তি তদারক করতে পারবেন কি না। তা ছাড়া, আপনার যা মতিগতি দেখছি, এবং যে মাত্রায় আপনি মদ্যপান করেন, তাতে ভরসা হয় না যে আপনি আপনার কাকার নাবালক ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করবেন।"

হাইডের চরিত্রের এই মানবিক মাধুর্যই সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল। অনেক সময় আইনের দিক দিয়ে তিনি অপরাধীদের যোগ্য শাস্তি দিতে পারতেন না বলে, এবং বহু অপরাধের সুবিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না বলে, তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন। বলতেন, "যদি বিচারকের আইন প্রণয়নেরও ক্ষমতা থাকত, তা হলে বহু অন্যায়ের ন্যায্য প্রতিকার আমি করতে পারতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সে ক্ষমতা নেই, তাই জেনেশুনেও সব সময় সব অন্যায়ের সুবিচার করা আমার দ্বারা সম্ভব হয় না।"

এই ধরনের একটি বিচারের সমস্যার কথা আমি উল্লেখ করব। শেরিফ নামে কলকাতা ট্রেজারির একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লার্ক ছিলেন। তিনি একটি অনাথ বালিকার সঙ্গে অবৈধ প্রেম করে শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর মতন বসবাস করতেও আরম্ভ করেন। যথাকালে তাঁর কয়েকটি পুত্রকন্যাও হয়। কিন্তু কিছুকাল পরেই দেখা যায়, আর একজন স্ত্রীলোকের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন, এবং বিবাহ না করলে স্ত্রীলোকটি তাঁর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে রাজী নয় বলে, তিনি

তাঁকে বিবাহ করতেও সম্মত হয়েছেন। কিন্তু তার জন্য তিনি তাঁর পূর্বের স্ত্রী সেই অনাথ মহিলা ও তার ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের ব্যাপারে কিছু করতে একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না। অসহায় অবস্থায় তাদের পরিত্যাগ করে তিনি নতুন স্ত্রী নিয়ে ঘর করবেন মনস্থ করেন। শুধু তাই নয়, ভদ্রলোক এত নিষ্ঠুর ও বদমায়েশ ছিলেন যে অনাথ স্ত্রীর সামান্য যা গয়নাগাঁটি ও জিনিসপত্তর ছিল, তাও ভয় দেখিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যান। সেই অনাথ মহিলা অবশেষে একেবারে নিরুপায় হয়ে জাস্টিস হাইডের শরণাপন্ন হন। শেরিফের কাছে মাসিক ভাতা ও ক্ষতিপূরণ দাবি করে তিনি হাইডের কাছে আবেদন করেন।

হাইডের মতন একজন মহানুভব বিচারক এ রকম অমানুষিক আচরণের কথা শুনে যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হবেন, তা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সময়কার আইন এমন ছিল যে তার জোরে শেরিফের মতন একজন নিষ্ঠুর পাষণ্ডকে বিশেষ কিছুই দণ্ড দেওয়া যায় না। তবু সেই অনাথ মহিলার আবেদনে তিনি এতদূর বিচলিত হলেন যে আইনের বলে কিছু করা যায় না জেনেও তিনি ঠিক করলেন যে শেরিফকে আদালতে ডেকে, সকলের সামনে, নির্মম ভাষায় গালাগাল করবেন। মানুষ হয়েও শেরিফ যে কত জঘন্য পশুর মতন আচরণ করেছেন একজন অসহায় মহিলার প্রতি, এ কথা প্রকাশ্য আদালতে বললে, হাইড ভাবলেন, হয়তো তার সুপ্ত মানবতাবোধ জাগতে পারে। কিন্তু তা হল না। তিনি অবশ্য সমন জারি করে শেরিফকে কোর্টে ডেকে পাঠালেন। তারপর প্রকাশ্য আদালতে হাইড ও শেরিফের মধ্যে যে বাক্য-বিনিময় হল তা এই :

হাইড। "শেরিফ সাহেব, আপনি আপনার স্ত্রীর প্রতি যে আচরণ করেছেন, তাতে কি আপনি মনে করেন যে মনুষ্যসমাজে আপনি ভদ্রলোক বলে গণ্য হবার যোগ্য!"

শেরিফ। "আমার ধারণা আমি এমন কিছু করি নি, যাতে সে যোগ্যতা আমার ক্ষুণ্ণ হয়েছে।"

হাইড। "আপনি মানুষ নন, চোর ডাকাত ও জানোয়ারদের চেয়েও অধম। একটি অনাথ বালিকার নারীত্বের অপমান করে আপনি কাপুরুষের মতন আজ অন্য নারীর সঙ্গসুখ উপভোগ করার জন্য উদগ্রীব। হত সহজে ও নিশ্চিন্তে, এবং নির্বিবেক জীবের মতন, কেবল টাকার জোরে আপনি এই জঘন্য কাজ করছেন, বনের কোন জানোয়ারও তা করতে পারত না। আবার ওই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছেন যে সমাজে আপনি ভদ্রলোক বলে গণ্য হবার যোগ্য।"

শেরিফ। "মানুষ হিসেবে, এবং নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার কি করা উচিত বা অনুচিত, আশা করি তার একমাত্র বিচারক আমি। আমার এই ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও আছে বলে আমি মনে করি না।"

হাইড। "তা অবশ্য ঠিক, ঠিক কথা। তবে একথাও ঠিক যে শুধু মানবসমাজে বাস করে আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন না। তবে বর্তমান আইনের অবস্থা এমন যে তার জোরে আমাদের সমাজ সেই আপনার অন্যায়ের বিচার করার। কিন্তু আমি জানতে চাই যে কোন গুণের জন্য, বা কিসের জোরে, আপনি নিজেকে ভদ্রলোক বলে দাবি করছেন? আপনি পায়ে জুতো পরে এসেছেন সেজন্য? আমরা এই দেশে দেখতে পাই, জুতো পরলেই মানুষ 'ভদ্রলোক' হয়ে যায়। আর কি? নিশ্চয় আপনার বিলক্ষণ টাকার জোরও আছে? তাই নয় কি?"

শেরিফ। "নিশ্চয়ই, টাকার জোর তো আছেই।"

হাইড। "কত টাকা আছে আপনার?"

শেরিফ। "গুনে দেখি নি, তবে দু লক্ষের বেশী।"

হাইড। "তা হলে, দেখছি দু লক্ষ টাকার ভদ্রলোক! আপনাকে সাবধানে প্রশ্ন করতে পারি কি—এক লক্ষ টাকায় ভদ্রলোক হওয়া যায় না? অর্ধেক টাকা আপনি যদি আপনার অসহায় পরিত্যক্তা স্ত্রীকে দিয়ে দেন, তা হলে কি সমাজের ভদ্রলোকের স্তর থেকে আপনার পতন হবে?"

শেরিফ। "আপনার এ কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না।"

হাইড দুঃখে ও ক্ষোভে প্রায় মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন, এবং দিগ্বিদিকজ্ঞানহারার মতন চিৎকার করে উঠলেন শেরিফের দিকে চেয়ে। বললেন, "পাষণ্ড জানোয়ার কোথাকার, বেরিয়ে যাও কোর্ট থেকে, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি!"

[ক্রমশ]

লোকে যা বলে বলুক, ভুল বুঝুক সুরজিৎকে, ভাবুক তাকে পাগল, তবু সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না নাটক করার নামে এই প্রহসনকে। সুরজিৎ নাট্যকার—নাম না জানা নাট্যকার। ছেলেবেলা থেকে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তার মন প্রতিবাদ করেছে, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে নিষ্ফল মাথা কুটে সে ক্ষান্ত হয় নি। তাই একা রক্ত ঝরাতে না পেরে যৌবনের সবটুকু শক্তি দিয়ে লিখে গেছে এ দেশের—এক একটা নাটক।

অথচ এসব নাটকের কোন দাম নেই সুরজিৎ তা ভাল করেই জানে। কাঁচা হাতের লেখা তৃতীয় শ্রেণীর সস্তা রোমাঞ্চকর গল্প-উপন্যাসেরও দাম আছে পাঠকের কাছে, কারণ এ দেশের পাঠকরা নাকি সেই পড়তে চায়। পড়তে না চাইলেও যা সম্পাদকরা পাতায় ভরে দিয়ে দেখাতে রাখেন তা হল কবিতা, প্রয়োজনমত বিজ্ঞাপনের পাদপূরণ হিসাবে ব্যবহার করার জন্যে। কিন্তু যা দেখলেই কাগজের সম্পাদক থেকে মুদ্রাকর পর্যন্ত 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' বলে চিৎকার করে ওঠেন তা হল নাটক।

এই দুর্ভাগা দেশের হতভাগ্য নাট্যকার সুরজিৎ সেনগুপ্ত। কবিতা সে লিখতে পারে না, গল্প তার মাথায় আসে না। যা তার হাত দিয়ে বেরোয় তা হল নাটক, স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ তার গতি, কোথাও কৃত্রিমতার লেশ নেই। অন্ধকারের মধ্যে ফুল দেখা না গেলেও তার গন্ধ চাপা থাকে না, ছড়িয়ে পড়ে। ছাপার অক্ষরে না থেকেও সুরজিতের নাটকের খ্যাতি ক্রমে প্রকাশ পেল বন্ধুবান্ধব মহলে। অভিনীত হল বিভিন্ন ক্লাবে, এমন কি মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও। শেষে যোগ্য হতেও সুরজিৎ দেখা পেল। অর্থাৎ তার অফিসের সহকর্মীরা স্থির করল এবারের প্রতিষ্ঠাদিবসে তারা সুরজিতের নাটক মঞ্চস্থ করবে। অফিসে নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি পেল সুরজিৎ।

প্রথম প্রথম সকলেরই ভাল লাগছিল এই নতুন ধরনের নাটক রিহার্সাল দিতে। এতদিন 'বঙ্গবর্গী' আর 'সাজাহান' করে এ এক রকম মুখ বদলানো আর কি। অফিস ছুটি হবার পর ঘণ্টা দুতিন রিহার্সাল চলে রিক্রিয়েশন ক্লাবের ঘরে। অপর্যাপ্ত চা, পান, সিগারেট, সেই সঙ্গে জলখাবার হিসাবে কচুরী-সিঙাড়ার ব্যবস্থা। রিহার্সালের সময় মেয়েদের পার্ট প্রক্সী দিয়ে চালাতে হয়, কারণ পেশাদার অভিনেত্রীরা দুটোর বেশী রিহার্সাল দিতে নারাজ। এদের মধ্যে যারা আবার একটু নামকরা তাঁরা রিহার্সালে আসেন না বললেই হয়—যেমন এ নাটকের নায়িকা মল্লিকা দত্ত।

কিন্তু এ ভাল লাগা বেশীদিন টিকল না। সুরজিতের নাট্যপরিচালনার রীতিতে মাস্টারি গন্ধ যেন বড় উগ্র বলে মনে হল সকলের কাছে। পার্ট সকলকে মুখস্থ করতে হবে, প্রত্যেকদিন সময়মত রিহার্সালে আসা চাই, আগের দিন যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, রিহার্সালের সময়

তার ব্যতিক্রম হলে সুরজিৎ চেঁচিয়ে ওঠে—এ সবই যেন একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। থিয়েটারের ব্যাপারে সুরজিৎ এতখানি কড়া মেজাজের লোক তা আগে জানলে এ নাটক মঞ্চস্থ করতে এরা চাইত না। সারা বছর খেটে খানিকটা মজরম করার জন্মে এখানে অভিনয় করা। তা যদি ইস্কুলের পড়া তৈরি করার মত শক্ত কাজ হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে আর কার ভাল লাগে।

সুরজিৎ কিন্তু কারুর কথা শোনবার লোক নয়। হেলাফেলা করে সে তার নাটক নামাতে দেবে না। তার কথার মাত্রাই হল, হয় আমি যেরকম বলছি সেইরকম করে খেটে নাটক নামাও, না হয় বন্ধ করে দাও।

এতদূর এগিয়ে বন্ধ করা সম্ভব নয় বলেই সকলকে মুখ বুজে সুরজিতের কথা শুনতে হয়। এমন কি মেয়েদেরও সুরজিৎ ছেড়ে কথা বলে না। পর পর দুদিন রিহার্সালে আসব বলে না এসে তৃতীয় দিন একটুকু অপ্রতিভ না হয়ে হাসতে হাসতে মন্দিরা গুহ অফিস-ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে ঘরে ঢুকতেই সুরজিৎ বিরক্ত হয়ে বলে, এ ভাবে নাটক করা যায় না। বন্ধ করে দাও।

সেক্রেটারি কাছে এসে নীচু গলায় বুঝিয়ে বলে, উনি তো এসে গেছেন, তবে আর মিছিমিছি চেঁচাচ্ছেন কেন?

কি পেয়েছ তোমরা, এ কি ছেলেখেলা যে উনি একদিন রিহার্সাল করে স্টেজে নামবেন?

সুরজিৎ বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিল যাতে মন্দিরা গুহর কানে কথাগুলো ঠিকমতই পৌঁছয়। আশ্চর্য, এ ধরনের কথাবার্তাতেও মন্দিরা রাগ করল না। সুরজিতের কাছে এগিয়ে গিয়ে হেসে বলে, ভয় নেই, আপনার নাটক আমি ডোবাব না। পার্টটা বাড়িতে বেশ ভাল করে পড়ে রেখেছি। রিহার্সাল দিয়ে দেখুন না।

সুরজিৎ কোনরকম আগ্রহ প্রকাশ করে না, নীরস গলায় বলে, নিন, আবার রিহার্সাল শুরু করুন, আপনাদের হিরোইন এসে গেছেন।

সেদিন রিহার্সাল চলল অনেকক্ষণ। বিশেষ করে মন্দিরার সব সিনগুলোই করানো হল। আবার কবে হিরোইনকে পাওয়া যাবে কে জানে!

মন্দিরা গুহর চেহারা ভাল নয়। বৈশোর তুলনায় প্রস্থ বেশী। অনেক কষ্টেও কোমরের রেখা খুঁজে পাওয়া যায় না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রঙ। চোখ দুটো বড় হলেও নাকটা কেমন যেন বেমানান। ক্যামেরায় এ চেহারা ভাল আসে না বলেই সিনেমার দর্শকের কাছে মন্দিরা গুহ সম্পূর্ণ অপরিচিতা। কিন্তু মঞ্চে তার নাম আছে। সামাজিক ঐতিহাসিক যে কোন নাটকে অভিনয় করার মত কণ্ঠস্বরই তার প্রধান সম্পদ। সেইজন্যেই জাঁদরেল নামকরা পেশাদারি মঞ্চে সে একজন প্রধান চরিত্রাভিনেত্রী।

আজকের রিহার্সালে তার অভিনয় দেখে সুরজিৎও এ কথা স্বীকার করল মনে মনে। এতদিন ধরে সবাইকে শিখিয়েও যা সে করতে পারে নি, মন্দিরার অভিনয়গুণে নাটক যেন সত্যিই জমে উঠল।

রিহার্সাল শেষ হতেই মন্দিরা কাছে এসে আগের মতই হেসে বলল, কি, অভিনয় পছন্দ হল? যদি না হয় নিঃসঙ্কোচে বলুন। যে টাকা আপনাদের কাছ থেকে নিয়েছি ফেরত দিয়ে চলে যাব।

সুরজিৎ গম্ভীর গলায় বলে, না, অভিনয় আপনি ভাল করেন। আমার চরিত্রটা বুঝতে পেরেছেন।

সুরজিৎ যে এ কথা বলবে তা যেন মন্দিরা জানত। সত্যি কথা বলতে কি, বেশীর ভাগ অ্যামেচার ক্লাবে এত খারাপ অভিনয় হয় যে কাজ করে আনন্দ পাই না। শুধু টাকার জন্যে অভিনয় করি।

তা আমি জানি।

আপনাদের এখানেও রিহার্সালে আসবার ইচ্ছে ছিল না, ভেবেছিলাম একেবারে স্টেজ রিহার্সাল দিয়ে দেব। তবু কেন এলাম জানেন?

কেন?

আপনার নাটকটা পড়ে—বেশ ভাল লিখেছেন।

সহজে কারুর প্রশংসায় সুরজিৎ কান দেয় না। অভ্যাসমত বাঁ দিকের ভুরুটা তুলে বলল, আশ্চর্য, এ ধরনের

মন্দিরার মুখের দিকে তাকিয়ে সুরজিৎ হাসে : আপনি তো খুব স্পষ্ট কথা বলেন।

ওইটেই আমার বদঅভ্যাস। তাই তো জীবনে কিছু করতে পারলাম না। চলুন ওপরে যাওয়া যাক্। হৃষীকেশবাবুকে আপনার কথা বলে রেখেছি।

চলুন।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। লবী থেকে পাক খেয়ে সিঁড়ি উঠেছে ড্রেস সার্কেলে। সেখান থেকে আবার তিনতলায়। ওইখানেই হৃষীবাবুর অফিস।

অফিস-ঘর কিছু বড় নয়। হৃষীবাবুর চেয়ার টেবিল ছাড়া খানপাঁচেক চেয়ার দেয়ালের গায়ে লাগানো রয়েছে। সাধারণ মামুলী অফিস বলতে যা বোঝায় এ তাই। লবী থিয়েটারের একমাত্র মালিককে সুরজিৎ এই ধরনের অফিসে দেখতে পাবে আশা করে নি। মন্দিরা শুধু স্বচ্ছন্দে ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সুরজিতের পরিচয় দিয়ে বলে, ইনিই সুরজিৎবাবু— যাঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম।

হৃষীকেশবাবু সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন।

হৃষীকেশ দত্তর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। গৌর-বর্ণ রঙ, প্রশস্ত কপাল। পাতলা চুলের ভিতর দিয়ে টাক ফুটে বেরয়। সারা চেয়ারজোড়া শরীর, দেখলেই বোঝা যায় এ ননী খাওয়া মাংসের ঢিবি নয়, রীতিমত পালোয়ানী কাঠামো। তবে সব সময় মাথাটা বাঁ দিকে হেলিয়ে রাখেন, মনে হয় ডান কাঁধের শিরে অকারণ টান পড়ায় গলা তার স্বচ্ছন্দগতি হারিয়েছে।

হাতের কাজ শেষ করে, চোখ থেকে চাল্‌শের চশমা সরিয়ে, হৃষীকেশবাবু সুরজিতের দিকে মন দিলেন। ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, বয়েস তো বেশী নয়।

উত্তর দিল মন্দিরা : কিন্তু এরই মধ্যে পাঁচ-সাতখানা নাটক লিখেছেন—

তাই নাকি! কি থীম? হিস্টোরিকাল, না সোস্যাল?

সুরজিৎ মৃদু হেসে বলে, আমি সামাজিক নাটকই বেশী লিখি।

আমরাও তাই চাই। আজকাল আর হিস্টোরিকাল নাটক চলে না। যা ড্রেসের খরচা! ওসব নাটক দু-তিনটে নামালে কোম্পানি উঠে যাবে। সামাজিক নাটকই ভাল— ড্রেসের ঝামেলা নেই, সেটও দু-একটা মামুলী হলেই চলে, আর ফার্নিচার আমাদের আছেই, একটু রঙ করে নিলেই ঝকঝক করবে। তা নাটকটার কি নাম দেওয়া হয়েছে?

নূতন যুগের জোরে।

কি বললেন?—হৃষীকেশবাবু চোখ দুটো বড় বড় করেন।

এবার মন্দিরা নামটা শুনিয়ে দেয় : নূতন যুগের জোরে।

হ্যাঁ, নামটা ভালই, বেশ চমক আছে। কিন্তু বিষয়-বস্তুটা কী? কোন ইজম-টিজম্ নেই তো?

সুরজিৎ একটু যেন বিরক্তই হয় : পড়েই দেখুন না।

হৃষীকেশবাবু পান চিবুতে চিবুতে বলেন, পড়ব বইকি, তবে আগে থেকে একটু সাবধান হয়ে নেওয়া ভাল। এখানে মশাই ঢের লোক নাট্যকার আসে, যা-তা ছাই-পাঁশ লিখে এনে বলবে নাটক লিখেছি। মশাই, ইজম্-টিজম্ নাটকে চলে না, ওসব পড়ার মাঠে ভাল। তবে মন্দিরার যখন ভাল লেগেছে ও-রকম কিছু নয় নিশ্চয়। তা এটা ট্র্যাজিডি, না কমিডি?

সুরজিৎ ইতস্তত করে বলে, আজকালকার নাটককে কি আর ওভাবে শ্রেণীভাগ করা যায়?

তা নয়, আমি বলছি নাটক দেখবার পর দর্শকরা হাসতে হাসতে বাড়ি যাবে, না কাঁদতে কাঁদতে।

সুরজিৎ হাসি চাপতে পারে না : সে নির্ভর করবে অভিনয়ের উপর। হাসির নাটক দেখতে এসে পয়সা দিয়ে টিকিট কাটার শোকে দর্শককে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি যেতেও তো দেখেছি।

এ ধরনের ঠাট্টায় পাছে হৃষীকেশবাবু বিরক্ত হন তাই মাঝখান থেকে মন্দিরাই কথা বলে, এটা ঠিক মামুলী নাটক নয়, মাঝখানে নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদ হলেও শেষের দিকে কিন্তু তাদের মিল হয়ে গেছে। বেশ সেন্টিমেন্ট আছে। একদিন সুরজিৎবাবুকে পড়তে বলুন না। মনে হয় আপনাদের ভাল লাগবে। এ একেবারে পাবলিক বোর্ডেরই নাটক।

হৃষীকেশবাবু খাদের নীচু পর্দায় কথা বলেন : বেশ তো, সামনের সপ্তাহে একদিন নাটক পড়া যাক। যতীবাবু আমাদের ডিরেক্টার, ওঁকেও শুনতে বলব।

সুরজিৎ জিজ্ঞেস করে, আপনি কি আমায় খবর দেবেন, তা হলে ঠিকানাটা—

তার দরকার নেই। এক কাজ করুন, সামনের শনি-রবিবার একদিন সময় করে এসে আমাদের নাটকটা দেখুন, এ বোর্ডের কে কি রকম আর্টিস্ট তার একটা আন্দাজ পাবেন। যখন আপনার নাটক পড়া হবে, তখন আপনি সাজেস্ট করতে পারেন, কে কোন্ রোল করতে পারবে।

হৃষীকেশবাবুকে নমস্কার করে বেরিয়ে এল সুরজিৎ। নীচে নামতে নামতে মন্দিরাকে বলল, ভদ্রলোক নাটক সম্বন্ধে কিছু বোঝেন বলে তো মনে হল না।

মন্দিরা শুধু সৌজন্যের হাসি হাসে : কিন্তু মানুষটা ভাল।

আমার নাটক এরা নেবে না।

বলা যায় না, হয়তো একটু অদল বদল করে নিতেও পারে।

আমি একটি লাইনও বদলাতে দেব না।

মন্দিরা একদৃষ্টে সুরজিতের দিকে তাকায় : প্রথম থেকেই অত মেজাজ গরম করতে নেই। একটা নাটক পাবলিক বোর্ডে হোক, নামটা হয়ে যাক, তারপর—

সেইদিনকার কথামত রবিবার সন্ধ্যের শোতে শ্রী থিয়েটারের স্টেজ-বক্সে বসে সুরজিৎ নাটক দেখছিল। দোতলায় বিশেষ লোক ছিল না। তবে নীচের দামী আসনগুলো প্রায় ভর্তি। ক্রমশঃ পিছনের দিকের সিট ফাঁকা পড়ে রয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের চেহারা খুব বেশী বদলায় নি। পনের বছর আগে যা ছিল এখনও প্রায় তাই। নড়বড়ে বসবার সিট, পা রাখার জায়গা নেই বললেই চলে। কিঞ্চিৎ স্থূল শরীরের কোন দর্শক বসলে পাশের লোকের বিলক্ষণ অসুবিধা হয়। সেদিনকার মত আজও সব ঘোরে। সুরজিতের মনে হয় কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মতই এর ঘোরা। তাই এতদিনে এক পাও বোধ হয় এগুতে পারে নি। সেই মান্ধাতার আমলের সিন। সামঞ্জস্যহীন আসবাবপত্র, তার চেয়েও পুরনো ধরনের অভিনয়। এই মরচে-পড়া নাটক দেখতে কেন যে মানুষ আসে তা সত্যিই ভেবে পাওয়া মুশকিল।

তবে পরিবর্তন যে কিছুই হয় নি তা নয়, এখন আর বিরামের সময় প্রেক্ষাগৃহ স্টেশনের প্লাটফর্মে রূপান্তরিত হয় না। সুরজিতের বেশ স্পষ্ট মনে আছে, ক বছর আগেও নাট্যাচার্য বা নটসূর্যের অভিনয় দেখতে এসে যখন সে মুগ্ধ হয়ে যেত, ভেসে যেত অভিনীত চরিত্রের সুখদুঃখের স্রোত নিয়ে দূর থেকে দূরান্তরে, ভুলে যেত নিজের অস্তিত্ব, ঠিক সেই সময় অঙ্কশেষের যবনিকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেরিওয়ালাদের চা-গরম আর পান-বিড়ি সিগারেটের হাঁকে তার মনটা বিরক্ত হয়ে উঠত। এতক্ষণের ভাল-লাগা চরিত্রের মধ্যে বিলীন হয়ে যেত। আজকাল আর তা হয় না।

আর একটা জিনিসের পরিবর্তন হয়েছে, তা হল যবনিকা। আগেকার দিনে সামনের পর্দায় আঁকা থাকত নানারকমের বিজ্ঞাপন, দাদের মলম আর অর্শের মহৌষধ। সেই দৃষ্টিকটু যবনিকা এখন বিদায় নিয়েছে। তার জায়গায় ঝোলে খুব একটা উঁচু দরের না হলেও এক রঙের পর্দা।

অন্ধকারের মধ্যেই এক সময় সুরজিতের পাশে এসে বসলেন রমেনবাবু, ইনি এই শ্রী থিয়েটারের ম্যানেজার। আজকেই সুরজিতের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে। ভদ্রলোক রোগা কিন্তু সৌখীন চেহারা। পুরু কাঁচের চশমার ভেতর থেকে চোখ দুটো লাল মাছের মত বড় বড় দেখায়। মাথার সাদা-কালো-জুড়ে চুল দেখে বয়স চল্লিশের ওপর ধরা গেলেও আঁটসাঁট শরীর দেখে তা মনে হয় না।

পাশে বসেই নীচুগলায় মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছে ?

সুরজিতের গোড়া থেকেই এ ভদ্রলোকটিকে ভাল লাগে নি। তার ওপর এই বিরক্তিকর নাটক দেখা।

তাই মনের ভাব গোপন করার চেষ্টা না করেই স্পষ্ট বলল, ভাল না।

এ ধরনের উত্তর রমেন চৌধুরী আশা করে নি, তবু বলল, গল্পটা একটু পুরনো ধরনের বটে তবে অ্যাকটিং ভালই হচ্ছে—কি বলুন।

সুরজিতের আবার কাটখোট্টা উত্তর: কিছু একটা ভাল হচ্ছে নিশ্চয়, তা না হলে আর এত লোক আসছে কেন?

কই আর লোক আসছে? [illegible] না পেলেই তো হাউসের এই অবস্থা।

সুরজিৎ মুখ বাড়িয়ে নীচেটা দেখে নিয়ে বলে, নীচে তো অনেক লোক রয়েছে।

রমেন চৌধুরী নীরস গলায় বলে, সবই পাস। দেখছেন না নীচু দরের টিকিটগুলো পড়ে রয়েছে! সত্যিকারের দর্শক [illegible] আগে এই সিটগুলো ভরে যায়।

তবু সুরজিতের বিস্ময় কাটে না: এত লোক সবাই পাসে এসেছে বলছেন?

এ ছাড়া উপায় কি? টিকিট তো বিক্রি হয়েছে মাত্র দুশো টাকার। তারা যদি ফাঁকা হল দেখে যায়, বাইরে গিয়ে কি রকম বাজে পাবলিসিটি করবে বলুন তো। যে রকম করে হোক কিছু লোক ঢোকাতেই হবে—শো-বিজনেসের সোজা কথাই এই।

একটু থেমে নিজে থেকেই আবার বলে, নাটক দেখতে যদি ভাল না লাগে, চলুন, বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাওয়া যাক।

চলুন।

দুজনে বেরিয়ে এসে পাশের সরু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। থিয়েটারের আঙিনা পেরলেই একটা মাঝারি আকারের বস্তি। তার পেছনে পাকা বাড়ি শুরু হয়েছে। কাছাকাছির মধ্যে খুব উঁচু বাড়ি না থাকায় এই থিয়েটারের বারান্দায় দাঁড়ালে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। একটা সাদা তিনতলা বাড়ির ছাদের ওপর যেখানে লাল কৃষ্ণচূড়ার গাছ এসে পড়েছে তারই পেছন থেকে উঠেছে যেন আকাশ। অনেকটা [illegible] থিয়েটারের মঞ্চের মধ্যে আঁকা কোন একটা দৃশ্য [illegible] মতই দেখায়।

দক্ষিণের দিক থেকে মিঠে হাওয়া আসছিল। সিগারেটে টান দিয়ে রমেন চৌধুরী আগের কথার জের টেনে বলে, এ নাটকের গোড়ায় কিন্তু নাম ছিল। প্রথম পঁচিশ নাইট তো হাউসফুল। তারপর পঞ্চাশ অবধি শনিবারের দুটো হাউসই ফুল চলেছে। কিন্তু [illegible] পর কেমন যেন মুখ থুবড়ে পড়ল। [illegible] কিছুতেই জের উঠল না।

সুরজিৎ বিরক্ত স্বরেই বলে, যাই বলুন নাটকটা কিন্তু বড় বাজে।

[illegible] নাটক [illegible] কী এসে যায়, অনেক [illegible] হলেই নাটক ভাল, নাহলে [illegible]

[illegible] নাটকের আঙ্গিক কিছু [illegible] গল্প, তবে অভিনয়—

রমেন চৌধুরী অভিজ্ঞ ম্যানেজারের হাসি হাসেন: বড়বাবুর থিয়েটারে তো সবই ছিল—মানে আমি শিশির-বাবুর কথা বলছি। 'তুর্কীর ঈমান' '[illegible]', লোকে যেমন নিলে কই, তাই তো 'শ্রীরঙ্গম' উঠে গেল।

সে আমাদের দুর্ভাগ্য।

সুরজিৎ মনে মনে ভাববার চেষ্টা করে, সত্যি কী চমৎকার নাটক, কী প্রাণবন্ত অভিনয়—তবু দেশের লোক নিল না।

রমেন চৌধুরী থামতে চায় না: তখন যে থিয়েটার চলে নি তা তো নয়, তারা ভিড় করে দেখতে গেছে অন্য থিয়েটারে, যেখানে হয়তো চলছে—

সুরজিৎ পাদপূরণ করে দেয়: নাটকের নামে যাত্রা, অভিনয়ের নামে চীৎকার, রোমান্সের নামে বস্তাপচা নোংরামি।

রমেন চৌধুরী এবার হেসে ফেলে: না, আপনি দেখছি একেবারেই অ্যামেচার থিয়েটারের লোক। পেশাদার মঞ্চে এসব চলে না। লোকে যা চায় আমাদের তাই দিতে হবে।

গ্রীনরুম—ছেলেদের মধ্যে যাঁরা মেন রোল করেন তাঁদের জন্যে।

তিনতলায় ছেলে-ছোকরাদের জন্যে আলাদা সাজঘর আছে, আর মেয়েদের ব্যবস্থা নীচে—স্টেজের পাশে।

রমেন চৌধুরীর বোধ হয় ইচ্ছে ছিল কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে সুরজিতের পরিচয় করিয়ে দেবার, কিন্তু পর্দা সরিয়ে কাউকেই ঘরে দেখতে পেলেন না। নীচে থেকে কাদের যেন চেঁচামেচি আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। একতলায় নামবার সিঁড়ির কাছে এগুতেই তা যেন আরও প্রকট হয়ে উঠল। এ মঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক প্রদীপ মুখার্জি সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই চিৎকার করে নীচে দাঁড়িয়ে-থাকা অন্য শিল্পীদের ধমকাচ্ছে: ইয়ারকি করার তোমরা জায়গা পাও নি, সিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছ? ঘুষি মেরে দাঁত ভেঙে দিলে তবে আমার রাগ যায়।

নীচে থেকে কে যেন প্রতিবাদ করে বলে ওঠে, আমাকে বকছেন কেন? আমি যদি হেসে থাকি—সিনিয়ার আর্টিস্টরা হাসিয়ে দিয়েছে বলে, তাঁদের বকুন না।

প্রদীপ মুখার্জী আরও চটে যায়: কোথা থেকে সব এই হতভাগাগুলোকে এনে জুটিয়েছে। স্টেজের ওপর দাঁড়াতে জানে না, তারা সব অ্যাক্টর হয়েছে। আর হবে নাই বা কেন, থিয়েটারের আর কি সেই রমেশী দিন আছে—যে-সে এখন থিয়েটার চালাচ্ছে।

কথাগুলো বিশেষ করে যেন রমেন চৌধুরীকেই শোনানো হল। প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই প্রদীপ মুখার্জী সুরজিৎদের পাশ দিয়ে হনহন করে নিজের সাজঘরে চলে গেল।

চারদিক তাকিয়ে নিয়ে রমেন চৌধুরী সভয়ে বলে, আমি আর এগুচ্ছি না মশাই।

সুরজিৎ চোখ তুলে তাকায়: কেন, কি হল?

নিশ্চয় কোন গোলমাল হয়েছে, এখুনি সবাই এসে আমাকে ধরে সালিশী মানবে। তার চেয়ে বাইরে চলে যাওয়াই ভাল।

তা হলে আমি?

আপনার ভয় কি, সিঁড়ি দিয়ে নীচে চলে যান। যাকে বলবেন মল্লিয়াকে ডেকে দেবে।

সুরজিতের পিঠে একটা চাপড় মেরে তাকে সিঁড়ির দিকে একটু এগিয়ে দিয়ে রমেন চৌধুরী দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে ক ধাপ নামতেই সুরজিৎ দেখে নীচে দাঁড়িয়ে একদল লোক চেঁচামেচি করছে। তার মধ্যে যার গলা সবচেয়ে বেশী শোনা যাচ্ছে, হাত পা ছুঁড়ে নিজের বক্তব্যকে সহজে বোঝাবার চেষ্টা করছে, সে আর কেউ নয়—এ মঞ্চের সুদর্শন নট বাসুদেব মজুমদার। বাসুদেব যুবক, রোমান্টিক হিরোর রোলে সে এরই মধ্যে নাম করেছে। শুধু মঞ্চে নয়, ছবিতেও। তার ন্যাকামী-ভরা প্রেমের কোনো অভিনয় দেখতে লোকে নিশ্চয় চায়, তা না হলে ক্রমশ: তার চাহিদা বাড়ছে কেন?

বাসুদেব নাক কুঁচকে বলছিল, ওসব ফুটুনী করলেই তো চলবে না, কত বড় অ্যাক্টার সব জানা আছে। যত মেজাজ এই কবী থিয়েটারে—কোন স্টুডিওতে আর ঢুকতে হচ্ছে না।

কৌতুক অভিনেতা রসময় চেঁচিয়ে ওঠে, এ কিন্তু তোর উচিত হচ্ছে না বাসু। প্রদীপদা কতদিনের একটা সিনিয়র আর্টিস্ট, তার নামে এ রকম করে যা-তা বলছিস?

উনিই বা আমাকে পাঁচজনের সামনে ওইরকম ভাবে যাচ্ছেতাই করলেন কেন?

উনি যাই বলুন, তোর খুব অন্যায় হয়েছে। এখুনি গিয়ে ওঁর কাছে মাপ চাওয়া উচিত।

বয়ে গেছে মাপ চাইতে। আমি এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি রমেনবাবুকে, দরকার হলে এ থিয়েটার আমি ছেড়ে দেব। আজই—এখুনি।

রাগে গরগর করতে করতে বাসুদেবও ওপরে উঠে গেল। রসময় ওর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থেকে দাঁতে দাঁত ঘষে তেতো গলায় বলে, বেটা রাঙা মুলো, তার মুখে আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। প্রদীপদা তো ঠিকই বলেছে—স্টেজে দাঁড়াতে জানে না, সব অ্যাক্টর হয়েছে।

সুরজিৎবাবু, আমি এদিকে।—ভিড়ের ভিতর থেকে [ম]ন্দিরা শুধু হাত নেড়ে সুরজিৎকে ডাকে।

সুরজিৎ ভিড় ঠেলে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে স্বস্তির [নি]শ্বাস ফেলে বাঁচে: আমি তো ভাবছিলাম এই [গ]ণ্ডগোলের মধ্যে কোথায় আপনাকে খুঁজে পাব।

মন্দিরা শুধু হাসে: সব কটা পাগল। চলুন, একটু [ফাঁ]কায় গিয়ে বসা যাক।

সুরজিৎ মন্দিরার পিছুপিছু মঞ্চের পেছন দিকে [illegible] এক টুকরো ফাঁকা উঠোনে এসে বসে।

সুরজিৎ নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছিল, [এ]ত গণ্ডগোল কেন?

বললাম তো, যত সব পাগলের কাণ্ড। দ্বিতীয় অঙ্কের [যবনিকা] পড়ার আগে ক্লাইম্যাক্স সিনে বাসুদেব কেঁদে ফেলেছে, [তাই] বুঝি তাকে থামিয়ে দিয়েছে, তাইতে প্রদীপদা রেগে স্থির। এখন পর্দা উঠলে হয়।

সুরজিৎ চোখ বড় করে বলে, সে কি, দর্শকরা বসে করে যে!

মন্দিরা খিলখিল করে হাসে: এ রকম তো হামেশাই [হয়]। আর্টিস্টরা বড্ড মুডি। রেগে গেলেই হল।

আপনিও রেগে যান নাকি?

কি মনে হয়?

দেখলে কিন্তু আপনাকে রাগী বলে মনে হয় না।

মন্দিরা ঠোঁট উলটিয়ে হাসে: সবাই তাই ভাবে, কিন্তু [রা]গ আমার শরীরে আছে। এক এক সময় একেবারে [ক্ষে]পে যাই। কিন্তু তাই বলে এদের মত দিন আটকে [রা]খি না। তাই তো এদের সঙ্গে আমার মেলে না। [আ]মার সঙ্গে এদের তফাতটা কোথায় জানেন?

সুরজিৎ কোন কথা না বলে চোখ তুলে তাকায়।

মন্দিরা বলে যায়, এদের মধ্যে বেশীর ভাগই থিয়েটার [ক]রতে আসে টাকার জন্যে, আবার অনেকের কাছে এটা [স]খের পথ। কিন্তু আমি টাকার জন্যে অভিনয় করি না, [স]খের জন্যেও করি না। থিয়েটার আমি ভালবাসি। অভিনয় আমার রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে রয়েছে।

মন্দিরা কথা শেষ করতে পারল না। হন্তদন্ত হয়ে এসে রমময় জানাল, ব্যাপার শুনেছ? রাঙামুলো রাগ করে মেক-আপ তুলে ফেলে ঘরে বসেছিল। রমেন চৌধুরী এতক্ষণ ধরে তার মান ভাঙিয়েছে। তাই এখন পনেরো মিনিট দেরিতে পর্দা উঠছে। দেখা যাবে সেদিন এ লাইনে। দুটো ছবিতে নেমেই এই মেজাজ?

মন্দিরা একটা ভুরু তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, হবে না কেন? সবাই তো আর ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো মন্দিরা গুহ নয় যে মুখ বুজে কাজ করে যাবে! ঠিক হয়েছে, প্রদীপদা এবার বুঝবেন। ওঁর চেয়েও বাসুদেবের খাতির এখন বেশী এ কোম্পানিতে।

রমময়ের মুখ বিরক্তিতে কুঁচকে যায়: তোমরাই তো ছোঁড়াটার মাথা খেলি, বাহাদুরির ঢাক বাজাতে শুরু করেছে। ক'দিন বাদে তো কেউ গ্রাহ্য করবে না।

মন্দিরা আবার শব্দ করে হাসে: সে ভয় নেই, ও যে আমার ছেলে।

ও-রকম অনেক মা-ছেলে এ লাইনে দেখলাম, তোমাদেরটাই বাকি আছে। আর আড্ডা মেরো না, রেডি হয়ে নাও—সিন উঠবে।

রমময় চলে যেতে মন্দিরা সুরজিৎকে বলে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই লোকটা রাতের পর রাত ভাঁড়ামী করে লোক হাসায়, অথচ নিজের ভেতরটা জিলিপির প্যাঁচে ভরা। ওর অভিনয় আপনার কি রকম লাগে?

ভালই। তবে মাঝে মাঝে একটু যেন বাড়াবাড়ি মনে হয়।

দর্শক তাই চায়। সত্যি সুরজিৎবাবু, ভাল জিনিস আমাদের দেশের দর্শক নিতে পারে না, এক এক সময় বড় খারাপ লাগে।

যদিও কথাগুলো শুনতে সুরজিতের ভাল লাগছিল তবু মনে করিয়ে দেবার জন্যে বলল, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো।

মন্দিরা শুধু অন্যমনস্ক স্বরে বলে, হ্যাঁ, যাই। আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, মঙ্গলবার দিন সন্ধ্যেবেলা আপনার নাটকটা পড়া হবে। সাড়ে ছটার সময় আসবেন, ওপরে ওই রবীবাবুর অফিসে।

সুরজিৎ সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে, আপনি আমার জন্যে অনেক কিছু করলেন।

সেটা নিজেরই স্বার্থে, একটা ভাল পার্ট পাবার আশায়। সত্যি, নাটকটা আপনি ভাল লিখেছেন। সেই লাইনটা, যেখানে তনিমা বলছে—"একে একে যখন রাস্তার আলোগুলো নিভে যায়, আমি একলা নির্জন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবি আবার কখন সূর্য উঠবে।"

কথাগুলো বলতে বলতে মন্দিরার চোখে জল ভরে আসে। সুরজিৎ বোঝে তার নাটকের তনিমাকে মন্দিরা সত্যিই ভালবেসেছে, তা না হলে এতখানি প্রাণ দিয়ে সে কথাগুলো উচ্চারণ করতে পারত না।

মন্দিরা উঠে পড়ে: তা হলে মঙ্গলবার দেখা হবে।

নাটক শেষ হয়ে যাবার পর একে একে শিল্পীরা সবাই চলে গেলেও মন্দিরার সাজঘর থেকে বেরুতে দেরি হয়। শেষ যবনিকা পড়ার সময় পর্যন্ত তাকে স্টেজে থাকতে হয় প্রদীপ মুখার্জীর সঙ্গে, তাই সাজঘরে গিয়ে আয়নার সামনে বসে ক্রীম দিয়ে মুখের রঙ তুলে আবার বাইরে বেরবার জন্যে মুখে পাউডার ঘষে তবা হয়ে বেরতে অন্যদের চেয়ে তার দেরি হয় বইকি। তবে কারুরই তাতে এসে যায় না। কারণ অন্য মেয়েরা থিয়েটারের গাড়ি করে যে যার বাড়ি চলে যায়। মন্দিরা সে গাড়িতে ওঠে না, অভিনয়ের শেষে একটা রিক্‌শা চেপে টুং টুং শব্দ শুনতে শুনতে সে বাড়ি ফেরে। রিক্‌শার ভাড়া অবশ্য থিয়েটার কোম্পানিই দেয়। বেশীর ভাগ রাত্রেই মন্দিরার সঙ্গে একই রিক্‌শায় বাড়ি ফেরে মুকুল নন্দী—স্টেজ ম্যানেজার। তার বাড়ি যদিও আরও একটু ভিতরের দিকে, তবে কোম্পানির দেওয়া ওই একই ভাড়ায় রিক্‌শা তার বাড়ি পর্যন্ত যায় বলে মন্দিরার সঙ্গ সে ছাড়ে না। যেদিন মন্দিরা শোয়ের পর রিহার্সাল দিতে চলে যায় অন্য জায়গায় তখনই হয় মুকুল নন্দীর মুশকিল—বেচারীকে একলা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরতে হয়।

অন্য দিনের মত আজও মুকুল নন্দী মেয়েদের সাজঘরের ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করে, হল তোমার মনো? রিক্‌শা এসে গেছে।

মন্দিরা আয়নায় দেখে দেখে খোঁপায় কাঁটা গুঁজছিল, হেসে বলে, এই যে হয়ে গেছে।

মুকুল নন্দী হাত পাতে: দুটো পান দাও।

মন্দিরা ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর থেকে পান বার করে দেয়।

জর্দা?

ফুরিয়ে গেছে।

মুকুল নন্দী ফিক করে হাসে: আজ বুঝি দুর্গাবাবুর কাছ থেকে চেয়ে আনা হয় নি?

এনেছিলাম, মেয়েগুলো লোভ করে খেয়ে ফেলেছে। ওদের কাছ থেকে কি কিছু লুকিয়ে রাখার উপায় আছে? চল, যাই—

আয়নায় নিজের চেহারাটা ভাল করে আর একবার দেখে নিয়ে মন্দিরা উঠে পড়ে: বল, কাউকে ব্যাগটা নিতে হবে।

মুকুল নন্দীর আর দেরি সয় না, নিজেই ব্যাগটা তুলে নেয়: চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

স্টেজের ফ্ল্যাটগুলো খুলে ফেলে মিস্ত্রীরা যথাস্থানে রেখে দিয়েছে। এতক্ষণ যে মঞ্চ দৃশ্যে, আলোয়, অভিনয়ে, জমজমাট ছিল এখন তা ফাঁকা, অন্ধকারে ঝিমিয়ে পড়েছে। প্রেক্ষাগৃহের আলোও নিভে গেছে, সামনের গলিতে বারান্দার নীচে শুধু একটা আলো জ্বলছে। কোলাপ্‌সিবল দরজা আধেকটা টানা। বক্স-অফিস বন্ধ। দু-একজন দরোয়ান পানওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে মন্দিরা আর মুকুল নন্দী পাশাপাশি উঠে বসল অপেক্ষমান রিক্‌শায়।

রিক্‌শা এগিয়ে চলেছে অতিপরিচিত রাস্তায়। কোন্ বাড়ির পর কোন্ দোকান আসবে, কিভাবে কোন্ মোড়ে লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকবে, তাও যেন এদের মুখস্থ। হয়তো হঠাৎ কানে ভেসে আসে, "ওই যে মন্দিরা গুহ যাচ্ছে, নবী থিয়েটারের মন্দিরা গুহ।" শুনতে ওদের

ভাল লাগে, তবে তা নিয়ে কোন কথা বলে না। যদি
া মুকুল নন্দী বলে, তোমার তো আজকাল ক্যাশ অনেক
শুনছি।

মন্দিরা ঠোঁট উল্‌টিয়ে উত্তর দেয়, যা গরম, বাড়িতে
কেটা লাগাতে পারলে বাঁচি।—একটু থেমে জিজ্ঞেস করে,
তোমার ছেলে কেমন আছে?

ডাক্তার তো ওষুধ দিচ্ছে, এখনও জ্বর ছাড়ে নি।

বউদি কি রকম?

বলছে তো বাপের বাড়ি যাবে, তারা তো ওই লোক
নয় না। সেদিন টেলিফোনে ওর দাদাকে বললাম।
লে আসব, আজও তো আসে নি। এ সময় ওর
দের বাড়িতে থাকাই ভাল।

বাড়ির কাছে রিকশা থামিয়ে মন্দিরা নেমে পড়ল।
বা থেকে থেকে বন্ধ ছিল, কথা বলতে বলতেই
জল, ঠিক আছে, তুমি চলে যাও মুকুলদা।

রিকশা চলে গেল।

একটু পরেই ভেতর থেকে দরজা খুলল গোবিন্দর
।। কালোকোলো মত রঙ, চিমড়ে বুড়ী, সাদা থান পরা,
বাড়ির পুরনো ঝি। কানে দুটো সোনার মাকড়ী,
ন্দিরার মা তাকে বকশিশ দিয়েছিলেন।

মন্দিরা বাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করে,
ী ঘুমিয়েছে?

এই তো শুল।

জামাইবাবু?

খাওয়া-দাওয়া করে কোথায় বাইরে গেলেন, বলে
ছেন ফিরতে রাত হবে।

কর্তাবাবু?

এখনও খায় নি। তোমার জন্যে বসে আছে।—
াবিন্দর মা গলাটা নামিয়ে নিয়ে বলে, আজ একেবারে
হুঁশ। তুমি গিয়ে একটু খাওয়াও।

মন্দিরা অযথা চেঁচিয়ে ওঠে: জ্বালা আমার, সারাদিন
টে বাড়ি ফিরব, কারুর যদি সেদিকে একটু খেয়াল
কে। একজন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতে গেলেন,
র একজন মাতাল।

গজগজ করতে করতে মন্দিরা নিজের ঘরে ঢুকে
ব্যাগটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। জুতোটা শব্দ করে
খোলে, কলঘরে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে এসে একটা
আটপৌরে শাড়ি পরে নেয়।

মন্দিরাদের এ বাড়িটা পুরনো। আরও বেশী পুরনো
দেখায় বহুদিন মেরামত করা হয় নি বলে। আঁকাবাঁকা
সরু গলির মধ্যে অনেক ঘিঞ্জি পট্টিতে চারদিকের খোলার
চাল আর বস্তীর মাঝে এই একখানাই ছিমছাম পাকা
বাড়ি। এ বাড়ির মালিক ছিলেন মন্দিরার মা—
করুণাময়ী। ছিলেন মঞ্চের অভিনেত্রী। অভিনয় করার
তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। তাই সহজেই মঞ্চে
নেমে তিনি পেলেন সুনাম, দর্শকের কাছে হাততালি
বাহবা, আর রোজগার করলেন টাকা। তার চেয়েও
বেশী যা পেলেন, তা বোধ হয় ভালবাসা। কলকাতার
হালদার-বংশের মেজকর্তা সোমনাথপুরের জমিদার
করুণাময়ীর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ভালবেসে
নিয়ে আসেন এই বাড়িতে। তখন অবশ্য এ বাড়ির
চেহারা ছিল অন্য রকম। ইচ্ছে করে বাড়ির রঙ
করিয়েছিলেন নীল, তখনকার দিনে এ ধরনের রঙ সহজে
চোখে পড়ত না বলে, পাড়ার লোকে এ বাড়ির নাম
দিয়েছিল নীলকুঠি। তখন চারদিকের বস্তী এত ঘন হয়ে
ওঠে নি, বাড়ির চারপাশেও ছিল বেশ খানিকটা জমি,
যা পরে দুর্দিনের সময় করুণাময়ী নিজেই একদিন বিক্রি
করে দিয়েছেন। হালদারবাবুর আমলে বাড়ির দেউড়িতে
থাকত দরোয়ান, অন্দরমহলে ঝি-চাকর। সব সময়
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত প্রত্যেকটি ঘর, আর সেখানকার
সৌখীন আসবাবপত্র। হালদারবাবু ভালবেসেছিলেন
শুধু করুণাময়ীকেই নয়, তাঁর অভিনয়কেও। তাই
সোনার খাঁচার মধ্যে ভরলেও তাঁর অভিনয় করা উনি
বন্ধ করেন নি। প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই তিনি যেতেন
থিয়েটারে, রিজার্ভ করা বক্সে বসে দেখতেন নাটকের
অভিনয় এবং সেই নিয়ে রাত্রে করুণাময়ীর সঙ্গে আলাপও

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

॥ প্রথম খণ্ড : উপন্যাস ॥

'মাদাম বোভারী' (৩)

"Madame Bovary,—C'est moi."
—Gustave Flaubert.

পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে ? মানব-জীবনের এই একমাত্র মহৎ জিজ্ঞাসাই দেশে-দেশে কালে-কালে মহাকাব্যের বুকে বারবার বেজেছে। মহাকাব্যের ফুলে-কাঁটায়, তার আলো-ছায়ার জোয়ার-ভাঁটায়, তার দুঃখে-সুখে-শঙ্কাতে কালের মন্দিরা বেজেছে এই সুরে। শুধু কালের খাতায়, পুঁথির পাতাতেই নয়—নিজের জীবনকে যাঁরা মহাকাব্যের বিশালতা দিয়েছেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কর্মে ও কথায় ফুলের মত ফুটিয়েছেন দলের পর দলে শতদলের মত, আকাশে বাতাসে মেলে দিয়েছেন গানের সুরের পাখা, মধুময় করেছেন পৃথিবীর ধূলিকে, মানবজীবনের চেয়েও মহত্তর আরও কোনও পারের ডাক পড়লে যাঁরা চলে গেলে, তখনও পশ্চিমাকাশে আঁকা থেকেছে একটি নীলাঞ্জনরেখা, সেই যাঁরা স্মরণীয়, যাঁরা বরণীয়, তাঁদেরই একজন, রাজসিংহাসন ত্যাগ করে মানবপ্রেমী যিনি পথের ধারে পেতেছিলেন নিজের আসন তিনিও জানতে চেয়েছিলেন, জানাতে চেয়েছিলেন ওই—পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে ?

সংখ্যা গণনার অতীত প্রত্যূষ থেকে মানবেতিহাসে ভগবানের দূত যাঁরা অন্তর থেকে বিদ্বেষের বিষকে নির্বাসন দিয়ে মানুষের প্রতি বিশ্বাস আর ভালবাসার অমৃতসিঞ্চনের করুণাধারা এনেছেন বহন করে কেবল তাঁরাও নন ; যে অমিতবীর্য দুঃশাসন, রক্তের ভয়ঙ্কর অভিশাপে যে হতভাগ্য মানবপুত্রকে করেছে লাঞ্ছিত, দুঃখপাকে যে অস্বীকার করেছে, দুঃখকে আয়ত্ত করতে চেয়েছে চন্দ্র-সূর্যগ্রহতারাকে, বর্ণোজ্জ্বল যে নক্ষত্রপুঞ্জভরা মানুষের এই বসুন্ধরাকে যুগে যুগে রঞ্জিত করেছে সংখ্যাহীন নিরস্ত্র শিশু এবং নরনারীর রক্তে, বিশ্বাসের যে টলাতে চেয়েছে ভিত, নিদারুণ দুঃসাহসে আঘাতে যে মানুষ চেয়েছে মর্তসীমা চূর্ণ করে কলুষস্পর্শে ক্ষুণ্ণ করতে দেবতার অমর মহিমা, সেই কালাপাহাড়ের বিক্ষুব্ধ অন্তরও হাহাকার করে উঠেছে হত্যার শেষে আত্মহত্যার মুহূর্তে—পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে ?

আর ধার্মিক-প্রেমিক কিছুতেই না হতে পেরে জ্ঞানী-বৈজ্ঞানিক যে সৃষ্টিরহস্যের জটিল গ্রন্থি উন্মোচনে বেছে নিল বিচার আর বিশ্লেষণের যৌক্তিক পথকে, পাথেয় করল যে চরমের পরম উদ্দেশ-অজ্ঞাত জীবনে বিশুদ্ধ জ্ঞানকে, পরিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে করল একমাত্র সম্বল, অবাঙ্মানসগোচরকে যে চাইল প্রত্যক্ষ করতে, জ্ঞানের কঠিন কণ্টক-আসনে বসে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের নিদিধ্যাসনে নিরন্তর মুক্ত যার কণ্ঠে উচ্চারিত হল না এই মন্ত্র : বুঝেছি কি বুঝি নাই বা সে তর্কে কাজ নাই ; ভাল লেগেছিল মনে রইল এই কথাই,—তর্ক সংশয়, অবিদ্যা এবং অবিশ্বাসের পথ যার ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য থেকে অনেকদূরে গেল বেঁকে সেই যে সৃষ্টির রহস্যের দরজার পর দরজা খুলতে খুলতে ঠেকে গেল যেখানে সব দরজা খুলে যায় যে চাবিতে, সে সংকেতেও ব্যর্থ হল যখন বন্ধ দ্বার উন্মুক্ত করতে করতে তখন অবারিত ফেলে আসা পথের আর অতিক্রম করে আসা অতীতের দিকে তাকিয়ে

বোভারী'র লেখক রিয়ালিস্ট না রোমান্টিক সেই ব্যাকরণ-সমস্যা বিচারেই নয় শুধু, জয় হয়েছে ফ্লবেয়ারের কাজের বিচারে। কালোত্তীর্ণ মহিমার মুকুট সেই মুহূর্তেই অলঙ্কৃত করেছে 'মাদাম বোভারী'কে।

অল্প ক্ষমতার অধিকারী কারুর কলমে যা হতে পারত নিছক পর্নগ্রাফী, গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের হাতে তাই হয়েছে ক্ষণিকের আনন্দে উজ্জ্বল চিরন্তন বেদনার পূর্ণিমা।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'মাদাম বোভারী'র পাণ্ডুলিপিতে শেষ দাঁড়ি টানেন ফ্লবেয়ার। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের সমস্ত সত্তা অধিকার করে ছিল যে নারী ডেলামেয়ারের দ্বিতীয় পক্ষ তার উপলক্ষ মাত্র। মাদাম বোভারীর উপস্থিতির মধ্যে অনুপস্থিত লুইজি কোলেকেও আগাগোড়া ছোঁয়া যায় রক্তমাংসের মানুষকে দুহাতে দিয়ে স্পর্শ করা যায় যেমন সহজে। কিন্তু মাদাম বোভারী আসলে কে? এ জিজ্ঞাসা যখনই যে কারণেই উঠেছে তখনই এর একমাত্র যে উত্তরে ফ্লবেয়ার ক্ষান্ত করেছেন পরিচিত অপরিচিত সন্ধিৎসু পাঠক-সমালোচককে তা হচ্ছে ফ্লবেয়ারের এই ইতিমধ্যেই সর্ববিশ্রুত উক্তি: 'Madame Bovary,—C'est moi.' ['Madame Bovary is me'] । এই উক্তি কেবলমাত্র প্রশ্নবাণে উত্ত্যক্ত ফ্লবেয়ার অব্যাহতির আশায় করেন নি। এ উক্তির মধ্যেই অবধারিত বিমূঢ় ফ্লবেয়ারের চরিত্রের অপ্রকৃতিস্থতার রহস্য। এবং এই উক্তির যথার্থ তাৎপর্য ফ্লবেয়ারের চেয়েও যিনি বেশী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনিও কবিকর্মে এবং জীবনযাপনে এক দলছাড়া, গোত্রহারা মানুষ। সমগ্র ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে বিচিত্র, বিশিষ্ট, অনন্য এই কবির পরবর্তীকালে বিশ্বখ্যাত নাম হচ্ছে বোদলেয়ার।

১৮৫৭ সালের ১৮ই অক্টোবর L'Artiste-এ প্রকাশিত হয় বোদলেয়ারের ক্রিটিসিজম্। বোদলেয়ার তখন কবিতার বইয়ের জন্য 'মাদাম বোভারী'র কারণে ফ্লবেয়ারের-মতই অশ্লীলতার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছেন। 'মাদাম বোভারী'র এই সমালোচনা স্বয়ং ফ্লবেয়ারকে নাড়া দিয়েছে সবচেয়ে বেশী। বোদলেয়ার 'মাদাম বোভারী'র চরিত্রের মর্মমূল উদ্ঘাটিত করেছেন শল্যচিকিৎসকের শবদেহ অনাবৃত করার মত নিঃসংশয়ে, নির্দ্বিধায়:

"To accomplish the tour de force in its entirety, it remained for the author only to divest himself (as much as possible) of his sex, and to become a woman. The result is a marvel, for despite all his zeal as an actor he was unable to keep from infusing his male blood into the veins of his creation and Madame Bovary in the most forceful and ambitious sides of her character, and also the most pensive, remained a man."

'মাদাম বোভারী'র মতো ফ্লবেয়ারকে এবং গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের মধ্যে এমনি একান্তভাবে সত্তাবহ স্বয়ং বোভারীর স্রষ্টাও নিরীক্ষণ করতে সক্ষম হন নি।

সন্তান জন্মদানের কষ্ট এবং আনন্দের সঙ্গেই কেবল তুলনা চলে তার মহৎ কাজ work of art। শিল্পসৃষ্টির রহস্য সন্তানজন্মের মতই একই সঙ্গে চরম কষ্ট এবং পরম গৌরবের মহিমায় রোমাঞ্চকর। সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন জননী দশমাস, মাদাম বোভারীকে সম্পূর্ণ চিন্তার অর্থমুক্ত করতে গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের লেগেছিল পঞ্চান্ন মাস। কোনও কোনও সময়ে মনে হয়েছে তাঁর থেমে গেছে বুঝি প্রাণের স্পন্দন। মাদাম বোভারী যখন বিষ খেয়েছে তখন তার স্রষ্টার সত্যসত্যই বমনোদ্রেক হয়েছে শোনা যায়। এবং সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার এমন একাত্মতার কথা বিশ্বসাহিত্যের বিচিত্র ইতিহাসেও একবারের বেশী শোনা যায় না। কিন্তু মাদাম বোভারী দিনের আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ভোগ শেষ হয় না তার introvert স্রষ্টার। নির্জনতার খোলস ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হয় শিল্পীকে আদালতের প্রকাশ্য অশালীনতার অন্তরালোকে। আদালতের মামলা শেষ হয় না এক সময়ে; শেষ হয় না পাঠকের মুখে মুখে 'মাদাম বোভারী' আর তার স্রষ্টাকে নিয়ে কুৎসিত আলোচনার খই ফোটার।

left broken, breathless, inert, sobbing in a low voice, with flowing tears." অন্য যে-কোনও লেখক হলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই Rodolphe-কে স্মরণ, ফ্লবেয়ার তার বদলে এনেছেন বোভারীর ভৃত্যকে : "'Why don't you tell master ?' The servant asked her when she came in during these crisis."

"'It is the nerves', said Emma. 'Do not speak to him of it ; it would worry him'." তার উত্তরে বোভারীর ভৃত্য Felicite একটি অবিবাহিত মেয়ের অনুরূপ কান্নার কথা মনে পড়ায় বলল : "When she was taken too bad she went off quite alone to the sea-shore, so that the customs officer, going his rounds, often found her lying flat on her face, crying on the shingle. **Then, after her marraige, it went off, they say.**"

এর পর মাদাম বোভারীর মুখ দিয়ে ফ্লবেয়ার যে কথা বলিয়েছেন তারই মধ্যে রয়েছে মাদাম বোভারীর নিজের জীবন দিয়ে রোমান্টিক বিদ্রোহের প্রথম বীজ :

"'But with me,' replied Emma, 'it was after marriage that it began.'"

'মাদাম বোভারী' বিশ্বসাহিত্য স্টাইল অথবা ক্যাফে-টেবিলের জন্যে নয়। বিবাহিত রমণীর পদস্খলনের উত্তেজক ইন্দ্রিয় উপভোগের কারণে যারা 'মাদাম বোভারী' পড়বে তারা বিশ্বসাহিত্যের পাঠক নয় কোনও দিন। 'মাদাম বোভারী' উপলব্ধির বিষয়, নিছক উপভোগের বস্তু নয়। ক্যাফে, স্টাইল, বিলিনিং, মিডল্, এদের অতিক্রম করে এই উপন্যাস মানবজীবনের চরম সত্যকে উদ্ঘাটনের মহিমাতেই চিরন্তন সাহিত্য। সে সত্য হচ্ছে মানুষ যা চেয়েছে তা পায় নি ; যা পেয়েছে তা চায় নি। চেয়ে না পাবার বেদনা, পেয়ে না চাওয়ার চিরন্তন ব্যর্থতাই মাদাম বোভারীর মুখে তুলে দিয়েছে জীবনের সুধা বলে যাকে সে মনে করেছিল, আসলে যা মৃত্যুর গরল। 'মাদাম বোভারী' মানবজীবনের মধুযামিনী নয় ; তার চিরন্তন বিরহের অমানিশি।

মাদাম বোভারী যাকে বিবাহ করেছিল তাকে সে চেয়েছিল কিন্তু পেয়েছিল যখন তখন আর চায় নি :

"But the moment after marriage, she returns to her restless dreams. For Bovary represents the commonplace Here, and Emma is always yearning for that glorious Elsewhere."

ঠিক এই সময় Leon এসে পৌঁছয় তার জীবনে : "A brief moment of ecstasy, a peep into the heaven beyond the horizon, and then he leaves her."

আবার মাদাম বোভারী ফিরে যায় বিবশ নিজের বিরস ঘরে, "Reality once more—heavier, duller, more oppressive than ever."

তারপর শুরু হয় নতুন প্রেম, প্রথম সমর্পণ : "A new dream, with her new lover (Rodolphe)." স্বপ্নভঙ্গ হয় অনতিবিলম্বেই, এবং ফলে : "Her actual world is unbearable, her romantic world is shattered and there is nothing left but forgetfulness. She seeks this forgetfulness in a frenzy of sensual excitement."

এবং তারই ফলে "And thus she falls from degradation to degradation.—She has even stopped dreaming. Her life has become a confused, desperate and panicky escape."

সর্বশেষ পতনের মুহূর্তে : "And then, the final choice between the gutter and the grave. Emma choses the grave. For the gutter would be but another relapse into reality. But death is that fearful, hopeful journey beyond the horizon. The last great excursion into the land of Romance.

Emma Bovary is romantic to the end."

উপরোক্ত ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারী' পড়ে আমরা আর একবার জানতে পারি এই চরম সত্য যে মানুষের স্বপ্ন কোনও দিন সত্য হয় না, কিন্তু মানবজীবনের একমাত্র সত্য—মানুষের স্বপ্ন।

[ক্রমশ]

ঘুরে বেড়াত। সবকিছু মিলে সেই দুপুরগুলি মনে কেমন যেন একটা স্বপ্ন-রঙিন মায়া ছড়িয়ে দিত। নির্জনে গাছের ছায়ায় বসে মুখরোচক খাবার খেতে খেতে কত গল্প করতুম। মনের কথা বলতুম।

আজ হঠাৎ বইটা নাড়াচাড়া করতে করতে, বইয়ের পৃষ্ঠায় খোকনের দেওয়া জলছবিটা আর তার হাতের লেখাটা দেখতে দেখতে ছেলেবেলার কতশত ঘটনার কথা, কত সুখদুঃখের স্মৃতি মনে জাগছে। মনে পড়ছে সেই কবে এক বিকেলে আমি আর খোকন হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে চলে গিয়েছিলুম, গঙ্গার ধারে বসে সূর্যাস্তের শোভা দেখেছিলুম। মনে পড়ছে পৌষ সংক্রান্তির দিনে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়ে খোকনের মায়ের সেই পিঠে খাওয়ানোর কথা। মনে পড়ছে খোকনের বাবার সঙ্গে দোলপূর্ণিমার রাতে ঘোষপাড়ার মেলা দেখতে যাওয়ার কথা। খোকনের সঙ্গে কাটানো সেই দুপুর, সেই বিকেল, সেই সন্ধ্যা, সেই জোছনা-মাখা রাত্রি—কাঁচরাপাড়ার সেই পথঘাট, সেই নির্জন পুকুরপাড়, পালেদের ভুতুড়ে আমবাগান—পঁচিশ বছর আগের সে অতীত জীবনের কত হাসিকান্না ব্যথা-বেদনা কত জীবনতরঙ্গের স্মৃতি আমার মনকে কেমন যেন বিষণ্ণ করে তুলল। বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

কোথায় হারিয়ে গেছে সেই দিনগুলি। হারিয়ে গেছে খোকনও।

তাই ভাবি, মানুষ কী ভাবে আর কী হয়। কে ধারণা করতে পেরেছিল যে খোকনের জীবনের একদিন ওই পরিণতি হবে! সমাজব্যবস্থার কি নির্মম পরিহাস!

হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি বলব। তা না হলে যার অমন অসাধারণ মেধা, অমন চারিত্রিক মাধুর্য ছিল তাকে ওই অল্পবয়সে লেখাপড়া ছাড়তে হল কেন! কেনই বা অত অল্পবয়সে জীবিকার জোয়ালে বাঁধা পড়তে হল! কতই বা তখন ওর বয়স—আট কিংবা নয়। হ্যাঁ, ওই রকমই হবে। বেশ মনে আছে আমরা তখন ক্লাস থ্রীতে পড়ি। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে। ঠিক সেই সময়ই খোকনের বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। মারা গেলেন বড় অদ্ভুতভাবে। দোকানে খাতা লেখার কাজ সেরে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়িতে ঢোকার সময় দরজার চৌকাঠে হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে উঠোনের উপরে পড়ে যান। সেই যে পড়ে গেলেন আর উঠে দাঁড়াতে পারলেন না।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে ব্যাপারটা শুনে আমরা রীতিমত হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। প্রথমে যেন ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারি নি। তারপর অবিশ্বাসটা দূর হল যখন দেখলুম খোকন স্কুলে আসে নি।

সেদিন স্কুলের লেখাপড়ায় আর একটুও মনোযোগ দিতে পারি নি। খোকনের শুকনো মুখটা আর খোকনের মায়ের সেই স্নেহময়ী রূপটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আর একটা গভীর বেদনায় বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠছে।

সেদিন ছুটির পর ওদের বাড়িতে যাব ঠিক করেছিলুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারি নি। বাইরে থেকে খোকন আর তার মায়ের কান্না শুনে দরজার কাছ থেকে ফিরে এসেছিলুম।

সেই কান্না অনেক দিন পর্যন্ত আমার কিশোর হৃদয়কে কাতর করে রেখেছিল। তাই দীর্ঘদিন ওদের বাড়িতে যেতে পারি নি। ওদের শোকের দৃশ্যটা চোখের আড়ালে রাখতে চেয়েছি।

ভেবেছিলুম শোকের ধাক্কাটা অপসারিত হলে খোকন আবার স্কুলে আসবে। বৃত্তিপরীক্ষার জলপানি পাওয়ার জন্যে আবার লেখাপড়ায় মনোযোগ দেবে। কিন্তু ও আর আসে নি। সেই যে আসা বন্ধ করেছিল তারপর থেকে আর কোনদিন আসে নি। ওর জন্যে মাঝে মাঝে মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠত। তাই মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন ওদের সেই বাড়িতে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখি ওরা আর সে বাড়িতে নেই, সেখানে নতুন ভাড়াটে এসেছে। ওরা কোথায় যেন চলে গেছে।

তারপর অনেক দিন ওদের আর কোনও খোঁজখবর পাই নি। প্রায় চার-পাঁচ মাস পরে হঠাৎ একদিন খোকনের সঙ্গে বড় অদ্ভুতভাবে দেখা হয়ে গিয়েছিল।

দুর্গাপুজোর রাতে পুজো দেখে বাড়ি ফিরছিলুম। বাজারের কাছে ওর সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন পরে দেখা পেয়ে আমি আবেগে ওর হাতটা চেপে ধরেছিলুম। বেশ মনে আছে, কিছুক্ষণ আমরা কোনও কথা বলতে পারি নি। ও আমায় অপলকে দেখছিল। আমিও ওকে দেখছিলুম। ও কি দেখছিল জানি না। আমি দেখছিলুম ওর চেহারা, ওর বেশবাস। চার-পাঁচ মাসে কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। একমাথা রুক্ষ চুল, মুখটা কেমন যেন ম্লান বিশীর্ণ, গায়ের জামা আর প্যান্টটা ছেঁড়া ময়লা চিটচিটে। দেখে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছিলুম, ওর বাবার মৃত্যুর পর ওদের সংসারের অবস্থা খুবই সংকটজনক। আত্মীয়স্বজনদের ভেতর ওর এক কাকা নৈহাটিতে থাকতেন। আগে ওদের বাড়িতে প্রায় আসতেন। ওর বাবার মৃত্যুর পর তিনিও আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। বেশী ভাড়া দিতে হয় বলে ওরা আগের বাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে। পালপাড়ার গলায় একটা খোলার ঘর ভাড়া নিয়েছে। ও বাজারের কাছে একটা খাবারের দোকানে পাঁচ টাকা মাইনের কাজ করে। ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ফাই-ফরমাশ খাটে। সেখানে ও বড় কষ্টে আছে। অত ভোরে ঘুম ভাঙে না, আর অত রাত্রি পর্যন্ত তার জাগাও অভ্যেস নেই। ভোরে যেতে দেরি হয়ে যায়। রাত্রে দোকানে সে ঘুমের ঘোরে ঝিমোয়। এর জন্যে দোকানের মালিকের হাতে প্রায় দিনই চড়চাপড় খায়।

কথাগুলো বলতে বলতে সেদিন খোকনের চোখে জল এসে গিয়েছিল। ওর চোখের জলে আমারও হৃদয় আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোন সান্ত্বনাই দিতে পারি নি। কি বলেই বা সান্ত্বনা দেব। অব্যক্ত যন্ত্রণাটা শুধু বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠেছে।

এর অনেক দিন পরে আবার যেদিন খোকনের সঙ্গে দেখা হল সেদিন জানতে পারলুম, খোকন সেই খাবারের দোকানের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকেছে। সেদিন রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে খোকন তার দুঃখের আরও অনেক ইতিহাস শোনাল। বলল—এ চাকরিটাও ভাল লাগছে না। এখানেও তার পোষাচ্ছে না। কে একজন যেন তার জন্যে অন্য কোথায় কাজের চেষ্টা করছে। সেটা পেয়ে গেলে এ চাকরি ছেড়ে দেবে।

তারপর এমনি করেই ওর জীবনের কয়েকটা বছর কেটে গেল। এ দোকান থেকে সে দোকান—সেখান থেকে আবার অন্য এক জায়গায়।

এমনি অবস্থায় ভেতর জীবনটা যখন হাঁসফাঁস করছে ঠিক সেই সময় আমাদের প্রায় তিনটে গ্রাম জুড়ে আমেরিকানদের সামরিক ঘাঁটি বসল। সারা অঞ্চলটা খাকী পোশাক, জীপ, বুলডোজার আর লরীদের [illegible] ভরে গেল। আকাশে ফাইটার বোমার আর নীচে অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট-গানের আওয়াজে মহড়ায় কান ঝালাপালা। চারিদিকে শুধু যেন হুল্লোড় আর মস্করা। আর এই প্রমত্ত হাওয়ায় যেন টাকা উড়তে লাগল—কাগজের টাকা। মানুষ সেই টাকা ধরার ফিকিরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আলোয় আঁধারে উপার্জন করার [illegible] নানারকম পথ। যে যে-পথে পারল নেমে পড়ল। কত চাষ ক্ষেত খামার ছাড়ল। কত মেয়ে ইজ্জত দিল। কত লোক পুরনো চাকরির মায়া কাটাল।

খোকনকেও দেখা গেল জীপে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুনলুম, আমেরিকান সোলজারদের ক্যাম্পে কি একটা চাকরি করে। ভাল মাইনে পায়। তার ওপর আছে উপরি। কথায় কথায় সাহেবদের বকশিশ। এ ছাড়া শার্ট, প্যান্টুল, সিগারেট, হুইস্কি, মুঠো মুঠো চকোলেট, বিস্কুট ইত্যাদি তো আছেই।

দেখলুম, ওর চেহারা বেশবাস কথাবার্তা সবকিছুই পালটেছে। শার্ট, প্যান্ট, বেল্ট, জুতো, আলবার্ট করা চুল আর ঠোঁটের সিগারেট সব সময় যেন সাহেবিয়ানা জাহির করার চেষ্টা। মুখে শিস আর মাঝে মাঝে [illegible] বাজারে চালু হওয়া দু-চারটে ইংরিজি বুলি। চলন্ত জীপে মত্ত অবস্থায় সৈনিকদের সঙ্গে হুল্লোড় করে যেতে যেতে আমাকে যদি কখনও চোখে পড়েছে তো 'হ্যাল্লাউ জনি' বলে অদ্ভুত ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে সম্বোধন করেছে।

ওর এই ডাক, এই গায়ে পড়ে আলাপ করার ভঙ্গীটা তখন আমি এড়িয়ে চলতে চেয়েছি। কারণ, ছেলেবেলার সে উচ্ছলতা তখন আর নেই। বয়স এবং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতর মান-অপমান এবং শালীনতাবোধটা জেগেছে। তাই ওকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলেছি।

তবু ওর প্রতি মনের কোণে কোথায় যেন একটু সহানুভূতি ছিল। বাইরে নতুন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সম্ভ্রম বজায় রাখার জন্যে ওকে এড়িয়ে চললেও অন্তরে ওর প্রতি সহানুভূতি ছিল। ভাবতুম, ও যাই হোক, ওর জীবনের অর্থকরী দিকটা তো সচ্ছল হয়েছে।

কিন্তু এই সচ্ছলতাও ওকে বেশীদিন ভোগ করতে হল না।

দীর্ঘদিন অদর্শনের পর হঠাৎ একদিন রেলস্টেশনে অদ্ভুত চেহারায় অদ্ভুত বেশবাসে ওকে ঘোরাফেরা করতে দেখে জিজ্ঞেস করলুম, কি ব্যাপার? হঠাৎ আবার এই অবস্থা কেন! ক্যাম্পে আর কাজ করিস না?

না, সে চাকরি গেছে।

কেন, কি হয়েছিল?

প্রথমটায় বলতে ও একটু ইতস্ততঃ করছিল। তারপর সবকিছু একে একে বলল। কি একটা চুরির ব্যাপারে নাকি ওর চাকরি চলে যায়। তিন মাসের জেলও হয়। কিছুদিন আগে জেল থেকে বেরিয়েছে।

ও আমার সঙ্গে যখন কথা বলছিল তখন পেছন থেকে একটা লোক এসে ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, কি রে বেটা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস, আর আমি যে চক্কর মেরে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। চল্ তাড়াতাড়ি।— বলে লোকটা টানতে টানতে ওকে স্টেশনের বাইরে নিয়ে গেল।

ব্যাপারটা দেখে আমি কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গেলাম। লোকটাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। চিনি অর্থাৎ ওর কার্যকলাপের কথা জানি। লোকটা এ অঞ্চলের কুখ্যাত দাগী। চুরি-ডাকাতির ব্যাপারে বেশ কয়েকবার ধরা পড়েছে। তাই ওর সঙ্গে খোকনের ঘনিষ্ঠতা দেখে অবাক হলুম। বেদনা অনুভব করলুম, ওর পরিণতিতে। ছেলেবেলায় দেখে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া সেই বুদ্ধিমান মেধাবী মধুর চরিত্রের ছেলেটির চেহারা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

তারপর পথেঘাটে খোকনকে ওই দাগী লোকটার সঙ্গে এবং ওই রকম চরিত্রেরই আরো কয়েকজনের সঙ্গে প্রায় ঘোরাফেরা করতে, বসে আড্ডা দিতে দেখেছি। ক্রমে ওর সম্পর্কে অনেক কিছুই শোনা যেতে লাগল। ইতিমধ্যে দু-চারবার জেল এবং হাজতবাসও হয়ে গেছে এবং তাইতে পুলিশের সঙ্গে ওর বেশ একটা চেনা-জানার সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। অনেকদিন দেখেছি কোনো পুলিশকে নিয়ে কোনও খাবারের দোকানে বা চায়ের দোকানে বসে খাচ্ছে বা তার সঙ্গে মস্করা করছে। তিন-চারেক বছর ওর জীবনটা এইভাবেই কাটল।

এই সব দেখে চোখ দুটো অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। আর অবাক হতাম না। বেদনাবোধটাও মন থেকে উবে গিয়েছিল। পথেঘাটে ওকে পুরোপুরি এড়িয়েই চলতাম।

তারপর দীর্ঘদিন—বোধ হয় বছরখানেক ওকে আর দেখি নি। ভেবেছিলুম, আবার বুঝি ও জেলে গেছে। কিন্তু না, কার মুখে একদিন যেন শুনলুম, ও আর এখানে থাকে না। চুরি-ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে কোথায় যেন ছোটখাটো একটা দোকান করেছে। একটি মেয়েকে বিয়েও করেছে। মা আর বউকে নিয়ে বেশ সুখেই ঘর-সংসার করছে।

কথাটা শুনে সেদিন বড় খুশী হয়েছিলুম। তারপর ওর সঙ্গে একদিন হঠাৎ দেখাও হয়ে গিয়েছিল। বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপে মুখোমুখি দেখা।

দীর্ঘদিন পরে আমাকে দেখে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরল। জিজ্ঞেস করল, কি রে, কেমন আছিস?

ভাল। তুই কেমন?

ভিড়ের মধ্যে প্রথমটায় বুঝতে পারি নি। পরে বুঝলুম, মাথায় সামান্য ঘোমটা-টানা যে যুবতী মেয়েটি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ভাবুক চোখে আড়ে আড়ে

আমাদের দিকে তাকাচ্ছে সে খোকনেরই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে—তোর বউ নাকি?

হ্যাঁ।—বলে খোকন একটু হাসল।

বাঃ, বেশ তো মেয়েটি!

হঠাৎ আমার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল। হাসতে হাসতে বললুম, তা ওকে অত দূরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস কেন। ডাক না।

খোকন ওর নাম ধরে ডাকল। ওর 'শ্যামা' নামটি আর খোকনের ডাকটি আমার কাছে বেশ বড় ভাল লাগল। মেয়েটিকে মুখ চোখে দেখতে দেখতে নামটি আমি মনে মনে কয়েকবার উচ্চারণ করলাম।

শ্যামা ধীর পায়ে নম্র নত চোখে কাছে এসে দাঁড়াল।

খোকন বলল, শ্যামা, এ আমার ছেলেবেলার সেই বন্ধু সত্যেন—যার কথা মা তোমায় একদিন বলছিলেন।

শ্যামা তার লাজনম্র চোখ দুটি তুলে আমার দিকে একবার তাকাল। বড় ভাল লাগল ওর চাউনিটুকু। ওর আবেশ জড়ানো চোখ দুটির দিকে আমি অপলকে তাকিয়ে থেকে বললাম, আমার কথা মাসীমার এখনও মনে আছে! আশ্চর্য তো!

খোকন বলল, আশ্চর্যই বটে। মা সহজে কিছু ভোলেন না। তুই ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে গিয়ে কি কি করতিস সে-সব কথা তাঁর এখনও বেশ মনে আছে। প্রায়ই তো সে-সব কথা বলেন।

খোকনের মায়ের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মনটা হঠাৎ যেন কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। আমার মন থেকে তাঁর স্মৃতি তো প্রায় মুছেই গেছে, অথচ তাঁর মনের মণিকোঠায় আমার স্মৃতি তো আজও অক্ষয় হয়ে আছে! আশ্চর্য মায়েদের মন!

অজয়ছিলায় ওদের কি জানি কেন মনে একটা বেদনা অনুভব করলুম। অনেকক্ষণ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চুপ করে থেকে একসময় বললুম, কতদিন মাসীমাকে দেখি নি। কেমন আছেন রে?

ওই এক রকম আছেন আর কি।—খোকন বলল, একদিন আমাদের বাড়িতে চল্ না। তোকে দেখলে মা কত খুশী হবে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে খোকন আবার বলল, একটা ছুটির দিন দেখে চল্। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করবি।

এতক্ষণ অন্যদিকে ফিরে ছিলুম, কথার ফাঁকে ফিরে হঠাৎ চোখে পড়ল শ্যামাও আমার দিকে সাগ্রহদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। লাজুক মেয়েটির এই নীরবতা অথচ অন্তরের আগ্রহ দেখে আমার মনে হঠাৎ যেন একটা কৌতুকবোধ জেগে উঠল। ওর মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসতে হাসতে খোকনকে বললুম, তা না হয় বুঝলুম, কিন্তু এখন তোর মায়ের খুশী-অখুশী হওয়ার প্রশ্নটাই তো বড় নয়, এখন তোর সংসারে যে নতুন কর্ত্রী এসেছেন তাঁর মতামতটাও যে একবার জানা দরকার। তিনি যদি আবার আমার যাওয়াটা উপদ্রব বলে মনে করেন তা হলেই তো মুশকিল।

কথাটায় কাজ হল। আমার কথায় হেসে ফেলে শ্যামা এবার জবাব দিল, ও মা, তাই আবার কেউ ভাবে নাকি! আপনি যাবেন সে তো আমাদের সৌভাগ্য।

সৌভাগ্যটা কার তা এখন কি করে বলি। আপনার হাতের রান্না খাওয়াটাও তো কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

শ্যামা এবার লজ্জা পেয়ে হাসতে লাগল। খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে আমি খোকনকে বললুম, চল, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাক।

সেদিন হাঁটতে হাঁটতে আরও অনেক কথা হল। সেই কথাবার্তায় জানতে পারলুম, খোকন কাছেই একটা গ্রামে পাঁচ কাঠা জমি কিনে ঘর তুলেছে। গ্রামের হাটতলায় একটা ছোটখাটো দোকান করেছে। তাইতেই কোনওরকমে চলে যায়। সেদিন ওর কথাবার্তায় বুঝতে পারলুম, ওর স্বভাবটা পুরোমাত্রায় বদলে গেছে।

কিন্তু এমন তো সাধারণতঃ হয় না। বড় অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। এমন অভাবনীয় ব্যাপারটা যে কী করে সম্ভব হল তা আমি সেদিন বুঝতে পারি নি।

জেনেছিলুম কয়েকদিন পরে—খোকনদের বাড়ি গিয়ে ওর মায়ের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা শুনে।

হ্যাঁ, খোকনদের বাড়িতে শেষ পর্যন্ত একদিন গিয়েছিলুম। না গিয়ে উপায় ছিল না। খোকনকে উপেক্ষা করা যদি বা সম্ভব ছিল কিন্তু ওই নম্র মিষ্টি স্বভাবের মেয়েটির অনুনয়ভরা চোখ দুটিকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। সেদিন বিদায় নেওয়ার আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ও বারবার অনুরোধ করেছিল, যাবেন, অতি অবশ্য যাবেন কিন্তু, গেলে খুব খুশী হব।

তাই এক ছুটির দিনে কিছু মিষ্টি হাতে নিয়ে ওদের বাড়িতে গেলুম। খোকন বাড়িতে ছিল না। শ্যামা কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠোন পরিষ্কার করছিল। আমাকে দেখে খুশীতে ওর মুখটা ভরে উঠল। অাহ্লাদে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, মা দেখবেন আসুন, কে এসেছে!

কে?—বলে ঘর থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁকে দেখে আমি চমকে উঠলুম। রোগে শোকে অশান্তিতে বার্ধক্যে চেহারার এত পরিবর্তন হয়েছে যে দেখে মোটেই চেনবার উপায় নেই। ওঁরও বুঝি আমার মত অবস্থা। ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে পরে শ্যামার দিকে জিজ্ঞাসুচোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কে?

শ্যামার চোখেমুখে কৌতুকের ছটা। হাসতে হাসতে বলল, চিনতে পারলেন না তো?—একটু থেমে শ্যামা আবার বলল, উনি আপনার ছেলের বন্ধু—সেই পরমেশবাবু।

ও মা, তাই নাকি!—বলতে বলতে বৃদ্ধার মুখ খুশীতে ভরে উঠল। তিনি এগিয়ে আসার আগেই আমি কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। আমার পিঠে হাত রেখে তিনি বললেন, বেঁচে থাক বাবা। তা এতদিন পরে তোমার অভাগিনী মাসীমাকে মনে পড়ল।

মাসীমার এই অনুযোগে বড় লজ্জা পেলুম। কোন জবাব দিতে পারলুম না। মাসীমা বললেন, চল, ঘরের ভেতর বসবে চল। কতদিন পরে দেখা বল তো!

আমি বললুম, ঘরে নয়, বাইরেই একটা কিছু পেতে দিন। এইখানে বেশ হাওয়া আছে।

শ্যামা এতক্ষণ উঠোনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছিল। এবার সে দ্রুত পায়ে ঘরের ভেতর গিয়ে একটা মাদুর এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দিল। আমি তার হাতে মিষ্টির ঠোঙাটা দিয়ে বললুম, এটা রেখে দিন।

মাসীমা বললেন, ও মা, তুমি আবার ওর সঙ্গে 'আপনি আজ্ঞে' করে কথা বলছ কেন। ও তোমার চেয়ে কত ছোট, ওর নাম ধরেই তুমি ডাকবে।

কথাটা শুনে শ্যামা যেতে যেতে চট করে ফিরে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, তা হলে তো আমাকেও একটা সম্পর্ক পাতাতে হয়।

হ্যাঁ নিশ্চয়।—মাসীমা বললেন, তুমি ওকে দাদা বলে ডাকবে।

আমি খানিকক্ষণ অবাকচোখে শ্যামার দিকে তাকিয়ে রইলাম। রাস্তায় যে মেয়েটিকে দেখে অতি লাজুক অতি অসহায় বলে মনে হয়েছিল, দেখলুম নিজের সংসারের গণ্ডীর ভেতর সে রীতিমত তরুণময়ী। এই ছোট্ট সংসারে তারই জীবনের তরঙ্গটা যেন বেশী করে অনুভব করলুম। দেখলুম মাসীমাও শ্যামাকে বড় ভালবাসেন। শ্যামার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শ্যামা যখন পুকুরে চান করতে গেল তখন মাসীমা আমাকে একে একে অনেক কথাই বললেন, জান পরমেশ, ওই মেয়েটিই আমার সংসারের লক্ষ্মী। ও না থাকলে আমি জীবনের শেষ বয়েসে এই সামান্য সুখটুকুরও মুখ দেখে যেতে পারতাম না। আর খোকনকেও এমনই করে ফিরে পেতাম না।

আমি মাসীমার কথায় সায় দিয়ে বললুম, সত্যিই মেয়েটি খুব ভাল। একে আপনি পেলেন কেমন করে?

আমার কথা শুনে মাসীমা একটু হাসলেন। হেসে বললেন, আমি পাই নি বাবা। ওরা নিজেরাই—মানে আর কি, বিয়ের আগেই ওদের ভেতর ভাবসাব হয়েছিল।

তাই নাকি!—মাসীমার কথা শুনে আমি একটু অবাক হলুম। বললুম, বাঃ বেশ ব্যাপারটা তো!

মাসীমা হাসতে হাসতে বললেন, হ্যাঁ, ওই আজকালকার ছেলেমেয়েদের যা হচ্ছে আর কি।

মাসীমা যা ভাবছিলেন আমার চিন্তা সে খাতে বইছিল না। আমি ভাবছিলুম শ্যামার কথা। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এ যুগেও কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে একটি পুরুষের চরিত্র শুধরে যেতে পারে। অথচ ব্যাপারটা যে ঘটেছে তাতে তো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই শ্যামার চারিত্রিক মাধুর্যের ওপর আমার মুগ্ধতা আরও বেড়ে গেল।

সেদিন সারাটা দিনই ওদের বাড়িতে থাকলুম। আমার আসার খবরটা শ্যামা কাকে দিয়ে যেন হাটতলায় খোকনের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। আমি যাওয়ার খানিক পরেই খোকন দোকান বন্ধ করে বাড়িতে এসেছিল। তাই সারাটা দিন খাওয়াদাওয়া হৈ-হল্লা করে বেশ আনন্দেই কাটল। দেখলুম, শ্যামার সঙ্গে খোকনের সম্পর্কটা বড় অদ্ভুত। কথায় কথায় ওদের ভেতর খুনসুটি লেগেই আছে। খোকন নানা কথা বলে শ্যামাকে রাগিয়ে দেয়। কখনও বা পেছন থেকে টেনে ওর খোঁপাটা খুলে দেয়। শ্যামাও কম যায় না। তারও

থাকত সে যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল। কারুর সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে পারত না।

ইতিমধ্যে ওর আবার একটা ছেলে হয়েছিল। তার জন্যেও ভাবনা। ভাবনা—কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। সংসারে কোথাও ওর মাথা গুঁজে থাকার মত ঠাঁই ছিল না। ছেলেবেলায় মা-বাপ হারিয়ে মাতাল এক মামার সংসারে অনেক দুঃখকষ্টে লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় মানুষ হয়েছিল, সেখানে ফিরে যেতে তার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না।

তবে কোথায় যে শেষ পর্যন্ত গেল তাও কেউ জানে না। বাড়িটা বেচে যা অল্প টাকা পেয়েছিল তাতে ধার-দেনা মিটিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে একদিন পথে বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর আর কেউ ওর খবর রাখত না।

তারপর দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ একদিন অদ্ভুতভাবে শ্যামার দেখা পেয়েছিলুম। দেখে চমকে উঠেছিলুম।

একটা দেশী কোম্পানির ওষুধ প্রচারের কাজে আমাকে নানান জায়গায় ঘুরতে হয়। বছর দুই আগে এই কাজে সেদিন রানাঘাটে গিয়েছিলুম। সেখানে একটা বড় ডাক্তারখানায় বসে ডাক্তারের সঙ্গে যখন আলাপ করছিলুম ঠিক সেই সময় কতকগুলো লোক ধরাধরি করে একটা আট-ন বছরের ছেলেকে এনে ডাক্তারখানার বেঞ্চটায় শুইয়ে দিয়ে বলল, ডাক্তারবাবু, একে একটু দেখুন।

ডাক্তার শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, কি ব্যাপার—জ্ঞান হারাল কি করে?

মার খেয়ে—লোকগুলো বলল।

ডাক্তারবাবু বিস্মিত গলায় বললেন, সে কি! এইটুকু ছেলেকে কে এমন মারল!

ডাক্তারবাবুর প্রশ্নে লোকগুলো যা বলল তার সারমর্ম এই—ছেলেটা একটা চায়ের দোকানে কাজ করে। ভোর পাঁচটায় এসে বেলা দুটোয় ছেড়ে সাকুল্যে দুটি পায়। এইটুকু ছেলে অতখানি বেলা পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারে না। তাই বুঝি খিদের জ্বালায় দোকানের বয়াম থেকে লুকিয়ে একটা কেক তুলে নিয়ে খেয়েছিল। দোকানের মালিক পরে কি করে যেন তা টের পেয়ে ওকে ধরে মার দেয়। মালিকের হাতের দুটো চড়েই ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তাইতে মালিক ভাবে, ছেলেটা বুঝি ভান করে পড়ে আছে। এই ভেবে সে ছেলেটার চাতুরি পরীক্ষা করার জন্যে কোথেকে কিছু বিছুটি পাতা এনে ওর সারা গায়ে ঘষে দেয়।

সমস্ত ব্যাপারটা শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, তা সেই কসাই বেটাকে তোমরা কি করলে?

কি আর করব বাবু, সে বেটা লোকজন জমতে দেখেই পালিয়েছে।

ডাক্তারবাবু লোকগুলোকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে ছেলেটার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে আমার কাজ মিটে গিয়েছিল। আপিসটা গুছিয়ে আমি উঠব উঠব করছিলুম, ঠিক সেই সময় ছিন্ন তেল চিটচিটে ময়লা বেশবাসে রুক্ষ ম্লান চেহারার যে মেয়েটি উদ্‌ভ্রান্তের মত কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকেছিল—তাকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলুম।

শ্যামা!

চিনতে একটুকু কষ্ট হল না। তবু যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। ওর চেহারা এবং বেশবাসের দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো যেমন যেন ধমকে গিয়েছিল। দুরন্ত বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠছিল। হাসিখুশী আনন্দ উচ্ছল যে শ্যামাকে দেখেছিলুম সেই শ্যামাকে এই অবস্থায় দেখে সহ্য করতে পারছিলুম না। অথচ ওকে দেখে কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত হয়ে পড়েছিলুম। কী করা উচিত ভেবে ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত নিজের আপিসটা তুলে নিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছি।

ভাগ্য ভাল যে শ্যামা আমায় দেখে নি। ওদিকে লক্ষ্য করার মত তখন ওর মনের অবস্থা ছিল না।

পরে এই পলায়নী মনোবৃত্তির জন্য নিজেকে অনেকদিন ধিক্কার দিয়েছি। আবার অনেক সময় ভেবেছি—আমার কী এমন সামর্থ্য আছে যা দিয়ে আমি শ্যামার দুঃখ দৈন্য দূর করতে পারি। বরং এই ভাল করেছি। ওর সঙ্গে সেদিন কথাবার্তা হলে ওকে এড়িয়ে চলা খুব মুশকিল হত।

শ্যামার সঙ্গে সেই দেখা হওয়ার পর কয়েকটা দিন মনটা কেমনই টানাপোড়েনে কেটেছিল। তারপর সংসারের সুখদুঃখের চাপে শ্যামার স্মৃতিটা মন থেকে প্রায় মুছেই গিয়েছিল। মুছে গিয়েছিল আরও অনেক স্মৃতি।

আজ সেই শৈশবের পড়া বইটি ঘাঁটতে ঘাঁটতে এবং বইয়ের ভেতর গোকুলের দেওয়া সেই ছবিটা আর তার হাতের লেখাটা দেখতে দেখতে গোকুলের কথা এবং তার সঙ্গে আরও অনেকের কথা মনে পড়ে গেল।

কাগজওয়ালার সমস্ত বই ওজন করা হয়ে গিয়েছিল। আমার হাতের বইটা দেখে বড়দা বলল, ওটা আবার রেখে দিলি কেন? দিয়ে দে। জঞ্জাল সব সাফ করে দে।

না, থাক এটা।—বলে বইটার ধুলো ঝেড়ে আমি সযত্নে রেখে দিলাম।

মধ্যে আমাকে আরও পাই। তাহার মধ্যে আমি যেন অমিততর হইয়া উঠি। এইজন্য সে আমার আত্মীয়, আমার আত্মাকে আমার বাহিরেও সে সত্য করিয়া তুলিয়াছে।" (সাহিত্য, পৃ ২৬)

কাজেই দেখা যায় যে শিল্পকর্মের সঙ্গে সন্তানের এ বিষয়ে বিশেষ মিল আছে। শিল্পরসের মাধ্যমে শিল্পী আপন ভাবকে সাধারণের মধ্যে বিস্তারিত করে আপন আত্মার ব্যাপকতর স্থিতি পান। পুত্র জন্ম দিয়েও মানুষ যেমনি পুত্রের মাধ্যমে আপনাকে 'আমার' বাহিরেও সত্য করে তোলে। অতএব বলা যেতে পারে যে শিল্পসৃষ্টি ও সন্তান লাভের মধ্যে একটি গভীর সমতা থাকার দরুনই প্রাচীন আলঙ্কারিকের পক্ষে রস সম্পর্কে 'সন্তানবৃত্তি' কথাটি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। তিনি হয়তো এ কথা ব্যবহারের অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক কারণটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না—কারণ, কারণটি গভীর অবচেতন মনে অবস্থিত। তবু সেই গভীর সত্যটি তাঁর অজ্ঞাতেই স্বপ্রকাশিত হয়ে উঠেছে। সাহিত্য-শিল্পের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে তাই অভিনবগুপ্তের 'সন্তানবৃত্তি' কথাটির ব্যবহার অর্থহীন বা অ্যাক্সিডেন্টাল নয়। এটি গভীর বৈজ্ঞানিক সত্যের সমর্থক।

মনের চাহিদার দিক থেকে শিল্প এবং সন্তান যে সমগোত্রীয় তা আরও স্পষ্ট হবে শিল্পীর শিল্পের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় থেকে। সাহিত্যে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"···সেক্সপীয়রের অনেকগুলি সাহিত্য-সন্তানের এক একটি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে বলে যে তাদের মধ্যে সেক্সপীয়রের আত্মপ্রকৃতির কোন অংশ নেই তা আমি স্বীকার করতে পারিনে।" (সাহিত্যের পথে, পৃঃ ১৬৩)

এখানে সাহিত্যের প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষণীয়। কবির দৃষ্টিতে সাহিত্য সন্তানতুল্য। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী, যা ভাষাতে প্রকাশ পেয়েছে—তা অন্তরের সত্য। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের মতে কোনও কথারই ব্যবহার অ্যাক্সিডেন্টাল নয়। প্রতিটি কথা বিশেষ অনুভূতি পর্যায় (feeling tone) থেকে ভেসে আসে এবং তা ব্যক্তির অন্তরের অনুভূতিরই পরিচয় দেয়। এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে অনুসরণ করে তা হলে সহজেই বলা যেতে পারে যে 'সাহিত্য-সন্তান' কথাটি ব্যবহারের মধ্যে সাহিত্য সন্তানের সমগোত্রীয়—কবির এই অনুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পুরুষের নারীবৃত্তি না হয় শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে তৃপ্ত হল, কিন্তু নারী তো সোজাসুজিই সন্তান প্রসব করে তার চাহিদা মেটাচ্ছে, তবু নারী আবার শিল্পসৃষ্টি করে কেন? তার কারণ, বাসনা অপরিমেয়। বাসনা পূর্ণ হলে তা কখনও নিঃশেষ হয়ে যায় না। সেটুকু মিটল তার জন্যে মন ক্ষণিক তৃপ্ত হল, কিন্তু আবার সে বাসনা দেখা দেয় এবং আবার তার তৃপ্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু সমস্ত বাসনাটুকুর তৃপ্তি সহজ ও স্বাভাবিক পথে সম্ভব হয় না, তাই নারী যদিও বাস্তবে সন্তান প্রসব করে তার বাসনা চরিতার্থ করে, তবু তার সন্তান প্রসবের চাহিদা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় না। এই ইচ্ছার অনেকটাই অতৃপ্ত থেকে যায়, সেই অতৃপ্ত ইচ্ছাই নারীর মধ্যে উদ্গতি (sublimation) লাভ করে শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে আবার তৃপ্ত হতে পারে। শিল্পের জন্ম এই অতিরিক্ততায়—শিল্প আমাদের 'উদ্বৃত্ত পাওনা'। রবীন্দ্রনাথের কথায় শিল্পের উৎস হল—the surplus in man। তাই নারীর শিল্পী হওয়ার কোনও অসঙ্গতি নেই।

এ ছাড়া আরও প্রশ্ন উঠতে পারে, সকল মানুষের মধ্যেই তো নারীত্ব রয়েছে এবং তা তৃপ্তি চাইছে। আর শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমেই যদি নারীপ্রবৃত্তির তৃপ্তি হয় তা হলে সকলেই শিল্পী হয় না কেন? এখানে শিল্পীমনের যে বিশেষত্ব সেই বিশেষত্বের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শিল্পের উৎস অতৃপ্ত বাসনা—এ কথা ঠিক। কিন্তু বাসনার তৃপ্তি নানাভাবেই হতে পারে—যেমন প্রকাশ্য সহজ পথে, অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে, মানসিক রোগের (neurosis) মাধ্যমে অথবা শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে। মনের চাহিদা যেখানে সহজ প্রকাশ পায় না সেখানে চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ অনেক অসামাজিক ও অন্যায় কাজ করে তার ইচ্ছার তৃপ্তিসাধন করে। যেমন আক্রম-ইচ্ছা

লাউনিংসেন, তুমি যে এমন এক গ্রহ থেকে এসেছ যেখানে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার অনুরূপ সভ্যতা এখনও বিরাজমান তা প্রায়ই আমি ভুলে যাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই সব ধারণা ছিল বটে—মানবতা ভাল, নিষ্ঠুরতা খারাপ। এই সব অর্বাচীন চিন্তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। আমরা পূর্ণতাপ্রাপ্ত সমাজে বাস করি। আমরা জানি যে পূর্ণতার জন্য যা করণীয় তা করতে হবে। যেটা নিয়ম তার তো অন্যথা করা যায় না। আমাদের সমাজ ষোল-আনা যান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এই ব্যবস্থা একটা নির্দিষ্ট-সংখ্যক মানুষের ভারের চেয়ে বেশী ভার বইতে অক্ষম। কাজেই বাড়তি মানুষদের মেরে ফেলতেই হবে। এর মধ্যে কোমলতা বা নিষ্ঠুরতার কোন প্রশ্ন নেই। যে মানুষ অস্বাভাবিক, সমাজের প্রয়োজনে তাকে নিকেশ করতে হবে। এর মধ্যে নিষ্ঠুরতার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

আবেগভরে বলে উঠলাম, বাস্তবিক, মনমোনা, তোমাদের এই আশ্চর্য সভ্যতার কথা যত শুনছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। এই সভ্যতায় আমি একজন নাগরিক হতে পারছি বলে নিজেকে গর্বিত বোধ করছি।

আমার এই কথায় কাজ হল। মনমোনার মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়ে দিলাম, তুমি তোমাদের ইতিহাস বলবে বলেছিলে মনমোনা। আমি শোনার জন্য তৈরি হয়ে আছি।

মনমোনা বলল, অত শোনার আগ্রহ ভাল নয়। অবশ্য আমি যখন বলব বলেছি তখন নিশ্চয়ই তা বলব। শোন, আমাদের এই সভ্যতার বয়স পাঁচ শো বছর। তারও পাঁচ শো বছর আগে বিংশ শতাব্দীতে এই পৃথিবী বর্বরদের বাসভূমি ছিল। তারা যুদ্ধবিগ্রহ করতে খুব ভালবাসত। কিছু বৈজ্ঞানিক উন্নতি করেছিল বলে তারা অহঙ্কারে ডগমগ ছিল; এবং বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করতে লাগল। তার ফলে যা হওয়া স্বাভাবিক ওই শতাব্দীর শেষের দিকে এক ভয়াবহ আণবিক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে পৃথিবীর শতকরা আশি ভাগ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং সমস্ত বাড়িঘর কলকারখানা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এইভাবে প্রাক্‌সভ্যতার যুগের বহু বিজ্ঞানের মানবতাবাদী চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়। যে সামান্য কিছু মানুষ বেঁচেছিল তাদের অধিকাংশ আণবিক যুদ্ধের পরিণামে যে সব রোগ দেখা দেয় তার আক্রমণে মারা গেল। যারা বেঁচে ছিল তাদের অনেকে বেঁচে থাকার মত উপযুক্ত জীবিকা খুঁজে পেল না। যারা গ্রামাঞ্চলে জমির খোঁজে গেল তারা দেখল তাদের জমি আণবিক অস্ত্রে আঘাতে পুড়ে অকেজো হয়ে চাষের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছে। যারা সামান্য কিছু চাষের উপযোগী জমি খুঁজে পেল তারা হয়তো আজীবন কল-কারখানায় কাজ করেছে, চাষবাসের কিছু জানে না। কাজেই এই সব লোকের অধিকাংশ শেষ পর্যন্ত মরে গেল। এইভাবে যুদ্ধের পঁচিশ বছর পরে সারা পৃথিবীতে পাঁচ কুড়ি হাজারের বেশী মানুষ আর রইল না। কিন্তু এদের মধ্যে ছিলেন দুই বৈজ্ঞানিক আইজেনসেন আর গলসেন। তাঁদের নামের শেষ অংশটুকু আমাদের নামের শেষে আমরা গ্রহণ করেছি। এই দুই বিজ্ঞানী অনুসন্ধান করতে করতে এক জায়গায় ভূগর্ভের মধ্যে কতকগুলি বই আর যন্ত্রপাতি পেলেন। সেই সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানের যত জ্ঞান আহরিত হয়েছিল তা সবই সেখানে সংরক্ষিত ছিল। সেই সব পুঁথি-পুস্তক এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করে তাঁরা কিছু কয়লা এবং কিছু লোহা ইত্যাদি ধাতুর সন্ধান পেলেন। তা দিয়ে পৃথিবী পুনর্গঠন সম্ভব ছিল না, কিন্তু গবেষণার কাজ চলতে লাগল। সমস্ত মানুষ আদিম পশু-শিকার, পশু পালন আর কৃষি-কর্মের মধ্যে ফিরে গেল। আর একদিকে তিন শো বছর ধরে বংশানুক্রমে বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান-সাধনা করে চললেন। বিজ্ঞানের এত উন্নতি হল যে সেই জ্ঞান আয়ত্ত করে বিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসতে শিক্ষার্থীর চল্লিশ বছর বয়স হয়ে যেত। তারপর বিয়ে-থা করে তারা আর বেশীদিন বাঁচত না। তখন শুরু হল পুনর্গঠনের কাজ। প্রথমেই একটি আণবিক শক্তি-উৎপাদনের স্বয়ং পুনরাবর্তনশীল কারখানা স্থাপন করা

ন। সূর্যে যেমন আণবিক বিস্ফোরণ ঘটবার পর আবার আপনা-আপনি বিস্ফোরক উপাদান তৈরি হয়ে যায় তেমনি প্রক্রিয়া। তার ফলে সেই যে একবার কারখানা দিয়ে দেওয়া হয়েছে তা আজও চলছে এবং চলবে নির্দিষ্ট কাল ধরে। কোন খনিজ পদার্থ ছিল না, কিন্তু মৌলিক পদার্থের অ্যাটমিক সংখ্যা ইচ্ছামত পরিবর্তন করার ক্ষমতা লাভ করে বিজ্ঞানীরা এমন সব ধাতু তৈরি করলেন আগে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না। এসব ধাতু যেমন কাজের উপযোগী, তেমনি ক্ষয়নিরোধক। যে গাড়িতে আমরা বসে আছি সেটা পাঁচ শো বছর আগে তৈরি, কিন্তু আজও সেটা নতুনের মত। এই সব নতুন নতুন যৌগিক পদার্থ দিয়ে নতুন স্বয়ংক্রিয় স্বয়ং-নবাবর্তনশীল যন্ত্রজগৎ তৈরি করা হল। সমস্ত যন্ত্র যন্ত্রমস্তিষ্কের দ্বারা চালিত হয়। মানুষ যে সুইচ টিপে যান যন্ত্রকে সচল করে সেই তারের যথাযোগ্য নির্দেশ যন্ত্র থেকেই লাভ করে। কচিৎ কোন যন্ত্র গোলমাল দেখা দিলে নির্দিষ্ট স্থানে পাঠিয়ে দিলে যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়াররা সেগুলোকে সারিয়ে দেয়। শুধু কি তাই? কাজে মানুষেরা কী করবে না করবে তার নির্দেশও যন্ত্রের থেকেই আসে। এই যন্ত্রের জগতে মানুষ যন্ত্রের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে মাত্র।

আমি বললাম, বুঝেছি, তোমাদের শাসক যন্ত্র, বিচারক যন্ত্র, সৈনিক পুলিশও যন্ত্র। তবে এই পার্লামেন্টটা কেন?

প্রশ্নটা বেশ বুদ্ধিমানের মতই করেছ। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যাঁরা এই যন্ত্র-জগৎ স্থাপন করেছিলেন তাঁদের ভবিষ্যৎদৃষ্টির ক্ষমতা ছিল। তাঁরা নানারকমের যন্ত্র-মস্তিষ্ক তৈরি করেছিলেন, প্রত্যেকেরই কার্যক্ষমতা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ। যে যন্ত্র-মস্তিষ্ক গাড়ি চালায় সে শুধু গাড়ি চালাতেই পারে, যে বিচারক সে শুধু বিচারই করে। সে শুধু কতকগুলো পূর্ব-নির্দিষ্ট সূত্র অনুসারেই বিচার করতে পারে। কিন্তু আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা জানতেন কালে কালে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটবে যা এই সব নির্দিষ্ট সূত্রের মধ্যে ধরা পড়বে না। যন্ত্র সেখানে কোন নির্দেশ দিতে পারবে না। এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য পার্লামেন্টের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। যেমন ধর, আমাদের উপন্যাস লেখার যন্ত্র-মস্তিষ্ক কতকগুলো নির্দিষ্ট উপাদানকেই নানারকমের যোগ-বিয়োগ করে উপন্যাস লেখে। কিন্তু এই যোগ-বিয়োগের ফলেই এক এক সময় এমন অদ্ভুত বই লেখা হয় যা এই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। পার্লামেন্টের কোন কোন সভ্য আছেন যাঁরা সব বই পড়েন। এবং প্রয়োজন-মত অবাঞ্ছিত বইকে পার্লামেন্টের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করেন। পার্লামেন্ট সে বইয়ের প্রচার নিষিদ্ধ করে দেন। তোমাকে তো আগেই অস্বাভাবিক মানুষদের কথা বলেছি। তাদের সম্পর্কেও পার্লামেন্টকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তুমি যে অতীত থেকে আসবে তা আমাদের পূর্বপুরুষেরা আগে অনুমান করতে পারেন নি। কাজেই পার্লামেন্টকে তোমার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে।

অভিভূত হয়ে বললাম, তোমাদের সভ্যতার বিস্ময়কর কীর্তি এইখানে যে কর্মের বন্ধন থেকে তোমরা মানুষকে মুক্তি দিয়েছ।

মনোলোনা বলল, আমরা মানুষের কামনার সর্বোচ্চ সীমাকে আয়ত্ত করেছি।

তারপর যন্ত্র-বালক ভৃত্যকে ডেকে রাতের খাবার এবং পানীয় দিতে আদেশ করলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে আমি মনোলোনাকে আবার একটি চুম্বন দিয়ে তার প্রতি আমার প্রেমের একাগ্রতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করলাম।

মনোলোনা কিন্তু এক পাত্রের বেশী পানীয় গ্রহণ করল না। বলল, কাজেই তুমি এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ লাউনিংসেন, যে তোমার কাজটা কতখানি গর্হিত হয়েছে। এখানে যন্ত্রের জগতে মানুষ বাস করছে। যন্ত্রের আইন প্রকৃতির আইনের মতই অমোঘ। আইন মেনে চল, সমস্ত সুখ তোমার। আইন অমান্য কর, এখানে তোমার স্থান নেই। জান, আজকে যে এক হাজার পুরুষ শোভাযাত্রা করে পার্লামেন্টে গিয়েছিল তাদের কী হয়েছে? তারা আর নেই।

প্রেসিডেন্ট কিন্তু আমার উপর ভীষণ বিরূপ হয়ে উঠলেন। বললেন, তুমি বুঝতে পারছ না মিসিউৎসোনা, যে লাউনিৎসেন একজন মেয়েকে নিয়ে দু রাত্রি যাপন করায় সোজাসুজি বিচারাধীন কয়েদী হয়ে পড়েছে। যন্ত্র-বিচারক তার বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেবেন এ অবধারিত। এতে হস্তক্ষেপ করার কোন এক্তিয়ার পার্লামেন্টের নেই। তুমি পার্লামেন্টের সভ্যা না হলে তোমারও সাধারণ কয়েদী হিসাবে বিচার হত। কাজেই লাউনিৎসেনের বিষয়টা পার্লামেন্টে উত্থাপন করা চলবে না।

কিন্তু আমাকে সমর্থন করতে গিয়ে মিসিউৎসোনা খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিল। সে বলল, প্রেসিডেন্টকে যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে এ কথাটা স্মরণ রাখতে বলি যে লাউনিৎসেনকে সাধারণ অপরাধী হিসাবে গণ্য করা যায় না। সে গ্রহান্তর থেকে এসেছে। তার অমন গৌরবর্ণ এবং দীর্ঘ দেহ আমাদের কাছে বিস্ময়। আমাদের রাজ্যে এই প্রথম আমরা সাদা রঙ দেখতে পেলাম। তার মৃত্যুদণ্ড বিধান করলে কোন অজানা শক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে না এ নিশ্চয়তা কে দেবে? কাজেই আমি প্রস্তাব করি যে লাউনিৎসেনকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ বলে একটি ঐতিহাসিক বিস্ময় হিসাবে সংরক্ষিত করা হোক।

নারী সদস্যারা চিরদিনই আমার প্রতি দয়ালু। অনেকে আমার সপক্ষে বললেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে কোন কোন পুরুষ সদস্যও আমার সপক্ষে বললেন। তাঁদের এই আকস্মিক পক্ষপাতের কারণ আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম। নারীমহলে আমার অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে পুরুষেরা আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল। কাজেই আমি মেয়েদের নাগালের বাইরে একটা দর্শনীয় বস্তু হয়ে থাকব এ কল্পনাটা তাদের কাছে খুব মজার বলে বোধ হয়েছিল।

সভার মত এতখানি তাঁর বিপক্ষে দেখে প্রেসিডেন্ট একটু নরম হলেন। মনে মনে দাঁতে দাঁত চেপে ভাবলেন, আগামী নির্বাচনে আমি দেখব তোমাদের মধ্যে কতজন পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে বহাল থাকতে পার। তিনি অবশ্য সহজে হার মানলেন না। শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন তুললেন। আমাকে ঐতিহাসিক বিস্ময় হিসাবে সংরক্ষিত করা শাসনতন্ত্রবিরোধী কিনা এ প্রশ্নের জবাবে যন্ত্র-শাসনতন্ত্র থেকে উত্তর পাওয়া গেল—বিরোধী নয়।

তারপর আর মিসিউৎসোনার প্রস্তাবটা পাস হতে যেতে কোন অসুবিধা হল না।

সন্ধ্যাবেলা মিসিউৎসোনা আমাকে খবরটা দিতে এল আর বলা বাহুল্য সেদিনকার মতো সে আমার সঙ্গে রাত্রি যাপন করল। আমি তাকে সাগ্রহে আদর করে অনুরোধ করলাম, দেখ মিস, বরাবরই দেখেছি প্রেসিডেন্ট আমার প্রতি খুব সদয় ছিলেন। হঠাৎ তিনি কেন আমার প্রতি এমন বিরূপ হয়ে উঠলেন তার কারণটা তোমাকে জেনে আসতে হবে।

পরদিন মিসিউৎসোনা যে রিপোর্ট নিয়ে এল তার থেকেই কারণটা বুঝতে পারলাম। যন্ত্র-পুলিসের কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট নাকি রিপোর্ট পেয়ে জেনেছিলেন যে আমি মাত্র এক দিন তাঁর হয়ে প্রচার করেছি। পরে দিনের পর দিন আমি নাকি শুধু নিজের জনপ্রিয়তাই বাড়িয়ে চলেছি। ফলে যে শহরে খুব কম লোকই প্রেসিডেন্টের নাম জানে সেই শহরে প্রায় সবাই আমার নাম শুনে পাগল হয়ে পড়ে।

বুঝতে পারলাম, এমন খবর পাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট রাগ না করলেই বিস্ময়ের বিষয় হত।

আমাকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারটার কিন্তু সহজে মীমাংসা হল না।

প্রথমে অনুরোধ করা হয়েছিল জাদুঘরকে। জাদুঘর-কর্তৃপক্ষ তাদের যান্ত্রিক নির্দেশকের সঙ্গে পরামর্শ করে জানাল যে আমার আকারের মত একটি খড়ের মানুষ তৈরি করে তাকে আমার গায়ের চামড়া দিয়ে জড়িয়ে দিলে তারা সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক বিস্ময় হলেও জীবন্ত কোন কিছুকে স্থান দেওয়া তাদের শাসনতন্ত্রের বিরোধী।

তারপর অনুরোধ করা হল চিড়িয়াখানাকে।

চিড়িয়াখানা জানাল যে বিস্ময়কর হলেও আমাকে মানুষ না বলে উপায় নেই। আমি দু পায়ে হাঁটি, মানবীর সঙ্গে প্রেম করি, এই সবই নিঃসন্দেহে মনুষ্যত্বজ্ঞাপক। অথচ তারা শুধুমাত্র মনুষ্যেতর জীবদেরই জায়গা দেওয়ার অধিকারী।

মিনিউৎসোনা আমাকে এসে জানাল, কলকাতার চিড়িয়াখানাও তোমাকে জায়গা দিতে রাজী হল না।

কিন্তু সবগুলো কথা আমার কানে গেল না। কলকাতা নামটা শুনেই আমার শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে গেল। এ কোন্ কলকাতা।

জিজ্ঞেস করলাম, মিনিসোনা, তুমি কলকাতার নাম বললে না?

হ্যাঁ। যে শহরে আমরা বাস করি তার নাম তো কলকাতা। কেন, তুমি জানতে না?

কলকাতা কোথায়?

ভারতবর্ষে।

ভারতবর্ষ কোথায়?

এশিয়ায়।

সব পরিচয়ই তো মিলে যাচ্ছে। কিন্তু এই রূপকথার কলকাতার মধ্যে আমার সেই চেনা কলকাতা কোথায়? এই তো মাত্র দিনকয়েক আগে স্পুটনিক-যোগে আমি কলকাতা ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলাম। না হয় মেনে নিলাম কোন অজ্ঞাত কারণে স্পুটনিক মহাকাশ পরিভ্রমণ করে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। কিন্তু আমার সেই চেনা কলকাতা কোথায়? মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই তো কলকাতা শহর এমন করে পাল্টিয়ে যেতে পারে না। অথবা এটা কি আমাদের চেনা কলকাতা শহরের [illegible] আইডিয়া?

অতীত বিষয়ে মন হাতড়িয়ে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ আইনস্টাইনের কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক তো! আইনস্টাইন তো বলেছিলেন যে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে ভ্রমণ করলে সময়ের হিসাব হ্রাস পায়। তাহলে মহাকাশে যে সময়টা আমার কাছে দিনকয়েক মাত্র বলে বোধ হয়েছিল সেই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে

এক হাজার বছর কেটে গিয়েছে। এবং এই বিজ্ঞানের যুগে এক হাজার বছরে যে কী বিপুল পরিবর্তন সাধিত হতে পারে এই কলকাতাই তার প্রমাণ।

মনে পড়ল মনুসোনা কথায় কথায় কয়েকবার পৃথিবী কথাটা উচ্চারণ করেছিল। তখন ভেবেছিলাম কথাটা সে রূপক অর্থে ব্যবহার করছে।

কিন্তু হায়! আমার এই কলকাতা শহরে আমি আজ বিদেশী, প্রাগৈতিহাসিক বিস্ময়! জাদুঘর এবং চিড়িয়াখানায় আমার জন্য জায়গার অনুসন্ধান করা হয়!

মনে মনে নিজের হাস্যকর অবস্থার চিন্তা করে নিজের প্রতি অনুকম্পায় মন ভরে গেল। এখানে নিঃসঙ্গ আমি কারাগারে বন্দী। আমার জন্য চিন্তা করবার, আমার দুঃখে দুঃখ করবার কেউ নেই। এখানে আমার যে জনপ্রিয়তা হয়েছিল তা কত মেকী! এ কদিনের মধ্যেই এই চিত্র-যুগের বাক্সের বাসিন্দারা আমার কথা ভুলে গিয়ে যার যার আনন্দে মত্ত হয়ে গিয়েছে। এমন কি প্রেসিডেন্টও হয়তো আমার জন্য বাস খুলে রাখার কথা ভুলে গিয়েছেন।

একমাত্র মিমিউইংসোনা আমার কাছে আসে বাইরের পৃথিবীর এক ঝলক বাতাসের মত। কিন্তু তার মনের থেকে আমার মন কত দূরে! সে যে আমার কাছে আসে শুধু তার কতকগুলো শারীরিক দাবি মেটাতে।

অনেক ভেবেচিন্তে মিমিউইংসোনাকেই একদিন বললাম, মিমিউইংসোনা, তুমি আমাকে ভালবাস। তাই তোমাকে একটা অনুরোধ করতে চাই।

কি অনুরোধ বল।

আমার পালিয়ে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দাও।

মনে মনে ধরে নিয়েছিলাম মিমিউইংসোনা এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারে না। আমি পালিয়ে গেলে সে আমার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ তার কাছে আমার শারীরিক সম্পর্ক ছাড়া আমার ভালবাসার আর কী অর্থ থাকতে পারে?

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে সে বলল, ঠিক; পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তোমার পরিত্রাণের আর কোন পথ দেখছি না।

সে পার্লামেন্টের সদস্য বলে অনেক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য যেসব প্রহরীর [illegible] ছিল [illegible] মিমিউইংসোনার [illegible]

আমার [illegible] মিমিউইংসোনার গাড়ি। [illegible] উত্তর-সীমান্ত অতিক্রম করে [illegible]

শহরের উত্তর-সীমান্ত [illegible] গাড়ি [illegible] অতিক্রম করে [illegible] গাড়ি থেকে [illegible] থেকে [illegible] দিয়ে [illegible] আমি ছোটাতে লাগলাম। [illegible] ছিল না। শুধু দৌড়লাম।

আমার সামনে পাহাড়ের পর পাহাড়। [illegible] হিমালয়কে চিনতে পারলাম। পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলাম। তারপর থেকে এই গুহাবাসীদের সঙ্গেই বাস করছি।

এখানকার জীবন খুব কঠোর। তবু শহরের সেই আরামের দিনগুলোর কথা ভেবে একটুও আপসোস বোধ করি না। দুঃখ বোধ হয় যখন মনুসোনার অকৃত্রিম ভালবাসার কথা মনে পড়ে। আর মিমিউইংসোনার সহানুভূতিশীল হৃদয়ের কথা। আমাকে মুক্তি দেওয়ায় মিমিউইংসোনার কোন বিপদ ঘটে নি তো?

সমাপ্ত

অন্ত এক পরিচিতার কণ্ঠলগ্ন হয়ে সুখে কালাতিপাত করছে। আমার জীবনটাও অকস্মাৎ তাই বাঁধা ঘাটের মোহ কাটিয়ে ফুটো নৌকোয় ভেসে পড়ল। ভাসতে ভাসতে যেখানে এসে ঠেকল সেখানে ভরাডুবি হবার আশঙ্কা যথেষ্টই ছিল। এমন কি অরক্ষণীয়া বলে আশে-পাশে যারা ভিড় করে এল, তারা অবলাবান্ধব হতে পারেন, কিন্তু 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ' বলে চাণক্য যাঁদের নির্দেশ করে গেছেন, এঁরা তাঁরা নন নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমার ভয় ছিল না তাতে। একবার বিশ্বাসভঙ্গের সুবিধেই এই যে দ্বিতীয়বার আর কাউকে বিশ্বাস করে ঠকার ভয় থাকে না। নিরুপম আমাকে 'বোধোদয়ে'র সেই সহজপাঠ দিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য গুরুদক্ষিণা হিসেবে আমার চোখের জল খরচা হয়েছে অনেক, অনেক দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বয়ে গেছে, কিন্তু এ সবেরই একটা শেষ আছে। সময় অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার নতুন করে বিশ্বাস করে ঠকলাম না বটে, কিন্তু আমার পুরনো ক্ষতের ওপর প্রলেপ পড়ল। আমি নিরুপমের কথা ভুলে গেলাম। নিরুপমের গল্পটা এইটুকুই। শান্তনু সেই নিরুপমেরই বন্ধু—সম্পর্কে আমারও।

শান্তনু আর আমি একসঙ্গে পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়েছি, আড্ডা মেরেছি কফিহাউসে, এমন কি একসঙ্গে বাড়িও ফিরেছি কতদিন—তবু চিরটাকাল আমি ওকে নিরুপমের বন্ধু হিসেবেই দেখেছি। নিরুপমের বন্ধু—এই পরিচিতির বাইরে ওর যে অস্তিত্ব ছিল সেটা আমার নজরে আসে নি।

নজরে পড়বার মত তেমন কিছু দেবদুর্লভ চেহারাও ছিল না শান্তনুর। রোগা মাঝারি লম্বা, নিতান্তই সাধারণ চেহারা। কথা বলার চাইতে কথা শুনত বেশী। তর্ক করলেও সেটা এত মৃদু সুরে হত যে মনে হত ক্ষমাভিক্ষা করছে। নিজেকে প্রতিভাশালী বলে মনে করার বা জগৎসংসারে যাবতীয় কিছু জেনে ফেলার মত বিদগ্ধতার, কোন কিছুরই প্রয়াস বা ভাণ ছিল না শান্তনুর। দশজনের মধ্যে থাকলেও যে আছে এই কথাটিই কারও কখনও মনে থাকত না।

শান্তনুর সঙ্গে কলেজি যুগে ভাবটা আমার নিতান্তই আপেক্ষিক ছিল। ক্লাস থেকে নিরুপমকে ডেকে দেবার, নিরুপমের বাড়িতে আমার জরুরী খবর পৌঁছে দেবার, আমার আর নিরুপমের ঝগড়া মেটাবার অন্যতম উপায় ছিল শান্তনু। কাজেই নিরুপমের প্রয়োজন যেদিন আমার মিটে গেল, সেদিন শান্তনুও আমার কাছে মূল্যহীন হয়ে গেল।

শান্তনুকে আমি প্রথম ভাল করে জানলাম যখন আমাদের কলেজি দিনগুলির স্বপ্ন রঙিন হল বাস্তব-জীবনের মধ্যাহ্ন-আকাশে মিলিয়ে গেছে, যখন চাকরির ধান্দায় ঘুরে ঘুরে মনের কোণে কণামাত্র রোমান্সের অবশিষ্ট নেই, যখন আমরা সকলেই বছর দেড়েক ছুটের ঘা খেয়ে অত্যন্ত বাস্তব হয়ে উঠেছি, ট্রামের পয়সা ফাঁকি দিতে পারলে মনে ভাবি বিশ্বজয় করলাম, উপরওয়ালার নিন্দার মত মুখরোচক অন্য কোন আলাপ নেই।

তখনই প্রায় বছর দুই পরে শান্তনুর সঙ্গে আমার দেখা এক সরকারী অফিসে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে আমাদের কয়েকজনকে পাঠিয়েছিল এ অফিসে ইণ্টারভিউ দিতে। একটা ছোট্ট ঘরে আমরা জনতিরিশেক ছেলেমেয়ে বসে বসে গলদঘর্ম হচ্ছিলাম, একটু হাওয়ার আশায় আমি বাইরের করিডোরে বেরিয়ে এলাম। লম্বা করিডোর, মস্ত অফিস, একপাশে সারি সারি ঘর, ফাইলের স্তূপ আলো হাওয়ার গতি রুদ্ধ করেছে।

সেদিকে তাকিয়ে আমার মনটা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গেল। বাইরে বৈশাখ মাসের উজ্জ্বল তাতানো আকাশ, রোদে গনগন করছে। ঘরের ভেতর এতটুকু রোদের আভাসমাত্র নেই, আলো নেই। সারি সারি ধূলিমলিন ফাইলচাপা টেবিল, উপুড় হয়ে আছে কেরানীর দল। ইণ্টারভিউ লিস্টে আমার নাম শেষের দিকে ছিল। কাজেই আমি বারান্দার থামের গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মনে নানাকথা গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল। আমার ভবিষ্যৎকে যেন এই বাইরের রোদজ্বলা অ্যাসফল্টের রাস্তায় নিহত হয়ে পড়ে থাকতে দেখলাম। আমার মনে পড়ে গেল আরও উনত্রিশটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের

LIFEBUOY
SOAP

কথা—যে ভবিষ্যৎগুলি আমার সঙ্গেই সমান উৎকণ্ঠায় বিবর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে। সবকিছুই আমার কাছে বিষম ফাঁকি বলে মনে হতে লাগল। হয়তো আরও অনেকক্ষণ আমি ভাবনায় মগ্ন থাকতাম, যদি না আমার কানের কাছে পরিচিত কণ্ঠ শুনতাম—আরে, তুমি এখানে!

ফিরে তাকিয়ে দেখি, শান্তনু। দুজনে প্রশ্ন বিনিময়ের পর জানলাম শান্তনু এখানেই চাকরি করে বছর দেড়েক হল।

দু-একটা কথার পর আপনা থেকেই কথা আমাদের ফুরিয়ে গেল। হঠাৎ-দেখার বিস্ময় কেটে গেছে। দুজনের মনেই তখন ধীরে ধীরে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে। আমি আর শান্তনু দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ শান্তনু গলার স্বরটাকে অত্যন্ত নামিয়ে যেন একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেছে এমনিভাবে বলল, জান, আজ নিরুপমের জন্মদিন, বাঁশরও।

আমি ছোট্ট করে উত্তর দিলাম, তাই নাকি? কিন্তু মন আমার অনেকখানি ভেঙে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। আমি মুহূর্তে মনটাকে গুটিয়ে নেবে শান্তনুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, আচ্ছা, আমি এবার যাই।

আবার সেই গুমোট করা গরম ঘরে এসে বসলাম। তখনও জনদশেক বাকি। দরজার পেছনে ঘরের কাছে যে লাল উর্দি পরা লোকটা বসেছিল, তার চকচকে পিতলের বোতামের ওপর ঘূর্ণায়মান ফ্যানের ছায়ার দিকে আমি চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম। আমার মনে আবার শান্তনুর কথাটা ফিরে এল একটি নীল মাছির মত ডানা ভনভন করতে করতে—আজ নিরুপমের জন্মদিন, বাঁশরও। শেষেরটুকু আমার জানা খবর নয়, কিন্তু প্রথমটা? আমি কি জানি নে যে আজ নিরুপমের জন্মদিন—এই জানাটাই কি আজ সকাল থেকে বারংবার আমাকে অন্যমনস্ক করে দেয় নি? ইন্টারভিউয়ের তাড়া, শেষমুহূর্তে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট ঠিক আছে কিনা দেখে নেওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছবার তাগাদা, এই প্রত্যাশায় বসে থাকার ক্লান্তি, আর সর্বোপরি একটি অনতিক্রম্য হতাশা—সব কিছুকে ছাপিয়েই কি সারাক্ষণ একটি কথাই গুঞ্জন করে নি—আজ নিরুপমের জন্মদিন। আজ নিরুপমের জন্মদিন। শান্তনু কি সব ভুলে গেছে? এ কথাটা কেন আবার ও আমায় মনে করিয়ে দিল? শান্তনুর ওপর কেমন রাগ হল। মনে হল, এ অফিসে চাকরি না হলেই ভাল হয়। হলে তো আবার রোজ শান্তনুর সঙ্গে আমার দেখা হবে, আর সব স্মৃতি কথা, বারবার আমাকে বারবার নিরুপমের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। যে কথা আমি ভুলে গিয়েছি, কেন আবার তাকে স্মরণ করে কষ্ট পাওয়া। তার চাইতে এ চাকরি না হলেই ভাল হয়।

আমার আকাঙ্ক্ষা হয়তো আন্তরিক ছিল না। কেন না, চাকরিটা আমার শেষ পর্যন্ত হল, আর এখানেই হল। এখন মনে হয় ভালই হয়েছিল, নইলে শান্তনুকে আমার পুরোপুরি করে জানা হত না। এর পর তার বন্ধুত্বের বাইরেও যে শান্তনুর অস্তিত্ব আছে এ কথা আমি কখনও জানতে পারতাম না।

শান্তনু আমায় বলে দিয়েছিল, যেদিন জয়েন করবে আমার সঙ্গে দেখা করো। এই সিঁড়িটা দিয়ে উঠে দেখলাম হাতের বাঁ দিকে যে ঘরটা, সেটাই আমার সেকশান। কিন্তু জয়েন করার পর প্রায় দিন তিন-চার কেটে গেল, আমি শান্তনুর সেকশানে গেলাম না, যাওয়ার ইচ্ছাও ছিল না, মনেও ছিল না।

দিন কয়েক পর শান্তনু এল। বলল, কি ব্যাপার, আমি তো ভাবলাম তুমি জয়েনই কর নি। চল, চা খেয়ে আসি।

তখন দুপুরবেলা, ঘড়িতে দেড়টা বেজে কয়েক মিনিট। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে বৈশাখী রোদ। অফিস থেকে বেরিয়ে আমি আর শান্তনু হাইকোর্টের পাশ দিয়ে একটু এগিয়ে একটা ছোট চায়ের দোকানে ঢুকলাম। ভাঙা নড়বড়ে চেয়ার, মোড়া, মাছি ভনভন করছে। বয়গুলি হাফপ্যান্টের ওপর ময়লা গেঞ্জি পরে কোমরে লাল গামছা বেঁধে খদ্দেরের তদারক করছে। চেয়ার টেনে

হয়তো এখানে-ওখানে কিছু খেয়ে নিয়ে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে, যে যার বাড়ি ফিরে যেতাম কাল দেখা হবে এই আশ্বাস নিয়ে। রোজই যে এমন হত তা নয়, তবে প্রায়ই এমনটি হত।

আমার আর শাশ্বতর জীবনটা তখন একসুরে বাঁধা পড়েছিল। আমাদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যারা কর্মক্ষেত্রে কৃতী হয়েছে, তারা পেশার কৃতিত্বে কখনও নিজেকে [illegible] করে নি। কিংবা একটি নিজস্ব [illegible] ভাবের সমস্ত ধ্যানের জগৎকে জড়িয়ে দেয় নি। কিন্তু আমার আর শাশ্বতর দুজনের জীবনেই সেই নিঃসঙ্গতা ক্রমেই মাথা উঁচিয়ে উঠেছিল। আমরা দুজনেই ছাত্রজীবনে নিশ্চয় অবজ্ঞাত ছিলাম না। আমরাও কবিতা পড়েছি, তর্ক করেছি, সমস্ত মানবজীবনের সামগ্রিক মুক্তি চেয়েছি। সেদিন আমাদের চিন্তাধারা পৃথিবীর কোন মনীষীর চিন্তাধারা থেকেই পর ছিল না। শুধু কর্মজীবনে সামগ্রিক মানবসমাজ দূরে থাক, নিজেদেরই মুক্তি খুঁজে পাই নি। দু বছর বেকার থাকার পর আমি বুঝেছি, ধ্যানের জগতের সঙ্গে বাস্তবের এত অমিল, দু বছর কেরানীগিরি করে শাশ্বত জেনেছে ধ্যানের জগতের সঙ্গে বাস্তবের কত তফাত।

বহুদিন পর দেখা হওয়ায় আমরা তাই পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছিলাম একটি প্রাক্তন মমতায়। অফিসের ওই আলো অন্ধকার রৌদ্র-বাতাস-বিবর্জিত ঘরগুলি, স্তূপীকৃত বিবর্ণ হলদে কাউন্টার, ধূলিমলিন ফাইলের পাহাড় আর নির্জীব একদল সহকর্মী ও সহকর্মিণী। এদের মধ্যে ছুটি যদি কোথাও থাকত, আর বদলাতে যদি হত, তবে সেটুকু ছুটো আর পাঁচটার অবসরে আমার আর শাশ্বতর পরস্পরের সঙ্গে দেখা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

আমাদের পুরনো বন্ধুরা এ ওখানে হারিয়ে গিয়েছিল, নতুন বন্ধুদের সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা গড়ে ওঠে নি। শাশ্বত আর আমার আলাপ তাই প্রায়শঃই পুরনো গণ্ডীগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে, এক পা থেকে শরীরের ভার অন্য পায়ে চালান দিয়ে দিয়ে শাশ্বত বলত, [illegible] [illegible], দিনের যাচ্ছে।

আমি বলতাম, আর শাশ্বত, সেই যে প্রকাশ ছিল, সেই যে অনন্তমোহন চৌধুরী, ও না, সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, রামকৃষ্ণ মিশনের খাতায় নাম লিখিয়েছে।

শাশ্বত হেসে, আমিও হাসতাম। সন্ন্যাসী হয়ে যাবার মধ্যে যে একটা [illegible] এসকেপিজম লুকনো আছে, তাই নিয়ে গবেষণা করতাম, দুজনেই একমত হতাম। মাঝে মাঝে [illegible] নয়, হত। যখন শাশ্বত পুরনো দিনের [illegible] আধুনিক কবিতার আলোচনা করতে যেত, অথবা আমি যখন কোনও কাব্য বা [illegible] বর্ণনা করতে যেতাম, তখন আবার সেই পুরনো [illegible] হত। কিন্তু বলা বাহুল্য, আমাদের মন [illegible] একেবারে বিচ্ছিন্ন হত না। সময়ের [illegible] হয়ে যে যার সেকশানে ফিরে যেতাম।

তারপর সারাটা দিন ধরে হিসাবের খাতার ওপর উপুড় হয়ে থাকা। গভর্মেন্টের খাতাপত্র ঘাঁটা কোথায় কত ব্যয় হল, কোথায় কোন ফুটো দিয়ে কত লক্ষ টাকা গলিয়ে গেল তারই অনুসন্ধান করা, আর ঘড়ির ছোট কাঁটাটি পাঁচটায় না পৌঁছনো পর্যন্ত শুধু যোগ আর বিয়োগ, বিয়োগ আর যোগ।

কোন কোনদিন পাঁচটা না বাজার আগেই এসে উপস্থিত হত শাশ্বত। বলত, উঃ, যোগ করে করে মাথা ধরে গেছে, চল এবার।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটা টুল ঠেলে দিয়ে বলতাম, বস, এখনও পাঁচটা বাজে নি, সুপারিন্টেন্ডেন্ট চটবেন রোজ রোজ আগে পালালে।

শাশ্বত টুলটা টেনে নিয়ে বসে বলত, কি করছ?

হুগলীর কালেক্টরকে চিঠি লিখছি।

ও বাবাঃ, কিন্তু কেন?

আর বলো না, পাঁচশালা পরিকল্পনায় যাদের জমি গেছে তারা ক্ষতিপূরণ পেল কিনা জানতে।

আমি দ্রুত হাতে বাঁধা গতে ড্রাফ্‌ট লিখতাম। শাশ্বত পেপারওয়েটটা লুফতে লুফতে বলত, তুমি কলেজে

দুইটি গুরুতর সমস্যার যে সার্থক সমাধান দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে শুধু শিল্পী বলিয়াই অভিনন্দিত করিতেছি না, সমাজ-সংস্কারের যে সহজ ইঙ্গিত তিনি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে একজন সমাজ-সচেতন সংস্কারক বলিয়াও প্রশংসা করিতেছি। "চোর" গল্পটিও আশ্চর্য দরদ দিয়া লেখা, ইহাকে একটি আদর্শ ছোটগল্প বলিতে পারি। ভাষার উপর লেখকের অসাধারণ দখল। তাঁহার গল্প আরও দেখিতে চাই।

লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় : হিমানীশ গোস্বামী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। তিন টাকা।

লণ্ডন লইয়া বাংলাভাষায় ভ্রমণকাহিনী লেখা হইতেছে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ হইতে। শিবচন্দ্র বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর সেন, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় দিয়া আরম্ভ। [illegible] তালিকা দেওয়া অসম্ভব। তবু লণ্ডন সম্বন্ধে অনেক জানিবার কথা বাকি ছিল শ্রীমান্ হিমানীশের এই বই পড়িয়া তাহা বলিতে বাধ্য হইতেছি। চমৎকার লেখা, পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন চলচ্চিত্র দেখিতেছি। লেখকের ফটোগ্রাফারের চোখ, দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য সবেরই উপর তিনি ফোকাস করিয়াছেন এবং কথার গাঁথুনিতে ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই সঙ্গে লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় আলোকচিত্র সংযুক্ত হইলে বইখানি আরও মনোরম হইত।

অমৃত-মন্থন : অজিত মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

লেখক প্রচলিত যাবতীয় কিংবদন্তী ও কাহিনী মন্থন করিয়া কালীক্ষেত্রে কালীমূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস রূপকথার ঢঙে বলিয়াছেন তাহা নিছক অমৃতই নয়। স্বার্থ-লালসা-ত্যাগ-মহত্ত্ব অর্থাৎ সুধা ও গরলে মিশিয়া এই কাহিনী অপরূপ হইয়াছে। মানুষেরই কাহিনী কিন্তু পটভূমিকায় করালবদনী কালী তাঁহার সর্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বা ও অনন্ত বরাভয় লইয়া সর্বদা বর্তমান আছেন। ভাষার দোষ মাঝে মাঝে পীড়াদায়ক হইলেও কাহিনীর আকর্ষণ আছে। কাহিনী এখনও অসমাপ্ত, পরবর্তী খণ্ডের প্রতীক্ষায় আছি।

স.

চেনা-অচেনা : মায়া বসু। সাহিত্য সদন, এ-১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। তিন টাকা।

এই বইতে লেখিকার ষোলটি গল্প সংকলিত হয়েছে। সবগুলি গল্পই 'শনিবারের চিঠি' ও নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত, সুতরাং লেখিকার গল্প-রীতির সঙ্গে বাঙালী পাঠকের মোটামুটি একটা পরিচয় ইতিমধ্যেই ঘটেছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কথাশিল্পীর তুলনায় মায়া বসু কথাসাহিত্যক্ষেত্রে অবশ্যই নবাগতা, কিন্তু গল্পরচনার ভঙ্গিতে তাঁর কোথাও নবাগতার দ্বিধা নেই। বরং অসাধারণ সাহসের পরিচয় আছে। সাহস এবং আত্মবিশ্বাস তাঁর কুণ্ঠাহীন।

মানুষকে তিনি সত্যদৃষ্টিতে দেখেছেন। এবং যে 'মুখ'-এর মাধ্যমে দেখেছেন, তা লেখিকা নারী হওয়া সত্ত্বেও—কখনও কল্প লোকের বিলাসের মধ্যে হারিয়ে যায় নি, তিনি নরনারীর জীবনালেখ্য চিত্রণে রূঢ় বাস্তবকেই অনুসরণ করেছেন। বঞ্চিত এবং অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর সহজ এবং গভীর সংবেদন পাঠকমনে তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে। "[illegible]", "আশ্রয়", "পুতুলওয়ালী", "বিচিত্র এ মন", "উত্তরণ", "[illegible]", "হাওয়া", "[illegible]" প্রভৃতি গল্প ঘটনা বৈচিত্র্য, দৃষ্টির স্বচ্ছতা, এবং মানুষের প্রতি অসামান্য মমতাবোধ মনে বিস্ময় জাগায়। লেখিকার শিল্পনিষ্ঠা অব্যাহত থাকলে কথাশিল্পের ক্ষেত্রে তিনি অদূর ভবিষ্যতে একটা বড় আসন লাভ করবেন এমন আশা মনে জাগে।

শ্যামল গোস্বামী

প্রণয়ী পঞ্চক : সুনীল রায়। নতুন প্রকাশ, ১৩০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাড়ে তিন টাকা।

মহাভারত থেকে পাঁচজন নায়িকা বেছে নিয়ে কবি সুনীল রায় নতুন করে তাদের কাহিনী লিখেছেন—সুকন্যা, গঙ্গা, মাধবী, প্রভাবতী এবং উর্বশী। মহাভারতের মহাকাব্যের মধ্যে বহু ছোটখাটো কাহিনীর অজস্র পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়িয়ে আছে। তাদের কথা আমরা আলাদা করে স্মরণে আনি না, সম্মুখের মহৎ আদর্শের উচ্চ কলরবে এইসব নায়িকাগুলির করুণ বিলাপ যায় হারিয়ে। মহাকবি এদের কথা বলতে কালক্ষেপণ করেন নি। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের বীরনায়কদের মূল কাহিনী অনুসরণ করতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ এরা এসে গিয়েছিল। কবি কোনরকমে তাদের কথা সেরে নিয়েছেন।

প্রাচীন মহাকাব্যের এটাই ছিল রীতি। উঁচু সুরে বাঁধা আদর্শ অথবা কতকগুলি শক্ত প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বসংঘাতেই সেকালের কল্পনার বৈশিষ্ট্য ছিল। অশরীরী ভাবের বাষ্পমণ্ডল সৃষ্টি করায় তাঁদের না ছিল প্রবণতা, না ছিল স্পৃহা। এই নির্বিকার বর্ণনারীতির মধ্যে আধুনিক কবিরা কত নাটকীয় সম্ভাবনাপূর্ণ মুহূর্ত, কত লিরিক সৌন্দর্যের নিটোল ক্ষণ, কত বস্তুগত মনস্তাত্ত্বিক সত্য খুঁজে পেয়েছেন। কবি মধুসূদনই সর্বপ্রথম আধুনিক কবিদের কাছে এর সূচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ

মুহূর্ত সৃষ্টি করে সুশীল রায়কে কাহিনীর কাঠামোটি কল্পনা করতে হয়েছে, সহজেই অনুমেয়। এ যুগের চিন্তাসর্বস্ব কবিতার যুগে এরকম আবেগমুখর কথাকাব্য আনন্দিত বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। শ্রীভবতোষ দত্ত

দাঁড়ের ময়না : পূর্ণেন্দু পত্রী। সাহিত্য, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাড়ে তিন টাকা।

কৃষি-জীবনের পটভূমিকায় লেখা এই বইটি আসলে বৃহত্তর মানবিক সমস্যাকেই উপস্থাপিত করতে চেয়েছে। কৃষক-জীবনের বিশেষ অর্থনৈতিক সমস্যা বা কৃষক-পরিবারের পরিচয়-জ্ঞাপক চিত্রের প্রতি লেখক যে অবহেলা দেখিয়েছেন তা নয়। কিন্তু এ সবের ভিতর দিয়েই লেখক মানবিক সম্পর্কের, সমাজ-চিন্তার এবং মানুষের ভাগ্যের ব্যাপকতর সর্বজনীন তাৎপর্য অনুসন্ধান করেছেন। বিষয়বস্তুর এই বৈশিষ্ট্য লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

কাহিনীর নায়ক রজনী তিন ভাইয়ের মধ্যে ছোট ভাই। ছোট বলে তার উপর সংসারের দায়িত্ব কম, দায়িত্ব-বোধও কম। একটু লেখা-পড়া শিখেছে বলে আর পাঁচজনের থেকে তার একটু স্বাতন্ত্র্য-বোধ রয়েছে। যাত্রায় অভিনয়ের জন্য কন্যার পিতাদের লুব্ধ দৃষ্টি এবং সমবয়সীদের ঈর্ষাকাতর দৃষ্টি লাভ করে। সর্বোপরি একটি পতিতা-নারীর সঙ্গে সে এক সমাজ-বিরোধী প্রেমের অংশীদার। সবকিছু মিলিয়ে সে হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র। কাজেই তার চিন্তার সূত্র গতানুগতিক চিন্তার স্রোতকে অতিক্রম করে যেতে চায়। সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা রজনীর চরিত্রকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। রজনীর চোখ দিয়ে লেখক একফালি জীবনের বিশ্লেষণ করে জীবন সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চাইছেন।

রজনীর সিদ্ধান্ত এই যে ব্যক্তি মানুষ তার সচেতন ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনকে পরিণতি দান করতে পারে না। সেইজন্যই জীবনে এত অন্তর্দ্বন্দ্ব। চারুবালার সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা না থাকলেও সে তার যৌবনের আবেদনকে অস্বীকার করতে পারে নি। চারুকে সে না পারে সামাজিকভাবে স্বীকার করতে, না পারে তাকে অস্বীকার করে বিয়ে করে সংসারী হতে। অথচ এমন একটি অযৌক্তিক অবস্থাকে সে মনে মনে কখনই কামনা করে নি। আবার নিজের মনের মমতা-বোধের সম্পর্কে সে সচেতন বলে কৃষক-সমাজের উপর উপরতলার অত্যাচারকে সে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু একটি প্রতিবাদ-মিছিলে যোগ দিয়ে তার মনের সেই মমতাবোধই একটা দারুণ আঘাত পেল। পুলিসের গুলিতে একজন কৃষককে নিহত হতে দেখে সে সমস্ত আন্দোলনের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল। কৃষকের প্রতি প্রেম যে আন্দোলনের উৎস সে আন্দোলন কেন কৃষককে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে—জীবনের এই প্যারাডক্সকে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। কারণ সে জীবনের একটা লজিকাল ব্যাখ্যা চাইছে। এবং জীবনকে লজিক দিয়ে বোঝা যায় না।

একটি ছোট উপন্যাসের মধ্যে কাহিনীকে একটি নির্দিষ্ট পরিণতি দান করতে পারার কৃতিত্ব কম নয়। লেখকের বক্তব্যকে পাঠক গ্রহণ করতে পারছেন কিনা সাহিত্য বিচারে তা বড় কথা নয়, পাঠক লেখকের বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততা অনুভব করছেন কিনা সেইটেই আসল কথা। সেদিক দিয়ে পূর্ণেন্দুবাবু কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। কিন্তু লেখক তার চেয়েও বড় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন চরিত্রাঙ্কনে। তিন ভাই এবং দুই বউ নিয়ে রজনীদের সংসারের প্রত্যেকটি চরিত্র এবং প্রত্যেকটি ঘটনা অত্যন্ত জীবন্ত। বস্তুতঃ সমগ্র কাহিনীর মধ্যে এই সাংসারিক চিত্রটিই সবচেয়ে উপভোগ্য। সুরেন এবং রমণীকে কৃষক বলে চিনতে ভুল হয় না, তবু তারা এক একটি সর্বজনীন মানবপ্রকৃতির প্রতিরূপ। তুলনায় চারুবালা অনেক নিষ্প্রভ। তার প্রেমের গভীরতা এবং ঐকান্তিকতা বা রহস্যময়তা পাঠকের কাছে ধরা পড়ে কিনা সন্দেহ।

লেখকের দুর্বলতা এই যে, যে বিষয়বস্তুকে লেখক গ্রহণ করেছেন তাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার ভাষা এবং আঙ্গিক লেখক এখনও আয়ত্ত করতে পারেন নি। চরিত্রসৃষ্টিতে লেখকের মুনশীয়ানার পরিচয় আছে। কিন্তু চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত নাটকীয়তাকে পরিস্ফুট করার জন্য কাহিনীকে আরও অনেক বিস্তৃত করার আবশ্যকতা ছিল। ঘটনার মধ্যে উৎকণ্ঠা সৃষ্টির দিকে আর একটু মনোযোগ দিলে ভাল হত।

বইখানি লেখকের প্রথম উপন্যাস। কাজেই বইটি কী হয়ে উঠেছে এ প্রশ্নের চেয়ে বড় কথা হল বইটি কী হয়ে উঠতে পারত। আমার মনে হয় একটি মহৎ উপন্যাস হওয়ার উপাদান বইটিতে ছিল। এ কথার অর্থ এই যে লেখক তাঁর মনের ব্যর্থতা-বোধকে অতিক্রম করে যদি আবার চেষ্টা করেন তা হলে তিনি কালক্রমে মহৎ উপন্যাস লিখতে পারবেন। অচ্যুত গোস্বামী

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-৫৮৩৬
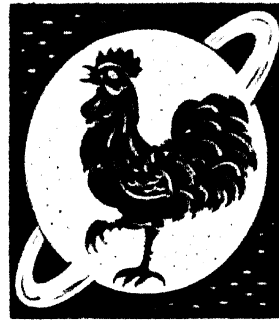
৩২শ বর্ষ,
৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬৭

সংবাদ-সাহিত্য

দেশে কয়েকদিন ধরিয়া বিশ্বাস-অবিশ্বাস দুই দিক বজায় রাখিয়া সংবাদ ও মন্তব্য বাহির হইয়াছিল—এক ইতালীয় মরমী সাধু ঘোষণা করিয়াছেন, এই জুলাইয়ের ১৪ই তারিখে পৃথিবীতে মহাপ্রলয় সংঘটিত হইবে। আমরা বহু বাধে অর্জিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বাহুতঃ সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেও আমাদেরই সমসাময়িক-দের আনন্দময়ী মা, বালক ব্রহ্মচারী, অনুকূল ঠাকুর, ভবানন্দ স্বামী, ওঙ্কারনাথ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবে অন্তরে ভারতে সাধুসন্তদের কথায় বিশ্বাস রাখি। তাহার উপর জানিতে পাইলাম, রোমক সাধু আসন্ন প্রলয়ের ভবিষ্যদ্বাণী দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই—উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ও উপাদেয় (পরম!) পানীয়সহ পাহাড়ের চূড়ায় নূহের মত স্বয়ং সদলবলে এ যুগের আরারত-পর্বতের শিখরে আশ্রয় করিয়াছেন। তখন আর দুর্বলা সাধা কাগজের উপর বৃথা কালির আঁচড় কাটিয়া হিজিবিজি "সংবাদ-সাহিত্যে"র কচুড়ি করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। দেবী চৌধুরাণীর মহামান্য শ্বশুর হরবল্লভ রায়ের মত মনে হইতেছিল, মরিয়াই যখন গিয়াছি তখন আর দুর্গানাম করিয়া কী হইবে।

তথাপি, মানুষ হইয়া যখন জন্মিয়াছি, মৃত্যু প্রত্যক্ষ জানিয়াও মরণের বাস্তিলটিকে বৈতরণীর ওপারে ফেলিয়া রাখিতে মন সরে না। শুনিয়াছি, ফাঁসীর আসামী অনুরোধের ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করিতে করিতে মাথার টেরিটি বিপর্যস্ত হইয়াছে কি না হাত বুলাইয়া দেখিয়া লয়। প্রলয়ের মুখে দাঁড়াইয়া আমরাও গত কয়েকদিন টেরি বাগাইবার কাজে নিজেদের ভুলাইয়া রাখিয়াছিলাম। নববর্ষাগমে লাইব্রেরি-কক্ষে শতধারায় উই-আবির্ভাবের মহোৎসব শুরু হইয়াছিল। ইঁদুরেরাও নিষ্ক্রিয় ছিল না। শৈশবে-পড়া কবিতার নির্দেশ মানিয়া উই আর ইঁদুরের ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ডি. ডি. টি. অভিযান চালাইতেছিলাম। ১৪ই জুলাই রাত্রিটা মৃত্যু-হাসিদের নেশায় বুঁদ হইয়া কাটাইয়া দিলাম। আজ ১৫ই তারিখের ভোরে দীর্ঘকালের অভ্যাসবশে ডেস্ক-ক্যালেণ্ডারের তারিখ পালটাইতে গিয়া সহসা হুঁশ হইল! তাই তো, বাঁচিয়াই তো আছি! আশেপাশে চারিদিকে তাকাইয়া পুরাতন পচা মামুলী গতানুগতিক পৃথিবীর সেই পরিচিত দুর্গন্ধ নাকে আসিয়া লাগিল, কোমরটা মরদ্-কি-বাত এবং নিউটন চাচার মাধ্যাকর্ষণের টানে কনকন করিয়া উঠিল, অনুভব হইল আবার সেই বাস-ট্রাম-ধাক্কাধাক্কি-ঠেলাঠেলি-ধোঁয়া-লাউডস্পীকার ভেদ করিয়া শনৈঃশনৈঃ যমের

আজ আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য যে মহাত্মা গান্ধীর মত সুবিবেচক, মানবপ্রেমিক এবং সাহসী নেতা, এই পরিকল্পিত হাঙ্গামা প্রশমনের জন্য বিপন্নদের মধ্যে দীর্ঘদিন বাস করিয়া শঙ্কিত ভীতসন্ত্রস্ত মানুষদের মনে সাহস ও বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে কেহই নাই। বিনোবা ভাবে-জী আছেন কিন্তু পদব্রজে ভ্রমণের পণ ত্যাগ না করিলে অকুস্থানে পৌঁছিতে তাঁহার বহু বিলম্ব ঘটিবে। রাষ্ট্রীয় পরিচালকেরা যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ভয়ার্তের ভয় দূর করুন কিন্তু তাহাদের মনে সাহস ও বিশ্বাস ফিরাইবার জন্য মহাত্মাশ্রেণীর মানুষ প্রয়োজন। বিপন্ন সাধারণ মানুষকে ত্রাণ করিবার মহৎ ব্রতে সকল অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁহারা অগ্রসর হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—

বর্তমানের চিন্তা মানুষকে যখন কূল-কিনারায় উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারে না তখন তাহা দিগ্‌ভ্রান্তের মত সর্বত্র হাতড়াইয়া ফেরে; অতীতে প্রবেশ করিয়া নজির খোঁজে, ভবিষ্যতে পাড়ি দিয়া আশা ও আশ্বাসের সন্ধান করে। এলোমেলো চিন্তার মধ্যে অনুভব হইল আমাদের এই জেনারেশনের (পুরুষের) ভাগ্য কী অদ্ভুত। বিড়ম্বিতও বলা যাইতে পারে, আবার বিচিত্র ভাবে সার্থকও বলিতে পারি। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিকালে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, তাহার উত্তেজনাময় পরিবেশে আমাদের জন্ম। দুই দুইটা বিশ্বমহাযুদ্ধের ঝড় আমাদের উপর দিয়া নির্মম ভাবে বহিয়া গেল। তরল বিশ্বাস সংশয় ও যুক্তিবাদের মধ্য হইতে আমরা নিরেট কঠিন জড়বাদ ও বিজ্ঞানবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কামান-মেশিনগান হইতে অ্যাটম বোমায়, জেপেলিন হইতে জেটবিমানে এবং বেলুন হইতে ভি. টু রকেটে আমরা অনন্ত মহাকাশের শান্তি বিঘ্নিত করিতে শিখিয়াছি। কাইজার উইলহেল্‌মের বিসমার্ক-প্রশ্রয়-প্রাপ্ত আকাশচুম্বী দম্ভ আমরা যেমন দেখিয়াছি, তেমনই দেখিয়াছি কলির বিশ্বামিত্র সন্ন্যাসী হিট্‌লারের নব আর্যস্থান রচনার স্বপ্ন। কালের গদাঘাতে কাইজারের দম্ভ এবং হিটলারের স্বপ্ন দুই-ই চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িতে আমরাই দেখিলাম। আত্মবিস্মৃত সাহিত্যিক মুসোলিনীকে দুনিয়ার জন্য ডিক্টেটর 'ডুচে'র ভূমিকায় মিলিটারী বুট পায়ে রোমের রাজপথ প্রকম্পিত করিতে দেখিয়া যেমন বিস্ময়বোধ করিয়াছিলাম, সেই বজ্রকণ্ঠ পুরুষকে সেই রোমের রাজপথেই স্তব্ধ ও নিগৃহীত দেখিয়া কম আশ্চর্য হই নাই। প্রবল প্রতাপান্বিত জারের শোষণ-অত্যাচারে একেবারে কোমর ভেঙে-খসা—নীচু তলায় পতিত রুশিয়াকে ১৯০৫ ও ১৯১৭ সনে বৈপ্লবিক গা-ঝাড়া দিয়া ধীরে ধীরে স্কাই-স্ক্র্যাপারেরও উঁচু তলায় উঠিতে আমরাই দেখিলাম। ইংরেজের গোলার মুখে গেলানো আফিমের নেশায় আত্মবিস্মৃত মহাচীনকে শেষ পর্যন্ত রুশ তন্ত্রের জোরে প্রমত্ত ও ভয়ঙ্কর হইতে দেখিয়াছি, তাহাদের শেষ পরিণতি কী হইবে দেখিবার প্রতীক্ষায় আছি। লেনিন ট্রট্‌স্কি স্টালিন সানইয়াৎসেন চিয়াং-কাইশেক তোজো ইহারা সকলেই আমাদের দেখা লোক। কালের সমুদ্রবেলায় বসিয়া তরঙ্গাভিঘাতে ইহাদের উত্থান পতন বল অপবল খ্যাতি বিড়ম্বনা প্রতিপত্তি লাঞ্ছনা আমরা অবিরত অবলোকন করিয়াছি। ক্রুক্‌স-আইনস্টাইন, ফোর্ড-নর্থক্লিফ, চ্যাপলিন গ্রেটাগার্বো, ইসাডোরা-পাবলোভা, গালিকুর্চি-শালিয়াপীন, ব্যাল্ডুইন-রেম্‌জে-ম্যাকডোনাল্ড, পিয়ের ও মাদাম কুরি-প্যাবলভ এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীকে আমাদেরই শতকালের পৃথিবীকে জ্ঞানসমৃদ্ধ, সুস্থ, স্বচ্ছ, সুন্দর, মনোহর ও মহৎ করিবার জন্য নিরন্তর সাধনা করিতে দেখিলাম। কিন্তু পরিণাম কী হইল।

আমরা বর্তমানে এই বাংলাদেশে যে শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এতদিনের এত জ্ঞান, এত শিক্ষা এত আত্মত্যাগ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যে পঙ্কিল কর্দমের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি তাহাতে আশা বা বিশ্বাস আর একটুকু অবশিষ্ট নাই। কে আমাদের এই সর্বনাশ ঘটাইল? কেন আমরা এমন উদ্যমহীন অবসন্ন মৃতপ্রায় হইয়া স্বদেশেই ধীরে ধীরে প্রবাসী হইয়া পড়িয়াছি? জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেন আমাদের পরাজয় ঘটিতেছে? আমাদের

নাই, বস্ত্র নাই, বাসস্থান নাই, কাজ নাই। আমাদের
তে অপরে চাষ করিতেছে, আমাদের ভিটায় অপরে
করিতেছে, আমাদের বাজারে অপরে ব্যবসা
তেছে। আমাদের ধন মান প্রাণ সকলই যদি
দের হাতে তুলিয়া দিতে হইল তাহা হইলে ১৮০১
ল হইতে পাশ্চাত্ত্য মেটিরিয়ালিষ্টিক শিক্ষায় শিক্ষিত
। আমরা কী করিলাম। এই যে মহাপুরুষ
শ শতাব্দীর বাংলাদেশে জন্মিলেন এবং আমাদের
। করিয়া প্রাণ দিলেন—তাঁহাদের আবির্ভাব-
হারে একুনে ফল কী হইল। আমরা কি কেবল
ষ্ঠী দলিল-দস্তাবেজ, সংবাদপত্র ও পুথি ঘাঁটিয়া
দের আদর কাটিতে থাকিব? নূতন ইতিহাস কই?
মহৎ মানুষ কই? আত্মপ্রতিষ্ঠ জাতি কই?
ক্ষোভ স্বাধীন হইয়াছে, আমাদের স্বাধীনতার
র মূল্য কী? আজ হইতে সাতাশ বৎসর পূর্বে
নতার নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যেই অগ্নিমন্ত্রদীক্ষিত
লিখিয়াছিলাম:

এর চেয়ে মৃত্যু ভাল

চেয়ে মৃত্যু ভাল, জানি জানি তাও জানি জানি,—
শার অন্ধকারে প'ড়ে থাকা চিরদিনমান,
র যাওয়া ভাল তার চেয়ে।
ড় প'ড়ে মার খাওয়া—ম'রে যাওয়া ভাল তার চেয়ে—
কথা জেনেছি কবে, তবু আজো মরিতে পারি না।
রে কি করি তবু, জীবনেরে ভালবাসি এত?
াতে আঘাতে আর নিঃসংশয় অপমান মাঝে
লিয়া উঠে বুকে আশা-আনন্দের বন্যাস্রোত?
যেন রয়েছে বাকি বিধিলিপি আমার ললাটে,
নের খাবদাহ উত্তরিয়া পাব একদিন
নবজন্মকান্তি আমাদের স্বপ্নধ্যানখানি,
নার অরুণ-আলো হয়তো বা সহসা একদা
না লিখিল মোর মৃত্যুমুখ শীতল ললাটে
কার-নিশিশেষে হাসি যাবে উজ্জ্বল পরশ—
বেঁচে আছি তারি প্রতীক্ষায়?
মরিতে পারি না ব'লে বাঁচিয়া রয়েছি এতদিন;

আমার ক্ষুধার অন্ন বুকে ল'য়ে জননী বসুধা
নিশিদিন জেগে আছে মোর মুখে নিরখি চাহিয়া।
শস্যভূমি করিতেছে নদীর প্রবাহে,
অন্তরে কাটিতেছে মাটি,
স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ আর কঠিন ইন্ধন,
পবিত্র ইন্ধন যত, মাতা বসুমতী
রেখেছে সঞ্চয় করি নিজ বক্ষতলে—
মোর প্রয়োজন লাগি জননীর আত্মসমর্পণ।

জননীর বক্ষতল নিষ্পেষিয়া ক'রে যায় যারা,
চক্ষে তাঁর বাষ্পোচ্ছ্বাস জাগে।
এক লইতেছে কাড়ি অন্যের আশ্রয়,
করিছে সংগ্রহ এক, দুটি ভরি আপন কোঠাতে
দু হাতে উড়ায় অন্যে নিরাশ্রয় উল্লাস-অপচয়ে।
নিপীড়িত অসহায় চেয়ে আছি বিমূঢ় বিস্ময়ে,
আতঙ্ক-কম্পিত কর বারবার হানিয়া ললাটে
হাঁকিতেছি—মৃত্যু, এস, মরিতে পারি না একেবারে।
মায়ের বুকের স্তন্য তাও নারি কাড়িবারে পান,
আপনি যা কেন মাতা মুখে তাও পারি না তুলিতে।
আপনার দৈন্যভারে দুর্ভিক্ষের দ্বারদেশে বসি
উন্মুক্ত বক্ষে জাগে বাঁচিবার অক্ষয় কামনা—
মারিয়া মরিতে চাহি, শীর্ণবাহু পারি না মারিতে,
লোলুপ জীবন ল'য়ে মরিতেও নাহি পারি হায়।

এর চেয়ে মৃত্যু ভাল, বেঁচে থাকা নহে স্বাভাবিক।
চলেছে চঞ্চলগতি নবযুগ ব্যাধির প্রকোপে,
অসংযত পীড়িতের যন্ত্রণার বিকৃত বিকারে—
বিকার-বাসনা আনে অসংখ্য উন্মাদ উত্তেজনা।
তারাও বাঁচিয়া আছে মরিবার উপায় আগ্রহে।
বেঁচে থাকা নহে স্বাভাবিক।
দুর্ভিক্ষ মৃত্যুরে আনে প্রাচুর্য মৃত্যুরে দেয় ডাক,

রবীন্দ্রনাথ পাইবেন। তিনি যদি অপঠিত থাকিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই দেখা যাইবে ঠাকুরবাড়ি-পাড়ার তৎকালীন অধিবাসীরা রবীন্দ্র-সরোবর কোন্ রবীন্দ্রনাথের নামে তাহা লইয়া গবেষণা করিতেছেন। হয়তো ততদিনে স্থানীয় চাকদের বড়লোক মালিক একজন রবীন্দ্রনাথ অথবা চলচ্চিত্র নক্ষত্র একজন রবীন্দ্রকুমার গজাইয়া উঠিবেন। এইরূপ যে ঘটিবে তাহার প্রত্যক্ষপ্রমাণ আমরা পাই প্রিন্সেপ স্ট্রীটের বেলায়। যিনি ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার কৌশল আবিষ্কার করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের মর্মস্থলে আমাদিগকে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন তাঁহার নাম আমরা শহরের মানচিত্র হইতে মুছিয়া ফেলিতে একটুকু দ্বিধাগ্রস্ত বা লজ্জিত হই নাই। সরোবরকে রবীন্দ্রনামাঙ্কিত করাতে রবীন্দ্র-সরোবরকে একদিন কায়কোবাদ-সরোবর করিবার সম্ভাবনাও তো রহিয়া গেল।

রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা সমিতির কর্মকর্তাদের কাছে আমাদের নিবেদন এই যে, যদি সমগ্র রচনাবলী স্বল্পমূল্যে দেওয়া সম্ভব না হয় তাঁহার গদ্য (নাটক গল্প বাদ দিয়া) রচনাবলী একত্র করিয়া দশ টাকা মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিলে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার সঙ্গে বাঙালী জাতিকে আত্মস্থ করা, তাহার মেরুদণ্ড ঋজু ও দৃঢ় করার কাজও হইবে। লঘু সঙ্গীত, লঘু চিন্তা, সস্তাই ছবি এবং হাওয়াই জামা বাঙালীকে স্পুটনিক করিয়া শূন্যমার্গ-অভিযানে প্রেরণ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাপূর্ণ ভারী ভারী প্রবন্ধের মর্মগ্রহণ করিলে সমস্ত জাতির নিঃশেষ লোকান্তর প্রাপ্তির প্রবাহ রুদ্ধ হইবে এবং ভবিষ্যৎ বাঙালী কৃতজ্ঞতার সহিত রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি অন্তরে বহন করিবে। প্রবন্ধের বইগুলির দ্বারা বিশ্বভারতী খুব বেশী লাভবান হয় না বলিয়াই আমাদের ধারণা। সুতরাং প্রবন্ধ-বাবদে তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি থাকিবে না।

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে বিশ্বভারতী গ্রন্থ সম্প্রতি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিয়াছেন—এ সিরিজের নাম দেওয়া হইয়াছে "রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী গ্রন্থমালা"। ইহার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য 'জীবনস্মৃতি'র সংস্করণটি। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রগুলি প্রথম সংস্করণ 'জীবনস্মৃতি'র সম্পদ ছিল। এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণের চব্বিশখানি চিত্রই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল বই ১৮০ পৃষ্ঠার সঙ্গে ১০০ পৃষ্ঠা গ্রন্থ-পরিচয়, টীকাটিপ্পনী, তথ্যপঞ্জী, উল্লেখপঞ্জী যুক্ত হওয়াতে রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসরের কাহিনী সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলা হইয়াছে। পাঠককে আর আনুষঙ্গিক তথ্যের জন্য এখানে-ওখানে হাতড়াইয়া মরিতে হইবে না। প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই সিরিজে 'চিঠিপত্র' সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। রায় এম. সি. সরকার বাহাদুরের কন্যা কাদম্বিনী দেবী ও পৌত্রী নির্ঝরিণী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি এই হিসাবে মূল্যবান যে এইগুলিতে আমাদের সাধারণ গৃহস্থ জীবনের বহু সমস্যা ও প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান ও সহজ উত্তর আছে। রবীন্দ্রনাথ যে কতবড় মানব-প্রেমিক, সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয়াদের কাছে এই পত্রগুলি তাহার সাক্ষ্য হইয়া রহিল। জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত রবীন্দ্রজীবনী 'রবীন্দ্রজীবনকথা' সহজ চলতি ভাষায় লিখিত—ঠিক গল্পের মত সুখপাঠ্য। অথচ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অত্যাবশ্যক খবরগুলি স্বল্পপরিসরের মধ্যে সম্পূর্ণ দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থ পড়িলে কবি, কর্মী ও মানুষ রবীন্দ্রনাথের একটা সমগ্র পরিচয় মিলিবে।

যাইতেছে। শিবের সহিত জগতের তুলনা হয়। অসীম অন্ধকার-দিক্-বসন পরিয়া ভূতনাথ-পশুপতি জগৎ কোটি কোটি ভূত লইয়া অনন্ত তাণ্ডবে উন্মত্ত। কণ্ঠের মধ্যে বিষ পূর্ণ রহিয়াছে, তবু নৃত্য। বিষধর সর্প তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়া রহিয়াছে, তবু নৃত্য। মরণের রঙ্গভূমি শ্মশানের মধ্যে তাঁহার বাস, তবু নৃত্য। মৃত্যুস্বরূপিণী কালী তাঁহার বক্ষের উপরে সদা বিচরণ করিতেছেন, তবু তাঁহার আনন্দের বিরাম নাই। যাঁহার প্রাণের মধ্যে অমৃত ও আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ, এত হলাহল এত অমঙ্গল তিনিই যদি ধারণ করিতে না পারিবেন তবে আর কে পারিবে! সর্পের ফণা, হলাহলের নীলদ্যুতি বাহির হইতে দেখিয়া আমরা শিবকে দুঃখী মনে করিতেছি, কিন্তু তাঁহার জটাজালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন চির-স্রোত অমৃত-নিস্যন্দিনী পুণ্য ভাগীরথীর আনন্দ-কল্লোল কি শুনা যাইতেছে না? নিজের ডমরুধ্বনিতে, নিজের অস্ফুট হরগানে উন্মত্ত হইয়া নিজে যে অবিশ্রাম নৃত্য করিতেছেন, তাহার গভীর কারণ কি দেখিতে পাইতেছি? বাহিরের লোকে তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু তাঁহার গৃহের মধ্যে দেখ দেখি, অন্নপূর্ণা চিরদিন অধিষ্ঠান করিতেছেন। আর ঐ যে মলিনতা দেখিতেছ, শ্মশানের ভস্ম দেখিতেছ, মৃত্যুর চিহ্ন দেখিতেছ, ও কেবল উপরে—ঐ শ্মশান-ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন রজত-গিরি-নিভ চারু চন্দ্রাবতংস অতি সুন্দর অমর বপু দেখিতেছ না কি? উনি যে মৃত্যুঞ্জয়; আর মৃত্যুকে কি আমরা চিনি? আমরা মৃত্যুকে বিকট করাল দশনা লোল-রসনা মূর্তিতে দেখিতেছি, কিন্তু ঐ মৃত্যুই ইঁহার প্রিয়তমা, ঐ মৃত্যুকে বক্ষে ধরিয়া ইনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া আছেন। কালীর যথার্থ স্বরূপ আমাদের জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আমাদের চক্ষে তিনি মৃত্যু আকারে প্রতিভাত হইতেছেন, কিন্তু ভক্তেরা জানেন কালীও যা গৌরীও তাই, আমরা তাঁহার করালমূর্তি দেখিতেছি, কিন্তু তাঁহার মোহিনীমূর্তি কেহ কেহ বা দেখিয়া থাকিবেন। শিবকে সকলে যোগী বলে। ইনি কাহার যোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন?

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে,
বিভূতিভূষিত শুভ্রদেহ, নাচিছ দিক্‌বসনে!
মহা আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশু শশী হাসিয়া চায়,
জটাজুট ছায় গগনে।"

পূর্বেই বলিয়াছি 'ভারতী'তে ১২৯০ চৈত্র সংখ্যায় উদ্ধৃত "প্রসঙ্গ"টি বাহির হয় এবং ১২৯১-এর বৈশাখ সংখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রিত হইতে থাকে। কিন্তু কাজ বেশি দূর অগ্রসর হইতে না হইতে ৮ই বৈশাখ তারিখে কাদম্বরী দেবীর স্বেচ্ছামৃত্যু ঘটিলে পত্রিকাপ্রকাশ স্থগিত থাকে। শুধু সাময়িক স্থগিত থাকা নয়, সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ এই দুর্ঘটনায় এমন বিচলিত হইয়া পড়েন যে 'ভারতী'র প্রকাশ একেবারে বন্ধ করিতে মনস্থ করেন। এই মর্মে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় একটি বিজ্ঞাপনও বাহির হয় এবং 'ভারতী'তে তাঁহার ধারাবাহিক "[illegible]" প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১২৯১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইতে থাকে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী নিজের স্কন্ধে নূতন সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া 'ভারতী' পুনঃপ্রকাশে ব্রতী হন। কাজেই জ্যৈষ্ঠ মাসেই বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা একত্র বাহির হয়। যুগ্মসংখ্যার প্রথম ৬০ পৃষ্ঠা বৈশাখ এবং পরবর্তী ৬০ পৃষ্ঠা জ্যৈষ্ঠ মাসাঙ্কিত হয়। এই বিভাগ যে সম্পূর্ণ অর্থহীন তাহার প্রমাণ যেমন "[illegible]" উপন্যাসের ধারাবাহিক কিস্তির শিরোনামার মাসের নাম ও পৃষ্ঠার সংখ্যায়। এই যুগ্মাঙ্কের কিছির খানিকটা বৈশাখ ও খানিকটা জ্যৈষ্ঠের ভাগে পড়িয়াছে। বৈশাখ-ভাগে ১৮ হইতে ২৯ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের "ডুব দেওয়া" প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। মনে হয়, ইহার উপসংহার-ভাগ "প্রেমের শিক্ষা" ৮ই বৈশাখের অব্যবহিত পরেই প্রবন্ধ-শেষে যোজিত হইয়াছে, এবং এই অংশটুকুই "মৃত্যু-শোকে"র প্রথম প্রকাশ। নিম্নের উদ্ধৃতিতে আমার অনুমানের কারণ নিহিত আছে:

"জগৎকে কখন মিথ্যা মনে করিতে পারি না, যখন জগৎকে ভালবাসি। একজন যে-সে লোক মরিয়া গেলে আমরা সহজেই মনে করিতে পারি যে, এ লোকটা

নীরব নিস্তব্ধ সব,
উঠিছে ঝিল্লীর রব,
প্রাণ যেন উদাস-উদাস।

৪

স্বপনের মহামায়া,
সাধেরে মেলেছে ছায়া,
আবরি রেখেছে প্রাণ মোর—
স্বপনের সেই [illegible]
স্বপনের সেই আলো
নয়ন ধাঁধায় আঁখি মোর।

৫

জগৎ দেখিতে কিসে
এসেছি জগতী তলে,
আর কিছু নাই দেখিবার ?
এ ক্ষুদ্র জীবন ল'য়ে
চলেছি অনন্ত পথে,
পার হোতে মহা পারাবার!

৬

আসিবে কি কোন দিন
ভাঙ্গিবে স্বপ্নের ঘোর,
চিরকাল রবে কি আঁধার!
এ মায়া কাহার মায়া,
বুঝিতে না পারে হিয়া
প্রাণ বলে—"এযে কারাগার"!

তোমাকে

১

নীরব রজনী বুকে,
মৃদু বায়ু মন সুখে
ধীরি ধীরি করে বিচরণ,
চম্পক চামেলি বেলা,
ফুটেছে মালতী মেলা,
মোহিছে পুলকে ত্রিভুবন।

২

ওই বুকে রাখি মাথা,
ওই মুখ পানে চেয়ে,
প্রাণ মোর ঘুমাইতে চায়,
দূরে দূরে হাসে ফুল,
দূরে দূরে নাচে লতা,
দূরে দূরে পাখী গান গায়।

৩

যামিনী জোছনা মাখা,
আকাশ তারকাময়,
ধরণীর হাসিছে কেমন!
এমন সময় প্রিয়ে
কেন গো বিষাদ মুখে
চাঁদমুখ, [illegible]

৪

আজি সোহাগিনী লতা,
কে বল দিয়েছে ব্যথা,
কেন বল এত অভিমান!
সে মধুর হাসিখানি,
কোথায় আমার রাণি,
কেন হেরি বিরস বয়ান!

৫

আমরা দুজনে মিলি,
আছি হেথা নিরিবিলি,
এস সখি মন কথা কই,
গেছে চলে কত কাল,
আরো বল কত কাল,
দুজনে দুজন হোয়ে রই!

৬

জগতের প্রান্ত দেশে,
ওই আকাশের শেষে,
যেথায় তারারা চেয়ে আছে;
সুধামুখী মেয়েগুলি,
কাননে কুসুম তুলি
বেড়ায় মন্দার গাছে গাছে!

৭

ওই দেখ হাত তুলে,
হেসে হেসে দুলে দুলে,
ওই ওরা ডাকিছে তোমায়,

আকাশ খুলেছে দ্বার,
কোন বাধা নাহি আর,
আয় সখি আয় তবে আয়!

উ—

['ভারতী' ১২৯১, ভাদ্র পৃ. ২২৬-২২৭]

এই কবিতা দুটি যে রবীন্দ্রনাথের রচনা, কবিতা দুইটির কয়েকটি পংক্তি ও কয়েকটি শব্দপ্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 'ছবি ও গানে'র "যোগী" কবিতা এবং এই প্রবন্ধের মধ্যে উদ্ধৃত "দশ" প্রবন্ধের শেষ অংশে "নীরব নিশীথে"র আভাস মিলিবে। 'ছবি ও গানে'র "স্মৃতি-প্রতিমা" "মাতাল" প্রভৃতি কবিতার মধ্যে "তোমাকে"র কোনও কোনও বাক্যাংশ লক্ষণীয়। তাহা ছাড়া সবচাইতে বড় প্রমাণ এই যে ১২৯১ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'র লেখকবৃন্দের মধ্যে এই জাতীয় ছন্দ ও ভাব প্রকাশের ক্ষমতা দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির ছিল না। যে কোনও অনুসন্ধিৎসু পাঠক পরবর্তীকালে রচিত 'কড়ি ও কোমলে'র গোড়ার দিকের এবং 'মানসী'র শেষের দিকের কবিতাগুলি মন্থন করিয়া পাঠ করিলে উদ্ধৃত কবিতা দুইটি যে রবীন্দ্রনাথের সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন।

এই "নীরব নিশীথে" ও "তোমাকে" কবিতা দুইটিকে অন্য নাম দিলে ইহাদের মর্ম পরিস্ফুটতর হইবে। "নীরব নিশীথে" = পুরাতন, অন্ধকার, মরণ বা কাদম্বরী দেবী এবং "তোমাকে" = নূতন, জ্যোৎস্না, জীবন বা মৃণালিনী দেবী।

বেনামের আড়ালে অভিমানিনী প্রিয়ার প্রতি প্রথম প্রেম নিবেদন করিয়া রবীন্দ্রনাথ "যোগিয়া" কার্তিক ১২৯১, "শরতের শুকতারা" অগ্রহায়ণ ১২৯১, "কোথায়" পৌষ ১২৯১, "বিদায়" ('কড়ি ও কোমলে' নাম "পুরাতন") চৈত্র ১২৯১ এবং "নূতন" বৈশাখ ১২৯২, "শান্তি" শ্রাবণ ১২৯২ প্রভৃতি কবিতায় ('ভারতী'তে) বিবিধ যুক্তি প্রয়োগে পুরাতনকে সান্ত্বনাদানে বিদায় করিয়া নূতনকে বরণের আয়োজন করিলেন। এই সকল যুক্তির সারমর্ম "নূতন" কবিতার শেষাংশে এইভাবে প্রকাশ পাইয়াছে:

নহে নহে, সে কি হয়! সংসার জীবনময়,
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয় রে, নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়,
তোর সুখ, তোর হাসি গান।
ফোটা' নব ফুলচয়, ওঠা' নব কিশলয়,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে।
যে যায় সে চলে যাক, সব তার নিয়ে যাক,
নাম তার যাক মুছে দিয়ে।
এ কি ঢেউ-খেলা হায়, এক আসে, আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
বিলাপের শেষ তান না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি।
আয় রে কাঁদিয়া লই, শুকাবে দু দিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারিধারা।
সংসারে ফিরিব ভুলি, ছোটো ছোটো সুখগুলি
রচি দিবে আনন্দের কারা।
না রে, করিব না শোক, এসেছে নূতন লোক,
তারে কে করিবে অবহেলা।
সেও চলে যাবে কবে, গীত গান সাঙ্গ হবে,
ফুরাইবে দু দিনের খেলা।

তবে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ২৩শে অগ্রহায়ণ "সে"ও চলিয়া গিয়াছে, "দুদিনের খেলা" হয়তো ফুরাইয়াছে কিন্তু "গীতগান সাঙ্গ" হয় নাই।

শ্রীমান্ জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁহার "কবিমানসী"তে বহু প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইয়াছেন "পুরাতন"কে বিদায় দিবার এই চেষ্টা নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র হইয়াছে। স্থূল সূক্ষ্ম হইয়া, দেহ দেহাতীত হইয়া কবির সমগ্র ভবিষ্যৎ-জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে।

কিন্তু কবি যে ১২৯১ সালেই মানসীকে বিদায় দিয়া প্রেয়সীকে বাস্তব জীবনে সাদরে বরণ করিয়াছিলেন, "তোমাকে" কবিতার মধ্যে তাহার চিরন্তন সাক্ষ্য রহিয়া গিয়াছে। এই কবিতাটিই তাঁহার প্রথম প্রিয়া-সম্ভাষণ, মৃণালিনীর চিত্ত-গগনে রবির প্রথম কিরণ-সম্পাত। রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের দাবি এই কবিতাটি রাখে।

গল্প

পাথর

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাসুদেব তার অতীত দিনের কথা ভাবে। আঃ কি সুখেই না দিন কেটেছে।

মোটর গাড়ি মেরামতের কাজ করত। আর এ-কারখানায়, ও-কারখানায়, কাজের অভাব ছিল না। কালিঝুলি মেখে কাজ করতে হত বটে, কি শীত, কি গ্রীষ্ম, বাড়ি ফিরে সাবান মেখে ভালো করে কাপড়জামা না পরলে মানুষ বলে মনেই হত না। কিন্তু তা হোক, কাজের সুখ ছিল অনেক। মাইনে তো একটা ছিলই, তার উপর গাড়ির একটা পার্টস্ সরাতে পারলেই চুপ করে কিছু উপরি রোজগার হয়ে যেত। তা ছাড়া, এটা-ওটা-সেটা ছোটখাট পার্টসে বাড়ি একেবারে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। গাড়ির পুরনো কলকব্জার দরকার হলে সবাই বলত—বাসু-মিস্ত্রির কাছে দেখো। মল্লিকবাজারে যাবার আগে অনেকে আসত বাসু-মিস্ত্রির বাড়িতে।

স্ত্রী বলত, এত সব কলকব্জা তুমি পাও কোথায়? চুরিটুরি কর না তো?

বাসুদেব হাসত। বলত, চুরি করে না কোন শালা? আমি করি ছোটখাট চুরি, আর আমার কারখানার মালিক যিনি, তিনি করেন বড় বড় চুরি। গাড়িকে গাড়ি ফাঁক করে দেন।

স্ত্রী রাগ করত। বলত, এগুলো ভাল নয়।

বাসুদেব বলত, যা জান না তা নিয়ে কথা বল না। একে চুরি বলে না। এর নাম—বিজিনেস্।

একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। একটুও অভাব ছিল না সংসারে।

আর আজ!

দিনকাল গেছে বদলে। জিনিসপত্রের দাম যেন হু হু করে বেড়ে চলেছে দিন-দিন। বাজারের থলি হাতে নিয়ে বাসুদেব বাজার করতে গিয়ে ভাবে, এ হল কি!

মোটরের কারখানায় কাজ সে এখনও করে। আগে যে-জিনিসটা বেচত দু টাকায়, এখন সেটা সে দশ টাকার কমে ছাড়ে না, তবু তার সংসার অচল।

ছেলেটা ঘড়ি মেরামতের কাজ জানে। বাপের মত কালিঝুলি মাখতে সে রাজী হয় নি, তাই মোটরের কাজ না শিখে ঘড়ির কাজ শিখেছে।

বাসুদেব বলে, বাবু সেজে বড় এবার ব্যাটা, কি খাবি খা। ঘড়িকে-ঘড়ি সরালেও তো কেউ ধরবে না।

ছেলে সে কথায় কান দেয় না। কাপড়ের কোঁচাটা পকেটে পুরে একটা সিগারেট ধরিয়ে হনহন করে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

স্ত্রী বলে, মিনির দিকে আর তাকানো যায় না। এবার যদি ওর বিয়ের ব্যবস্থা না কর তো কোনদিন কী বিপদ ঘটিয়ে বসবে কে জানে।

বাসুদেব জানে সে কথা। এই সেদিন যে মেয়ে ফ্রক পরত, আজ তার রঙিন শাড়ি না হলে চলে না।

মিনির একখানা শাড়ি কিনতে গিয়ে সেদিন জিব বেরিয়ে পড়েছিল বাসুদেবের। মেয়ের বিয়ে সে দেবে কেমন করে?

তার চেয়ে—

বাসুদেব বলে, সাহেবদের কেমন বাপ-মাকে ও-সব ঝক্কি-ঝক্কাট পোয়াতে হয় না। মেয়ে নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নেয়।

স্ত্রী বলে, আমরা তো সাহেব নই।

বাসুদেব বলে, সাহেব হতে আর দেরি নেই।

মুখে বলে বটে, কিন্তু বাপ হয়ে চুপ করেই বা থাকে কেমন করে।

তিন-চারটে কারখানার প্রায় সব মিস্ত্রিদের সে বলে রেখেছিল—মেয়ে আমার দেখতে শুনতে খুবই ভাল।

কায়েতের ঘরের মেয়ে—কত আর খারাপ হবে? ভাল একটি পাত্তর যদি পাও তো ভাই আমাকে খবর দিও।

খবর দু-একটা যে আসে না তা নয়, কিন্তু টাকার খাঁকতি বড় বেশী। শুধু মেয়ে দেখে বিয়ে করতে কেউ রাজী হয় না।

খিদিরপুরের পাঁচু মিস্ত্রি একদিন খবর পাঠাল—পিয়ারসন গ্যারেজে এসে বাসুদেব যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করে।

ডাক্‌সাইটে মাতাল এই পাঁচু মিস্ত্রি। হলে কি হবে, গাড়ির আওয়াজ শুনে দোষ ধরে দেয়। সাহেব-পাড়ার গ্যারেজে তার যেমন রোজগার, তেমনি খাতির।

বাসুদেব গেল তার সঙ্গে দেখা করতে।

পাঁচু বলল, তোমার ছেলের বিয়ে দেবে?

বাসুদেব বলল, ছেলের বিয়ের জন্যে তো ভাবছি না রে ভাই, আমার মেয়ের বিয়ের ভাবনাটাই আগে।

পাঁচু বলল, মেয়ের বিয়ে দেবার টাকা আছে?

না ভাই, টাকাকড়ি কিচ্ছু নেই।

পাঁচু বলল, জানি, আমাদের চুরির পয়সা থাকে না। তবে মদ-ভাঙ তো খাও না, কিছু তো থাকা উচিত।

বাসুদেব বলল, না ভাই, কিচ্ছু নেই।

তা হলে এক কাজ কর।—পাঁচু পরামর্শ দিল, ছেলের বিয়ে দিয়ে যা পাবে, তাই দিয়ে মেয়েটার বিয়ে দাও।

বাসুদেব বলল, মন্দ বল নি।

মন্দ আমি কখনও বলি না।

বলেই পাঁচু তার হাত পেতে বসল। বলল, এই ঘটকালির জন্যে আমাকে কি দেবে বল?

আগে কি পাব তাই ঠিক হোক, তারপর তো ঘটক বিদায়।

এই বলে বাসুদেব হো হো করে হাসতে লাগল। সে ভেবেছিল পাঁচু বুঝি রসিকতা করছে।

কিন্তু না, রসিকতা সে করে না আজকাল। এমনি করেই দু-দশ টাকা তাকে রোজগার করতে হয়। পুরনো গাড়ির দালালি করতে হয়। বিয়ের ঘটকালি করতে হয়।

পাঁচু বলল, তা হলে শোন বাসুদেব, কথাটা তোমাকে খুলেই বলি। মেয়েটি কালো, তবে বডি একেবারে ওল্ড মডেলের গাড়ির মত—রোল্‌স্ রয়েস্!

বাসুদেব বলল, আমার ছেলে কিন্তু খুব সুন্দর। কালো মেয়েকে সে বিয়ে করতে চাইবে না।

পাঁচু বলল, মামার মস্ত গয়নার দোকান। সোনায় মুড়ে দেবে মেয়েকে।

সোনা দিয়ে কি করবে?

পাঁচু বলল, সেই সোনা দিয়ে মেয়ে পার করবে।

বাসুদেব বলল, মেয়ে যদি না দিতে চায়?

পাঁচু বলল, ওর বাপ দেবে।

তারপর যদি কান্নাকাটি করে?

পাঁচু বলল, ঘাড় ধরে বিদেয় করে দেবে।

বাসুদেব একেবারে যেন আশস্ত হল। বলল, তা যদি বল তো বিয়ে দিতে পারি। কিন্তু নগদ টাকা কিছু দিতে হবে। বউ-ভাতের খরচ আছে।

বউ-ভাত না ঘেঁচু! নগদ পাঁচশো পাঁচশো করছে। বলে-কয়ে আমি ওকে এক হাজারে তুলতে পারি—তুমি যদি আমাকে আড়াইশো টাকা দাও।

বাসুদেব বলল, আড়াইশো নয়, দুশো দেব।

পাঁচু বলল, বাস্‌, তা হলে এই কথা রইল তোমার সঙ্গে। সাহেব কোম্পানিতে কাজ করি, বেশী কথা বলতে ভালবাসি না। মেয়ে কবে দেখবে বল?

বাসুদেব বলল, চুপিচুপি একদিন দেখে আসব ছেলেকে না জানিয়ে। আগে তা হলে মেয়ের জন্যে একটি ছেলে ঠিক করি।

পাঁচু চোখ বুজে রইল। চোখ বুজে বলতে লাগল, ছেলে, ছেলে, ছেলে—

স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করে দেখতে লাগল, যদি পাওয়া যায় কোনও ছেলের সন্ধান।

হঠাৎ একসময় সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল: পেয়েছি। তোমার মেয়ের বয়েস কত?

বাসুদেব বলল, মুখে বলি আঠারো, কিন্তু আসলে হল গিয়ে কুড়ি-একুশ।

পাঁচু বলল, বাস্ হয়ে গেছে। ছেলের বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ। বিয়ে একটা করেছিল, বউ মরে গেছে। বাপের একটি ছেলে। বাপ বহুত টাকা করে গেছে ব্ল্যাক মার্কেটে। বাপ মরে যাবার পর সেই সব টাকা এসে পড়েছে ছেলের হাতে। ছেলে দু হাতে টাকা ওড়াচ্ছে। এই রকম একটা জামাই পেলে তোমার বিয়ে হয়ে যাবে।

এই রকমটিই তো চাইছে বাসুদেব। মনে হল, বিয়েটা যদি এক্ষুনি হয়ে যায় তো ভাল হয়। কিন্তু একটা ভয় শুধু মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। মিস্ত্রিরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। গাড়ি মেরামতের কাজ শিখতে গিয়ে ছেলেবেলা থেকে দুটো জিনিস তাদের অভ্যাস করতে হয়। গাড়ির ভাল পার্টস খুলে নিয়ে তার জায়গায় জোড়াতালি দিয়ে গাড়ি চালানো, আর মিছে কথা বলে আনাড়ী খদ্দেরের চোখে ধুলো দেওয়া।

বাসুদেব পাকা মিস্ত্রি হলে কি হবে আনাড়ী বাপ তো। পাঁচু তার সঙ্গে চালাকি করছে কি না তাই বা কে জানে।

বাসুদেব বলল, চল, তা হলে কালই দেখে আসি।

পাঁচু বলল, চল।

বলেই সে আবার সাবধান করে দিল বাসুদেবকে: ও জায়গা থেকেই আমি কিছু কিছু মারব। তোমায় সত্যি কথা বলে রাখছি তোমাকে।

পাঁচুকে সঙ্গে নিয়ে বাসুদেব মেয়েও দেখে এলো, ছেলেও দেখে এলো। পাঁচু মিথ্যা বলে নি। জামাই যে হবে—ছোকরাটা দেখতে যেন একটু কেমন-কেমন। প্রচুর পান খায়, অথচ দাঁত মাজে না। মাথার চুলে 'উত্তমকুমারী' ছাঁট। পরনে লম্বা পা-জামা, আর গায়ে ওস্তাগরের ছাপমারা বুশশার্ট। তা হোক, আজকালকার বড়লোকের ছেলেরা অমনই হয়।

বউমাকে কিন্তু ছেলের পছন্দ হবে না। পাঁচু বলছিল, পুরনো মডেলের গাড়ির মতন মজবুত, আর খোলস রঙের মতন দামী। তা হয়তো সত্যি, কিন্তু গায়ের রঙটি ঠিক হঁকোর মতন।

অনন্তর যদি পছন্দ না হয় তো তখন পাঁচু যা পরামর্শ দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থা করলেই চলে যাবে। গয়নাগুলো লিলিকে পরিয়ে ছাড়িয়ে নিলেই হবে।

সোনার গয়না আর টাকা—একই কথা।

জামাইয়ের মাও রাজী হয়ে গেছে—টাকা চাই না, মেয়েকে সাজিয়ে দিলেই চলবে।

বাসুদেবের স্ত্রী শুনল। ছেলে শুনল। মেয়ে শুনল।

লিলি মুখ বুজে চুপ করে রইল। অনন্ত কিন্তু তার মাকে দিয়ে বলল, মেয়ে দেখতে না। না দেখেই বিয়ে করছি। খারাপ যদি হয় তো বাপের নাম ডুবিয়ে দেব।

অনন্তর বিয়ে আগে। লিলির বিয়ে পরে।

অনন্তর বিয়ের দিন বাসুদেব ভেবেছিল পাঁচুকে এক বোতল মদ দিয়ে ভুলিয়ে রাখবে। তারপর তার পাওনা মেটাবে লিলির বিয়ের পর।

কিন্তু মদপান না করালে পাঁচু বোধ করি ভুলে থাকতে পারত। মদটুকু পেটে পড়বার পরই জ্ঞানবুদ্ধি তার টনটনে হয়ে উঠল। ক্রমাগত চেঁচাতে লাগল, মেসো, আমার টাকা দে।

অগত্যা টাকা বাসুদেবকে দিতেই হল, আর দিতে হল গুনে গুনে কড়কড়ে কুড়িখানি দশ টাকার নোট। বাসুদেবের মনে হল—সে যেন তার পাঁজরার হাড় কখানি গুনে গুনে পাঁচুর হাতে তুলে দিল।

কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই।

পাঁচু থাকে থাকে আর হুড়মুড় হুড়মুড় ওঠে: মেসো, আমার টাকা?

বাসুদেব বলে, দিলাম যে।

পাঁচু বলে, ও, দিলি নাকি?

বার-পাঁচেক টাকা টাকা করবার পর, বাসুদেব তাকে ধমকে দিল। বলল, আচ্ছা মাতালের পাল্লায় পড়লাম তো। লোকজন সব রয়েছে, তারা ভাববে কি?

তখন সে অন্য সুরো ধরল। বলল, ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর্—বউ পছন্দ হল?

বাসুদেব বলল, না, পছন্দ হয় নি। চেঁচামেচি করছে আর বলছে—পালিয়ে যাবে বাড়ি থেকে।

পাঁচু জিজ্ঞাসা করল, ছেলের মা কি বলছে?

কাঁদছে বসে বসে।

পাঁচু বলল, কাঁদুক। তোর হাতে পড়ে তো সারা জীবন কাঁদল, এখনও কান্নার সাধ মিটল না? টাকাগুলো রেখেছিস তো ভাল করে?

বাসুদেব বলল, রেখেছি।

বিয়ে তো চুকে গেছে?

হ্যাঁ।

পাঁচু বলল, বাস। এইবার মেয়ের বিয়েটা সেরে দিয়ে চল্ একবার কাশী থেকে ঘুরে আসি। পুণ্যি হবে।

বাসুদেব বলল, তোমার পায়ে ধরছি, তুমি চুপ কর পাঁচুদা।

আর একটা বোতল না দিলে আমি চুপ করব না।

এই বলে সে আবার চেঁচাতে লাগল।

বেসো।

কি বলছ?

মদ দে। নইলে আমি সব ফাঁস করে দেব।

ফাঁস অবশ্য সে করল না। মেয়ের বিয়েটাও চুকে গেল।

এক-গা গয়না পরে লিলি যখন বরের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠল, বাসুদেব তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এক গ্লাস জল খেল।

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, বললামত্র গয়নাগুলো খুলে দিলে? বউমা কিছু বলল না?

লিলির মা বলল, না।

বাসুদেব চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল, অনন্ত কোথায়?

লিলির মা বলল, মনের দুঃখে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বউমার দিকে একবার মুখ তুলে দেখছে না পর্যন্ত।

বাসুদেব বলল, এইবার তা হলে ওদের বলি—মেয়েটাকে ওরা নিয়ে যাক।

গয়নার জন্যে যদি হাঙ্গামা করে?

বাসুদেব বলল, পুলিস ডাকব।

যা ভাল বোঝ তাই কর বাপু, আমার আর ভাল লাগছে না।

বাড়িতে রাত্রিবাস করছে না অনন্ত। কোথায় কোন্ বন্ধুর বাড়িতে দুদিন কাটিয়ে সেদিন রাত্রে সে বাড়ি ফিরতেই মা বলল, কাল বউমাকে আমরা বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেব ঠিক করেছি। ওর বাবা ওদের বলে এসেছে। সকালেই গাড়ি আসবে।

অনন্ত গম্ভীরভাবে বলল, ভাল।

বলেই সে তার মার খাটের ওপর শুয়ে পড়ছিল। মা বলল, খেয়ে এসেছিস নাকি?

অনন্ত বলল, হ্যাঁ।

মা বলল, তোকে একটি কাজ করতে হবে বাবা।

কি কাজ?

বউমাকে জানিয়ে দিয়ে আসতে হবে কথাটা।

তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব না।

আমি যেতে পারছি না বাবা। ওর গায়ের গয়নাগুলো খুলে নিয়ে লিলিকে পরিয়ে দিয়েছি। বলেছি, লিলি ফিরে আসুক শ্বশুরবাড়ি থেকে, তারপর তোমার গয়না তোমাকেই ফিরিয়ে দেব বউমা।

অনন্ত চিৎকার করে উঠে বলল: বউমা বউমা করছ কেন? কে তোমার বউমা?

মা বলল, ছেলের বউ, তাই বউমা বলছি।

অনন্ত বলল, না, ও তোমার ছেলের বউ নয়। ও তোমার কেউ নয়। এই কথাটা আর বলে আসতে পারছ না যে, এখানে তোমার থাকা চলবে না।

মা বসল তার পাশে। বলল, তা হলে কেমন করে বলব রে? আমার কথাটা তুই বুঝছিস না অনন্ত। আমার লজ্জা করছে।

বেশ, তবে লজ্জাশরম খাও, এই তাকেই পাঠিয়ে দাও গে।

অনন্ত কাকে ইঙ্গিত করছে, মার বুঝতে বাকি রইল না। বলল, তোর বুড়ো বাপকে আর এর ভেতর টানিস নি বাবা।

না, টানবে না! বাবা কেন এর ভেতর আমাকে টানল?

মা বলল, কেন টানল কে জানে বাবা। লিলির বিয়ে এমন না হয় না হত। এর চেয়ে সে অনেক ভাল ছিল। আমি বারণ করেছিলাম অনন্ত। এ পাপ, এ অন্যায়। নিজের মেয়েটিকে পার করলাম, কিন্তু পরের মেয়েটির সর্বনাশ করা কেন? তুই যে বাড়িতে থাকছিস না, নইলে আমার ইচ্ছে ছিল, লিলি ফিরে এলে ওর গয়নাগুলো ওকে ফিরিয়ে দিয়ে—

অনন্ত উঠে দাঁড়াল। কথাটা তার শেষ হল না।

মা বলল, যা বাবা যা। নইলে আমিই তো ওর কাছে শুই। বলবে, শাশুড়ী কিছু বললে না।

আমি ফিরে এসে এইখানে শোব।

বলেই অনন্ত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল অনন্ত। আলো জলছে। মেয়েটা বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছে। দিদির ঘর এটা। মা আর দিদি থাকত এই ঘরে। ঘর না ছাই! বাঁশের বাখারির ওপর কাদালেপা দেয়াল আর খোলার খাপরার চাল। ঘরপিছু তিন টাকা করে নিয়ে বাড়ির মালিক ইলেকট্রিকের লাইন টেনে দিয়েছে।

কিন্তু ঘুমন্ত মেয়েটার সঙ্গে কথা বলবে কেমন করে?

কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল অনন্ত। লোহার শিকল দেওয়া দরজায় ঝনঝন করে আওয়াজ হল। আওয়াজ শুনেই ধড়মড় করে উঠে বসল মেয়েটি। অসাবধানে নিজের শাড়ির আঁচলটা লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়াতে জড়াতে খাট থেকে নীচে নেমে দাঁড়াল সে।

দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই দেখল অনন্ত।

ঘরে ঢুকে খাটের ওপর গিয়ে বসল। কি বলে কথাটা আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না। আড়চোখে একবার আপাদমস্তক দেখে নিল তাকে। মেয়েটিও বোধ করি দেখবার চেষ্টা করছিল। চুরি করে দেখতে গিয়ে হঠাৎ চোখে চোখ পড়ে গেল।

চোখ দুটো মন্দ নয়। শুভদৃষ্টির সময় সেটা সে লক্ষ্য করেছে। তারপর আর ভাল করে দেখে নি একেবারে। গায়ের রঙটা কিন্তু ভয়ানক কালো। মাথার চুল আর গায়ের রঙ যেন এক হয়ে গেছে।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

মেয়েটি চুপ করে রইল। এক হাত দিয়ে শাড়ির আঁচলটা চেপে ধরে আর এক হাত দিয়ে টানতে লাগল শাড়ির পাড়টা।

অনন্ত আবার বলল, কথা কইছ না যে?

কালো চোখের তারা দুটো চোখের কোণে এসে যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল। ঠোঁট দুটি একটুখানি ফাঁক করে কি যেন বলতে চাইল। কিছু বলতে চাইল, না মুখ টিপে হাসল তাই বা কে জানে!

অনন্ত বলল, আমার সঙ্গে কথা বলবে না বুঝি?

এতক্ষণে সে কথা বলল।

আপনি জানেন না বুঝি আমার নাম?

অনন্ত বলল, না।

মিথ্যে কথা। বিয়ের মন্ত্রের সঙ্গে বহুবার উচ্চারণ করেছে যে নাম, সে নাম সে ভোলে নি। এটা শুধু কথা বলবার ছুতো।

মেয়েটি বলল, আমার নাম ঝিনকি।

অনন্ত বলল, বেশ ঝিনকি, এখানে তোমার থাকা হবে না। তুমি গিয়ে তোমার মাকে বলো।

ঝিনকি বলল, আমার মা তো নেই।

কে আছে তা হলে? সেই যাকে তুমি মা বলছিলে, উনি কে?

আমার মাসী।

তোমার ভাইবোন কেউ নেই?

না। আমি একা।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, সেই লোকটা কে? সেই যে বিয়ের সময় বাবার হাতে টাকা দিল?

ঝিনকি বলল, টাকা দেওয়া আমি দেখি নি। বোধ হয় আমার মামা—মেসোমশায়ের ভাই। উনিই সব দেখাশুনো করেন। আমার বাবা তো হাঁপানীর রুগী।

কথা বলতে বলতে ঝিনকি কখন যে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, অনন্ত বুঝতে পারে নি। হঠাৎ ঝিনকির একটা হাতে অনন্তর হাতটা ঠেকে গেল। অনন্ত সরিয়ে নিল তার হাতটা। চোখ তুলে একবার তাকাল তার দিকে। ঝিনকির চোখের কোণটা চিকচিক করছে।

ঝিনকি বলল, আমি জানি, আমাকে আপনার পছন্দ হয় নি।

অনন্ত বলল, হ্যাঁ, সেকথা সবাই জানে।

ঝিনকি বলল, বিয়ে আপনি করলেন কেন?

অনন্ত বলল, আমি কি জানি ছাই। আমার বাবা, আর সেই পাঁচু মিস্ত্রি।

ঝিনকি বলল, আর আমার ওই মামা—মেসোমশায়ের ভাই।

হ্যাঁ, ওরা ষড়যন্ত্র করে দুজনে আর টাকার লোভে এই কাণ্ডটি করলে।

ঝিনকি বলল, আমার জন্যে বাড়িতে আপনি থাকেন না—মা বলছিল।

অনন্ত কথার কোনও জবাব দিতে পারল না। শুধু আর একবার চেয়ে দেখল ঝিনকিকে।

ঝিনকি বলল, আপনি বাড়িতে এসে থাকুন। আমি চলে যাই।

শেষের কথাটি কেমন যেন বেসুরো শোনাল অনন্তর কানে।

হ্যাঁ, সেই ভাল। আমি চললাম।

অনন্ত উঠে চলে যাচ্ছিল। খোলা দরজাটা ভেজিয়ে দেবার জন্যে যেই পেছন ফিরে তাকিয়েছে, দেখল সোজা তার দিকে তাকিয়ে আছে ঝিনকি, আর তার দু চোখে নেমেছে জলের ধারা।

হঠাৎ কেমন যেন মনে হল অনন্তর। ফিরবে না ফিরবে না করেও আবার ফিরে এল। ফিরে এসে বসল ঠিক যেখান থেকে উঠে গিয়েছিল সেই জায়গাটিতে। বলল, কাঁদছ কেন? নিজের মুখেই তো বললে যাবে।

কোনও জবাব এল না মিনতির কাছ থেকে। টপটপ করে চোখের জল পড়তে লাগল তার নিজের শাড়ির ওপর।

ঠোঁট দুটো তার থরথর করে কাঁপছে। নীচেকার ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে আছে জোর করে। কান্না আর থামে না কিছুতেই।

অনন্ত বলল, ধেৎ! ভাল লাগে না।—কাঁদছ কেন?

হাত বাড়িয়ে অনন্ত তাকে টেনে আনল নিজের কাছে।

দাঁড়িয়ে আছে মিনতি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

অনন্ত তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে বসিয়ে দিল নিজের পাশে।

তবু তার কান্না থামে না।

তখন বাধ্য হয়ে অনন্ত এক হাত দিয়ে মিনতির মুখখানি একটু কাত করে তারই বুকের আঁচলটা তুলে নিয়ে সারা মুখটা ভাল করে মুছতে মুছতে নিজের মুখখানা তার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি ডাকল, মিনতি!

মিনতি তার চোখ দুটি তুলে অনন্তর চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, উঁ!

মার ডাক শুনে অনন্তর ঘুম ভেঙে গেল। পাশের ঘর থেকে মা ডাকল, অন্তু!

ধড়মড় করে উঠে বসল অনন্ত। অনেক বেলা হয়ে গেছে। দোর খোলা—মিনতি নেই।

মুখে জল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে অনন্ত পাশের ঘরে এসে দেখল মোড়ার ওপর দশ-বারো বছরের একটি ছেলে বসে আছে।

মা বলল, বউমার মামাতো ভাই।

তারপর চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল, কি হবে রে? বউমাকে নিতে এসেছে।

অনন্ত বলল, বলে দাও—মিনতি এখন যাবে না।

পাঁচটা দিন তখনও পার হয় নি, বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল বাসুদেবের বাড়ির দরজায়। ট্যাক্সিটা লিলিকে নামিয়ে দিয়েই চলে গেল।

চামড়ার বড় ব্যাগটা নিজেই হাতে করে ঝুলিয়ে নিয়ে লিলি তার মার কাছে এসে দাঁড়াল।

মেয়ে এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। মার খুশী হবার কথাই। হাসতে হাসতে মা বলল, আয় মা, আয়।

কিন্তু তার সঙ্গে কেউ নেই। মুখখানি শুকনো। মা জিজ্ঞাসা করল, একাই এলি নাকি? কে দিয়ে গেল?

ওদের সরকার মশাই।

বলতে গিয়ে লিলি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

ওদিকে রান্না করতে করতে মিনতি এসে দাঁড়িয়েছে। অবাক হয়ে গেছে সবাই।

মা বলল, কি হয়েছে? কাঁদছিস কেন? গয়নাগুলো কি হল?

যেমনই কাঁদতে কাঁদতে লিলি তার ব্যাগটা খুলে ফেলল। ব্যাগের ভেতর থেকে কাপড়ে বাঁধা একটা পুঁটলি বের করে তার মার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বলল, সব গিল্টির গয়না। শাশুড়ি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

অনন্তও শুনল সে কথা। ডাকল, মিনু।

মিনতিকে আজকাল সে মিনু বলে ডাকে।

আঁটসাঁট করে শাড়িটাকে গাছ-কোমর বেঁধে পরে মিনতি রান্না করছিল। আঁচলটাকে কোমর থেকে খুলে মাথায় দিতে দিতে পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, কি বলছ?

অনন্ত বলল, তোমার গয়না সব গিল্টির গয়না?

মিনতি বলল, তা হবে।

তা হবে মানে—তুমি জানতে?

মিনতি বলল, আমার সন্দেহ হয়েছিল।

অনন্ত বলল, তবে যে শুনলাম তোমাদের গয়নার দোকান?

এই তো, এই গয়নার দোকান। আমার মামাটি তো এই কারবারই করে।

অনন্ত দাঁতে দাঁত চেপে বলল, জাল।

বাসুদেব কোথায় যেন বেরিয়েছিল, বাড়ি ফিরেই দেখল এই কাণ্ড। ঘরের ভেতর আর ঢুকতে পারল না। দোরের কাছে উবু হয়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল।

লিলির মা তাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল, এদিকে দেখেছ কি কাণ্ড হল? যে মেয়ের বিয়ের জন্যে এত কাণ্ড করলে সেই মেয়ে আবার বাড়িতে ফিরে এল!

কথার কোনও জবাব দিল না বাসুদেব। বিড়ি টানছে তো টানছেই।

বলি আমার কথাগুলো শুনছ?

বাসুদেব চিবিয়ে চিবিয়ে টেনে টেনে বলল, শুনছি, শুনছি।

মনে হল সে যেন পাথর হয়ে গেছে। তার যেন কিছুই আর বলবার নেই।

The loving sage beholds that Mysterious Existence
Wherein the universe comes to have one home;
Therein unites and therefrom issues the whole;
The Lord is warp and woof in created beings.

Yajurveda. XXXII 8.

এক

শৈশবে এক সাধুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম। মাথায় জটা নেই, গায়ে ভস্ম নেই, গলায় নেই রুদ্রাক্ষের মালা। একখানা বাঘছাল, কি একটা কমণ্ডলুও সঙ্গে নেই। আমি বলেছিলুম: এ কেমন সাধু?

পরনে এক খণ্ড সাদা কাপড়, গলায় পইতে। গাছের ছায়ায় বসে সাধু রামায়ণ পাঠ করছিলেন মনে মনে। আমার দিকে চেয়ে একটুখানি হেসেছিলেন।

কাছে গিয়ে আমি বলেছিলুম: হাসলেন যে?

আমি তো সাধু নই, ভক্ত নই। সাধু সাজলে শাস্তি হয়।

তবে সাধুর মত ঘুরে বেড়ান কেন?

সাধু হেসে বলেছিলেন: ঘুরে বেড়াতে যে ভাল লাগে।

পরদিন সকালে এসে সাধুকে আর দেখতে পাই নি। গাছের নীচে লোক জমবার আগেই তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর অনেকদিন সেই সাধুর কথা ভেবেছি। ঘুরে বেড়াবার পথে তিনি সাধু হয়েছিলেন। আমাদেরও পথ আছে, কিন্তু সাধু হই নি। সংসারে থেকে পথের ডাক শুনি। সে ডাক সমুদ্রের গর্জনের মত নয়, বাঁশির সুরের মতও নয়। সে ডাক ফুলের সৌরভের মত বাতাসে ভরে আসে। আফিঙের নেশার মত মন আচ্ছন্ন করে, অস্থির করে। সে ডাকে সাড়া না দিয়ে কে থাকতে পারে জানি নে। যে পারে, তার কানে নিশ্চয়ই পথের ডাক পৌঁছয় না।

হিমালয়ের কথা শুনেছি। হিমালয় ভোলা যায় না একবার দেখলে। এক সন্ন্যাসী নাকি একবার বলেছিলেন, জন্মান্তরেও তার স্মৃতি জেগে থাকে, আকর্ষণ করে চুম্বকের মত। ভগবান কোথায়? কে দেখেছে ভগবান? হিমালয়ের টানেই তো মানুষ সন্ন্যাসী হয়। নয়তো এই ঘোর বস্তুবাদের দিনেও এত সন্ন্যাসী কেন হিমালয়ের বুকে! সেখানে ত্যাগ কোথায়? প্রাণ ভরে সেখানে সবাই সৌন্দর্য ভোগ করছে।

পথের যে টান আছে, দিনে দিনে এ কথা আমার বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে। তা না হলে বেড়াবার জন্যে এই পাগলামি কেন প্রতিদিন বাড়ছে! শুধু একটু প্রশ্রয়ের

সঙ্গে আরও একটু তৃপ্তি ছিল জড়িয়ে। সেই তৃপ্তির অভাবে এই যাত্রা বিস্বাদ লাগছে। বললুম : ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এবারে বিশ্রামের দরকার।

মহিলা বললেন : বেড়াতে আমরা ক্লান্ত হই নে। রাতে ঘুমোতে না পেলে যেটুকু কষ্ট হয়, দিনের বেলায় নতুন দেশ দেখে সব ভুলে যাই।

মনে মনে তাঁর সমস্ত কথা আমি স্বীকার করে নিলুম।

মহিলা বললেন : আপনার যে ভাল লাগবে তাতে সন্দেহ নেই।

কেন বলুন তো?

যে কালিদাসের কথা বললেন, আমরা সেই কালিদাসেরই বিদিশা আর উজ্জয়িনী দেখব। তারপর খাজুরাহো। অদ্ভুত কবিত্বময় স্থান।

ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলেন। কি মনে করে আমার দিকেও একটা বাড়িয়ে দিলেন। অন্যমনস্ক ভাবে আমি সেটা নিয়ে নিলুম। যখন মনে পড়ল আমি সিগারেট খাই না, তখন ভদ্রলোক দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিয়েছেন। আমি আর আপত্তি করলুম না।

ভদ্রলোক সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন : চূর্ণী বলে নেমে পড়ুন, তারপর দেখা যাবে।

সিগারেটের ধোঁয়ায় গলাটা জ্বালা করছে। মনে হল বুকটাও বুঝি জ্বলছে। বললুম : ভেবে দেখি।

বোম্বের আলো অনেকক্ষণ হল মিলিয়ে গেছে। যাঁরা জেগে আছেন তাঁরা ঘুমোবার আয়োজন করছেন। অনেকে ঘুমিয়েও পড়েছেন। অস্মিতা ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বাবা মাও শুয়ে পড়েছেন। আমি আমার কোণটিতে জেগে বসে আছি। আমার চোখে আজ ঘুম আসছে না। দুটি স্বপ্নময় নাম মনে পড়ছে। বিদিশা আর উজ্জয়িনী। আকাশের মেঘের মত মন যায় মুক্ত হয়ে। লঘুপক্ষ পাখির মত ওড়ে, যুগ থেকে যুগান্তরে চলে যায়, বর্তমান থেকে স্বর্ণময় অতীতে। কে দেখেছে সেদিনের ভারত, কে শুনেছে সেদিনের বাণী! সেই যুগান্তরের বার্তা আজ শ্লোকের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। আর কয়েকটি নাম সেই কল্পনার বিলাসকে রেখেছে বাঁচিয়ে। বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব বড় স্থূল হয়ে গেছে। যা চাই, তা হাতের মুঠোর মধ্যে পেতে হবে। নিংড়ে নিংড়ে তার রস বার করে নেব, তারপর অপরিসীম অবজ্ঞায় তাকে ছিবড়ে ফেলে দেব পথের ধুলোর ওপর। বিশ্ব হয়েছে ভোগসর্বস্ব। অনুভবের জগৎ আমরা অনাদরে হারিয়েছি। সেই সেখানে মিলিয়ে যায়, বিদেহী মন যোগে হৃদয়ের স্পন্দন। রামগিরির প্রাণের স্পন্দন বিন্ধ্যকে অতিক্রম করেছে অনায়াসে। যেমন করে আলো করে, বাতাস করে, মেঘ করে, তেমনই করে প্রাণও করে। প্রাণের কথা কয়, এক প্রাণের কথা আর এক প্রাণ শোনে তপস্যা দিয়ে, প্রেম দিয়ে। সাধকে আর প্রেমিকে কোন তফাত নেই। দুজনেই পাগল।

কিন্তু আমার আজ এ কী হল? কেন আমি ঘুমোতে পারছি না। দুটো নাম আজ কেন আমায় অশান্ত করে তুলেছে। আমি তো কবি নই, কল্পনার বিলাস নেই আমার। তবু কেন এরা আমায় টানবে।

সেই সাধুর কথা আমার মনে পড়ল। পথের ধারে যে মানুষটি সংসার ছেড়েছিলেন। সংসার ত্যাগের প্রয়োজনের কথা আমি মানি নি। সংসারে থেকেও যে ঘুরে বেড়ানো যায়। কিন্তু আজ আমার অন্য কথা মনে এল। আজ খানিকটা সন্দেহ জাগছে। বাড়িকে ফেলে মামা মামীকে ছেড়ে আমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। আমার চাকরি আছে। পুজোর ছুটিতে বেরিয়েছিলুম। সে ছুটি আমার কবে গেছে শেষ হয়ে। কাজে তো যোগ দিতে হবে। পয়সা দিয়ে যারা কাজ নেয়, তারা আমার অনিয়মের আর কত প্রশ্রয় দেবে! এ সবই যুক্তির কথা, সত্য কথা। কিন্তু মন কেন মানতে চাইছে না। এমন অবুঝ হলে কি সংসারে থাকা চলে! সংসারে শৃঙ্খলা আছে, শাসন আছে। সংসারে বাস করতে হলে তার বিধিনিষেধকে শ্রদ্ধা করতে হবে। না পারলে সন্ন্যাস নাও, বাণপ্রস্থ গ্রহণ কর। সংসারে থেকে বিদ্রোহ করো না। সেই সাধুকে আজ আমার শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হল। মুক্ত মনের সঙ্গে বন্দীজীবনের সন্ধি করার

দুপুরের দিকে প্রায় রোজই ঘণ্টাখানেকের জন্য সুরজিৎ যায় কফিহাউসে। কফিহাউসের নিজের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে ঠিক চায়ের দোকানের আড্ডা বসে না, রকে বসা ছেলেরা একজোট হলেও গুলতানি করতে ভয় পায়। আবার এ ঠিক প্যারীর কাফেও নয় যেখানে মনীষীর জন্ম হয়। যা ভাল লাগে তা হল এখানকার পাঁচমিশেলী ভিড়। হীরো ওয়ারশিপের কেউ ধার ধারে না। এখানে আসেন অনেক নামজাদা সাহিত্যিক, শিল্পী, চিত্রজগতের দিক্‌পাল। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য অন্যেরা চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না। আর পাঁচজনের মত তাঁরাও আসেন, বসেন, এক কাপ গরম কফি নিয়ে গল্প করে, আবার একসময় সকলের অজান্তে উঠে চলে যান।

সেইজন্যেই সুরজিতের কফিহাউসে আসতে ভাল লাগে। অবশ্য প্রতিদিন আসার অভ্যাস বেশী দিনের নয়, মাস ছয়েক হবে। আগে তার অফিস ছিল ক্লাইভ বিল্ডিংয়ে, এখন উঠে এসেছে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে, তাই লাঞ্চের সময় ঘণ্টাখানেক সে এখানে কাটিয়ে যেতে পারে। সকালবেলা বাড়ি থেকে খেয়ে বেরয় বলে কফিহাউসে বসে খুব যে কিছু খাওয়া হয় তা নয়, একখানা কেক, এক প্লেট স্যাণ্ডউইচ কি বড়জোর ডিমের অমলেট—তাও রোজ নয়। আলুভাজা কি পকোড়ার সঙ্গে কয়েক কাপ কফি তার বরাদ্দ জলখাবার।

প্রথম প্রথম এক কোণে বসে সুরজিৎ কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতো আর শুনত সামনের টেবিলের রাজনৈতিক আলোচনা, কিংবা শিল্প-সাহিত্য নিয়ে তুমুল বিতর্ক। আজকাল কিন্তু আর একলা বসে থাকতে পারে না। এই ক মাসে পরিচয় হয়েছে অনেকের সঙ্গে, সকলেই কফিহাউসের বন্ধু, এখানেই দেখা হয়। খুব একটা ঘনিষ্ঠ আলাপ গড়ে না উঠলেও এদের অনেকের সঙ্গে এমনই একটা সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কারুর সঙ্গে কিছুদিন দেখা না হলে খবর নিতে ইচ্ছে করে হঠাৎ কি হল তার, কেন আসে না কফিহাউসে।

এ পর্যন্ত যার কোনদিন কামাই দেখে নি সুরজিৎ সে হল সুবোধ হাজরা। তামাটে রঙ, পাকানো শরীর, কপালের সবুজ শিরগুলো উঁচু হয়ে থাকে। সব সময় চোখে পরে কাল চশমা। মাঝে মাঝে প্যান্ট আর বুশ-শার্ট পরলেও তাকে মানায় বেশী ধুতি আর গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবিতে। শান্তিনিকেতনী ধরনে কাঁধে থাকে একটা ঝোলা, কথাবার্তার ধরনেই বুঝিয়ে দেয় সে খাঁটি টেম্পারের লোক, নিজের মতের সঙ্গে না মিললেই চট করে রেগে যায়। হাজরা কী কাজ করে ওরা কেউ তা এখনও ভাল জানে না, [illegible] বেশীর ভাগ সময় কাটায় কফিহাউসে, [illegible] দেখে। অনেকেই তাকে পছন্দ না করলেও সুরজিতের ভাল লাগে। কারণ সুবোধ হাজরা নামকরা সমালোচকদের একজন প্রধান। [illegible] নামে যে [illegible] অর্জন করেছে হাজরাই [illegible] সম্পাদক। শুধু সম্পাদক বললে বোধ হয় সুবোধের সবটুকু পরিচয় দেওয়া হয় না, এই কাগজের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ একমাত্র সেই করে।

আজ হাজরা এক কোণে চুপচাপ বসেছিল, এটার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই সুরজিৎ জিজ্ঞেস না করে পারে না: কি ব্যাপার, চুপচাপ যে?

হাজরা শুকনো মুখে উত্তর দেয়, খুব মুশকিল, আর ভাল লাগছে না।

কেন?

আজকের বাংলা কাগজ পড়েছেন?

না। কেন?

হাজরা চোখ পাকিয়ে বলে, সমালোচনার নামে যা-তা, গালাগাল করেছে। আমাদের 'বঙ্গ বলাকা'র প্রযোজনাটার কিছুই নাকি তার ভাল লাগে নি। না সেট, না অ্যাক্টিং—শুধু প্রশংসা করেছে দুটি মেয়েকে যারা একেবারেই পার্ট করতে জানে না।

কেন জানা নেই প্রগতি-মঞ্চের নাটককে কাগজে গালাগাল দিয়েছে শুনে সুরজিতের ভাল লাগল। মনে মনে ঠিক করল, এক কপি কাগজ কিনে বাড়ি নিয়ে যাবে। তবু চোখেমুখে বিস্ময়ের ভাব এনে বলে, কেন এ রকম করলে বলুন তো?

ভিড় ভাঙবার আগে ট্রাম ধরে এসপ্ল্যানেড থেকে যায় বালীগঞ্জে প্রগতি-মঞ্চের অফিসে। আজ তার হাতে প্রায় দু ঘণ্টা বাড়তি সময়, পকেটে পয়সা থাকলে সে যে-কোন একটা সিনেমায় ঢুকে পড়ত, কিন্তু তাও নেই। অগত্যা সে হাঁটতে শুরু করে।

মেট্রো পেরুলে ইউ. এস. আই. এদের বড় বড় কাচের শো-কেস, সেখানে এব্রাহাম লিঙ্কন আর গান্ধীর তুলনা করে নানারকম ছবি দিয়ে কি সব লিখে রেখেছে। হাজরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখে। মনটা এতই অন্যমনস্ক যে লেখাগুলো একবার পড়ে গেলেও কি পড়ল বুঝতে পারে না। ইউ. এস. আই. এদের অফিসের ভেতর থেকে দুটি মেয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল, তাদের মধ্যে একজন হাজরার পরিচিত। প্রগতি মঞ্চের কোন একটা নাটকে কিছুদিন অভিনয় করেছিল। পাছে দেখা হলে 'বন্ধ বলাকা'র কথা তোলে তাই পাশ ফিরেই হাজরা দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করল।

লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে কোন্ দিকে যাবে ভাবছিল হাজরা, এমন সময় তার সামনে দিয়ে চলে-যাওয়া দোতলা বাসের ওপর থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকে। বাসটা সামনের স্টপে গিয়ে দাঁড়াতেই নেমে এল অলক। হাজরার দিকে এগিয়ে এসে বলে, আমি তোকেই খুঁজছিলাম, আজ কফিহাউসে যাস নি?

হাজরা নাকটা কুঁচকে বলে, গিয়েছিলাম, তবে টিকতে পারলাম না। একটা সিগারেট দে।

অলক পকেট থেকে সিগারেট বার করে দেয়: চল্, কোথাও বসে একটু কথা বলা যাক।

কোথায়?

অলক হাতঘড়িটা দেখে নেয়: খেতে হবে, সারাদিন খাওয়া হয় নি। চল্, কোন পাঞ্জাবীর দোকানে যাই।

দুজনে লিণ্ডসে স্ট্রীটের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

অলকের চুল উস্কোখুস্কো, প্যান্ট-সার্টও ময়লা। হাজরা সেইদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কোথায় গিয়েছিলি?

একটা স্টেজ-রিহার্সাল ছিল।

কাদের?

স্কুলের শো। মেয়েদের নাচ, দু-একটা নাটকের দৃশ্য, লাইটিং করতে হবে—এই আর কি।

সে যাই হোক, টু পাইস থাকবে তো?

অলক হাসে: তা থাকবে। বড়লোক স্কুল, আলোর ভাড়া দিয়েও গোটা পঞ্চাশ টাকা ম্যানেজ করব।

হগ মার্কেটের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সিনেমাটা পেরিয়ে তারা এসে পৌঁছল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডে। এখানকার পাঞ্জাবী রেস্তরাঁগুলোর বেশ নামডাক আছে। দোকানে বসে খাওয়া-দাওয়ার চেয়েও কিনে নিয়ে যাওয়ার ভিড় এখানে বেশী। বড় বড় গাড়ি এসে থামে দোকানের সামনে, তন্দুরী-মুরগী তুলে নিয়ে যে যার বাড়ি চলে যায়। অলকের বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থা নেই, তাই দু বেলাই তাকে খেতে হয় বিভিন্ন রেস্তোরাঁয়। যেদিন যে দোকান কাছে পায় সেখানেই ঢুকে পড়ে। তবে এখানকার এই পাঞ্জাবী দোকানগুলোর ওপর যেন তার একটু দুর্বলতাই আছে।

রেস্তরাঁর মধ্যে ঢুকে পেছনের দিকের একটা টেবিলে বসে ওরা হাতে-গড়া রুটি আর মাংসের অর্ডার দেয়।

এতক্ষণে হাজরা জিজ্ঞেস করে, কেন আমাকে খুঁজছিলি বললি না?

অলক অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, হাঁ, বলছি। মানে তোকে যে বলাই মুশকিল, দুম করে জ্বলে উঠবি।

অলক কথাটা বলতে সত্যিই ভয় পাচ্ছিল। তা দেখে হাজরার হাসি পায়: তা হলে সে রকম কথা বলিস না।

মানে আমি বলছিলাম কি, প্রগতি-মঞ্চের জন্যে দু-একজন বাইরের আর্টিস্ট নিলে ক্ষতি কি? নাটক ভাল, অভিনয় ভাল, সেই সঙ্গে যদি দু-একটা বক্স-অফিস নাম থাকে, দেখবি কি কাণ্ড হয়। আপনা থেকেই টিকিট বিক্রি হবে, এখনকার মত আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে টিকিট গুঁজতে হবে না। কাগজওয়ালারাও অনেক সময়ে মতামত লিখবে।

হাজরা বুঝতে পারে এ সব অলকের নিজের কথা নয়, কেউ তাকে বুঝিয়েছে। হেসে জিজ্ঞেস করে, কে তোকে ওকালতি করতে পাঠাল? কুন্তল বুঝি?

সুরজিৎ তার দিকে মুখ তুলে তাকায়, কথা বলে না, চোখ তার আনন্দে উজ্জ্বল।

দাদার এ অভিব্যক্তির সঙ্গে মাধবী সুপরিচিত: কি রে, নতুন কিছু খবর আছে বুঝি? বল্ না।

আমার নাটক রূপী থিয়েটারে প্লে হবে।—কথা বলতে গিয়ে আনন্দে সুরজিতের গলা কেঁপে ওঠে।

সত্যি? কোন্‌টা?

'নূতন যুগের ভোরে'।

দাদার এ সৌভাগ্যে আনন্দে অধীরা মাধবী চোখের জল সামলাতে পারে না: আমি তো আগেই বলেছিলাম খুব ভাল লেখা হয়েছে, এতে যা তোর নাম হবে না, দেখিস।

মা কোথায় রে?

শরীরটা ভাল নেই, শুয়ে পড়েছেন।

সুরজিৎ উদ্বিগ্ন হয়: কি হয়েছে?

না, আজ একাদশী কিনা। সারাদিন কিছু খান নি, কোমরের ব্যথাটাও একটু বেড়েছে।

ওষুধ খেয়েছেন?

হ্যাঁ। দেখি যদি জেগে থাকেন।

মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, একটু বাদেই পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে ডাকে, দাদা, মা ডাকছেন, এঘরে আয়।

সুরজিৎ মার ঘরে গিয়ে দেখে পদ্মাবতী উঠে বসেছেন, সস্নেহ হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে জিজ্ঞেস করলেন, কই, আমাকে তো আগে বলিস নি। রূপী থিয়েটারের সঙ্গে কবে তোর কথা হল?

সুরজিৎ মায়ের খাটটিতে এসে বসে: পাছে না হয় তাই আগে বলি নি।

কাল তোর জ্যাঠামণি আর কাকাবাবুকে বলে আসিস।

সুরজিৎ বাধা দেয়: না, মা এখন থাক, এ লাইনের লোকদের কথার কোন দাম নেই। তারপর ওরা যদি নাটক না নামায়, সবাই আমায় খেপাবে। তোমরাও কাউকে বলো না।

পদ্মাবতী মাধবীকে বললেন, তোদের খাবার জায়গা কর্ মা, আমি গিয়ে বসছি।

তুমি আবার কেন উঠলে, শুয়ে পড়।

পদ্মাবতীর গলা অন্য রকম শোনায়: উনি কিন্তু আমায় বরাবর বলতেন, খোকা বড় হলে লেখক হবে।

তাই নাকি, বাবা এ কথা বলতেন?

পদ্মাবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন: হ্যাঁ। আমি অবশ্য হেসে বলতাম খোকা ব্যারিস্টার হবে। কিন্তু ওঁর কথাটাই ফলল।

সুরজিৎ ও মাধবী দুজনেই বিস্মিত হয়। মায়ের মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে সুরজিৎ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, তুমি কি খুশী হও নি?

অশ্রুসজল পদ্মাবতী উত্তর দেন, কেন হব না। খোকা খুশী হলেই আমি খুশী। চল, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ খাটে শুয়ে থেকেও কিছুতেই সুরজিতের চোখে ঘুম এল না, এপাশ ওপাশ করে শেষকালে উঠে পড়ল, একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করল ঘরের মধ্যে। ভুলে যাওয়া অনেক কথা আজ তার মনে পড়ছে। জ্যাঠামশাইয়ের বিরাট খাট-খানাকে স্টেজ বানিয়ে তারা থিয়েটার করত জাঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনেরা সব মিলে, সঙ্গে থাকত পাড়ার ছেলেরাও। দেখতে আসতেন বাড়ির গুরুজনেরা। খাটের নীচেই ছিল গ্রীনরুম, সেখানে মাথায় পাগড়ী বেঁধে রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র সেজে বসে থাকত সুরজিৎরা, তাদের ভূমিকা আসলেই খাটের ওপর উঠে নিজেদের পার্ট বলে এসে আবার ঢুকে যেত খাটের নীচে। শুনত দর্শকদের হাততালি, আবার পর্দা ফাঁক করে দেখত কারা কতখানি হাসছে।

সে প্রায় বিশ বছর আগেকার কথা। সুরজিৎ তখন ছ সাত বছরের ছেলে। সে সময় যার সবচেয়ে বেশী উৎসাহ ছিল, সে হল অতীশদা—সুরজিতের জাঠতুতো দাদার বন্ধু। বাড়িতে কোন উৎসব হলে—সে মুখেভাত, পইতে, কি সরস্বতী পুজো—যাই হোক না কেন অতীশদা আর দাদা ভাই-বোনদের নিয়ে নামাত থিয়েটার। রোজ সন্ধ্যেবেলা চলত রিহার্সাল, হৈ-হৈ আনন্দের মধ্যে কাটত দিন।

কিন্তু যখন পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাটক করার উৎসাহ কমে গেল এ বাড়িতে, বিশেষ করে অটলদা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে কলকাতার বাইরে চলে যাবার পর থেকে। দাদা এখন ব্যারিস্টার, খুব মন দিয়ে প্র্যাকটিস করে, ছেলেবেলার নাটকের কথা উঠলে হেসে পাইপ কামড়ে বলে, অটলের খেয়ালে সেকেণ্ড-ক্লাসটা [illegible] দিয়েছিল, [illegible] সময় নষ্ট করতে [illegible] [illegible]।

সবাই ছেড়ে দিলেও মঞ্চের নেশা যেন পেয়ে বসল সুরজিৎকে। বাড়িতে আর অভিনয় না হলেও সে [illegible] [illegible] কলেজের ক্লাবে। যে কোন [illegible] অভিনয় করে ছোট-বড় [illegible]। তখনও সে অভিনেতাই। নাট্যকার সুরজিতের [illegible] জীবনে। একাঙ্ক নাটক দিয়ে শুরু করে [illegible] বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক।

কলেজ-জীবন থেকেই তার পরিচয় বিদেশী নাট্যকারদের সঙ্গে। সেক্সপীয়ার তাকে মুগ্ধ করেছে। হ্যামলেটের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ম্যাকবেথের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ওথেলোর ঈর্ষার জ্বালা কি ভাবে তাদের অন্তলোকে টেনে নিয়ে গেছে চরম পরিণতির দিকে, তা পড়তে পড়তে মন উদাস হয়ে পড়েছে অদ্ভুত কারুণ্যে ভরে গেছে। আবার দিক দিয়ে দেখতে গেলে সে যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার মার্লো। সেক্সপীয়ারের আগে জন্মেও দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের ট্র্যাজেডি সার্থক ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। সুরজিতের ভাল লাগে অস্কার ওয়াইল্ডের নাটকের কথোপকথন। কি তীব্র শ্লেষ। সুদূর নরওয়ের হেনরিক ইবসেন তাকে নাড়া দিয়েছে; নাটকের মধ্যে দিয়ে সমাজকে সচেতন করে তোলার কি অপূর্ব প্রয়াস। মাত্র কয়েকটি নাটক লিখেই তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন বিশ্বসাহিত্যে। তাঁর রেখে যাওয়া কলম যেন হাতে তুলে নিলেন আইরিশ নাট্যকার বার্নার্ড শ। গণতন্ত্রের ভণ্ডামী, খৃষ্টানীতির প্রহসন, যোদ্ধাদের মিথ্যা দম্ভ, আভিজাত্যের মুখোশ খুলে ফেলে চোখে আঙুল দিয়ে প্রকাশ করেছেন তাদের সত্যিকারের স্বরূপ। কালস্রোতে শ বেঁচে থাকবেন কিনা তা নিয়ে ঘোরতর তর্ক উঠলেও সুরজিৎ জানে এ কথা সকলেই বিশ্বাস করেন যে নাট্যকারের দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে। প্রমাণ করেছেন সত্যিই এ যুগে অসির চেয়ে মসীর শক্তি বেশী। কি নির্দয় তাঁর কলমের চাবুক!

তার বাংলাদেশ। যেখানে জন্মেছেন বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের মত লেখকেরা উপন্যাসিক, রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বকবি, গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের মত অনন্যসাধারণ নাট্যকার, সেই দেশে আর নাট্যকার জন্মায় না। বছরের পর বছর ধরে সেখানকার মঞ্চে অভিনীত হয় কয়েকজন ব্যবসায়ী লেখকের নাটক। যারা কোনরকমে কথার পিঠে কথা সাজিয়ে, থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ আর নামকরা অভিনেতাদের মন ভুলিয়ে নাটক লিখে গেছেন।

তাই সেখানকার মঞ্চ আজও ধুঁকছে, কিন্তু এগোয় না এক পাও।

সুরজিতের মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। সে নিজে কি লিখতে পারবে নাটক যাতে থাকবে মানুষের সুখ-দুঃখের কথা, হতে পারবে সত্যিকারের নাট্যকার যার লেখা পড়ে নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে ভাবীকালের পাঠক!

হাতের সিগারেটটা নিভিয়ে দিয়ে সুরজিৎ খাটে শুয়ে পড়ে।

শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে যেখানে দোতলা বাসগুলো থাকে তারই সামনে দিয়ে যে ছোট গলিটা এগিয়ে গেছে সেখানেই রতীন ঘোষালের ভাড়া বাড়ি। সারা দুপুর ঘুমিয়ে সবেমাত্র চায়ের পেয়ালা হাতে ইজিচেয়ারে বসেছেন এমন সময় সুরজিৎ ঘরে ঢুকল। রতীন ঘোষাল সাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

এস বাবা, এই তক্তাপোশের ওপরেই বস।

বাড়ির অন্দরমহলের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন আর এক কাপ চা দিয়ে যাবার জন্যে। সুরজিতকে জিজ্ঞেস করলেন, মিষ্টিটিষ্টি কিছু আনাব নাকি?

সুরজিৎ সোজা অফিস থেকেই এসেছে, খিদেও পেয়েছিল বেশ। তবু মুখে বলে, না, এখন থাক্।

রবিবাবু প্রসঙ্গান্তরে গেলেন : নাটকখানি কিবা লিখেছ ভায়া, পড়লাম। বেশ লাগল। পার্ট কপি করতে থিয়েটারে দিয়ে দিয়েছি।

সুরজিৎ ভেবেছিল নাটক সম্বন্ধে আজ তাকে অনেক রকম সমালোচনাই শুনতে হবে, মনে মনে শঙ্কিতও হয়েছিল পাছে মাথার ঠিক রাখতে না পেরে কাঁদাকাটি শুরু করে বসে, কিন্তু তার বদলে নাটক একেবারে কপি হতে গেছে শুনে খুশী হল, তবু জিজ্ঞেস করল, আপনি যে বলেছিলেন কিছু অদলবদল করবেন ?

রবিবাবু নস্যি গুঁজে গুঁজে নাকটা বোঝাই করে বললেন, ভেবে দেখলাম লেখা বদলে কোন লাভ হবে না। বরং রিহার্সালের সময় প্রয়োজনবোধে একটা কাঁচি আর খানিকটা গঁদের আঠা নিয়ে বসলেই হবে।

তার মানে ?

কোথাও কাঁচি দিয়ে কাটো আর কোথাও আঠা দিয়ে সাঁটো। একে বলে এডিটিং। এই করে এখানে পত্রিকা চলে, নাটক নামানো হয়। অনেকটা দর্জির কাজ।

সুরজিৎ একটু হাসে : কাকে কি পার্ট দেবেন ভেবেছেন নাকি ?

মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি, বড়বাবুকে বলেছি। তবে উনি অ্যাপ্রুভ না করলে তো আর কিছু হবে না।

কবে থেকে রিহার্সাল ফেলবেন ?

সামনের সোমবার, সন্ধ্যা সাতটায়। তাড়াতাড়ি অন্ততঃ প্রথম অঙ্কের কপি পেয়ে যাব।

সুরজিৎ অন্য কথা ভাবছিল, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, এত অল্প সময়ের মধ্যে কি নাটক নামানো যাবে ?

রবিবাবু অভিজ্ঞতার হাসি হাসলেন : পেশাদার বোর্ডে তাই হয়। পনের দিনের বেশী রিহার্সাল হয় না। অবশ্য প্রথম ক নাইট স্টেজ রিহার্সালই হয়, অভিনেতাদের পারফরমেন্স হয় না। সে কথা সবাই জানে, এমন কি দর্শকরাও। যাঁরা প্রথম দিকে নাটক দেখতে আসেন, তাঁরা আবার পরেও এসে দেখে যান নাটক কতটা দানা বাঁধল।

এর চেয়ে একটু আগে থেকে রিহার্সাল দিয়ে তৈরি হয়ে নামলে ক্ষতি কি ?

সে তো আমরা বুঝি, কিন্তু মালিকরা বোঝেন কই ? যখন চলতি নাটকের নাভিশ্বাস ওঠে, দর্শকরা জবাব দিয়ে যায়, তখনই তাদের হয় নতুন নাটক নামানোর কথা। সে সময় আর ভাববার অবকাশ থাকে না। তা ছাড়া আজকের দিনে একটা [illegible] প্রোডাকশনের যে খরচ সেটা খুব বেশী। বেশীদিন বেকার বসিয়ে মাইনে গোনাবে কেন ?

সুরজিৎ জোর দিয়ে বলে, না হলে অন্য সময় রিহার্সাল করুন — সারারাত ধরে, কিংবা দুপুরবেলা।

রবিবাবু হাসেন : আর্টিস্ট কোথায় পাবে ভায়া, সিনেমার স্যুটিং কামাই করে তো কেউ আর নাটকের রিহার্সাল দিতে আসবে না।

সবাই তো সিনেমা আর্টিস্ট নয়।

অন্যরা অফিসে চাকরি করে। শুনেছি পেশাদার মঞ্চ, শুধু এইটিকেই পেশা করলে কারও বাড়িতেই দুবেলা হাঁড়ি চড়বে না। আগেকার দিনে সুদিনে ছিল অনেক — আমি বলছি শিশিরকুমারের সময়ও। তখন মঞ্চের শিল্পীরা বেশীর ভাগ কাজ করতেন মঞ্চে। শুধু তাই নয়, [illegible] সামনে এসে দাঁড়াতে। তখনকার দিনে দেখেছি অল্প সময়ের মধ্যে নাটক নামলেও রিহার্সাল হত পুরো দমে। এমনও দিন মনে পড়ে যখন বড়বাবু সকাল থেকে নতুন নাটকের মহলা দিচ্ছেন, দুপুরবেলা ঘণ্টাখানেকের জন্যে শিল্পীরা ছুটি পেল নাকে-মুখে খাবার। থিয়েটারেই তা রান্না হয়েছে, আবার দুপুর থেকে চলল রিহার্সাল, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। তার পরেই যে যার সাজঘরে ঢুকল, মেকআপ নিয়ে নামল ছটায় চলতি নাটকে। এতটুকু বিরক্তি কোনদিন দেখি নি তাঁদের মুখে। সেইজন্যেই সেকালের নাটকে আমরা দেখেছি জীবন্ত অভিনয়। যে অভিনয়ের গুণে সাধারণ নাটকও অসাধারণ মনে হয়েছে।

সেকালের কথা শুনতে সুরজিতের ভাল লাগছিল, কিন্তু রবিবাবু নিজেই থামিয়ে দেন : চল ভায়া, থিয়েটারেই যাওয়া যাক। আজ বেস্পতিবার, শো আছে,

মেয়েটি সুরজিৎকে কথা শেষ করতে দেয় না : আগে থিয়েটারে তাই নিয়ম ছিল, পরিচালকরাই শিল্পী বেছে নিতেন। তাতে আমাদেরও সুবিধে ছিল। কার কি রকম অভিনয় ক্ষমতা তা তাঁরা জানতেন। এবার থেকে শুনছি আপনার পছন্দমত আর্টিস্ট নেওয়া হবে। বেশ তো, আমাকে দিয়ে পার্ট বলান, পারি কিনা দেখুন। তার আগেই আপনি আমাকে বাদ দিয়ে দিলেন কি করে?

সুরজিৎ বিব্রত বোধ করে : সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, কেউ আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে, এখনও কাউকে পার্ট দেওয়া হয় নি, সোমবার প্রথম রিহার্সাল হবে।

মেয়েটি হাসে—শ্লেষভরা হাসি : সে রিহার্সালে আমাদের ডাকা হয় নি—যারা পার্ট পাবার তারা পেয়ে গেছে।

ও, তাই নাকি! আমি বরং রতিবাবুকে জিজ্ঞেস করে রাখব।

মেয়েটি এক নিঃশ্বাসে বলে যায় : আমার নাম বীথি সেন, মঞ্চে অভিনয় করছি তিন বছর। ছবিতে পাঁচ বছর, অ্যামেচারে করি না। আমার রোজগারের ওপর নির্ভর করছে সমস্ত সংসার, আমার দুই ছেলে, মা, বুঝতেই পারছেন। কলকাতার শহরে কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকতেও এই পাঁচটা প্রাণীর জন্যে কতগুলো টাকা দরকার?

সুরজিৎ বাধা দেয় : আর কিছু বলতে হবে না, আমি রতিবাবুকে—

বীথি সেনের চোখে জল এসে পড়ে, মোছবার সে চেষ্টা করে না। বলে যায়, এই থিয়েটারেই যা আমার বাঁধা রোজগার। এটেও চলে গেলে চোখে অন্ধকার দেখতে হবে। দুটি অপোগণ্ড শিশু, বৃদ্ধা মা, তাদের তো বোঝাবার কিছু নেই। দুবেলা তাদের খাওয়াতে হবে। খাওয়াবই বা কিভাবে তাও আপনি জানেন, আমি তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম, আপনারা দাঁড়াতে দিলেন না।

আমি?

যদি পা হড়কায় আমাকে নিয়েই পরের নাটক লিখবেন, কি বলুন? লোকে দেখবে, হাততালি দেবে। বোধ হয় আপনার দৈন্যপ্রাপ্তি ঘটাচ্ছি, চলি। এর পর আমার শীন আছে।

বীথি সেন ঘর থেকে বেরিয়ে উইংসের দিকে চলে গেল। ঝড়ের মত এসে সুরজিতের মনের আনন্দোজ্জ্বল দেওয়ালির আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল।

[ক্রমশ]

লঘু বর্ষণ ঃ বৃত্ত

অজিতকুমার

কড়াইশুঁটি, কড়াইশুঁটি ছোট্ট সবুজ দানা
তোমায় খাবে বলে এখন নাচছে পাখির ছানা।
পাখির ছানা, পাখির ছানা জানতে পার কী?
কাটব তোমায় বলে আমার বঁটি শানাচ্ছি।
লোহার বঁটি, লোহার বঁটি, ভাবছ তুমি কি?
তোমার বুকে ছুরি হবার মন্ত্র কি ভাবছি।

'সে'

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

টেকোমাথা বুড়ো গল্প বলছে :

"তারপর ওদিকে বড়মন্ত্রী তো রাজকন্যার গুলিসুতো খেয়ে ফেলেছে। কেউ কিছু জানে না। ওদিকে রাজকন্যা করেছে কি, ঘুমুতে ঘুমুতে হাঁউ মাঁউ কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ বলে তড়মুড় করে খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। অমনি ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি লোক লস্কর সেপাই পল্টন হৈ হৈ রৈ রৈ মার-মার কাট-কাট— এর মধ্যে হঠাৎ রাজা বলে উঠলেন, পক্ষিরাজ যদি হবে, তা হলে ন্যাজ নেই কেন? শুনে পাত্র মিত্র ডাক্তার মোক্তার আক্কেল মক্কেল সবাই বললে, ভালো কথা। ন্যাজ কি হল? কেউ তার জবাব দিতে পারে না। সব সুড়সুড় করে পালাতে লাগল।"

আশা করি রসিক পাঠককে বলে দিতে হবে না যে এই অংশটি স্বনামধন্য সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' থেকে গৃহীত হয়েছে। এই খামখেয়ালের কাহিনী রচনা করে সুকুমার রায় অবিনাশী গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। আমাদের বাস্তব জগতের বিচারে এ কাহিনী উদ্ভট, খাপছাড়া নিশ্চয় বলা যায়। কিন্তু না, এ হল প্রতিভার আশ্চর্য স্বপ্নের ফসল। সুকুমার রায় সেই বিরল প্রতিভা।

বিখ্যাত অঙ্কবিদ্ চার্লস ডজ্‌সনের কথা আমরা মনে রাখি না, কিন্তু 'লুই ক্যারল' এই ছদ্মনামে যে অপূর্ব খাপছাড়া গ্রন্থ—'অ্যালিস ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' তিনি রচনা করেছেন, তা অমর হয়ে আছে ও থাকবে। জগতের কোটি কোটি শিশু এই বই পড়ে আনন্দ পেয়েছে ও পাবে। এবং সম্ভবতঃ শিশুদের জনকজননীরাও এই বই পড়ে আনন্দ পান।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, পরশুরাম এই জাতীয় উদ্ভট রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইংরেজিতে লুই ক্যারল, এডোয়ার্ড লীয়র, ইউজিন ফীল্ড, অগডেন ন্যাশ 'ননসেন্স' কবিতা রচনা করেছেন। উদ্ভট খামখেয়ালের কথা ও এলোমেলো কবিতা রচনা করা সোজা নয়, তার জন্য প্রয়োজন গভীর কল্পনা, অবাধ উৎকল্পনা ও মননশীল অভিজ্ঞতা। ইমাজিনেশন ও ফ্যান্সি, দুয়ের উপরই দখল চাই। অতিশিষ্ট অতিভদ্র নিয়মশাসিত প্রথাবদ্ধ সংসারের সেখানে যখন মন বিদ্রোহ করতে চায়, খেলে বেড়াতে ইচ্ছে করে, তখন এই ননসেন্স ও ফ্যান্টাসির জগতে, খাপছাড়া ও উৎকল্পনার রাজ্যে পালিয়ে যাবার তীব্র বাসনা জাগে।

এই খামখেয়ালের কথায় রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল সমগ্র জীবনব্যাপী। "হিং টিং ছট্" ('সোনার তরী') থেকে "গল্পসল্প" তার পরিচয়স্থল।

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনার মধ্যে 'সে' একটি আশ্চর্য রচনা। 'সে' প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে, ইং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ সৃষ্টিতে তাঁর সমগ্র জীবনে অস্বীকৃত ছায়াময় জগতের আভাস ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে, গল্প-কবিতায়, 'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থে সুপ্ত অবচেতন অন্তরের অন্ধকার ছায়ালোকের ও অবহেলিত জগতের স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। ছবিতে যে অ-রূপ জগতের রূপ ফুটে উঠেছে, তা একদিনের রবীন্দ্র-সাহিত্যে অস্বীকৃত ছিল। আর "তিনসঙ্গী" গল্পে বিজ্ঞান-উপাদানের সমাবেশ ও বিজ্ঞান-মনস্কতা লক্ষ্য করা যায়। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) লেখেন ও বিজ্ঞান-কর্মীদের সান্নিধ্যে আসেন। 'সে' গ্রন্থে বিজ্ঞান-মনস্কতা ও খেয়ালিপনা দুই-ই আছে। 'সে' গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছেন বিজ্ঞানী-অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে। এটিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

॥ ২ ॥

উৎসর্গ-পত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'সে' গ্রন্থের পরিচয় দিয়েছেন। সেটি আলোচনা করলে এর স্বরূপ বুঝতে সহায়তা করবে বলে আমার ধারণা।

কবি বলেছেন :

'আমারো খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেশে।
যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া
সেথায় সে মুক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষ্মীছাড়া।
যেমন-তেমন এরা আঁকাবাঁকা
কিছু আলো দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেম উজাড় করি ঝুলি।
লও যদি লও তুলি,
রাখো ফেলো যাহা ইচ্ছা তাই—
কোনো দায় নাই।'

মনের গহন থেকে ভেসে-আসা খেয়াল-ছবির মিছিল 'সে' গ্রন্থে দেখা গিয়েছে। ফসল কাটার পর শূন্য মাঠে যে তুচ্ছ আগাছার ফুল ফোটে, রবীন্দ্রনাথ 'সে' গ্রন্থকে তার সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। ফ্যান্টাসির ধর্ম তিনি এর উপরে আরোপ করেছেন, নিরুদ্দেশ বাউলের বেশে এ ভেসে বেড়ায়। খেয়ালী লঘু কল্পনার উদ্দেশ্যহীন খাপছাড়া সঞ্চরণ বলেই একে তিনি মনে করেন।

'সে' কি কেবল ছোটদের জন্য লিখিত? 'সে' পড়ে তা মনে হয় না। শিশুর অবাধ বিস্ময় ও কৌতূহলের খোরাক 'সে' জোগায়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে যে বিজ্ঞান-মনস্কতা 'সে' গ্রন্থে আছে, তা সম্পূর্ণরূপে শিশুবোধ্য নয়। শিশুর কল্পনা-সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে 'সে'। বিশ্বসৃষ্টিকে অবলম্বন করে শেষের দিকের কয়েকটি অধ্যায়ে যে বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে, তা প্রতিভার স্পর্শে অ-সাধারণত্বের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

॥ ৩ ॥

'সে' গ্রন্থের প্রধান চরিত্র তিনটি—আমি (গল্পকথক), তুমি (গল্পের শ্রোতা অর্থাৎ পুপুদিদি) আর সে (অনামিকভাবে আড়ালে আছেন)। 'সে' মানুষটি সম্পূর্ণ খেয়ালী, বলা যায় উদ্ভট ও খাপছাড়া। একে নিয়েই যত গল্প। তার চরিত্রে যত চাঞ্চল্যকর উপাদান আছে তা [illegible] সে সবকে নিয়ে মজাদার অলঙ্কারে 'আমি' ব্যাখ্যা করেছেন।

'সে' গ্রন্থের সূচনায় প্রথম পরিচ্ছেদে গল্পকথক 'আমি' মানুষের অন্তরের আদিম প্রবৃত্তি—গল্প শোনার প্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। গল্পরসের সঙ্গে এখানে মিশেছে উদ্ভটরস আর বিজ্ঞানরস, সবটা মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি। 'সে' গ্রন্থ রচনার কৈফিয়ত দিয়েছেন এই বলে, "অনেক গল্প শুরু হয়েছে এই ব'লে যে, এক যে ছিল রাজা। আমি আরম্ভ ক'রে দিলুম, এক যে আছে মানুষ। তার পরে লোকে যাকে বলে গপ্পো, এতে তাহার কোনো আঁচ নেই। সে মানুষ ঘোড়ায় চ'ড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না। একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে। আমি বই পড়ছিলুম। সে বললে, দাদা, খিদে পেয়েছে।"

এই ভূমিকা থেকেই বোঝা গেল এই গল্প বাঁধা ধরা পথে চলবে না। 'সে' পরিচিত সংসারের লোক, তার খিদে পায় এবং খায় জল। এমন একটি ঘোরতর সাংসারী চরিত্রকে নিয়েই যত কাণ্ড।

প্রথম থেকে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনী 'সে'-র টানে চলে এসেছে। 'সে'-র নানা কৌতিকলাপের সরস বর্ণনা পাই। 'আমি' ও 'পুপেদিদি'—দুজনে মিলে 'সে'-কে নিয়ে কত মজাই করেছেন। গোড়াতেই লেখক বলেছেন, এ রূপকথা নয়। "এ তো রাজপুত্তুর নয়, এ হল মানুষ, এ খায়-দায় ঘুমোয়, আপিসে যায়, সিনেমা দেখবারও শখ আছে। দিনের পর দিন যা সবাই করছে তাই এর গল্প।···তার পরে? তার পরে এই রকমই আরও কত কী—বড়োবাজার থেকে বহুবাজার, বহুবাজার থেকে নিমতলা।"

গল্পকথক বলছেন, "আমাদের এই 'সে' পদার্থটি

ক্ষণজন্মা বটে; এমনতরো কোটিকে গোটিক মেলে। মিথ্যে কথা বানাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা। আমার আজগবি গল্পের এক বড়ো উত্তর সাধক অন্যায় বহু ভাগ্যে জুটেছে। গল্প-প্রশ্নের উত্তরপাড়ার এই যে মানুষ, মাঝে মাঝে একে পুপুদিদির কাছে এনে হাজির করি—দেখে তার বড়ো চোখ আরও বড়ো হয়ে ওঠে। খুশি হয়ে বাজার থেকে গরম জিলিপি এনে খাইয়ে দেয়—লোকটা অসম্ভব জিলিপি ভালোবাসে, আর ভালোবাসে শিককাবাব পাড়া গলির চমচম। পুপুদিদি জিগেস করে, তোমার বাড়ি কোথায়। ও বলে, কোন্নগরে, গুলঞ্চকেদ গলিতে।"

এই অনামিক অথচ অতি-প্রত্যক্ষ 'সরলা নম্বরের মানুষ' সে-কে নিয়েই যত গল্পের সূচনা। বাঁচাউ বীপের ইতিহাস, নিবারোধন সমিতির রিপোর্ট, গেছোবাবা, সে-র বরযাত্র' ও বিয়ে, তাসমানিয়ার দিদুক কোম্পানির ও শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোকজুমা, আধুনিক বাংলার প্রগতি-আন্দোলন, সে-র চেহারাহারানো, স্বামীত্ব-দাবিতে পাড়ুয়াড়োর গিন্নির মামলা, সে-র মগজে বাঁদরের মগজ, খর্গোশ-ঘণ্টাকর্ণ, শুক-সারীর দ্বন্দ্ব—পর পর এই এগারোটি কাহিনীতে গল্পকথক আমাদের ফ্যান্টাসির রাজ্যে নিয়ে গেছেন। এর মধ্যে যোগসূত্র আমি ও অকৃত্রিম 'সে'। তাই কখনই বাস্তব জগৎ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। 'সে' এই জগতেরই লোক, তাকে নিয়ে রঙ্গ করতে করতে গল্পকথক স্ফূর্তিতে গাঁজার গল্প রচনা করেছেন। শিশুর জগতে 'সে' এক নতুন আনন্দের বার্তাবহ হয়ে এসেছে। পুপেদিদির 'পরে গল্পগুলির প্রতিক্রিয়াতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

এরপর দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লেখাগুলি বিজ্ঞান-মনস্কতার পরিচয় মাই। এখানে অলৌকিক রসের সঙ্গে মিশেছে বিজ্ঞান-কৌতূহল। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বিশ্বসৃষ্টির বিজ্ঞান-কাহিনীকে সুর-বেসুরের দ্বন্দ্ব বর্ণনাচ্ছলে গল্পকথক উপস্থিত করেছেন। 'পত্রপুটে'র "পৃথিবী" কবিতায় সৃষ্টিকাহিনীর যে অপরূপ কবিত্বমূর্তি, এখানে তারই অলৌকিক ফ্যান্টাসিপ্রতিমা। শেষে পাই কবির নিজস্ব বক্তব্য: "আমার মতটা বলি। দুঃশাসনের আস্ফালনটা পৌরুষ নয়, একেবারে উল্টো। আজ পর্যন্ত পুরুষই সৃষ্টি করেছে সুন্দর, লড়াই করেছে বেসুরের সঙ্গে। অসুর সেই পরিমাণেই জোরের ভান করে যে পরিমাণে পুরুষ হয় কাপুরুষ। আজ পৃথিবীতে তারই প্রমাণ পাচ্ছি।" শেষ মন্তব্যটি প্রফেটের উক্তি বলে মনে করা যায়। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'অধ্যাপন-সরোবরের গভীর জলের মাছ' মাস্টারমশাইকে উপলক্ষ করে কথক সৃষ্টিকাহিনী বর্ণনা করেছেন—এবার জীবের জন্ম ও বিবর্তনের পালা—মনের সঙ্গে মাপের ঠেলাঠেলি মারামারি—মনোবাহী মানুষ সৃষ্টির শেষতম অধ্যায়।' চতুর্দশ পরিচ্ছেদে কিশোর সুকুমারকে কেন্দ্র করে গল্পের সৃষ্টি—জীবের বিবর্তনের কথা এক স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে—গাছপালা মাটির সঙ্গে এক হয়ে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে।

গল্পের সমাপ্তি হয়েছে সুকুমারের বিদায়পত্রে। সে লিখেছে: "দূরবাসে চন্দ্রলোকে যাবার আয়োজন চলেছে। যদি সুবিধা পাই যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাব। আমাদের পৃথিবীর আকাশ প্রকাশকে ছাড় পাইয়ে দিতে চাই।—ছেলেবেলা থেকে অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার অভ্যাস। ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি চোখে দিয়ে পূর্ণ। এই বিলীয়মান চোখগুলো বিশ্বসৃষ্টির কোন কাজে লাগে না। তাই ভাবি দেখার চোখ নিয়ে আমরা পৃথিবীতে উৎসর্গের চোখগুলো সেই আকাশেই যে আকাশে আজ আমি উড়তে চলেছি।"

'বনবাণী' ও 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের রচয়িতাকে এখানে চিনে নিতে পারি। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পরিচ্ছেদ কাব্যরসে ও গভীর ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ, বিজ্ঞান-মনস্কতায় ও রসেতে পরিপূর্ণ। প্রতিভার লীলার এক অভিনব পরিচয়স্থল হয়ে রইল 'সে' গ্রন্থ।

॥ ৪ ॥

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে এই গ্রন্থের গভীর যোগ রয়েছে। 'সে' রচনার পূর্বেই বিদেশে রবীন্দ্রচিত্রের প্রদর্শনী হয়েছে ও বিদেশী চিত্ররসিকদের সমাদর লাভ করেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য মূলতঃ আলোর জগৎ, রবীন্দ্র-চিত্র অন্ধকারের জগৎ। সৃষ্টিসূচনায় যে অন্ধকার ছিল, তার বিবরণ 'সে' গ্রন্থে কেবল রচে নয়, রেখায় ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রকৃত রেখাচিত্রগুলি 'সে'-র অন্যতম আকর্ষণ। মলাটের রঙিন পেনসিল-ড্রয়িং, 'সে', 'পান্নারাম', ও 'পুপু'—জলরঙে আঁকা এই তিনটি ছবি এবং বহুসংখ্যক পেনসিল-ড্রয়িং দেখলে আর সন্দেহ থাকে না যে অন্ধকারের জগৎ এখানে কবির নিকট সমাদৃত হয়েছে। বিশেষ করে এতে যে সব পশুর ছবি আঁকা হয়েছে, তা যে রকম প্রথাচ্যুত দুঃসাহসিক কল্পনানির্ভর, তা রবীন্দ্রনাথের এক অন্য পরিচয় বহন করে। 'গাভিগাড়ুড়ুং', 'গেছো বাবা', 'ঘণ্টাকর্ণ', 'হিংস্রজাতের ঘণ্টাকর্ণ', 'জিব-বেরকরা কাটাওয়ালা', 'পাড়ুয়াড়োর গিন্নি', 'শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোকজুমা', 'গাঁড়েজি', 'স্মৃতিস্তম্ভশায়', 'কনে-দেখা মাঝরাত্তিরের অন্ধকারে' প্রভৃতি ড্রয়িংগুলি এর প্রমাণ।

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন-দর্শন

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

প্রাচীন ভারতে 'জিজ্ঞাসা' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। 'জিজ্ঞাসা' কথাটির অর্থ 'জানিবার ইচ্ছা', কিন্তু নানা জাগতিক বিষয় সম্পর্কে কৌতূহলই জিজ্ঞাসা নয়। সত্যকে দর্শন করিবার জন্য প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির যে অভীপ্সা ছিল, তাহাকেই বলে 'জিজ্ঞাসা'। এই জিজ্ঞাসার একজন বিশিষ্ট সহচরী আছেন, তাঁহার নাম শুশ্রূষা। এই শুশ্রূষার অর্থ কিন্তু সেবা নয়, সত্যদর্শী মহাত্মার নিকট হইতে শ্রবণ করিবার ইচ্ছা। মনু বলিয়াছেন, 'মানুষ যেমন খনিত্রের দ্বারা খনন করিতে করিতে জল প্রাপ্ত হয়, তেমনই শুশ্রূষু শিষ্য সমস্ত গুরুগত বিদ্যা প্রাপ্ত হয়।'

'যথা খনন খনিত্রেণ নরো বার্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি।'

এই জিজ্ঞাসা ও শুশ্রূষা যাহার আছে, তিনি কোন না কোনদিন সত্যকে দর্শন বা উপলব্ধি করিবেনই। আমরা যাহাকে 'দর্শন' বলি, তাহার অর্থ এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। কেহ কেহ বলেন, 'দর্শন' অর্থে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বোঝায়। এই অর্থে অবশ্য প্রত্যেক সাহিত্যিক বা প্রত্যেক মনস্বী ব্যক্তিই দার্শনিক। ইংরেজিতে কিন্তু 'ফিলজফি' কথাটির মানে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ (Love of Knowledge)। চিন্তাশীল মানুষের মনে বিভিন্ন সময়ে কত প্রশ্ন জাগে যাহার সমাধান মানুষ সহজে খুঁজিয়া পায় না। বিজ্ঞান কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য মানিয়া লইয়া তাহার যাত্রা শুরু করে, কিন্তু মানুষের অবাধ্য মন তো বিনা প্রমাণে কিছুই মানিতে চায় না। তাই বিজ্ঞান যাহা বিনা বিচারে মানিয়া লয়, 'ফিলজফি' উহার প্রমাণ বা অপ্রমাণের ভার গ্রহণ করে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে 'ফিলজফি' প্রধানতঃ বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যেই সত্যকে নিরূপণ করিতে চেষ্টা করে, তাই পাশ্চাত্ত্য দর্শনের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ মানুষের কৌতূহলের চরিতার্থতা। পক্ষান্তরে ভারতীয় দর্শনের উদ্দেশ্য অপরোক্ষ অনুভূতি, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি অথবা মুক্তি। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কি তবে জিজ্ঞাসু নয়? ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলে অবশ্যই তাঁহাদিগকে 'জিজ্ঞাসু' বলা যায়, কিন্তু মীমাংসা দর্শনের প্রথম সূত্রে যে অর্থে বলা হইয়াছে, 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা' অথবা বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রে যে অর্থে বলা হইয়াছে, 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', সেই অর্থে কিন্তু 'জিজ্ঞাসা'কে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের উৎস বলা চলে না। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের উৎস বিস্ময় (অ্যারিস্টটলের মতে বিস্ময় হইতেই জ্ঞানের আরম্ভ, wonder is the beginning of wisdom) অথবা কৌতূহল। আবার ভগবদ্-গীতায় যে অর্থে 'জিজ্ঞাসু'কে 'ভগবানের ভজনাকারী' ও 'ভাগ্যবান' বলা হইয়াছে, সে অর্থে প্রতীচ্য দার্শনিকগণ 'জিজ্ঞাসু' নন। গীতার সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি স্মরণ করুন—

'চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।'

'হে অর্জুন, চারি প্রকার লোক আমার ভজনা করেন, তাঁহারা সকলেই ভাগ্যবান। তাঁহারা হইতেছেন—আর্ত বা পীড়িত, জিজ্ঞাসু, অর্থকামী ও জ্ঞানী।'

'জিজ্ঞাসা' প্রশ্নে 'ঈশোপনিষদ্' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।'

'হে জগৎপালক সূর্য, হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত আছে, জিজ্ঞাসু আমার দর্শনের জন্য তুমি সেই আবরণ উন্মোচন কর।'

পদার্থ-বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা শাখায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর

ছিল দুর্জ্ঞেয় বা দুর্বিজ্ঞেয়। কিন্তু তাঁহার বিধাতা সগুণ ব্রহ্ম বা Personal God নন, তিনি যাহাকে বিধি বলেন, তাহা বৈজ্ঞানিকের inexorable laws যাহার ফলে পাপ-নিবারকেরও গ্রহ-পীড়ন ঘটিয়া থাকে। অথচ অদৃশ্য হস্তের অঙ্গুলি-স্পর্শ অনুভব করেন যে রামেন্দ্রসুন্দর, মঙ্গলময় ভগবানে বিশ্বাস করেন যে রামেন্দ্রসুন্দর, তিনি নিশ্চয়ই সংশয়বাদী নহেন। তিনি যে 'নিয়তির বিধানে'র কথা বলেন, সে নিয়তিও অন্ধ নয়, সে নিয়তির অর্থই তো নিয়ম, আর সেই নিয়মের দ্বারা যিনি জগৎকে পরিচালিত করেন, তিনিই তো জগদীশ্বর, কিন্তু তাঁহার বিধান যে মানব-বুদ্ধির অগম্য, 'Mysterious are the ways of Providence', অথবা জগৎটাই একটা সীমাহীন রহস্য, বুদ্ধিতে যাহার ব্যাখ্যা চলে না, 'a riddle, an enigma, an inexplicable mystery.' আবার দেখিতে পাই, ঋষিগণ যে সত্য দিব্যদৃষ্টিতে বিষ্ণুর পরম পদ দর্শন করিতেন—

'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্'

ইহাও রামেন্দ্রসুন্দরের দৃঢ় প্রত্যয়। তাঁহার নেত্রদ্বয় যে অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ, তিনি যে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে পারেন নাই, এ কথা তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন, এইখানেই তিনি বৈদিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।

'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে যে রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখিতে পাই, তিনি কিন্তু কোথাও দিব্যদৃষ্টির কথা বলেন নাই। তিনি সত্যকে লাভ করিয়াছেন বুদ্ধির দ্বারা, বোধি বা প্রজ্ঞার (intuition) দ্বারা নয়। সত্যকে লাভ করিয়াছেন, কারণ, মানুষ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতে করিতে এমন একটা অবস্থায় উপনীত হয় যখন তাঁহার দৃষ্টি হইতে সহসা অন্ধকার যবনিকা অপসারিত হয়, জিজ্ঞাসু তখন জ্ঞানী হইয়া যান, জ্ঞানী তখন ভক্ত হইয়া পড়েন। আর এইজন্যই ভগবান জিজ্ঞাসুকে তাঁহার ভজনাকারী বলিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর কি দুঃখবাদী?

সংসারে প্রত্যেক মানুষই সুখকে লাভ করিতে ও দুঃখকে পরিহার করিতে চায়। সুখ তাহার নিকট উপাদেয়, দুঃখ হেয়। কিন্তু মানুষের জীবনে দুঃখের অন্ত নাই, এমন কি, ইতর প্রাণীর জীবনেও দুঃখ আছে। কিন্তু সংসারে মানুষের জীবনে সুখের মাত্রা বাড়িতেছে, না দুঃখের মাত্রা বাড়িতেছে? যাঁহারা বলেন সংসারে সুখের মাত্রা বাড়িতেছে, তাঁহাদের মতে দুঃখ জিনিসটা সুখের সাময়িক অভাব মাত্র। ইঁহারা আশাবাদী—লাইব্‌নিজ ও হেগেল ইঁহাদের প্রধান পাণ্ডা। লাইব্‌নিজ বলেন, যত প্রকার পৃথিবী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাহাদের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ (The world is the best of all possible world)। হেগেল বলেন, দুঃখ বা অমঙ্গল ব্রহ্মের অভিব্যক্তির অপরিহার্য অঙ্গ (Evil is a necessary phase in the self-evolution of the Absolute)। আবার দুঃখবাদীদের মধ্যে একালে দুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য, শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যান। তাঁহাদের মতে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের মাত্রা বাড়িতেছে। অভিব্যক্তির ফলে দুঃখের মাত্রা কমিতেছে, এ কথা আদৌ সত্য নহে। যাহাকে আমরা সুখ বলি, উহা দুঃখের অভাব ভিন্ন আর কিছুই নয়। অবশ্য, সুখই যে মানুষের জীবনে সর্বদা কাম্য, এ কথা জন স্টুয়ার্ট মিলও (যাঁহার মতে সুখ বা দুঃখই ভালমন্দের মাপকাঠি হওয়া উচিত) স্বীকার করেন নাই। তাঁহার সেই প্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণ করুন—'It is better to be a human being dissatisfied than to be a pig satisfied, better to be a Socrates dissatisfied than to be a human being satisfied.' দুঃখের মধ্য দিয়াই যে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ, দুঃখই যে মানবের পরম গৌরব, এ কথা তো রবীন্দ্রনাথ বারংবার আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দর পরম রসিক পুরুষের ন্যায় উভয় পক্ষের যুক্তি পর্যালোচনা করিয়াছেন কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত আমাদের সম্মুখে স্থাপন করেন নাই। তবে দুঃখবাদের দিকেই যে তাঁহার প্রবণতা

দেহের উপর আত্মশুদ্ধি তোমার পথ-প্রদর্শক হউক। যিনি তোমার অন্তরে থাকিয়া তোমাকে পথ দেখাইতেছেন, তাঁহার দয়াবিধানে তোমার প্রীতি থাকুক। ... মাঝে তুমি নিজেকে অগ্রসর কর। ... না হউক, অমঙ্গলেরও ভয় হউক, উভয়ের অতীত তোমার জয়।'

অমঙ্গলের উৎপত্তি কেন? ইহা মানব-মনের একটি চিরন্তন জিজ্ঞাসা। বুক অব জবের (Book of Job) ... মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। কিন্তু তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। ... এই চিরন্তন জিজ্ঞাসাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ... কিন্তু তোমার সহিত তুমি ... তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করিও না। ... কবির কণ্ঠেও এই প্রশ্ন—

'... ... ... বিষের বিকার
মানব হৃদয়ে কি এ দহিছে বেদনা?'

ভারতীয় দর্শনে দুঃখ ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে অমঙ্গল বা Evil দ্বিবিধ—ভৌতিক বা Physical, আর আধ্যাত্মিক বা Moral. প্রশ্ন এই—মঙ্গল ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বের সঙ্গে অমঙ্গলের সকল ক্ষেত্রে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য বিধান করা যায় কিনা? মার্টিনো প্রভৃতি মনীষিগণ এইরূপ সঙ্গতিবিধানের নিষ্ফল প্রয়াস করিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দর কিন্তু ইঁহাদের এই ব্যর্থ প্রচেষ্টার উপর বিদ্রূপের কশাঘাত করিয়াছেন।

সত্যের সন্ধানে রামেন্দ্রসুন্দর

সত্য কী—ইহা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মনের চিরন্তন প্রশ্ন। বৈজ্ঞানিক বিনা প্রমাণে কতকগুলি কথা স্বীকার করিয়া লন, যথা—আমাদের মনের বাহিরে জগতের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মের একরূপতা আছে ইত্যাদি। এই সকল কথা মানিয়া না লইলে বৈজ্ঞানিক তাঁহার গবেষণায় অগ্রসর হইতে পারেন না। *প্রকৃতির রাজ্য যে নিয়মের রাজ্য, প্রকৃতিতে যাহা* ঘটে, তাহা যে কখনও অনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না, যে ঘটনার কারণ আমরা জানি না, তাহাকেই যে অতিলৌকিক ঘটনা বলিয়া নির্দেশ করি, বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন—কোন্ সত্য যে চিরন্তন সত্য, তাহা আমরা কেমন করিয়া জানি? প্রকৃতি যে নিয়মের রাজ্য, তাহা আমাকে কে বলিল? ইহা আমরা পুনঃপুনঃ দর্শনের সাহায্যে জানিয়াছি। কিন্তু ইহা যে চিরদিন সত্য ছিল ও চিরদিন সত্য থাকিবে, অথবা আমাদের এই জগতে যাহা সত্য তাহা যে সকল লোকেই সত্য হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমাদের সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার বাহিরে কোন দেশে যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না, তাহা কেমন করিয়া জানি? আবার আমার বাহিরে যে বস্তুজগৎ আছে, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমরা বহির্জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ পাই কতকগুলি সংবেদনের (sensation) মধ্য দিয়া। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের অনুভূতির মধ্য দিয়া অর্থাৎ কতকগুলি প্রত্যয়ের মধ্য দিয়া বহির্জগতের অস্তিত্বের অনুমান করি মাত্র। আমরা যাহাকে বস্তুর প্রত্যক্ষ বলি উহা তো স্নায়ুর ক্রিয়া বা মস্তিষ্কের আলোড়ন মাত্র। এই আলোড়নের সঙ্গে বস্তুর কি সম্পর্ক, আজও কেহ তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। আমরা যখন স্বপ্ন দর্শন করি, তখনও তো কতকগুলি প্রত্যয় পরম্পরাক্রমে আমাদের মনে উদিত হয়, আর স্বপ্নদর্শনকালে কেহ সেই প্রত্যয়গুলিকে মিথ্যা বলিয়া মনে করেন না। সুতরাং জগতে একটি মাত্র সত্য সকল সত্যের উপরে। সে সত্য হইতেছে—অহমস্মি, আমি আছি। রামেন্দ্রসুন্দরের এই কথাটি যেন গণিতশাস্ত্রবিদ দার্শনিক দেকার্তের (Descartes) কথার প্রতিধ্বনি—Cogito Ergo Sum. আমি যেহেতু সংশয় প্রকাশ করি, অতএব প্রমাণিত হইল যে আমি চিন্তা করি, আর আমি চিন্তা করি বলিয়াই আমি আছি, ইহা নিশ্চিত সত্য। এই 'আমি' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই চরম সত্য।

কিন্তু সংসারে বাঁচিতে হইলে, জীবন-সংগ্রামে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য জয়ী হইতে হইলে বহির্জগতের অস্তিত্ব আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আচার্য শঙ্করের ন্যায় রামেন্দ্রসুন্দরও জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম জেমসের ন্যায় রামেন্দ্রসুন্দরও উপযোগিতাবাদ বা Pragmatism-এ বিশ্বাস করেন। কিন্তু ভাববাদ বা Idealismই তাঁহার দৃষ্টিতে চরম সত্য। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে 'আমি আছি' ইহা নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য, পারমার্থিক সত্য। তিনি বলেন—'এই সত্যে বিশ্বাস করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে আরও কতকগুলা সত্যে বিশ্বাস করিতে হয়। যাহাতে বিশ্বাস না করিলে জীবনযাত্রা চলে না বা নিজের অস্তিত্ব টিকে না, তাহাকেই আমরা সত্য বলি। কিন্তু এই শ্রেণীর সত্য আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক সত্য। মনুষ্যের যাবতীয় বিজ্ঞান এই ব্যবহারিক সত্য লইয়াই কারবার করে।' এই হিসাবেই প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা সত্য। ইহা না মানিলে আমাদের মঙ্গল নাই, সংসারে টিকিয়া থাকিবার কোন উপায় নাই। এইজন্যই "নিয়মের রাজত্ব" প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেন—'যেদিন জ্যোতিষীরা আর ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই অশুভ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।'

মুক্তপুরুষ রামেন্দ্রসুন্দর

'আমি আছি' ইহাই ধ্রুব সত্য, কিন্তু এই 'আমি' কে? 'কে আমি'—ইহাই ভারতীয় মনের চিরন্তন প্রশ্ন। সাংখ্যদর্শন বলেন, আমি অসঙ্গ পুরুষ, উদাসীন, দ্রষ্টা, সাক্ষীস্বরূপ, এই উপলব্ধি যেদিন হইবে, সেদিন নৃত্য-পটীয়সী প্রকৃতির নৃত্য—এই magical cosmic dance থামিয়া যাইবে। অদ্বৈতবাদী বলেন, আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, অহঙ্কার নই, আমি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত চৈতন্যস্বরূপ। রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাধারায় অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাব বিপুল, কিন্তু আচার্য শঙ্করের প্রতি তাঁহার মনোভাব যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিকের মনোভাব। খ্রীষ্টীয় Salvation ও আমাদের মুক্তি যে এক নয়, তাহা তিনি সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। "জগতের অস্তিত্ব", "সৃষ্টি", "অতিপ্রাকৃত" (দ্বিতীয় প্রস্তাব), "আত্মার অবিনাশিতা", "এক না দুই", "মুক্তি" ও "মায়াপুরী" প্রবন্ধে লেখক তাঁহার সিদ্ধান্ত বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। এই নিবন্ধগুলি আচার্য শঙ্করের মায়াবাদের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে। "জগতের অস্তিত্ব" প্রবন্ধে লেখক বলেন—

'আমিই চিন্ময় একমাত্র পদার্থ, আর সকলই আমার কল্পনা। আমার চৈতন্যের প্রমাণ অনাবশ্যক, অন্যত্র চৈতন্যের প্রমাণ নাই।...

এই পদার্থ, ইহার স্বরূপ কি? ইহা সৎ, ইহা আছে, ইহা সত্যপদার্থ—স্বপ্রকাশ। ইহা চিৎ, ইহা চিন্ময় পদার্থ—স্বপ্রকাশ। ইহা আনন্দস্বরূপ—তাই কি? কেহ কেহ আপত্তি করিবেন;—বলিবেন জানি না, ইহা অজ্ঞেয়, অনির্দেশ্য। মাধ্যমিক বৌদ্ধ বলিবেন, উহা সৎ নহে, অসৎও নহে, সৎও বটে, অসৎও বটে, তাহাও নহে, সৎও নয়, অসৎও নয়, তাহাও নহে। উহার পারিভাষিক নাম শূন্য। হিউম ও হক্সলি হয়তো বলিবেন, পদার্থ লইয়া এত মাথাব্যথা কেন? যাহা আছে, তাহাই আছে। মায়াপটের অন্তরালে যাইবার আবশ্যকতা কি? চিন্ময়, সন্দেহ নাই। কিন্তু চিন্ময়ের মূলে কি আছে, অন্বেষণের প্রয়োজন নাই। শব্দের মরীচিকায় প্রতারিত হইও না।'

"মুক্তি" প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—

'আমি কেন আপনাতে মায়ার আরোপ করিয়া ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া জগতের সৃষ্টি করি, আর কেনই বা আপনাতে অবিদ্যার আরোপ করিয়া জগতের বাস্তব অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া প্রতারিত হই, তাহার উত্তর বোধ করি নাই। বেদান্ত বলেন, উহাই আমার স্বভাব; বৈষ্ণব বলেন, উহা আমার লীলা বা খেয়াল; শাক্ত বলেন, উহা আমার আনন্দ; বৌদ্ধ ও অজ্ঞানবাদী বলেন, উহা জিজ্ঞাসা করিও না। পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ইহার উত্তর ঋষিমুখে বলাইয়াছেন—এই সৃষ্টি যাহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, তিনিই ইহা বিধান করিয়াছেন বা তিনি

তাব,—আমি যখন মায়ের চরণ আঁকড়াইয়া আছি তখন কি ভয়—শমন বেটা কি করিবে?

* * *

'আর একটা দিক চৈতন্যের দিক—আমি পাপী তাপী দীন, আমার কি হইবে—হয়তো তিনি দয়া করিয়া উদ্ধার করিবেন—যদি তিনি কৃপা করিয়া উদ্ধার করেন তবেই রক্ষা।

* * *

'মনে হয় শঙ্কর জীবকে [illegible] যাহা মরণ-ভয় হইতে উদ্ধার তাহা বলিতেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শঙ্কর আপনার ব্রহ্মস্বরূপতার উপলব্ধি না ঘটে, তত্ক্ষণ মরণ-ভয় যাইবার নহে। আমিই ব্রহ্ম আর কোনো ব্রহ্ম নাই—আমিই জগৎকর্তা ও জগৎবিধাতা—এই যে জন্ম-মৃত্যু-জীবন, এ সকলই আমার লীলাবিলাস—এইটুকু উপলব্ধি না হইলে মৃত্যুভয় ঘুচিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহাও উপলব্ধির ব্যাপার—কেবল চেষ্টা করিয়া তর্ক দ্বারা এ উপলব্ধি ঘটিবে না।'

রামেন্দ্রসুন্দর পত্রলেখককে দুইখানি বই পড়িবার উপদেশ দিয়াছিলেন, আমরাও রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরাগী পাঠকগণকে এই দুইখানি পড়িতে বলি—ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্তরের কথা' ও উইলিয়াম জেমসের 'Varieties of Religious Experience.'

এই পত্রখানিতে আমরা দেখিতে পাই, রামেন্দ্রসুন্দর ভক্ত হইলেও জ্ঞানের সাধনার দিকেই তাঁহার অন্তরের প্রবণতা ছিল। তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, কেন না, তিনি প্রজ্ঞাবান, সংযত ও সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইয়াছিল, তাই তিনি সত্যকে দর্শন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের কোন কোন মনীষী বা কবিও আত্ম-সমাহিত অবস্থায় এই দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। সেক্সপীয়ার যখন বলিয়াছেন—

'We are such stuff as dreams are made o[n]'

অথবা ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন কোকিলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

'O blessed bird! The earth we pace,
Again appears to be,
An unsubstantial, fairy thing,
It is fit home for thee.'

তখন তাঁহারাও দিব্যনেত্রে সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ভারতীয় সাধনার উত্তরাধিকারী রামেন্দ্রসুন্দর জ্ঞান-সাধনার দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

উপসংহার

রামেন্দ্রসুন্দরের মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে (৬ই জুন ১৯১৯, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬) আমরা সংক্ষেপে তাঁহার দার্শনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। তাঁহার সম্পর্কে আরও নানা দিক দিয়া আলোচনা করা চলে—যেমন বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর, বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর, ভারতীয় সাধনার উত্তরাধিকারী রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি। রামেন্দ্রসুন্দর স্বল্প পঞ্চান্ন বৎসর জীবিত ছিলেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দান বিপুল। আবার সাহিত্যসেবী রামেন্দ্রসুন্দরের চেয়ে মানুষ রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন আরও বড়, তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক ও মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত, তাই তিনি জাতিকে কল্যাণের পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। বাঙালীর পরম দুর্ভাগ্য, সে আজও রামেন্দ্রসুন্দরকে তাঁহার জন্ম-দিবস বা মৃত্যু-দিবস উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদন করে না, তাঁহার রচনাবলী হইতে প্রেরণা লাভ করে না। ইহাতে তাহার নিজেরই কল্যাণ ব্যাহত হয়—'প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজা-ব্যতিক্রমঃ'। আজও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন না করিয়া বাঙালী যে মহাপাপ করিয়াছে, আজও কি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় আসে নাই?

ফেলেছি, পার্টির বরাবরই একটা বাড়িভাড়া করা ছিল। তার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। [illegible] সে মাত্র কয়েক মাসের জন্য ছিল, কিন্তু তার মধ্যেই [illegible] ও আমাদের ব্যাপারে [illegible] করে ফেলেছিল।

একটি বিচিত্র দুর্ঘটনা

ঘোড়ায় দুর্ঘটনা ঘটেছে অনেক, বিশেষ করে কলকাতা শহরে, এবং অধিকাংশই আমার ফিটিনগাড়ি চালাতে গিয়ে। একদিন এক ডিনারের নেমন্তন্নে একটু বেশী মাত্রায় মদ্যপান করে ফেলেছিলাম। শীত ছিল, বেশ গরম বোধ করছিলাম। ভোজ শেষ হবার পর, ক্যাপ্টেন বন্ধু [illegible] বললেন, তাঁকে নিয়ে ফিটিনে করে একটু হাওয়া সেবন করাতে। ভুরিভোজনের পর হাওয়া সেবন বেশ ভালই লাগে। আমিও তাই রাজী হলাম, এবং দুর্বুদ্ধির বশে নিজেই ফিটিন হাঁকিয়ে বেড়াতে বেরুলাম। বল্গা হাতেই ধরা রইল, কিন্তু তাতে ঘোড়া দুটির উদ্দামগতিতে দৌড়নোর কোন বাধা হল না। পিঠে চাবুক পড়তেই বেগ প্রায় বাতাসের গতি ধরল। চোখে তখন ক্যাপ্টেনের রঙ ধরেছে, কুয়াশার ছোঁয়া লাগছে গায়ে, আর মনে হচ্ছে যেন দেবদূতদের মতন পুষ্পরথে করে স্বর্গের দিকে উড়ে চলেছি। জানিও না কখন ঘোড়া দুটি কোর্টের দিকে বাঁক নিয়েছে। ক্যাপ্টেনের ইচ্ছা ছিল কোর্টের ভিতর দিয়ে যাবার। আমি নিজেই তাই শুনে ঘোড়ার মুখ কখন কোনার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি খেয়াল নেই। স্বর্গের বদলে যে আমরা কোর্টের দিকে চলেছি, এবং দুরন্তবেগে, তার হুঁশ নেই। কোর্টের ভিতরে ঢোকার রাস্তাগুলি সরু সরু, জোরে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া কখনই উচিত নয়। সে চেতনা তখন আমাদের লুপ্তপ্রায়। সরু পথে ঘোড়া সবেগে ছুটছে, ভালমন্দ জ্ঞানও নেই। কোর্টের ভিতর থেকে আর একখানি গাড়ি আসছিল বাইরে। কিভাবে যে আমার ফিটিন তার গা ঘেঁষে তীরবেগে বেরিয়ে গেল, এবং কেমন করে পাশাপাশি [illegible] দুটো [illegible] না লেগে [illegible] হল, [illegible] আমি [illegible] না। [illegible] হলে [illegible] হয়ে [illegible] হল, [illegible] গাড়ির [illegible] বুকে [illegible] উড়ে [illegible] হয়ে [illegible]। [illegible]

[illegible] কোর্টের [illegible] গাড়ির [illegible] হয়ে গেছে [illegible] আমার [illegible] হয়ে পড়েছে, [illegible] মনে হল। [illegible] এমন সময় ক্যাপ্টেন বললেন, "কি করছেন [illegible]? কোচোয়ানটি গাড়ি হাঁকিয়ে কোথায় পালাল, অন্ধকারে কেউ দেখতে পায় নি। সৈনিকের দফা শেষ হয়ে গেছে, তার জন্য কোন চিন্তা নেই।"

দূরের জোরবাতী চোখ ঝিম করে উঠল। [illegible] হাতের বল্গা ছেড়ে দিলাম। ঘোড়া দুটো আপনি পার হয়ে গেল। বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। নেশাটা কিন্তু একেবারে নেমে গেল। একটা নির্দোষ লোককে এইভাবে খুন করলাম ভেবে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। দ্বিতীয় দিন সকালে আমার বন্ধু কোর্টের ডাক্তার উইলসনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কোর্টের ভিতরে ঢোকার সময় পলাতক খুনী আসামীর মতন অপরাধী বোধ করছিলাম। ডাক্তার উইলসনের কাছে গিয়ে, এ কথা সে কথার পর, জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, দু-একদিনের মধ্যে কোর্টের ভিতরে কোন গাড়িচাপা-টাপার দুর্ঘটনা ঘটেছে কি?" ডাক্তার বললেন, "দিন দুই আগে সন্ধ্যাবেলা একটি অদ্ভুত দুর্ঘটনা ঘটেছে। তৃতীয় রেজিমেন্টের একটি সৈনিক কর্নেল হ্যামিলটনের কোচগাড়িতে চাপা পড়েছে। মনে হয় গাড়ির জোয়ালে জোরে বুকে ধাক্কা লেগেছিল,

দিনে
দিনে
দিনে
দি...
Rexona

আপনার রূপ লাবণ্য আপনারই হাতে !
হিমালয় বুকে স্নো !
HIMALAYA BOUQUET SNOW

লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে !
LIFEBUOY
SOAP

বাড়ির সারি সোজা হয়েছে কিনা এ কথা বলতে গিয়ে থরথর করে আচমকা কেঁপে উঠছে বুকের ভেতরটা। মনে মনে মিনতি জানাল বন্দনা, ঠাকুর, যেন সে না আসে—না আসে। যেন কিছুতেই না আসে। না—না।

রাত্রি গভীর হল। ফরেস্ট অফিসার পিকদারের বাংলোয় সার সার মোমের শিখা কাঁপল। হাওয়ায় জ্বলল গন্ধক। লাল নীল আগুনের ফুলকি ছুটল।

মোম নিভল। রাত্রি গভীরতর হল। মুঠো মুঠো মানিকের কুঁচির মত জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে পাগল অরণ্যের মন ভরিয়েছে।

উতলা অন্তর শান্ত হল না তবু। বন্দনার মনে হল এই অন্ধকারে প্রদ্যোত হয়তো পথ হারিয়ে ফেলেছে। দিশে পাচ্ছে না। দূরে কোথাও একটা জানোয়ার ডাকল। তার ডাকের প্রতিধ্বনি ভেসে এল হাওয়ায়। কেউ কি ডাকল, কে—এ—উ—উ—উ? কত না ডাক, কত না ধ্বনি, কত যে অজস্র শব্দ রাতের অরণ্যে। বন্দনা যেন আজ সবকটি শব্দের ওপর কান পেতে শুয়েছে। প্রদ্যোত—যদি সে এসে থাকে—যদি পথ হারিয়ে গিয়ে থাকে এই বনে।

বন্দনা মনে মনে বলল, ঠাকুর, যদি সে এসে থাকে তবে তাকে তুমি দেখ, রক্ষা কর।

সে তিথি চলে গেল। তার মনের এই শঙ্কাদোদুল, উতলা ভাব কাটতে লাগল দিনদিন। কেউ এল না। দীপাবলীর দিন নয়, তার পরদিন নয়—তার পরদিনও নয়।

নিশ্চিন্ত হল বন্দনা। নিশ্চিন্ত হল এবং বিরক্ত হল। তার মনে হল প্রদ্যোতটা অত্যন্ত ভীরু, কাপুরুষ। তার বুক চিতিয়ে চলা, গমগম করে হাসি, এ সবই লোক-দেখানো। ভেতরে ভেতরে লোকটা অসম্ভব দুর্বল। নিশ্চয়ই—না হলে কোন কথা না বলে চিঠিগুলো ফিরিয়ে দেয়! মানুষের একটা আত্মসম্মানজ্ঞান তো থাকে। সে তো বন্দনার মুখের ওপর বলতে পারত, চিঠি আমার। দেব না। এখানে আসতেও তো পারত কালীপুজোর দিন। সাহস নেই।

প্রদ্যোত এসে সে দেখিয়ে দিত যে সে সব করতে পারে। এল না। অভিজিতের পাশে নিজেকে ছোট মনে হবে। বন্দনার এক জোড়া চোখে সইবে না তার। আসে নি সেইজন্য—মনে মনে সিদ্ধান্ত করল বন্দনা।

সাতদিন পর ডাক এল—সাইকেলের। ফরেস্ট অফিসারের বাংলোয় ডাক আসে বেলা পেরিয়ে বিকেলে আসার সময়। ডাকপিওন সাইকেল করে এসে চিঠি দিয়ে চলে যায়। দুপুরে মাথায় তন্দ্রার মত আবেশ ধরেছিল। এবার উঠে পড়ল বন্দনা। একটা সাপ্তাহিক আর একটা মাসিক পত্রিকা এসেছে। একটা কার্ড দিয়েছেন মা—পারিবারিক কুশল। আর একটা চিঠি আছে। খামের লেখা দেখে বোঝা যাচ্ছে লিখেছে মাধবী। বাকী চিঠিগুলো অভিজিতের। পত্রিকাগুলো নেড়েচেড়ে বিছানায় ফেলল বন্দনা। তারপর খামটা খুলল। হাঁ, মাধবীর চিঠি।

একবার পড়ল। দুবার—তিনবার পড়ল সে। নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর মাধবী। কেমন দু-লাইনে কথা সাজানোর মত খবরটা জানিয়েছে তাকে। হাত থেকে চিঠিটা খসে পড়ে গেল মেঝেয়।

হাওয়াতে উড়িয়ে নিচ্ছিল খসে-পড়া চিঠির কাগজ। বন্দনা নীচু হয়ে সেটা তুলে নিল। নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল তারপর। নির্জন দুপুর। বাংলোর টালির ওপর বসে করুণ কণ্ঠে ঘুঘু পাখি ডাকছে একটা। পাখির ডাক নয়—যেন কান্না।

টেবিলের একেবারে তলায় প্রদ্যোতের সেই একমাত্র চিঠিটা রেখে দিয়েছিল বন্দনা। কতদিন আগে লেখা। ঠিকানার অক্ষরগুলো ম্রিয়মাণ, রঙ বদলেছে। চিঠিটা একবার পড়তে চাইল বন্দনা। খানিকটা পড়ল। আর পারল না। পড়ল না।

বাইরে এসে বারান্দার কোণে পাশাপাশি রাখল চিঠি দুখানা। মাধবীর লেখা চিঠি আর তুলে রাখা প্রদ্যোতের চিঠিটা। দুটো চিঠি পাশাপাশি রেখে আগুন লাগাতে গিয়ে আবার পড়ল সে। কেবল মাধবীর চিঠিটার

রহসি

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

রাত্রির আঁধার নামে আমার প্রাঙ্গণে,
মন্থর, পিচ্ছিল কালো পাখা দুটি তার—
যেন কোন্ অজানিত ব্যথা সঙ্গোপনে
তারি মাঝে ঢেলে দেয় ক্লান্ত মনোভার।
নিঃসঙ্গ নিবৃতি রাতে, নিঃসীম নিশ্চল,
যুগান্তের মৌনতারে করিয়া সারথি—
শূন্যপানে চেয়ে রয় যেথা অচঞ্চল
অনিরুদ্ধ তপস্যার নির্বাক আরতি।
আদিহীন অন্তহীন দিগন্তের কোলে
অধ্বনিত কোন্ ভাষা তরঙ্গিয়া যায়—
আঁধার জলধি মাঝে অশ্রুত কল্লোলে,
দিশাহীন ইঙ্গিতের অদৃশ্য দিশায়।
মনে হয় কোথা নাই জীবন-উত্তাপ
যেন কোন্ মেরুদেশ-তুহিন-শীতল
চূর্ণিত-তুষার বায়ু করে পরিমাপ
অন্ধ ক্লীব নৈরাশ্যের কোথা আছে তল।

আমার আকাশভরা এত হাসি আলো,
এত প্রেম অফুরন্ত শান্তির কূজনে,
নাহি জানি অকস্মাৎ কোথায় মিলালো
নিগূঢ় রহস্যমাঝে মায়ার গহনে।
মনে হয় শূন্য আজি দিগন্তের পারে,
চিহ্নিত সীমার মাঝে নিখিল জগৎ
বিক্ষুব্ধ কামনা তার জাগে বারেবারে
ব্যাপ্ত করি জলধিরে, সমুদ্র-পর্বত,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেন কী হতাশা
মূর্ছিত কল্পনালোকে বেদনা-বিকল
গতিহীন জ্যোতিহীন মৌন-মূক ভাষা
নিষ্ফল প্রয়াসে নিত্য জাগে অবিরল।

কেবা তুমি অলক্ষিতে রহিয়া আড়ালে,
সে কোন্ মায়ায় রচি আলোকের স্তব,
অনন্ত-নীল আচ্ছাদনে রূপ-কঙ্কালে
ঢাকিয়াছে দিলে আনি শাশ্বত গৌরব।
সে কি শুধু ইন্দ্রজাল, মানস-প্রচ্ছায়ে
নিত্য নব সুরচিত রূপের আরতি—
মিথ্যারে সত্যের মাঝে দিলে কি বিছায়ে
শুধুই বেড়িতে তার ব্যর্থ পরিণতি?

অবগুণ্ঠিত হে গোপন, তোমার লুকায়
অন্তরের অনুরাগ প্রকাশে বিধুর
অজানার খেলাঘরে সুতীব্র আশায়
কাহারে খুঁজে যে রবে নিরতি মধুর?
তরঙ্গিত বহিঃস্রোতে প্রাণের বারতা
তরঙ্গিয়া অনির্দেশপানে ছুটে চলে
সীমার বাঁধন খুলি অসীমের কথা
আসক্তিরে মুক্ত শুধু জাগে অন্তরালে।

চিরন্তনী জিজ্ঞাসার হে চিরদুর্জয়
চিরায়ত কালস্রোতে সুচির আঁধারে
নিত্য আনো অলৌকিক অলোক-বিস্ময়—
তোমারে ধরিতে নারি জ্ঞানের প্রাকারে!
অদৃশ্য সঙ্কেত শুধু করিয়া বিস্তার
কী কথা কহিয়া যাও গোপনে গোপনে—
রহসি রহিয়া কর রহস্য-বিহার
সঞ্জীবিত করি ক্ষুদ্র আশা-দীর্ণ জনে।

'মোদের গরব, মোদের আশা'

দেবব্রত ভৌমিক

"The writer must, naturally, make a living in order to exist and write, but he must not exist and write in order to make a living... The writer in no way regards his works as a means. They are ends in themselves; so little are they a means for him and others that, when necessary, he sacrifices his existence to theirs and, like the preacher of religion, he takes as his principle 'Obey God more than men', men among whom he is himself included along with his human needs and desires."

Karl Marx—'Debaten ueber Pressfreiheit', MEGA, Part I, Vol. I, pp. 223-24.

বিশেষ করে মার্ক্স সাহেবের উক্তি দিয়ে রচনা শুরু করার পিছনে আমার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। মানুষের জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের পিছনেই যিনি সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রণোদনা খুঁজে পেয়েছেন, এবং সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তনের জন্যই জীবনের সব-কিছু নিয়োগ করার কথা যিনি আজীবন ঘোষণা করে এসেছেন, সেই বিশেষ ব্যক্তির মুখে লেখক-সত্তার এই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার বাণী পাঠককে একটু গভীরতর দিক থেকেই ভাবাবে বলে আমার বিশ্বাস। অবশ্য, সাঁচা কথা বলতে গেলে গোড়াতেই বলতে হয় যে পড়ুয়া যিনি পাঠক, তাঁকে চিন্তান্বিত করার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নয়; আমি ভাবাতে চাই লেখককেই।

কেন চাই, তার কৈফিয়ত দিতে হলে প্রথমেই আমাদের আধুনিক সাহিত্যের চরিত্রের কথাটা মোটামুটি আলোচনা করে নিতে হয়। কোন সাহিত্যকেই আমরা কেবল সময়ের হিসেব দিয়েই আধুনিক আখ্যা দিই না। এ-আখ্যার পিছনে অনুক্ষণের হিসেব যতটা সত্য, চরিত্র-লক্ষণের বিচার তার থেকে ঢের বেশী গ্রাহ্য—অর্থাৎ আধুনিক কালের সাহিত্যমাত্রেই আধুনিক-সাহিত্য নয়। যে-সাহিত্যে আধুনিক মানসের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট, একমাত্র তাকেই আমরা আধুনিক সাহিত্য আখ্যা দিতে পারি—তা তার বয়সের হিসেবে পরিমাণ যতই থাকুক না কেন। অবশ্য, এ-কথা সর্বজন-স্বীকার্য যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বয়োধর্মেরই অনুসারী। এবং সেইজন্যই সাহিত্য-সত্যের বিচারে শেষ পর্যন্ত বয়সের হিসেব নিতে হয় আমাদের সর্বত্রই।

আধুনিক সাহিত্যের এই বয়স-বিচারে প্রবৃত্ত হলে, অর্থাৎ উৎসের সন্ধানে অগ্রসর হতে গেলে আমাদের স্বদেশের সীমাকে পেরিয়ে যেতে হয়। আর, এক্ষেত্রে সাগর-লঙ্ঘনে জাত যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই; কেন-না আধুনিক সাহিত্য বস্তুটাই কোন বিশেষ ভৌগোলিক সীমারেখায় ধরা দিতে নারাজ। দেশগত রূপের বিচারে যাই হোক না কেন, মনোগত স্বরূপের বিশ্লেষণে, আধুনিক সাহিত্য কোনমতেই কোন দেশীয় বা প্রাদেশীক সাহিত্য নয়। তাকে আমরা যথার্থ অর্থে বিশ্ব-সাহিত্যই বলতে পারি। বিশ্বের সব ভাষার সাহিত্যই এখানে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের দ্বারা 'আধুনিক'—এই সংজ্ঞায় চিহ্নিত হয়েছে।

মোটামুটিভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই আধুনিক

মানসের জন্ম বলা যেতে পারে। শিল্প-বিপ্লব ব্যক্তিকে যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি-সত্তার গৌরব দিয়েছিল, এবং রেনেসাঁসের আন্দোলন এই ব্যক্তি-সত্তার সামনে যে নতুন উদার স্বর্গদ্বার অবারিত করে ধরেছিল, সাধারণভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার সমস্ত মানস-কৃতিতেই তার প্রভাব সুস্পষ্ট। রেনেসাঁসী চেতনা জীবনকে একটি বিশেষ সুস্থির সুন্দর অর্থ দান করেছিল—যে অর্থ একান্তভাবেই মানবিক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং যুক্তিনির্ভর। এই পরিতৃপ্ত অর্থের ঐশ্বর্যে শক্তিমান হয়েই উনিশ শতকের জীবন বিভিন্ন দিক থেকে সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছিল। সমস্ত সমাজের মধ্য দিয়েই তখন অবাধ অগাধ সৃষ্টিশীল আলো-হাওয়ার প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছু বৈপ্লবিক আবিষ্কার এই রেনেসাঁসী সুস্থির জীবন-চৈতন্য এবং সুস্থ মূল্যবোধের বনিয়াদে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। যে উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানেরা এতদিন রেনেসাঁসের ঐতিহ্য ও শিক্ষার উত্তর-সাধক হিসেবে সমাজের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন সৃজনশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এসেছে, হঠাৎ ব্যাকুল বিস্ময়ে তারা দেখতে পেয়েছে যে পায়ের নীচে থেকে জমি সরে যাচ্ছে। শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে নতুন অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বনিয়াদের উপর সমাজের নায়ক হিসাবে যে নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল, অনেকদিন আগে থেকেই অলক্ষ্যে তাদের অগ্রণীর ভূমিকায় ভাটা পড়তে শুরু করেছিল। ইতিহাসের আপন ডায়লেকটিক বিবর্তনের নিয়মে এই বিশেষ কালের পরিতৃপ্ত সৃষ্টিশীল ভূমিকা নিঃশেষ হয়ে যাবার পর নেমেসিসের কাজ আপনা থেকেই ভিতরে-ভিতরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নির্মম আঘাতে সেই নেমেসিসের বা ডেকাডেন্সের নগ্ন রূপ স্পষ্ট করে ধরা পড়ল। অপরূপ রূপের প্রতিমার উপর থেকে রঙ ধুয়ে গেল, মাটি খসে গেল—কুৎসিতভাবে প্রকট হয়ে উঠল পচা খড়কুটোর বোঝা আবর্জনা। দলে-দলে তরুণ যুবককে যখন বাধ্য হয়ে গোরু-ছাগলের মত কামানের খোরাক হতে হল, বুভুক্ষার যন্ত্রণায় মাকে যখন সন্তান ত্যাগ করতে হল, পতিব্রতা নারীকে যখন পণ্যবস্তুর মত নিজের দেহকে বিক্রয় করতে হল, তখন মানুষের মনে রেনেসাঁসের সুস্থ জীবনদর্শন এবং মূল্যবোধের প্রতি আস্থা চুরমার হয়ে ভেঙে গেল। বাইরের দিক থেকে যেমন আঘাত এল যুদ্ধের, তেমনি ভিতরের দিক থেকেও আহত হতে হল জ্ঞানের নতুন বিস্ময় আবিষ্কারে। ডারুইনের গবেষণা, মার্ক্স-এঙ্গেলসের সমাজের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের পুরাতন সুস্থির চেতনাকে বিপর্যস্ত করে দিল। আরও সব থেকে বড় কথা—যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকসমাজ এতদিন ধরে বাণিজ্যের আদি ও অকৃত্রিম সাধক-বাহকের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়ে এসেছেন, তাঁরা সমস্ত কর্মচাঞ্চল্যের যুগে যে স্বচ্ছন্দ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নির্ভর ছিল, সে নির্ভর প্রায় শেষের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমেই গুটিকয়েক কোটিপতিদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ছোটখাট ব্যবসার পথে মনোপলিস্টদের দানবের ছায়া ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এমনি অবস্থায় সমাজের সব কিছুকেই আর সুস্থ ও সুন্দর হয়ে থাকতে পারে না। পারে নি। অবিশ্বাস অসন্তোষ সংশয় সন্দেহ চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। পতনশীল জগৎ ব্যাপারকে কোন মঙ্গলময় পরম কারুণিক ঈশ্বরের দৈবী লীলার করুণা-দান মনে করে সান্ত্বনা পাবার প্রয়োজন আর বিশেষ অবশিষ্ট রইল না। রেনেসাঁস-পূর্ব সহজ ধর্মীয় বিশ্বাসের অবলম্বন যেমন নষ্ট হয়ে গেল, তেমনি রেনেসাঁসী চেতনার যুক্তিনিষ্ঠ উদারবন্ধী আত্ম-প্রত্যয়ও আর শক্তি যোগাতে পারল না। শ্রীমতী উল্ফ্ যাকে 'leaning tower sensation' বলেছেন, সেই sensation-এ শ্রেণী-হিসাবে অধঃপতিত মধ্যবিত্ত মন তখন টলমল করে উঠেছে। শিল্প সাহিত্যেও তারও অশুভ ছায়া পড়েছে সর্বদিক থেকে। লেখকেরা জগৎকে কেবল 'waste land' বলে চিহ্নিত করেছেন এবং মানুষকে বর্ণনা করেছেন 'hollow men' হিসাবে। কোন দিক থেকে কোন আশার বাণী শোনাতে পারেন নি কেউ। শুধু যে পারেন নি, তাই নয়, আসলে

শোনাতেও চান নি কেউ। তাঁদের ব্যাধিগ্রস্ত মনে সমস্ত আশার আনন্দের ও শান্তির কথাই সত্যের অপলাপ এবং মনগড়া মোহের ব্যর্থতা বলে প্রতিভাত হয়েছে। আশার কথা শোনাতে যেন লজ্জিতই বোধ করেছেন সকলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু পর্যন্ত চলেছে এই একই অবস্থা। এই সময়ের মধ্যে একদিকে যেমন কিছু সংখ্যক লেখক রুশ-বিপ্লবের আপাত-সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মার্ক্সবাদের মধ্যে নতুন সৃষ্টিশীল জীবনের সম্ভাবনার পথ খুঁজে নিয়েছেন, তেমনি অপরদিকে বহু শক্তিমান কবি-সাহিত্যিকই বিপরীতমুখী হয়ে পিছনের দিকে পা বাড়িয়েছেন—কেউ ধর্মের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিন কায়ক্লেশে কাটিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, কেউ প্রাচীন লোক-কথার রোমাণ্টিক কাগজ-স্বপ্নের বালুকায় উটপাখির মত মাথা গুঁজে ঝড়ের ঝাপটাকে এড়াতে চেয়েছেন, আবার কেউ-বা অবচেতনার গভীর গুহাস্থিত অন্ধকারে কেবলই অন্ধের মত ঘুরপাক খেয়ে মরেছেন। হাক্সলী-ইশেরউডের মত লেখকেরা, যাঁরা প্রচুর শক্তির ঔজ্জ্বল্যে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে আসরে নেমেছিলেন, তাঁরা কিছুকাল প্রচণ্ড উৎসাহে দু হাতে পচনশীল সমাজের আবরণ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তীব্র ব্যঙ্গের হাসিতে প্রথাসিদ্ধ জীবনযাত্রার পূর্ণতার অহমিকাকে সচকিত করে তুলেছেন। কিন্তু তারপর? তারপর এই নেগেটিভ কাজের একঘেয়ে তুচ্ছতায় ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে উঠেছে তাঁদের অমিত উৎসাহ। এবং অবশেষে হলিউডি ফিল্মের স্ক্রিপ্ট রচনায় ও অবসর সময়ে সর্বগ্লানি-হর উপনিষদ অথবা বেদান্তের চর্চায় প্রাজ্ঞজনোচিত উপায়ে তাঁরা অতীত যৌবনের স্মৃতিকে বিস্মৃত হবার ঐকান্তিক সাধনায় রত হয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী এবং পরবর্তী কালেও মূলগত দিক থেকে সেই অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। সব দিক থেকে শুধু লক্ষণগুলোই আরও তীব্র হয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। মানুষের বিশ্বাসের ওপর একে একে আঘাত এসে পড়েছে আরও নানা দিক থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী ভয়াবহতা প্রথম যুদ্ধের স্মৃতিকে ম্লান করে দিয়েছে। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে বিজ্ঞানের একটি পরম আবিষ্কারের চরম ধ্বংসকারীতার রূপ যে-মানুষ একবার প্রত্যক্ষ করেছে, তার পক্ষে জীবনের অন্তর্লীন কোন শুভচেতনায় অবিচল থাকা প্রায় অসম্ভবেরই নামান্তর হয়ে উঠেছে। অপর দিকে, যারা কম্যুনিজমের আশ্বাসকে আশ্রয় করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিল, তাদেরও চরম আঘাতের মুখোমুখি হতে হয়েছে বারবার। ক্রুশ্চেভ কর্তৃক মহিমান্বিত স্তালিনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, ম্যালেনকভের নির্বাসন, হাঙ্গেরীর বিদ্রোহকে রক্তের স্রোতে ধুয়ে দেবার প্রচেষ্টা, এবং সর্বশেষে প্রাচ্যের প্রাজ্ঞ চীন কর্তৃক ভারতসীমান্ত লঙ্ঘন ইত্যাদি ঘটনার আঘাতে সংবিবেকবান মানুষের পক্ষেই জগতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নের সঙ্গে কম্যুনিজমকে যুক্ত করে নিশ্চিন্ত থাকার অবকাশ নেই আর। ফলে, সব দিক থেকেই মার খেয়ে মানুষের জীবন আজ নোঙরহীন নৌকোর মত উদাস নিরুদ্দেশে ভেসে চলেছে—কোথাও কোন প্রত্যয়ের খুঁটিকে আশ্রয় করে দাঁড়াতে পারছে না কেউ। আর সব থেকে বড় কথা এই যে, এ ভেসে যাওয়ায় তার কোন গতির আবেগ নেই, নিরুদ্দেশ-যাত্রার রোমান্স নেই—আছে শুধু নিরুপায় আত্মসমর্পণের গ্লানি, যন্ত্রণা। এই গ্লানি আর যন্ত্রণার ছাপই আজকের বিশ্ব-সাহিত্যের অঙ্গে-অঙ্গে। আধুনিক সাহিত্যের মানস-প্রকরণের এটাই বোধ হয় সব থেকে বড় উপকরণ।

এ-উপকরণ যেমন রয়েছে য়ুরোপের সাহিত্যে, আমেরিকার সাহিত্যে—তেমনি বাংলাদেশের সাহিত্যেও। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এ-উপকরণের ব্যবহার ঠিক পাশ্চাত্ত্যের মত হয় নি। হয় নি—তার কারণ, এ-দেশের মানসভূমির বৈশিষ্ট্য। সে ভূমি পূর্ববর্তী কাল থেকেই বিশেষ কর্ষণায় যে-ফসল ফলানোর জন্যে তৈরি হয়েছিল, তা 'আধুনিকতা' হলেও ঠিক ও-দেশের তুল্য সবটা নয়। বাংলাদেশে রেনেসাঁসের আন্দোলনের সঙ্গে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের রূপের একটা মূলগত পার্থক্য আছে। বাংলার এই নব-জাগৃতির বাণী কেবল কিছু ইংরেজী শিক্ষিত

নাগরিক উচ্চবিত্ত মানুষের জীবনের মধ্য দিয়েই এসেছিল। এবং প্রায় নগরের সীমারেখার মধ্যেই তাঁদের জীবনকে কেন্দ্র করে তার ঢেউ ওঠানামা করেছিল। সমগ্র দেশ এবং সমগ্র সমাজের মধ্যে সে আন্দোলন বিশেষ একটা প্রভাব বিস্তার করে নি। করলেও সেটা বাইরের কিছু ঘটনা এবং ক্রিয়াকলাপেই সীমাবদ্ধ ছিল, জীবনের গভীরে প্রবেশ করে মানস-সত্তার মূল শক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারে নি। পারে নি, তার কারণ, সে-সময়ের সমাজের বিশেষ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্যাটার্ন, এবং তার পূর্ব-ইতিহাস। আমাদের নব-জাগৃতির পুরোহিতেরা বোধ হয় সে আন্দোলনকে তাঁদের সাংস্কৃতিক জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। আর তা ছাড়া, তাঁদের অধিকাংশেরই জীবনের আর্থিক ভিত্তিটা ছিল জমির উপরে। নতুন বণিকদের মালিকানা-স্বত্বে নব্য শ্রেণী হিসাবে তাঁদের উদ্ভব ঘটে নি। অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজ-বিন্যাস রয়ে গেছে প্রায় পূর্বানুগই। নব-জাগৃতির পুরোধারা নতুন যুগের সাড় বাইরে ইউরোপীয় এডিটেশনে এবং খবরের কাগজে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে এসে হাত-পা ধুয়ে পুনরায় সেই সনাতন সমাজেরই প্রতিভূ হয়ে বসেছেন। তারপর, আবার সেই গোঁড়া এবং সনাতন, হিঁদু এবং সাম্প্রদায়িক। মাত্র জনকয়েকের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্ত ছাড়া, অন্য অধিকাংশের সম্বন্ধেই এমন কথা মনে করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বস্তুতঃ, রেনেসাঁসের ভাবধারা অধিকাংশ ব্যক্তিই সমগ্র সত্তা দিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন কি না, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। চাঁদসদাগরের মতই তাঁরা বৈদেশিক চেঙমুড়ি কানীর পূজা অবহেলায় বাঁ-হাতে সেরে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের চোখ এবং মন সব সময়ই ফিরিয়ে রেখেছেন স্বদেশীয় সনাতন শৈবলিঙ্গের মূর্ত্তির উপরে। মনে হয়, সে-যুগের বেশীর ভাগ ব্যক্তি সম্পর্কেই এ উক্তিকে সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। রেনেসাঁসের ভাবধারা স্বাভাবিক ডায়লেকটিক্ প্রসেসে আমাদের স্বদেশীয় সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ হিসাবে আসে নি। ওটা আমাদের উপর হঠাৎ এক্সিডেন্টের মত বাইরে থেকে এসে চেপে বসেছে। আর, তার মূল অর্থনৈতিক বনিয়াদটাও যে যথোপযুক্ত সবল হয় নি, সে কথা তো আগেই বলেছি। কাজেই ও-ভাবধারা সম্পূর্ণভাবে আমাদের মানসিক কাঠামোটাকে পরিবর্তিত করতে পারে নি; পুরনো কাঠামোর উপরেই একটা নতুন ভঙ্গীর রঙ লাগিয়েছে মাত্র। আমরা সম্পূর্ণভাবে সামনের দিকে এগোতে পারি নি—এক পা এগিয়েছে সামনে, আর এক পা পিছনে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই এ দ্বন্দ্ব স্পষ্ট করে ধরা পড়ে। বঙ্কিমের একদিকে যেমন রেনেসাঁসী উদারনৈতিক যুক্তিবাদ, অপর দিকে তেমনি হিন্দু রিভাইভ্যালের সনাতন ভক্তিবাদ। এই আপাতবিরোধী ভাবধারার দ্বন্দ্ব আমাদের সমাজ-মানসে বর্তমান ছিল, অর্থাৎ আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সমানই রয়ে গেছে। আর, সেইজন্যই আমাদের আধুনিক মনের লক্ষণ সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক আধুনিকতার অনুকারী নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর যখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের হাল ধরেছেন, তখন তাঁর মধ্যেও এই ভাববিরোধ উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ বিরোধ ঠিক বঙ্কিমানুগ হয়ে থাকে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যে হিন্দু-রিভাইভ্যালিজমের জায়গায় বসিয়েছেন ব্রাহ্ম ভাবধারাকে। এক দিকে রেনেসাঁসী উদারনৈতিক যুক্তিবাদ, এবং অপর দিকে ব্রাহ্ম ভাববাদ; এক দিকে প্রাচ্যের ভাব-সিদ্ধির প্রতি প্রীতি, এবং অপর দিকে পাশ্চাত্যের কর্ম-সাধনার প্রতি আকর্ষণ—এই উভয় ভাবধারার টানাপোড়েনেই গঠিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মানস-ভূমি। এ উভয় ভাবধারার সমন্বিত প্রবেগ নিয়ে তাঁর মন কবি-মানসের বিশিষ্ট নিয়মে একবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসীমার রূপের চরম প্রান্তে পৌঁছেছে, তারপর আবার ইন্দ্রিয়াতীত অরূপ অসীমের দুয়ারের উদ্দেশে নিরুদ্দেশযাত্রা করেছে।* দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংকট যে তাঁর মনে কখনও আসে নি, তা নয়। কিন্তু তিনি সচেতন মনের সাহায্যে উপনিষদীয় আনন্দবাদের দ্বারা সমস্ত দ্বন্দ্ব-খণ্ডতাকে অতিক্রম করে

* 'পরিচয়ের চিঠি', মাঘ ১৩৫০ সংখ্যায় লেখকের 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

গেছেন, সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংকট-সন্দেহকে পরাস্ত করেছেন। কিন্তু অবচেতন মনে যে সম্পূর্ণভাবে জয়ী হতে পারেন নি, তার পরিচয় রয়েছে তাঁর ছবিতে, তাঁর কোন কোন গল্প এবং পদ্য রচনার শব্দ-নির্বাচনে। যুদ্ধোত্তর কালেও রবীন্দ্রনাথের রচনায় আধুনিক যুগের কোন প্রভাব পড়ে নি দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, বিস্ময়ের কোন কারণই নেই এতে। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কবি-প্রকৃতি, এবং তাঁর উদয়-কালের সাংস্কৃতিক পটভূমির বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে তাঁর কাব্য-কৃতির রহস্যকেও বোঝা যায় সহজেই।

যাই হোক, আমরা যাকে আধুনিকতা বলেছি, রবীন্দ্রনাথ সে-অর্থে আধুনিক নন। আধুনিক সময়ের অন্তহীন দ্বিধা দ্বন্দ্ব-সন্দেহ-যন্ত্রণার অভিঘাত তাঁর স্পর্শকাতর মনকে আঘাত করেছে, অবচেতনায় কিছু প্রভাব বিস্তারও করেছে, কিন্তু সচেতন মনকে তিনি তাকে অতিক্রম করে গেছেন। আর যে-ঐতিহ্যের শক্তিতে তাঁর এ অতিক্রমণ ঘটেছে, তা নবযুগের বাইরে-থেকে-আমদানি-করা রেনেসাঁসী ঐতিহ্য নয়—ভারত-ইতিহাসের কয়েক হাজার বছরের ভাব-সাধনার সমন্বিত রূপ। কিন্তু তাঁর পরবর্তী যুগে যাঁরা সাহিত্যে এসেছেন, যাঁদের আমরা আধুনিক বলতে পারি, তাঁরা এ রূপকে স্বীকার করেন নি। সে-আধুনিকদের কথাতেই এবার আসতে হবে আমাদের।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলার সাহিত্য-সংসারে এমন একদল লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁদের জগৎ রবীন্দ্রনাথের জগতের থেকে অনেক দূরে। রবীন্দ্র-মানসিকতার থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন তাঁরা। তাঁদের যেতে হয়েছে। যেতে হয়েছে যুগের প্রয়োজনে। ইতিহাসের আন্তর সবলই তাঁদের ঠেলে এনেছে সামনে—তৈরি করে দিয়েছে তাঁদের মানসিকতা। যুদ্ধোত্তর যুগের যে বিশেষ মানসিকতার কথা আগে বলেছি, সেই মানসিকতাতেই গড়ে উঠেছে তাঁদের আন্তর সত্তা, তাঁদের ভাব-জগৎ। এ-জগতে কলস কোন বিশ্বাস নেই, অবিচল কোন প্রত্যয় নেই, অন্ত-নিরপেক্ষ শাশ্বত কোন সৌন্দর্যের, কোন ভাবের অনুভূতি নেই। আছে শুধু অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, যন্ত্রণা, গ্লানি। যুদ্ধোত্তর কালেও রবীন্দ্রনাথ বহুদিন ধরে শিল্পসৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সে-কালেও যে-মানসসঙ্কট তাঁকে আচ্ছন্ন করে নি, সেই সঙ্কট এঁদের অভিভূত করে দিয়েছে। তার কারণও ছিল স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের মূল কাঠামোটা, ইন্‌ডিভিজুয়াল সাইকোলজিতে আড্‌লার যাকে ইগো বলেছেন, সেই ইগো যে-সময়ে গড়ে উঠেছে, সেটা যুক্তপূর্ব কাল, এবং তার পরিবেশ ঠাকুরবাড়ির বিশেষ আবহাওয়া। এই ইগো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন-পরিকল্পনা তাঁকে যে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছে, সে প্রত্যয় যুদ্ধোত্তর কালের আঘাতেও টলে নি। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর যুগের যে নবীন লেখকগুলিকে আমরা আধুনিক লেখক বলি, তাঁদের জীবনে সে-সুযোগ ঘটে নি। যাঁদের শৈশব কৈশোর কেটেছে যুদ্ধের বিষাক্ত আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে, যাঁদের ইগো গড়ে উঠেছে চতুর্দিকের অবক্ষয়ের দুঃসহ আঘাতে-আঘাতে, তাঁদের জীবনদর্শনে কোথাও কোন শাশ্বত সত্তা, শাশ্বত সৌন্দর্য ঠাঁই পায় নি। রবীন্দ্রনাথের মত তাঁরা কোন ঐতিহ্যাশ্রয়ী দৃঢ় প্রত্যয়ে জীবনের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে অবিচল থাকতে পারেন নি, কোন সামগ্রিক আনন্দবোধের প্লাবিতে সমস্ত ক্ষুদ্র সত্তাকে শোক-দুঃখ-ব্যথা-যন্ত্রণাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। তাঁরা আধুনিক কালের হতাশ যন্ত্রণা-জর্জর মানসকেই তাঁদের সাহিত্যে রূপ দিতে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদেরই আমরা রবীন্দ্রোত্তর যুগের লেখক বা আধুনিক লেখক বলি।

আমি আগেই বলেছি যে আধুনিক সাহিত্য মানেই বিশ্বসাহিত্য। কিন্তু এ-কথা আমরা কিছুতেই বলতে পারি না যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের কোথাও কোন গরমিল নেই। বরং মনে হয়, এ উভয়ের মধ্যে মিলের থেকে গরমিলের সংখ্যাই বেশী। মিলটা আপাতত, কিন্তু গরমিলটা মূলতঃ। এ কথা স্পষ্ট করে বুঝতে গেলে উৎসের দিক থেকে, অর্থাৎ লেখক-মানসের দিক থেকে, আমাদের

আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করতে হয়।

এদেশে রেনেসাঁসের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে আমি বলেছি যে সে আন্দোলনের বোতারা শিল্পের মালিকানা-স্বত্বে নতুন শ্রেণী হিসাবে দৃঢ় ভূমির উপর পা রেখে দাঁড়াতে পারেন নি। তাই, তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যেই একটা চরম দুর্বলতা এবং অন্তঃসার-শূন্যতা রয়ে গেছে। এ দুর্বলতা এবং অন্তঃসারশূন্যতা পরবর্তী কালের মানসে আরো বেশী প্রকট, আরো বেশী তীব্র। আধুনিক কালের এই লেখকদের জীবন-ভার সেই প্রমাণ হয়ে চোখের সামনে হাজির হয়েছে। এঁদের অধিকাংশই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। জমির সঙ্গে এঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শূন্য হয়েছে কিছু অংশ উপস্বত্বভোগী হয়ে আছেন। আবার শিল্পের সঙ্গেও কোন নতুন মিত্রতা-সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। এই ত্রিশঙ্কু অবস্থায় তাঁরা পূর্ববর্তী যুগের 'leaning tower sensation'-এর চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী অসহায়তার এবং অনিশ্চয়তার sensation-এর আঘাতে সব সময়ই উন্মন করেছেন। তাঁরা না পেরেছেন দুর্বহ গ্রাম্য জনতার সঙ্গে কোলাকুলি অনুভব করতে, না পেরেছেন নতুন-শ্রেণী-হিসাবে-গড়ে-ওঠা শ্রমজীবী মজুরের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিতে। এই অবস্থায় তাঁদের দৃষ্টি এবং চেতনা একমাত্র নিজেকে কেন্দ্র করেই শামুকের মত আত্মাভিমানী আবর্তের বেষ্টনে বন্দী হয়েছে। একমাত্র নিজেকে ছাড়া তাঁরা আর কাউকেই চেনেন নি। আর, চেনেন নি বলেই বাইরের দিকে যখনই তাকিয়েছেন—তাকিয়েছেন রোমান্সের রঙিন চশমা চোখে দিয়ে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে কৃষক এবং শ্রমিক জীবন নিয়ে যা কিছু রচিত হয়েছে, তার অধিকাংশ সম্বন্ধেই এ কথা প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে আমার মনে হয়।

যেমন রেনেসাঁসের ভার আমরা পাশ্চাত্যের কাছে ধার করে নিয়েছি, তেমনি নিয়েছি আধুনিকতাকেও। এবং ধার-করা বস্তু বলেই তাকে আমরা কখনই একেবারে আত্মসাৎ করে নিতে পারি নি। পাশ্চাত্যে আধুনিক মানসের যে তীব্র যন্ত্রণা, সে-যন্ত্রণা আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে সত্যবস্তু নয়। অথচ ও-যন্ত্রণা যে ভাবে বিচলিত করতে পারে, সৃষ্টিশীল করতে পারে, আমাদের তা পারে না। আর পারে না বলেই আমাদের কোন লেখক এ যুগের চিত্রকেও সার্থকভাবে রূপ দিতে পারেন নি, এ যুগের যন্ত্রণাকে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হন নি।

আমি আগেই বলেছি যে রেনেসাঁসের সময় থেকেই আমাদের মানসসত্তার এক পা সামনে আর এক পা পিছনে। আধুনিক লেখকদের সম্পর্কেও এ কথা সত্য। ব্যক্তিগত জীবনে এঁদের শিক্ষা ইংরেজী ভাষায়। ইংরেজী ভাবধারার মধ্যেই এঁদের মনের পুষ্টি। কিন্তু গোষ্ঠীজীবনে অর্থাৎ পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে, জীবনের বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণ-রীতি-নীতির ক্ষেত্রে, এঁদের অধিকাংশেরই জীবন এখনও সেই সনাতন চণ্ডীমণ্ডপে বিধবা মাসী-পিসির সুদৃঢ় আঁচলে শক্ত গেরোয় বাঁধা। কাজেই, মানসসত্তার দিক থেকে এঁদের এক অদ্ভুত দোটানায় সব সময় দুলতে হচ্ছে। না পারছেন সম্পূর্ণভাবে আধুনিক মানসের অবিশ্বাসকে স্বভাবে গ্রহণ করতে, না পারছেন প্রাচীন প্রত্যয়কে মেনে নিতে। জীবনাচরণের বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিক থেকে এঁদের মন একেবারে বিশ্বাসহীন নয়। কিন্তু সে বিশ্বাসকে প্রত্যক্ষভাবে সচেতন মনে স্বীকার করে নেবার সাহস বা চরিত্র এঁদের নেই। ইংরেজী শিক্ষার অর্থহীন অভিমান এবং এক ধরনের উন্নাসিকতা বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতীয় ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসে আস্থার কথা ঘোষণা করতে এঁরা যেন কেমন-একটা বিকৃত লজ্জা অনুভব করেন। আবার, সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাসকে বিশ্বাস করতেও এঁদের সাহসে কুলোয় না। যদি কুলোত তবে তা থেকেই এঁরা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন।

এই উভয়মুখী টানের ফলে কোন দিকেই এঁরা সৃষ্টিশীল হবার সুযোগ পাচ্ছেন না। না পারছেন সম্পূর্ণভাবে আধুনিক জীবনের যন্ত্রণাকে ফোটাতে, না পারছেন তাকে অতিক্রম করে যাবার মত কোন আশার আলো চোখের সামনে তুলে ধরতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে যে-সব লেখক আমাদের সাহিত্য-সংসারে এসেছেন, তাঁদের সকলেরই প্রায় এই একই অবস্থা। একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দেখতে পাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনিই বোধ হয় বর্তমান বাংলা সাহিত্যের একমাত্র অনাধুনিক লেখক। তাঁর রচনায় সন্দেহ নেই, সংকট নেই, অবিশ্বাসের যন্ত্রণা নেই। আছে সহজ প্রত্যয়, স্বাভাবিক স্বীকার—এক কথায় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই তাঁর রচনার যা-কিছু গুণ এবং যা-কিছু দোষ। এই বিশ্বাসের ফলেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্র একদিকে যেমন একটা দৃঢ় প্রশান্তি পেয়েছে, অপর দিকে তেমনি দ্বন্দ্ব-সংকট-সংঘর্ষকে অতিক্রম করে পূর্ণতর মানব হিসেবে বিকশিত হবার সুযোগ হারিয়েছে। (বিশেষ করে উপন্যাসের দিক থেকে এটা খুবই বড় রকমের দুর্বলতা।)

দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

৪। যাহা অসত্য, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।

৫। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তার পর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।

৬। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্তব্য। এটি সোজা কথা, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যতে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

৭। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাশি, জর্ম্মান্ কোটেশন বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

৮। অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে—ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য আর কিছুই নাই।

৯। যে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটি প্রাচীন বিধি; আমি সে কথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃপুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারি বার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না—বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

১০। সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

১১। কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গলা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

এই যে নিয়মগুলির কথা বললাম, এর একটিও আমার নিজের রচনা নয়—১২৯১ সালের মাঘ মাসের 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্র এর প্রত্যেকটি 'বাঙ্গালার নব্য-লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' করে গেছেন। আমি তাঁরই পুনরুক্তি করে বাংলার বর্তমান নব্য-লেখকদের প্রতি পুনরায় নিবেদন করছি।

১২৯১ সালে এই নিয়মগুলির যতটা প্রয়োজন ছিল, আজ উনসত্তর বছর পরে তাদের প্রয়োজন তার থেকে ঢের বেশী বেড়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমরা যাকে একদিন 'মোদের গরব, মোদের আশা' বলে সোচ্চারে ঘোষণা করেছি, সেই গর্ব এবং আশাকে আজ আমরাই নিজের হাতে ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছি। শুধু দিচ্ছিই না, তাতে আমরা এক ধরনের বিকৃত আনন্দ অনুভবও করছি। কোন জাতির পক্ষেই এর থেকে লজ্জার দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। সেইজন্যই আজ আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য নিজে আত্মসচেতন হওয়া এবং অপরকে আত্মসচেতন করা। সেই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই আমি বাংলার নব্য-লেখকদের প্রতি এই সামান্য কটিকয়েক কথা নিবেদন করতে অগ্রসর হলাম।

কবিতার সংবেদনশীল কবিতার এবং প্রাণকে স্পর্শ করে এমন কবিতার প্রতি আমাদের প্রার্থনার দিন এসেছে। সে প্রার্থনার চিহ্ন দেখলাম 'দিগন্তের মেঘে'।

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

সাহিত্যের সমস্যা—নারায়ণ চৌধুরী—পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। তিন টাকা।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সংগ্রহ 'সাহিত্যের সমস্যা'য় মোট বারটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে।* নারায়ণবাবুর প্রবন্ধ পড়লেই বোঝা যায় যে সে প্রবন্ধের বক্তব্য তাঁর উপলব্ধি অনুশীলন এবং প্রত্যয়ের গভীরতা থেকে জন্ম নিয়েছে। সাহিত্যবিষয়ক কোনও কিছু আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অপর সমালোচকের মন্তব্যের কষ্টিপাথরে আপন বক্তব্য ঘষে নিয়ে তার যাথার্থ্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হবার চেষ্টা করেন না। তাঁর পরিশীলিত মনোমুকুরে বাংলাসাহিত্যের যে প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে, যথার্থবাদিতার সঙ্গে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে কুণ্ঠা নেই তাঁর। বিপত্তি সেই জন্যেই। সাহিত্যের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক যোগ করে সাহিত্যালোচনা করতে গিয়ে আত্মীয় ব্যক্তিও শত্রু হয়েছে। "ভালো" লেখকের লেখার "মন্দ" দিকগুলি সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করতে গিয়ে তিনি নিন্দিত হয়েছেন, চেনা লেখকের রচনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি পূর্বোক্ত দোষে দুষ্ট বলে চাটুকারিতার উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করতে পারেন নি কখনও—আর সেই জন্যেই তাঁকে পংক্তির বাইরে একা থাকতে হয়েছে। শুধু সাহিত্য পাঠ করে যে সত্য তিনি অর্জন লাভ করেছেন, অপ্রিয় হলেও তা প্রকাশ করতে অপ্রস্তুত হন নি। 'সাহিত্যের সমস্যা' গ্রন্থেও সে পরিচয় রয়েছে "লেখা লেখা খেলা" করতে গিয়ে এবং "সহজ সুরে সহজ কথা বলতে গিয়ে হাল-আমলের লেখকেরা যে সমস্যার সৃষ্টি করছেন, তাতে সাহিত্যের এবং সেই সঙ্গে রচয়িতাদের ব্যক্তিত্বের যে সর্বনাশ ঘটছে তা-ই নারায়ণবাবুর সর্বাধিক দুশ্চিন্তার কারণ। সাহিত্যের জগতে "রম্যরচনা" নামে এক প্রকার জোড়াতালি দেওয়া বস্তুর সন্ধান পাই। তাতে "বাগ্‌বিস্তার আছে, কলরব আছে, আত্মপ্রচার আছে, ব্যঞ্জনা নেই।" রচনাকে "রম্য" করতে গিয়ে রুচি যেখানে অপরিচ্ছন্ন সেখানে নারায়ণবাবুর মনস্তাপের অবধি নেই।

সাহিত্যের পাঠক হিসাবে যে প্রশ্ন এবং যে সংশয় তাঁর মনে জেগেছে এই গ্রন্থে তার অনেকগুলি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। শিল্প বড়, না জীবন বড়? সাহিত্য বিশুদ্ধচর্চা না জীবনসাধনা? সাহিত্যের গুণাগুণ নির্ণয়ে সাহিত্যসেবীর ব্যক্তিত্ব-বিচার অপরিহার্য কি না; শিল্পীর সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও শিল্পী-ব্যক্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? বর্তমান সমাজ-পরিস্থিতিতে সাহিত্যে "দেহবাদে"র আধিপত্য কেন? সমালোচকের ভূমিকা কী হবে? আধুনিক কাব্যান্দোলনের প্রেরণায় কতখানি সততা রয়েছে? সার্থক উপন্যাসে উপাদান বড় না লেখকের ক্ষমতা বড়?—ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'সাহিত্যের সমস্যা' গ্রন্থে। যাঁরা নারায়ণবাবুর মতামত মানবেন না, তাঁরাও তাঁর নির্ভীকতা, সততা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হবেন।

অরুণকুমার মিত্র

* জীবনশিল্প, সাহিত্যে ব্যক্তিত্বচর্চা, সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি, সাধু ও চলিত ভাষার দ্বন্দ্ব, 'রম্যরচনা', বর্তমান সাহিত্য ও সমাজ পরিস্থিতি, সমাজ-সমালোচনা, ভাবাশ্রিত সমালোচনা, সমালোচকের ভূমিকা, আধুনিক কাব্য-আন্দোলন, বাংলার নবজন্ম পত্র, উপন্যাসের উপাদান।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৫-২৮৮৩

ভবভূতি, [illegible], কৌটিল্য চাণক্য-বিষ্ণুগুপ্ত, শ্রীচৈতন্য, গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, মীরাবাঈ, কবীর, দাদূ, নানক, তুকারাম, সুরদাস, তুলসীদাস—কে কোন্ প্রদেশের লোক ভারতবর্ষের কোনও মানুষই তাহার হিসাব রাখে নাই। এমন কি, বুদ্ধ মহাবীরের জন্মস্থানেরও কোনও বিশেষ মাহাত্ম্য নাই। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানের লোকই হউন সারা ভারতবর্ষ রাম-নবমী জন্মাষ্টমী পালন করে। যে যেখানেই জন্ম হইয়া থাকুন সবাই ভারতের। এই অখণ্ড একাত্মবোধের মূলে ছিল ধর্ম এবং আজও তাহাই আছে। তীর্থস্থান এবং যোগ-কুম্ভ-মেলাস্থানগুলি আদিকাল হইতে আজও পর্যন্ত সেই সাক্ষ্যই বহন করিতেছে। সেইখানেই সবাকার ভারত অনাদিকাল হইতে বর্তমান আছে এবং আরও অনন্তকাল থাকিবে। সে ভারত এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয়। মিথিলা-বঙ্গের কবিরা এই একাত্মবোধের ফলেই ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিয়াছেন, কৃত্তিবাস রচনা করিয়াছেন অযোধ্যার রাম এবং মিথিলার সীতার জয়গান, রামায়ণ। পাঞ্জাবের গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের কীর্তিকথা বাংলা পয়ারে বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। পদ্মিনীর উপাখ্যান লিখিয়াছেন চট্টগ্রামের আলাওল।

বাঙালী কখনই ভারত-মাহাত্ম্যবিরোধী নয়। তাহার প্রতিবাদ হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, গুজর-মারবার-শোষণের বিরুদ্ধে। গুজর মারবার বা জোধপুর ভারত নহে। জওহরলাল সেই ভুলটাই করিয়াছেন। যে বাংলাদেশের রামমোহন বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড ভারত ছাড়া আর কিছু কখনই চিন্তা করেন নাই, ভারতের স্বাধীনতার সাধনায় যে বাঙালী হিন্দুমেলা, ভারত-সভা, ভারত মহামণ্ডল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের নাম দিয়াছে স্বদেশী আন্দোলন, "এই ভারতের-মহামানবের সাগরতীরে" যে বাংলাদেশের কবির কল্পনা, "জয়হিন্দ" ধ্বনি যে বাংলাদেশের নেতার সৃষ্টি, উনবিংশ-শতাব্দীর যে বাংলা-দেশের সাহিত্যে ভারতমহিমা ওতপ্রোত হইয়া আছে সে বাঙালী ভারতকে কখনও কোনওকালে একমুহূর্তের জন্যও যেন ত্যাগ করে নাই এবং করিবেও না। [illegible] জওহরলাল মনেপ্রাণে কবি ও সাহিত্যিক, [illegible] তাঁহার আত্মকথা তাঁহার [illegible] এখানে [illegible] ভারতের শান্তিনিকেতন-আশ্রমে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের [illegible] তাহাই আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

ভারতবর্ষের ধর্ম

প্রথম যুগে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল নিতান্ত অনিশ্চিত। আহার বিহার প্রভৃতি সকল ব্যাপারে [illegible] ছিল একান্ত দুর্গম, [illegible] অভাব ছিল, বিপদ। [illegible] সকল অবস্থাতেই [illegible] চেষ্টা ছিল প্রবল। এই শক্তির [illegible] ছিল মানবসমাজে। এরই প্রেরণায় সেদিন মানুষ শক্তিকে শ্রদ্ধা করেছে, শক্তির প্রচণ্ড বিভীষিকাকে দূর করে, শান্ত করে, [illegible] আপনার পক্ষে টানবার চেষ্টা করেছে। জীবনকে এই ভাবে [illegible] শান্তিস্থাপন [illegible] প্রবল, এরই ফলে সে-যুগে যার হাতে ছিল শক্তি সে জোর করে সকলকে এনেছে নিজের মতে, নিজের শাসনের ধারা এবং [illegible] স্বপক্ষে টেনে সে নিজেদের মত পুষ্ট করেছে অন্যকে।

একমাত্র উপনিষদের মধ্যেই দেখতে পাই ঋষিরা দূর করতে পেরেছেন শক্তির আতঙ্ক এই জগতে। তাঁরা বলেছেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এমন সুস্পষ্ট এত বড় কথা কোনো ধর্মে কোথাও বলা হয় নি। এই আনন্দের দিকেই চলেছে সৃষ্টি, ভয়ের দিকে নয়। এ-কথা যাঁরা বলেছেন তাঁদেরও জীবন, তখন ছিল বিভীষিকার দ্বারা হিংসার দ্বারা ঘেরা। এই আদিম যুগের মানুষই যেদিন অন্ধ পূজা করেছে অন্ধ শক্তিকে, সেই যুগেরই আর এক মানুষের অন্তরে প্রথম এল উপনিষদের মধ্যে আনন্দের অমোঘ বাণী, সে-বাণী এল আমাদেরই এই ভারতবর্ষে।

আনন্দের এ বাণী সকলের পক্ষে সমান ভাবে মিলিত

স্থাবরতা বা স্থবিরতা এগুলোও আমি কিছু আর অম্বর দিয়ে মেনে নিই নি। তবে এই ধরনের মতবাদগুলি নিয়ে বিতণ্ডা করবার জন্ম চিরকাল সক্রেটিসের পরে কোপারনিকাস এবং গ্যালিলিওর পরে অটোহান্ জন্মে থাকেন; স্থবির পৃথিবী জঙ্গম হন, নিশ্চল মানুষ হন পরিব্রাজক, অকাট্য পরমাণুর বিচূর্ণিত দেহ থেকে সৃষ্টি হয় বিশ্বধ্বংসী আণবিকশক্তি। পরীক্ষাগারের সত্যকে মিথ্যায় অবলুণ্ঠিত করার জন্যে রয়েছেন পরীক্ষাগারেরই পরবর্তী অবতারগণ; আমার পক্ষে তা অনধিকার। কিন্তু যে সত্যের ল্যাবরেটরী করোটির দেওয়াল-ঘেরা মস্তিষ্কের বাইরে নেই, নিরোধ দৃষ্টি ছাড়া, অপক্ষপাত চিন্তা ছাড়া নেই যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তার বিচারে যদি দীর্ঘপ্রচলিত বলেই কোন মতবাদকে আভূমি-লুণ্ঠিত কুর্নিশ জানাই, তবে ধিক্ আমাকে। বাঙালীর গৌরব-রবি অস্তমিত—এর মধ্যে প্রমাণিত সত্য কোথায়?

১

পাঠকের সৌভাগ্য আমি ইতিহাসের ছাত্র নই, এবং শিক্ষকও নই। বাংলাদেশের মাপজোকবিহীন থানকাপড়ের মত ইতিহাসটাকে নিজের ধারণার মাপেজোপে ছেঁটেকেটে নিপুণ একটি জামার কুর্তি তৈরি করে তাদের সামনে মেলে ধরতে স্বভাবতঃই তাই ভরসা পাব না। তার বদলে আপনাকেই আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করব, বাঙালীর অধঃপতন কবে থেকে শুরু হল? আপনার যে-কোন উত্তর মেনে নিয়েই আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে; উত্তর যদি আপনার যথার্থ হয়, সৎ যদি হয় আমার সত্যানুসন্ধান, তবে আমার প্রত্যুত্তরও হবে নির্ভুল। আর আপনার উত্তরে যদি ত্রুটি থাকে তবে নিশ্চয় আমার করোটির ল্যাবরেটরী তার স্বয়ংক্রিয় মননযন্ত্র থেকে আপনার উত্তর আপনাকেই দেবে ফিরিয়ে—ঠিক ত্রুটির স্থলটিতে ছোট্ট একটু ঢেঁড়া-চিহ্ন এঁকে।

শ্রদ্ধেয় এক দেশনেতা যেদিন—এইতো সেদিন, বলেছিলেন বাঙালী কেবল কাঁদতে জানে; সেদিন কি তারই অব্যবহিত আগে কি শুরু হয়েছে আমাদের অধঃপাত? বঙ্গদেশের শিরে মানচিত্রকে যেদিন রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের ছুরিকা দিয়ে দু টুকরো করে কেটে ফেলা হল, সেদিন? তারই পরে যে দেশজুড়ে দেখলাম ক্লীব নির্বীর্য মানুষের পাল শুধু শূন্যের মত নিজের ক্রোড়ের মধ্যে বসে বসে আবর্জনায় উদ্দেশুদ্ধির প্রয়াসে ব্রতী; ওরা উদ্বাস্তু শিবিরে শিবিরে ভিক্ষার চাল কাঁড়া নেবে, না, আকাঁড়া নেবে তারই কোন্দলে দিন কাটায়, ওরা শিয়ালদার প্লাটফর্মে, অকস্মাৎ চাষের প্রাঙ্গণে, তারা গ্রামাঞ্চলের আনাচে-কানাচে লুক্কায়িত কুকুরের মত বসে থাকে; ভিক্ষা ছাড়া বৃত্তি জানে না, ভূখা ছাড়া জেহাদ জানে না, মৃত্যু ছাড়া পরিত্রাণ জানে না, কলহ ছাড়া অবসর-বিনোদন জানে না, বিলাপ জানে না সম্মান-প্রসাদের কর্তব্য ছাড়া। আশ্চর্য, দেশবিভাগের আগে এরা কী ছিল? যদি কৃষক ছিল তো রাজস্থানের ঊষর মৃত্তিকা, দণ্ডকারণ্যের কুমারী বনানী, আন্দামানের নারিকেল-কুঞ্জবীথি কেন এদের হাতছানি দেয় নি, কেন জানায় নি এদের দেশজ পৌরুষের প্রতি অমোঘ চ্যালেঞ্জ? যদি ছিল কামার কি কুমোর, ছুতোর কিংবা রাজমিস্ত্রী, তবে আজ মানিকতলার খালের ধারে ধারে, ভোরবেলাকার এসপ্ল্যানেড-কলেজ স্ট্রীট-বড়বাজারের ফুটপাথে কেন দেখি না এদের উত্তরপ্রদেশ কি বিহার, উৎকল কি পাঞ্জাবের দূর দূরান্ত থেকে আগত কারিগরদের পরিশ্রমী পংক্তিতে আপন দক্ষতায় প্রতিষ্ঠাবান্? রাজস্থানবাসী বণিকের স্বজনপ্রীতিতে অক্ষম ঈর্ষায় জর্জর হয়ে যখন বাঙালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখি তখন কেন চোখে পড়ে না যে গত তের বছর কাল কলকাতার সৌখীন অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের যে কটি মণিহারী দোকান নিয়ন-আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার প্রত্যেকটি মিস্ত্রী কি পশ্চারী পশ্চিমাগত উদ্বাস্তুর—বাঙালীর নয়। স্বজনপ্রীতিতে এর ব্যাখ্যা মেলে না; স্বজনবিদ্বেষেও না।

হায় সন্দিগ্ধ প্রাবন্ধিক, এর পরেও কি তোমার চোখে ছুঁচ ফুটিয়ে দেখাতে হবে যে বাঙালী অধঃপাতিত জাতি?

কিছু বোঝে না, মাথার তালুতে মোট বইবে সে কী করে? বরঞ্চ হাতের তালু চিত করে সে মোটর-বাসের জানলায় জানলায় প্রেতমূর্তির মত ভিক্ষে করে বেড়াবে। আসলে ভিক্ষা আর অপহরণ দুটোর মধ্যে মৌল পার্থক্য তো যৎসামান্য: এরা আগে অপহরণরূপ ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবিকানির্বাহ করত, এখন ভিক্ষারূপ অপহরণবৃত্তি ছাড়া আর সম্বল নেই। যেমন, সরকারী ঋণের অর্থ কিংবা বেসরকারী দানের কথাই ধরুন।

তা হলে যে সংক্রান্তিকে আপনি বাঙালীর অধঃপাতের মুহূর্ত বলেছেন, তখন যদি বা এই মহামারীর গুটিকা দেখা দিয়ে থাকে তবে তার মধ্যে সংক্রমণ আরও অনেক আগে—মধ্যবিত্ততার সৃষ্টিমুহূর্তে।

৩

তবে আরও অতীতে ডুব দিই আসুন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যেদিন শ্রমবিমুখ বাঙালীর উদ্দেশে কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন সেই যুগে কি মিলবে বাঙালীর অধঃপাতের সূচনা? কিন্তু শ্রমবিমুখতা তো মধ্যবিত্ততা ব্যাধিরই একটিমাত্র সামান্য লক্ষণ, সম্ভবতঃ সর্বপ্রধান লক্ষণ। যে উৎপাদন করে, কৃষিজাত শস্য হোক, কৃষ্টিজাত মনস্বিতা হোক, বাণিজ্যজাত সমৃদ্ধি হোক অথবা শ্রমজাত পণ্য হোক, যে উৎপাদন করে তাকে তো শ্রমবিমুখ হলে চলে না। যে শ্রমবিমুখ, সে উৎপাদন করে না; সে মধ্যবিত্ত। ডাক্তার মধ্যবিত্ত নয় যদি না সে জীবনবীমার দালালের উপদালালে পর্যবসিত হয়। উকিল মধ্যবিত্ত, সে মধ্যস্বত্বভোগী তালুকদার-জোতদারের কিংবা উচ্চস্বত্বভোগী জমিদারের মধ্যবিত্ততার মুখাপেক্ষী।

মধ্যবিত্ত সৃষ্টির অশুভ লগ্ন থেকে আরও উজানে যেতে হবে তা হলে বাঙালীর অধঃপতন কবে শুরু তারই সন্ধানে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পেরিয়ে আরও অতীতে।

সিরাজদ্দৌল্লার রাজত্বে একবার থেমে দেখা চলতে পারে; শচীনবাবুর নাটকে সিরাজ নয়, মীরজাফরের চাইতে স্বেচ্ছাতন্ত্রী আসল সিরাজদ্দৌল্লার যুগে। সেখন বাঙালীর মত ক্লীব অপদার্থ জাতের বিশ্বে বুঝি আর জুড়ি নেই। রাজধানীর আশেপাশে শ্রেষ্ঠী আর আমলারা শকুনির মত নিষ্ঠুর সর্বনাশক, দূর দূরান্তে ফৌজদার রাজশক্তির বেসরকারী আমলার মত নিরঙ্কুশ। এরই মধ্যে কয়েক কোটি বাঙালী ঝাঁকসুদ্ধ পাখীর মত নিরবধি কালকে রোমন্থনে পরিপাক করছে।

আরও একটু অতীতে লক্ষ্মণসেনের যুগে উঁকি মেরে না দেখাই ছিল ভাল। সে যুগের লক্ষ্মণসেনই তো এ যুগের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন। এদের পূর্বপুরুষ পালিয়ে আর পালিয়ে—পশ্চিম থেকে পূবে, পূব থেকে পশ্চিমে, পালিয়ে চরম মরণে কি লজ্জা, জয় [illegible] ভরসা!

আর কত পশ্চাদপসরণ করব খুঁটি বাঙালীর মত? শেষে কি দেখব আমরা অধঃপতিত নই, আত্মঘাতী জাতি?

৪

অথচ তা বলবার উপায় নেই। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি—এর মত সত্যের অপলাপ তো দুটি নেই। আসলে আমরা অতিমাত্রায় আত্মাভিমানী ও আত্মসচেতন জাতি। বিপদে পড়লে আমরা পিতৃনাম যদি বা কখনও বিস্মৃত হই তবু ভুলতে পারি না ইতিহাসের বা উপকথার আনাচে-কানাচে আমাদের গৌরবকাহিনীর যা কিছু ছিটেফোঁটা ছড়িয়ে আছে। চতুর্দশ পুরুষ আগে আমার যে প্রবর-পিতা একটু ঘি খেয়েছিলেন, তার বিমল সুগন্ধ আমরা এখনও পাই আমাদের আঙুলে, এখনও তাই লেহন করতে ভুল হয় না আমাদের। আর সেই সব গৌরব-কাহিনী সগর্ব আবৃত্তি করার সময়ে বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য শুধুমাত্র বঙ্গদেশের অধিবাসীর নামই উচ্চারণ করি তা নয়, সর্বভারতীয় কাউকেই বাদ দিই না। সীতা-সাবিত্রীর নাম একসঙ্গে অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করে আমরা বঙ্গললনার সতীত্বের আদর্শ ঘোষণা করি।

আমার যাহা ছিল সব নিল আপনায়,
হরিল আমাদের আকাশের আলো সে।
সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়,
তাহারি চরণের শরণের লালসে।

যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়,
নিখিলে যত প্রাণ যত গান ঘিরে তায়।
সকল রূপ-হার উপহার চরণে,
যায় গো উদাসিয়া যত হিয়া পায় পায়।
যে জন পড়ে থাকে একা ডাকে মরণে,
সুদূর হতে হাসি আর বাঁশি শোনা যায়।

শবদ নাহি আর, চারিধার প্রাণহীন,
কেবল ধুক্ ধুক্ করে বুক নিশিদিন।
যেন গো লনি এই তারি সেই চরণের,
কেবলি বাজে শুনি, তাই গুণি দুই তিন।
কুড়ায়ে সব শেষ অবশেষ স্মরণের,
বসিয়া একজন আনমন উদাসীন।

৯ই ভাদ্র ১৮৮৯

একটি কবিতাংশ (ভাব ও ভাষাসহ) ব্যবহার করিয়া লওয়া দুই বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ কেন কবিতাদ্বয়ের জন্ম দিলেন এ রহস্য আজ আর সন্ধান করিয়া ভেদ করা যাইবে না। আমার মনে হয় "ক্ষণিক মিলনে"র সন-তারিখে ভুল আছে। "বিরহানন্দ" ও "ক্ষণিক মিলন" একই কালের রচনা। স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন প্রভৃতি রবীন্দ্র-গবেষকগণ 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত "বিফল মিলন" কবিতাটি লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহারা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'মানসী'র কবিতাগুলির নাম ও তারিখই ব্যবহার করিয়াছেন। ফলে "বিরহানন্দ" যে "বিফল মিলনে"ই গুপ্ত হইয়া আছে সে সংবাদ গুপ্তই থাকিয়া গিয়াছে।

প্রভাতকুমার 'মানসী'র অনেক স্তর ভাগ করিয়াছেন—পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে বেদনাশ্রিত প্রথম স্তর, দার্জিলিঙে দ্বিতীয় স্তর, গাজিপুরে তৃতীয় স্তর। "বিফল মিলন" প্রথম স্তরের অন্তর্গত এবং এই স্তরের কবিতার বেদনার কথা কবি স্বয়ং "শান্তিনিকেতনে 'মানসী' অধ্যাপনাকালে কথিত 'মানসী' কাব্যপাঠের ভূমিকা"য় ('প্রবাসী', ১৩৪৭ আশ্বিন, পৃ. ৭৬৮-৬৮) এইভাবে বলিয়াছেন :

" 'মানসী'র প্রথম পাঁচ-ছয়টি কবিতা বেদনার কবিতা। এই কাব্য দুঃখের কথায় শুরু হ'ল কেন, এটি একটি তর্কের বিষয়। মানুষ তার রসসৃষ্টিতে, রচনাতে বড় স্থান দিয়েছে দুঃখকে, বেদনাকে। অ্যারিষ্টটল থেকে আরম্ভ ক'রে পৃথিবীর যত আলংকারিক তার কারণ নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন অনেক প্রকারে। এ বিষয়ে আমার নিজের একটি মত আছে। আমরা নিজেকে অনুভব করতে চাই। নিখিল বিশ্ব যখন আমাকে স্পর্শ করে, তখন আমরা আপনাকে অনুভব করতে পাই, সুন্দরকে যখন দেখি তখন নিজেকে উপলব্ধি করি। এইরূপে আপনাকে যখন পাই, তখন আমরা খুশি হই।...

দুঃখের মধ্যে আমরা গভীরভাবে আপনাকে অনুভব করি। কিন্তু সংসারে বাস্তবক্ষেত্রে দুঃখের সঙ্গে ক্ষতি জড়িত থাকে। সাহিত্যে সেই নিত্য সম্বন্ধ নেই। যেমন—কিং লীয়ারে রাজার মানসিক বিকৃতি, রামায়ণে সীতার কাহিনী। সেই কঠিন দুঃখের মধ্যে আপনাকে দেখতে পাই, কিন্তু ক্ষতির কোনো কারণ থাকে না, সম্পূর্ণ নিষ্কাম দুঃখ।...

মানসীর প্রথম দিকের কবিতাগুলিকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা উচিত বলা কঠিন। তাতে কবির হৃদয়ের আবেগ রয়েছে; কিন্তু কবিতার শেষ কথা তো তা নয়। হৃদয়ের আবেগ কবিতার উপকরণ বা মসলার মতন, সেই সব উপকরণ থেকে সৃষ্টি হয় সৌন্দর্যের, সেই সৌন্দর্যসৃষ্টি সুচারুরূপে সম্পন্ন করলে কবি তখন ভুলে যান দুঃখ দিকের কথা। তখন সেই আবেগকে উপলক্ষ্য ক'রে মনের বেদনার ভিত্তিভূমিতে সৃষ্টি করতে চান শিল্পকুশলতার সুন্দরকে। অর্থাৎ তিনি শিল্পরচনা করেন যাতে তাঁর সুখদুঃখ, সাময়িক আবিলতামুক্ত হয়ে চিরন্তনের বুকে স্থান পায় নিরাসক্ত। এই শিল্পসৃষ্টিকে গৌণভাবে বলতে পারা যায় অটোবায়োগ্রাফি, কিন্তু মুখ্যভাবে তা হচ্ছে আপনার রচনাকে আপনার সৃষ্টিকে চিরস্থায়ী করবার আগ্রহ।

মানসীর গোড়ার কবিতা হচ্ছে সেই ভাবের আলপনা। ছন্দের দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়। তার আগে বাংলা কবিতায় এ-সব ছন্দের আমদানি হয় নি। বাংলা কাব্য পয়ার আর ত্রিপদীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে যুক্ত অক্ষরকে কবিতার মধ্যে আহ্বান ক'রে, তার ধ্বনির পূর্ণ মূল্য দেওয়া হ'ল।"

এই ভূমিকার পরিশিষ্টে কবি যে কথা বলিয়াছেন তাহাই 'মানসী'র গোড়ার কবিতাগুলি সম্পর্কে সর্বাধিক স্মরণীয় :

"কাব্যে যে বেদনা ফুটে ওঠে সে-বেদনা ব্যক্তিগত নয়।...মানসীর প্রথম দিকের অনেক কবিতায় মনে হবে আত্মজীবনের প্রেরণা আছে, সে-কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়।"

সত্য যে নয় তাহার প্রমাণ কবিতাগুলিতেই আছে। কবি পার্ক স্ট্রীটের বাসায় আছেন। অপরাহ্নে কাল-

জন্য তৈরি হয়েছিল। বেলা তখন বোধ করি দুটো। চারিদিকে রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। আর ঠিক সেই সময়েই একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে পাঁচু মিস্ত্রি নিজেই তার বাড়িতে এসে হাজির।

পান খেয়ে কালো কালো ঠোঁট দুটি লাল করে নিয়ে একটা সিগারেট টানতে টানতে পাঁচু এসেই ধপ করে বসে পড়ল ঘরের চৌকাঠের ওপর।

বাসুদেব বলল, তোমারই কাছে যাচ্ছিলাম।

আমার সৌভাগ্য। তা যাওয়াটা হল না কেন?

এই যে, তুমি এসে গেলে!

পাঁচু বলল, হাঁ, এলাম। এইদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম বাসুদেবকে একবার দেখে যাই। তোমার আর ছেলেমেয়ে আছে?

বাসুদেব বলল, না।—বলেই থেমে গেলল।

পাঁচুর কিন্তু নজর এড়াল না। বেলা দুটোর সময় মদ সে খেয়েছে প্রচুর। ভুর ভুর করে দিশী মদের গন্ধ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে। কিন্তু কথা শুনে বোঝবার উপায় নেই। বলল, থামলি যে?

তুমি কি আজকাল বিয়ের ঘটকালিই করছ নাকি?

পাঁচু বলল, হাঁ, করছি। এতে লাভ আছে।

বাসুদেব বলল, সেটা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

পাঁচু একটু চাঙ্গা হয়ে ভাল করে চেপে বসল। পোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আবার একটা নতুন সিগারেট ধরাল। জিজ্ঞাসা করল, কি রকম? হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিস্ কেন বলবি বল্?

বাসুদেব বলল, ছেলের বিয়ে দিলাম। কালো বউ ঘরে আনলাম শুধু সোনার গয়নার লোভে। সেই গয়না দিয়ে মেয়ে পার করলাম। তুমি তো সবই জান। কিন্তু গয়নাগুলো সব গিল্টি। মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

জামাই এসে মেয়েকে আবার যে নিয়ে গেছে সে কথাটা সে চেপে গেল। বলল না।

পাঁচু জিজ্ঞাসা করল, কে তাড়িয়ে দিয়েছে? জামাই?

বাসুদেব বলল, না। জামাইয়ের মা।

পাঁচু অবলীলাক্রমে বলে বসল, আবার নিয়ে যাবে। তোমার মেয়েকে আমি দেখেছি। তোমার জামাইকেও আমি চিনি। পরিতোষ ঠিক কুকুরের মত ঘুরে বেড়াবে তোমার মেয়ের পিছু পিছু। বাগাতে যদি পার তো বুড়ো বয়েসে নিজের সংসারের ভাবনাটাও আর ভাবতে হবে না। যাক, ওর জন্যে ভাবি না। এবার ছেলে-বউয়ের খবর বল। বউটাকে তুমিও তাড়িয়ে দিয়েছ নাকি?

বাসুদেব বলল, সেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু আমার ছেলে অনন্ত ছাড়ল না মেয়েটাকে। মেয়েটাও গেল না।

পাঁচু বলল, যাবে না জানি।

বাসুদেব বলল, তুমি জান?

হ্যাঁ রে বাবা জানি, জানি। আমাদের ছেলেমেয়েরা সব কুমার বাচ্চা। মন-টনের ধার ধারে না। এক দেহ হলেই হল। আর সেই জন্যেই এই বিশ্ব নেমন্ত্রণ হয়েছিল।

সোনার গয়না বলে তাই গিল্টির গয়না দেবে?

পাঁচু বলল, তোমার ছেলেটি যে গিল্টি বাসুদেব সেদিকে একবার তাকাও।

বল কি পাঁচু? আমার ছেলে রাজপুত্রের মত দেখতে।

ওই দেখতেই শুধু—পাঁচু বলল, ঘড়ির দোকানে মাইনে পায় তো মাসে চল্লিশটি টাকা। গিল্টি নয় তো কী? ও যে কাপড় পেয়েছে, জামা পেয়েছে, জুতো পেয়েছে, আংটি পেয়েছে, ঘড়ি পেয়েছে, তার ওপর এক হাজার টাকা পেয়েছে—এইটেই যথেষ্ট।

বাসুদেব বলল, সেই হাজার টাকা থেকে তো তুমি নিয়েছ দুশো টাকা।

আর ওদের কাছ থেকে নিয়েছি পাঁচশো টাকা।

বাসুদেব সে কথা জানত না। কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল। বলল, তা হলে তুমি জানতে গয়নাগুলো সব গিল্টির?

অম্লান বদনে পাঁচু বলে বসল, নিশ্চয়ই জানতাম।

বাসুদেব রেগে উঠল।

এ ষড়যন্ত্র তা হলে তুমিই করেছিলে?

আমি ষড়যন্ত্র করি নি বাসু, ষড়যন্ত্র যদি কেউ করে থাকে তো করেছে ভগবান।

এই বলে বাসুদেবের পিঠ চাপড়ে পাঁচু বলল, রাগ করিস নি। তুই সারাজীবন চুরি জোচ্চুরি করলি, মানুষকে ঠকালি, বউকে ঠ্যাঙালি, তারপর বুড়ো বয়সে ভেবেছিলি, ছেলের বউয়ের গয়না বেচে বেচে তোফা আরামে বসে বসে খাবি—সেইটি আর হতে দিলে না। দেখ্, আজকাল যে লোকটা ভগবানগিরি করছে, তার হাতটা তেমন নরাজ নয়। একটু টিপে টিপে পয়সাকড়ি ছাড়ছে আমাদের মতন চোর-জোচ্চোরদের হাতে।

পাঁচু আবার একটা সিগারেট ধরাল। বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে বাসু, ভাবিস নি। এবার চল্ একবার কাশী যাই দুজনে। একটু পুণ্যি করে আসি।

এই বলে মনের আনন্দে জোরে সিগারেটটা টেনে টেনে পাঁচু খুব ধোঁয়া বের করতে লাগল।

অনুভূতির প্রকাশও স্বচ্ছ। কিন্তু যে অনুভূতির উৎস মানুষের ভাবনিভৃত অন্তর্লোক সেই অনুভূতির প্রকাশও অস্পষ্ট—রহস্যময়। পাশ্চাত্ত্য শিল্পী-মনীষী জোশুয়া রেনল্ডস্ সেজন্য অস্পষ্টতাকে বলেছেন একপ্রকার মহৎ ভাবের অভিব্যক্তি (Obscurity is one sort of the sublime)। যে সৌন্দর্য স্বরূপে প্রকাশিত সেই সৌন্দর্যের ভিতর মানুষের দৃষ্টি স্বচ্ছন্দ বিহারের অবকাশ পায়, কিন্তু কল্পনা অবাধে পাখা বিস্তার করতে পারে না। অস্পষ্ট সৌন্দর্যের ভিতরই মানুষের কল্পনা-বিকাশের অবকাশ আছে। সেজন্য আধুনিক সৌন্দর্যতাত্ত্বিকমাত্রই স্বীকার করেন রূপক এবং সাংকেতিক শিল্পেই শিল্পের চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে।

জীবন-শিল্পী টলস্টয়ের মতে শ্রেষ্ঠ শিল্পের অন্যতম পরিচয় হল তার নৈতিক আবেদনে। যে শিল্পের বিষয়বস্তু প্রয়োজনীয় এবং আবেদন সর্বলোকাশ্রয়ী সেই শিল্প নীতিনির্ভর হতে বাধ্য। কিন্তু কলাকৈবল্যবাদীরা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন তুলবেন, সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন তুলে ব্যাপারটিকে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে, শিল্প তো নীতিশাস্ত্রের কোনো নয় যে তা নীতিমূলক হতে বাধ্য। শিল্পের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি, এবং এই রস সৌন্দর্যনির্ভর, অতএব যে শিল্পকর্মে সৌন্দর্যের নিখুঁত প্রকাশ হয় সেই শিল্পই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কথা ওঠে, যে শিল্পের আবেদন দুর্নীতিমূলক সেই শিল্পকে সুন্দর সৃষ্টিকর্ম বলা চলে কিনা? আমাদের দেশের শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী মনীষী। সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—যা 'aesthetically beautiful' তাই সুন্দর। আধুনিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী রবীন্দ্রনাথও আর্টের 'অহেতুকী' প্রেরণাকে স্বীকার করে নিয়েও শ্রেষ্ঠ শিল্পের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে নীতিবোধের প্রেরণাকেও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। রবীন্দ্রনাথের মতে দুর্নীতির আবেদন চিত্তের উত্তেজনায় এবং সুনীতির আবেদন চিত্তের প্রশান্তিতে। তিনি বলেন, 'উত্তেজনাকে আনন্দ ও বিকৃতিকে সৌন্দর্য বলিয়া ভুল করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক', কিন্তু 'সৌন্দর্যবোধকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে চিত্তের শান্তি চাই।' (সাহিত্য, পৃ. ২৪)

শিল্পের উৎস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবগম্ভীর কথাটি আমাদের আধুনিক শিল্পীদের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

শিল্পসৃষ্টির উৎস সম্পর্কে উক্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ শিল্পকর্ম অসম্পূর্ণতার লক্ষণাক্রান্ত সে বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। প্রবীণ শিল্পী টলস্টয় একদেশে শিল্পসৃষ্টির শ্রেণীবিভাগ করেছেন এভাবে:

(ক) যে শিল্পকর্মে শুধু বিষয়বস্তুরই প্রাধান্য,

(খ) শুধুমাত্র আঙ্গিক-সৌন্দর্যে যে শিল্প স্বতন্ত্র

(গ) যে শিল্প শুধুমাত্র অকৃত্রিম অনুভূতির প্রকাশ

শিল্পসৃষ্টির প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তরুণ শিল্পীদের শিল্পপ্রয়াসে হয়তো অকৃত্রিমতা আছে কিন্তু তাঁদের বিষয়বস্তুতে গুরুত্বের অভাব, কিংবা তাতে আঙ্গিক সৌন্দর্যের অভাব। অপর পক্ষে প্রাচীন শিল্পীদের শিল্পকর্ম বিষয়গৌরবে গৌরবান্বিত হলেও আঙ্গিক-সৌন্দর্যের দীনতায় ম্লান। আবার মৌলিক প্রতিভাহীন শিল্পীর রচনায় বিষয়গৌরব এবং অকৃত্রিমতার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে সাধারণতঃ আঙ্গিকসজ্জার চমকপ্রদ উজ্জ্বল্য।

শিল্পসৃষ্টির চরমতম উৎকর্ষ সম্পর্কে শেষ কথা এখনও উচ্চারিত হয় নি, কোনদিন হবে কিনা সন্দেহ আছে। তবে বিভিন্ন যুগের শিল্পরচনার ধারার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এক যুগে শিল্পসৃষ্টি এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যে অবলম্বন করে বিকাশলাভ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাচীন যুগের শিল্পরচনায় বিষয়বস্তুর মূল্য স্বীকৃত হত বেশী, পরবর্তীকালের শিল্পকর্মে স্পষ্টতঃ যে আঙ্গিকগত দাবি বড় প্রবল হয়ে উঠেছিল তা শিল্পসৃষ্টির প্রথম যুগে অনুপস্থিত। অন্যযুগে দেখা যায় শিল্পকর্মে সৌন্দর্যসৃষ্টির দাবি চরম প্রবল হয়ে, অথচ যে বিষয়গৌরব বা শিল্পীমনের অকৃত্রিমতা পূর্বযুগে শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষের লক্ষণ বলে স্বীকৃত হত তার মূল্য গেছে অনেক কমে। আবার বর্তমান যুগে দেখা যাচ্ছে, শিল্পের দাবি কেন্দ্রীভূত হয়েছে অকৃত্রিমতা ও বাস্তবধর্মিতার উপর। অথচ পূর্বযুগের শিল্পোৎকর্ষের মান হিসাবে যে সৌন্দর্য, বিশেষতঃ বিষয়গৌরবের যে দাবি মুখ্যতঃ স্বীকৃত হত—সেই মানের যথেষ্ট অবনতি দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালের শিল্পকর্মে বিষয়গৌরব স্বীকৃত হলেও সেই শিল্প ক্রমশঃ অস্পষ্ট, সঙ্কেতধর্মী এবং ভঙ্গীপ্রধান হয়ে উঠছে। এ ছাড়া এ যুগের বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদীদের মতে শিল্প সেই পরিমাণে সার্থক যে পরিমাণে তা সমাজের প্রয়োজনের দাবি মেটাতে সমর্থ।

অনাগত ভবিষ্যতে সমাজচিন্তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোৎকর্ষের মান সম্পর্কে মানুষের ধারণা যে আরও পরিবর্তিত হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

উইলিয়ম হিকি (৮)

১৭৮৩ সালের এপ্রিল মাসে বেঞ্জামিন মূর (Benjamin Moor) নামে আমার এক পুরোনো বন্ধু বিলেত থেকে বাংলাদেশে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পিতা লন্ডন শহরের একজন নামী ব্যবসায়ী এবং 'ব্যাঙ্ক অফ ইংলন্ডে'র অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। লন্ডনে তিনি দীর্ঘকাল বিলাসিতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন এবং অর্থের অপব্যয়ও করেছেন যথেষ্ট। তা ছাড়া, নানারকমের ফাটকাবাজিতেও অনেক টাকা লোকসান দিয়েছেন। অবশেষে দেনার দায়ে পৈতৃক সম্পত্তির প্রায় অধিকাংশই তিনি পাওনাদারদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। বন্ধুবান্ধবরা তখন তাঁকে পরামর্শ দেন, ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে ভারতযাত্রা করতে। বাংলার সেনাবাহিনীতে একজন ক্যাডেটের চাকরি নিয়ে তিনি এদেশে আসেন। উদ্দেশ্য যে চাকরি করা নয় তা বোঝাই যায়। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষপুটে কোনরকমে একবার এদেশে পৌঁছে, স্বাধীনভাবে কিছু করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর ইংলন্ডেই আলাপ হয়, এবং বন্ধুত্বও গভীর হয় দুজনের মধ্যে।

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক

কলকাতা শহরে পৌঁছবার অল্পদিনের মধ্যেই বেঞ্জামিন ক্যাডেটের চাকরি ছেড়ে দেন এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্কে অংশীদাররূপে যোগদান করেন। তখন ব্যাঙ্কের আরও দুজন অংশীদার ছিলেন, জেকব রাইডার ও জেকব মৌকাজ, দুজনেই আমার বন্ধু। ব্যাঙ্কের ব্যবসা খুবই জমে উঠেছিল এবং কাজও চলছিল বেশ। সারা এশিয়া মহাদেশের ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত এলাকায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের নোট চালু হয়েছিল বেশ, নগদ টাকার মতনই তার লেনদেন হত সর্বত্র। এত বেশী পরিমাণ টাকার নোট চলত ব্যাঙ্কের, যা তখনকার দিনে সত্যিই কল্পনা করা যায় না। কিন্তু মানুষ সব সময় স্থিরবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজ করে না, এমন কি নিজের মঙ্গল ও স্বার্থ কোথায় তাও বোঝে না। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অংশীদারদেরও তাই হল। তাঁরা দুর্বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে, ব্যাঙ্কের উন্নতির দিকে মনোযোগ না দিয়ে, নানারকমের বাণিজ্যের ও অর্থ উপার্জনের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। কতকগুলি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেতে, বাজারে তাঁদের সুনাম ক্ষুণ্ণ হল, লোকের আস্থা টলে গেল তাঁদের উপর। লোকের বিশ্বাস হারালে ব্যাঙ্কের ব্যবসা চালানো যায় না। কিছুদিনের মধ্যেই তাই তাঁদের ব্যাঙ্কের দ্রুত অবনতি শুরু হল, এবং অবশেষে প্রতিষ্ঠানটি উঠে গেল।

কর্নওয়ালিস বাংলাদেশে ছিলেন, ততদিন তিনি কেবল সরকারী ব্যাপারে ছাড়া কোন ব্যক্তিগত বা সামাজিক ব্যাপারে কখনও 'সিপাহী'-ভৃত্য পরিবেষ্টিত হয়ে চলাফেরা করতেন না। যে-কোন সাধারণ সঙ্গতিসম্পন্ন ভদ্রলোকের মত বিনা আড়ম্বরে একাই তিনি চলাফেরা করতে ভালবাসতেন।

বার্কের বাগানবাড়িতে পার্টি-ডিনারের অভিজ্ঞতার পর কর্নওয়ালিস মনস্থ করেন, বাইরে কারও বাড়িতে আর কোনদিন নিমন্ত্রণ খাবেন না। প্রত্যেকদিন তাঁর গৃহেই তিনি প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন নিমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে ডিনার খেতেন। কেবল প্রথানুযায়ী বছরে একদিন চীফ-জাস্টিসের বাড়ি, অথবা কোন সরকারী উৎসবে তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেন। এ ছাড়া বাড়ির বাইরে কখনও কোন পার্টি-ডিনারে যোগ দিতেন না। তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গেই আমার অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়েছিল বলে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন আমিও তাঁর বাড়ি নিমন্ত্রণ পেতে যেতাম। নির্দিষ্ট সময়ে ডাইনিংটেবিলে বসা হত, গ্রীষ্মকালে বেলা চারটেয়, শীতকালে বেলা তিনটের সময়। গভর্নর-জেনারেল প্রায় দু ঘণ্টা সময় ডাইনিংটেবিলে কাটাতেন, এবং নিজে পানভোজন উপভোগ করতেন। টেবিলের উপর মদের বোতল হাতে হাতে ঘুরবে, এই ছিল তাঁর নির্দেশ। কেউ যদি বোতল 'pass' করতে দেরি করতেন, অথবা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ভুলে যেতেন, তা হলে কর্নওয়ালিস ডাইনিংটেবিলে বসেই ঠাট্টা করে বেশ দু-কথা তাঁকে শুনিয়ে দিতেন। এইভাবে দু ঘণ্টা ধরে প্রত্যহ নিমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে তাঁর গৃহে ডিনার খাওয়া চলত।

তখনকার রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক বছর ক্রীসমাসের দিন গভর্নর-জেনারেল, তাঁর কৌন্সিলের সদস্যরা এবং কলকাতা শহরের গণ্যমান্য সাহেবসুবোরা সকলে কোর্ট-হাউসে একত্রে বসে ডিনার খেতেন। রাতে মহিলারা 'সাপার' খেতেন এবং শেষে 'বলনাচ' হত। সে-বছরেও ২৫ ডিসেম্বর ভোজের দিন ঠিক হল। লর্ড কর্নওয়ালিস এই পদ্ধতিতে ক্রীসমাস উৎসব পালনের বিরোধী ছিলেন। কারণ তাঁর মতে এইভাবে নাচগানের মধ্যে বড়দিন পালন করলে তার কোন পবিত্রতা বা মর্যাদা রক্ষা করা হয় না। কলকাতা শহরে ইংরেজরা যে ক্রীসমাস উৎসবকে এই কোলাহলের স্তরে নামিয়ে এনেছেন এ দৃশ্য দেখে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। তারপর থেকে, প্রধানতঃ কর্নওয়ালিসের জন্যই, ক্রীসমাস উৎসবের ধারা বদলে যায় কলকাতায়।

বাণিজ্য-বোর্ডের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

১৭৮৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে কর্নওয়ালিস একটি অত্যন্ত কঠোর ও অপ্রিয় কর্তব্য পালনে ব্যস্ত হন। কোম্পানির সিনিয়র অফিসারদের বিরুদ্ধে এদেশের ডাইরেক্টররা গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তৃত তদন্ত করার আদেশ দিয়েছেন। অভিযোগ হল, তাঁরা পণ্যদ্রব্যের কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে নিজেরা ঘুষ নিতেন, অথবা অনেক সময় বেনামীতে নিজেরাই কন্ট্রাক্ট নিয়ে কোম্পানিকে ন্যায্য মুনাফা থেকে বঞ্চিত করেছেন।

কোম্পানির বাণিজ্য-ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করতেন 'বোর্ড অব ট্রেড' (Board of Trade)। একজন প্রেসিডেন্ট ও এগারজন সদস্য নিয়ে এই বাণিজ্য-বোর্ড গঠিত হয়। কোম্পানির সিনিয়র কর্মচারীরা অধিক পারিতোষিকের লোভে বোর্ডের সদস্যপদ লাভ করতেন। তাতে যে তাঁরা খুব ধনী বা কৃতার্থ হতেন তা নয়, কারণ পারিতোষিক হলে তাঁদের কেবল সম্মান-মর্যাদাই বাড়ত, অধিক অর্থপ্রাপ্তি ঘটত না। বোর্ডের সদস্যদের মাসিক বেতন ছিল তখন ১১০০ সিক্কা টাকা। প্রত্যেকে প্রায় তার অনেক বেশী টাকা বাইরের ব্যবসা-বাণিজ্যাদি থেকে রোজগার করতেন। অতএব বোর্ডের সদস্য হবার পর তাঁরা সকলেই এই আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে নেন। ব্যবস্থাটা এইরকম: তাঁরা যাদের পণ্যদ্রব্যের কন্ট্রাক্ট পাইয়ে দেবেন, তাদের কাছ থেকে কমিশন নেবেন, অথবা নিজেরাই গোপনে বেনামীতে কন্ট্রাক্ট নিয়ে মুনাফাটা আত্মসাৎ করবেন। এ কাজ

আগামীর
প্রস্তুতি

বিনামূল্যে!
লেডিস্ রুমাল
হিমালয়
বুকে স্নো'র
বিশেষ প্যাকেটে
HIMALAYA
BOUQUET
SNOW
FREE
HANDKERCHIEF

অলক ঘোষ দ্বিতীয় ছেলে। ছেলেবেলা থেকেই আলো নিয়ে খেলা করে। বাগের সময় এমন করে ব্যাটারি দিয়ে বাল্‌ব লাগাত যে রঙের চাকা ঘোরার সঙ্গে চরকির মত আলো ঘুরত। উঁচুতে দুটো কাচের ওপর হিজিবিজি আঁকা ছবি লাগিয়ে সিনেমা দেখাত সমবয়সী বন্ধুদের। স্কুল-জীবন থেকেই শুরু হল তার ইলেকট্রিক বাল্‌ব নিয়ে মাতামাতি করা। আর লাল নীল হলদে সবুজ সেলোফেন কাগজের কারসাজি। স্কুলের অনুষ্ঠানে, বারোয়ারী পুজোর মণ্ডপে, যেখানেই আলোর খেলা দেখাবার একটুকু সুযোগ থাকত, অলক তা কিছুতেই ছাড়ত না। এ ধরনের কাজে বেশী মন দেওয়ার জন্যেই বোধ হয় অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়েও লেখাপড়ায় বিশেষ সুবিধে করতে পারল না অলক। তার ভুল ইউনিভার্সিটির দেওয়ালে মাথা ঠুকে শেষ পর্যন্ত হলো তার কলেজ-জীবন। চেষ্টা করলে ছোটখাটো কোন চাকরি যে সে কিছুতে পেত না তা নয়, কিন্তু যখন দেখল বাড়িতে বাবা মা তার ওপর আশা হারিয়ে বড়ো দাদাকেই মানুষ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন তখন একদিন না বলে-কয়ে খানকয়েক জামা আর এক বাক্স আলোর সরঞ্জাম নিয়ে চলে এসেছিল কলকাতায়। উঠেছিল দূর-সম্পর্কের এক মেসোমশাইয়ের বাড়িতে, কিন্তু সেখানেও টিকতে পারল না বেশীদিন। রোজগার শুরু হতেই ভাড়া নিয়েছিল একটি বাড়ি—মনোহরপুকুর রোডে। দুখানা ঘরের একতলা ছোট্ট ফ্ল্যাট, ভাড়া পঁচাত্তর টাকা। একলা খরচা চালাতে পারবে না বলেই সঙ্গে করে এনেছিল রতনলাল আর রমলাকে। রতনলাল নাচের মাস্টার, রমলা ছবি আঁকে। কোন একটা স্কুলের নাচের শোতে তিনজনে একসঙ্গে কাজ করেছিল, সেইখানেই পরিচয়, ক্রমে বন্ধুত্ব, শেষে সহবাস। আজ সেই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথাই ভাবছে অলক ঘোষ। এখন অবশ্য একলাই সে থাকতে পারে, মাস গেলে মোটামুটি একটা রোজগার তার হয়ই।

সুবোধ চাকলাদার সহজ গলায় বলে, যদি অসুবিধে হয়, অন্য জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত এই অফিসে এসে থাকতে পারেন।

এখানে?

কেন, আপত্তি আছে?

আপত্তি আমার নয়, কিন্তু আপনার অন্য লোকেরা কি বলবে।

কেউ কিছুই বলবে না।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] চল, বাস ধর।

[illegible]

[illegible] একসঙ্গে [illegible]

[illegible]

সুবোধ চাকলা অলকের কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরায়। টানতে টানতেই বলে, এই কফিহাউসেই দুর্বল জেনারেশনকে আবিষ্কার করেছি।

অলক ঘোষ কৌতূহল প্রকাশ করে: সেই নাকি, কোথায়?

কফিহাউসে। মহলানবিশের সঙ্গে আলাপও আছে, কথায় হয়, অথচ ও যে নাটিকার লোক তা তো জানতাম না।

আমার সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দিন? বোধ হয় চেষ্টা করে যদি লেখাপড়ার মধ্যে ঢুকে পড়া যায়।

চাকলা ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, ও কি আর পারবে, তবু একবার কাল আসিস কফিহাউসে, সেইখানেই আলাপ পরিচয় করিয়ে দেব।

সেই ভাল হবে।

দুজনে এগিয়ে গিয়ে মোড়ের মাথায় বাস ধরে।

পরের দিন কফিহাউসে অলক আর অনেক বাকী রইল না যে সাধারণতঃ একটা থেকে ছুটোর মধ্যে অনেক

LIFEBUOY
SOAP

ইতিমধ্যে কফিহাউসের আড্ডা অনেকখানি পাতলা হয়ে এসেছে, কোন টেবিলেই আর ভিড় নেই। দু-একজন ইতস্ততঃ বসে গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। কারুর দিকে না তাকিয়ে সুরজিৎ বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

রুবী থিয়েটারের পোস্টার পড়ার পর থেকে নাট্যকার সুরজিতের নাম শুধু যে বাইরেই ছড়িয়ে পড়ল তা নয়, ঘরের মধ্যেও আলোচনা চলল পুরোদস্তুর। জ্যাঠামশাই আর কাকা—সাহিত্যের সঙ্গে যাদের ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক, যাঁরা পড়েন শুধু খবরের কাগজ, তাঁরাও বিস্ময় প্রকাশ করলেন। জ্যাঠামশাই বললেন, আশ্চর্য, খোকন কী সব লেখেটেখে জানতাম, কিন্তু তার বই যে পাবলিক থিয়েটারে অভিনয় হবার মত—এ কখনও ভাবতে পারি নি। কাকা বললেন, ও একেবারে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, বাংলায় ফেল করার ভয়ে সায়েন্স পড়ে ডাক্তার হলাম, আর সেই বংশের ছেলে হয়ে খোকন কিনা বই লিখছে!

সাহিত্যের সঙ্গে সুরজিতের যোগসূত্র কোথায়—বাড়ির আর কেউ খুঁজে না পেলেও যিনি খোকনের এই নাট্যখ্যাতিতে মোটেই বিস্মিত হন নি, তিনি জ্যাঠাইমা। প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন, খোকন যে বই লিখবে এ আমি খুব জানতাম। ওর বাবারও কি কম শখ ছিল! নানা কাজের চাপে ঠিক ফুটল না।

সুরজিৎ জিজ্ঞেস করে, বাবার লেখা আপনি দেখেছেন?

দেখেছি বইকি, কত দেখেছি। নতুন বিয়ে হয়ে যখন এ বাড়িতে এলাম, তোমার বাবা তখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে কিংবা কলেজেই ঢুকেছে। ও তখন কবিতা লিখত। আমাকে দেখাত। যদিও কোথাও ছাপাটাপা হয় নি, কিন্তু বেশ ভাল লিখত।

লেখা বন্ধ করলেন কেন?

জ্যাঠাইমা চোখ দুটো ছোট করে পুরনো দিনের কথা ভাববার চেষ্টা করেন: বন্ধ একেবারে করে নি—লিখত, তবে খুব কম। কলেজ থেকে বেরিয়েই কাজে ঢুকে গেল, আর সময় পেত না। খুব তাড়াতাড়ি কাজে উন্নতি করলে তো।

সুরজিৎ মুখটা নীচু করে বলে, এক এক সময় মনে হয় বাবার লেখার খাতাগুলো পেলে বেশ হত। পড়তাম, হয়তো অনেকটা ঠিক বুঝতেও পারতাম।

জ্যাঠাইমা চোখের জল মুছলেন: সেদিনের কথা মনে হলে বড় কষ্ট হয়। হঠাৎ খবর এল তোমার বাবা মারা গেছেন, সারা বাড়িটা যেন ঝিমিয়ে পড়ল। কোথায় যে কোন্ জিনিস পড়ে রইল কে আর তখন খবর রেখেছে। আমার মনে হয় ওর লেখার খাতাপত্র সব ওর সঙ্গেই ছিল, সেগুলো আর কেউ আনে নি।

কিন্তু বাড়ির এ মহলের আলোচনায় কখনই যোগ দিতেন না পদ্মাবতী। [illegible] হাঁ বা না সামান্য উত্তর দিয়ে সরে যেতেন। আর এই নির্লিপ্ত ভাব মোটেই ভাল লাগে না মাধবীর। তাই সে অনুযোগ করে, দাদার সঙ্গে থিয়েটার নিয়ে তুমি কোন কথাই বল না। ও কিছু বলতে গেলেও তুমি একটু বাদেই উঠে যাও। কেন বল তো?

পদ্মাবতী স্থির দৃষ্টিতে মাধবীকে একবার দেখে নেন। বলেন, সবাই তো কথা বলছে।

তাতে কি হয়েছে, তোমার শুনতেও ইচ্ছে করে না?

বয়স বাড়ছে তো, উৎসাহও কমছে। এতগুলো বছর ধরে শুধু কর্তব্য পালন করেছি। এখন তোমরা মানুষ হয়েছ, বড় হয়েছ, আর নতুন করে কিছু ভাবতে পারি না।

মাধবী বোঝে মা কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন। সুরজিতের লেখক জীবনের সূচনা দেখে তিনি মনে মনে শঙ্কিতই হয়েছেন, শুধু মুখে তা প্রকাশ করছেন না। মাধবী না বলে পারে না: দাদা ব্যারিস্টার হলেই তুমি বেশী খুশী হতে।

পদ্মাবতী আবার মেয়ের দিকে তাকান। ব্যারিস্টার পদবীর ওপর আমার কোন লোভ নেই। আমি চেয়েছিলাম সুরজিৎ মাথা তুলে দাঁড়াক—মানুষের মত মানুষ হোক। তোমাদের মানুষ করার জন্যে আমি কোনদিন কারুর কাছে হাত পাতি নি। তোমাদের বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন তাই দিয়েই সব খরচা চালিয়েছি। নিজের জন্যে আমি মোটেই ভাবি না,

আসছে। গলাটা ওর মিষ্টি, শিখলে ভাল গান করতে পারত। জ্যাঠাইমার পুজোর ঘর থেকে ঘণ্টা বাজছে। নিশ্চয় কুলপুরোহিতের ইস্কুলে-পড়া পনেরো বছরের ছেলে গায়ে নামাবলী চাপিয়ে পুজো করতে বসেছে। বাইরের ঘরে কারা যেন ঢুকল, মার সঙ্গে কথা বলছে। আত্মীয়-স্বজন কেউ হবে বোধ হয়। মনে মনে বিরক্ত হয় সুরজিৎ, ইচ্ছে না করলেও এখুনি হয়তো উঠে গিয়ে গল্প করতে হবে। কেন যে এরা যখন-তখন আসে।

একটু পরেই মা এসে ঘরে ঢুকলেন: খোকা, তোকে কারা খুঁজছেন বাইরে।

সুরজিৎ বিরক্তি গোপন না করেই জিজ্ঞেস করে, কারা?

আমি চিনি না। নাম বললে চৌধুরী। সঙ্গে একটি মেয়ে এসেছে।

সুরজিৎ উঠতে উঠতে বলে, আমি না আবার কে এল, দেখি।

সুরজিৎ মুখ ধুয়ে গায়ে জামা দিয়ে বাইরের ঘরে এসে দেখে রবী থিয়েটারের ম্যানেজার রমেন চৌধুরী। সুরজিৎকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠে একগাল হেসে বলে, সার্, আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো? কিন্তু থিয়েটারে কিছুতেই আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি না, তাই আজ রোববার দেখে শুভ্রাকে নিয়ে সোজা এখানে চলে এলাম। শুভ্রা মিত্র। ওর কথা তো আগে থেকেই বলে রেখেছি।

মেয়েটি যেন তৈরি হয়েই ছিল, কথা শেষ হওয়ার আগেই হাসি-হাসি মুখ করে এগিয়ে এসে টুপ করে সুরজিৎকে প্রণাম করে। সুরজিৎ ঠিক এজন্যে প্রস্তুত ছিল না। বলে ওঠে, আরে আরে, একি হচ্ছে।

উত্তর দিল রমেন চৌধুরী, আমি খুব বড় মুখ করে ওর মাকে বলে এসেছি, ওকে চান্স কিন্তু আপনাকে দিতেই হবে।

সুরজিৎ বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে: আপনি তো জানেন রমেনবাবু, আমার আর কতটুকু ক্ষমতা, হরীবাবু মালিক, রতীনবাবু পরিচালক, ওঁরা যাকে যাকে দেবেন—

সে কথা আর আমাকে বলতে হবে না সার্। হরীবাবুকে বলে রেখেছি, শুভ্রাকে ওঁর রীতিমত পছন্দ হয়েছে। অনেকক্ষণ বসিয়ে গল্প করলেন। এখন আপনার যদি অমত না হয়, তা হলেই রতীনবাবুকে আমি চেপে ধরব।

অগত্যা সুরজিৎকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে হয়, আপনি আগে অভিনয় করেছেন?

শুভ্রা বড় বড় চোখ তুলে তাকায়: অনেক প্লে করেছি তবে প্রোফেশনাল থিয়েটারে নয়, অ্যামেচারদের সঙ্গে। আপনাদের বোর্ডের মঞ্জরীদি, নীলিদি সবাই আমাকে চেনেন।

এক ধরনের চরিত্র অভিনয় করতে আপনার ভাল লাগে?

শুভ্রা ফিক করে হাসে, এক সারি সুন্দর ঝকঝকে দাঁত বেরিয়ে পড়ে: দুঃখের রোল আমার ভাল আসে, সেন্টিমেন্টাল চরিত্র আর কি। খুব সহজে আমি কাঁদতে পারি। নীলিদির মত চোখে গ্লিসারিন দিতে হয় না।

রমেন চৌধুরী মাঝখান থেকে ওকালতি করে: শুভ্রা ঠিক বলেছে সার্, এই ক'দিন আগে আমাদেরই বোর্ডে 'পথের মেয়ে' নাটকে পারুলের পার্ট করল—সে হাউহাউ করে কি কান্না। অফিসের ছেলেগুলোকে তো পাশে দাঁড়াতে দিল না, এমন কি মঞ্জরীর ললিতাও খুলল না। আমি বলছি সার্, শুভ্রাকে নিলে আপনার নাটকের জু বাড়বে।

শুভ্রা মিত্রের চেহারা ভালই। বড় চোখ, টিকলো মুখ, চুলের সামনের দিকটা কোঁকড়ানো, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মানানসই লম্বা, তবে মনে হয় বয়েসের অনুপাতে শরীরটা ভারী করে ফেলেছে। একটু কমে গেলেই যেন ভাল হয়।

সুরজিতের মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন রমেন চৌধুরী বলে ওঠে, স্টেজে ওকে যা মানায় সার্, তা আপনি নিজে না দেখলে বুঝতে পারবেন না। সেদিন শাজাহানে সাদা পোশাক পরে যখন পিয়ারা সেজে বেরিয়ে এল, দর্শকরা সব বলাবলি করছিল মেয়েটি কে!

কুচোদের দলের একটি ছেলে—নাম কান্তি, প্রথম থেকেই সে সুরজিতের সঙ্গে আলাপ করেছে। ফিসফিস করে সে বলে, আমাদের পার্ট বলানো হবে সেই স্টেজ-রিহার্সালের দিন। প্রথম দু-চার নাইট স্টেজে ঢুকে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব বুঝতে না পেরে রোজই বকুনি খাব বড় অ্যাক্টারদের কাছে।

সুরজিৎ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, তা হলে নাটক নামবে কি করে?

ওই তো মজা। প্রদীপদা হয়তো বলবে, কান্তি এগিয়ে যা। যেই আমি এগোব, রসময়দা সার্ট ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারবে—পেছো বলছি। আমাদের অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত।

প্রদীপবাবুরা কি কোনদিনই পার্ট বলবেন না?

কান্তি কোঁচাটা ঠিক করতে করতে বলে, বলবে হয়তো দু-একদিন যদি কর্তারা ভাল টিফিনের ব্যবস্থা করেন। তা অবশ্য খুব যে সিরিয়াসলি বলবে তা নয়, বেশীর ভাগই হাসি-ঠাট্টা করে সময় কাটাবে।

সুরজিৎ চিন্তিত স্বরে বলে, আগে তো এরকম ছিল না।

তা বলতে পারি না মশাই, তবে বছর দশেক এ লাইনে ঘোরাঘুরি করছি, রিহার্সালের অবস্থা সব জায়গাতেই এইরকম। বড় আর্টিস্টরা সব স্টেজে মারবেন যে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাব আমরা।

প্রদীপ মুখার্জী বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। সুরজিতের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাত নেড়ে কাছে ডাকে। একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় নি, তবে জানি আপনিই নাট্যকার। আমার পার্টটা পেয়েছি, পড়েছি, ভাল লেগেছে। কিন্তু পুরো নাটকটা তো এখনও পড়ি নি, রিহার্সালও দেখি নি, তাই জিজ্ঞেস করছি শেষ পর্যন্ত কি আমার মা মারা যাবেন?

সুরজিৎ ছোট্ট উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

ওঁকে কাশী পাঠিয়ে দিলে পারতেন।

কেন?

দেখতেন, মেয়েরা কি রকম নিত—রোজ লেডিজ ফুল যেত।

কোন উত্তর না দিয়ে সুরজিৎ হাসতে থাকে।

প্রদীপ মুখার্জী সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বেশ নিশ্চিন্ত গলায় বলে, আমার ডায়ালগ কিছু বদলাতে হবে—সে আপনাকে বিরক্ত করব না, আমি নিজেই লিখে নিচ্ছি। আপনার ভাবটা ঠিকই থাকবে, শুধু অভিনয় করার জন্যে একটু সুবিধে করে নেওয়া।

সুরজিৎ ভয় পেয়ে বলে, খুব বেশী বদলাবেন না, বরং আমাকে যদি একবার দেখিয়ে নেন—

হা হা শব্দ করে প্রাণ খুলে হাসে প্রদীপ মুখার্জী: আরে মশাই, আমাকে কোন ভয় নেই, আমি কখনও রামকে শ্যাম বানাই না। দেখবেন ওই রসময়টা কি করে। নিরেট মুখ্যু তো। একবার ভাঁড়ামী করতে শুরু করলে আর কিছুতেই থামবে না। আপনার বইটাকে পুরোপুরি মার খাইয়ে তবে ও ছাড়বে।

ঘরের ভেতর থেকে রতিবাবু ডেকে পাঠালেন বলে প্রদীপ মুখার্জী চলে যেতে যেতে খাদের পর্দায় গলা নামিয়ে বলে যায়, রসময়ের অনেক কীর্তি আপনাকে পরে বলব—ও একটি চীজ।

তখনও সুরজিতের হাতের সিগারেটটা শেষ হয় নি, নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছে অ্যামেচার থিয়েটারের দর্শকরা ইণ্টারভ্যালে বেরিয়ে ভিড় করেছে। এমন সময় পেছন থেকে কে ডাকল, সুরজিৎবাবু—

আর কেউ নয় রসময় ঘোষ। সুরজিৎ মুখ ফেরাতেই ভদ্রলোক চোখ গোল গোল করে হাসেন: কেমন লাগছে প্রফেশ্যনাল থিয়েটার?

সুরজিৎ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে: ভালই।

কেন মিথ্যে কথা বলছেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি থিয়েটারের হালচাল দেখে আপনি রীতিমত হতাশ হয়েছেন। হবারই কথা, যতগুলো ভ্যাগাবণ্ড আর লোফার এসে জুটেছে, মা সরস্বতীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে কি হলেন—না, স্টেজ-আর্টিস্ট।

দিনে
দিনে
দিনে
দিনে
দি...
Rexona
BLENDED WITH CADYL

বিস্মিত সুরজিৎ চোখ তুলে তাকায়।

রসময় জিভ দিয়ে নীচের ঠোঁট চাটে : ওই যে প্রদীপ মুখার্জী—রুবী থিয়েটারের গ্রেট হিরো। একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন না, একখানা সেক্সপীয়রের বই পড়েছে কিংবা বার্নার্ড শ? তা হলেই বিদ্যে বেরিয়ে পড়বে। অত কথা কি, গিরীশচন্দ্রের 'আনন্দ রহ' কি 'মায়াতরু'র নাম শুনেছে ও? জানে, কবে প্রথম বাংলা থিয়েটার শুরু হল? আরে মশাই, এ একটা মুখ্যুর ডিপো, আপনার মত লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক তো কারুর সঙ্গে কথাই বলতে পারবেন না।

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে সুরজিৎ জিজ্ঞেস করে, পার্ট পছন্দ হয়েছে আপনার?

সেই কথাই তো বলতে এলাম। কড়া লিখেছেন মশাই। হাসতে হাসতে লোকের পেটে খিল ধরে যাবে। আমাকে কিছুই করতে হবে না শুধু মাঝে-মধ্যে একটু নুন আর মরিচ ছড়াতে হবে। অল্পবিস্তর হাসির চাটনি। বুঝলেন না?

সুরজিৎ সাহস করে জিজ্ঞেস করে, আমার ডায়ালগগুলো থাকবে তো?

রসময়ের চোখ সন্দেহে ছোট হয়ে আসে : কে আমার নামে লাগিয়েছে শুনি, নিশ্চয় ওই প্রদীপটা। কানের কাছে ফিসফিস করছিল তখনই বুঝেছি। ওকেই একটু নজরে রাখবেন মশাই, পাঁড় মাতাল। কোন্‌দিন যে কি বলবে সীনে তার কোন ঠিক নেই, ভেরি ডেঞ্জারাস্ ম্যান।

এদের কথাবার্তা শুনলে সত্যিই সুরজিতের আশ্চর্য লাগে। পরনিন্দা আর পরচর্চাই এখানে প্রধান আলোচনার বিষয়। অন্যের ভালটা সহজে কেউ দেখতে পায় না। পাঁচজন একত্র হয়ে প্রাণখোলা হাসি হেসে এরা যখন গল্প করে, সুরজিৎ বোঝে সেটা এদের অভিনয়। আসল স্বরূপ ধরা পড়ে সন্ধ্যার অন্তরালে, নির্জন ঘরের আড়ালে একলা যখন কথা বলার সুযোগ পায়। তাদের মধ্যে ফুটে ওঠে মীরজাফরের ছবি, শোনা যায় ইয়াগোর কণ্ঠস্বর, চোখে তাদের কুচক্রী ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টি। প্রদীপ মুখার্জী রসময় ঘোষের মতই অন্য অভিনেতারাও সুরজিৎকে একান্তে ডেকে অন্যদের কাছ থেকে সাবধান হতে বলে, রমেন চৌধুরী কানে কানে উপদেশ দেয়, স্টেজ-ম্যানেজার মুকুলবাবু পুরনো সেট সীনের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে অন্যদের মুণ্ডপাত করে।

এসব দেখে সুরজিতের মনে পড়ে যায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশায়ের কথা, যা হয়তো বইয়ে পড়বার সময় তার অদ্ভুত লেগেছিল। পাবলিক থিয়েটারে প্রবেশেচ্ছু কোন নবীন নাট্যকারকে তিনি বলেছিলেন—কাউকে বিশ্বাস করেছ কি ঠকেছ—থিয়েটার এমনি জায়গা।

এ কথা বলছেন কেন?

বলছি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে।

কিন্তু আপনারা শিল্পী, আপনাদের শিল্পচর্চার জগৎ।

হ্যাঁ, আমরা শিল্পী। তবে কি জানেন, শিল্পচর্চার জগতে অনেক কিছুই পাওয়া যায়, পাওয়া যায় না শুধু শিল্পীমন। ও বস্তুটি এখানে একান্ত দুর্লভ।

এ কথাগুলো যে কতখানি সত্যি তা কদিন মাত্র এই থিয়েটারের আঙিনায় ঢুকে সুরজিৎ জলের মত বুঝতে পেরেছে। যে মন্দিরা গুহ বলতে গেলে একরকম অগ্রণী হয়ে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সে পর্যন্ত সুবিধে পেলেই বাঁকা ভাষায় কথা বলে, শুনলাম, শুভ্রাকে আপনিই পছন্দ করে নিয়েছেন—

সুরজিৎ আপত্তি তোলে : আমি কেন নেব।

মন্দিরা হাসে : বাজারে গুজব শুনলাম, তাই বলছি। শুভ্রা নাকি আজকাল আপনার বাড়িতেও যাচ্ছে।

একদিন গিয়েছিল বটে রমেনবাবুর সঙ্গে।

কি জানি ওর মধ্যে কি গুণ দেখেছেন আপনি—বয়সটা কম, চেহারায় চটক আছে, ওইটুকুই যা। এ পর্যন্ত একটা পার্টও ঠিকমত করতে পারে না।

সে কি, আমি যে শুনলাম—

মন্দিরা গুহর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে : কে বলেছে, ওই রমেন চৌধুরী তো? শুভ্রাদের বাড়িতে কি ওর কম দিনের যাতায়াত!

কথা ঘোরাবার জন্যে সুরজিৎ ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করে, নাটক কিরকম দাঁড়াবে মনে হচ্ছে?

বলা খুব শক্ত।

কেন ?

রতিদার তো মাথা খারাপ, বাসুদেবকে অতবড় একটা পার্ট দিয়েছেন, ও কি আর টানতে পারবে ? তার ওপর আপনার শুভ্রা। ওই দুটো পার্টই না মার খায়।

রিহার্সালে কিন্তু সুরজিতের ভাল লেগেছে এ দুজনের পার্ট, এরা অন্তত: মন দিয়ে অভিনয় করার চেষ্টা করেছে। মঞ্চ-অভিজ্ঞতা বেশীদিনের নয় বলেই বোধ হয় উৎসাহটা এখনও বেশী। তবে মন্দিরার সামনে এ কথা বলার ইচ্ছে হল না সুরজিতের।

মন্দিরা কিন্তু থামে না : ওই বাসুদেব, দেখছেন তো কিছু পারে না, কিন্তু চেহারাটা ভাল। দেখবেন একদিন ওরও নাম হবে। এখন থেকেই ফিল্মে চান্স পাচ্ছে—কদিন বাদেই নায়ক, হাজার হাজার টাকা রোজগার।

মন্দিরা নিজের মনেই কি যেন ভাবে। বোধ হয় মনে পড়ে যায় অতীতের কথা। অন্যমনস্ক স্বরে বলে, ওকে যত দেখি ততই মনে হয় তপনের কথা—আপনাদের তপনকুমার, চিত্রজগতের একচ্ছত্র সম্রাট। একদিন আমার সঙ্গেই থিয়েটার করত। লোকে বলত রাঙামুলো, পার্ট করতে পারত না দেখে সবাই হাসত, কিন্তু মনটা ভাল ছিল। আমি নিজে ওকে শেখাতাম। কতদিন দুপুরবেলা ওই নীচের গ্রীনরুমে বসে বসে অভিনয় শিখিয়েছি, অথচ আজ সে কোথায়, আর আমি কোথায় !

মন্দিরার শেষের কথাগুলো বড় করুণ শোনায়। সুরজিতের সাহিত্যিক মন জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে : ওর সঙ্গে আজকাল দেখা হয় ?

হয়। এত ওপরে উঠে গিয়েও তপন সেই থিয়েটারের দিনগুলো ভোলে নি। আসে, গল্প করে, দুঃখের কথা বলে, সাহায্যও করতে চায়। কিন্তু কি করবে বেচারা, ছবিতে যে আমার চেহারাটা কিছুতেই ভাল আসে না।

কথাগুলো বলে নিজেই জোর করে হাসে। বলে, এসব কথা ভাববার কোন মানে হয় না, আপনিও হয়তো একদিন নাম-করা নাট্যকার হবেন, তখনও আমি এই থিয়েটারেরই মেয়ে।

উত্তর দেবার কিছু ছিল না, সুরজিৎ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। হঠাৎ একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে বলে, আপনি যে বলেছিলেন আমায় নটগুরুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন, তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন।

মন্দিরা এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। গলা পরিষ্কার করে বলে, বাবাকে বলে রেখেছি, উনি আপনাকে নিয়ে যাবেন। বাবা ওদের সঙ্গে থিয়েটার করতেন তো। তাই বাবার সঙ্গে যোগসূত্রটা এখনও আছে। আসুন না একদিন আমাদের বাড়ি।

যাব একদিন।

আগে থেকে কিন্তু আমায় বলে রাখবেন, বাবাকে সামলে রাখতে হবে।

তার মানে ?

পুরনো দিনের লোক, নেশা করলে মাথার ঠিক থাকে না।

এ ধরনের কথা কোন মেয়ের মুখে শুনলে অনেকেই অবাক হয়, সুরজিৎও হল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে মন্দিরা কৌতুক বোধ করে : এখানকার সবকিছুই আপনার নতুন লাগছে, না ? মাঝে মাঝে এমন অবাক হয়ে তাকান, দেখলে মনে হয় একেবারে ছেলেমানুষ, আমার ভারি হাসি পায়।

মন্দিরা খিলখিল করে হাসে।

সুরজিৎ তার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকে, সত্যি আশ্চর্যময়ী এই মন্দিরা গুহ।

টিমেতেতালায় নতুন নাটকের রিহার্সাল চলছিল একরকম ভাবে। তা দেখে সুরজিৎ খুব বেশী উৎসাহিত না হলেও আর সবাই ভাবছিল শেষ পর্যন্ত নাটক ভালই দাঁড়াবে। কিন্তু বিপদ এল কদিন বাদে।

ফোন এল সুরজিতের অফিসে—সে যেন দুপুরের মধ্যে হৃষীবাবুর সঙ্গে দেখা করে, বিশেষ দরকার।

প্রথমটা এ খবরের গুরুত্ব বুঝতে না পারলেও হৃষীবাবুর সঙ্গে দেখা হবার পর সুরজিৎ সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়ল। রুবী থিয়েটারের অফিস-ঘরে চুপচাপ বসে রয়েছেন

হৃষীকেশবাবু। গম্ভীর মুখ, গভীর চিন্তামগ্ন। অস্থির স্বরে বললেন, কদিন থেকেই রতিবাবু বলছিলেন তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, কিন্তু হঠাৎ যে এ রকম বেয়াড়া অসুখে পড়ে যাবেন ভাবতে পারি নি। কাল আসেন নি দেখে আমি নিজেই গিয়েছিলাম। একশো চার-পাঁচ জ্বর, মাথার যন্ত্রণা। সাতদিন বাদে নাটক খুলবে, কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না।

সুরজিৎ আস্তে আস্তে বলে, তা হলে বরং উদ্বোধনের দিন পেছিয়ে দিন।

তা কি করে সম্ভব—পয়লা বৈশাখ একটা শুভদিন! ইতিমধ্যে কাগজে পোস্টারে পয়লা বৈশাখ বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, পেছিয়ে দিলে তো চলবে না।

সুরজিৎ চুপ করে থাকে, কি বলবে ভেবে পায় না।

হৃষীবাবু আবার বলেন, আপনি একবার বরং রতিবাবুর বাড়ি যান, দেখুন এখন কেমন আছেন। আজকের মধ্যে যা হোক একটা ডিসিশান আমাদের নিতে হবে।

সুরজিৎ উঠে পড়ে: এখুনি যাব?

ঘুরে আসুন, আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।

সুরজিতের কাঁধের ওপর হাত রেখে হৃষীকেশবাবু জোর দিয়ে বলেন, মনে রাখবেন পয়লা বৈশাখ আমাদের নাটক খুলতেই হবে—যে রকম করে হোক।

সারা রাস্তাই সুরজিৎ ভাবতে ভাবতে গেছে রুবী থিয়েটার থেকে রতীন ঘোষালের বাড়ি পর্যন্ত, কি করে সে বিপদের মুশকিল-আসান করবে। হাতে আর মাত্র সাতদিন সময়, তার মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠে নতুন নাটক মঞ্চস্থ করা রতিবাবুর পক্ষে অসম্ভব।

বাইরের ঘরেই তক্তাপোশের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল রতীন ঘোষাল। আগের চেয়ে জ্বর একটু কমেছে, কিন্তু শরীরে অস্বস্তি খুব, উঠে বসলেই মাথা ঘোরে। সুরজিৎকে দেখে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন, হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন কাছে বসবার জন্যে।

সুরজিৎ রতিবাবুর বিছানায় গিয়ে বসে, মাথা নীচু করে ওঁর কথা শোনে।

রতীন ঘোষাল বিড়বিড় করে বলেন, বড় বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে ব্রাদার। এ নিশ্চয় জাপানি ফ্লু, বেশ কিছুদিন ভোগাবে।

হৃষীবাবুর কাছে শুনেই আমি আসছি।

উনি সকালে এসেছিলেন, তখন খুব জ্বর। কথাই বলতে পারি নি।

উনি খুব ব্যস্ত হয়েছেন পয়লা বৈশাখ কি করে নাটক নামবে তাই ভেবে।

রতীন ঘোষাল একটু চুপ করে থেকে বলেন, কেন? ভাবনার কি আছে? আমি যেতে না পারলে তুমি পরিচালনা করবে।

সুরজিৎ একেবারে আকাশ থেকে পড়ে: আমি!

কেন, পারবে না? তুমি তো এই নাটকই অফিসে সবাইকে শিখিয়েছ।

তা শিখিয়েছি, কিন্তু এরা সব প্রফেশ্যনাল আর্টিস্ট, আমার কথা কি শুনবে?

নিশ্চয় শুনবে। না শুনলে হৃষীকেশবাবু শোনাবেন। তুমি আমার নাম করে বলো, সবাই রাজী হবে।

তবু যেন সুরজিৎ মনে জোর পায় না। বলে, আমি কি পারব এই সাতদিনের মধ্যে নতুন বই তৈরি করাতে।

রতীন ঘোষাল শুকনো হাসেন: সাতদিন কম সময় নয় সুরজিৎ। অনেক বছর আগের কথা, স্টার থিয়েটারে নামল দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ', অভিনয় করছেন অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, নরীসুন্দরীর মত নাম করা শিল্পী। তারিখটা বোধ হয় ৬ই শ্রাবণ, ১৩১২ সাল। নাটক জমল, কিন্তু দ্বিজুবাবুর সঙ্গে স্টারের মনোমালিন্য হল, সে যে কোন কারণেই হোক। দ্বিজুবাবু এসে মিনার্ভা থিয়েটারকে বললেন, 'রাণা প্রতাপ' এখানেও নামাতে হবে। পাল্লা দিয়ে অভিনয় করে দেখাতে হবে স্টারের চেয়ে মিনার্ভার অভিনয় ভাল। মিনার্ভায় পরিচালনা করলেন স্বয়ং গিরীশচন্দ্র, অভিনয় করলেন দানীবাবু, মুস্তাফী সাহেব, তারাসুন্দরী আরও অনেকে। সে নাটকও নেমেছিল মাত্র সাতদিনের মধ্যে।

সুরজিৎ মাথা নীচু করে বলে, সে অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল, কারণ পরিচালক ছিলেন স্বয়ং গিরীশচন্দ্র।

তাঁরই কথা স্মরণ করে কাজে নেমে যাও। আশীর্বাদ করছি তুমি জয়যুক্ত হবে।

রতীন ঘোষালের গলা কাঁপল। অভিজ্ঞ পরিচালকের আন্তরিক আশীর্বাদ।

সুরজিৎ প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

শুরু হল তার নতুন জীবন। শুধু নাট্যকার নয়—পরিচালক সুরজিৎ সেনগুপ্ত।

[ক্রমশ]

দুই

আমরা অনেকটা সময় পেয়েছি। ওয়েটিং-রুমে স্নান করে চা খেয়েছি। টিকিট নিয়েছি পালটে। ভোর সাড়ে ছটায় নেমে পৌনে এগারোটা পর্যন্ত অবসর। বাইরে বেরিয়ে শহরটাও দেখে নেওয়া যেত, কিন্তু মিনতির অনুরোধে অভিমন্যুর সঙ্গে খেয়ে নিতে হল। মৌ বিকেলে পৌছয়। তার আগে কোন খাবার জায়গা নেই। মিনতি বলল : হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই।

বিরূপাক্ষ বললেন : ঠিক কথা। কাল হয়তো কিছুই জুটবে না।

খেয়েদেয়ে আমরা ছোট লাইনের গাড়িতে চাপলুম।

এদিকের রেলপথের কোন ধারণা আমার ছিল না। গাড়িতে বসে টাইমটেবলের মানচিত্র দেখে মোটামুটি একটু বোঝা গেল। বোম্বে থেকে দিল্লীর দুটো পথ আছে। পশ্চিম-রেলের পথ সুরত বরোদা রতলাম হয়ে দিল্লী গেছে আর মধ্য-রেলের পথ নাসিক খাণ্ডোয়া ভূপাল ঝাঁসি আগ্রা হয়ে দিল্লী পৌছেছে। এই দুটো পথ মিলেছে মথুরায় এসে। এদের যোগাযোগ আছে তিন জায়গায়—জলগাঁও থেকে সুরত, ভূপাল থেকে নাগ্‌দা, আর বিনা থেকে কোটা। উজ্জয়িনী নাগ্‌দার কাছে ভূপালের পথে। বড় লাইনের স্টেশন। খাণ্ডোয়ার ছোট লাইন এসে এখানে মিলেছে, রতলামের দিকেও গেছে একটা ছোট লাইন। অভিমন্যুর বাবা বললেন : আমরা মৌয়ে নামব। ইন্দোরে নামলেও চলে। ইন্দোর থেকে মাণ্ডুর বাস মৌ আর ধার হয়ে যায়।

তারপরে নিশ্চয়ই উজ্জয়িনী!

সেখান থেকে ভূপাল সাঁচি ও ভিল্‌সা। বিদিশার নাম এখন ভিল্‌সা।

আমরা আর কী দেখব?

ঝাঁসি আর খাজুরাহো।

অভিমন্যুর বাবার মেজাজ রাতের মত অপ্রসন্ন নয়। বললেন : মিনতির মিনতিতে এই কেলেঙ্কারি করলাম।

কিসের কেলেঙ্কারি!

ভদ্রলোক বললেন : সোজা পথে ঘরে না ফিরে বাঁকা পথে এই ঘুরপাক খাওয়া কেলেঙ্কারি নয়! তবু রক্ষা যে রেলের পাসে যাচ্ছি। পাস হাতে নিয়ে ইঞ্জিনের মত আগে-পিছে যাবার উপায় নেই। আপনাদের মত টিকিট-কাটা যাত্রী হলে নাগপুর ঘুরে যেতে হত।

আপনি তা হলে রেলের লোক?

খাঁটি রেলের। আপিসে বসে ফাইল ঘাঁটি নে, বিল পাস করি নে। সারাদিন রেল নিয়েই কারবার। পাণ্ডব-বর্জিত দেশে আমি স্টেশন-মাস্টার। তেরজন লোকের ইষ্টিশনে ছোটবাবু। আমার অনুমতি পেলে ট্রেন আসে, ট্রেন যায়। মেল ট্রেন থাকলে তাকেও আমার অনুমতি নিয়ে যাওয়া-আসা করতে হত। আমার নাম বিরূপাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। আসুন, একটা সিগারেট ধরান।

বলে পকেট থেকে তাঁর সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন।

আমি হাত গুটিয়ে বললুম: ধন্যবাদ, আমি সিগারেট খাই নে।

সেকি!

মিনতিও আশ্চর্য হয়েছেন দেখলুম।

কালকের কথা ভাবছেন তো, কাস অন্যমনস্কভাবে নিয়ে ফেলেছিলুম।

বিরূপাক্ষ বললেন: ভাল। এ আমার নামে সিগারেট, কাজে বিড়ির গোত্র। মিনতি আমাকে শৌখিনতা শেখাচ্ছে।

প্যাকেটটা লক্ষ্য করে বললুম: ও তো আজকাল উঁচুতলার জিনিস। বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা আজকাল ওই ব্র্যাণ্ড খাচ্ছেন। সোনার কেস থেকে তাঁরা বার করেন।

বলেন কি!

কিন্তু আমাদের বেসরকারী অফিসে তত চলে না। আমাদের সাহেবরা ব্র্যাণ্ড দেখাবার জন্যে কৌটো হাতে রাখেন।

বিরূপাক্ষ তাঁর সিগারেট ধরালেন। কড়া তামাকের গন্ধ। মিনতি বললেন: যাই বল, এ তোমার বিড়ির চেয়ে ঢের ভাল। বিড়ির গন্ধে আমার বমি আসে।

অভিমন্যু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। হঠাৎ বলে উঠল: আমিও সিগারেট খাব মা!

আমি কৌতুক বোধ করলেও হাসবার সাহস পেলুম না। বিরূপাক্ষর মেজাজকে আমার ভয় ছিল। কিন্তু এখন তাঁকে একেবারে স্বতন্ত্র মানুষ বলে মনে হল। বললেন: বাপকে বেটা হবে।

মিনতি বললেন: আপনার বাড়িতে সবাই ভাববেন তো?

প্রশ্ন শুনে আমি হাসলুম।

বিরূপাক্ষ বললেন: তোমার সঙ্গে পোস্টকার্ড আছে তো, একখানা বার করে দিয়ো।

আমাকে বললেন: খাওয়ায় ফেললেই ভাল হত! মৌয়ে নেমে গাড়িতেই ফেলে দেব।

মিনতি তখুনি তাঁর বাক্স থেকে পোস্টকার্ড বার করবেন ভাবছিলেন। বাধা দিয়ে বললুম: দরকার নেই।

সেকি, বাড়িতে একটা খবর দেবেন না?

বাড়ি থাকলে তো খবর দেব?

আমি এই তরুণ দম্পতির চোখে গভীর অবিশ্বাস দেখলুম। বাড়ি নেই এমন লোকও এদেশে আছে!

হেসে বললুম: উত্তরপাড়ার একখানা ভাড়াটে ভাঙা ঘরে আমার একার সংসার। দেশের বাড়িতে আমার শেষ আত্মীয়ের শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে, বিদেশের ঘরে নতুন আত্মীয় আনবার ভরসা আজও পাই নি।

মিনতি বললেন: বিয়ে করেন নি বুঝি?

বিরূপাক্ষ বললেন: ভাল করেছেন।

অভিমন্যু অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল, বলল: কে তোমাকে খেতে দেয়?

কেউ না।

কেউ না!

অভিমন্যু যেন মর্মাহত হল। একটা লোক রোজ না খেয়ে থাকে!

প্রশ্ন করলুম: তুমি আমাকে খেতে দেবে?

একটু ভেবে অভিমন্যু বলল: তুমি আমাদের কাছে কেন থাক না, তা হলে তো মা তোমাকে খেতে দিতে পারে।

মিনতি বললেন: মামীমা এসে তোমার মামাকে খেতে দেবেন। হ্যাঁ ভাই, আপনার নামটা কী!

গোপাল।

বিরূপাক্ষ বললেন: চমৎকার নাম।

কেন?

প্রথম ভাগ পড়তে পড়তেই নাম লেখা যায়, আমার নাম আমি এখনও ভুল লিখি।

মিনতি হেসে বললেন: ভুল লেখার ভয়ে উনি 'বি. বি.' লেখেন।

বিরূপাক্ষ বললেন: সাহেব নই বলেই বিবির প্রতি একটু দুর্বলতা।

মনে হল, এসব তাঁদের পুরনো রসিকতার কথা।

পুরনো জিনিস উপভোগের মত আবেগশূন্য। আমি কিছু বলতে গিয়েও মিনতির দৃষ্টিতে উদ্বেগ দেখে থেমে গেলুম। উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। অভিমন্যু আর বসে থাকতে না পেরে গাড়ির ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দরজা বন্ধ। চলতি গাড়িতে টাল সামলাতে না পারলে মারাত্মক কিছু ঘটবে না। মিনতি তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

অভিমন্যু একজন যাত্রীর জিনিসপত্র পরীক্ষা করছিল। বিরূপাক্ষ ডাকলেন : খোকা।

অভিমন্যু মুখ ফিরিয়ে হাসল। ভাবখানা এই রকম যে তোমরা অকারণে ব্যস্ত হচ্ছ। প্রথম পদক্ষেপ মানুষ অনেকার চোখে দেখে। অথচ এই পদক্ষেপের প্রেরণা ফুরলেই পৃথিবীর যাত্রা যাবে বন্ধ হয়ে। মনের আবেগ যখন পায়ে সঞ্চারিত হয়, মানুষ তখন চলে। কে জানে, এই চলা কবে শুরু হয়েছিল। চলার ইতিহাস বলার ইতিহাসের চেয়েও পুরনো। লেখার ইতিহাসে এসব কথা লেখা নেই। খানিকটা অনুমান আছে মাত্র। সেই অনুমান দিয়ে আমরা প্রাগৈতিহাসিক ঘটনাকে স্বপ্নময় করে রেখেছি।

একদা এই বিরাট দেশে আর্ট-সভ্যতার পদক্ষেপ হয়েছিল আজকের অভিমন্যুর মত টলমল। দূরে দাঁড়িয়ে আদিম সভ্যতা তাকে সশঙ্ক পিতামাতার মত প্রত্যক্ষ করেছে। পৃথিবীর জন্মের যেমন হিসাব নেই, তেমনি সেই সভ্যতার জন্মের হিসাব। মহাভারতের কাল আমরা নির্ণয় করেছি, পারি নি রামায়ণের কাল নির্ণয় করতে। পুরাণের হিসাবে তার বয়স তের লক্ষ এক হাজার বছর। বিদেশীরা পুরাণ মানে না। খ্রীষ্টের জন্মের তারিখ দিয়ে তারা ইতিহাস রচনা করেছে। সে ইতিহাস মাত্র কয়েক হাজার বছরের। এই গোলার্ধে তখন তিনটি নদীর উপত্যকায় সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। সিন্ধু নীল আর ইউফ্রেতিস। মেম্ফিস মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা তার সাক্ষী দিচ্ছে। মাটি খুঁড়ে নগরের ধ্বংসাবশেষ না পেলে বিদেশীরা বোধ হয় এ কথাও অস্বীকার করত। তারা দাবি করে, এ দেশের সভ্যতা এসেছে ভোলগার উপত্যকা থেকে। ইংরেজ যেমন করে ভারত উদ্ধারে এসেছে, পাদরিরা ঘুরে বেড়িয়েছে হিদেনদের মুক্তির জন্যে, তেমনি করেই নাকি ভোলগার মানুষ এদেশে এসেছে সভ্যতার মশাল হাতে। আসুক, এখানে সে তর্ক নয়। ভারতে আর্য-সভ্যতার উন্মেষ হয়েছে খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বছর আগে। প্রথমে পঞ্চনদে, তারপর ব্রহ্মবর্তে, গঙ্গা যমুনার উপত্যকায় হয়েছে তৃতীয় অবস্থায়। ধীরে ধীরে সভ্যতা এল সুরাষ্ট্র আর অবন্তীতে। উজ্জ্বল হল উজ্জয়িনী আর বিদিশা। সেও খ্রীষ্টের জন্মের সাত-আটশো বছর আগের ঘটনা। সাতপুরার দক্ষিণে বিদর্ভে ছিল অনার্য অধিকার। দণ্ডকারণ্যেও। বিংশ শতাব্দীর প্রখর আলো আজও এই অরণ্য ভেদ করে নি। এবারে বুঝি করবে।

অতীতের বিস্মৃত ইতিহাসে এ অঞ্চলের একটা ঐতিহ্য ছিল। শুধু ইতিহাসে কেন, রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের যুগেও এই ঐতিহ্য ছিল ভারতবিশ্রুত। স্কন্দপুরাণে অবন্তীর উল্লেখ আছে ভারতের সাতটি মোক্ষ-দায়িকা জনপদের সঙ্গে :

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

অবন্তী উজ্জয়িনী মালব বোধ হয় একই স্থানের ভিন্ন নাম। যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। একদা নাকি অবন্তী ছিল মালব রাজ্যের রাজধানী! কেউ বলেন, অবন্তীই রাজ্যের নাম, উজ্জয়িনী তার রাজধানী। প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনায় শুধু সংশয় বাড়ে, প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। ঋক্ সংহিতায় অবন্তীর উল্লেখ নেই, আছে সূত্রগ্রন্থে। তখন এ দেশে যাদের বাস ছিল তারা নামে মানুষ হলেও ঠিক মানুষের মত ছিল না। তারা ছিল একটা মিশ্র জাতি। বেদের আর্যরা সহস্রাধিক বৎসর ধরে এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছেন।

রামায়ণে অবন্তীর নাম আছে। সীতার অন্বেষণে সুগ্রীব বিন্ধ্যাশ্রিত অবন্তীতেও বানর পাঠিয়েছিলেন। মহাভারতে সঞ্জয় অবন্তীর নামোল্লেখ করেছেন। উজ্জয়িনী নামও পাওয়া যায়। কিন্তু মালব রাজ্য বলেছেন

দক্ষিণ-ভারতে। পুরাণের কত স্থানে অবন্তী উজ্জয়িনীর নাম আছে জানা নেই। তবে স্থানে স্থানে যে আছে তা জানা গেছে। মৎস্যপুরাণে বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসী জনপদের তালিকায় অবন্তীর নাম পাওয়া গেছে। অবন্তী নগরে মঙ্গল গ্রহের জন্ম হয়েছিল। বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়, কৃষ্ণ বলরাম অস্ত্রশিক্ষার জন্য অবন্তী নগরে এসেছিলেন সন্দীপনি মুনির নিকট।

অবন্তীর পরিচয় আছে বৌদ্ধশাস্ত্রেও। সিংহলের মহাবংশে আছে, সম্রাট বিন্দুসার তাঁর পুত্র অশোককে উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বৌদ্ধ-সমৃদ্ধি কী করে গড়ে ওঠে, সে ইতিবৃত্ত আমাদের জানা নেই। তবে সমৃদ্ধির সংবাদ প্রসারিত হয়েছিল সারা ভারতে। তাই চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন চাঙকে এদেশে আসতে হয়েছে। তখনও এখানে তিন-চারটি বিহার বিদ্যমান ছিল। শ-তিনেক বৌদ্ধ নাকি ধ্বংসের হাত থেকে সেই বিহারগুলিকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। পশ্চিমে মালবের রাজধানী ধারা নগর, পূর্বে মহেশ্বরপুর, উত্তরে মথুরা ও জজহোতি, এবং দক্ষিণে সাতপুরার পর্বতমালা—এই ছিল সে যুগের উজ্জয়িনী রাজ্য। রাজা ব্রাহ্মণ। দেশে তাই হিন্দুধর্মের প্রাধান্য।

পাশ্চাত্ত্য দেশের টলেমি ও পেরিপ্লাসের গ্রন্থেও উজ্জয়িনীর উল্লেখ আছে বিকৃত অবস্থায়। তারা ওজিনি বলেছেন। হিউয়েন চাঙের মত উ-শে-এন-না বলেন নি।

বরাহ-মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় অবন্তীর সমৃদ্ধির পরিচয় আছে। সমাজের পরিচয় আছে শূদ্রকের নাটক মৃচ্ছকটিকে। ব্রাহ্মণ চারুদত্তের সঙ্গে বারবনিতা বসন্তসেনার প্রেমকে অবলম্বন করে কবি উজ্জয়িনীরই উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন। এ কাহিনী আধুনিককালের যে কোন কাহিনীর মত চমকপ্রদ—চিরনূতন।

তারপর কালিদাসের মেঘদূত:

"প্রাপ্যাবন্তী-নুদয়নকথাকোবিদগ্রাম বৃদ্ধান্
পূর্বোদিষ্টমনুসরপুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিনাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুনৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্॥"

"সিন্ধুপারে অবন্তীপুর
যেথায় উদয়নের গান,
বৃহৎ-কথার গল্পে ভরা
গাঁয়ের পিতামহের প্রাণ!
উজ্জয়িনী নগর সেথা
শ্রীবিশালা শ্রেষ্ঠপুরী
মর্তলোকে খানিক যেন
করেছে কেউ স্বর্গ চুরি!
পুণ্যক্ষয়ে ত্রিদশ হতে
ধরায় এসে নামল যারা,
তাদের বাকি সুকাজটুকুর
ফল কি হেথায় আনলো তারা?"

তিন

বিরূপাক্ষ বললেন: রাতে একেবারেই ঘুম হয় নি, তাই না?

মিনতি সরে বসে বললেন: একটু গড়িয়ে নেবেন?

আমি লজ্জা পেলুম। বসে বসেই আমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তবে কি স্বপ্ন দেখছিলুম এতক্ষণ!

বিরূপাক্ষ বললেন: আজ রাতে আমরা ট্রেনে ঘুমব। মৌয়ে ভাল ওয়েটিং-রুম আছে।

ওয়েটিং-রুমে কেন?

এ তো বিলিতী ধর্মশালা। ছারপোকা নেই, তার বদলে ভাল বাথরুম আছে।

তা হলে ইন্দোরে যাওয়াই ভাল। সেখানকার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আরও ভাল হবে।

বিরূপাক্ষ বললেন: তা হলে অন্য বিপদ আছে। স্থানাভাব হবে। আর বাসেও তেরো তেরো ছাব্বিশ মাইলের বেশী ভাড়া দিতে হবে। ইন্দোর থেকে যে বাস ছাড়ে, সে মৌ ধার হয়ে মাণ্ডু যায়।

দেখি।—বলে ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে টাইম-টেবলখানা চেয়ে নিলেন। বইয়ের শেষে মানচিত্র আছে। সেখানা খুলে আমাকে বোঝাতে বললেন: এই হল মৌ বা মাউ। এখানে নেমে আমরা বাসে মাণ্ডু

একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
না দেখলে বিশ্বাসই হতনাঃ শঙ্কর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সার্টটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সার্ট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্য্যকরী ও অফুরন্ত ফেণা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুনা না কেন...আজই!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড
S. 267-X52 BG

যাব—পঞ্চান্ন মাইল পথ। সময় লাগবে প্রায় চার ঘণ্টা—ভাড়া দু টাকা ছ পয়সা। ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়াবে।

তারপর?

মিনতির দিকে চেয়ে বিরূপাক্ষ বললেন: তারপর মোক্ষলাভ। যার জন্যে এত শ্রম, সে রত্ন মুঠোর ভেতর।

মিনতি লজ্জা পেয়েও পেলেন না। বললেন: ভোর-বেলায় আমাদের যাত্রা। শুনেছি, সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে পারলে সন্ধ্যেবেলাতেই ফিরে আসা যায়।

আমি দেশে ফেরার কথা ভাবছিলুম। ঘুরে ঘুরে শরীর কত ক্লান্ত হয়েছে, এখন বোঝা যাচ্ছে না। মনটা ঝিমিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে। আমি তাঁর মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে বললুম: তারপর আমরা কোথায় যাব?

বিরূপাক্ষ বললেন: মৌ থেকে ইন্দোর যাবার অসংখ্য ট্রেন। তারই কয়েকখানা যায় উজ্জয়িনী। ইন্দোরে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আমরা উজ্জয়িনী যাব। সেখানে পুরো একটি দিন।

মিনতি বললেন: একটি সন্ধ্যাও কাটাব শিপ্রার তীরে। সম্ভব হলে রাত।

সুর করে বিরূপাক্ষ বললেন:

"দূরে বহু দূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদীপারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।"

মাঝখানেই মিনতি বলে উঠেছিলেন: থাক্ থাক্, তোমার কাব্য এখন থাক্।

আমি প্রশ্ন করলুম: আপনি কবিতা লেখেন বুঝি?

কবিতা বলি।

পরম কৌতুকভরে মিনতি বললেন: বলে দেব?

না বললেও বুঝতে পারলুম যে বিরূপাক্ষ কোন সময় কবিতা লিখেছেন, কিংবা এখনও লেখেন। এই প্রসঙ্গটি এড়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন: উজ্জয়িনী থেকে ভূপালের বড় লাইন দেখুন। ভূপাল থেকে ঝাঁসির গাড়ি ধরব। মাঝখানে সাঁচি আর ভিল্সা।

এ সব জায়গাতেই ওঠা-নামা আছে। পরিশ্রম আছে, সময়েরও দরকার। বিরূপাক্ষ বলে চললেন: ঝাঁসি থেকে হরপালপুর খাজুরাহোর জন্যে।

বললুম: মধ্যভারতের রাজধানী গোয়ালিয়র?

উপায় নেই। রেল কোম্পানির পাস আমাকে হরপালপুর থেকে মানিকপুর, সেখান থেকে এলাহাবাদ হয়ে দেশে নিয়ে যাবে। তা না হলেই গাঁটের কড়ি। গাঁট শূন্য।

আমার পকেটও ভর্তি নয়। যা সামান্য পুঁজি নিয়ে বেরিয়েছিলুম, খরচ করলে তা অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। মামা ঈগল পাখির মত আমার পকেট আগলেছেন। কোনখানে আমায় খরচ করতে দেন নি। কলকাতার টিকিটখানাও নিজে কেটে দিয়েছেন। বলেছিলেন, তোমাকে আমি ডেকে এনেছি, কলকাতা থেকে জয়পুরের ভাড়াটাও আমার দেওয়া দরকার।

হাত পেতে পয়সা নিতে আমি শিখি নি। শুধু মাইনের টাকা নিই গুনে গুনে। সেই টাকারই কিছু অবশিষ্ট আছে।

বিরূপাক্ষর হাত থেকে আমি টাইমটেবলটা নিলুম। মিনতি একখানা গাইড-বই বার করে দিলেন। নিবিষ্টমনে আমি সব মিলিয়ে নিতে লাগলুম। একসময় মনে হল, একটা দিন আমরা সংক্ষেপ করতে পারি। বিরূপাক্ষকে সেই কথা বলতেই তিনি উৎসাহ পেলেন, বললেন: সত্যি?

গাইড-বই খুলে তাঁকে বুঝিয়ে দিলুম: মৌ থেকে মাণ্ডু পঞ্চান্ন মাইল—ভাড়া দু টাকা ছ পয়সা আর ইন্দোর থেকে মাণ্ডু বাষট্টি মাইল—ভাড়া দু টাকা চার আনা। দশ পয়সায় একটা দিন বাঁচছে।

মিনতি একখানা বই পড়ছিলেন, আমার দিকে মুখ তুললেন।

বললুম: বিকেলে মৌ পৌঁছে কিছু করবার নেই। কিন্তু একটু এগিয়ে ইন্দোরে নামলে শহরটা আজই দেখা হয়ে যাবে। তারপর কাল মাণ্ডু, পরশু উজ্জয়িনী।

অত্যন্ত তৎপরভাবে বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট বার করে বললেন: ইচ্ছা করুন।

তাঁর কথায় ও কাজে আমি হাসলুম। মিনতিও হাসলেন। বিরূপাক্ষ নিজেই সিগারেট ধরালেন।

মিনতি আস্তে আস্তে বললেন : রেলের লোক কিনা—

কথাটা বিরূপাক্ষ লুফে নিলেন, বললেন : টাইমটেবল দেখা আর টিকিট কাটা, এ কাজ দুটো যাত্রীরাই ভাল পারে। আমার নিজের স্টেশনের সময় জিজ্ঞেস কর, সব মুখস্থ।

মিনতি বললেন : দেখুন তো ভাই গোপালবাবু, উজ্জয়িনীতে একটা রাত থাকা যায় কিনা ?

টাইমটেবল আমার হাতেই ছিল। দেখে বললুম : অনায়াসে। মাণ্ডু থেকে ফিরে এসে ইন্দোরেই রাত কাটাব। উজ্জয়িনীর ট্রেন দেখছি সকাল পৌনে আটটায়। পৌঁছবে বেলা সাড়ে দশটায়। ভূপালের গাড়ি আমরা বিকেল সাড়ে ছটায় ধরব না। রাত দুটো দশে একটা ট্রেন ছাড়ে— উজ্জয়িনী থেকেই ছাড়ে। সকাল সাতটায় ভূপাল।

উজ্জ্বল চোখে মিনতি বললেন : দেখলে তো !

সহাস্যে বিরূপাক্ষ বললেন : এ তো চিরকালই দেখছি। আমি কেন, সবাই দেখছে। গাঁয়ের যোগী কোনদিন ভিখ পায় না।

একসময় আমরা নর্মদার পুল পেরিয়ে গেলুম। আরও কিছু পরে বিন্ধ্যের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছব। উঠব তার মালভূমির উপর। ভারতের মানচিত্রের দিকে চেয়ে চিরকাল আমার একটি বিস্ময় জেগেছে। এ অঞ্চলে দুটি পর্বতশ্রেণী পূর্ব থেকে পশ্চিমে সমান্তরাল ভাবে বিস্তৃত। বিন্ধ্য ও সাতপুরা। বিন্ধ্য উত্তরে, সাতপুরা দক্ষিণে। আর এই দুই শ্রেণীর দক্ষিণ প্রান্তে প্রবাহিত হচ্ছে দুটি বিখ্যাত নদী—নর্মদা ও তাপ্তি। বিন্ধ্যের দক্ষিণে নর্মদা, আর সাতপুরার দক্ষিণে তাপ্তি। বোম্বের পর পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অতিক্রম করে এসেছি। সাতপুরার নীচে দিয়ে রেলপথ। ভুসাবনের পর তাপ্তি পেরিয়ে আমরা মহাদেও পর্বতের দিকে যাই নি। উত্তরে এসেছি বিন্ধ্য পর্বতের দিকে। আর কিছুদূর এগিয়ে মধ্যভারতের মালভূমি শুরু হবে।

রাজস্থান ভ্রমণের সময় আরাবল্লীর পর্বতমালা দেখেছি। আবু থেকে আজমীর পর্যন্ত। জয়পুর আলোয়ারে কেন, দিল্লীতেও এই পাহাড়ের নমুনা দেখি। দিল্লীর রোমান্স তো আবু পাহাড়ে গিয়ে শেষ হল। শেষ কেন, নতুন রোমান্সেরও তো শুরু সেইখানে। এই তো কয়েকটা দিন আগের ঘটনা। পনরো-কুড়ি দিন আগে মিত্রা ও চাওলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। রানা আসে নি। মামীমা খুব আশা করেছিলেন রানা আসবে। চিতোর আর উদয়পুরে তিনি অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। রানা এসে আবু পাহাড়ে বসে থাকবে, এ ভারি অন্যায় কথা। রানার সঙ্গে যে স্বাতির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

মামাকে বড় নির্বিকার বোধ হয়েছিল। রানা আসবে না, এ কথা তিনি বলেন নি। কিন্তু আসবে বলেও তাঁর ভরসা ছিল না। রানার বাবা মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর সহপাঠী বন্ধু। প্রেসিডেন্সী কলেজে একসঙ্গে পড়েছিলেন। সেইখানেই সম্বন্ধের শেষ। বি.এ. পাস করে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। ফিরেছিলেন সিভিলিয়ান হয়ে। মামা দেশে ফিরলেন বাপের জমিদারী দেখতে। বাংলার জমিদারদের সম্বন্ধে মিস্টার ব্যানার্জির মনোভাবের কথাও মামা বলেছিলেন, সম্পত্তি দেখছে, না অধঃপাতে গেছে ! আশকারা দিয়ে গভর্মেণ্ট একগুষ্টি অপদার্থ পুষছে।

বলেছিলেন, তুমি জান না গোপাল। আমাদের প্রতি কত গভীর ঘৃণা ওরা বুকের ভেতর পুষে রেখেছে। যাদের চালচুলো ছিল না, আর যাদের প্রচুর ছিল, তাদের দু দলকেই ওরা ঘৃণা করে। সরকারী প্রতিপত্তিওয়ালা বন্ধুমহলে যা বলে, তাও জানি। সে সব নোংরা কথা আর নাই বা শুনলে।

শুনতে আমি চাই নি। আর সে সম্বন্ধে যা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। শুধু তাঁর মত আমার মনেও একটা প্রশ্ন জেগেছিল। তাঁর উপযুক্ত পুত্র রানা কেন স্বাতিকে বিয়ে করতে চাইল। সে কি তার বাপের কাছে এ যুগের শিক্ষা পায় নি, না তার

অন্তরের মর্যাদা দিয়েছে সকলের উর্ধ্বে! তাই যদি হবে তো আবু পাহাড়ে কেন এল না।

এল তার বোন মিত্রা, আর সেই পাঞ্জাবী যুবক চাওলা। মিত্রার কথা আমি ভুলব না। এমন স্পষ্টবাদী মেয়ে আমি বোধ হয় আজও দেখি নি। গোড়া থেকেই আমি এ কথা অনুভব করেছিলুম। সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাস করলুম সেইদিন, যেদিন ওখলায় আমার পাশে বসে বলল, চাওলাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে করব না। সে কথা আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছি।

মিত্রা আমাকে মামার বাড়ি থেকে তুলে এনেছিল, স্বাতিকে আনে নি। ইচ্ছে করেই আনে নি। যমুনার ধারে সেই ছায়াঘন শ্যামল পরিবেশে বসে বলেছিল, আপনার পোশাকী রূপটা দেখেছি। ইচ্ছে হল, আপনাকে একান্তে একবার দেখি।

বলেছিল, মানুষের দুটো রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট। একটা তার সমাজের কাছে—অভিনেতার মত সেটা তার বাইরের রূপ। আর একটা তার নিজস্ব—সেটা ভেজালহীন খাঁটি পরিচয়। আমার বিশ্বাস, মানুষের একটা তৃতীয় রূপ আছে। সেটা তার একান্তে কোন একজনের সামনে, যাকে সে—

একটা ঢোঁক গিলে বলেছিল, ভালবাসে।

মিত্রা তার বিশ্বাসের কথা আমায় বুঝিয়ে বলেছিল, মানুষ যখন প্রথম ভালবাসে তখন তার তৃতীয় রূপ কতকটা অভিনেতারই মত কৃত্রিম রূপ। ভালবাসা যত গভীর হয়, ততই সে রূপ বদলায়। শেষে তার সত্য রূপের সঙ্গে আর কোন তফাত থাকে না। মানুষকে চিনতে হলে তাই একান্তে দেখতে হয়।

অন্য মেয়ে হলে নিজের মনকে মিত্রা এমন অকপটে মেলে ধরত না। লজ্জা পেত, হয়তো ভয়ও পেত। কোন স্বল্প-পরিচিত পুরুষ তাকে নির্লজ্জ ভাববে। এ তো ভয়েরই কথা। মিত্রা ভয়কে জয় করেছে। সংস্কারকে উপেক্ষা করছে। তাকে আমার ভাল লেগেছিল। বলেছিলুম, চাওলাকে যখন ভালই বাসেন, তখন বিয়ে করতে আপত্তি কি?

মিত্রা বলেছিল, তার সঙ্গে আমার অন্তর মিল নেই। সে ভাবে ঘুঁটেকুড়ুনীর দুঃখই দুঃখ, রাজকন্যের দুঃখ দুঃখ নয়। তার মন সমাজ-সচেতন। কিন্তু একটা মতবাদকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে আর একটা মতবাদের ভারে বেঁকে গেছে। লোকটা এখন আর সুস্থ নয়।

আবু পাহাড়ে রানা স্বাতির জন্য এল না। মিত্রা এল চাওলার সঙ্গে। যাকে সে অসুস্থ ভাবে, তারই সঙ্গে এল। মনে হল, তাদের এই আসার ভিতর আরও কোন গভীর অর্থ আছে। সে কথা আমার কাছে এখনও স্পষ্ট হয় নি।

মামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাণা এল না কেন?

চাকরি।

পুজোর সময়েও চাকরি!

চাওলা আমায় একটা চিমটি কেটেছিল লুকিয়ে। বলেছিল, সিনিয়রের ইচ্ছে নয়।

মামা গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, বুঝেছি।

মিত্রার দৃষ্টি একটু অবনত হয়েছে। আর মামী হয়েছেন বিষণ্ণ। তিনিও বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে রাণা আর আসবে না।

আবু পাহাড় থেকে নেমে আসবার সময় চাওলা বলেছিল, তুমি থাক, তোমার জায়গায় আমি নেমে যাই।

সবাই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, কিন্তু স্বাতির চোখে আমি কৌতুক দেখেছিলুম। আমার কর্তব্য স্থির করতে আর একটুও দেরি হল না। বললুম, আসি।

এক টুকরো কাগজ আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে চাওলা বলল, ভেবেছিলুম, মিত্রার হাতে গুঁজে দিয়ে আমি তোমার জায়গায় ফিরে যাব। কিন্তু তার যখন দরকার হল না, তুমি ওখানা নিয়ে যাও।

চলতি বাসে কাগজখানা পড়ে দেখলুম। অত্যন্ত কাঁচা হাতে একছত্র কবিতা লেখা—তোমারই হউক জয়।

চাওলা বলেছিল, মিত্রার কাছে সে বাংলা শিখছে। আগে দেখলে এই কাগজখানা আমি তাকেই উপহার দিতুম। তারা হাত ধরাধরি করে হাঁটতে শুরু করেছে। দেখে অদ্ভুত ভাল লাগল।

[ক্রমশ]

অবন্ধ্যা

হিমাদ্রি চক্রবর্তী

শিমুল গাছটা লাল ফুলে ছেয়ে গেছে।

প্রতি বছরই এমন সময়ে নিষ্পত্র জরাজীর্ণ গাছটা যৌবন ফিরে পায়। সকলের অলক্ষ্যে একটি দুটি করে পাতা ন্যাড়া ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। ভোরের শিশিরে স্নান করে সারাদিন রোদ পুইয়ে ফাল্গুনী হাওয়ার মাতলামীতে গা ভাসিয়ে দেয় বিকেলে। শীত পেরোবার পর থেকেই এই রকম নিঃশব্দ খেলা চলতে থাকে জবুথবু রোঁয়া-ওঠা কাকভূশণ্ডি শিমুল গাছটায়। তারপর একদিন সোনারোদ সকালে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে সবাই, কোথা থেকে একপাল দুরন্ত রঙিন শিশু ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাছটার মাথায়। দমকা হাওয়ায় টুকটুকে লাল থোকা থোকা ফুলগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছে অগ্নিশিখার মত।

দীর্ঘদিন পর বাড়ি ফিরে এসেছি চাকরিস্থল থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে। শিমুল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আর আশ মেটে না। বনগন্ধের মত শৈশবের অস্পষ্ট স্মৃতি কৈশোরের দুয়ার উন্মুক্ত করে যৌবনের প্রথম বেদনার্ত সুখের মত নতুন করে রোমাঞ্চ জাগায় যেন। এই বুড়ো শিমুল আর তার পাশের ক্লাব-ঘরটার সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলার সকল স্মৃতি সকল কাহিনী জড়িয়ে আছে বনস্পতির শাখায় শাখায় শতসহস্র তরুলতার মত।

বাড়িতে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিই পাড়ার আর সকলের—কে কোথায় আছে, কেমন আছে। পুরনো বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রায় সকলেই আছে এখানে—শম্ভু টোটন জগা তোতলা নিমাই সকলেই। কেবল বিলটু মাঝখানে আজমীঢ় গিয়েছিল চাকরি নিয়ে। অবাঙালী মালিকের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আবার এসে শিকড় গেড়েছে ঘরে। চৌধুরীদের মেয়ে বুলুর বিয়ে হয়ে গেছে নাকি খুব বড় এক অফিসারের সঙ্গে। সান্যালদের মিঠু আর হালদার-বাড়ির মন্টি-রিজিয়ার বিয়েতে তো নিজেই উপস্থিত ছিলাম। হিসেব করে দেখলাম সমবয়সী মেয়েদের প্রায় সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও অনেকে মার অসুবিধে অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। শম্ভু তো লাভ-ম্যারেজ করে বসেছে এরই মধ্যে—বিয়ে না করে নাকি উপায় ছিল না।

কথার শেষে যতিচিহ্নের মত ভৈরবকাকার মেয়ে অণিমার কথাও উঠল। পাড়াসূবাদে ভৈরবকাকা মানে ভৈরব ঘোষাল আমাদের এখানকার পুরনো বাসিন্দে। জঙ্গল কেটে খানা-ডোবা ভরাট করে এই অঞ্চলে জনবসতির পত্তন হওয়ার শুরুতেই আমাদের পাড়ার দক্ষিণ প্রান্তে বেশ কয়েক কাঠা জমির উপর গোটাকয়েক ছাতিমগাছের মালিকানা-স্বত্ব নিয়ে বেশ পাকাপোক্ত ভাবেই আটচালা ঘর তুলেছিলেন ভৈরব ঘোষাল। পেশাতে পুরুতঠাকুর হলেও বেশ চণ্ডপ্রকৃতির এবং উগ্র-স্বভাবের লোক ছিলেন তিনি, এই শুনেছি সকলের মুখে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান হবার পর থেকেই তাঁকে দেখে আসছি বিছানায় আধ-শোওয়া, শরীরের নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু।

সেই অণিমার বিয়ে হয় নি আজও, আর হবেও না বোধ হয় কোনদিন। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলাধুলো করেছি আমরা। একসঙ্গে বললে একটু ভুল হয়—আমরা খেলতাম, আর একটু ফাঁকে বসে অণিমা আমাদের জামা জুতো পাহারা দিত। ধবধবে ফরসা স্কার্ট-ব্লাউজ পরা বুলু কিংবা সালোয়ার-কামিজ পরা মিঠু মন্টি রিজিয়া সবাইকে আমরা নিজের নিজের দলে টানবার চেষ্টা করতুম। তুচ্ছ কারণে বুলু হঠাৎ ঝগড়া করে বসলে, গায়ে পড়ে ভাব করার জন্য সাধ্য-সাধনা করতুম—কিন্তু অণিমাকে

ভুলেও কেউ ডাকত না। নিতান্ত খেলোয়াড় কম পড়ে গেলে যদি ডাকতুম, অণিমা যেন কৃতার্থ হয়ে যেত।

ফ্যাকাশে গায়ের রঙ, কাঠি-কাঠি হাত-পা, আর একমাথা রুক্ষ বিবর্ণ চুল। ছেঁড়া মলিন ফ্রকটা পিঠে বোতাম না থাকায় শীর্ণ কাঁধ থেকে পিছলে পড়ত প্রায়ই। নিজেদের অবস্থার কথা ভেবে অণিমাও যেন সকলের নজর এড়িয়ে নিঃশব্দে থাকতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

তারপর সকলের দৃষ্টির আড়ালেই অণিমা বড় হয়েছে। ছেঁড়া ফ্রক ছেড়ে ছেঁড়া শাড়ি ময়লা ব্লাউজ পরেছে। অণিমার দেহের ও মনের ঋতু পরিবর্তনের খবর কেউ রাখে নি। এহেন অণিমার খবর জিজ্ঞাসা করাতে মা পিসীমা আর ছোট বোনেরা আশ্চর্য হয়ে গেল। মা হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, অণিমাদের কথা আর বলো না। সংসার নাকি আর চলে না শুনতে পাই, ভৈরব ঠাকুরপো বোধ হয় এ যাত্রা আর টিকবে না। সত্যিই ওদের বড় কষ্ট। মেয়েটা আজকাল আর আসেও না।

অণিমা নাকি হাসপাতালে ধাত্রীর কাজ নিয়েছে ও মাস থেকে।—ছোঁয়াচ-এড়ানো স্বরে মালা জপতে জপতে ও-পাশ থেকে পিসীমা কথাটি ছুঁড়ে দিলেন।

ভৈরবকাকার সংসারে অভাব-অনটন তো ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, কাজেই বিস্মিত হলাম না। ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নির্বিকার চিত্তে ভাবলাম, হাসপাতালের ধাত্রীর কাজ, তাই বা মন্দ কি? ম্যাট্রিকটাও পাস করে নি, চেহারাও নাকি তেমনি আছে। এসব মেয়ের বিয়ে হয় না, ভাল চাকরিও পায় না। এই মফস্বল শহরে এর বেশী কী আশা করতে পারে অণিমা।

অণিমার প্রসঙ্গে ছেলেবেলার কথা নতুন করে মনে পড়ে। ছোট মফস্বল শহরের যে অঞ্চলটাতে আমরা থাকতুম তার নাম ছিল শিল্প-সংহতি পাড়া। দু পাশে বাংলো-প্যাটার্নের একতলা বাড়িগুলো সাজিয়ে রেখে ঠিক মাঝখানে লেডিস-পার্কের মত একফালি চৌকো সবুজ ঘাসের জমিকে প্রায় বৃত্তাকারে বেষ্টন করে লাল সুরকি-ঢালা রাস্তাটা আবার গিয়ে মিশে গেছে বড় রাস্তায়। স্বদেশী আমলে কুটীরশিল্পের কেন্দ্রস্থল ছিল এদিকটা। এখন তার কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। তবুও খুঁজলে এখানে দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে যে পাহাড়ী ঢলের সরু মরসুমী নদীটা বাঁক ফিরেছে সেখানে ভেরেণ্ডা ঘোড়ানিম আর কালকাসন্দীর ঝোপঝাড়ের আড়ালে হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে চুনের ভাটি, বালি আর পোড়া ইটের ভগ্নস্তূপ, উই-ধরা কাঠের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আড়া। পশমী কাপড়ের তাঁত, দেশলাইয়ের কারখানা ছিল এদিকটা জুড়ে। আর একটু উজিয়ে ধোপাদের আড্ডা। এপাশে শিমুল গাছটা থেকে কিছুদূর এগিয়ে একটা চওড়া ঢালু খাদ অন্য পাড়ার সঙ্গে নো-ম্যান্‌স্‌-ল্যাণ্ডের ব্যবধান রক্ষা করে চলেছে প্রথম থেকেই। প্রায়ই ও-পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আমাদের গুলিগোলা বিনিময় হত—গুলতি ঢিল আর থান-ইট মারফত। যুদ্ধ-বিরতির পর সন্ধি হলে ইস্কুল ছুটির পর চলত টেনিস্‌বলে ফ্রেণ্ড্‌লী ফুটবল ম্যাচ কিংবা পুরনো ছাতার বাঁট দিয়ে কাঠের বলে হকি খেলা। কারচুপি কিংবা পক্ষপাতিত্ব চোখে পড়লে সেই ছাতার বাঁট রেফারীর পিঠে বসাতেও দ্বিধা করত না কোন ডানপিটে ছেলে। হৈচৈ, মারামারি, যুদ্ধ-ঘোষণা—তারপর আবার যথানিয়মে গুলিগোলা বিনিময়।

দৈবাৎ যদি একা কেউ পাড়ার বাইরে গিয়ে পড়ত তা হলে আর রক্ষে ছিল না। জামা ছিঁড়ে আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে এসে সেই আহত সৈনিক তার লাঞ্ছনার বিবরণ দিত, আর আমরা সমবেত বৈঠকে দাঁত কড়মড় করে তার প্রতিশোধ নেবার উপায় চিন্তা করতাম। ফলে বড় রাস্তায় একা বেরনো ছিল আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ। ইস্কুল যাওয়া থেকে আরম্ভ করে হাটে-বাজারে পোস্ট-অফিসে পর্যন্ত আমরা যূথবদ্ধ ভাবে চলাফেরা করতাম।

পাড়ায় আমাদের সমবয়সী মেয়েরাও এই ধর্মযুদ্ধে পিছিয়ে ছিল না। গুরুজনদের লুকিয়ে ওরা তৈরি করেছিল নার্সিং-স্কোয়াড্‌। আমাদের মধ্যে কেউ আহত কি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে আয়োডিন তুলো থেকে শুরু করে নারকোলনাড়ু, চিঁড়ের মোয়া পর্যন্ত ওয়ার-ফ্রন্টে

এসে পৌঁছত। চৌধুরীদের বুলু, সান্যালবাড়ির মিঠু, হালদারবাড়ির মন্টি-রিজিয়া এমন কি অণিমা পর্যন্ত। অবশ্য এতে ওদের স্বার্থ কোন কম ছিল না। কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষার মাস দুই আগে থেকে আপনা-আপনি রণদামামা শুরু হয়ে যেত। এ ব্যাপারে একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে গিয়েছিল যেন আমাদের মধ্যে। এমন কি গায়ে পড়ে ভাব করার স্পৃহাও জেগে উঠত।

এমনি করে একটার পর একটা বাৎসরিক পরীক্ষার গণ্ডি উতরে যেতে যেতে ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষা দেবার পর একদিন হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করলাম আমরা বড় হয়েছি। ইতিমধ্যে চিৎকার করে অন্য একজনকে ডাকতে গিয়ে গলা দিয়ে তিন রকম কর্কশ স্বর বেরুতে আরম্ভ করেছে, জুলফির নীচে পাতলা দাড়ি আর গোঁফের রেখা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, জামার নীচে আগা-পাস্তলা দড়ি দিয়ে বেঁধেও দৈর্ঘ্যে নিজেকে ছোট করে স্কুলের ফুটবল টিমে খেলবার অনুমতি পাচ্ছি না। এমন সব চমকপ্রদ ঘটনাগুলি সচেতন মনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, কিন্তু একদিন একটা ছোট্ট ঘটনার পর বুঝতে পারলাম আমরা কৈশোরের যুদ্ধোত্তর দিনে পা দিতে চলেছি।

সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল খুব। স্কুলে থাকলে থাকী শার্ট ভিজিয়ে রেনী-ডে আদায় করতাম অবশ্যই। কিন্তু তখন প্রায় নির্বাধ মুক্তি। সকাল সকাল ফাইন্যাল পরীক্ষার পড়ায় ইতি দিয়ে এক এক করে ক্লাবঘরে এসে আড্ডা জমিয়েছিলাম—আমি, বিল্টু, টোটন, শম্ভু, জগা আর তোতলা নিমাই। অর্থাৎ আমাদের ব্যাচের চাঁই বলতে সকলেই ছিলাম সেদিন। জানলার ধারে বসে আসন্ন পরীক্ষার কথাই হচ্ছে। ঝিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে, নীচু মাঠটা জলে ভরে উঠেছে প্রায়। এমন সময়ে দেখতে পেলাম চৌধুরীদের মেয়ে বুলু, পরনে নীল শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ, শাড়ির আঁচলটা ডান হাতে ঘোমটার মত মাথার উপর ধরে মিঠুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে খালি পায়ের উপর শাড়িটা বাঁ-হাতে একটু তুলে ধরে আলতো পায়ে হেঁটে চলে গেল নিজেদের বাড়িতে।

আমাদের কথার স্রোতটা থেমে গেল হঠাৎ। সবুজ বৃষ্টি-ভেজা ঘাসের উপর শঙ্খের মত সাদা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত অনাবৃত একজোড়া পা হেঁটে গেল লীলায়িত ভঙ্গীতে। আমরা সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলাম যতক্ষণ না পর্যন্ত বুলু ওদের বাড়ির গেটে মেহেদি-বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর একটা অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে আমাদের কিছুক্ষণ কাটল নিঃশব্দে। ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় কেউ কারও দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। এসব কিছুই নয় অথচ কী যেন! এমন তো এর আগে কোনদিন হয় নি!

বিল্টু সহজ গলায় বলতে চেষ্টা করল, শাড়ি পরলে মেয়েদের কিরকম লম্বা দেখতে লাগে, তাই না?

আমি অস্পষ্ট গলায় জবাব দিলুম, হুঁ।

নিমাই থতিয়ে থতিয়ে কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। আবার সেই অস্বস্তিকর নীরবতা। বাড়িতে কাজ আছে বলে শম্ভু হঠাৎ উঠে গেল। তারপর আর আড্ডা জমল না, একটা না একটা ছুতো করে উঠে দাঁড়ালাম একে একে। বৃষ্টিও থেমে এসেছে প্রায়।

টুপটাপ বৃষ্টি মাথায় ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরে এলাম। কোন কারণ নেই, তবু কি যেন একটা অস্বস্তির খোঁচা তাড়া করে ফিরছিল তখন থেকে। ঝাঁকড়া জামরুল গাছের তলায় ছাগলছানাটা শুকনো খড়ের গাদা বেছে নিয়ে চুপ করে শুয়ে আছে। সেটাকে খানিক আদর করতে করতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার চৌধুরীদের আনারসের বাগানটা লক্ষ্য করলাম—কেউ নেই। আরও কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে নিরাসক্তভাবে পড়ার ঘরে ঢুকতে গিয়ে চোখে পড়ল ভৈরবকাকার মেয়ে অণিমা মার পিছন পিছন ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল, ছেঁড়া নোংরা শাড়িটা বৃষ্টিতে ভিজে স্যাতনেতে হয়ে পিঠের হাড় দুটোর সঙ্গে কদাকারভাবে আটকে আছে। আবার চাল ধার চাইতে এসেছে বোধ হয়!

তারপর আরও বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, কিন্তু বুলুকে আমরা ভুলতে পারি নি। কয়েক বছর আগেকার ছবি ভাসে চোখের সামনে, শঙ্খ-সাদা গায়ের রঙ,

টিকলো নাক, টানা ভুরুর নীচে ভ্রমর-কালো চোখ, পিছনে কোঁকড়ানো চুলের ঢাল কোমর ছাপিয়ে নেমেছে স্তবকে স্তবকে। রঙিন রেশমী শাড়ির আঁচল উড়িয়ে লাল সুরকি-ঢালা রাস্তায় বুলু মৃদু হেসে আমাদের পাশ কাটিয়ে মেহেদি-বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেত।

কিন্তু নিমাই আর প্রতিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করত না, বিন্টুও গলায় আয়াসসাধ্য সহজ ভাব ফোটাত না। তখন বড় হয়েছি, কলেজী গাম্ভীর্য এসেছে আমাদের মধ্যে। তবুও কি যেন একটা নিঃশব্দ পরিবর্তন ঘটত সকলের মনে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে কেউ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত কিংবা নস্যির ডিবের উপর বেতালা টোকা উঠত।

অণিমাও হয়তো কোন কোন দিন জীর্ণ তাঁতের শাড়িটা সারা দেহে ব্যাণ্ডেজের মত জড়িয়ে মন্থর পায়ে হেঁটে গেছে এই পথে, আমাদের পাশ দিয়ে। কিন্তু আমাদের উত্তপ্ত আলোচনায় যতি পড়ে নি, ফিরেও তাকাই নি কেউ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অণিমার সামনের দাঁত দুটো যেন বিশ্রী রকম উঁচু হয়ে উঠেছে গাল ভেঙে গিয়ে। বাঁ দিকের চোখের মণিটাও যেন কেমন সাদা ঘোলাটে। তেলহীন রুক্ষ কদাকার চেহারা, বেশীক্ষণ কাছাকাছি থাকলে গা ঘিনঘিন করে যেন।

তবু যেন মনে হয় অণিমা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে একদৃষ্টে। শম্ভু একদিন সোজাসুজি বলেই ফেলল, অণিমাটা আজকাল কেমন বেহায়ার মত তাকায় লক্ষ্য করেছিস? গিলে খাবে যেন!

জগা ঠাট্টা করে বলে, ওর বিয়েটা ছাঁদনাতলার বদলে শ্যাওড়া গাছতলায় দিলেই মানাবে ভাল।

আমি চিন্তিতভাবে সিগারেটে টান দিয়ে বলেছিলাম, বিয়ে নামক জিনিসটাই অণিমার মন থেকে মুছে ফেলা উচিত, তা না হলে মুশকিল আছে মেয়েটার।

অণিমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ আছে বইকি। আমাদের পাড়াটা একটু সৌখীন। সামনে লাল সুরকি-ঢালা রাস্তার পাশে সবুজ ঘাসের আস্তরণ, আর পিছনে পাহাড়ী ঢলের রুপোলী ফিতের মত সরু নদী। প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে মরসুমী ফুলের ছোটখাটো বাগান। ইউক্যালিপ্টাস আর ঝাউ গাছের ফাঁকে ফাঁকে বুগেনভোলিয়া আর কসমসের ঝোপে হাজার রঙিন প্রজাপতির মত ফুল ফোটে, ডালিয়া আর ক্রিসান্থিমামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফোটে সূর্যমুখী আর রজনীগন্ধা। মেহেদি-বেড়ার আভিজাত্য-ঘেরা পরিচ্ছন্ন বাড়িগুলি। এরই মাঝে নিতান্ত বিসদৃশভাবে দাঁড়িয়ে আছে অণিমাদের বাড়িটা, ন্যাড়া ছাতিমের নীচে ভাঙাচোরা উইঢিবির মত। সেই পুরনো আটচালার চাল রোদ-বৃষ্টি-জলে ঝুরঝুর করে ভেঙে গেছে পোড়া পাঁপরের মত। আলকাতরায় রঙ করা কেরোসিন টিনের চাল আর দরমার বেড়া। ফুলের বাগানের বদলে লঙ্কা আর বেগুনের গুটিকয়েক শুকনো চারা সারের অভাবে বিবর্ণ হয়ে কুঁকড়ে মাথা নামিয়েছে। পক্ষাঘাতে ভৈরব ঘোষালের সমস্ত দেহটাই আড়ষ্ট হয়ে গেছে আজকাল। শুনেছি কেবল একটা বিশ্বগ্রাসী খিদেয় তার ভারি ঠোঁট দুটো তৃষিত চাতকের মত কেঁপে ওঠে বারবার। আধঘণ্টা অন্তর অন্তর নাকি ভৈরব-কাকার খিদে পায় আর সেই খিদের তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত একটা জান্তব গোঙানি ঠিকরে বেরুতে থাকে তার গলা দিয়ে।

পাড়ার গিন্নীদের আড্ডায় ভৈরব ঘোষালের সংসার নিয়ে আলোচনাটা আজকাল বিরক্তি আর নাক কোঁচকানোর ভিতর দিয়ে শেষ হয়। হালদার-গিন্নী পানের পিক ফেলে, আলতো করে একটিপ দামী জর্দা মুখে ফেলে বলেন, সত্যিই এবার ওদের উঠে যাওয়া উচিত এ-পাড়া থেকে। জমিটা বিক্রি করে দিলেও তো কিছু সুরাহা হয়।

পাড়ার অন্যতম সম্ভ্রান্ত বাসিন্দে রাজেন সান্যালের স্ত্রী অর্থাৎ মিঠুর মা টপ করে কথাটা আঁকড়ে ধরে উৎসাহিতভাবে বললেন, উনি তো সেদিন এই কথাটাই অত করে বোঝালেন অণিমাকে। ভাল দামও দেবেন বলেছিলেন। তা মেয়ের আদিখ্যেতা দেখে বাঁচি না, বলে কিনা—মাথা গোঁজার জায়গাটুকুও যদি যায় তবে আর রইল কি?

সকলেই একবাক্যে অণিমার এই ধরনের অন্যায় জিদের

নিন্দা করতে লাগল: আরে, আগে পেটের ভাত জোগাড় কর্ তবে তো মাথা গোঁজার জায়গা!

রিজিয়া রোদে বসে মেয়ের গায়ে তেল মালিশ করতে করতে বলে, জান মা, কালকে অণিমাকে দেখলাম, সেজেগুজে কোথায় যেন বেরুচ্ছে।—তারপর মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে হেসে বলে, আহা, সাজের কি ছিরি, কানের পাশে এক খাবলা পাউডার লেগে রয়েছে, এদিকে আবার কপাল চুঁইয়ে তেল গড়াচ্ছে, মনে হচ্ছিল যেন—

পাড়ার নতুন ভাড়াটে প্রফেসরের রূপসী বউ বিশেষণটা হাতের কাছে জুগিয়ে দেয়: যেন শিঙ্গি মাছে কেউ ছাই মাখিয়েছে।

উচ্ছ্বসিত হাসিতে খিলখিল করে সকলেই এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে: শুনেছিলাম হাসপাতালে নাকি নার্সের চাকরি পেয়েছে?

সঠিক খবর দিল বুলুর মা: অণিমা টিকে দিয়ে বেড়ায়। ও নিজে ঠিক দেয় না, টিকাদারবাবুর সঙ্গে থেকে লোকের হাতে স্পিরিট ঘষে। চৌধুরীসাহেবই নাকি শেষ পর্যন্ত মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের মিটিংয়ে কথাটা তুলে অণিমাকে ভ্যাক্সিনেশন অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

কথাটা শুনে অল্পবয়সী কুমারী মেয়েদের দল একটু শিউরে ওঠে যেন—অণিমাদি অজানা অচেনা পুরুষ-মানুষের হাত ধরে! হাত শক্ত করে ধরে স্পিরিট ঘষতে লজ্জা করে না একটুও! ছবিটা মনে মনে কল্পনা করে রঙিন সিল্কের শাড়ির নীচে তাদের নরম ফোলা ফোলা হাতের তালু ঘেমে ওঠে। এ ওর মুখের দিকে আড়চোখে তাকায়, তারপর ফিক্ করে হেসে ফেলে ছুটে পালিয়ে যায় ওখান থেকে।

বড়দের আসরে প্রফেসর-গিন্নী মুখ টিপে হেসে বলে, অণিমা যদি হাত জাপটেও ধরে তো কোন পুরুষের মন টলবে না।

* * *

বসন্তের হাওয়াটা মোলায়েম হলেও রোগটা তেমন নয়। শহরের দক্ষিণ দিকটাতে মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে বসন্ত। টিকাদারবাবুর কাজ বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। ব্যস্তসমস্তভাবে হাতবাক্সটা নিয়ে শহরের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে লোকটা। পিছনে দেখা যাবে স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া জুতো ঘষতে ঘষতে স্পিরিটের বোতল আর তুলোর প্যাকেট হাতে অণিমা চলেছে। তেল-তেলে ঘামে আর পরিশ্রমে মুখের রঙটা বেগুনী হয়ে উঠেছে, বাঁ দিকের চোখের মণিটি নিষ্প্রভ সাদা।

এরই মধ্যে একদিন সকালে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হৈচৈ কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল। ছোট বোন লুকু বাবরী দুলিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলে গেল, ছোড়দা, দেখবে এসো অণিমাদি টিকে দিতে এসেছে। বাবা চায়ের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করছিলেন, কিন্তু মুখে গাম্ভীর্য টেনে বললেন, যাও অঞ্জন, হাতমুখ ধুয়ে টিকেটা নিয়েই নাও—সময়টা খুব খারাপ।—তারপর অণিমাকে লক্ষ্য করে নীচু গলায় অনুকম্পা মিশিয়ে বললেন, পুওর গার্ল।

শার্টের আস্তিন গুটিয়ে সুপুষ্ট বাঁ হাতটা এগিয়ে দিতে অণিমা যেন সাগ্রহে হাতটা আঁকড়ে তুলে ধরল একেবারে ওর প্রায় বুকের কাছে। মাকড়শার ঠ্যাংয়ের মত সরু সরু আঙুলে পেঁচিয়ে ধরেছে হাতটা। এতক্ষণের কৌতুককর ব্যাপারটা মা, ছোট পিসীমার কাছে এখন যেন বেশ দৃষ্টিকটু লাগল, গম্ভীরমুখে তাঁরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বউদি মুচকি হাসি গোপন করতে ঘুরে দাঁড়াল।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিয়ে যেন অণিমা হাতে স্পিরিট ঘষে। ওর এই বিশ্রী স্বভাবটা নাকি অনেকেরই চোখে পড়েছে।

সেদিন ক্লাবঘরের আড্ডায় কথাটা উঠল। শম্ভু নতুন বিয়ে করেছে, আমাদের অনেক কিছু না-জানা জগতের খবর ওর নখদর্পণে। সিগারেটে দীর্ঘ টান মেরে ও বিজ্ঞ ভাবে বলে, এটা হচ্ছে এক ধরনের রিপ্রেসড্ প্যাশন। বাইরে থেকে ওদের ফ্রিজিড বলে মনে হলেও মনে মনে ওরা ভয়ঙ্কর হয়, বুঝলি। আমরা মাথা নেড়ে সায় দিই,

এক ঝলকে
সবার
চোখে...

অণিমাদের মত মেয়েদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক এটা। কিন্তু মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

*　　　*　　　*

ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে এল। প্রীতিভোজ, হৈচৈ আর নিটোল আনন্দের ভিতর দিয়ে দিনগুলো কী করে যে কেটে গেল টেরই পাই নি। মাঝখানে অণিমাদের নিয়ে একটা হৈচৈ উঠেছিল। ভৈরবকাকা মারা গেছেন, গোল বাধল শ্মশানে যাওয়া নিয়ে। আমরা চক্ষুলজ্জার খাতিরে দু-একজন এগিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু বাবা-মা সকলেই ঘোর আপত্তি তুললেন—ঝাঁকে ঝাঁকে লোক মরছে বসন্তে, এ সময় রিস্ক নেওয়া ঠিক নয়। শেষে রিফিউজী কলোনির কয়েকটি ছেলে খবর পেয়ে এগিয়ে এসেছে।

যাবার আগের দিন আকস্মিকভাবে আবার অণিমাকে দেখলুম। জেঠিনের বউদির ছেলে হয়েছে—খবরটা জন্মরেজেস্ট্রী অফিসে দিতে গিয়েছিলাম। ভ্যাক্সিনেশন-ওয়ার্ডে বারান্দার ছায়ায় চেয়ার-টেবিল পাতা। স্পিরিট-ভেজানো তুলো-হাতে অণিমা একা লোচন কুশারীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে।

জীবনে বোধ হয় এই প্রথম অণিমার সম্বন্ধে একটু কৌতূহল বোধ করে এগিয়ে গেলাম। লোচন কুশারীর নামের সঙ্গে একটা প্রীতি-মেশানো অস্বস্তি জড়িয়ে আছে এই মফস্বল শহরের সকলের মনে। এখানকার শ্মশানের ঘাটবাবু। ভাঙা কলমটা কালিতে ডুবিয়ে খসখস করে মৃত্যুর পরোয়ানা সই করে মোটা খেরো-বাঁধানো খাতায় সযত্নে মৃতের নাম-ধাম-বিবরণ টুকে রাখে, কাঠ ওজনের সময় শ্যেন-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে ওজনের কাঁটা, যাতে একখানা কাঠও পর্যন্ত না বেশী যায়, এমন কি শোনা যায়, মৃতের খাটের তোশক-বালিশ নিয়ে পর্যন্ত নাকি মুদ্দফরাশদের সঙ্গে জঘন্যভাবে ঝগড়া করে। তিনকুলে কেউ নেই, শ্মশানেই থাকে খায়, শহরের দিকে বড় একটা আসে না। লোচন কুশারীর চেহারাটা আরও ভীতিপ্রদ। চল্লিশোর্ধ্ব বয়স, তার উপর থুতনি থেকে ডান দিকের গালের চোয়াল পর্যন্ত একটা বীভৎস পোড়া দাগ, ক্ষত শুকিয়ে যাবার পরেও জায়গাটা কাঁচা শ্বেতী রোগের মত দগদগ করছে। ভ্রূর নীচে কোঁচকানো চামড়া ঝুলে পড়েছে গলিত মাংসস্তূপের মত। দেখে মনে হয় লোচন কুশারী সদ্য সদ্য চিতার আগুনে ঝলসে উঠে এসেছে আধপোড়া হয়ে। লোকে বলে মাঝরাত্রে শ্মশানের নিভন্ত চিতাগুলির আশেপাশে কী যেন খুঁজে বেড়ায় লোচন কুশারী। এহেন লোককে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে সকলেই।

একা একা অমন একটা জায়গায় থাকেন, অসুখ-বিসুখ হলে মুখে জল দেবার লোকটা পর্যন্ত নেই। আগে থেকে সাবধান হওয়াটা ভাল নয় কি?—অণিমার গলা সমবেদনায় আর্দ্র শোনায়।

বিস্মিতভাবে চোখ তোলে লোচন কুশারী। বিশ্বাসহীন দৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে কী যেন খোঁজে অণিমার মুখে। অনেক দিন—অনেক দিন পর যেন কোন এক ভুলে-যাওয়া সুরের তন্ত্রীতে ঘা পড়ল। ঠাণ্ডা মেথিলেটেড স্পিরিট শুকিয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কেবল কোমল সুষমায় উষ্ণ একটা শীর্ণ হাতের স্পর্শে লোচন কুশারীর ভারী দেহটা কেঁপে উঠল একবার।

চোরের মত নিঃশব্দে পা টিপে টিপে সরে এলাম ওখান থেকে। দূরে শিমুল গাছটার দিকে নজর পড়ল, রক্তিম আগুনের শিখার মত টুকটুকে লাল থোকা থোকা ফুলগুলি দমকা হাওয়ায় কাঁপছে।

●

হুজুগ ও যুগ

[৩৮২ পৃষ্ঠার পর]

উক্ত ছয়টি দফা ছাড়াও অন্ততঃ আরও শতাধিক দৃষ্টান্ত আমার হাতেই আছে, কিন্তু শান্তি-আন্দোলন যে হুজুগ ছাড়া আর কিছু নয় তা ইতিমধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে। তবু যদি কোনও নাছোড়বান্দা এতেও সন্তুষ্ট হতে না চান, তবে তাঁকে আমি বলতে বাধ্য হব যে মানুষ কোনদিনই শান্তি চায় নি এবং শান্তি চাওয়াটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। প্রমাণস্বরূপ ইতিহাস তুলে ধরব, যা থেকে দেখা যাবে যে গত সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছে, এবং যতই সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে বড় বড় যুদ্ধগুলোর মধ্যে ব্যবধানকালও ততই কমে আসছে। যথা :

(১)	প্রুসিয়ান যুদ্ধ	১৮৬৪	হতাহত	ত্রিশ লক্ষ
(২)	প্রথম মহাসমর	১৯১৪	„	ষাট লক্ষ
(৩)	দ্বিতীয় „	১৯৪০	„	দুই কোটি
(৪)	কোরিয়া যুদ্ধ	১৯৫২	„	কুড়ি লক্ষ

এ ছাড়া তো প্রথম ও দ্বিতীয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে বহুশত ছোটখাটো যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল এবং আজও চলেছে।

১৯২০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত এই সকল প্রধান প্রধান হুজুগগুলির বিষয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে পূর্ণিমা অমাবস্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়মগুলির মত এগুলিও কেমন সুন্দর এক ছান্দসিক নিয়মে চলেছে। পূর্ণিমা-অমাবস্যা আমরা ভুলি না, রেখে দিই দেওয়াল-পঞ্জীতে, শুধু হুজুগগুলির কথাই ভুলে যাই। কিন্তু ভোলে না মহাকাল। জাতির ভাবধারাকে ইচ্ছামত গড়ে-পিটে ইতিহাসে আনে পরিবর্তন, আঁকে ওঠা-নামার আলপনা।

সমস্যা জাগে মানুষের কর্মফলে। মানুষ কর্ম করে প্রচলিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী। শিক্ষার ধারা বয়ে চলে যুগোপযোগী সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুযায়ী, এবং সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তারই সঙ্গে তাল রেখে। আজকাল আবার প্রশ্ন উঠেছে—শিক্ষা অনুযায়ী সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, কিংবা সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী শিক্ষার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। বিষয়টি গুরুতর, এবং এ বিষয়ে আলোচনা বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক। শুধু এইটুকু নিরাপদে বলা চলে যে প্রথমটি নিঃসংশয়ে মঙ্গলজনক, এবং দ্বিতীয়টির বিষয়ে বলবার সময় আসে নি এখনও।

এ বিষয়ে কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, শিক্ষা সমাজ ও রাষ্ট্রের লক্ষ্য মানুষের আত্যন্তিক সুখ বিধান করা, এবং ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে গত সাড়ে তিন হাজার বছরের মধ্যে পৃথিবীর কোন দেশই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে নি। আরণ্যক যুগে মানুষ যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছে সত্য, কিন্তু আজ এই যান্ত্রিক যুগে সে তার চেয়ে বেশী সুখ পাচ্ছে না—তার প্রমাণ দিচ্ছে করোনারী থ্রম্বোসিস্। সেই পুরনো পাথরের যুগে যে সমস্যা ছিল, আজ মহাশূন্য-জয়যাত্রা-যুগেও সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সমস্যা উদ্ধত ভঙ্গীতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—"সুখ নাই স্বস্তি নাই কোথাও ছিটে-ফোঁটা।" কেন এমন হয়? এই অতৃপ্তির, এই পরাজয়ের গ্লানি ভোলবার উপায় কি? এই হুজুগগুলির মর্মই বা কি?

অ্যারিস্টটল্ বললেন, মানুষের মত এমন সুন্দর তেজীয়ান, তুরীয়ান ও বলীয়ান প্রাণী তুচ্ছ সুখভোগের জন্য সৃষ্ট হয় নি। হয়েছে কাজ করবার জন্য। কর্মে তার আগমন, কর্মেই তার বিসর্জন। সেই অবধি পাশ্চাত্ত্য জগৎ কাজ নিয়েই মেতে রইল। কাজই যখন অবলম্বন, তখন শিক্ষা এবং সমাজ-ব্যবস্থাও তদুপযোগী হওয়া প্রয়োজন। তাই এল হাজার কিসিম্‌কা ইজ্‌মের হুজুগ। ইজ্‌ম্ দিয়ে কাজ বাড়ানো যায়, ভোগ্য-সামগ্রীও বাড়ানো যায়, কিন্তু প্রাণের ক্ষুধা মেটানো যায় না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, কাজ কমিয়ে ছুটি বাড়ানো হোক।

কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতা যতই উন্নততর হবে মানুষের শ্রমের উপর তার দাবিও ততই বেড়ে যাবে। বিজ্ঞান যতই নির্ভুলতর হবে, মানুষের বুদ্ধি যতই বাড়তে থাকবে, এবং কূটনীতিকের প্রচারকার্য যতই নিখুঁত হতে থাকবে, মানুষের নিজস্ব গণ্ডির স্বরূপটাও ততই বদলে যেতে থাকবে। সেদিন রাম তার নিজের জন্য চিন্তা করবে না, সীতার জন্য তো নয়ই, কার জন্য যে সে সদা ব্যস্ত থাকবে তা সে নিজেই জানবে না। বালজাক তাঁর উপন্যাসে এই অবস্থাটা বেশ সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়িকা যখন কাঁদছে, স্বামী তখন বলছে—"শোন শোন, তোমার চোখের জলে কি-কি আছে আমি বিশ্লেষণ করেছি, ওতে আছে খানিকটা phosphate of lime, কিছু chloride of soda, খানিকটা mucus আর বাকীটা জল।"

কর্মব্যস্ত বৈজ্ঞানিক স্বামীর কাছে তাঁর স্ত্রীর চোখের জলের দাম ওইটুকুই, তার বেশী নয়। স্বামী যেদিন তাঁর স্ত্রীর চোখের জলকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই করবেন সেই সুদিনকে মানুষের ভাগ্যে বিলম্বিত বা ত্বরান্বিত করবার দায়িত্ব উত্তর-পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে চলবে না। আমাদেরই তা ঠিক করতে হবে। মস্তিষ্কে বুদ্ধির পরিমাণ বেড়ে গেলেই কি মানুষ উন্মাদ হয়?

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি। তাঁর ভাষার স্বাভাবিক জলদমন্দ্র রুদ্র-মাধুর্য ও অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীর ভয়াবহ গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য অনুবাদ না করে সেটুকু উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করা গেল না। তিনি বলেছিলেন :—

"It is one of the evils of your Western Civilisation, that you are after intellectual education alone, and there is no safeguard with it. There is one mistake made; you give this education but you take no care of the heart. *It only makes you ten times more selfish and that will be your destruction.*"

এ কথা জানতে আজ বাকী নেই কারও, দ্রষ্টা ব্রহ্মবিদের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে।

হুজুগের ঝোঁকে আমরা কেবলই ভুলে যাই বিজ্ঞান আমরা চাই কেন? তথাকথিত সুখ বিধানের জন্যই তো! কিন্তু কপালদোষে "উল্টা সমঝ্‌লি রাম" হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভগীরথের মত বহু দুঃখ সহ্য করে বহু সাধনায় সভ্যতার বুকে খাল কাটলুম যেজন্য, সেই বিজ্ঞান-স্রোত এল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু সেই সঙ্গে দেখছি এসে গেছে প্রকাণ্ড এক কুমীর। আজ বিজ্ঞান-সিঞ্চিত উর্বরা সভ্যতা-ভূমিতে বাস করে কুমীরের ভক্ষ্য হব, কিংবা পালিয়ে যাব হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে এই সমস্যায় ইতিমধ্যে অনেক সুসভ্য পরিবার বিষ খেয়ে মরেছে।

কবি দার্শনিকশ্রেষ্ঠ টেনিসনের একটা কবিতায় আমাদের অবস্থার যে করুণ প্রতিচ্ছবি ফুটেছে তা সকলের পড়া দরকার—

"—Science moves, but slowly, creeping on from point to point,
Slowly comes a hungry people, as lion creeping nigher.
Glares at one that nods and winks behind a slowly dying fire.

• • •

Knowledge comes but wisdom lingers and I linger on the shore,
And the individual withers, and the world is more and more."

Knowledge and Wisdom—জ্ঞান ও বিদ্যা। জ্ঞান—জানা। বিদ্যা—সেই জানাটাকে আমার শরীর ও মনের অঙ্গীভূত করে নেওয়া। কে না জানে বর্ণ-বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ এবং গায়ের জোর প্রভৃতি নীতি আজকের যুগে অচল। কিন্তু সেই জ্ঞানকে কোনদিন অন্তরে-বাহিরে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি কি? যদি না করে থাকি, তবে দোহাই আপনাদের—ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক, আর হুজুগে মাতাবেন না।

সংবাদ-সাহিত্য

[৩৬০ পৃষ্ঠার পর]

ভাষায় বহু চীনা ও ভারতীয় শব্দ ঢুকিয়াছে, লিপি চীনা এবং বর্ণমালা ভারতীয়—তাহাতে আমাদের লজ্জা নাই। এই ঋণ আমাদিগকে এক করিয়াছে, সমৃদ্ধ করিয়াছে এই কারণে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রশ্ন করিলাম, বর্ণমালা ভারতীয় মানে? জবাব পাইলাম, এগারো শো বছর আগে এক ভারতীয় অর্হৎ আমাদিগকে স্বর-ব্যঞ্জন বর্ণমালার ক্রম শিখাইয়াছিলেন, সেই ক্রমই আমরা অনুসরণ করিতেছি। ভারতীয় ভাষা? যে গৃহাচ্ছাদন টাইল সর্বদা আমাদের মাথা রক্ষা করে তাহাকে আমরা খাওওরা বলি—ভারতীয় খাপরা শব্দেরই জাপানী রূপ উহা। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষের এক হওয়ার সব চাইতে বড় বাধা ভাষা ও লিপির পার্থক্য। ইহা যেদিন এক হইবে সেদিন ভারতবর্ষের বহু সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, ভারতবর্ষ শক্তিশালী হইবে। কিন্তু তাহা হউক বা না হউক বর্তমানে প্রচলিত ভাষাতেই শিক্ষার বিস্তার চাই—৯৯.৯ না হউক শতকরা আশি জন শিক্ষিত হওয়া চাই।

গত কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে বাধার সৃষ্টি করিতেছেন। পরীক্ষা পাসের হার একদিকে মারাত্মকরকম কমাইয়া ফেলা হইতেছে অন্যদিকে অকৃতকার্য ছাত্রদের কোনও কলেজে স্থান নাই। যে কলেজে ছয়শত ছাত্র ফেল হইয়াছে সে কলেজে মাত্র ত্রিশজনকে পুনঃপ্রবেশের অধিকার দেওয়া হইতেছে। ইচ্ছা করিয়া প্রথম শ্রেণীর অনার্স দেওয়া বন্ধ করিয়া সর্বভারতীয় চাকুরিতে বাঙালীর ছেলের স্বার্থহানি ঘটানো হইতেছে। সমপর্যায়ের ছাত্ররা অন্যপ্রদেশে কর্তৃপক্ষের উদারতায় প্রথম শ্রেণীর ছাপ পাইয়া চাকুরিতে সুবিধা করিয়া লইতেছে। এই আত্মঘাত মোটেই প্রশংসনীয় নয়। বাংলাদেশের অলিতেগলিতে ইউনিভার্সিটির উপর ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হইয়া করদাতাদের অর্থের শ্রাদ্ধ হইতেছে অথচ বৎসরে বৎসরে হাজার হাজার ছাত্র কলেজে ঢুকিতে না পারিয়া চলন্ত ট্রেনের তলায় ঢুকিতে চাহিতেছে। ইস্কুলে স্যামুয়েল টেলর কোলরীজের 'রাইম অব দি এনসিয়েন্ট মেরিনারে' একজন নাবিকের হাহাকারে শুনিয়াছিলাম—"ওয়াটার ওয়াটার এভ্‌রি-হোয়ার নট এ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক।" বাঙালীর ছেলেদেরও অনুরূপ দুর্দশায় ফেলা হইতেছে। ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি এভ্‌রিহোয়ার, নট এ সীট টু সিট। ফেল করাইলেই ছাত্ররা ফেল হয়, পাস করাইলে শিক্ষার ধারাটা অব্যাহত থাকিয়া শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং জাপানী ভদ্রলোকের মত এই যে, শিক্ষিতের হার বাড়িলেই দেশের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

ফরিয়াদী

নরহত্যা, খুনখারাপি, লুঠতরাজ, খাণ্ডবদাহন এবং নারীধর্ষণ ইত্যাদি সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও ব্যাপকভাবে করিয়া যাহারা আসামীশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে—যাহাদের উপরে এই সব অমানুষিক বর্বরতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, ফরিয়াদীস্বরূপ তাহারা—তাহাদের অর্থাৎ ওই আসামীদের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিয়াছে উচ্চতম বিচারকের দরবারে। আসামী-ফরিয়াদী উভয় দলের চরম শাসন-ব্যবস্থা এই দরবারেরই হাতে সংবিধান বলে অর্পিত ছিল। যদি এ কথা সত্য হয় এই রাহাজানির সংবাদ পূর্বাহ্ণে পাওয়া সত্ত্বেও ইহা নিবারণের কোন চেষ্টাই উচ্চতম কর্তৃপক্ষ করেন নাই তাহা হইলে তাঁহাদের বিচারও পক্ষপাতদুষ্ট হইতে বাধ্য। পূর্বপ্রদত্ত প্রশ্রয়-পাপকে ঢাকিবার জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ছলের অভাব কখনই হয় না। যথাযথ বিচারে সন্দেহ করিয়াই ফরিয়াদী পক্ষ আতঙ্কিত হইয়াছে। তাহারা নিরুপায়, অসহায়, কাজেই অসহায়ের অবলম্বনীয় একমাত্র পথ পলায়ন করিতে করিতে ক্রন্দন-চীৎকারে দিঙ্‌মণ্ডল মুখর করিতে বাধ্য হইতেছে। মাত্র চৌদ্দ বৎসর পূর্বের ভয়াবহ স্মৃতি তাহাদিগকে আরও ভয়াতুর করিয়া তুলিয়াছে। উচ্চতম কর্তারা যদি অপক্ষপাত বিচারের দ্বারা হতাশাক্লিষ্ট মানুষের মনে আশ্বাস ও সাহস সঞ্চার করিতে না পারেন তাহা হইলে বর্তমান উদ্বাস্তু-সমস্যা দ্বিগুণিত হইয়া দেশের সংহতি সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন করিবে। যে চক্রান্তের ফলে এমন কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে সে চক্রান্তে উচ্চ নীচ ও আসামী ফরিয়াদী যাঁহারাই থাকুন তাঁহাদিগকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না করিলে পাপের মূলোচ্ছেদ হইবে না এবং ভয়ার্তের ভয় কখনই দূর হইবে না। কিন্তু আসামীর হাতে যতকাল পাপানুষ্ঠান-ক্ষেত্রের কর্তৃত্ব ও শাসনভার থাকিবে ততকাল ন্যায়বিচারের চেষ্টা বিড়ম্বনায় পর্যবসিত হইবেই। এই কারণেই আমরা সাময়িক ভাবে শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি জানাইতেছি। আর একটা কারণ ১৯৬১ সনের আদমশুমারি। সংখ্যাগুরুকে সংখ্যালঘু করিবার জন্য যাহারা নৃশংস অত্যাচারে কুণ্ঠিত নয়, আদমশুমারির দপ্তর তাহাদের তাঁবে থাকিলে হয় নয় হইতে

কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতা যতই উন্নততর হবে মানুষের শ্রমের উপর তার দাবিও ততই বেড়ে যাবে। বিজ্ঞান যতই নির্ভুলতর হবে, মানুষের বুদ্ধি যতই বাড়তে থাকবে, এবং কূটনীতিকের প্রচারকার্য যতই নিখুঁত হতে থাকবে, মানুষের নিজস্ব গণ্ডির স্বরূপটাও ততই বদলে যেতে থাকবে। সেদিন রাম তার নিজের জন্য চিন্তা করবে না, সীতার জন্য তো নয়ই, কার জন্য যে সে সদা ব্যস্ত থাকবে তা সে নিজেই জানবে না। বালজাক তাঁর উপন্যাসে এই অবস্থাটা বেশ সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়িকা যখন কাঁদছে, স্বামী তখন বলছে—"শোন শোন, তোমার চোখের জলে কি-কি আছে আমি বিশ্লেষণ করেছি, ওতে আছে খানিকটা phosphate of lime, কিছু chloride of soda, খানিকটা mucus আর বাকীটা জল।"

কর্মব্যস্ত বৈজ্ঞানিক স্বামীর কাছে তাঁর স্ত্রীর চোখের জলের দাম ওইটুকুই, তার বেশী নয়। স্বামী যেদিন তাঁর স্ত্রীর চোখের জলকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই করবেন সেই সুদিনকে মানুষের ভাগ্যে বিলম্বিত বা ত্বরান্বিত করবার দায়িত্ব উত্তর-পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে চলবে না। আমাদেরই তা ঠিক করতে হবে। মস্তিষ্কে বুদ্ধির পরিমাণ বেড়ে গেলেই কি মানুষ উন্মাদ হয়?

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি। তাঁর ভাষার স্বাভাবিক জলদমন্দ্র রুদ্র-মাধুর্য ও অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীর ভয়াবহ গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য অনুবাদ না করে সেটুকু উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করা গেল না। তিনি বলেছিলেন :—

"It is one of the evils of your Western Civilisation, that you are after intellectual education alone, and there is no safeguard with it. There is one mistake made; you give this education but you take no care of the heart. *It only makes you ten times more selfish and that will be your destruction.*"

এ কথা জানতে আজ বাকী নেই কারও, দ্রষ্টা ব্রহ্মবিদের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে।

হুজুগের ঝোঁকে আমরা কেবলই ভুলে যাই বিজ্ঞান আমরা চাই কেন? তথাকথিত সুখ বিধানের জন্যই তো! কিন্তু কপালদোষে "উল্টা সমঝ্‌লি রাম" হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভগীরথের মত বহু দুঃখ সহ্য করে বহু সাধনায় সভ্যতার বুকে খাল কাটলুম যেজন্য, সেই বিজ্ঞান-স্রোত এল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু সেই সঙ্গে দেখছি এসে গেছে প্রকাণ্ড এক কুমীর। আজ বিজ্ঞান-সিক্তিত উর্বরা সভ্যতা-ভূমিতে বাস করে কুমীরের ভক্ষ্য হব, কিংবা পালিয়ে যাব হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে এই সমস্যায় ইতিমধ্যে অনেক সুসভ্য পরিবার বিষ খেয়ে মরেছে।

কবি দার্শনিকশ্রেষ্ঠ টেনিসনের একটা কবিতায় আমাদের অবস্থার যে করুণ প্রতিচ্ছবি ফুটেছে তা সকলের পড়া দরকার—

"—Science moves, but slowly, creeping on from point to point,
Slowly comes a hungry people, as lion creeping nigher.
Glares at one that nods and winks behind a slowly dying fire.

•   •   •

Knowledge comes but wisdom lingers and I linger on the shore,
And the individual withers, and the world is more and more."

Knowledge and Wisdom—জ্ঞান ও বিদ্যা। জ্ঞান—জানা। বিদ্যা—সেই জানাটাকে আমার শরীর ও মনের অঙ্গীভূত করে নেওয়া। কে না জানে বর্ণ-বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ এবং গায়ের জোর প্রভৃতি নীতি আজকের যুগে অচল। কিন্তু সেই জ্ঞানকে কোনদিন অন্তরে-বাহিরে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি কি? যদি না করে থাকি, তবে দোহাই আপনাদের—ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক, আর হুজুগে মাতাবেন না।

সংবাদ-সাহিত্য

[৩৬০ পৃষ্ঠার পর]

ভাষায় বহু চীনা ও ভারতীয় শব্দ ঢুকিয়াছে, লিপি চীনা এবং বর্ণমালা ভারতীয়—তাহাতে আমাদের লজ্জা নাই। এই ঋণ আমাদিগকে এক করিয়াছে, সমৃদ্ধ করিয়াছে এই কারণে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রশ্ন করিলাম, বর্ণমালা ভারতীয় মানে? জবাব পাইলাম, এগারো শো বছর আগে এক ভারতীয় অর্হৎ আমাদিগকে স্বর-ব্যঞ্জন বর্ণমালার ক্রম শিখাইয়াছিলেন, সেই ক্রমই আমরা অনুসরণ করিতেছি। ভারতীয় ভাষা? যে গৃহাচ্ছাদন টাইল সর্বদা আমাদের মাথা রক্ষা করে তাহাকে আমরা খাওয়রা বলি—ভারতীয় খাপরা শব্দেরই জাপানী রূপ উহা। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষের এক হওয়ার সব চাইতে বড় বাধা ভাষা ও লিপির পার্থক্য। ইহা যেদিন এক হইবে সেদিন ভারতবর্ষের বহু সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, ভারতবর্ষ শক্তিশালী হইবে। কিন্তু তাহা হউক বা না হউক বর্তমানে প্রচলিত ভাষাতেই শিক্ষার বিস্তার চাই—৯৯.৯ না হউক শতকরা আশি জন শিক্ষিত হওয়া চাই।

গত কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে বাধার সৃষ্টি করিতেছেন। পরীক্ষা পাসের হার একদিকে মারাত্মকরকম কমাইয়া ফেলা হইতেছে অন্যদিকে অকৃতকার্য ছাত্রদের কোনও কলেজে স্থান নাই। যে কলেজে ছয়শত ছাত্র ফেল হইয়াছে সে কলেজে মাত্র ত্রিশজনকে পুনঃপ্রবেশের অধিকার দেওয়া হইতেছে। ইচ্ছা করিয়া প্রথম শ্রেণীর অনার্স দেওয়া বন্ধ করিয়া সর্বভারতীয় চাকুরিতে বাঙালীর ছেলের স্বার্থহানি ঘটানো হইতেছে। সমপর্যায়ের ছাত্ররা অন্যপ্রদেশে কর্তৃপক্ষের উদারতায় প্রথম শ্রেণীর ছাপ পাইয়া চাকুরিতে সুবিধা করিয়া লইতেছে। এই আত্মঘাত মোটেই প্রশংসনীয় নয়। বাংলাদেশের অলিতেগলিতে ইউনিভার্সিটির উপর ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হইয়া করদাতাদের অর্থের শ্রাদ্ধ হইতেছে অথচ বৎসরে বৎসরে হাজার হাজার ছাত্র কলেজে ঢুকিতে না পারিয়া চলন্ত ট্রেনের তলায় ঢুকিতে চাহিতেছে। ইস্কুলে স্যামুয়েল টেলর কোলরীজের 'রাইম অব দি এনসিয়েণ্ট মেরিনারে' একজন নাবিকের হাহাকারে শুনিয়াছিলাম—"ওয়াটার ওয়াটার এভ্‌রি-হোয়ার নট এ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক।" বাঙালীর ছেলেদেরও অনুরূপ দুর্দশায় ফেলা হইতেছে। ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি এভ্‌রিহোয়ার, নট এ সীট টু সিট। ফেল করাইলেই ছাত্ররা ফেল হয়, পাস করাইলে শিক্ষার ধারাটা অব্যাহত থাকিয়া শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং জাপানী ভদ্রলোকের মত এই যে, শিক্ষিতের হার বাড়িলেই দেশের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

ফরিয়াদী

নরহত্যা, খুনখারাপি, লুঠতরাজ, খাণ্ডবদাহন এবং নারীধর্ষণ ইত্যাদি সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও ব্যাপকভাবে করিয়া যাহারা আসামীশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে—যাহাদের উপরে এই সব অমানুষিক বর্বরতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, ফরিয়াদীস্বরূপ তাহারা—তাহাদের অর্থাৎ ওই আসামীদের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিয়াছে উচ্চতম বিচারকের দরবারে। আসামী-ফরিয়াদী উভয় দলের চরম শাসন-ব্যবস্থা এই দরবারেরই হাতে সংবিধান বলে অর্পিত ছিল। যদি এ কথা সত্য হয় এই রাহাজানির সংবাদ পূর্বাহ্নে পাওয়া সত্ত্বেও ইহা নিবারণের কোন চেষ্টাই উচ্চতম কর্তৃপক্ষ করেন নাই তাহা হইলে তাঁহাদের বিচারও পক্ষপাতদুষ্ট হইতে বাধ্য। পূর্বপ্রদত্ত প্রশ্রয়-পাপকে ঢাকিবার জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ছলের অভাব কখনই হয় না। যথাযথ বিচারে সন্দেহ করিয়াই ফরিয়াদী পক্ষ আতঙ্কিত হইয়াছে। তাহারা নিরুপায়, অসহায়, কাজেই অসহায়ের অবলম্বনীয় একমাত্র পথ পলায়ন করিতে করিতে ক্রন্দন-চীৎকারে দিঙ্‌মণ্ডল মুখর করিতে বাধ্য হইতেছে। মাত্র চৌদ্দ বৎসর পূর্বের ভয়াবহ স্মৃতি তাহাদিগকে আরও ভয়াতুর করিয়া তুলিয়াছে। উচ্চতম কর্তারা যদি অপক্ষপাত বিচারের দ্বারা হতাশাক্লিষ্ট মানুষের মনে আশ্বাস ও সাহস সঞ্চার করিতে না পারেন তাহা হইলে বর্তমান উদ্বাস্তু-সমস্যা দ্বিগুণিত হইয়া দেশের সংহতি সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন করিবে। যে চক্রান্তের ফলে এমন কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে সে চক্রান্তে উচ্চ নীচ ও আসামী ফরিয়াদী যাঁহারাই থাকুন তাঁহাদিগকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না করিলে পাপের মূলোচ্ছেদ হইবে না এবং ভয়ার্তের ভয় কখনই দূর হইবে না। কিন্তু আসামীর হাতে যতকাল পাপানুষ্ঠান-ক্ষেত্রের কর্তৃত্ব ও শাসনভার থাকিবে ততকাল ন্যায়বিচারের চেষ্টা বিড়ম্বনায় পর্যবসিত হইবেই। এই কারণেই আমরা সাময়িক ভাবে শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি জানাইতেছি। আর একটা কারণ ১৯৬১ সনের আদমশুমারি। সংখ্যাগুরুকে সংখ্যালঘু করিবার জন্য যাহারা নৃশংস অত্যাচারে কুণ্ঠিত নয়, আদমশুমারির দপ্তর তাহাদের তাঁবে থাকিলে হয় নয় হইতে

বুড়োদের দলের একটি ছেলে—নাম কান্তি, প্রথম থেকেই সে সুরজিতের সঙ্গে আলাপ করেছে। ফিসফিস করে সে বলে, আমাদের পার্ট বলানো হবে সেই স্টেজ-রিহার্সালের দিন। প্রথম দু-চার নাইট স্টেজে ঢুকে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব বুঝতে না পেরে রোজই বকুনি খাব বড় অ্যাক্টারদের কাছে।

সুরজিৎ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, তা হলে নাটক নামবে কি করে?

ওই তো মজা। প্রদীপদা হয়তো বলবে, কান্তি এগিয়ে যা। যেই আমি এগোব, রসময়দা শার্ট ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারবে—দেখো বলছি। আমাদের অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত।

প্রদীপবাবুরা কি কোনদিনই পার্ট বলবেন না?

কান্তি কোঁচাটা ঠিক করতে করতে বলে, বলবে হয়তো দু-একদিন যদি কর্তারা ভাল টিফিনের ব্যবস্থা করেন। তা অবশ্য খুব যে সিরিয়াসলি বলবে তা নয়, বেশীর ভাগই হাসি-ঠাট্টা করে সময় কাটাবে।

সুরজিৎ চিন্তিত স্বরে বলে, আগে তো এরকম ছিল না।

তা বলতে পারি না মশাই, তবে বছর দশেক এ লাইনে ঘোরাঘুরি করছি, রিহার্সালের অবস্থা সব জায়গাতেই এইরকম। বড় আর্টিস্টরা সব স্টেজে মারবেন যে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাব আমরা।

প্রদীপ মুখার্জী বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। সুরজিতের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাত নেড়ে কাছে ডাকে। একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় নি, তবে জানি আপনিই নাট্যকার। আমার পার্টটা পেয়েছি, পড়েছি, ভাল লেগেছে। কিন্তু পুরো নাটকটা তো এখনও পড়ি নি, রিহার্সালও দেখি নি, তাই জিজ্ঞেস করছি শেষ পর্যন্ত কি আমার মা মারা যাবেন?

সুরজিৎ ছোট্ট উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

ওঁকে কাশী পাঠিয়ে দিলে পারতেন।

কেন?

দেখতেন, মেয়েরা কি রকম নিত—রোজ লেডিজ ফুল যেত।

কোন উত্তর না দিয়ে সুরজিৎ হাসতে থাকে।

প্রদীপ মুখার্জী সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বেশ নিশ্চিন্ত গলায় বলে, আমার ডায়ালগ কিছু বদলাতে হবে—সে আপনাকে বিরক্ত করব না, আমি নিজেই লিখে নিচ্ছি। আপনার ভাবটা ঠিকই থাকবে, শুধু অভিনয় করার জন্যে একটু সুবিধে করে নেওয়া।

সুরজিৎ ভয় পেয়ে বলে, খুব বেশী বদলাবেন না, বরং আমাকে যদি একবার দেখিয়ে নেন—

হা হা শব্দ করে প্রাণ খুলে হাসে প্রদীপ মুখার্জী। আরে মশাই, আমাকে কোন ভয় নেই, আমি কখনও রামকে শ্যাম বানাই না। দেখবেন ওই রসময়টা কি করে। নিরেট মুখ্যু তো। একবার ভাঁড়ামি করতে শুরু করলে আর কিছুতেই থামবে না। আপনার বইটাকে পুরোপুরি মার খাইয়ে তবে ও ছাড়বে।

ঘরের ভেতর থেকে রতিবাবু ডেকে পাঠালেন বলে প্রদীপ মুখার্জী চলে যেতে যেতে খাদের পর্দায় গলা নামিয়ে বলে যায়, রসময়ের অনেক কীর্তি আপনাকে পরে বলব—ও একটি চীজ।

তখনও সুরজিতের হাতের সিগারেটটা শেষ হয় নি। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছে অ্যামেচার থিয়েটারের দর্শকরা ইন্টারভ্যালে বেরিয়ে ভিড় করেছে। এমন সময় পেছন থেকে কে ডাকল, সুরজিৎবাবু—

আর কেউ নয় রসময় ঘোষ। সুরজিৎ মুখ ফেরাতেই ভদ্রলোক চোখ গোল গোল করে হাসেন: কেমন লাগছে প্রফেশ্যনাল থিয়েটার?

সুরজিৎ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে: ভালই।

কেন মিথ্যে কথা বলছেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি থিয়েটারের হালচাল দেখে আপনি রীতিমত হতাশ হয়েছেন। হবারই কথা, যতগুলো ভ্যাগাবণ্ড আর লোফার এসে জুটেছে, মা সরস্বতীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে কি হলেন—না, স্টেজ-আর্টিস্ট।

বিস্মিত সুরজিৎ চোখ তুলে তাকায়।

রসময় জিভ দিয়ে নীচের ঠোঁট চাটে : ওই যে প্রদীপ মুখার্জী—রুবী থিয়েটারের গ্রেট হিরো। একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন না, একখানা সেক্সপীয়রের বই পড়েছে কিংবা বার্নার্ড শ ? তা হলেই বিদ্যে বেরিয়ে পড়বে। অত কথা কি, গিরীশচন্দ্রের 'আনন্দ রহ' কি 'মায়াতরু'র নাম শুনেছে ও ? জানে, কবে প্রথম বাংলা থিয়েটার শুরু হল ? আরে মশাই, এ একটা মুখ্যুর ডিপো, আপনার মত লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক তো কারুর সঙ্গে কথাই বলতে পারবেন না।

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে সুরজিৎ জিজ্ঞেস করে, পার্ট পছন্দ হয়েছে আপনার ?

সেই কথাই তো বলতে এলাম। কড়া লিখেছেন মশাই। হাসতে হাসতে লোকের পেটে খিল ধরে যাবে। আমাকে কিছুই করতে হবে না শুধু মাঝে-মধ্যে একটু নুন আর মরিচ ছড়াতে হবে। অল্লদিন্দর হাসির চাটনি। বুঝলেন না ?

সুরজিৎ সাহস করে জিজ্ঞেস করে, আমার ডায়ালগগুলো থাকবে তো ?

রসময়ের চোখ সন্দেহে ছোট হয়ে আসে : কে আমার নামে লাগিয়েছে শুনি. নিশ্চয় ওই প্রদীপটা। কানের কাছে ফিসফিস করছিল তখনই বুঝেছি। ওকেই একটু নজরে রাখবেন মশাই, পাড় মাতাল। কোন্‌দিন যে কি বলবে সীনে তার কোন ঠিক নেই, ভেরি ডেঞ্জারাস ম্যান।

এদের কথাবার্তা শুনলে সত্যিই সুরজিতের আশ্চর্য লাগে। পরনিন্দা আর পরচর্চাই এখানে প্রধান আলোচনার বিষয়। অন্যের ভালটা সহজে কেউ দেখতে পায় না। পাঁচজন একত্র হয়ে প্রাণখোলা হাসি হেসে এরা যখন গল্প করে, সুরজিৎ বোঝে সেটা এদের অভিনয়। আসল স্বরূপ ধরা পড়ে সন্ধ্যার অন্তরালে, নির্জন ঘরের আড়ালে একলা যখন কথা বলার সুযোগ পায়। তাদের মধ্যে ফুটে ওঠে মীরজাফরের ছবি, শোনা যায় ইয়াগোর কণ্ঠস্বর, চোখে তাদের কুচক্রী ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টি। প্রদীপ মুখার্জী, রসময় ঘোষের মতই অন্য অভিনেতারাও সুরজিৎকে একান্তে ডেকে অন্যদের কাছ থেকে সাবধান হতে বলে, রমেন চৌধুরী কানে কানে উপদেশ দেয়, স্টেজ-ম্যানেজার মুকুলবাবু পুরনো সেট সীনের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে অন্যদের মুণ্ডপাত করে।

এসব দেখে সুরজিতের মনে পড়ে যায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশায়ের কথা, যা হয়তো বইয়ে পড়বার সময় তার অদ্ভুত লেগেছিল। পাবলিক থিয়েটারে প্রবেশেচ্ছু কোন নবীন নাট্যকারকে তিনি বলেছিলেন—কাউকে বিশ্বাস করেছ কি ঠকেছ—থিয়েটার এমনি জায়গা।

এ কথা বলছেন কেন ?

বলছি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে।

কিন্তু আপনারা শিল্পী, আপনাদের শিল্পচর্চার জগৎ।

হ্যাঁ, আমরা শিল্পী। তবে কি জানেন, শিল্পচর্চার জগতে অনেক কিছুই পাওয়া যায়, পাওয়া যায় না শুধু শিল্পীমন ও বস্তুটি এখানে একান্ত দুর্লভ।

এ কথাগুলো যে কতখানি সত্যি তা কদিন মাত্র এই থিয়েটারের আঙিনায় ঢুকে সুরজিৎ জলের মত বুঝতে পেরেছে। যে মন্দিরা গুহ বলতে গেলে একরকম অগ্রণী হয়ে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সে পর্যন্ত সুবিধে পেলেই বাঁকা ভাষায় কথা বলে, শুনলাম, শুভ্রাকে আপনিই পছন্দ করে নিয়েছেন—

সুরজিৎ আপত্তি তোলে : আমি কেন নেব।

মন্দিরা হাসে : বাজারে গুজব শুনলাম, তাই বলছি শুভ্রা নাকি আজকাল আপনার বাড়িতেও যাচ্ছে।

একদিন গিয়েছিল বটে রমেনবাবুর সঙ্গে।

কি জানি ওর মধ্যে কি গুণ দেখেছেন আপনি—বয়সটা কম, চেহারায় চটক আছে, ওইটুকুই যা। এ পর্যন্ত একটা পার্টও ঠিকমত করতে পারে না।

সে কি, আমি যে শুনলাম—

মন্দিরা গুহর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে : কে বলেছে, ওই রমেন চৌধুরী তো ? শুভ্রাদের বাড়িতে কি ওর ক' দিনের যাতায়াত !

কথা ঘোরাবার জন্যে সুরজিৎ ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করে, নাটক কিরকম দাঁড়াবে মনে হচ্ছে ?

বলা খুব শক্ত।

কেন?

রতিদার তো মাথা খারাপ, বাসুদেবকে অতবড় একটা পার্ট দিয়েছেন, ও কি আর টানতে পারবে? তার ওপর আপনার শুভা। ওই দুটো পার্টই না মার খায়।

রিহার্সালে কিন্তু সুরজিতের ভাল লেগেছে এ দুজনের পার্ট, এরা অন্ততঃ মন দিয়ে অভিনয় করার চেষ্টা করেছে। মঞ্চ-অভিজ্ঞতা বেশীদিনের নয় বলেই বোধ হয় উৎসাহটা এখনও বেশী। তবে মন্দিরার সামনে এ কথা বলার ইচ্ছে হল না সুরজিতের।

মন্দিরা কিন্তু থামে না: ওই বাসুদেব, দেখছেন তো কিচ্ছু পারে না, কিন্তু চেহারাটা ভাল। দেখবেন একদিন ওরও নাম হবে। এখন থেকেই ফিল্মে চান্স পাচ্ছে—কদিন বাদেই নায়ক, হাজার হাজার টাকা রোজগার।

মন্দিরা নিজের মনেই কি যেন ভাবে। বোধ হয় মনে পড়ে যায় অতীতের কথা। অন্যমনস্ক স্বরে বলে, ওকে যত দেখি ততই মনে হয় তপনের কথা—আপনাদের তপনকুমার, চিত্রজগতের একচ্ছত্র সম্রাট। একদিন আমার সঙ্গেই থিয়েটার করত। লোকে বলত রাঙামুলো, পার্ট করতে পারত না দেখে সবাই হাসত, কিন্তু মনটা ভাল ছিল। আমি নিজে ওকে শেখাতাম। কতদিন দুপুরবেলা ওই নীচের গ্রীনরুমে বসে বসে অভিনয় শিখিয়েছি, অথচ আজ সে কোথায়, আর আমি কোথায়!

মন্দিরার শেষের কথাগুলো বড় করুণ শোনায়। সুরজিতের সাহিত্যিক মন জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে: ওর সঙ্গে আজকাল দেখা হয়?

হয়। এত ওপরে উঠে গিয়েও তপন সেই থিয়েটারের দিনগুলো ভোলে নি। আসে, গল্প করে, দুঃখের কথা বলে, সাহায্যও করতে চায়। কিন্তু কি করবে বেচারা, ছবিতে যে আমার চেহারাটা কিছুতেই ভাল আসে না।

কথাগুলো বলে নিজেই জোর করে হাসে। বলে, এসব কথা ভাববার কোন মানে হয় না, আপনিও হয়তো একদিন নাম-করা নাট্যকার হবেন, তখনও আমি এই থিয়েটারেরই মেয়ে।

উত্তর দেবার কিছু ছিল না, সুরজিৎ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। হঠাৎ একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে বলে, আপনি যে বলেছিলেন আমায় নটগুরুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন, তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন।

মন্দিরা এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। গলা পরিষ্কার করে বলে, বাবাকে বলে রেখেছি, উনি আপনাকে নিয়ে যাবেন। বাবা ওদের সঙ্গে থিয়েটার করতেন তো। তাই বাবার সঙ্গে যোগসূত্রটা এখনও আছে। আসুন না একদিন আমাদের বাড়ি।

যাব একদিন।

আগে থেকে কিন্তু আমায় বলে রাখবেন, বাবাকে সামলে রাখতে হবে।

তার মানে?

পুরনো দিনের লোক, নেশা করলে মাথার ঠিক থাকে না।

এ ধরনের কথা কোন মেয়ের মুখে শুনলে অনেকেই অবাক হয়, সুরজিৎও হল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে মন্দিরা কৌতুক বোধ করে: এখানকার সবকিছুই আপনার নতুন লাগছে, না? মাঝে মাঝে এমন অবাক হয়ে তাকান, দেখলে মনে হয় একেবারে ছেলেমানুষ, আমার ভারি হাসি পায়।

মন্দিরা খিলখিল করে হাসে।

সুরজিৎ তার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকে, সত্যি আশ্চর্যময়ী এই মন্দিরা গুহ।

টিমেতেতালায় নতুন নাটকের রিহার্সাল চলছিল একরকম ভাবে। তা দেখে সুরজিৎ খুব বেশী উৎসাহিত না হলেও আর সবাই ভাবছিল শেষ পর্যন্ত নাটক ভালই দাঁড়াবে। কিন্তু বিপদ এল কদিন বাদে।

ফোন এল সুরজিতের অফিসে—সে যেন দুপুরের মধ্যে হৃষীবাবুর সঙ্গে দেখা করে, বিশেষ দরকার।

প্রথমটা এ খবরের গুরুত্ব বুঝতে না পারলেও হৃষীবাবুর সঙ্গে দেখা হবার পর সুরজিৎ সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়ল। রুবী থিয়েটারের অফিস-ঘরে চুপচাপ বসে রয়েছেন

হৃষীকেশবাবু। গম্ভীর মুখ, গভীর চিন্তামগ্ন। অস্থির স্বরে বললেন, কদিন থেকেই রতিবাবু বলছিলেন তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, কিন্তু হঠাৎ যে এ রকম বেয়াড়া অসুখে পড়ে যাবেন ভাবতে পারি নি। কাল আসেন নি দেখে আমি নিজেই গিয়েছিলাম। একশো চার-পাঁচ জ্বর, মাথার যন্ত্রণা। সাতদিন বাদে নাটক খুলবে, কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না।

সুরজিৎ আস্তে আস্তে বলে, তা হলে বরং উদ্বোধনের দিন পেছিয়ে দিন।

তা কি করে সম্ভব—পয়লা বৈশাখ একটা শুভদিন! ইতিমধ্যে কাগজে পোস্টারে পয়লা বৈশাখ বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, পেছিয়ে দিলে তো চলবে না।

সুরজিৎ চুপ করে থাকে, কি বলবে ভেবে পায় না।

হৃষীবাবু আবার বলেন, আপনি একবার বরং রতিবাবুর বাড়ি যান, দেখুন এখন কেমন আছেন। আজকের মধ্যে যা হোক একটা ডিসিশান আমাদের নিতে হবে।

সুরজিৎ উঠে পড়ে: এখুনি যাব?

ঘুরে আসুন, আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।

সুরজিতের কাঁধের ওপর হাত রেখে হৃষীকেশবাবু জোর দিয়ে বলেন, মনে রাখবেন পয়লা বৈশাখ আমাদের নাটক খুলতেই হবে—যে রকম করে হোক।

সারা রাস্তাই সুরজিৎ ভাবতে ভাবতে গেছে কবী থিয়েটার থেকে রতীন ঘোষালের বাড়ি পর্যন্ত, কি করে সে বিপদের মুশকিল-আসান করবে। হাতে আর মাত্র সাতদিন সময়, তার মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠে নতুন নাটক মঞ্চস্থ করা রতিবাবুর পক্ষে অসম্ভব।

বাইরের ঘরেই তক্তাপোশের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল রতীন ঘোষাল। আগের চেয়ে জ্বর একটু কমেছে, কিন্তু শরীরে অস্বস্তি খুব, উঠে বসলেই মাথা ঘোরে। সুরজিৎকে দেখে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন, হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন কাছে বসবার জন্যে।

সুরজিৎ রতিবাবুর বিছানায় গিয়ে বসে, মাথা নীচু করে ওঁর কথা শোনে।

রতীন ঘোষাল বিড়বিড় করে বলেন, বড় বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে ব্রাদার। এ নিশ্চয় জাপানি ফ্লু, বেশ কিছুদিন ভোগাবে।

হৃষীবাবুর কাছে শুনেই আমি আসছি।

উনি সকালে এসেছিলেন, তখন খুব জ্বর। কথাই বলতে পারি নি।

উনি খুব ব্যস্ত হয়েছেন পয়লা বৈশাখ কি করে নাটক নামবে তাই ভেবে।

রতীন ঘোষাল একটু চুপ করে থেকে বলেন, কেন? ভাবনার কি আছে? আমি যেতে না পারলে তুমি পরিচালনা করবে।

সুরজিৎ একেবারে আকাশ থেকে পড়ে: আমি!

কেন, পারবে না? তুমি তো এই নাটকই অফিসে সবাইকে শিখিয়েছ।

তা শিখিয়েছি, কিন্তু এরা সব প্রফেশ্যনাল আর্টিস্ট, আমার কথা কি শুনবে?

নিশ্চয় শুনবে। না শুনলে হৃষীকেশবাবু শোনাবেন। তুমি আমার নাম করে বলো, সবাই রাজী হবে।

তবু যেন সুরজিৎ মনে জোর পায় না। বলে, আমি কি পারব এই সাতদিনের মধ্যে নতুন বই তৈরি করাতে।

রতীন ঘোষাল শুকনো হাসেন: সাতদিন কম সময় নয় সুরজিৎ। অনেক বছর আগের কথা, স্টার থিয়েটারে নামল দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ', অভিনয় করছেন অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, নরীসুন্দরীর মত নাম করা শিল্পী। তারিখটা বোধ হয় ৬ই শ্রাবণ, ১৩১২ সাল। নাটক জমল, কিন্তু দ্বিজুবাবুর সঙ্গে স্টারের মনোমালিন্য হল, সে যে কোন কারণেই হোক। দ্বিজুবাবু এসে মিনার্ভা থিয়েটারকে বললেন, 'রাণা প্রতাপ' এখানেও নামাতে হবে। পাল্লা দিয়ে অভিনয় করে দেখাতে হবে স্টারের চেয়ে মিনার্ভার অভিনয় ভাল। মিনার্ভায় পরিচালনা করলেন স্বয়ং গিরীশচন্দ্র, অভিনয় করলেন দানীবাবু, মুস্তাফী সাহেব, তারাসুন্দরী আরও অনেকে। সে নাটকও নেমেছিল মাত্র সাতদিনের মধ্যে।

সুরজিৎ মাথা নীচু করে বলে, সে অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল, কারণ পরিচালক ছিলেন স্বয়ং গিরীশচন্দ্র।

তাঁরই কথা স্মরণ করে কাজে নেমে যাও। আশীর্বাদ করছি তুমি জয়যুক্ত হবে।

রতীন ঘোষালের গলা কাঁপল। অভিজ্ঞ পরিচালকের আন্তরিক আশীর্বাদ।

সুরজিৎ প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

শুরু হল তার নতুন জীবন। শুধু নাট্যকার নয়—পরিচালক সুরজিৎ সেনগুপ্ত।

[ক্রমশ]

রম্যাণি বীক্ষ্য

মধ্যভারত পর্ব ॥ শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী ॥

দুই

আমরা অনেকটা সময় পেয়েছি। ওয়েটিং-রুমে স্নান করে চা খেয়েছি। টিকিট নিয়েছি পালটে। ভোর সাড়ে ছটায় নেমে পৌনে এগারোটা পর্যন্ত অবসর। বাইরে বেরিয়ে শহরটাও দেখে নেওয়া যেত, কিন্তু মিনতির অনুরোধে অভিমন্যুর সঙ্গে খেয়ে নিতে হল। মৌ বিকেলে পৌঁছয়। তার আগে কোন খাবার জায়গা নেই। মিনতি বলল: হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই।

বিরূপাক্ষ বললেন: ঠিক কথা। কাল হয়তো কিছুই জুটবে না।

খেয়েদেয়ে আমরা ছোট লাইনের গাড়িতে চাপলুম।

এদিকের রেলপথের কোন ধারণা আমার ছিল না। গাড়িতে বসে টাইমটেবলের মানচিত্র দেখে মোটামুটি একটু বোঝা গেল। বোম্বে থেকে দিল্লীর দুটো পথ আছে। পশ্চিম-রেলের পথ সুরত বরোদা রতলাম হয়ে দিল্লী গেছে আর মধ্য-রেলের পথ নাসিক খাণ্ডোয়া ভূপাল ঝাঁসি আগ্রা হয়ে দিল্লী পৌঁছেছে। এই দুটো পথ মিলেছে মথুরায় এসে। এদের যোগাযোগ আছে তিন জায়গায়—জলগাঁও থেকে সুরত, ভূপাল থেকে নাগ্‌দা, আর বিনা থেকে কোটা। উজ্জয়িনী নাগ্‌দার কাছে ভূপালের পথে। বড় লাইনের স্টেশন। খাণ্ডোয়ার ছোট লাইন এসে এখানে মিলেছে, রতলামের দিকেও গেছে একটা ছোট লাইন। অভিমন্যুর বাবা বললেন: আমরা মৌয়ে নামব। ইন্দোরে নামলেও চলে। ইন্দোর থেকে মাণ্ডুর বাস মৌ আর ধার হয়ে যায়।

তারপরে নিশ্চয়ই উজ্জয়িনী!

সেখান থেকে ভূপাল সাঁচি ও ভিল্‌সা। বিদিশার নাম এখন ভিল্‌সা।

আমরা আর কী দেখব?

ঝাঁসি আর খাজুরাহো।

অভিমন্যুর বাবার মেজাজ রাতের মত অপ্রসন্ন নয়। বললেন: মিনতির মিনতিতে এই কেলেঙ্কারি করলাম।

কিসের কেলেঙ্কারি!

ভদ্রলোক বললেন: সোজা পথে ঘরে না ফিরে বাঁকা পথে এই ঘুরপাক খাওয়া কেলেঙ্কারি নয়! তবু রক্ষা যে রেলের পাসে যাচ্ছি। পাস হাতে নিয়ে ইঞ্জিনের মত আগে-পিছে যাবার উপায় নেই। আপনাদের মত টিকিট-কাটা যাত্রী হলে নাগপুর ঘুরে যেতে হত।

আপনি তা হলে রেলের লোক?

খাঁটি রেলের। আপিসে বসে ফাইল ঘাঁটি নে, বিল পাস করি নে। সারাদিন রেল নিয়েই কারবার। পাণ্ডব-বর্জিত দেশে আমি স্টেশন-মাস্টার। তেরজন লোকের ইষ্টিশনে ছোটবাবু। আমার অনুমতি পেলে ট্রেন আসে, ট্রেন যায়। মেল ট্রেন থাকলে তাকেও আমার অনুমতি নিয়ে যাওয়া-আসা করতে হত। আমার নাম বিরূপাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। আসুন, একটা সিগারেট ধরান।

বলে পকেট থেকে তাঁর সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন।

আমি হাত গুটিয়ে বললুম: ধন্যবাদ, আমি সিগারেট খাই নে।

সেকি!

মিনতিও আশ্চর্য হয়েছেন দেখলুম।

কালকের কথা ভাবছেন তো, কাল অন্যমনস্কভাবে নিয়ে ফেলেছিলুম।

বিরূপাক্ষ বললেন: ভাল। এ আমার নামে সিগারেট, কাজে বিড়ির গোত্র। মিনতি আমাকে শৌখিনতা শেখাচ্ছে।

প্যাকেটটা লক্ষ্য করে বললুম: ও তো আজকাল উঁচুতলার জিনিস। বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা আজকাল ওই ব্র্যাণ্ড খাচ্ছেন। সোনার কেস থেকে তাঁরা বার করেন।

বলেন কি!

কিন্তু আমাদের বেসরকারী অফিসে তত চলে না। আমাদের সাহেবরা ব্র্যাণ্ড দেখাবার জন্যে কৌটো হাতে রাখেন।

বিরূপাক্ষ তাঁর সিগারেট ধরালেন। কড়া তামাকের গন্ধ। মিনতি বললেন: যাই বল, এ তোমার বিড়ির চেয়ে ঢের ভাল। বিড়ির গন্ধে আমার বমি আসে।

অভিমন্যু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। হঠাৎ বলে উঠল: আমিও সিগারেট খাব মা!

আমি কৌতুক বোধ করলেও হাসবার সাহস পেলুম না। বিরূপাক্ষর মেজাজকে আমার ভয় ছিল। কিন্তু এখন তাঁকে একেবারে স্বতন্ত্র মানুষ বলে মনে হল। বললেন: বাপকে বেটা হবে।

মিনতি বললেন: আপনার বাড়িতে সবাই ভাববেন তো?

প্রশ্ন শুনে আমি হাসলুম।

বিরূপাক্ষ বললেন: তোমার সঙ্গে পোস্টকার্ড আছে তো, একখানা বার করে দিয়ো।

আমাকে বললেন: খাওয়ায় ফেললেই ভাল হত। মৌয়ে নেমে গাড়িতেই ফেলে দেব।

মিনতি তখুনি তাঁর বাক্স থেকে পোস্টকার্ড বার করবেন ভাবছিলেন। বাধা দিয়ে বললুম: দরকার নেই।

সেকি, বাড়িতে একটা খবর দেবেন না?

বাড়ি থাকলে তো খবর দেব?

আমি এই তরুণ দম্পতির চোখে গভীর অবিশ্বাস দেখলুম। বাড়ি নেই এমন লোকও এদেশে আছে!

হেসে বললুম: উত্তরপাড়ার একখানা ভাড়াটে ভাঙা ঘরে আমার একার সংসার। দেশের বাড়িতে আমার শেষ আত্মীয়ের শেষ নিশ্বাস পড়েছে, বিদেশের ঘরে নতুন আত্মীয় আনবার ভরসা আজও পাই নি।

মিনতি বললেন: বিয়ে করেন নি বুঝি?

বিরূপাক্ষ বললেন: ভাল করেছেন।

অভিমন্যু অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল, বলল: কে তোমাকে খেতে দেয়?

কেউ না।

কেউ না!

অভিমন্যু যেন মর্মাহত হল। একটা লোক রোজ না খেয়ে থাকে!

প্রশ্ন করলুম: তুমি আমাকে খেতে দেবে?

একটু ভেবে অভিমন্যু বলল: তুমি আমাদের কাছে কেন থাক না, তা হলে তো মা তোমাকে খেতে দিতে পারে।

মিনতি বললেন: মামীমা এসে তোমার মামাকে খেতে দেবেন। হাঁ ভাই, আপনার নামটা কী!

গোপাল।

বিরূপাক্ষ বললেন: চমৎকার নাম।

কেন?

প্রথম ভাগ পড়তে পড়তেই নাম লেখা যায়, আমার নাম আমি এখনও ভুল লিখি।

মিনতি হেসে বললেন: ভুল লেখার ভয়ে উনি 'বি. বি' লেখেন।

বিরূপাক্ষ বললেন: সাহেব নই বলেই বিবির প্রতি একটু দুর্বলতা।

মনে হল, এসব তাঁদের পুরনো রসিকতার কথা।

পুরনো জিনিস উপভোগের মত আবেগশূন্য। আমি কিছু বলতে গিয়েও মিনতির দৃষ্টিতে উদ্বেগ দেখে থেমে গেলুম। উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। অভিমন্যু আর বসে থাকতে না পেরে গাড়ির ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দরজা বন্ধ। চলতি গাড়িতে টাল সামলাতে না পারলে মারাত্মক কিছু ঘটবে না। মিনতি তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

অভিমন্যু একজন যাত্রীর জিনিসপত্র পরীক্ষা করছিল। বিরূপাক্ষ ডাকলেন: খোকা।

অভিমন্যু মুখ ফিরিয়ে হাসল। ভাবখানা এই রকম যে তোমরা অকারণে ব্যস্ত হচ্ছ। প্রথম পদক্ষেপ মানুষ আশঙ্কার চোখে দেখে। অথচ এই পদক্ষেপের প্রেরণা গেলেই পৃথিবীর যাত্রা যাবে বন্ধ হয়ে। মনের আবেগ যখন পায়ে সঞ্চারিত হয়, মানুষ তখন চলে। কে জানে, এই চলা কবে শুরু হয়েছিল। চলার ইতিহাস বলার ইতিহাসের চেয়েও পুরনো। লেখার ইতিহাসে এসব কথা লেখা নেই। খানিকটা অনুমান আছে মাত্র। সেই অনুমান দিয়ে আমরা প্রাগৈতিহাসিক ঘটনাকে স্বপ্নময় করে রেখেছি।

একদা এই বিরাট দেশে আর্ট-সভ্যতার পদক্ষেপ হয়েছিল আজকের অভিমন্যুর মত টলমল। দূরে দাঁড়িয়ে আদিম সভ্যতা তাকে সশঙ্ক পিতামাতার মত প্রত্যক্ষ করেছে। পৃথিবীর জন্মের যেমন হিসাব নেই, তেমনি নেই সভ্যতার জন্মের হিসাব। মহাভারতের কাল আমরা নির্ণয় করেছি, পারি নি রামায়ণের কাল নির্ণয় করতে। পুরাণের হিসাবে তার বয়স তের লক্ষ এক হাজার বছর। বিদেশীরা পুরাণ মানে না। খ্রীষ্টের জন্মের তারিখ দিয়ে তারা ইতিহাস রচনা করেছে। সে ইতিহাস মাত্র কয়েক হাজার বছরের। এই গোলার্ধে তখন তিনটি নদীর উপত্যকায় সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। সিন্ধু নীল আর ইউফ্রেতিস। মেম্ফিস মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা তার সাক্ষী দিচ্ছে। মাটি খুঁড়ে নগরের ধ্বংসাবশেষ না পেলে বিদেশীরা বোধ হয় এ কথাও অস্বীকার করত। তারা দাবি করে, এ দেশের সভ্যতা এসেছে ভোলগার উপত্যকা থেকে। ইংরেজ যেমন করে ভারত উদ্ধারে এসেছে, পাদরিরা ঘুরে বেড়িয়েছে হিদেনদের মুক্তির জন্যে, তেমনি করেই নাকি ভোলগার মানুষ এদেশে এসেছে সভ্যতার মশাল হাতে। আসুক, এখানে সে তর্ক নয়। ভারতে আর্য-সভ্যতার উন্মেষ হয়েছে খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বছর আগে। প্রথমে পঞ্চনদে, তারপর ব্রহ্মবর্তে, গঙ্গা যমুনার উপত্যকায় হয়েছে তৃতীয় অবস্থায়। ধীরে ধীরে সভ্যতা এল সুরাষ্ট্র আর অবন্তীতে। উজ্জ্বল হল উজ্জয়িনী আর বিদিশা। সেও খ্রীষ্টের জন্মের সাত-আটশো বছর আগের ঘটনা। সাতপুরার দক্ষিণে বিদর্ভে ছিল অনার্য অধিকার। দণ্ডকারণ্যেও। বিংশ শতাব্দীর প্রখর আলো আজও এই অরণ্য ভেদ করে নি। এবারে বুঝি করবে।

অতীতের বিস্মৃত ইতিহাসে এ অঞ্চলের একটা ঐতিহ্য ছিল। শুধু ইতিহাসে কেন, রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের যুগেও এই ঐতিহ্য ছিল ভারতবিশ্রুত। স্কন্দপুরাণে অবন্তীর উল্লেখ আছে ভারতের সাতটি মোক্ষদায়িকা জনপদের সঙ্গে:

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

অবন্তী উজ্জয়িনী মালব বোধ হয় একই স্থানের ভিন্ন নাম। যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। একদা নাকি অবন্তী ছিল মালব রাজ্যের রাজধানী! কেউ বলেন, অবন্তীই রাজ্যের নাম, উজ্জয়িনী তার রাজধানী। প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনায় শুধু সংশয় বাড়ে, প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। ঋক্ সংহিতায় অবন্তীর উল্লেখ নেই, আছে সূত্রগ্রন্থে। তখন এ দেশে যাদের বাস ছিল তারা নামে মানুষ হলেও ঠিক মানুষের মত ছিল না। তারা ছিল একটা মিশ্র জাতি। বেদের আর্যরা সহস্রাধিক বৎসর ধরে এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছেন।

রামায়ণে অবন্তীর নাম আছে। সীতার অন্বেষণে সুগ্রীব বিন্ধ্যাশ্রিত অবন্তীতেও বানর পাঠিয়েছিলেন। মহাভারতে সঞ্জয় অবন্তীর নামোল্লেখ করেছেন। উজ্জয়িনী নামও পাওয়া যায়। কিন্তু মালব রাজ্য বলেছেন

দক্ষিণ-ভারতে। পুরাণের কত স্থানে অবন্তী উজ্জয়িনীর নাম আছে জানা নেই। তবে স্থানে স্থানে যে আছে তা জানা গেছে। মৎস্যপুরাণে বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসী জনপদের তালিকায় অবন্তীর নাম পাওয়া গেছে। অবন্তী নগরে মঙ্গল গ্রহের জন্ম হয়েছিল। বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়, কৃষ্ণ বলরাম অস্ত্রশিক্ষার জন্য অবন্তী নগরে এসেছিলেন সন্দীপনি মুনির নিকট।

অবন্তীর পরিচয় আছে বৌদ্ধশাস্ত্রেও। সিংহলের মহাবংশে আছে, সম্রাট বিন্দুসার তাঁর পুত্র অশোককে উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বৌদ্ধ-সমৃদ্ধি কী করে গড়ে ওঠে, সে ইতিবৃত্ত আমাদের জানা নেই। তবে সমৃদ্ধির সংবাদ প্রসারিত হয়েছিল সারা ভারতে। তাই চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন চাঙকে এদেশে আসতে হয়েছে। তখনও এখানে তিন-চারটি বিহার বিদ্যমান ছিল। শ-তিনেক বৌদ্ধ নাকি ধ্বংসের হাত থেকে সেই বিহারগুলিকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। পশ্চিমে মালবের রাজধানী ধারা নগর, পূবে মহেশ্বরপুর, উত্তরে মথুরা ও জজহোতি, এবং দক্ষিণে মাণ্ডুপুরার পর্বতমালা—এই ছিল সে যুগের উজ্জয়িনী রাজ্য। রাজা ব্রাহ্মণ। দেশে তাই হিন্দুধর্মের প্রাধান্য।

পাশ্চাত্য দেশের টলেমি ও পেরিপ্লাসের গ্রন্থেও উজ্জয়িনীর উল্লেখ আছে বিকৃত অবস্থায়। তাঁরা ওজিনি বলেছেন। হিউয়েন চাঙের মত উ-শে-এন-না বলেন নি।

বরাহ-মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় অবন্তীর সমৃদ্ধির পরিচয় আছে। সমাজের পরিচয় আছে শূদ্রকের নাটক মৃচ্ছকটিকে। ব্রাহ্মণ চারুদত্তের সঙ্গে বারবনিতা বসন্তসেনার প্রেমকে অবলম্বন করে কবি উজ্জয়িনীরই উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন। এ কাহিনী আধুনিককালের যে কোন কাহিনীর মত চমৎপ্রদ—চিরনূতন।

তারপর কালিদাসের মেঘদূত :

"প্রাপ্যাবন্তী-নুদয়নকথাকোবিদগ্রাম বৃদ্ধান্
পূর্বোদিষ্টমনুসরপুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিনাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্॥"

"সিন্ধুপারে অবন্তীপুর
যেথায় উদয়নের গান,
বৃহৎ-কথার গল্পে ভরা
গাঁয়ের পিতামহের প্রাণ!
উজ্জয়িনী নগর সেথা
শ্রীবিশালা শ্রেষ্ঠপুরী
মর্তলোকে খানিক যেন
করেছে কেউ স্বর্গ চুরি!
পুণ্যক্ষয়ে ত্রিদশ হতে
ধরায় এসে নামল যারা,
তাদের বাকি সুকাজটুকুর
ফল কি হেথায় আনলো তারা?"

তিন

বিরূপাক্ষ বললেন : রাতে একেবারেই ঘুম হয় নি তাই না?

মিনতি সরে বসে বললেন : একটু গড়িয়ে নেবেন?

আমি লজ্জা পেলুম। বসে বসেই আমি বুঝি ঘুমি পড়েছিলুম। তবে কি স্বপ্ন দেখছিলুম এতক্ষণ!

বিরূপাক্ষ বললেন : আজ রাতে আমরা ট্রেনে ঘুম মৌয়ে ভাল ওয়েটিং-রুম আছে।

ওয়েটিং-রুমে কেন?

এ তো বিলিতী ধর্মশালা। ছারপোকা নেই, তা বদলে ভাল বাথরুম আছে।

তা হলে ইন্দোরে যাওয়াই ভাল। সেখানকা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আরও ভাল হবে।

বিরূপাক্ষ বললেন : তা হলে অন্য বিপদ আছে স্থানাভাব হবে। আর বাসেও তেরো তেরো ছাব্বিশ মাইলের বেশী ভাড়া দিতে হবে। ইন্দোর থেকে যে বাস ছাড়ে, সে মৌ ধার হয়ে মাণ্ডু যায়।

দেখি।—বলে ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে টাইম-টেবলখানা চেয়ে নিলেন। বইয়ের শেষে মানচিত্র আছে। সেখানা খুলে আমাকে বোঝাতে বসলেন : এই হল মৌ বা মাউ। এখানে নেমে আমরা বাসে মাণ্ডু

একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সাতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সার্টটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সার্ট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তুপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্যকরী ও অফুরন্ত ফেণা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুনা না কেন...আজই!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP

যাব—পঞ্চান্ন মাইল পথ। সময় লাগবে প্রায় চার ঘণ্টা—ভাড়া দু টাকা ছ পয়সা। ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়াবে।

তারপর?

মিনতির দিকে চেয়ে বিরূপাক্ষ বললেন: তারপর মোগলাভ। যার জন্যে এত শ্রম, সে বস্তু মুঠোর ভেতর।

মিনতি লজ্জা পেয়েও পেলেন না। বললেন: ভোর-বেলায় আমাদের যাত্রা। শুনেছি, সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে পারলে সন্ধোবেলাতেই ফিরে আসা যায়।

আমি দেশে ফেরার কথা ভাবছিলুম। ঘুরে ঘুরে শরীর কত ক্লান্ত হয়েছে, এখন বোঝা যাচ্ছে না। মনটা ঝিমিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে। আমি তাঁর মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে বললুম: তারপর আমরা কোথায় যাব?

বিরূপাক্ষ বললেন: মৌ থেকে ইন্দোর যাবার অসংখ্য ট্রেন। তারই কয়েকখানা যায় উজ্জয়িনী। ইন্দোরে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আমরা উজ্জয়িনী যাব। সেখানে পুরো একটি দিন।

মিনতি বললেন: একটি সন্ধ্যাও কাটাব শিপ্রার তীরে। সম্ভব হলে রাত।

সুর করে বিরূপাক্ষ বললেন:

"দূরে বহু দূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদীপারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।"

মাঝখানেই মিনতি বলে উঠেছিলেন: থাক্ থাক্, তোমার কাব্য এখন থাক্।

আমি প্রশ্ন করলুম: আপনি কবিতা লেখেন বুঝি?

কবিতা বলি।

পরম কৌতুকভরে মিনতি বললেন: বলে দেব?

না বললেও বুঝতে পারলুম যে বিরূপাক্ষ কোন সময় কবিতা লিখেছেন, কিংবা এখনও লেখেন। এই প্রসঙ্গটি এড়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন: উজ্জয়িনী থেকে ভূপালের বড় লাইন দেখুন। ভূপাল থেকে ঝাঁসির গাড়ি ধরব। মাঝখানে সাঁচি আর ভিল্‌সা।

এ সব জায়গাতেই ওঠা-নামা আছে। পরিশ্রম আছে, সময়েরও দরকার। বিরূপাক্ষ বলে চললেন: ঝাঁসি থেকে হরপালপুর খাজুরাহোর জন্যে।

বললুম: মধ্যভারতের রাজধানী গোয়ালিয়র?

উপায় নেই। রেল কোম্পানির পাস আমাকে হরপালপুর থেকে মানিকপুর, সেখান থেকে এলাহাবাদ হয়ে দেশে নিয়ে যাবে। তা না হলেই গাঁটের কড়ি; গাঁট শূন্য।

আমার পকেটও ভর্তি নয়। যা সামান্য পুঁজি নিয়ে বেরিয়েছিলুম, খরচ করলে তা অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। মামা ঈগল পাখির মত আমার পকেট আগলেছেন। কোনখানে আমায় খরচ করতে দেন নি। কলকাতার টিকিটখানাও নিজে কেটে দিয়েছেন। বলেছিলেন, তোমাকে আমি ডেকে এনেছি, কলকাতা থেকে জয়পুরের ভাড়াটাও আমার দেওয়া দরকার।

হাত পেতে পয়সা নিতে আমি শিখি নি। শুধু মাইনের টাকা নিই গুনে গুনে। সেই টাকারই কিছু অবশিষ্ট আছে।

বিরূপাক্ষর হাত থেকে আমি টাইমটেবলটা নিলুম। মিনতি একখানা গাইড-বই বার করে দিলেন। নিবিষ্টমনে আমি সব মিলিয়ে নিতে লাগলুম। একসময় মনে হল, একটা দিন আমরা সংক্ষেপ করতে পারি। বিরূপাক্ষকে সেই কথা বলতেই তিনি উৎসাহ পেলেন, বললেন: সত্যি?

গাইড-বই খুলে তাঁকে বুঝিয়ে দিলুম: মৌ থেকে মাণ্ডু পঞ্চান্ন মাইল—ভাড়া দু টাকা ছ পয়সা আর ইন্দোর থেকে মাণ্ডু বাষট্টি মাইল—ভাড়া দু টাকা চার আনা। দশ পয়সায় একটা দিন বাঁচছে।

মিনতি একখানা বই পড়ছিলেন, আমার দিকে মুখ তুললেন।

বললুম: বিকেলে মৌ পৌঁছে কিছু করবার নেই। কিন্তু একটু এগিয়ে ইন্দোরে নামলে শহরটা আজই দেখা হয়ে যাবে। তারপর কাল মাণ্ডু, পরশু উজ্জয়িনী।

অত্যন্ত তৎপরভাবে বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট বার করে বললেন: ইচ্ছা করুন।

তাঁর কথায় ও কাজে আমি হাসলুম। মিনতিও হাসলেন। বিরূপাক্ষ নিজেই সিগারেট ধরালেন।

মিনতি আস্তে আস্তে বললেন: রেলের লোক কিনা—

কথাটা বিরূপাক্ষ লুফে নিলেন, বললেন: টাইমটেবল দেখা আর টিকিট কাটা, এ কাজ দুটো যাত্রীরাই ভাল পারে। আমার নিজের স্টেশনের সময় জিজ্ঞেস কর, সব মুখস্থ।

মিনতি বললেন: দেখুন তো ভাই গোপালবাবু, উজ্জয়িনীতে একটা রাত থাকা যায় কিনা?

টাইমটেবল আমার হাতেই ছিল। দেখে বললুম: অনায়াসে। মাণ্ডু থেকে ফিরে এসে ইন্দোরেই রাত কাটাব। উজ্জয়িনীর ট্রেন দেখছি সকাল পৌনে আটটায়। পৌঁছবে বেলা সাড়ে দশটায়। ভূপালের গাড়ি আমরা বিকেল সাড়ে ছটায় ধরব না। রাত দুটো দশে একটা ট্রেন ছাড়ে— উজ্জয়িনী থেকেই ছাড়ে। সকাল সাতটায় ভূপাল।

উজ্জ্বল চোখে মিনতি বললেন: দেখলে তো!

সহাস্যে বিরূপাক্ষ বললেন: এ তো চিরকালই দেখছি। আমি কেন, সবাই দেখছে। গাঁয়ের যোগী কোনদিন ভিখ পায় না।

একসময় আমরা নর্মদার পুল পেরিয়ে গেলুম। আরও কিছু পরে বিন্ধ্যের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছব। উঠব তার মালভূমির উপর। ভারতের মানচিত্রের দিকে চেয়ে চিরকাল আমার একটি বিস্ময় জেগেছে। এ অঞ্চলে দুটি পর্বতশ্রেণী পূর্ব থেকে পশ্চিমে সমান্তরাল ভাবে বিস্তৃত। বিন্ধ্য ও সাতপুরা। বিন্ধ্য উত্তরে, সাতপুরা দক্ষিণে। আর এই দুই শ্রেণীর দক্ষিণ প্রান্তে প্রবাহিত হচ্ছে দুটি বিখ্যাত নদী—নর্মদা ও তাপ্তি। বিন্ধ্যের দক্ষিণে নর্মদা, আর সাতপুরার দক্ষিণে তাপ্তি। বোম্বের পর পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অতিক্রম করে এসেছি। সাতপুরার নীচে দিয়ে রেলপথ। ভুসাবলের পর তাপ্তি পেরিয়ে আমরা মহাদেও পর্বতের দিকে যাই নি। উত্তরে এসেছি বিন্ধ্য পর্বতের দিকে। আর কিছুদূর এগিয়ে মধ্যভারতের মালভূমি শুরু হবে।

রাজস্থান ভ্রমণের সময় আরাবল্লীর পর্বতমালা দেখেছি। আবু থেকে আজমীর পর্যন্ত। জয়পুর আলোয়ারে কেন, দিল্লীতেও এই পাহাড়ের নমুনা দেখি। দিল্লীর রোমান্স তো আবু পাহাড়ে গিয়ে শেষ হল। শেষ কেন, নতুন রোমান্সেরও তো শুরু সেইখানে। এই তো কয়েকটা দিন আগের ঘটনা। পনরো-কুড়ি দিন আগে মিত্রা ও চারুলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। রানা আসে নি। মামীমা খুব আশা করেছিলেন রানা আসবে। চিতোর আর উদয়পুরে তিনি অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। রানা এসে আবু পাহাড়ে বসে থাকবে, এ ভাবি অন্যায় কথা। রানার সঙ্গে যে স্বাতির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

মামাকে বড় নির্বিকার বোধ হয়েছিল। রানা আসবে না, এ কথা তিনি বলেন নি। কিন্তু আসবে বলেও তাঁর ভরসা ছিল না। রানার বাবা মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর সহপাঠী বন্ধু। প্রেসিডেন্সী কলেজে একসঙ্গে পড়েছিলেন। সেইখানেই সম্বন্ধের শেষ। বি.এ. পাস করে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। ফিরেছিলেন সিভিলিয়ান হয়ে। মামা দেশে ফিরলেন বাপের জমিদারী দেখতে। বাংলার জমিদারদের সম্বন্ধে মিস্টার ব্যানার্জির মনোভাবের কথাও মামা বলেছিলেন, সম্পত্তি দেখছে, না অধঃপাতে গেছে! আশকারা দিয়ে গভর্মেণ্ট একগুষ্টি অপদার্থ পুষছে।

বলেছিলেন, তুমি জান না গোপাল। আমাদের প্রতি কত গভীর ঘৃণা ওরা বুকের ভেতর পুষে রেখেছে। যাদের চালচুলো ছিল না, আর যাদের প্রচুর ছিল, তাদের দু দলকেই ওরা ঘৃণা করে। সরকারী প্রতিপত্তিওয়ালা বন্ধুমহলে যা বলে, তাও জানি। সে সব নোংরা কথা আর নাই বা শুনলে।

শুনতে আমি চাই নি। আর সে সম্বন্ধে যা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। শুধু তাঁর মত আমার মনেও একটা প্রশ্ন জেগেছিল। তাঁর উপযুক্ত পুত্র রানা কেন স্বাতিকে বিয়ে করতে চাইল। সে কি তার বাপের কাছে এ যুগের শিক্ষা পায় নি, না তার

অন্তরের মর্যাদা দিয়েছে সকলের উর্ধ্বে! তাই যদি হবে তো আবু পাহাড়ে কেন এল না।

এল তার বোন মিত্রা, আর সেই পাঞ্জাবী যুবক চাওলা। মিত্রার কথা আমি ভুলব না। এমন স্পষ্টবাদী মেয়ে আমি বোধ হয় আজও দেখি নি। গোড়া থেকেই আমি এ কথা অনুভব করেছিলুম। সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাস করলুম সেইদিন, যেদিন ওখলায় আমার পাশে বসে বলল, চাওলাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে করব না। সে কথা আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছি।

মিত্রা আমাকে মামার বাড়ি থেকে তুলে এনেছিল, স্বাতিকে আনে নি। ইচ্ছে করেই আনে নি। যমুনার ধারে সেই ছায়াঘন শ্যামল পরিবেশে বসে বলেছিল, আপনার পোশাকী রূপটা দেখেছি। ইচ্ছে হল, আপনাকে একান্তে একবার দেখি।

বলেছিল, মানুষের দুটো রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট। একটা তার সমাজের কাছে—অভিনেতার মত সেটা তার বাইরের রূপ। আর একটা তার নিজস্ব—সেটা ভেজালহীন খাঁটি পরিচয়। আমার বিশ্বাস, মানুষের একটা তৃতীয় রূপ আছে। সেটা তার একান্তে কোন একজনের সামনে, যাকে সে—

একটা ঢোঁক গিলে বলেছিল, ভালবাসে।

মিত্রা তার বিশ্বাসের কথা আমায় বুঝিয়ে বলেছিল, মানুষ যখন প্রথম ভালবাসে তখন তার তৃতীয় রূপ কতকটা অভিনেতারই মত কৃত্রিম রূপ। ভালবাসা যত গভীর হয়, ততই সে রূপ বদলায়। শেষে তার সত্য রূপের সঙ্গে আর কোন তফাত থাকে না। মানুষকে চিনতে হলে তাই একান্তে দেখতে হয়।

অন্য মেয়ে হলে নিজের মনকে মিত্রা এমন অকপটে মেলে ধরত না। লজ্জা পেত, হয়তো ভয়ও পেত। কোন স্বল্প-পরিচিত পুরুষ তাকে নির্লজ্জ ভাববে। এ তো ভয়েরই কথা। মিত্রা ভয়কে জয় করেছে। সংস্কারকে উপেক্ষা করছে। তাকে আমার ভাল লেগেছিল। বলেছিলুম, চাওলাকে যখন ভালই বাসেন, তখন বিয়ে করতে আপত্তি কি?

মিত্রা বলেছিল, তার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। সে ভাবে ঘুঁটেকুড়ুনীর দুঃখই দুঃখ, রাজকন্যের দুঃখ দুঃখ নয়। তার মন সমাজ-সচেতন। কিন্তু একটা মতবাদকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে আর একটা মতবাদের ভারে বেঁকে গেছে। লোকটা এখন আর সুস্থ নয়।

আবু পাহাড়ে রানা স্বাতির জন্য এল না। মিত্রা এল চাওলার সঙ্গে। যাকে সে অসুস্থ ভাবে, তারই সঙ্গে এল। মনে হল, তাদের এই আসার ভিতর আরও কোন গভীর অর্থ আছে। সে কথা আমার কাছে এখনও স্পষ্ট হয় নি।

মামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাণা এল না কেন?

চাকরি।

পুজোর সময়েও চাকরি!

চাওলা আমায় একটা চিমটি কেটেছিল লুকিয়ে। বলেছিল, সিনিয়রের ইচ্ছে নয়।

মামা গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, বুঝেছি।

মিত্রার দৃষ্টি একটু অবনত হয়েছে। আর মামী হয়েছেন বিষন্ন। তিনিও বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে রানা আর আসবে না।

আবু পাহাড় থেকে নেমে আসবার সময় চাওলা বলেছিল, তুমি থাক, তোমার জায়গায় আমি নেমে যাই।

সবাই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, কিন্তু স্বাতির চোখে আমি কৌতুক দেখেছিলুম। আমার কর্তব্য স্থির করতে আর একটুও দেরি হল না। বললুম, আসি।

এক টুকরো কাগজ আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে চাওলা বলল, ভেবেছিলুম, মিত্রার হাতে গুঁজে দিয়ে আমি তোমার জায়গায় ফিরে যাব। কিন্তু তার যখন দরকার হল না, তুমি ওখানা নিয়ে যাও।

চলতি বাসে কাগজখানা পড়ে দেখলুম। অত্যন্ত কাঁচা হাতে একছত্র কবিতা লেখা—তোমারই হউক জয়।

চাওলা বলেছিল, মিত্রার কাছে সে বাংলা শিখছে। আগে দেখলে এই কাগজখানা আমি তাকেই উপহার দিতুম। তারা হাত ধরাধরি করে হাঁটতে শুরু করেছে। দেখে অদ্ভুত ভাল লাগল।

[ক্রমশ]

অলক্ষ্যা

হিমাদ্রি চক্রবর্তী

শিমুল গাছটা লাল ফুলে ছেয়ে গেছে।

প্রতি বছরই এমন সময়ে নিষ্পত্র জরাজীর্ণ গাছটা যৌবন ফিরে পায়। সকলের অলক্ষ্যে একটি দুটি করে পাতা ন্যাড়া ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। ভোরের শিশিরে স্নান করে সারাদিন রোদ পুইয়ে ফাল্গুনী হাওয়ার মাতলামীতে গা ভাসিয়ে দেয় বিকেলে। শীত পেরোবার পর থেকেই এই রকম নিঃশব্দ খেলা চলতে থাকে জবুথবু রোঁয়া-ওঠা কাকভুশণ্ডি শিমুল গাছটায়। তারপর একদিন সোনারোদ সকালে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে সবাই, কোথা থেকে একপাল দুরন্ত রঙিন শিশু ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাছটার মাথায়। দমকা হাওয়ায় টুকটুকে লাল থোকা থোকা ফুলগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছে অগ্নিশিখার মত।

দীর্ঘদিন পর বাড়ি ফিরে এসেছি চাকরিস্থল থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে। শিমুল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আর আশ মেটে না। বনগন্ধের মত শৈশবের অস্পষ্ট স্মৃতি কৈশোরের দুয়ার উন্মুক্ত করে যৌবনের প্রথম বেদনার্ত সুখের মত নতুন করে রোমাঞ্চ জাগায় যেন। এই বুড়ো শিমুল আর তার পাশের ক্লাব-ঘরটার সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলার সকল স্মৃতি সকল কাহিনী জড়িয়ে আছে বনস্পতির শাখায় শাখায় শতসহস্র তরুলতার মত।

বাড়িতে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিই পাড়ার আর সকলের—কে কোথায় আছে, কেমন আছে। পুরনো বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রায় সকলেই আছে এখানে—শম্ভু টোটন জগা তোতলা নিমাই সকলেই। কেবল বিল্টু মাঝখানে আজমীঢ় গিয়েছিল চাকরি নিয়ে। অবাঙালী মালিকের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আবার এসে শিকড় গেড়েছে ঘরে। চৌধুরীদের মেয়ে বুলুর বিয়ে হয়ে গেছে নাকি খুব বড় এক অফিসারের সঙ্গে। সান্যালদের মিঠু আর হালদার-বাড়ির মন্টি-রিজিয়ার বিয়েতে তো নিজেই উপস্থিত ছিলাম। হিসেব করে দেখলাম সমবয়সী মেয়েদের প্রায় সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও অনেকে মার অসুবিধে অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। শম্ভু তো লাভ-ম্যারেজ করে বসেছে এরই মধ্যে—বিয়ে না করে নাকি উপায় ছিল না।

কথার শেষে যতিচিহ্নের মত ভৈরবকাকার মেয়ে অণিমার কথাও উঠল। পাড়াসুবাদে ভৈরবকাকা মানে ভৈরব ঘোষাল আমাদের এখানকার পুরনো বাসিন্দে। জঙ্গল কেটে খানা-ডোবা ভরাট করে এই অঞ্চলে জন-বসতির পত্তন হওয়ার শুরুতেই আমাদের পাড়ার দক্ষিণ প্রান্তে বেশ কয়েক কাঠা জমির উপর গোটাকয়েক ছাতিমগাছের মালিকানা-স্বত্ব নিয়ে বেশ পাকাপোক্ত ভাবেই আটচালা ঘর তুলেছিলেন ভৈরব ঘোষাল। পেশাতে পুরুতঠাকুর হলেও বেশ চণ্ডপ্রকৃতির এবং উগ্র-স্বভাবের লোক ছিলেন তিনি, এই শুনেছি সকলের মুখে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান হবার পর থেকেই তাঁকে দেখে আসছি বিছানায় আধ-শোওয়া, শরীরের নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু।

সেই অণিমার বিয়ে হয় নি আজও, আর হবেও না বোধ হয় কোনদিন। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলাধুলো করেছি আমরা। একসঙ্গে বললে একটু ভুল হয়—আমরা খেলতাম, আর একটু ফাঁকে বসে অণিমা আমাদের জামা জুতো পাহারা দিত। ধবধবে ফরসা স্কার্ট-ব্লাউজ পরা বুলু কিংবা সালোয়ার-কামিজ পরা মিঠু মন্টি রিজিয়া সবাইকে আমরা নিজের নিজের দলে টানবার চেষ্টা করতুম। তুচ্ছ কারণে বুলু হঠাৎ ঝগড়া করে বসলে, গায়ে পড়ে ভাব করার জন্য সাধ্য-সাধনা করতুম—কিন্তু অণিমাকে

যাঁদের রুচি আছে…

সেই সব মহাত্মাদের প্রতি আমার এই ছোট্ট ডাইরীটি উৎসর্গিত হলো! কে আমি প্রশ্ন নয়…তবে আজ আমি তাঁদেরই একজন যাঁরা স্বপ্নে-জাগরণে কেবলই ভাবেন আলু কপির ডালনার কথা, মটর ডালের কথা, ইলিশ মাছ, রুইয়ের মাথা, মুরগী মাংস আর পায়েস্ রসগোল্লার কথা। ভাবছেন পেটুক আমি? মোটেই নয়।

কয়েদী মাত্র: কয়েদখানায় আটক নই। আটক আমি হাসপাতালে। জেলা হাসপাতালের কোন এক অজানা বেড থেকে লিখছি। আমার পরিচয় দিয়ে কি প্রয়োজন? শুধু জেনে রাখুন পেটের রোগের সাজায় এখানে আমি বন্দী। ভাল মন্দের আস্বাদ আমি পাই না। রুচি আছে, তবু ইচ্ছে মতো খাবার আমায় দেওয়া হয় না… এইতো আমার বড় সাজা।…না, খেতে আমাকে এরা দেয় বৈকি! ডাবের জল, ছানা আর ঘোল…মাঝে মাঝে লবণ ছাড়া মুরগী স্যুপেরও স্বাদ পাই…স্বাদ পাই দুবেলা সেন্টিগ্রেড থার্মমিটারের! কোন এক অজানা দিনের আশায় আছি। যেদিন নিষ্ঠুর ডাক্তার বলবে তুমি সুস্থ, তুমি মুক্ত, আজ থেকে খুশী মতো, ইচ্ছে মতো তুমি খেতে পারো। সেদিনের স্বপ্নে বিভোর আমি…

১লা আগষ্ট

ঐ তো পাশের বেডের ছেলেটা কি যেন গিলছে। মুরগী মাংস! আহা কতদিন খাইনি! আমাদের বাড়ীর সবাই মুরগী খায়। কেবল হেবলুটা খায় না। ছোট ভাই, ওকে কত বলেছি, ওরে খারে খা। মুরগীর মতো মাংস হয় না, তবুও খেতো না।…

৬ই আগষ্ট

হাসপাতালে আজ তেরো দিন হলো। মা, হেবলু রোজকার মতো আজ বিকেলেও এসেছে। তবে সঙ্গে খাবার কিছু আনেনি। পাশের বেডের ছেলেটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমাদেরই দিকে। কেন জানি না ছেলেটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। হ্যাংলার মতো তাকানোটা অবশ্য ওর স্বভাব, আমাদের নার্সটার দিকেও ও অমন করেই তাকায়। সে যাকগে। ওকে দেখে আমার ঈর্ষা হয়। পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে আছে। অথচ দু'বেলা মুরগী, মাংস ঠিক গিলছে। আমিও তো ওর মতোই রুগী। অথচ আমাকে ইচ্ছে মতো কিছুতেই খেতে দেওয়া হয় না।…

১৬ই আগষ্ট

আজ আমাকে যারা দেখতে এসেছে, তাদের ভেতর একজন হচ্ছে নবাগতা। আমাদের হেবলুর বৌ। হাসপাতালে পড়ে আছি, এরই মধ্যে হেবলুর বিয়ে হয়েছে। কিরণ চাকরী নিয়ে দিল্লী গেছে। নতুন মাষ্টার মশাই এসেছেন। আরও কত কি! অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হেবলুটা বরাবরই বিয়ের বিপক্ষে ছিল। আমি ভাবছিলাম শেষটায় কেলেঙ্কারী না হয়। মার মুখে শুনলাম, না, হেবলুটা ভালছেলের মতো সবকিছু মেনে নিয়েছে।…

১৮ই আগষ্ট

আজও মার সাথে বৌমা এসেছে। মালতীর (আমার স্ত্রী) মুখে কিন্তু একটা মজার কথা শুনলাম। হেবলুটা মুরগী খায় না। কিন্তু কাল নাকি বৌমার হাতের রান্না ফেলতে পারেনি। বৌমা ওকে শুধু চাকতে দিয়েছিল। এক বাটি মাংসের সবটুকু খেয়েছে। বাহবা! বৌমার রান্নার তবে বাহাদুরী আছে। 'আচ্ছা বৌমা কি এমন যাদু দিয়ে রাঁধলে যে হেবলুও মুরগী খেলো?'

'যাদু দিয়ে নয়, 'ডালডা' দিয়ে।'

''ডালডা' দিয়ে? 'ডালডা'য় খাবারের এত ভাল স্বাদ হয়?' 'হ্যাঁ, 'ডালডা'র নিজস্ব কোন স্বাদ বা গন্ধ নেই। তবে খাবারের আসল স্বাদটি ফুটিয়ে তুলতে এর জুড়ি হয় না।' 'তাই নাকি? কিন্তু এর কি কোন উপকার আছে?' 'আছে বৈকি! প্রতি আউন্স 'ডালডা'তেই ৭০০ ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'এ' ৫৬ ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'ডি' মেশানো হয়।'

'ভাল, ভাল, খাঁটি জিনিষে রাঁধাতে আনন্দ আছে। তা বৌমা আজ একটু বেশী করে 'ডালডা' আনিয়ে রেখো। আমি আবার দুদিন পর বাড়ী ফিরছি, কিনা! দেখা যাক্ তোমার 'ডালডা'য় রান্না কেমন হয়।'…

'হবেগো হবে! আগে বাড়ীতে তো এসো।'—মালতী সান্ত্বনা দিল।…সবাই চলে গেল। একটা মাত্র দিন। তারপর আমিও বৌমার হাতের রান্না খাবো।…হাসপাতাল ডাইরীর এইখানেই শেষ। আর নয়।…

DL. 25 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

ডাকলেও কেউ ডাকত না। নিতান্ত খেলোয়াড় কম পড়ে গেলে যদি ডাকতুম, অণিমা যেন কৃতার্থ হয়ে যেত।

মিশকালো গায়ের রঙ, কাঠি-কাঠি হাত-পা, আর এক-মাথা রুক্ষ বিবর্ণ চুল। ছেঁড়া মলিন ফ্রকটা পিঠে বোতাম না থাকায় শীর্ণ কাঁধ থেকে পিছলে পড়ত প্রায়ই। নিজেদের অবস্থার কথা ভেবে অণিমাও যেন সকলের নজর এড়িয়ে নিঃশব্দে থাকতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

তারপর সকলের দৃষ্টির আড়ালেই অণিমা বড় হয়েছে। ছেঁড়া ফ্রক ছেড়ে ছেঁড়া শাড়ি ময়লা ব্লাউজ পরেছে। অণিমার দেহের ও মনের ঋতু পরিবর্তনের খবর কেউ রাখে নি। এহেন অণিমার খবর জিজ্ঞাসা করাতে মা পিসীমা আর ছোট বোনেরা আশ্চর্য হয়ে গেল। মা হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, অণিমাদের কথা আর বলো না। ওদের নাকি আর চলে না শুনতে পাই, ভৈরব ঠাকুরপো বোধ হয় এ যাত্রা আর টিকবে না। সত্যিই ওদের বড় কষ্ট। মেয়েটা আজকাল আর আসেও না।

অণিমা নাকি হাসপাতালে ধাত্রীর কাজ নিয়েছে ও মাস থেকে।—ছোঁয়াচ-এড়ানো স্বরে মালা জপতে জপতে ও-পাশ থেকে পিসীমা কথাটি ছুঁড়ে দিলেন।

ভৈরবকাকার সংসারে অভাব-অনটন তো ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, কাজেই বিস্মিত হলাম না। ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নির্বিকার চিত্তে ভাবলাম, হাসপাতালের ধাত্রীর কাজ, তাই বা মন্দ কি? ম্যাট্রিকটাও পাস করে নি, চেহারাও নাকি তেমনি আছে। এসব মেয়ের বিয়ে হয় না, ভাল চাকরিও পায় না। এই মফস্বল শহরে এর বেশী কী আশা করতে পারে অণিমা।

অণিমার প্রসঙ্গে ছেলেবেলার কথা নতুন করে মনে পড়ে। ছোট মফস্বল শহরের যে অঞ্চলটাতে আমরা থাকতুম তার নাম ছিল শিল্প-সংহতি পাড়া। দু পাশে বাংলো-প্যাটার্নের একতলা বাড়িগুলো সাজিয়ে রেখে ঠিক মাঝখানে লেডিস-পার্কের মত একফালি চৌকো সবুজ ঘাসের জমিকে প্রায় বৃত্তাকারে বেষ্টন করে লাল সুরকি-ঢালা রাস্তাটা আবার গিয়ে মিশে গেছে বড় রাস্তায়। স্বদেশী আমলে কুটীরশিল্পের কেন্দ্রস্থল ছিল এদিকটা। এখন তার কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। তবুও খুঁজলে এখানে দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে যে পাহাড়ী ঢলের সরু মরসুমী নদীটা বাঁক ফিরেছে সেখানে ভেরেণ্ডা ঘোড়ানিম আর কালকাসন্দীর ঝোপঝাড়ের আড়ালে হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে চুনের ভাটি, বালি আর পোড়া ইটের ভগ্নস্তূপ, উই-ধরা কাঠের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আড়া। পশমী কাপড়ের তাঁত, দেশলাইয়ের কারখানা ছিল এদিকটা জুড়ে। আর একটু উজিয়ে ধোপাদের আড্ডা। এপাশে শিমুল গাছটা থেকে কিছুদূর এগিয়ে একটা চওড়া ঢালু খাদ অন্য পাড়ার সঙ্গে নো-ম্যান্স্-ল্যাণ্ডের ব্যবধান রক্ষা করে চলেছে প্রথম থেকেই। প্রায়ই ও-পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আমাদের গুলিগোলা বিনিময় হত—গুলতি ঢিল আর থান-ইট মারফত। যুদ্ধ-বিরতির পর সন্ধি হলে ইস্কুল ছুটির পর চলত টেনিসবলে ফ্রেণ্ডলী ফুটবল ম্যাচ কিংবা পুরনো ছাতার বাঁট দিয়ে কাঠের বলে হকি খেলা। কারচুপি কিংবা পক্ষপাতিত্ব চোখে পড়লে সেই ছাতার বাঁট রেফারীর পিঠে বসাতেও দ্বিধা করত না কোন ডানপিটে ছেলে। হৈচৈ, মারামারি, যুদ্ধ-ঘোষণা—তারপর আবার যথানিয়মে গুলিগোলা বিনিময়।

দৈবাৎ যদি একা কেউ পাড়ার বাইরে গিয়ে পড়ত তা হলে আর রক্ষে ছিল না। জামা ছিঁড়ে আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে এসে সেই আহত সৈনিক তার লাঞ্ছনার বিবরণ দিত, আর আমরা সমবেত বৈঠকে দাঁত কড়মড় করে তার প্রতিশোধ নেবার উপায় চিন্তা করতাম। ফলে বড় রাস্তায় একা বেরোনো ছিল আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ। ইস্কুল যাওয়া থেকে আরম্ভ করে হাটে-বাজারে পোস্ট-অফিসে পর্যন্ত আমরা যূথবদ্ধ ভাবে চলাফেরা করতাম।

পাড়ায় আমাদের সমবয়সী মেয়েরাও এই ধর্মযুদ্ধে পিছিয়ে ছিল না। গুরুজনদের লুকিয়ে ওরা তৈরি করেছিল নার্সিং-স্কোয়াড্। আমাদের মধ্যে কেউ আহত কি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে আয়োডিন তুলো থেকে শুরু করে নারকোলনাড়ু, চিঁড়ের মোয়া পর্যন্ত ওয়ার-ফ্রণ্টে

এসে পৌঁছত। চৌধুরীদের বুলু, সান্যালবাড়ির মিঠু, হালদারবাড়ির মন্টি-রিঙ্কিয়া এমন কি অণিমা পর্যন্ত। অবশ্য এতে ওদের স্বার্থ কোন কম ছিল না। কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষার মাস দুই আগে থেকে আপনা-আপনি রণদামামা স্তব্ধ হয়ে যেত। এ ব্যাপারে একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে গিয়েছিল যেন আমাদের মধ্যে। এমন কি গায়ে পড়ে ভাব করার স্পৃহাও জেগে উঠত।

এমনি করে একটার পর একটা বাৎসরিক পরীক্ষার গণ্ডি উতরে যেতে যেতে ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষা দেবার পর একদিন হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করলাম আমরা বড় হয়েছি। ইতিমধ্যে চিৎকার করে অন্য কেজনকে ডাকতে গিয়ে গলা দিয়ে তিন রকম কর্কশ স্বর বেরুতে আরম্ভ করেছে, জুলফির নীচে পাতলা দাড়ি আর গোঁফের রেখা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, জামার নীচে আগা-পাস্তলা দড়ি দিয়ে বেঁধেও দৈর্ঘ্যে নিজেকে ছোট করে স্কুলের ফুটবল টিমে খেলবার অনুমতি পাচ্ছি না। এমন সব চমকপ্রদ ঘটনাগুলি সচেতন মনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, কিন্তু একদিন একটা ছোট্ট ঘটনার পর বুঝতে পারলাম আমরা কৈশোরের যুদ্ধোত্তর দিনে পা দিতে চলেছি।

সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল খুব। স্কুলে থাকলে খাকী শার্ট ভিজিয়ে বেশী ডে আদায় করতাম অবশ্যই। কিন্তু তখন প্রায় নির্বাধ মুক্তি। সকাল সকাল ফাইন্যাল পরীক্ষার পড়ায় ইতি দিয়ে এক এক করে ক্লাবঘরে এসে আড্ডা জমিয়েছিলাম—আমি, বিল্টু, টোটন, শঙ্কু, জগা আর তোতলা নিমাই। অর্থাৎ আমাদের ব্যাচের চাঁই বলতে সকলেই ছিলাম সেদিন। জানলার ধারে বসে আসন্ন পরীক্ষার কথাই হচ্ছে। ঝিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে, নীচু মাঠটা জলে ভরে উঠেছে প্রায়। এমন সময়ে দেখতে পেলাম চৌধুরীদের মেয়ে বুলু পরনে নীল শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ, শাড়ির আঁচলটা ডান হাতে ঘোমটার মত মাথার উপর ধরে মিঠুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে খালি পায়ের উপর শাড়িটা বাঁ-হাতে একটু তুলে ধরে আলতো পায়ে হেঁটে চলে গেল নিজেদের বাড়িতে।

আমাদের কথার স্রোতটা থেমে গেল হঠাৎ। সবুজ বৃষ্টি-ভেজা ঘাসের উপর শঙ্খের মত সাদা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত অনাবৃত একজোড়া পা হেঁটে গেল লীলায়িত ভঙ্গীতে। আমরা সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলাম যতক্ষণ না পর্যন্ত বুলু ওদের বাড়ির গেটে মেহেদি-বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর একটা অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে আমাদের কিছুক্ষণ কাটল নিঃশব্দে। ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় কেউ কারও দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। এসব কিছুই নয় অথচ কী যেন! এমন তো এর আগে কোনদিন হয় নি!

বিল্টু সহজ গলায় বলতে চেষ্টা করল, শাড়ি পরলে মেয়েদের কিরকম লম্বা দেখতে লাগে, তাই না?

আমি অস্পষ্ট গলায় জবাব দিলুম, হুঁ।

নিমাই খতিয়ে খতিয়ে কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। আবার সেই অস্বস্তিকর নীরবতা। বাড়িতে কাজ আছে বলে শঙ্কু হঠাৎ উঠে গেল। তারপর আর আড্ডা জমল না, একটা না একটা ছুতো করে উঠে দাঁড়ালাম একে একে। বৃষ্টিও থেমে এসেছে প্রায়।

টুপটাপ বৃষ্টি মাথায় ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরে এলাম। কোন কারণ নেই, তবু কি যেন একটা অস্বস্তির খোঁচা তাড়া করে ফিরছিল তখন থেকে। ঝাঁকড়া জামরুল গাছের তলায় ছাগলছানাটা শুকনো খড়ের গাদা বেছে নিয়ে চুপ করে শুয়ে আছে। সেটাকে খানিক আদর করতে করতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার চৌধুরীদের আনারসের বাগানটা লক্ষ্য করলাম—কেউ নেই। আরও কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে নিরাসক্তভাবে পড়ার ঘরে ঢুকতে গিয়ে চোখে পড়ল ভৈরবকাকার মেয়ে অণিমা মার পিছন পিছন ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল, ছেঁড়া নোংরা শাড়িটা বৃষ্টিতে ভিজে ন্যাতনেতে হয়ে পিঠের হাড় দুটোর সঙ্গে কদাকারভাবে আটকে আছে। আবার চাল ধার চাইতে এসেছে বোধ হয়!

তারপর আরও বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, কিন্তু বুলুকে আমরা ভুলতে পারি নি। কয়েক বছর আগেকার ছবি ভাসে চোখের সামনে, শঙ্খ-সাদা গায়ের রঙ,

টিকলো নাক, টানা ভুরুর নীচে ভ্রমর-কালো চোখ, পিঠের কোঁকড়ানো চুলের ঢাল কোমর ছাপিয়ে নেমেছে স্তবকে স্তবকে। রঙিন রেশমী শাড়ির আঁচল উড়িয়ে লাল সুরকি-ঢালা রাস্তায় বুলু মৃদু হেসে আমাদের পাশ কাটিয়ে মেহেদি-বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেত।

কিন্তু নিমাই আর খতিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করত না, বিল্টুও গলায় আয়াসসাধ্য সহজ ভাব ফোটাতে না। তখন বড় হয়েছি, কলেজী গাম্ভীর্য এসেছে আমাদের মধ্যে। তবুও কি যেন একটা নিঃশব্দ পরিবর্তন ঘটত সকলের মনে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে কেউ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত কিংবা নস্যির ডিবের উপর বেতালা টোকা উঠত।

অণিমাও হয়তো কোন কোন দিন জীর্ণ তাঁতের শাড়িটা সারা দেহে ব্যাণ্ডেজের মত জড়িয়ে মন্থর পায়ে হেঁটে গেছে এই পথে, আমাদের পাশ দিয়ে। কিন্তু আমাদের উত্তপ্ত আলোচনায় যতি পড়ে নি, ফিরেও তাকাই নি কেউ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অণিমার সামনের দাঁত দুটো যেন বিশ্রী রকম উঁচু হয়ে উঠেছে গাল ভেঙে গিয়ে। বাঁ দিকের চোখের মণিটাও যেন কেমন সাদা ঘোলাটে। তেলহীন রুক্ষ কদাকার চেহারা, বেশীক্ষণ কাছাকাছি থাকলে গা ঘিনঘিন করে যেন।

তবু যেন মনে হয় অণিমা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে একদৃষ্টে। শম্ভু একদিন সোজাসুজি বলেই ফেলল, অণিমাটা আজকাল কেমন বেহায়ার মত তাকায় লক্ষ্য করেছিস? গিলে খাবে যেন!

জগা ঠাট্টা করে বলে, ওর বিয়েটা ছাদনাতলার বদলে শ্যাওড়া গাছতলায় দিলেই মানাবে ভাল।

আমি চিন্তিতভাবে সিগারেটে টান দিয়ে বলেছিলাম, বিয়ে নামক জিনিসটাই অণিমার মন থেকে মুছে ফেলা উচিত, তা না হলে মুশকিল আছে মেয়েটার।

অণিমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ আছে বইকি। আমাদের পাড়াটা একটু সৌখীন। সামনে লাল সুরকি-ঢালা রাস্তার পাশে সবুজ ঘাসের আস্তরণ, আর পিছনে পাহাড়ী ঢলের রুপোলী ফিতের মত সরু নদী। প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে মরসুমী ফুলের ছোটখাটো বাগান। ইউক্যালিপ্টাস আর ঝাউ গাছের ফাঁকে ফাঁকে বুগেনভেলিয়া আর কসমসের ঝোপে হাজার রঙিন প্রজাপতির মত ফুল ফোটে, ডালিয়া আর চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফোটে সূর্যমুখী আর রজনীগন্ধা। মেহেদি-বেড়ার আভিজাত্য-ঘেরা পরিচ্ছন্ন বাড়িগুলি। এরই মাঝে নিতান্ত বিসদৃশভাবে দাঁড়িয়ে আছে অণিমাদের বাড়িটা, ন্যাড়া ছাতিমের নীচে ভাঙাচোরা উইঢিবির মত। সেই পুরনো আটচালার চাল রোদ-বৃষ্টি-জলে ঝুরঝুর করে ভেঙে গেছে পোড়া পাঁপরের মত। আলকাতরায় রঙ করা কেরোসিন টিনের চাল আর দরমার বেড়া। ফুলের বাগানের বদলে লঙ্কা আর বেগুনের গুটিকয়েক শুকনো চারা সারের অভাবে বিবর্ণ হয়ে কুঁকড়ে মাথা নামিয়েছে। পক্ষাঘাতে ভৈরব ঘোষালের সমস্ত দেহটাই আড়ষ্ট হয়ে গেছে আজকাল। শুনেছি কেবল একটা বিশ্বগ্রাসী খিদেয় তার ভারি ঠোঁট দুটো তৃষিত চাতকের মত কেঁপে ওঠে বারবার। আধঘণ্টা অন্তর অন্তর নাকি ভৈরব-কাকার খিদে পায় আর সেই খিদের তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত একটা জান্তব গোঙানি ঠিকরে বেরুতে থাকে তার গলা দিয়ে।

পাড়ার গিন্নীদের আড্ডায় ভৈরব ঘোষালের সংসার নিয়ে আলোচনাটা আজকাল বিরক্তি আর নাক কোঁচকানোর ভিতর দিয়ে শেষ হয়। হালদার-গিন্নী পানের পিক ফেলে, আলতো করে একটিপ দামী জর্দা মুখে ফেলে বলেন, সত্যিই এবার ওদের উঠে যাওয়া উচিত এ-পাড়া থেকে। জমিটা বিক্রি করে দিলেও তো কিছু সুরাহা হয়।

পাড়ার অন্যতম সম্ভ্রান্ত বাসিন্দে রাজেন সান্যালের স্ত্রী অর্থাৎ মিন্টুর মা টপ করে কথাটা আঁকড়ে ধরে উৎসাহিতভাবে বললেন, উনি তো সেদিন এই কথাটাই অত করে বোঝালেন অণিমাকে। ভাল দামও দেবেন বলেছিলেন। তা মেয়ের আদিখ্যেতা দেখে বাঁচি না, বলে কিনা—মাথা গোঁজার জায়গাটুকুও যদি যায় তবে আর রইল কি?

সকলেই একবাক্যে অণিমার এই ধরনের অন্যায় জিদের

নিন্দা করতে লাগল: আরে, আগে পেটের ভাত জোগাড় কর্ তবে তো মাথা গোঁজার জায়গা!

বিন্তিয়া রোদে বসে মেয়ের গায়ে তেল মালিশ করতে করতে বলে, জান মা, কালকে অণিমাকে দেখলাম, সেজেগুজে কোথায় যেন বেরুচ্ছে।—তারপর মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে হেসে বলে, আহা, সাজের কি ছিরি, কানের পাশে এক থাবলা পাউডার লেগে রয়েছে, এদিকে আবার কপাল চুঁইয়ে তেল গড়াচ্ছে, মনে হচ্ছিল যেন—

পাড়ার নতুন ভাড়াটে প্রফেসরের রূপসী বউ বিশেষণটা হাতের কাছে জুগিয়ে দেয়: যেন শিঙ্গি মাছে কেউ ছাই মাখিয়েছে।

উচ্ছ্বসিত হাসিতে খিলখিল করে সকলেই এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে: শুনেছিলাম হাসপাতালে নাকি নার্সের চাকরি পেয়েছে?

সঠিক খবর দিল বুলুর মা: অণিমা টিকে দিয়ে বেড়ায়। ও নিজে টিকে দেয় না, টিকাদারবাবুর সঙ্গে থেকে লোকের হাতে স্পিরিট ঘষে। চৌধুরীসাহেবই নাকি শেষ পর্যন্ত মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের মিটিংয়ে কথাটা তুলে অণিমাকে ভ্যাক্সিনেশন অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

কথাটা শুনে অল্পবয়সী কুমারী মেয়েদের দল একটু শিউরে ওঠে যেন—অণিমাদি অজানা অচেনা পুরুষ-মানুষের হাত ধরে! হাত শক্ত করে ধরে স্পিরিট ঘষতে লজ্জা করে না একটুও! ছবিটা মনে মনে কল্পনা করে রঙিন সিল্কের শাড়ির নীচে তাদের নরম ফোলা ফোলা হাতের তালু ঘেমে ওঠে। এ ওর মুখের দিকে আড়চোখে তাকায়, তারপর ফিক্ করে হেসে ফেলে ছুটে পালিয়ে যায় ওখান থেকে।

বড়দের আসরে প্রফেসর-গিন্নী মুখ টিপে হেসে বলে, অণিমা যদি হাত জাপটেও ধরে তো কোন পুরুষের মন টলবে না।

* * *

বসন্তের হাওয়াটা মোলায়েম হলেও রোগটা তেমন নয়। শহরের দক্ষিণ দিকটাতে মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে বসন্ত। টিকাদারবাবুর কাজ বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। ব্যস্তসমস্তভাবে হাতবাক্সটা নিয়ে শহরের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে লোকটা। পিছনে দেখা যাবে স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া জুতো ঘষতে ঘষতে স্পিরিটের বোতল আর তুলোর প্যাকেট হাতে অণিমা চলেছে। তেল-তেল ঘামে আর পরিশ্রমে মুখের রঙটা বেগুনী হয়ে উঠেছে, বাঁ দিকের চোখের মণিটা নিষ্প্রভ সাদা।

এরই মধ্যে একদিন সকালে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হৈচৈ কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল। ছোট বোন রুকু বাবরী দুলিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলে গেল, ছোড়দা, দেখবে এসো অণিমাদি টিকে দিতে এসেছে। বাবা চায়ের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করছিলেন, কিন্তু মুখে গাম্ভীর্য টেনে বললেন, যাও অঞ্জন, হাতমুখ ধুয়ে টিকেটা নিয়েই নাও—সময়টা খুব খারাপ।—তারপর অণিমাকে লক্ষ্য করে নীচু গলায় অনুকম্পা মিশিয়ে বললেন, পুওর গার্ল।

শার্টের আস্তিন গুটিয়ে সুপুষ্ট বাঁ হাতটা এগিয়ে দিতে অণিমা যেন সাগ্রহে হাতটা আঁকড়ে তুলে ধরল একেবারে ওর প্রায় বুকের কাছে। মাকড়শার ঠ্যাংয়ের মত সরু সরু আঙুলে পেঁচিয়ে ধরেছে হাতটা। এতক্ষণের কৌতুককর ব্যাপারটা মা, ছোট পিসীমার কাছে এখন যেন বেশ দৃষ্টিকটু লাগল, গম্ভীরমুখে তাঁরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বউদি মুচকি হাসি গোপন করতে ঘুরে দাঁড়াল।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিয়ে যেন অণিমা হাতে স্পিরিট ঘষে। ওর এই বিশ্রী স্বভাবটা নাকি অনেকেরই চোখে পড়েছে।

সেদিন ক্লাবঘরের আড্ডায় কথাটা উঠল। শম্ভু নতুন বিয়ে করেছে, আমাদের অনেক কিছু না-জানা জগতের খবর ওর নখদর্পণে। সিগারেটে দীর্ঘ টান মেরে ও বিজ্ঞ ভাবে বলে, এটা হচ্ছে এক ধরনের রিপ্রেস্‌ড্ প্যাশন। বাইরে থেকে ওদের ফ্রিজিড বলে মনে হলেও মনে মনে ওরা ভয়ঙ্কর হয়, বুঝলি। আমরা মাথা নেড়ে সায় দিই,

অনিমাদের মত মেয়েদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক এটা। কিন্তু মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

*　　　*　　　*

ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে এল। প্রীতিভোজ, হৈচৈ আর নিটোল আড্ডার ভিতর দিয়ে দিনগুলো কী করে যে কেটে গেল টেরই পাই নি। মাঝখানে অনিমাদের নিয়ে একটা হৈচৈ উঠেছিল। ভৈরবকাকা মারা গেছেন, গোল বাধল শ্মশানে যাওয়া নিয়ে। আমরা চক্ষুলজ্জার খাতিরে দু-একজন এগিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু বাবা-মা সকলেই ঘোর আপত্তি তুললেন—ঝাঁকে ঝাঁকে লোক মরছে বসন্তে, এ সময় রিস্ক নেওয়া ঠিক নয়। শেষে রিফিউজী কলোনির কয়েকটি ছেলে খবর পেয়ে এগিয়ে এসেছে।

যাবার আগের দিন আকস্মিকভাবে আবার অনিমাকে দেখলুম। ছোটদিনের বউদির ছেলে হয়েছে—খবরটা জন্মরেজেষ্ট্রী অফিসে দিতে গিয়েছিলাম। ভ্যাক্সিনেশন-ওয়ার্ডে বারান্দার ছায়ায় চেয়ার-টেবিল পাতা। স্পিরিট-ভেজানো তুলো-হাতে অনিমা একা লোচন কুশারীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে।

জীবনে বোধ হয় এই প্রথম অনিমার সম্বন্ধে একটু কৌতূহল বোধ করে এগিয়ে গেলাম। লোচন কুশারীর নামের সঙ্গে একটা প্রীতি-মেশানো অস্বস্তি জড়িয়ে আছে এই মফস্বল শহরের সকলের মনে। এখানকার শ্মশানের ঘাটবাবু। ভাঙা কলমটা কালিতে ডুবিয়ে খসখস করে মৃত্যুর পরোয়ানা সই করে মোটা খেরো-বাঁধানো খাতায় সযত্নে মৃতের নাম-ধাম-বিবরণ টুকে রাখে, কাঠ ওজনের সময় শ্যেন-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে ওজনের কাঁটা, যাতে একখানা কাঠও পর্যন্ত না বেশী যায়, এমন কি শোনা যায়, মৃতের খাটের তোশক-বালিশ নিয়ে পর্যন্ত নাকি মুদ্দফরাশদের সঙ্গে জঘন্যভাবে ঝগড়া করে। তিনকুলে কেউ নেই, শ্মশানেই থাকে খায়, শহরের দিকে বড় একটা আসে না। লোচন কুশারীর চেহারাটা আরও ভীতিপ্রদ। চল্লিশোর্ধ্বে বয়স, তার উপর থুতনি থেকে ডান দিকের গালের চোয়াল পর্যন্ত একটা বীভৎস পোড়া দাগ, ক্ষত শুকিয়ে যাবার পরেও জায়গাটা কাঁচা শ্বেতী রোগের মত দগদগ করছে। তার নীচে কোঁচকানো চামড়া ঝুলে পড়েছে গলিত মাংসস্তূপের মত। দেখে মনে হয় লোচন কুশারী সত্য সত্য চিতার আগুনে ঝলসে উঠে এসেছে আধপোড়া হয়ে। লোকে বলে মাঝরাত্রে শ্মশানের নিভন্ত চিতাগুলির আশেপাশে কী যেন খুঁজে বেড়ায় লোচন কুশারী। এহেন লোককে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে সকলেই।

একা একা অমন একটা জায়গায় থাকেন, অসুখ-বিসুখ হলে মুখে জল দেবার লোকটা পর্যন্ত নেই। আগে থেকে সাবধান হওয়াটা ভাল নয় কি?—অনিমার গলা সমবেদনায় আর্দ্র শোনায়।

বিস্মিতভাবে চোখ তোলে লোচন কুশারী। বিশ্বাসহীন দৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে কী যেন খোঁজে অনিমার মুখে। অনেক দিন—অনেক দিন পর যেন কোন এক ভুলে-যাওয়া সুরের তন্ত্রীতে ঘা পড়ল। ঠাণ্ডা মেথিলেটেড স্পিরিট শুকিয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কেবল কোমল সুষমায় উষ্ণ একটা শীর্ণ হাতের স্পর্শে লোচন কুশারীর ভারী দেহটা কেঁপে উঠল একবার।

চোরের মত নিঃশব্দে পা টিপে টিপে সরে এলাম ওখান থেকে। দূরে শিমুল গাছটার দিকে নজর পড়ল, রক্তিম আগুনের শিখার মত টুকটুকে লাল থোকা থোকা ফুলগুলি দমকা হাওয়ায় কাঁপছে।

●

হুজুগ ও যুগ

[৩৮২ পৃষ্ঠার পর]

উক্ত ছয়টি দফা ছাড়াও অন্ততঃ আরও শতাধিক দৃষ্টান্ত আমার হাতেই আছে, কিন্তু শান্তি-আন্দোলন যে হুজুগ ছাড়া আর কিছু নয় তা ইতিমধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে। তবু যদি কোনও নাছোড়বান্দা এতেও সন্তুষ্ট হতে না চান, তবে তাঁকে আমি বলতে বাধ্য হব যে মানুষ কোনদিনই শান্তি চায় নি এবং শান্তি চাওয়াটা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। প্রমাণস্বরূপ ইতিহাস তুলে ধরব, যা থেকে দেখা যাবে যে গত সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছে, এবং যতই সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে বড় বড় যুদ্ধগুলোর মধ্যে ব্যবধানকালও ততই কমে আসছে। যথা :

(১) প্রুসিয়ান যুদ্ধ ১৮৬৬ হতাহত ত্রিশ লক্ষ
(২) প্রথম মহাসমর ১৯১৪ " ষাট লক্ষ
(৩) দ্বিতীয় " ১৯৪০ " দুই কোটি
(৪) কোরিয়া যুদ্ধ ১৯৫২ " কুড়ি লক্ষ

এ ছাড়া তো প্রথম ও দ্বিতীয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে বহুশত ছোটখাটো যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল এবং আজও চলেছে।

১৯২০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত এই সকল প্রধান প্রধান হুজুগগুলির বিষয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে পূর্ণিমা অমাবস্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়মগুলির মত এগুলিও কেমন সুন্দর এক ছান্দসিক নিয়মে চলেছে। পূর্ণিমা-অমাবস্যা আমরা ভুলি না, রেখে দিই দেওয়াল-পঞ্জীতে, শুধু হুজুগগুলির কথাই ভুলে যাই। কিন্তু ভোলে না মহাকাল। জাতির ভাবধারাকে ইচ্ছামত গড়ে-পিটে ইতিহাসে আনে পরিবর্তন, আঁকে ওঠা-নামার আলপনা।

সমস্যা জাগে মানুষের কর্মফলে। মানুষ কর্ম করে প্রচলিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী। শিক্ষার ধারা বয়ে চলে যুগোপযোগী সমাজ-ব্যবস্থা। প্রকৃতি অনুযায়ী, এবং সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তারই সঙ্গে তাল রেখে। আজকাল আবার প্রশ্ন উঠেছে—শিক্ষা অনুযায়ী সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, কিংবা সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী শিক্ষার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। বিষয়টি গুরুতর, এবং এ বিষয়ে আলোচনা বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক। শুধু এইটুকু নিরাপদে বলা চলে যে প্রথমটি নিঃসংশয়ে মঙ্গলজনক, এবং দ্বিতীয়টির বিষয়ে বলবার সময় আসে নি এখনও।

এ বিষয়ে কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, শিক্ষা সমাজ ও রাষ্ট্রের লক্ষ্য মানুষের আত্যন্তিক সুখ বিধান করা, এবং ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে গত সাড়ে তিন হাজার বছরের মধ্যে পৃথিবীর কোন দেশই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে নি। আরণ্যক যুগে মানুষ যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছে সত্য, কিন্তু আজ এই যান্ত্রিক যুগে সে তার চেয়ে বেশী সুখ পাচ্ছে না—তার প্রমাণ দিচ্ছে করোনারী থ্রম্বোসিস্। সেই পুরনো পাথরের যুগে যে সমস্যা ছিল, আজ মহাশূন্য-জয়যাত্রা যুগেও সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সমস্যা উদ্ধত ভঙ্গীতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—"সুখ নাই স্বস্তি নাই কোথাও ছিটে-ফোঁটা।" কেন এমন হয় ? এই অতৃপ্তির, এই পরাজয়ের গ্লানি ভোলবার উপায় কি ? এই হুজুগগুলির মর্মই বা কি ?

অ্যারিস্টটল্ বললেন, মানুষের মত এমন সুন্দর তেজীয়ান, ভূয়ীয়ান ও বলীয়ান প্রাণী তুচ্ছ সুখভোগের জন্য সৃষ্ট হয় নি। হয়েছে কাজ করবার জন্য। কর্মে তার আগমন, কর্মেই তার বিসর্জন। সেই অবধি পাশ্চাত্ত্য জগৎ কাজ নিয়েই মেতে রইল। কাজই যখন অবলম্বন, তখন শিক্ষা এবং সমাজ-ব্যবস্থাও তদুপযোগী হওয়া প্রয়োজন। তাই এল হাজার কিসিমের ইজ্‌মের হুজুগ। ইজ্‌ম্ দিয়ে কাজ বাড়ানো যায়, ভোগ্য-সামগ্রীও বাড়ানো যায়, কিন্তু প্রাণের ক্ষুধা মেটানো যায় না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, কাজ কমিয়ে ছুটি বাড়ানো হোক।

কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতা যতই উন্নততর হবে মানুষের শ্রমের উপর তার দাবিও ততই বেড়ে যাবে। বিজ্ঞান যতই নির্ভুলতর হবে, মানুষের বুদ্ধি যতই বাড়তে থাকবে, এবং কূটনৈতিকের প্রচারকার্য যতই নিখুঁত হতে থাকবে, মানুষের নিজস্ব শক্তির স্বরূপটাও ততই বদলে যেতে থাকবে। সেদিন রাম তার নিজের জন্য চিন্তা করবে না, সীতার জন্য তো নয়ই, কার জন্য যে সে সদা ব্যস্ত থাকবে তা সে নিজেই জানবে না। বালজাক তাঁর উপন্যাসে এই অবস্থাটা বেশ সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়িকা যখন কাঁদছে, স্বামী তখন বলছে—"শোন শোন, তোমার চোখের জলে কি-কি আছে আমি বিশ্লেষণ করেছি, ওতে আছে খানিকটা phosphate of lime, কিছু chloride of soda, খানিকটা mucus আর বাকীটা জল।"

কর্মব্যস্ত বৈজ্ঞানিক স্বামীর কাছে তাঁর স্ত্রীর চোখের জলের দাম এইটুকুই, তার বেশী নয়। স্বামী যেদিন তাঁর স্ত্রীর চোখের জলকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই করবেন সেই দুর্দিনকে মানুষের ভাগ্যে বিলম্বিত বা ত্বরান্বিত করবার দায়িত্ব উত্তর-পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে চলবে না। আমাদেরই তা ঠিক করতে হবে। মস্তিষ্কে বুদ্ধির পরিমাণ বেড়ে গেলেই কি মানুষ উন্মাদ হয়?

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি। তাঁর ভাষার স্বাভাবিক জলদমন্দ্র রুদ্র-মাধুর্য ও অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীর ভয়াবহ গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য অনুবাদ না করে সেটুকু উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করা গেল না। তিনি বলেছিলেন :—

"It is one of the evils of your Western Civilisation, that you are after intellectual education alone, and there is no safeguard with it. There is one mistake made; you give this education but you take no care of the heart. *It only makes you ten times more selfish and that will be your destruction.*"

এ কথা জানতে আজ বাকী নেই কারও, দ্রষ্টা ব্রহ্মর্ষির ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে।

হুজুগের ঝোঁকে আমরা কেবলই ভুলে যাই বিজ্ঞান আমরা চাই কেন? তথাকথিত সুখ বিধানের জন্যই তো। কিন্তু কপালদোষে "উল্টা সমঝলি রাম" হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভগীরথের মত বহু দুঃখ সহ্য করে বহু সাধনায় সভ্যতার বুকে খাল কাটলুম যেজন্য, সেই বিজ্ঞান-স্রোত এল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু সেই সঙ্গে দেখছি এসে গেছে প্রকাণ্ড এক কুমীর। আজ বিজ্ঞান-সিঞ্চিত উর্বরা সভ্যতা-ভূমিতে বাস করে কুমীরের ভক্ষ্য হব, কিংবা পালিয়ে যাব হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে এই সমস্যায় ইতিমধ্যে অনেক সুসভ্য পরিবার বিষ খেয়ে মরেছে।

কবি দার্শনিকশ্রেষ্ঠ টেনিসনের একটা কবিতায় আমাদের অবস্থার যে করুণ প্রতিচ্ছবি ফুটেছে তা সকলের পড়া দরকার—

"—Science moves, but slowly, creeping on from point to point;
Slowly comes a hungry people, as lion creeping nigher.
Glares at one that nods and winks behind a slowly dying fire.

* * *

Knowledge comes but wisdom lingers and I linger on the shore,
And the individual withers, and the world is more and more."

Knowledge and Wisdom—জ্ঞান ও বিদ্যা। জ্ঞান—জানা। বিদ্যা—সেই জানাটাকে আমার শরীর ও মনের অঙ্গীভূত করে নেওয়া। কে না জানে বর্ণ বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ এবং গায়ের জোর প্রভৃতি নীতি আজকের যুগে অচল। কিন্তু সেই জ্ঞানকে কোনদিন অন্তরে-বাহিরে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি কি? যদি না করে থাকি, তবে দোহাই আপনাদের—ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক, আর হুজুগে মাতাবেন না।

সংবাদ-সাহিত্য

[৩৬০ পৃষ্ঠার পর]

ভাষায় বহু চীনা ও ভারতীয় শব্দ ঢুকিয়াছে, লিপি চীনা এবং বর্ণমালা ভারতীয়—তাহাতে আমাদের লজ্জা নাই। এই ঋণ আমাদিগকে এক করিয়াছে, সমৃদ্ধ করিয়াছে এই কারণে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রশ্ন করিলাম, বর্ণমালা ভারতীয় মানে? জবাব পাইলাম, এগারো শো বছর আগে এক ভারতীয় অর্হৎ আমাদিগকে স্বর-ব্যঞ্জন বর্ণমালার ক্রম শিখাইয়াছিলেন, সেই ক্রমই আমরা অনুসরণ করিতেছি। ভারতীয় ভাষা? যে গৃহাচ্ছাদন টাইল সর্বদা আমাদের মাথা রক্ষা করে তাহাকে আমরা খাওয়ারা বলি—ভারতীয় খাপরা শব্দেরই জাপানী রূপ উহা। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষের এক হওয়ার সব চাইতে বড় বাধা ভাষা ও লিপির পার্থক্য। ইহা যেদিন এক হইবে সেদিন ভারতবর্ষের বহু সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, ভারতবর্ষ শক্তিশালী হইবে। কিন্তু তাহা হউক বা না হউক বর্তমানে প্রচলিত ভাষাতেই শিক্ষার বিস্তার চাই—৯৯'৯ না হউক শতকরা আশি জন শিক্ষিত হওয়া চাই।

গত কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে বাধার সৃষ্টি করিতেছেন। পরীক্ষা পাসের হার একদিকে মারাত্মকরকম কমাইয়া ফেলা হইতেছে অন্যদিকে অকৃতকার্য ছাত্রদের কোনও কলেজে স্থান নাই। যে কলেজে ছয়শত ছাত্র ফেল হইয়াছে সে কলেজে মাত্র ত্রিশজনকে পুনঃপ্রবেশের অধিকার দেওয়া হইতেছে। ইচ্ছা করিয়া প্রথম শ্রেণীর অনার্স দেওয়া বন্ধ করিয়া সর্বভারতীয় চাকুরিতে বাঙালীর ছেলের স্বার্থহানি ঘটানো হইতেছে। সমপর্যায়ের ছাত্ররা অন্য প্রদেশে কর্তৃপক্ষের উদারতায় প্রথম শ্রেণীর ছাপ পাইয়া চাকুরিতে সুবিধা করিয়া লইতেছে। এই আত্মঘাত মোটেই প্রশংসনীয় নয়। বাংলাদেশের অলিতেগলিতে ইউনিভার্সিটির উপর ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হইয়া করদাতাদের অর্থের শ্রাদ্ধ হইতেছে অথচ বৎসরে বৎসরে হাজার হাজার ছাত্র কলেজে ঢুকিতে না পারিয়া চলন্ত ট্রেনের তলায় ঢুকিতে চাহিতেছে। ইস্কুলে স্যামুয়েল টেলর কোলরীজের 'রাইম অব দি এনসিয়েণ্ট মেরিনারে' একজন নাবিকের হাহাকারে শুনিয়াছিলাম—"ওয়াটার ওয়াটার এভ্‌রি-হোয়ার নট এ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক।" বাঙালীর ছেলেদেরও অনুরূপ দুর্দশায় ফেলা হইতেছে। ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি এভ্‌রিহোয়ার, নট এ সীট টু সিট। ফেল করাইলেই ছাত্ররা ফেল হয়, পাস করাইলে শিক্ষার ধারাটা অব্যাহত থাকিয়া শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং জাপানী ভদ্রলোকের মত এই যে, শিক্ষিতের হার বাড়িলেই দেশের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

ফরিয়াদী

নরহত্যা, খুনখারাপি, লুটতরাজ, খাণ্ডবদাহন এবং নারীধর্ষণ ইত্যাদি সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও ব্যাপকভাবে করিয়া যাহারা আসামীশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে—যাহাদের উপরে এই সব অমানুষিক বর্বরতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, ফরিয়াদীস্বরূপ তাহারা—তাহাদের অর্থাৎ ওই আসামীদের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিয়াছে উচ্চতম বিচারকের দরবারে। আসামী-ফরিয়াদী উভয় দলের চরম শাসন-ব্যবস্থা এই দরবারেরই হাতে সংবিধান বলে অর্পিত ছিল। যদি এ কথা সত্য হয় এই রাহাজানির সংবাদ পূর্বাহ্ণে পাওয়া সত্ত্বেও ইহা নিবারণের কোন চেষ্টাই উচ্চতম কর্তৃপক্ষ করেন নাই তাহা হইলে তাঁহাদের বিচারও পক্ষপাতদুষ্ট হইতে বাধ্য। পূর্বপ্রদত্ত প্রশ্রয়-পাপকে ঢাকিবার জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ছলের অভাব কখনই হয় না। যথাযথ বিচারে সন্দেহ করিয়াই ফরিয়াদী পক্ষ আতঙ্কিত হইয়াছে। তাহারা নিরুপায়, অসহায়, কাজেই অসহায়ের অবলম্বনীয় একমাত্র পথ পলায়ন করিতে করিতে ক্রন্দন-চীৎকারে দিঙ্‌মণ্ডল মুখর করিতে বাধ্য হইতেছে। মাত্র চৌদ্দ বৎসর পূর্বের ভয়াবহ স্মৃতি তাহাদিগকে আরও ভয়াতুর করিয়া তুলিয়াছে। উচ্চতম কর্তারা যদি অপক্ষপাত বিচারের দ্বারা হতাশাক্লিষ্ট মানুষের মনে আশ্বাস ও সাহস সঞ্চার করিতে না পারেন তাহা হইলে বর্তমান উদ্বাস্তু-সমস্যা দ্বিগুণিত হইয়া দেশের সংহতি সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন করিবে। যে চক্রান্তের ফলে এমন কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে সে চক্রান্তে উচ্চ নীচ ও আসামী ফরিয়াদী যাঁহারাই থাকুন তাঁহাদিগকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না করিলে পাপের মূলোচ্ছেদ হইবে না এবং ভয়ার্তের ভয় কখনই দূর হইবে না। কিন্তু আসামীর হাতে যতকাল পাপানুষ্ঠান-ক্ষেত্রের কর্তৃত্ব ও শাসনভার থাকিবে ততকাল ন্যায়বিচারের চেষ্টা বিড়ম্বনায় পর্যবসিত হইবেই। এই কারণেই আমরা সাময়িক ভাবে শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি জানাইতেছি। আর একটা কারণ ১৯৬১ সনের আদমশুমারি। সংখ্যাগুরুকে সংখ্যালঘু করিবার জন্য যাহারা নৃশংস অত্যাচারে কুণ্ঠিত নয়, আদম-শুমারির দপ্তর তাহাদের তাঁবে থাকিলে হয় নয় হইতে

কতক্ষণ ? অত্যাচার-ব্যভিচারের উদ্দেশ্য যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনই হয় তাহা হইলে আগামী আদমশুমারি পর্যন্ত শাসন-ব্যবস্থান্তর একান্ত প্রয়োজন। এ যুগে যখন ন্যায়-নীতি-ধর্ম সমস্তই সংখ্যাসাপেক্ষ তখন সংখ্যাটা যাহাতে বাস্তবানুসারী হয় তাহার ব্যবস্থা করাও উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। যে ভূখণ্ডের সহিত সমগ্র দেশের সীমান্তসমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সে ভূখণ্ডের অন্তর্বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হইলে আন্তর্জাতিক অপঘাত অচিরাৎ আসিয়া পড়িবে। অঙ্কুরে বিনাশ না করিলে এই ভেদবুদ্ধিজাত তুষানল দেশের সর্বত্র ধিকিধিকি জ্বলিতে থাকিবে এবং একদিন অনুকূল বাতাসের সহায়তায় প্রচণ্ড দাবানলের সৃষ্টি করিয়া অখণ্ডকে খণ্ডিত এবং এককে বিচ্ছিন্ন করিয়া সমগ্রকে সমূলে ধ্বংস করিবে।

পুরাতন কথা

আসামে ভাষা লইয়া যে আন্দোলন তাহা আকস্মিক বা আধুনিক নয়। স্মরণ হইতেছে ১৯৩৬ সনে আমরা প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য গৌহাটি গিয়াছিলাম। সেখানে তখনই আসামীভাষাভাষীরা উগ্রপন্থী হইয়াছেন। আমরা আমাদের ভাষণে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, বাংলা আসামী একই ভাষা। বাংলা ভাষা অনুশীলনের ফলে অনেক অগ্রসর। সুতরাং দুইকে এক করিলেই লাভ, পৃথক হইলে দুই পক্ষেরই ক্ষতি। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পেটিকাটা ব-সম্বলিত কয়েকটি চিঠি পাইলাম; কয়েকটিতে আমরা দ্বিতীয়বার আসাম গেলে আমাদের পেটও কাটিয়া ফেলা হইবে এইরূপ শাসানি ছিল। কয়েকটি মুদ্রিত সংবাদপত্র স্থানে স্থানে লাল কালির দাগ দিয়া আমাদের পাঠানো হইয়াছিল, লাল মার্কার মোদ্দা কথা আমাদের রুধির দর্শন। এই আন্দোলন যে থামে নাই তাহার প্রমাণ পাইলাম ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে"। স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—

"আসাম প্রদেশের বাঙালী

ভৌগোলিক ও ভাষিক বঙ্গের কতক অংশ—যেমন শ্রীহট্ট জেলা—আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অসমিয়া-ভাষাভাষী অনেকে এই জেলাটিকে পুনর্বার বাংলাদেশভুক্ত দেখিতে ইচ্ছুক।

বঙ্গের কিয়দংশ আসামপ্রদেশভুক্ত হওয়ায় এবং আসাম প্রদেশের অন্যান্য অংশেও অনেক বাঙালী থাকায় ও যাওয়ায় ফল এই হইয়াছে যে, আসাম প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪৩ জন বাংলা-ভাষী এবং শতকরা ২১·৬ জন অসমিয়া-ভাষী। অর্থাৎ প্রদেশটির নাম যদিও আসাম, কিন্তু এখানে অসমিয়া-ভাষীরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ নহে। সমস্ত আসাম প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি শুধু তাহার সেই অংশটির কথা ধরা যায় যাহাকে খাস্ আসাম বা আসাম উপত্যকা বলে, তাহা হইলে দেখি সেখানেও অসমিয়া-ভাষীরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ অর্ধেকের উপর কিম্বা অন্ততঃ অর্ধেকও নহেন। সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে তাঁহারা শতকরা ৪১ জন, বাঙ্গালীরা প্রায় শতকরা ২৩ জন, বাকী শতকরা ৩৬ জন অন্য নানা ভাষাভাষী।

আসাম প্রদেশে বা খাস আসামে অসমিয়া-ভাষীরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ নহেন বলিয়া, সমগ্র প্রদেশে বাঙালীদের সংখ্যা তাঁহাদের প্রায় দ্বিগুণ বলিয়া, তথাকার বাঙালীরা সেখানে প্রভুত্ব করিতে বা তথাকার প্রধান অধিবাসী বলিয়া পরিগণিত হইতে চান না। অসমিয়া-ভাষীদের ও তাঁহাদের ভাষাসাহিত্য-সংস্কৃতির পূর্ণ উন্নতি হওয়াতে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। শিল্প-বাণিজ্যে ও কৃষিতে এবং সরকারী চাকরীতে অসমিয়া-ভাষীরা পূর্ণ সুযোগ ও অধিকার প্রাপ্ত হউন, ইহাও বাঙালীরা চান। কিন্তু তাঁহারা ইহাও চান যে, যেহেতু তাঁহারাও ভারতবর্ষের মহাজাতির, জানপদবর্গের ও পৌরজনের অংশ এবং যেহেতু তাঁহারাও আসাম প্রদেশেরও অধিবাসী, সেই জন্য তাঁহাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিনষ্ট বা খর্ব করিবার কোন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ চেষ্টা হইবে না, তাঁহাদের সন্তানেরা মাতৃভাষায় শিক্ষা পাইবে, তাঁহারা ন্যায্য মূল্যে জমি লইয়া ঘর-বাড়ী চাষ-বাস ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিবেন, এবং যোগ্যতা অনুসারে সরকারী চাকরী তাঁহারা পাইবেন। এই সকল ও অন্য কোন কোন বিষয়ে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ নানা বাধাবিঘ্ন ঘটায় এই বৎসর ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আসাম প্রদেশের পৌরজন-সভার (Assam Citizens' Association-এর) একটি কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল। আগেও এরূপ একাধিক কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। এই বৎসরের কন্‌ফারেন্সটিতে ২১টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৎসমুদয়ের ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের বৃত্তান্ত সমন্বিত একটি রিপোর্ট সভা ইংরেজীতে বাহির করিয়াছেন। রাধাকুমুদ বাবু তাহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

সমুদয় প্রস্তাবই ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত।"

গ্রন্থ - পরিচয়

রবীন্দ্রস্মৃতি ঃ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। বিশ্বভারতী, লিকাতা-৭। দুই টাকা।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিক উৎসব-দিবসের মাস কয়েক পূর্বেই ন্দিরা দেবীর মৃত্যু অতিশয় শোচনীয়। রবীন্দ্রনাথের ীবন ও সঙ্গীত সম্বন্ধে বর্তমানে তিনিই সর্বাধিক অভিজ্ঞ ছলেন এবং তাঁহারই কল্যাণে আমরা বিশ্বের পত্রসাহিত্যে বীন্দ্রনাথের অতুলনীয় দান 'ছিন্নপত্রে'র পাঠাধিকার াভ করিয়াছি। 'কড়ি ও কোমল' 'শিশু' প্রভৃতি াব্যগ্রন্থের নানা কবিতায় তিনি কবির কতখানি স্নেহ- াজন ছিলেন তাহার শাশ্বত প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে।

সুখের বিষয় মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার 'রবীন্দ্র- তি' 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া পুলিনবিহারী সেন প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। এই তিগ্রন্থে এমন অনেক বিচিত্র সংবাদ আছে যাহা আর াহারও জানা ছিল না। মানুষ, কর্মী, কবি রবীন্দ্রনাথকে মগ্রভাবে দেখিবার পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ সহায়তা রিবে। এবং এই সমগ্র দর্শন মধুর ও মনোহর। সেই বিই শ্রেষ্ঠ কবি যাহার পরিচয় দিনে দিনে ম্লান না হইয়া জ্জ্বলতর হয়---স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথের আলেখ্য ার একটু উজ্জ্বল করিয়া গেলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান ঃ শ্রীবিমানবিহারী জুমদার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পনের টাকা।

দীর্ঘ কুড়ি বৎসরেরও পরে শ্রীচৈতন্যসাহিত্য বিষয়ে তিশয় মূল্যবান এই গ্রন্থখানির যে দ্বিতীয় সংস্করণ হইল াহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কোনও মহাপুরুষ ম্পর্কে গ্রন্থ নানাভাবে লেখা যায়; ভক্ত পক্ষেও লেখা য় আবার পাষণ্ড পক্ষেও। পাষণ্ডেরা সন্দেহ তোলেন, ক্তেরা তাহা নিরাকরণ করেন। মজুমদার মহাশয় াবৈষ্ণব এবং ভক্ত মানুষ। তিনি চৈতন্যদেবের যাবতীয় রিতাখ্যানের আলোচনা করিয়া উপাস্যের সম্পূর্ণ রূপ রিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন, বহু পরস্পরবিরোধী উক্তির মাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্তমান সংস্করণে তাঁহার বিগত কুড়ি বৎসরের নবলব্ধ গবেষণা ও চিন্তার ফল যুক্ত হওয়াতে বইটির মূল্য আরও বাড়িয়াছে।

গোপীচন্দ্রের গান ঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। দশ টাকা।

দীনেশচন্দ্র সেন, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রের গান' দীর্ঘকাল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল অথচ বাংলা সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে গবেষণাকারীদের ইহা একটি মূল্যবান উপাদান। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রায় তিন যুগ পরে গ্রন্থখানি নূতন আলোকে সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করাতে তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ১৮৭৮ সনে প্রাচ্যবিদ্যার্ণব গ্রীয়ার্সন কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে "মানিকচন্দ্র রাজার গান" প্রকাশিত হওয়াতে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। তাহার পরে বহুজনে বহু নামে এই কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করিয়া বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে সহায়তা করিয়াছেন। ডাঃ ভট্টাচার্য এই সকল খণ্ড খণ্ড সাধনার ফল নিজ গ্রন্থমধ্যে ব্যবহার করিয়া এবং নিজস্ব সুচিন্তিত মন্তব্য মণ্ডিত করিয়া এই "ম্যাগনাম ওপাস" প্রকাশ করিলেন। তাহার ভূমিকা ও টীকা অতিশয় মূল্যবান হইয়াছে।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার ঃ শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত। গ্রন্থ- নিলয়, কলিকাতা-৬। দুই টাকা পঁচাত্তর ন. প.।

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাব্যসাহিত্য সমুদ্রবিশেষ। তিনি যে কত কবিতা লিখিয়াছেন এবং এখনও প্রায় প্রত্যহ লিখিতেছেন তাহার হিসাব তাঁহার নিজেরও নাই, আর কাহারও নাই। কতগুলি গ্রন্থাকারে কবিতাগুলি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন কারণ সব গ্রন্থ সুপ্রাপ্য নহে। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় সহস্রাধিক কবিতা যে আত্মগোপন করিয়াছে নিঃসংশয়ে তাহা বলিতে পারি। শ্রীমান ক্ষেত্র গুপ্ত এই সমুদ্র মন্থন করিয়া বিচিত্র ও মনোহর রত্নরাজির

সঙ্গে বাংলা কাব্যরসিকদের পরিচয় ঘটাইলেন। নয়টি অধ্যায়ে কুমুদরঞ্জনের মানসিকতা ও কাব্যরীতি বিশ্লেষিত হইয়া কবির একটি সামগ্রিক পরিচয় ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। উদ্ধৃতিগুলির বাছাইও চমৎকার। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি করিয়াছেন।

শুভ-নির্মাল্য—নাটিকা: নবীনচন্দ্র সেন। আট আনা।

প্রভাত—কবিতা: দীপককুমার সেন। আট আনা।

জননী ও জন্মভূমি—বাণী-সঙ্কলন: মণীন্দ্রনাথ সেন ও অমূল্যরতন চৌধুরী। এক টাকা।

তিনটি পুস্তকই নবীনচন্দ্র গ্রন্থাগার, কলিকাতা-২৮ হইতে প্রকাশিত।

ষাট বৎসর পূর্বে পুত্র নির্মলচন্দ্রের বিবাহ-উপলক্ষে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন 'শুভ-নির্মাল্য' নাটিকাটি রচনা করিয়াছিলেন ও বিবাহ-বাসরে ইহা অভিনীত হইয়াছিল। আত্মীয়বান্ধবদের মধ্যে বিতরণের জন্য ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি ইহা মুদ্রিতও হয়। এই অমূল্য-দুষ্প্রাপ্য কৌতুককর নাটিকাখানি পুনর্মুদ্রিত করিয়া শ্রীমান দীপক সেন তাঁহার অসাধারণ নবীনচন্দ্র-ভক্তিরই পরিচয় দিয়াছেন। ইতিপূর্বে নবীনচন্দ্রের কোনও গ্রন্থাবলীতে ইহা মুদ্রিত হয় নাই।

'প্রভাত' কয়েকটি সুমধুর কবিতার সমষ্টি। কিশোর কবির ভাব ও ছন্দ আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছে।

'জননী ও জন্মভূমি' একখানি চমৎকার বাণীসংগ্রহ গ্রন্থ। মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণ, বিভিন্ন দেশের ও জাতির ধর্মগ্রন্থ ও নীতিশাস্ত্র এবং প্রধানতঃ বাঙালী মনীষী ও কবিদের জননী ও জন্মভূমি প্রশস্তিসূচক বাণী দ্বারা গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। বহু বিখ্যাত ও পরিচিত শ্লোকাংশ ও কাব্যাংশের একত্র সমাবেশ দেখিয়া আনন্দ হইল। যাঁহারা জননী ও জন্মভূমিকে ভালবাসেন তাঁহারা এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া কাছে রাখিলে প্রীত ও উপকৃত হইবেন।

—স.

হারানো ছন্দ: মীরাটিলাল। অরুণিমা প্রকাশনী, ২ নং জগবন্ধু মোদক রোড, কলিকাতা-৫। দুই টাকা।

উপন্যাসে কাহিনীর একটা বড় স্থান আছে, একথা স্বীকার করেও বলা যায়, চরিত্রসৃষ্টিতেই ঔপন্যাসিকের দক্ষতা। ডিকেন্স দিয়েছেন কতকগুলি অবিস্মরণীয় চরিত্র আর হার্ডি পড়লেই একটানা কাহিনীর এক মোহময় আকর্ষণ মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ভিন্নতর স্বাদ পাওয়া যায় লরেন্সে, জয়েসে। অতএব উপন্যাসের শেষ কথা কেউ বলেন নি, বলা সম্ভবও নয়। বাংলা দেশের উপন্যাসে পশ্চিমের হাওয়া এসেছে উনিশ শতকে, এখনও সেই খোলা জানলা বন্ধ হয় নি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সক্ষম ও অক্ষম হাতের উভয়বিধ রচনা পড়েই মনকে বলতে পারি, এত ব্যস্ততা কেন, রসের শেষ কথা এখনই জানতে চাওয়া ভুল, বাংলা উপন্যাসের বয়সই বা হল কত।

মীরাটিলালের 'হারানো ছন্দ' আলোচনায় উপন্যাসের এই ভূমিকার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তরুণ লেখক এখানে একটি জীবনের কাহিনী বলেছেন, যা দুঃখ ও বেদনা, মান-অভিমানের স্তর পেরিয়ে একটি প্রণয়মধুর পরিসমাপ্তিতে গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি দুটি জীবনের একটি কাহিনী বলেছেন, অমিতাভ আর শাশ্বতী, ভাগ্যচক্রে যাদের বিবাহ, ভাগ্যবিড়ম্বনায় যাদের বিচ্ছেদ ঘটেছিল। দুটো চরিত্র পৃথক মেজাজের, স্বতন্ত্র তাদের দৃষ্টিভঙ্গী। অমিতাভ খ্যাতিহীন যুবক, শাশ্বতী বিত্তশালিনী তরুণী। বিয়ে হলেও তাদের মন জোড়া লাগে নি। কিন্তু অমিতাভ তার অজ্ঞাতবাসে কঠোর সাহিত্যসাধনায় যেদিন দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করল, অভিমানিনী শাশ্বতী সেদিন সাগ্রহে এসে ধরা দিল স্বামীর কাছে। তাদের হারানো ছন্দ আবার জীবনের স্বপ্ন ও সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত হল।

মীরাটিলালের কুশলী লেখনীতে এই সুন্দর রোমান্টিক কাহিনীটি স্বল্পপরিসরে পুরুষ ও নারী হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে অনুরণন তুলতে সমর্থ হয়েছে। কাহিনী ও চরিত্র দুই-ই এখানে সমান মর্যাদা পেয়েছে। লেখকের আন্তরিকতায় জীবনের উষ্ণ স্পর্শ সমগ্র উপন্যাসটিকে দিয়েছে এক বিরল সৌন্দর্য, যার জন্য অপেক্ষা করে থাকা যায়। লেখকের এই প্রথম উপন্যাসে পরিণত মনের সন্ধান পেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি। তিনি জীবনের গভীরতর, প্রশস্ততর উপন্যাস লিখবেন এ আশা করি। কৃষ্ণ ধর

বৈঠকী গল্প: সন্তোষকুমার দে। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দুই টাকা পঞ্চাশ ন.প.

বাংলায় রসরচনা অন্য রচনার তুলনায় কমই লেখা হয়। সন্তোষকুমার দে-র 'কৌতুক-যৌতুক,' 'সরস গল্প' এবং বর্তমান গ্রন্থ 'বৈঠকী গল্প' তাঁকে রসরচনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে পনেরটি সরস রচনা আছে—তার মধ্যে একটি একাঙ্ক নাটিকা এবং দুটি ব্যঙ্গ কাব্য এবং বাকি বারোটি ছোট গল্প। ব্যঙ্গকাব্যের মধ্যে 'টলিউডের উনি' শনিবারের চিঠির একটি পূজা-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

'বৈঠকী গল্প' গ্রন্থখানির অন্যতম আকর্ষণ ব্যঙ্গচিত্রী রেবতীভূষণ ঘোষের অঙ্কিত সুন্দর চিত্রগুলি। রূপে রসে 'বৈঠকী গল্প' তাই পরম উপভোগ্য হয়েছে। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। —প্রবোধ নান

শতাব্দীর অধীশ্বর*

"Whether it be that I was born mad or a little too sane, my kingdom was not of this world : I was at home only in the realm of my imagination, and at my ease only with the mighty dead"—G. B. S.

শতাব্দীর আদ্যক্ষর যে শ সে কেবল 'একশত' এই কথার সংক্ষিপ্তকরণ নয় ; বর্তমান শতাব্দীর যিনি অধীশ্বর তিনিও নিঃশব্দে উপস্থিত ওই একটি শব্দের মধ্যেই : জর্জ বার্নার্ড শ।

এই শতাব্দীর অধীশ্বর দুজন। প্রাচ্যের—রবীন্দ্রনাথ ; প্রতীচ্যের—বার্নার্ড শ। না। রবীন্দ্রনাথ কেবল প্রাচ্যের নন, প্রতীচ্যেরও। রবীন্দ্রনাথ কেবল শতাব্দীর নন, কালেরও অধীশ্বর। তিনি নিরবধি কালের এবং বিপুলা পৃথ্বীর—কারণ তিনি কবি। বার্নার্ড শ জীবনরঙ্গমঞ্চের শেষ বিদূষক ; এই বিশ্বের অশেষ বিস্ময়। ভোলতেয়ারে যে বিপুল বিচিত্র বলশালী বিস্ময়ের সূচনা ; শ'য়ের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অশেষ বিস্ময়ের অনির্বাণ শিখার অবশেষ লুপ্তপ্রায়। একথা ঠিক যে ভোলতেয়ারের সঙ্গে শ'য়ের নাম যুক্ত হলেও ভোলতেয়ার প্রথম শ্রেণীর 'উইট', শ দ্বিতীয় শ্রেণীর। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে 'বিলং' করা সত্ত্বেও শ এক জায়গায় বিশ্বের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর বিদূষকের তুলনায়, ভোলতেয়ারের সঙ্গে অসম তুলনাতেও অদ্বিতীয় ; সেই অবধারিত ক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের প্রতি তুলনাবিহীন বিশ্বাসের কুরুক্ষেত্র। সেক্সপীয়রের নাটক যখন সেক্সপীয়রের জীবনদর্শন আওড়ায় : Out, out, brief candle, শ তখন গর্জন করে ওঠেন : Life is no brief candle for me. It is a sort of splendid torch, which I have got hold of for the moment : and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations."

সেক্সপীয়রের সঙ্গে নয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর সৃষ্টিধর্মী নাট্যকারদের তুলনাতেও শ'য়ের নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃত হবে না কোনও দাবি। ভবিষ্যৎকালের কথা বলছি না ; এখনই শ প্রায় বিস্মৃত। উইট অথবা ইনটেলেকচুয়াল হিসেবেও শ'য়ের প্রতিষ্ঠা অস্থায়ী। কেবল একা তাঁর নয়, ওয়েলস্, ওয়েব সমেত যাঁরা fallen among fabians তাঁরা আজ তবু জীবিতাবস্থায় নয় মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ধরা পড়ে গেছেন। ধরা পড়ে গেছেন যে তাঁরা সবাই অল্প জলের সফরী ; তাঁরা কেউ জায়াণ্ট তো ননই, উপরন্তু সেক্সপীয়র, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, গেটে, রবীন্দ্রনাথ, এমন কি ডারুইন, কার্ল মার্কস, ফ্রাডরিক এঙ্গেলস, সিগমুণ্ড ফ্রয়েডদের তুলনাতে পিগমিও নন। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন আর্নল্ড বেনেটের দিনপঞ্জীতে সেই কথাই পড়ি তাই :

"Soon after Shaw and the Wellses came Hardy seemed to curl up....The spectacle of Wells and G. B. S. talking firmly and strongly about the war, in their comparative youth, in front of this aged, fatigued and silent man—incomparably their superior as a creative artist—was very striking." [The Journals of Arnold Bennett : July 1917]

টমাস হার্ডিকেই বেনেট 'incomparably superior as a creative artist' বলেছেন শ আর ওয়েলসের থেকে ; আরও বড়দের নাম না হয় নাই করলাম।

Creative artist না হয় ফেবিয়ানরা নাই হলেন। কিন্তু এঁদের রচনায় এবং উক্তিতে এমন একটি শব্দও পাওয়া শক্ত যা আগামীকাল অনেক দূরের কথা, একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেচে। এর কারণ এঁরা যে পরিমাণ গর্জেছেন সে পরিমাণে বর্ষণ এত নগণ্য যে শ এবং ওয়েলস অথবা ফেবিয়ানদের আর কেউ কখনও ছিলেন বললেও, তাঁরা কে ও কী, জানতে চাইবে আগামী কয়েক বছর বাদের কাল ; এখনই তাঁরা 'had been'।

তা হলে শ কেন শতাব্দীর অধীশ্বর ? নাট্যকার অথবা মনীষী বলে নন নিশ্চয়ই। শ'য়ের সৃষ্ট কোনও চরিত্রের নাম পর্যন্ত লোকে মনে রাখে নি : না সাধারণ, না অসাধারণ কেউই। মনে রাখে নি, কারণ তারা

জীবন্ত চরিত্র নয় কেউ। ডক্টর জনসনের উইট সম্পর্কে বইয়ের পর বই লেখা চলে ; শ'য়ের উইট খুব বেশী হলে রীডার্স ডাইজেস্টের পাদপূরক হিসেবে চলে। শ তবুও এ শতাব্দীর অদ্বিতীয় নাম ; সে নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবার যোগ্য নাটকের, উইটের অথবা মনীষার কারণে নয় ; মানুষ হিসেবে শ'য়ের মহত্ত্বই এর একমাত্র কারণ।

শ'য়ের নাট্যজীবনের নয়, জীবননাট্যের মূল্য অপরিমীম।

অসত্যের, অর্ধসত্যের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের সংগ্রামে রক্তাক্ত বার্নাড শ-ই এ শতাব্দীর এবং আগামী বহু শতাব্দীর প্রণম্য। ভবানী মুখোপাধ্যায় তাঁর জর্জ বার্নাড শ নামক বাংলা গ্রন্থে শ'য়ের নাট্যজীবনের বিশ্লেষণের চেয়ে, জীবননাট্যের ব্যাখ্যায় অনেক বেশী সময়, নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধা ব্যয় করেছেন বলেই এ বই আজ পর্যন্ত শ'য়ের ওপর যত ভাষায় যত বই বেরিয়েছে তাদের সকলের চেয়েই এ কারণে অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য।

আমি জানি যে এদেশের সাময়িক-পত্রের সমালোচনার নামে দলীয় লোক হলে তার স্তুতি এবং বৈরী হলে ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রদর্শনের পৃষ্ঠায় ভবানীবাবুর এই বইয়ের প্রধান ত্রুটি বলে যেটি পরিগণিত হবে, সেটিই আমার দৃষ্টিকোণ থেকে এ বইয়ের সবচেয়ে বড় গুণ—শ'য়ের নাট্যজীবনের চেয়ে জীবননাট্যের উপস্থিতি। আমার এই বক্তব্য পেশ করে অতঃপর প্রবৃত্ত হই এই নাতিবৃহৎ কিন্তু সুমহান বাংলা জীবনীগ্রন্থের আলোচনায়।

দুই

শ'য়ের সমস্ত নাটকের চেয়ে শ নিজে অনেক বেশী নাটকীয় চরিত্র [সব মহৎ এবং মন্দ মানুষই অল্পবিস্তর অতিনাটকীয়]। সেই দুর্দান্ত ড্রামাটিক জীবনকে বঙ্গভাষায় উপস্থিত করতে গিয়ে ভবানীবাবু কদাচ মেলোড্রামাটিক হয়েছেন, এর জন্যে যথেষ্ট সাধুবাদেও তাঁর প্রাপ্য পূরণ হয় না। তিনি সংযত সংহত ভাষায় একটি জীবনসঙ্গত আলেখ্য তুলে ধরেছেন—এদেশের জীবনীগ্রন্থের ইতিহাসে যার অনুরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বঙ্গভাষায় উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে, অন্ধভক্তির আতিশয্যে, সর্বোপরি অলীক অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্যের অনিবার্য পৌনঃপুনিকতায় জীবনের এতটুকু গন্ধ পর্যন্ত সেই জীবনী থেকে সম্পূর্ণ উবে যায় ; প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম ছত্র থেকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় অমূল্য জীবনের মূল্যবান উপাদানসমূহ। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের জর্জ বার্নাড শ, বাংলা জীবনচরিতের সেই চরিতামৃত-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত আর সতর্ক সজাগ থাকার ফলে, সত্যের অমৃত পরিবেশনে প্রথম সমর্থ সাবালকপাঠ্য বাংলা জীবনী। এ হচ্ছে এ বইয়ের এক গুণ ; তার আর এক গুণ আরও পজিটিভ, আরও সুনির্দিষ্ট—তা হচ্ছে বঙ্গভাষায় যখনই যিনি উচ্ছ্বাসবর্জিত যথাযথ জীবনী রচনা করতে এগিয়েছেন তখন তিনি নীরস তথ্যের, শুষ্ক সন-তারিখের, বিশুষ্ক সংখ্যাতত্ত্বের এমন সমাবেশ ঘটিয়েছেন যাতে চরম কৌতূহলোদ্দীপক জীবনীও হয়ে দাঁড়িয়েছে অচিন্তনীয়রূপে অপাঠ্য। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের জর্জ বার্নাড শ অতিকথনের অতিনাটকীয়তার মুদ্রাদোষ থেকে যেমন, তেমনই প্রসাদগুণবর্জিত ভাষার অজীর্ণতার 'অ-সুখ'পাঠ্যতার কবল থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত একটি তথ্যের সঙ্গে উপস্থাপনের, তথ্যের সঙ্গে নির্বাচনের, সন-তারিখের সঙ্গে কালোত্তীর্ণ সত্যের সার্থক রাখীবন্ধনের অতি উজ্জ্বল উদাহরণ।

সব দেশে সব কালেই সাহিত্যে-শিল্পে কেউ কেউ প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয় ; যেমন কেউ কেউ প্রাপ্যের চেয়ে বেশী পায়। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হবে কেন ? বঙ্গভাষার পাঠকপাঠিকাদের কাছে ভবানী মুখোপাধ্যায়ের যা প্রাপ্য তার তুলনায় অনেক কম পেয়েছেন তিনি। প্রধানতঃ তাঁর পরিচয় অনুবাদক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলেই এই প্রাপ্তিযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তিনি। হয়েছেন এতকাল ; এখন তাঁর নতুন করে দিগ্বিজয় আরম্ভ হবে যে-গ্রন্থ উপলক্ষ করে সে বইয়ের নামই : জর্জ বার্নাড শ। এই গ্রন্থে যে ভবানী মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে সে ভবানী মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠ বঙ্গানুবাদকের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয় নয়। একটি মহৎ জীবনের জীবন্ত অনুবাদ করেছেন তিনি এই গ্রন্থে। এ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় যাঁরা জীবনচরিত রচনায় হাত দিতে চান, কেমন করে আদর্শ জীবনী লিখতে হয়, সে সম্পর্কে তাঁদের বর্ণপরিচয় করাবার যোগ্যতার অধিকারী।

ভবানী মুখোপাধ্যায় বহু ভাল ইংরেজি বইয়ের আরও ভাল অনুবাদ করেছেন বাংলায় ; বাংলা ভাষায় রচিত ভবানী মুখোপাধ্যায় বিরচিত জর্জ বার্নাড শ—ইংরেজি এবং অন্য ভাষায় অনূদিত হবার দাবি রাখে।

দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

---

*জর্জ বার্নাড শ : ভবানী মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। আট টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮

৩২শ বর্ষ,
১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৭
পূজা সংখ্যা

গ্রন্থাকারে পরিত্যক্ত রবীন্দ্রনাথের হাস্য ও ব্যঙ্গ কৌতুক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

১২৯১ বঙ্গাব্দ বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে ও রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওই বৎসরের ৮ই বৈশাখ কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী'র সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করেন এবং স্বর্ণকুমারী দেবী উহার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুশোকে সাময়িকভাবে উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়েন। এই কালে কয়েকটি ধর্মমূলক সাময়িক পত্রের প্রকাশে বাংলা সাময়িক সাহিত্য নীতিশাস্ত্র-ধর্ম-সংক্রান্ত কলহ-বাদানুবাদে মুখর হইয়া উঠে। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক (১ম প্রকাশ ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৮) এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি নব্যব্রাহ্মগণ পরিচালিত 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিকে (প্রথম প্রকাশ ৩ বৈশাখ ১২৯০) তো খিটিমিটি লাগিয়াই ছিল। ১২৯১ সালের বৈশাখে মাসিক 'ব্রাহ্মজীবন', শ্রাবণে বঙ্কিমের পৃষ্ঠপোষকতায় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় মাসিক 'নবজীবন' এবং বঙ্কিম-জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক 'প্রচার', ভাদ্রে ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পালের সহায়তায় গগনচন্দ্র হোম সম্পাদিত মাসিক 'আলোচনা' এবং আশ্বিনে শান্তিপুর হইতে শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত (হিন্দুধর্ম প্রসারকল্পে) মাসিক 'আর্য্যবন্ধু' বাহির হইল। 'নবজীবন' ও 'প্রচারে'র প্রথম সংখ্যাতে যথাক্রমে "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" ও "হিন্দুধর্ম্ম" প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রিয়বন্ধু আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রধান দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে "দুঃখিত" করিলেন। ১২৯১ ভাদ্র সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিলেন। শ্রাবণ মাস হইতেই 'নবজীবন' 'সঞ্জীবনী' ও 'বঙ্গবাসী'তে কলহ শুরু হইয়াছিল। 'সঞ্জীবনী'তে "র" আদ্যাক্ষরযুক্ত লেখকও এই কলহে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'রবীন্দ্রজীবনী'কার প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন : "আদিব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই আগ্রহ দেখিয়া মহর্ষি বোধ হয় মনে মনে খুশি হইলেন ; মৃতকল্প আদি-সমাজের মধ্যে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করা যায় ভাবিয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথকে আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে নির্বাচিত করাইলেন (১২৯১ আশ্বিন)। যুবক রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক-পদে অধিরূঢ় হইয়া নিজ কর্তব্য অত্যন্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন......" ['রবীন্দ্রজীবনী' ১ম খণ্ড ২য় সং, পৃ. ১৫১]

শোকবিমূঢ় নিষ্ক্রিয় রবীন্দ্রনাথ হাতে কাজ পাইয়া অত্যন্ত উৎসাহী ও উগ্র ভাবাপন্ন হইয়া নব্যহিন্দুদের সহিত

ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কবি ও লেখকের পক্ষে যুদ্ধ মানেই মসীযুদ্ধ। 'সঞ্জীবনী'তে প্রথম প্রকাশিত ১ম সংস্করণ 'কড়ি ও কোমলে'র "পত্র। শ্রীমান দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু" (১২৯১ ?) হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৯৯ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে লেখা 'সোনার তরী'র "হিং টিং ছট" পর্যন্ত বহু কবিতা একদিকে যেমন এই মসীযুদ্ধের ফল, অন্যদিকে তেমনি 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র গোড়ার দুইটি রচনা "রসিকতার ফলাফল" (১২৯২ বৈশাখ 'ভারতী') এবং "ডেঞ্জে পিঁপড়ের মন্তব্য" (১২৯২ বৈশাখ 'বালক') এবং সমগ্র 'হাস্য কৌতুক' বইখানিও (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ হইতে ভাদ্র ১২৯৪-এর মধ্যে রচিত) সেই কলমের লড়াইয়ের ফসল। "দামু-চামু" সংক্রান্ত ২১ স্তবকের কবিতাটি রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে একেবারে বিলুপ্ত করা হইয়াছে। প্রভাতকুমার 'রবীন্দ্রজীবনী'তে (১ম খণ্ড ২য় সং পৃ. ১৭২) শেষের ১৫ (৭-২১) স্তবকের ৩টি স্তবক পরিত্যাগ করিয়া ১২টি স্তবক পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। আমি এখানে কবিতাটির প্রথম ৬ স্তবক এবং প্রভাতকুমার-পরিত্যক্ত ১৩, ১৭ ও ১৮ স্তবক মোট ৯টি স্তবক পুনর্মুদ্রিত করিয়া এই যুগের পাঠকদের সম্পূর্ণ কবিতাটি দেখিবার সুযোগ করিয়া দিলাম:

১। দামু বোস্ আর চামু বোসে
কাগজ বেনিয়েছে,
বিদ্যেখানা বড্ড ফেনিয়েছে!
(আমার দামু আমার চামু!)

২। কোথায় গেল বাবা তোমার
মা জননী কই!
সাত রাজার ধন মাণিক ছেলের
মুখে ফুট্‌চে খই!
(আমার দামু আমার চামু!)

৩। দামু ছিল এক-রত্তি
চামু তথৈবচ,
কোথা থেকে এল শিখে
এই খচমচ!
(আমার দামু আমার চামু!)

৪। দামু বলেন "দাদা আমার"
চামু বলেন "ভাই,"
"আমাদের দোঁহাকার মত
ত্রিভুবনে নাই!"
(আমার দামু আমার চামু!)

৫। গায়ে পড়ে গাল পাড়চে
বাজার সরগরম,
মেছুনি-সংহিতার ব্যাখ্যা
হিঁদুর ধরম!
(দামু আমার চামু!)

৬। দামুচন্দ্র অতি হিঁদু
আরো হিঁদু চামু
সঙ্গে সঙ্গে গজায় হিঁদু
রামু বামু শামু—
(দামু আমার চামু!)

১৩। মনু বলেন "ম'নু আমি"
বেদের হল ভেদ,
দামু চামু শাস্ত্র ছাড়ে,
রৈল মনে খেদ!
(ওরে দামু ওরে চামু!)

১৭। আদর পেয়ে নাদুস্ নুদুস্
আহার করচে ক'সে,
তরিবৎটা শিখলেনাক
বাপের শিক্ষাদোষে!
(ওরে দামু চামু!)

১৮। এস বাবু কানটি নিয়ে,
শিখ্‌বে সদাচার,
কানের যদি অভাব থাকে
তবেই নাচার!
(হায় দামু হায় চামু!)

'ভারতী ও বালক' ১২৯৪ আষাঢ়ে প্রকাশি "হেঁয়ালিনাট্য" [পিতাপুত্র] রবীন্দ্রনাথের রচনা হও সত্ত্বেও 'হাস্য কৌতুকে' স্থান পায় নাই ; ইহাতে আযাি বিরুদ্ধে খোঁচা নাই তবে উচ্চশিক্ষিত নব্যবঙ্গের ভা

ও নীতিবোধের বিরুদ্ধে কঠিন শ্লেষ আছে। এতখানি ইংরেজী প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ 'গোড়ায় গলদে'র ললিত চাটুজ্জে ছাড়া আর কাহাকেও দিয়া করান নাই। লেখাটি 'ভারতী ও বালক' হইতে নীচে উদ্ধার করিয়া দিলাম :

হেঁয়ালিনাট্য

বৈকুণ্ঠ, তস্য পুত্র খগেশ এবং অন্যান্য পাঁচজন।

বৈ। আমার ছেলের কি বুদ্ধি! প্রায় আমারই মত। যখন তর্ক করে মুখের কাছে দাঁড়ান যায় না! বাবা খগেশ, অনেক লোক উপস্থিত আছেন, এইখেনে একবার তর্ক কর্ত্তে আরম্ভ কর দেখি!

অন্য পাঁচজন। (মনে মনে) তা হলে পালাতে হয় বুঝি!

খগেশ। আচ্ছা রাজি আছি। এখন কাকে ওড়াতে হবে কাকে রাখ্‌তে হবে বলে দাও!

অন্য পাঁচজন। (মনে মনে) আপনাকে আর বাবাকে রেখে বাকি সকলকে উড়িয়ে দাও!

বৈ। বাবা, যেটা হাতের কাছে পাও সেইটেই ওড়াও। ইহকাল ওড়াও, পরকাল ওড়াও।

খ। তা হলে বোস বাবা, আগে dinnerটা খেয়ে নেওয়া যাক্, তার পরে খেয়ে দেয়ে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বসে-বসে চুরট টান্‌তে টান্‌তে চুরটের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আরামে উড়িয়ে দেব, যারা যারা উপস্থিত থাকবে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।

বৈ। That's right খগেশ! আপনারা সকলেই দেখ্‌চেন, আমার খগেশ কেমন sensible। ওর মাথায় কোন রকম nonsense নেই। যেটা real এবং immediate want তার প্রতি ওর প্রথম নজর—তার পরে সেটা satisfied হলে পরে কাগজের চুরটের মত জগতের ডগায় তর্কের দেশলাই ধরিয়ে ওটাকে quietly বসে বসে ধোঁয়া করেই ওড়াও বা ছাই করেই ফেল তাতে আরাম বই কারো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

খ। হাঃ হাঃ হাঃ, বাবা has put the matter very well indeed. আমি দেখেছি বাবা যেমন clearly and with great precision একটা proposition lay down কর্ত্তে পারেন, এমন there are very few men who—

বৈ। সে আর তোমার বলবার দরকার নেই। I know that. আর কিছু না, এর secret হচ্ছে clear head এবং proper training। আমাদের দেশের লোকের ঐ দুটো জিনিষেরই বিশেষ অভাব and in consequence none of them has the least idea how to think out a subject.

খ। And I must confess তুমি আমার বাবা হওয়াতে আমার ঐ এক মস্ত advantage হয়েছে, certainly I possess a clear head, আর তার জন্যে আমি তোমার কাছে really grateful আছি বাবা।

অন্য পাঁচজন। বাপ-বেটার কি বিনয়।

খ। Nonsense! বিনয়! আচ্ছা এস এই বিষয়ে একটা settle করা যাক্। I don't believe in বিনয়। It must be either hypocrisy or ignorance, যারা really clever they know they are clever and why should they not make it known to other people! Now come বিনয় কাকে বলে, let us have a definition of it.

অন্য পাঁচজন। (মাথা চাপ্‌ড়াইয়া) Clear head নেই। খগেশ বাবু, তোমার বাবার মত বাবা আমাদের ছিল না। বিনয়ের definition আমাদের ঠাহর হচ্চে না!

বৈকুণ্ঠ। ওহে ও যজ্ঞেশ্বর, শুনে যাও শুনে যাও, আমার ছেলে খগেশ এদিকে তর্ক কর্ত্তে আরম্ভ করেছে—It's a treat to hear him argue। (খগেশের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া) Go on খগেশ।

যজ্ঞে। আজ আমাদের ওখেনে খেতে গেলে না যে!

খগেশ। (হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া) Now come কেন খেতে যাব!

যজ্ঞে। কথা ছিল যে।

খ। কি কথা ছিল ভাল করে analyze করে দেখা

যাক্। তুমি আমাকে বল্লে খগি কাল আমাদের বাড়ি খেতে যাবে কি? আমি বল্লুম "হাঁ" ভেবে দেখ it was no promise। তুমি simply একটি fact জান্তে চেয়েছিলে এবং তখন যেটা likely answer বোধ হল সেইটে তোমাকে বল্লুম। মনে কর if you had asked me খগি, কাল তুমি কি কালো মোজা পরবে, and if I happened to have answered হাঁ, এবং আজ যদি আমি কালো মোজা না পরতুম, what then! কিন্তু তুমি যদি বল্তে—

যজ্ঞে। বুঝেছি খগেশ, আর কাজ নেই।

খ। কাজ আছে। তুমি না কি হঠাৎ এসে একটা wrong statement করে সকলের মনে একটা vague impression create করে দিয়েছ যে আমি আমার promise রাখিনে তারি absurdity আমি প্রমাণ করে দিতে চাই। Now to the point—তুমি আমাকে next question জিজ্ঞাসা করলে "কখন্ আসবে?" আমি বল্লুম "তা বল্তে পারিনে আমি ঘড়ি ধ'রে কাজ করিনে।" তুমি একটা further question জিজ্ঞাসা করলে আমি তার এক indefinite উত্তর দিলুম—and the last question was "তুমি কি খাবে? মাংস না ডাল ভাত?" আমি বল্লুম "যা পাব তাই খাব।" There it ended, এর থেকে কি কি প্রমাণ হচ্চে দেখা যাক্—

যজ্ঞে। রক্ষে কর বাপু আমার বাড়িতে যে তোমার পা পড়েনি সে আমার পরম সৌভাগ্য বল্তে হবে।

অন্য পাঁচ জন। পা পড়েনি বলচেন কি, মাথা পড়েনি বলুন—আপনার নেমন্তন্নের মধ্যে যদি ওঁর clear headটা হঠাৎ গিয়ে পড়ত সে ত কামানের গোলা পড়ত, আপনার বন্ধুবান্ধবেরা সশঙ্কিত হয়ে উঠত। Clear head অতি ভয়ানক জিনিষ! বিশেষ, সভাস্থলে।

যজ্ঞে। তা ঠিক বলেছেন।

বৈ। (পিঠ থাব্ড়াইয়া) তুমি বলে যাও না খগেশ। থাম্লে কেন। বেশ বল্‌ছিলে।

খ। যার এক পাতা logic পড়া আছে সে কখনো deny কর্ত্তে পার্ব্বে না যে—

য। তোমার যা বল্‌বার বল আমরা চল্লুম।

বৈ। কেন কেন?

যজ্ঞে। ভদ্র সমাজে নিমন্ত্রণে বা বন্ধুবান্ধবের সভায় ভদ্রলোকেরা গল্প সল্প করে, আমোদ করে, আলোচনা করে, কিন্তু পারতপক্ষে তর্ক করে না। যারা কথায় কথায় তর্ক উঁচিয়ে থেঁকিয়ে আসে, তাদের এক রকম সঙ্কীর্ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকতে পারে বটে কিন্তু তারা ভদ্র নয়।

বৈ। কিন্তু ideaর precision—

খ। Perceptionএর clearness,

বৈ। Exepressionএর luminous lucidity.

খ। The sense of utter futility of all fog and fallacy—

যজ্ঞে। ও সবই থাক্‌তে পারে কিন্তু তাই বলে তার্কিকতা নামক তীক্ষ্ণ ও বর্দ্ধনশীল জিহ্বাগ্রভাগ সর্ব্বদা সকলকে প্রদর্শন করবার জন্যে সর্ব্বদা বের করে উঁচিয়ে রেখে দিতে হবে ভদ্রসমাজে তার কোন আবশ্যক নেই।

খ। "ভদ্রসমাজের" definition কি?

বৈ। And what is "তর্ক।"

খ। জিহ্বাই বা কি? Where is the analogy?

বৈ। এবং "আবশ্যক" কাকে বলে?

খ। তোমার idea of "সর্ব্বদা"ই বা কি রকম!

সকলে। আর এক দণ্ড এখানে থাকা নয়।

খ। দেখেছ বাবা, একটা proposition-এর মধ্যে string of inaccuracies!

বৈ। Want of precision and proper training! [সমাপ্ত]

'হাস্য-কৌতুকে'র "একান্নবর্ত্তী" নামক কৌতুকনাট্যটি "হেঁয়ালিনাট্য" শিরোনামায় ১২৯৪ সালের বৈশাখের 'ভারতী ও বালকে' বাহির হয়। ইহার প্রথমাংশ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া পুস্তকে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে:

"দৌলত। হৃদয় যখন ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তখন কোম্পানির দমকল এলেও থামাতে পারে না। একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে সভায় দাঁড়িয়ে অনর্গল বলতে লাগলুম,

সভাপতি ঘুমিয়ে পড়াতে নিষেধ করবার কেউ রইল না। শেষকালে দুজন ছোকরা এসে দুই হাত ধরে আমাকে টেনে বসিয়ে দিলে। সেদিন এত উৎসাহ হয়েছিল।

কানাই। বটে, তা হবার কথাই তো। তা আপান কী বলেছিলেন।

দৌলত। আমি বলেছিলেম স্বার্থত্যাগের উপায় একান্নবর্তী পরিবার। যেখানে পরের অর্থেই জীবন-নির্বাহ হয় সেখানে স্বার্থের কোনো প্রয়োজনই হয় না। খবরের কাগজে আমার বক্তৃতা খুব রটে গেছে—তারা সকলেই বলচে, দুঃখের বিষয় দৌলত বাবুর পরিবার কেউ নেই, তিনি একলা। (দীর্ঘনিশ্বাস)"

মুসে ছিল :

"দৌ। হৃদয় যখন ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তখন বক্তৃতা করা কি সহজ? একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা সম্বন্ধে আমি যতই ভাবতে লাগলুম আমার উৎসাহ ততই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল, সভায় দাঁড়িয়ে ততই আমি অনর্গল বলতে লাগলুম সভাপতি ঘুমিয়ে পড়াতে আমাকে নিষেধ করবার কেউ রইল না। অবশেষে দেখলুম্ শোন্‌বার লোকও বড় একটা কেউ নেই, সেজের বাতিগুলো শুভ্র অশ্রুধারায় বিগলিতকলেবর হয়ে ক্রমেই অস্তিত্বের নিকটবর্ত্তী হতে লাগল। কিন্তু আমার বাগ্মিতা-শিখা সমান ভাবেই জ্বল্‌তে লাগল; শেষ কালে দুজন ছোক্‌রা এসে জোর করে আমার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলে। বাড়িতে ফিরে এসে আমার কালাচাঁদ খানসামাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জোর করে বসিয়ে বাকি বক্তৃতাটুকু তাকে শুনিয়ে তবে রাত্তিরে একটু ঘুম হয়। সে দিন আমার এত উৎসাহ হয়েছিল।

কানাই। বটে, তা হবারই কথা। তা আপনি কি বলেছিলেন?

দৌ। আমি বলেছিলেম যে দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার নেই সে দেশের লোকেরা সকাল সকাল মারা পড়ে, কারণ ব্যামো হলে তাদের সেবা করবার কেউ থাকে না। অকালমৃত্যু যে কি শোচনীয় ঘটনা তা আমি সকলকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেম। আমি বল্লেম "দেখ ভাই, তোমার যে শিশু সন্তানটি সবেমাত্র বাবা বল্‌তে, হামাগুড়ি দিতে এবং দাড়ি ধ'রে টান্‌তে শিখেছে আজ হঠাৎ যদি ফিরে গিয়ে দেখ সে হাত পা খিঁচিয়ে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মরে প'ড়ে রয়েচে তা হলে তোমার মনে কি রকম ভাবের উদয় হয়?"

যুবক শ্রোতাদের ডেকে বল্লুম "হে যুবক, এখনি যদি তোমার বাড়ি থেকে একটি দূত উর্দ্ধশ্বাসে এসে তোমাকে খবর দেয় যে তোমার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর মুখকমল দিয়ে অনবরত রক্ত উঠচে, তার কমলায়ত লোচন দুটি একেবারে উল্টে গিয়েছে, এবং তার কোকিলবিনিন্দিত কণ্ঠ থেকে ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শ্রুতিগোচর হচ্চে না, তা হলে তুমি কি কর!" এই যেমন বলা অমনি পাঁচ সাতটা লোক এসে আমার গলা চেপে ধরলে। আমার উন্মাদকারী বক্তৃতা শুনে তাদের যে কতদূর পর্য্যন্ত আবেগ উপস্থিত হয়েছিল তাদের দৃঢ় মুষ্টির প্রভাবে আমি অত্যন্ত স্পষ্টই বুঝতে পারলুম। সেখেনে আর অধিক কিছু না বলে বাড়ি ফিরে এসে কালাচাঁদকে ঘুম থেকে জাগিয়েই আমি বল্লুম "হে সভাপতি এবং হে কালাচাঁদ, হঠাৎ যদি এখনি তোমার বাড়ি থেকে চিঠি আসে যে, তোমার যুবক জামাইটি কাল ভোরের বেলায় ওলাউঠো হয়ে হিম হয়ে মরে গেছে এবং তোমার ১২ বৎসরের মেয়েটি বিধবা হয়েচে তা হলে তুমি কি কর!" কালাচাঁদ কেঁদে ভাসিয়ে দিলে—আমিও খানিকক্ষণ আর কথা কইতে পারলুম না। আমার নিজের বক্তৃতা-শক্তির প্রভাবে আমার নিজের কণ্ঠরোধ হয়ে গেল, আমি অনেকক্ষণ মুখ নত করে চুপ করে কেবলিই অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগলুম। কালাচাঁদ তার পর দিনই আমার কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গিয়েচে। একান্নবর্ত্তী পরিবার না থাকা এতই শোকাবহ, এতই মর্ম্ম-বিদারণকারী, এতে হৃদয় এতই ভীত, স্তম্ভিত, চকিত এবং বিস্ফারিত এবং বিদ্রাবিত হয়। কানাই কি বল?

কা। আজ্ঞে তা হয় বটে। আমার এখনিই হচ্চে।

দৌলত। কেবল তাই নয় কানাই। আমি বলেছিলেম স্বার্থত্যাগ শিক্ষার একমাত্র উপায় একান্নবর্ত্তী

পরিবার। এরূপ পরিবারে পরের অর্থেই অধিকাংশ লোকের জীবন নির্ব্বাহ হয়, স্বার্থের কোন সম্ভাবনা বা আবশ্যক থাকে না। চতুর্দ্দিকের খবরের কাগজে আমার বক্তৃতা অত্যন্ত রাষ্ট্র হয়ে গেছে—তারা সকলেই বলেচে দুঃখের বিষয় দৌলত বাবুর পরিবার কেউ নেই তিনি একলা! (দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ)

কা। আহা, এমন মহৎ ব্যক্তিরও এমন দশা হয়!"

১২৯২ হইতে ১২৯৬ সালের মধ্যে এই 'হাস্য-কৌতুকে'র দ্বন্দ্ব পরিসমাপ্ত হয়। ধর্মনিরপেক্ষ খাঁটি সাহিত্যিক 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র সূত্রপাত ১২৯৮ সালে—'ভারতী ও বালক' এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায়। প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক হাস্যকর সাহিত্যিক গবেষণা, ১২৮২ সালে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র প্রকাশে বাংলাসাহিত্যে ন্যাকামি ও হা-হুতাশের বন্যা এবং 'হিতবাদী'র কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার ছোটগল্পের বিষয়বস্তু লইয়া মনান্তর রবীন্দ্রনাথকে এইকালে যথেষ্ট পীড়িত ও উত্তেজিত করিয়াছিল। তাহার ফলেই আমরা 'ব্যঙ্গ-কৌতুকে'র "প্রত্নতত্ত্ব", "লেখার নমুনা", "সারবান সাহিত্য" ইত্যাদি রচনা পাইয়াছি। "মীমাংসা" শীর্ষক রচনায় প্রেম-পাগলদের প্রতি যে কশাঘাত আছে ১২৯৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা "ভারতী ও বালকে" প্রকাশিত "নিষ্ফল চেষ্টা" ও "সফলতার দৃষ্টান্ত" রচনা দুইটিতে বিদ্রূপ তদপেক্ষা বড় কম নাই। রচনা দুইটি "মীমাংসা" অপেক্ষা নিকৃষ্ট তো নহেই, আমাদের বিবেচনায় উৎকৃষ্ট। কিন্তু 'ব্যঙ্গকৌতুক' পুস্তকাকারে বাহির করিবার সময় এই দুইটি রচনা যে কেন বাদ পড়িয়াছে জানি না। সম্ভবতঃ অনবধানতাবশতঃ এইরূপ হইয়া থাকিবে। পরবর্তী সংস্করণ 'ব্যঙ্গকৌতুকে' এই দুইটির স্থান করিয়া দিবার অনুরোধ-(শ্রীপুলিনবিহারী সেনের দরবারে)সহ এখানে আটষট্টি বৎসর পরে সেগুলির পুনর্মুদ্রণ করিলাম। যুগের পরিবর্তন ঘটিয়াছে সত্য। কিন্তু হতাশ আদেখ্‌লা প্রেমিকেরা তেমনি আছে। কাজেই প্রায় ত্রিপাদ শতাব্দীকাল পরে এযুগের পাঠকও যে কৌতুকবোধ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিষ্ফল চেষ্টা

অনেকগুলি বাঙ্গলা পদ্য, বিশেষতঃ গদ্যপ্রবন্ধ পড়িয়া আমার সর্ব্বদাই কি-যেন কে-যেন কখন-যেন-কেমন-যেন-কি-যেন-কি-ময় হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু কোনরূপ সুযোগ পাইয়া উঠি না।

আপিসের ছুটি হইলে পদব্রজে পথে বাহির হই; মনে করি, একেবারে উদাস হইয়া কি-যেন হইয়া যাইব। কিন্তু দেখিয়াছি ঠিক নিয়মিত সময়ে বাড়িতে পৌঁছিয়া হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে তামাক টানিতে বসি—মনের কোন যায়গায় কোন রূপ বিহ্বলতা অনুভব করি না।

বাড়ির গলির মোড়ে একটা প্রৌঢ়া পানওয়ালী বসিয়া থাকে সকালেও দেখিতে পাই, বিকালেও দেখিতে পাই, এবং নিমন্ত্রণ খাইয়া অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিবার সময় স্তিমিত দীপালোকে তাহার ক্লান্ত মুখচ্ছবি দৃষ্টিপথে পড়ে। মনে করা দুঃসাধ্য নয় যে, সে নিশিদিন যেন কাহার জন্য, যেন কিসের জন্য, যেন কোন্ অপরিচিত স্মৃতির জন্য, যেন কোন্ পরিচিত বিস্মৃতির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া প্রত্যেক পথিকের মুখের দিকে চাহিতেছে। কিন্তু সেরূপ কল্পনা করিয়াও কোন ফল হয় না। বিস্তর চেষ্টা করি, তবু কিছুতেই তাহাকে দেখিয়া হৃদয়ের মধ্যে জ্যোৎস্নার সুগন্ধ, বাঁশির আলিঙ্গন, নিস্তব্ধতার সঙ্গীত জাগ্রত হইয়া উঠে না। তাহার স্বহস্তরচিত অনেক পান কিনিয়া খাইয়াছি কিন্তু তাহার মধ্যে চূণ খয়ের এবং গুটিদুয়েক খণ্ড সুপারি ছাড়া একদিনের জন্যও বাসনা, স্মৃতি, আশা অথবা স্বপ্নের লেশমাত্রও পাই নাই।

যে দিন চাঁদ উঠে সে দিন মনে করি, চাঁদের দিকে তাকাইয়া থাকা যাক্, দেখি তাহাতে কিরূপ ফল হয়। বেশিক্ষণ একভাবে থাকিতে পারি না। অনতিবিলম্বে ঘুম আসে।

বাতায়নে গিয়া বসি। রান্নাঘর হইতে ধোঁয়া আসে, আস্তাবল হইতে গন্ধ পাই এবং প্রতিবেশিনীগণ অসাধু-ভাষায় পরস্পরসম্বন্ধে স্ব স্ব মনোভাব উচ্ছ্বসিতস্বরে ব্যক্ত করিতে থাকে। নিদ্রিত অথবা জাগ্রত কোন প্রকার স্বপ্নই টিঁকিতে পারে না।

সেখান হইতে উঠিয়া একাকী ছাতে গিয়া বসি। আপিসের ময়রা, ইন্সিওরেন্সের টাকা, দোবার কাপড় দিতে বিলম্ব, প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় অসংলগ্নভাবে মনে উদয় হইতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই কোন বিস্মৃত মুখচ্ছবি, কোন পূর্ব্বজন্মের সুখস্বপ্ন মনে পড়ে না।

দেখিয়াছি আমার বন্ধুরা প্রায় সকলেই নীরব কবি। সকলেরই প্রায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেছে, অশ্রুজল শুকাইয়া গেছে, আশা ফুরাইয়া গেছে, কেবল স্মৃতি আছে এবং স্বপ্ন আছে। সুতরাং তাঁহাদের কাছে আমার মনের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিতে লজ্জা হয়।

হৃদয় আছে অথচ প্রাণপণ চেষ্টাতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না এ কথা আমি কেমন করিয়া স্বীকার করি!

আমি বেশ আছি, আরামে আছি, নিয়মিত বেতন পাইলে আমার কোনরূপ কষ্ট হয় না এ কথা একবার যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে তবে বন্ধুসমাজে আমার আর কিছুমাত্র প্রতিপত্তি থাকিবে না।

সেই ভয়ে নীরব হইয়া থাকি। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলি নীরব চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা গভীর চিন্তা, নীরব বেদনা সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র বেদনা, এবং নীরব কবিতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিতা। চোখে যে সহজে অশ্রুজল পড়ে না ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ আমার হইয়া তাহার জবাব দিয়া গেছেন।

আসল কথা, আমার বন্ধুবান্ধবদের সকলেরই একটি করিয়া "কে-যেন" "কি-যেন" আছে, অথবা ছিল অথবা ভবিষ্যতে থাকিবার সম্ভাবনা আছে; আমার আর সমস্ত আছে কেবল সেইটা নাই।

আমি কি করিব? কি করিলে আমার বুক ফাটিবে, সুখ থাকিবে না, আশা ফুরাইবে। হাসিব কিন্তু সে কেবল লোক-দেখানে; আমোদ করিতে ছাড়িব না কিন্তু সে কেবল অদৃষ্টকে সবলে উপেক্ষা করিবার জন্য। আপিসে যাইব, কিন্তু সে কেবল কাজের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে।

এক কথায়—কি করিলে একটি "কে-যেন" একটি "কি-যেন" পাওয়া যায়!—

সফলতার দৃষ্টান্ত

হরি হরি! আমার কি হইল! মরি মরি, আমাকে এমন করিয়া পাগল কে করিতেছে!

তবে সমস্ত ইতিহাসটি খুলিয়া বলি!

কিছু দিন হইতে প্রত্যহ সকালে আমার ডেস্কের উপর একটি করিয়া ফুলের তোড়া কে রাখিয়া যায়?

হায়! কে বলিবে কে রাখিয়া যায়! তোমরা জান কি, কাহার কোমল চম্পক অঙ্গুলি এই চাঁপা গুলি চয়ন করিয়াছিল? বলিতে পার কি, এই গোলাপে কাহার লজ্জা, এই বেলফুলে কাহার হাসি, এই দোপাটি ফুলে কাহার দুটি বিন্দু অশ্রুজল এখনো লাগিয়া আছে? তোমরা সংসারের লোক, তোমরা বুঝিতে পারিবে কি সে হৃদয়ে কত ভালবাসা, হরি হরি কত প্রেম!

রোজ মনে করি আজ দেখিব—এই নীরব হৃদয়ের প্রেমের উচ্ছ্বাস আমার ডেস্কের উপর কে রাখিয়া যায় আজ তাহাকে ধরিব, আমার অন্তরে অন্তরে যে ব্যথা হাহাকার করিতেছে আজ তাহাকে বলিব—এবং মরিব।

কিন্তু ধরি ধরি ধরা হয় না, বলি বলি বলা হয় না, মরি মরি মরিতে পাইলাম না!

কেমন করিয়া ধরিব! যে গোপনে আসে গোপনে চলিয়া যায় তাহাকে কেমন করিয়া বাঁধিব! যে অদৃশ্যে থাকিয়া পূজা করে, যে নির্জ্জনে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করে, যে দেখা দেয় না, দেখিতে আসে, ওরে পাষাণ হৃদয়, তাহার গোপন প্রেমব্রত ভঙ্গ করিবি কেমন করিয়া?

কিন্তু থাকিতে পারিলাম কই—অশান্ত হৃদয় বারণ মানিল কই—একদিন প্রত্যুষে উঠিলাম।

দেখিলাম আমার বাগানের মালী তোড়া হাতে করিয়া লইয়া আসিতেছে।

কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কম্পিত হৃদয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওরে জগা, তুই এ তোড়া কোথায় পাইলি রে!"

সে তৎক্ষণাৎ কহিল "বাগান হইতে তৈয়ার করিয়া আনিলাম!"

আমি কাতর কণ্ঠে কহিলাম, "প্রবঞ্চনা করিস্‌না রে জগা, সত্য করিয়া বল্‌—এ তোড়া তোকে কে দিল !"

সে কহিল "প্রভু এ আমি নিজে বানাইয়াছি !"

আমি পুনশ্চ ব্যাকুল অনুনয়ের সহিত কহিলাম—"আমার মাথা খাইস্‌ জগা, আমার কাছে কিছু গোপন করিস্‌ না, যে এ তোড়া তোকে দিয়াছে তাহার নামটি আমাকে বল্‌ !"

মালাকর অনেকক্ষণ অবাকভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে, না রমণীর বিশ্বাস রক্ষা করিবে, বোধ করি এই দুই কর্ত্তব্যের মধ্যে তাহার চিত্ত দোদুল্যমান হইতেছিল। অবশেষে করজোড়ে একান্ত কাতরতা সহকারে সে উৎকল-উচ্চারণ-মিশ্রিত গ্রাম্য ভাষায় কহিল—"প্রভো, এ কুসুমগুচ্ছ আমারি স্বহস্তের রচনা।"

বুঝিলাম সে কিছুতেই সেই অজ্ঞাতনাম্নীর নাম প্রকাশ করিবে না।

আমি যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, আমার সেই অপরিচিত অনামিকা—আমার সেই জন্মান্তরের বিস্মৃতনামা প্রিয়তমা তোড়াটি প্রস্তুত করিয়া মালীর হাতে দিতেছেন এবং অশ্রুগদ্গদ কাতরকণ্ঠে কহিতেছেন—"এই তোড়াটি গোপনে তাঁহার ঘরে রাখিয়া আয় জগা, কিন্তু আমার মাথা খাস্‌, আমার মৃতমুখ দর্শন করিস্‌ জগা, আমার নাম তাঁহাকে শুনাইস্‌ না, আমার কথা তাঁহাকে বলিস্‌ না, আমার পরিচয় তাঁহাকে দিস্‌ না, আমার হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই থাকুক, আমার জীবনের কাহিনী জীবনের সহিতই অবসান হইয়া যাক্‌ !"—

জগা ত চলিয়া গেল। কিন্তু আমি আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তোড়াটি হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলাম, দুটি একটি কণ্টক বক্ষে বিঁধিল—বুকের রক্তের সহিত ফুলের শিশির এবং ফুলের শিশিরের সঙ্গে আমার চোখের জল মিশিল। হরি হরি, সেই অবধি আমার এ কি হইল। কি যেন আমাকে কি করিল! কে যেন আমাকে কি বলিয়া গেল! কোথায় যেন আমার কাহার সহিত দেখা হইয়াছিল! কখন যেন তাহাকে হারাইয়াছি। কেবল যেন এই তোড়াটি—এই কয়েকটি ক্রোটনের পাতা, এই শ্বেত গোলাপ এবং এই গুটিকতক দোপাটি—আমার কাছে চিরজীবনের মত কি যেন কি হইয়া রহিল এবং এখন হইতে যখনি জগা মালীকে দেখি তাহার মুখে যেন কি যেন কি দেখিতে পাই এবং সেও আমার ভাবগতিক দেখিয়া অবাক হইয়া আমারও মুখে যেন কি যেন কি দেখিতে পায়! জগতের লোকে সকলে জানে যে, আমার জগা মালী আমাকে বাগান হইতে ফুল তুলিয়া তোড়া বাঁধিয়া দেয়, কেবল আমার অন্তর জানে, আমাকে কে যেন গোপনে তোড়া পাঠাইয়া দেয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'কড়ি ও কোমল' প্রথম সংস্করণের আর একটি পরিত্যক্ত রচনা হইতে সংবাদপত্র ও সংবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মনোভাব নিম্নে অংশতঃ উদ্ধৃত ১৪টি পংক্তিতে এইভাবে প্রকাশ পাইয়াছে :

"খবর ব'য়ে বেড়ায় ঘুরে খবরওয়ালা ঝাঁকা-মুটে।
আমি বাপু ভাবের ভক্ত বেড়াইনাকো খবর খুঁটে।
এত ধুলো, এত খবর কল্‌কাতাটার গলিতে।
নাকে চোকে খবর ঢোকে দু-চার কদম চলিতে।
এত খবর সয় না আমার মরি আমি হাঁপোয়ে।
ঘরে এসেই খবরগুলো মুছে ফেলি পাপোষে।
আমাকে ত জানই বাছা! আমি একজন খেয়ালি।
কথাগুলো যা' বলি, তার অধিকাংশই হেঁয়ালি।
আমার যত খবর আসে ভোরের বেলা পূব দিয়ে।
পেটের কথা তুলি আমি পেটের মধ্যে ডুব দিয়ে।
আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরাই ব্যবসা।
থাক্‌ গে তোমার পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবুসা।
কল্পতরুর তলায় থাকি নই গো আমি খবুরে।
হাঁ করিয়ে চেয়ে আছি মেওয়া ফলে সবুরে।"

রচনাটি "চিঠি" শিরোনামায় ১২৯২ ফাল্গুনের 'বালকে' প্রথম বাহির হয়। তাহার পরে সংবাদপত্র, সংবাদ ও সাময়িকপত্র সম্বন্ধে অজস্র ব্যঙ্গবিদ্রূপে রবীন্দ্ররচনা কণ্টকিত হইয়াছে। প্রথম বিদ্রোহকেই এইখানে স্থান দিলাম। বহু বৎসর পরে 'শিশু' কাব্যগ্রন্থে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আকারে উপরে-উদ্ধৃত-অংশ-বর্জিত-ভাবে "চিঠি" কবিতাটি "পরিচয়" নামে প্রকাশিত হয়।

শারলক হোমসের শিষ্য মিস্টার লক তিন দিন তিন রাত্রি কিছুই খান নি, যা খেয়েছেন কাজের আরম্ভে। এখন শুধু একটু একটু কফি আর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পাইপ। বেহালা থেকে কিছু দূরে ডায়ামণ্ড হারবার রোডের পাশে কোনো এক পল্লীতে একটি নির্জন বাড়ি তাঁর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বেহালায় যে বাড়িতে খুন হয়েছে সে বাড়িতে তিনি মাত্র পনেরো মিনিট ছিলেন। এই পনেরো মিনিট তিনি, যে ঘরে খুন হয়েছে তার ভিতরে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিসের মাপজোক করেছেন। তার বেশি কিছু না।

ডায়ামণ্ড হারবার রোডে যেখানে লক আছেন, ঠিক তার বিপরীত দিকের এক পল্লীতে থর্নডাইকের শিষ্য মিস্টার থর্ন মাইক্রোস্কোপ নিয়ে ঘটনাস্থলের কিছু ধুলো, একগোছা বেওয়ারিশ চুল এবং হত্যার পর দরজা ভেঙে যারা সে ঘরে প্রবেশ করেছিল তাদের মধ্যকার একমাত্র স্থানীয় পুলিস ভিন্ন আর সবার মাথার একটি করে চুল নিয়ে পরীক্ষা করছেন আজ কয়েকদিন ধরে।

এঁরা দুজনেই লণ্ডন থেকে এসেছেন দিন সাতেক হল। এ সবই অবশ্য প্রাইভেট ব্যবস্থা। পুলিসের ব্যবস্থাও কম নয়। কেসটি এমনই রহস্যপূর্ণ যে তা ভেদ করতে যত রকম সম্ভব উপায় অবলম্বন করার হুকুম আছে বাড়ির মালিকের। কাজেই পুলিস স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত একটি গোয়েন্দা কুকুরকে তার পরিচালক বা প্রযোজকসহ আনিয়ে নিয়েছে।

এ ভিন্ন একটি দেশী রোগা কুকুরকেও মাঝে মাঝে সন্দেহজনকভাবে বেহালা-ডায়ামণ্ড হারবার রোড এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে।

বেহালার বিখ্যাত হাম্বড়া চৌধুরীর বাড়িতে খুন হয়েছে। প্রচুর টাকার মালিক। প্রকাণ্ড বাড়ি। এঁর

পূর্বপুরুষ উত্তর-প্রদেশের কোনো জেলা থেকে এসে ইংরেজ আমলে কলকাতার বাসিন্দা হয়ে পড়েছিলেন। সেই থেকে এই পরিবার ধনাঢ্য। এঁদের যে কত টাকা তা কেউ অনুমান করতে পারে না। এঁরই স্ত্রী একবার জলে ডুবে অজ্ঞান হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার বললেন কৃত্রিম শ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। আর যায় কোথা? হাম্বড়া উত্তেজিতভাবে বললেন, মানে? আমার স্ত্রীকে কৃত্রিম শ্বাস? ডাক্তার, অবিলম্বে আসল শ্বাসের ব্যবস্থা কর, যত টাকা লাগে দেব। তুমি না পার, অন্য ডাক্তার ডাকছি।

এই কাহিনীটিই কি করে বিলেতে চালান হয়ে যায় এবং এটা এখন তাদেরই দেশের গল্প বলে প্রচলিত।

এই হাম্বড়া চৌধুরীর বাড়িতে খুন! অসম্ভব কাণ্ড! অসম্ভব এজন্য যে, ঘর ভিতর থেকে বন্ধ, অথচ খুন। আরও অসম্ভব এজন্য যে আততায়ীর এত বড় স্পর্ধা হল কি করে।

কিন্তু কে খুন হয়েছে তা এতক্ষণ বলা হয় নি। সেটা এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর বলেই বলা হয় নি। যে-কোনো একটি স্ত্রীলোক খুন হয়েছে ধরা যাক। সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকটি হাম্বড়া চৌধুরীর স্ত্রী। তার ঝিও হতে পারে। মোট কথা কে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, কেন না সে আপনার আমার কারও আত্মীয়া নয়।

পুলিসের প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ হয়ে গেছে। দিনের বেলা ঘর ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়েছিল পুলিসের। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত দরজা বন্ধ দেখে সন্দেহ হয়। দরজা পার হয়ে বাঁয়ের দিকে পাঁচ হাত দূরে খাট। খাটের শিয়রে জানলা। সে জানলা দিয়ে একটা বিড়ালও বাইরে পালাতে পারে না। সামনের দিকে দরজার পাশের জানলা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।

দারোগা যখন দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবল ছিল, তারা দরজা ভেঙে দিয়েই বিদায় হয়ে যায়। ভিতরে প্রবেশ করেন পুলিসের দারোগা ও হাম্বড়া চৌধুরী। দরজা ভাঙার শব্দে আরও কয়েকজন সিঁড়ি বেয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসেন সেই দোতলার ঘরে।

ক্রম অনুযায়ী সাজালে এই রকম হয়। প্রথম দারোগা, পরে হাম্বড়া চৌধুরী, পরে দুজন নবাগত আত্মীয় দুলালচাঁদ ও নকুলেশ্বর। সবশেষে তাঁদের ঠিক পিছনে ঘরে ঢুকেছে হাম্বড়ার ভাইপো সনৎকুমার।

জেরার সময় নকুলেশ্বর স্বীকার করেছে যে সে-ই সবার শেষে ঘরে এসেছে। অথচ সনৎ বলছে সে সবার শেষে এসেছে।

সবাই অবাক। অবাক আততায়ীর কৌশলে। এই কৌশলটি কি, তার মীমাংসা না হলে আততায়ী যে কে তা ভাবাই যাচ্ছে না।

গলা টেপা হয়েছে, ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন তারপর ধস্তাধস্তির চিহ্ন এবং সবশেষে গলায় ছুরির আঘাত। অতএব কোনোমতেই এটি আত্মহত্যা নয়। ছুরি পড়ে আছে দূরে। ছুরির হাতলে আঙুলের ছাপ নেই।

যদি কেউ খুন করে থাকে তবে সে পালাবে কি করে? কে আততায়ী? কিন্তু এ প্রশ্ন আপাততঃ উঠছে না, কারণ যেই হোক সে কি করে পালাবে আগে তা আবিষ্কার না হলে কে খুন করল ভেবে লাভ নেই। লাভ নেই এই কারণে যে যাকে ধরা হবে সেই বলবে কি করে সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে পুলিসকে।

তিন দিন ধরে বাড়ির সবাইকে জেরা করা হয়েছে এবং পুলিসের তিনখানা মোটা খাতা লেগেছে তা লিখতে। কিন্তু অন্দরের দোতলার সুরক্ষিত ঘরে একটি স্ত্রীলোক খুন হল অথচ ভিতর থেকে দরজা এমনভাবে বন্ধ যে বাইরে এসে সে রকম বন্ধ করা অসম্ভব এবং দরজা বন্ধ রেখে ঘর থেকে কারও বাইরে আসা অসম্ভব।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: ঘরের মধ্যে কোনো গুপ্ত দরজা আছে কি না। কিন্তু সে দিকেও নিরাশ হতে হল। একটি

দেয়াল-আলমারি আছে বটে, কিন্তু নানাজাতীয় যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা হল, কোনো রহস্যের সন্ধান মিলল না।

অতএব সব যেমন আছে তেমনি রইল। পুলিস বলল, আগে দরজা-রহস্যের সমাধান চাই, তারপর অন্য কথা। অর্থাৎ কে খুন করল, খুনের 'মোটিভ' কি ইত্যাদি ভাবা যাবে। ইতিমধ্যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শিক্ষিত কুকুর স্কট এসে পৌঁচচ্ছে প্লেনে। সে যাকে নির্দেশ করে, তাকে গ্রেপ্তার করে রেখে পরে ভাবা যাবে দরজার রহস্য।

হাম্বড়া দেখলেন সমস্যা জটিল। তিনি সব শুনে বহু টাকা খরচ করে বিলেতের দুই বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভকে আনিয়ে নিয়েছেন। তাঁদের কথা আগেই বলা হয়েছে। পুলিসের বড়ই আপত্তি ছিল, বলেছিলেন ওদের আবার কেন ? কিন্তু হাম্বড়া পুলিসের কথা রাখতে পারেন নি। তাঁর বাড়িতে খুন—সাধারণ ব্যাপার নয়।

মিস্টার লক এবং মিস্টার থর্ন দুজনেই ভারতবর্ষে এসে খুব স্ফূর্তি বোধ করছেন। তবে এ কথাও বলেছেন, ঘটনার বিবরণ পেলে লণ্ডনে বসেই রহস্য ভেদ করতে পারতেন। তবে থর্ন শুধু বিবরণ পেলে কিছু করতে পারতেন না, ঘটনাস্থলের কিছু ধুলো পেলে চেষ্টা করে দেখতে পারতেন।

ইতিমধ্যে পনেরোটা দিন কেটে গেছে। পুলিস কাউকেই গ্রেপ্তার করে নি। কিন্তু স্কট এসে পড়াতে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। স্কটের সঙ্গে তার পরিচালক কনস্টেবল রবার্টও এসেছে। তাদের তো আর বেকার বসিয়ে রাখা চলে না, তাই নিহতা স্ত্রীলোকের রক্ত শুঁকিয়ে রবার্ট কুকুরকে ইশারা করতেই কুকুর তার কর্তব্য পালনে রত হল। সে মাটি শুঁকতে শুঁকতে অদৃশ্য আততায়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে লাগল। সে প্রথমে এলোমেলো ঘুরতে লাগল। একবার বাড়ির ভিতরে গেল, কিন্তু সেখানে সেদিনকার কেউ উপস্থিত ছিল না, ছিলেন একমাত্র হাম্বড়া চৌধুরী। কুকুর একটু বিভ্রান্তভাবে বেরিয়ে এলো পথে, আবার বাড়ির ভিতর গেল, আবার এলো। প্রকাণ্ড বাড়ির ভিতর কুকুর দিশাহারা হয়ে ঘুরে একটি বেলা কাটাল। কিন্তু উপায় তো নেই। সে শেষ বারের মত যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথের দিকে চলতে লাগল তখন প্রায় সন্ধ্যা। চলল সে ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরে।

আরও একটি দেশী কুকুর তাদের অনুসরণ করছিল, কিন্তু কেউ তা লক্ষ্য করে নি। এই সময় লক একটু সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, হঠাৎ রবার্টের সঙ্গে দেখা হতেই আনন্দে গদগদ হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, একটু কফি খেয়ে যাও। রবার্ট বলল, স্কট অনুসরণ করছে রক্তের গন্ধ। লক বললেন, তা হোক। ও এগিয়ে যাক, তুমি তো গাড়িতে আছ, ভয় কি। রবার্ট লকের পুরনো বন্ধু।

রবার্ট লকের ঘরে গিয়ে বসলেন। পুলিসের দারোগাও রবার্টের সঙ্গে ছিলেন, তিনিও অগত্যা লকের বাড়িতে গেলেন। মিনিট পাঁচেকের ব্যাপার। রবার্ট ও দারোগা কফি খেলেন এক পেয়ালা করে, কিন্তু হত্যা বিষয়ে একটি কথাও লক বললেন না। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, কবে ফিরবে মনে করছ ? রবার্ট বলল, বোধ হয় দিনতিনেকের মধ্যে। দারোগাকেও লক খুব অভ্যর্থনা জানালেন, এবং কলকাতার আবহাওয়া ভিন্ন তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো বিষয়েই কোন আলাপ করলেন না।

লক মনে মনে ভীষণ খুশী, কেন না তাঁর কাজ প্রায় শেষ। কিন্তু বাইরে থেকে তা কারও বোঝবার উপায় নেই। এদিকে থর্নও আপন ঘরে বসে যে সব অদ্ভুত পরীক্ষা চালাচ্ছেন তাও প্রায় সাফল্যের মুখে এসে পড়েছে।

দারোগা ও রবার্ট যখন লকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বড় রাস্তার উপর এলেন তখন তাঁরা দেখতে পেলেন স্কট বেশিদূরে যায় নি। কয়েকজন লোক তাকে আদর করছিল, এবং স্কট আনন্দে ল্যাজ নাড়ছিল। কিন্তু রবার্টকে দেখে ল্যাজ নাড়া থামিয়ে দিল, যারা ওকে

আদর করছিল তারাও নিজেদের অপরাধী মনে করে ওখান থেকে সরে গেল বলে মনে হল।

কালো দেশী কুকুরটিকে আর দেখা গেল না।

কিন্তু স্কটের মধ্যে স্পষ্ট একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। কারণ স্কট হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেছে। সে যেন তার সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। সন্দেহ জাগল, কেউ কিছু খাইয়ে দিয়েছে হয়তো। যারা আদর করছিল তাঁরা সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাদের আর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। সবই একটা রহস্য বলে মনে হতে লাগল। রহস্যসংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

ভয়ানক ব্যাপার যে! শিক্ষিত কুকুর। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দা কুকুর। তার এই পরিবর্তনে রবার্ট মুষড়ে পড়ল। হাজার হাজার লোক উৎসুক হয়ে আছে কুকুরের ওস্তাদি দেখার জন্য। বিলেতে ট্রাঙ্ক কল করা হল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বলল, ওখানে চিকিৎসা না করিয়ে স্কটকে অবিলম্বে এখানে পাঠিয়ে দাও। টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলে দিও।

জরুরি নির্দেশ।

এদিকে লক দরজার রহস্যভেদের কাজে আরও কিছু এগিয়েছেন। এখন মাত্র আধ-আনা বাকি। তাঁর কাজের সুবিধা এই যে কাউকে জেরা করতে হচ্ছে না। সমস্ত তর্কবিতর্ক শুধু নিজের সঙ্গে। তাঁর পদ্ধতি তাঁর নিজের। তিনি যদি দেখেন একটি ত্রিভুজ পড়ে আছে অথচ তার একটা বাহু নেই, তা হলে যতক্ষণ না সেই হারানো বাহু খুঁজে পাচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁর আর বিরাম নেই। খুঁজে পেলে ওই ত্রিভুজের যে-কোন দুটি বাহু তৃতীয় বাহুটির চেয়ে বড়, অথবা ত্রিভুজমধ্যস্থিত তিনটি কোণের যোগফল দুই সমকোণের সমান, প্রমাণ করে তবে নিষ্কৃতি।

লক ভাবছেন। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করা অসম্ভব। ভিতর থেকে বন্ধ করলে দরজা না খুলে বাইরে আসা অসম্ভব। অথচ খুন। অথচ দেওয়ালে কোনো গুপ্ত দরজা নেই।

তা হলে আততায়ী কি—

লক লাফিয়ে উঠলেন। ত্রিভুজের হারানো বাহু খুঁজে পাওয়া গেছে। সব মিলে যাচ্ছে। তিনটি কোণের যোগফল দুই সমকোণের সমান!

ওদিকে ধর্নের পরীক্ষাও শেষ। মাত্র কয়েকটি চুল নিয়ে পরীক্ষা। তিনিও আনন্দে লাফাতে লাগলেন এবং ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে ছোট্ট গাড়িখানায় স্টার্ট দিলেন এবং ওই একই সময়ে লকও তাঁর গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। দুজনেই নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেছেন, দুজনেরই অধৈর্য চরমে উঠেছে, এবং কেউ এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট করবেন না প্রতিজ্ঞা করে স্পীড দিয়েছেন। ফলে ডায়মণ্ড হারবার রোডের দু পাশের দুই গলি থেকে দুজনে বেরিয়ে এসে হেড-অন কলিশন হতে হতে বেঁচে গেলেন। গাড়ি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দুজনেরই অসাধারণ, সামান্য একটু গুঁতোর উপর দিয়েই তাই তাঁরা রক্ষা পেলেন। গুঁতোটা প্রায় আদরে পিঠ চাপড়ানোর মতোই হালকা এবং প্রীতিপূর্ণ।

তবু ব্যাপারটা কারোরই ভাল লাগল না। ওঁরা ঠিক করলেন গাড়ি দুখানা ওখানেই রেখে হেঁটে যাবেন। হাঁটতে হাঁটতে অনেক আলাপ করা যাবে।

আলাপের বিষয়, কলকাতার ইতিহাস। খুনজখম গোয়েন্দাগিরি নয়—মোট কথা নিজেদের বৃত্তিবিষয়ে কিছুই না।

ওঁরা দুজনেই গিয়ে পৌঁছলেন চৌধুরী বাড়িতে হাম্বড়া চৌধুরী খুব খুশী। অভ্যর্থনা জানালেন ওঁদের।

গিয়ে শুনলেন সেদিনকার উপস্থিত সবাই নিজের কাজে বাইরে চলে গিয়েছিলেন। সনৎও বাইরে গিয়েছিল কিন্তু ফিরে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে জানা গেল অন্যরাও ফিরে এসেছে।

লক শুধু হালকাভাবে একবার জিজ্ঞাসা করলেন সেদিন সবশেষে ঘরে কে ঢুকেছিল? এবং এ কথা জিজ্ঞাসা করার আগে বারবার ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

সনৎ বলল, আমি।

নকুল বলল, আমি।

লক প্রশ্ন করলেন, নকুলবাবু, আপনিই যে শেষে ঢুকেছিলেন এ বিষয়ে এমন নিশ্চিত হলেন কি করে?

নকুল বলল, আমি পিছনে কাউকে আসতে দেখি নি।

পিছনে তাকিয়েছিলেন দোতলায় ওঠবার সময়?

একবার।

কেন?

দেখলাম আরো কেউ আসছে কি না।

বড়ই অস্বাভাবিক ইচ্ছা। যাই হোক কিছু মনে করবেন না, এটি আমার নিছক কৌতূহল।

কৌতূহল কেন বলছেন? আপনি তো তদন্ত করছেন এই কেস্।

না। আমার কাজ হচ্ছে দরজার রহস্য ভেদ করা। তার বেশি কিছু না।

লক পাইপে নতুন তামাক পুরে আগুন ধরিয়ে টানতে টানতে বলতে লাগলেন, দরজার রহস্যটা এত সহজ আগে ভাবতে পারি নি। ত্রিভুজের একটি বাহু হারালে তার সন্ধান করা সহজ। কিংবা অনেক বাহু কুড়িয়ে এনে কোন্‌টা ফিট করে তা দেখাও সহজ। কিন্তু ত্রিভুজ পড়ে আছে অথচ তার তিনটি বাহুর একটিও নেই, এ বড় কঠিন রহস্য। আমার চিন্তাধারাটি এইভাবে চলল : হয় তিনটি বাহুই আছে আমি দেখতে পাচ্ছি না, অথবা একটিও নেই, এবং কোনো দিনই খুঁজে পাব না।

তারপর একটু থেমে পকেট থেকে ভাঁজ করা একখানা কাগজ খুললেন এবং বললেন এইটি হচ্ছে ওই ঘরের নকশা। আপনারা দেখুন সব ঠিক আঁকা হয়েছে কি না।

সবাই বললেন, ঠিক হয়েছে। সবাই অর্থাৎ ওখানে তখন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাদের পূর্বপরিচিত। রবার্টও স্কটকে নিয়ে এসেছিল সেখানে। যদি আততায়ী এদের মধ্যে কেউ থেকে থাকে তবে হঠাৎ স্কটের মাথা ভাল হয়ে যেতেও পারে, এই আশা। এজন্য রবার্ট মাঝে মাঝে পকেট থেকে নিহতার রক্তমাখা শাড়ির টুকরো বার করে শোঁকাচ্ছিল। কিন্তু স্কট নির্বিকার।

এমন সময় হঠাৎ ফটকের বাইরে সেই রহস্যজনক রোগা কুকুরটির মাথা দেখা যেতেই স্কট ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল, এবং শিকল ছিঁড়ে তাকে আক্রমণ করবে বলে বারবার চেষ্টা করতে লাগল। রবার্ট লজ্জিত হয়ে স্কটকে আড়ালে নিয়ে গেল।

লক বলতে লাগলেন, আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন। দরজা ভেঙে যাঁরা ঘরে ঢুকেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ যিনি ঢুকেছেন তিনিই আততায়ী। তিনি কে, তা আমি বলব না, তা বলতে আমি আসিও নি।

লক অতঃপর ম্যাপ খুলে একে একে সব বোঝাতে লাগলেন। বললেন, এই দেখুন, এই দরজা ভাঙা হয়েছে, তারপর এইভাবে আপনারা বাঁয়ের দিকে গেছেন নিহতার খাটের কাছে। আপনাদের অনুসরণ করেছে আততায়ী।

কেমন করে?—সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করলেন।

লক বললেন, আততায়ী ঘরেই লুকিয়ে ছিল, দরজার আড়ালে। আপনারা তখন উত্তেজিত ছিলেন, তাই ডানদিক দেখেন নি, ঘরে ঢুকে শুধু বাঁ দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন। কিন্তু আততায়ী খুন করে দরজা খুলে বেরিয়ে যায় নি কেন, তার হাজার রকম কারণ থাকতে পারে। তাকে জেরা করে আপনারা প্রকৃত কারণ নির্ণয় করুন। আমি এবারে আসি। নষ্ট করবার মতো এক মুহূর্ত সময় আমার হাতে নেই—এক ঘণ্টা পরে আমার প্লেন ছাড়বে।

পুলিসের এতক্ষণ যে সন্দেহ ছিল, তা অনেকটা দূর হল, তাই দারোগা লকের বিদায়কালে তাঁকে জড়িয়ে ধরে গোটা দশ-বারো চুমু খেলেন।

এবারে থর্নের পালা। এক-একটি অংশ এক এক-

জনের হাতে। লকের অংশ শেষ হয়ে থর্নের অংশ আরম্ভ হল।

থর্ন বলতে লাগলেন, আমি যে সাফল্যের কথা এখন আপনাদের কাছে বলতে যাচ্ছি—আততায়ীর নাম আবিষ্কারের সাফল্য—তা সম্ভব হয়েছে প্রধানতঃ ভারতীয় বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ ব্রজবিলাস সরকারের নিপুণ সহযোগিতায়। ব্রজবিলাস যখন ছদ্মবেশের বিশেষ শিক্ষালাভের জন্য বিলেতে ছিলেন তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। এবং তিনি আজ এই সভাতে উপস্থিত আছেন বলা চলে।

সবাই পরস্পরের দিকে চাইতে লাগলেন।

থর্ন বললেন, ঠিক এখানে নয়, ফটকের বাইরে। আপনাদের অনুমতি পেলেই তাঁকে ডাকতে পারি।

নিশ্চয় ডাকুন।—বললেন চৌধুরী।

থর্ন ডাকতেই বাইরের কুকুরটি ভিতরে এল ল্যাজ নাড়তে নাড়তে।

থর্ন বললেন, ইনিই ব্রজবিলাস সরকার। বর্তমানে ইনি কুকুরের ছদ্মবেশে আছেন। মিস্টার সরকার, আপনি ছদ্মবেশ ছাড়ুন।

আদেশ পাওয়ামাত্র কুকুর মানুষের ভঙ্গিতে দু-পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মানুষের ভাষায় বলল, একটু অন্তরাল দরকার।

তাকে বাথরুম দেখিয়ে দেওয়া হল। দু-মিনিট পরেই ব্রজবিলাস বেরিয়ে এল, হাতে চামড়ার ব্যাগ। ছদ্মবেশটা উলটো করে ধরলেই ব্যাগের চেহারা পায়, এ এক অদ্ভুত ব্রিটিশ আবিষ্কার।

থর্ন বললেন, লকের পরে অবশিষ্ট আছে দুটি রহস্য, তার একটি আমি ভেদ করেছি, আর একটি করেছেন মিস্টার সরকার। আমারটি একটু জটিল, আপনাদের ধৈর্যের উপর অত্যাচার করা হবে না তো?

বিলক্ষণ! আপনি যতক্ষণ ইচ্ছা সময় নিন।—বললেন চৌধুরী। দারোগাও বললেন, আমার ক্রমেই সব অদ্ভুত লাগছে—আপনি সব বলুন, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনব।

ইতিমধ্যে থর্নের ঘর থেকে দুটি বড় বড় বাক্স এসে পৌঁছেছে। তার একটিতে একটি টেপ রেকর্ডিং যন্ত্র অন্যটিতে মাইক্রোস্কোপ। থর্ন, বাক্স দুটি খুলতে খুলতে বললেন, আততায়ীর নাম আমি আগেই প্রকাশ করে দিই—তার নাম সনৎ।

হঠাৎ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হল, সনৎকে দারোগা ধরে ফেললেন।

থর্ন বলতে লাগলেন, আমার পদ্ধতি একটু ঘোরা পথের, মাপজোক দরকার হয় না। আগেই বলেছি যে হত্যার ঘর থেকে আমি চুল সংগ্রহ করেছিলাম। তারপর কি করেছি শুনুন। আমি ব্রজবিলাসবাবুর সাহায্যে জানতে পেরেছি সনতের একজন প্রণয়িনী আছে। তার নাম প্রকাশ করব না। তবে তাকে আমি আমার পরীক্ষাঘরে আনাবার ব্যবস্থা করেছিলাম নানা কৌশলে। গভীর রাত্রে ঘটনাটা ঘটেছিল, কেউ জানে না। খুনের কিনারা হতে পারে ভেবেই এটি করেছিলাম। কারণ ঘর থেকে আমি যে চুল সংগ্রহ করেছিলাম তা সনতের চুল এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি, কারণ পরে ও-ঘরে যাঁরা গেছেন সবার চুল আমি পরে চেয়ে নিয়েছি। মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করা সহজ।

তারপর মেয়েটিকে জেরা করে শুনলাম ওদের প্রণয় গভীর। শুনলাম সনৎ ওর সান্নিধ্যে এলেই রোমাঞ্চিত হত। এ কথা মেয়েটিকে সে বারবার বলেছে। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম ঠিক। মাইক্রোস্কোপের স্লাইডে চুল বসিয়ে মেয়েটিকে বললাম তুমি সনৎ সনৎ বলে ডাক। মেয়েটি ডাকতে লাগল—আমি দেখলাম মাইক্রোস্কোপে, সে ডাকে স্লাইডের উপর চুলটি খাড়া হয়ে নাচছে। এ নাচ এত সূক্ষ্ম যে খালি চোখে ভাল দেখা যায় না।

আপনাদের এ পরীক্ষা দেখাবার জন্য আমি মেয়েটির কণ্ঠস্বর রেকর্ড করে নিয়েছি।

ধর্ন সবাইকে তাঁর পরীক্ষা দেখিয়ে অবাক করলেন। তার হাতের মুঠিতে যতগুলো চুল ছিল সব একসঙ্গে টাইডের উপর নাচতে লাগল, টেপ রেকর্ডে মেয়ের কণ্ঠে "সনৎ সনৎ" ডাক শুনে।

ধর্ন বললেন, আমার অংশ শেষ হল, আমি এবারে বিদায় নিই। পরের অংশ ব্রজবিলাসবাবু বলবেন। দারোগা আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠে ধর্নকে জড়িয়ে অনেক চুমো খেলেন এবং বললেন, আপনি যাবেন না, একটুখানি অপেক্ষা করে যান।

ব্রজবিলাস দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, আমার উপর ভার পড়েছিল স্কট নামক স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শিক্ষিত গোয়েন্দা কুকুর হঠাৎ বিগড়ে গেল কেন তা আবিষ্কারের। আমি ঠিক এই ঘটনার সন্ধান করতেই কাজ আরম্ভ করি নি। ব্যাপারটা হঠাৎ আমার চোখে পড়েছে। এটি নিতান্তই দৈব যোগাযোগ।

স্কট বিপক্ষের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছে। ঘুষ খেয়ে তার কর্তব্য থেকে সে চ্যুত হয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন সে আমাকে কুকুরের ছদ্মবেশে এখানে দেখেই চিনতে পেরেছিল, আমাকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল, এবং শিকলবাঁধা না থাকলে আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলত। কারণ তার ওই দুষ্কার্যের সাক্ষী ছিলাম আমি।

স্কটকে অতঃপর সেখানে আনা হল। স্কট লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল।

রবার্ট সব শুনে স্তম্ভিত।

শোনা গেল দশ হাজার টাকা ঘুষ খেয়েছে।

স্কট ধরা পড়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ল এবং আত্মরক্ষার জন্য নিজের ব্যবহার হঠাৎ পরিবর্তন করে আগের মত ল্যাজ নাড়তে লাগল। রবার্ট তা দেখে আশান্বিত হয়ে নিহতের রক্তমাখা কাপড়ের টুকরো নাকে ধরতেই স্কট একলাফে সনতের ঘাড়ে পড়ে তাকে চিত করে ফেলল।

ধর্ন বললেন, ভারতবর্ষের জল-বায়ুতে কিছু একটা আছে বলে মনে হয়। কারণ আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে বিপক্ষ অনেক টাকা ঘুষ দিতে এলে হয়তো নিয়ে ফেলব।

সবাই হেসে উঠলেন। এবং দারোগা ব্রজবিলাসকে তিনটি চুমু খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

এত্যার মোটিভ নিয়ে অতঃপর তিনি ভাবতে লাগলেন।

জাঁহাপনা

"বনফুল"

সত্যেরই জয় হয়, নিশ্চয় নিশ্চয়, ঠিক বাত
সত্যের সাধনায় জাঁহাপনা মগ্ন যে দিনরাত
তাঁহার গোমুখী হতে সুতরাং নিঃসৃত হয় যা
নির্জলা সত্য তা নির্ঘাৎ।

২

রাত্রিকে দিন করা দিনকে রাত্রি করা সম্ভব
জাঁহাপনা বোঝেন তা, বোঝেনাকো বোকা ডিক্-টম্ সব
জিনিয়াস জাঁহাপনা খান রোজ পলান্ন ক্ষীরসা
এরা খায় ডাল ভাত গম যব।

৩

জাঁহাপনা সমতুল আছে আর কোন্ 'ইন্‌শান্' বল
তাঁকে বলা মিথ্যুক। নাক মল, ওরে তোরা, কান মল
ইতিহাসী জাঁহাপনা একচেটে কারবারী সত্যের
বুঝিস না এ কথাটা প্রাঞ্জল!

৪

'জয় জয় জাঁহাপনা' অতএব এই গান জোরে গাও
বেসুরো গাইবে যারা তারা সব সরে যাও, মরে যাও।
বঞ্চিত গৃহহারা? তারা তো বাক্স আর প্যাটরা
যে কোনও গুদোমে সব ভরে দাও।

৫

সত্যের সঙ্গীতে লাগাইতে হবে কবে কোন্ সুর
জানে না তা রামা-শামা ডিক্-টম্ রমজান-মনসুর
জানেন তা জাঁহাপনা, সুতরাং বল খালি তোমরা
জি হুজুর, জি হুজুর, জি হুজুর।

মারীচ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ভূস্বর্গ কাশ্মীরে বোনা হয় কার্পেট ; কোনোটিতে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল স্বর্ণমিনার ও চোখ-ঝলসানো রৌপ্য-গম্বুজ-শোভিত মসজিদ-প্রাসাদ-সমাকীর্ণ মক্কাশরিফ, কোনোটিতে বা মন্দির-চূড়া ও প্রাসাদ বিপণির পটভূমিকায় কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট—সিঁড়ির পরে সিঁড়ি, গঙ্গাবক্ষে তরণী-শ্রেণী—দক্ষশিল্পীর নিপুণহস্তে পশম-সূত্রের টানা-পোড়েনের মধ্যে একটির পর একটি চিত্র পরিস্ফুট হইতে থাকে—বহুবর্ণে বিচিত্র, অপরূপ। দেশে-বিদেশে এই কার্পেটের সমাদর ; লোকে শুইয়া বসিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে, মুখে তারিফ করে।

কিন্তু উলটাইয়া পাত, দেখিবে মক্কা-মদিনা কাশী-কাঞ্চী গয়া-সারনাথ সব একাকার। একবার এক মহামান্য মৌলভীকে কার্পেটের উলটাপিঠ দেখিয়া বাছাই করিতে বলায় তিনি পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে হাত দিয়া তোবা করিয়াছিলেন এবং একবার এক মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত কাশীবিশ্বেশ্বর মন্দির ভ্রমে দিল্লীর জুম্মামসজিদ বাছাই করিয়া কি ভাবে "রামঃ রামঃ" বলিয়া উঠিয়াছিলেন—মুসলমান শিল্পীরা খরিদ্দারদের কাছে সকৌতুকে সেই গল্প করিয়া থাকে। তাহারা এই কাহিনীটিকে নিজেদের শিল্পদক্ষতার পরিচয়স্বরূপ প্রচার করে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে এই চিরন্তন দার্শনিক সত্যও উদ্‌ঘাটিত হয় যে, বহিঃপ্রকাশ যত স্বতন্ত্রই হউক, সকল বস্তুর অন্তরের রূপ এক।

দক্ষিণপন্থী দেশনায়ক শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ ও বামপন্থী "লীডার" শ্রীরাবণচন্দ্র বসু আসলে বরানগরের একই কার্পেট-কারখানায় প্রস্তুত মাল—লোকে এমন অসম্মান-সূচক "চীজ" অভিধা দেয়, কিন্তু আমরা ঐতিহাসিক, এরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করিতে পারি না। নেপথ্য-দর্শনে অর্থাৎ উলটাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, বাল্যকালে দুজনেই পড়াশুনায় অমনোযোগী, খেলাধূলায় দক্ষ, দুর্দান্ত প্রকৃতির বালক ছিল। তাহাদের উৎপাতে পাড়ার আবৃদ্ধবনিতা অর্থাৎ কর্তা ও গিন্নীরা সর্বদা সশঙ্ক ও সন্ত্রস্ত থাকিতেন। রাস্তায় বেওয়ারিশ ঘোড়া দেখিলেই তাহারা পালা করিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া, বিনা লাগামে ও জিনে দাবড়াইয়া ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড নিরীহ পথিকের পক্ষে সচকিত ও বিপদসঙ্কুল করিত এবং দলভ্রষ্ট বা পথভ্রান্ত

পাঁঠা দেখিলেই সেটিকে কব্জা করিয়া নিশীথরাত্রে নিঃশব্দে বড়ালদের প'ড়ো বাগানবাড়িতে সদলবলে "ফিষ্টি" লাগাইত। হরিদাসের বুলবুল ভাজা, আলু-কাবলি ও গোলাবি গেণ্ডেরি-ওয়ালারা তাহাদিগকে দেখিলেই উর্ধ্বপুচ্ছ গাভীর মত দৌড় মারিত, কারণ প্রত্যেককেই কোন-না-কোন সময়ে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইয়া বস্তুমূল্যে ঠগীকর যোগাইতে হইয়াছে। লুণ্ঠনের ভাগ পাইয়া বরানগরের বাল-সমাজ উভয়কে আদর্শপুরুষজ্ঞানে ভয়ভক্তি করিত। কিন্তু প্রবীণেরা বলিতেন, ত্রেতায় পরস্পর-বিরোধী রামরাবণের যুদ্ধে সোনার লঙ্কা ছারখার ও ত্রিভুবন তোলপাড় হইয়াছিল, কলিতে রামরাবণের সৌহার্দ্যে এখন বরানগর ছারখার হইতেছে, ভবিষ্যতে ত্রিভুবনও প্রকম্পিত হইবে।

তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে। শুধু একটু ভুল ছিল, মহাকাল তাহা সংশোধন করিয়া লইয়াছেন—ত্রেতার ঐতিহ্য কলিকালেও অটুট আছে। অর্থাৎ, দুই বন্ধু শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যতঃ বন্ধু নাই, দুই পরস্পরবিবদমান দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি করিয়া এইরূপ ঘটিল সে কাহিনী পশ্চিমবঙ্গের পলিটিকাল ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমরা সংক্ষেপে সূত্রমাত্র দিতেছি।

রামচন্দ্রের প্র-প্র-প্র-পিতামহের পিতামহ ভীমচন্দ্র নবাব সিরাজউদ্দৌলার বরাহনগর মোকামের সেরেস্তাদার খান-খানান উজবেগআলি বেগের খাস দাওয়ান ছিলেন। দোলদুর্গোৎসব, বারমাসে তেরপার্বণ—ভীম ঘোষের যেমন রবরবা তেমনই দাপট ছিল। কালের দুরন্ত কশাঘাতে ভীমের গদার তুলা ও ছেঁড়া ন্যাকড়া প্রভৃতি বাহির হইয়া ঝড়ের মুখে এদিক-ওদিক ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, রামচন্দ্রের পিতা দশরথ ঘোষ কোনওক্রমে একটা ডাইংক্লিনিঙের দোকান ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। পুত্র রামচন্দ্রই তখন একমাত্র ভরসা। ঘুড়ি-লাটাই ডাণ্ডাগুলি হাডুডুডু ও ফুটবলের মধ্য দিয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিয়া রামচন্দ্র যখন ইণ্টার আর্টসের চৌকাঠ পার হইয়া স্কটিশচার্চ কলেজে বি. এ. পড়িতেছে এমন সময় অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সসম্মানে "পরিত্রাণায়" অসহযোগ আন্দোলনের সুদর্শনচক্রহস্তে অবতাররূপী মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাষ্ট্রীয় জগতে "সম্ভব" হইলেন। বাইবেল-ক্লাসের সংক্ষিপ্ত কালটুকুকে বাল্যকালের অভ্যস্ত বীরত্ব প্রকাশের পক্ষে অতীব সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে পিতার ধোলাই এবং ধোলাই কারবারের ভবিষ্যৎ উপেক্ষা করিয়া রামচন্দ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতারূপ সীতা উদ্ধারকল্পে অহিংস-অসহযোগ-আন্দোলনরূপ সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যখন রাক্ষসদের কারাকবলমুক্ত হইয়া আবার ভারত-উপকূলে ভাসিয়া উঠিল তখন দশরথ গতাসু, তাই ত্রিবর্ণ পতাকাধারী পুষ্পমালাশোভিত মহিমান্বিত বীরপুত্রকে প্রত্যক্ষ দর্শনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন।

রাবণচন্দ্রের বংশতালিকা অতখানি অতীত গৌরব-বাহিনী নয়, ইংরেজরা যাহাদের 'আপস্টার্ট' আখ্যা দেয় রাবণের পিতা হিরণ্যকশিপু বসু সেই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া শত্রুরা নাসিকাকুঞ্চিত করিত। তিনি শিয়ালদহ পুলিসকোর্টের দুঁদে উকীল। মক্কেলের কাজে মেজাজ যত মোলায়েমই দেখান, ঘরে তাঁহার মেজাজ তিরিক্ষি, শাসন কড়া। রাবণকে "বাধ্যতামূলক" ভাবে এক 'চান্সেই' ম্যাট্রিক, আই. এ., বি. এ. পাস করিতে হইল। ভগীরথের মত চরকা-ঘর্ঘর-শঙ্খ বাজাইয়া গান্ধীজী যখন কলিকাতার হুগলীখাল প্লাবিত করিলেন, রাবণচন্দ্র তখন এম. এ ও ল একই সঙ্গে পড়িতেছে এবং ছাত্রসমাজের ডিবেটিং কম্পিটিশনে কৃতিত্ব দেখাইয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। হিরণ্যকশিপুর প্রতাপ তখনও অটুট থাকাতেই হুগলীতে গঙ্গার প্লাবন রাবণকে স্পর্শ করিল না।

রাবণচন্দ্র যখন ডিবেটিং সোসাইটিতে যুক্তিকে ধারালো এবং লজিককে সূক্ষ্মতর করিতে ব্যস্ত, রামচন্দ্র তখন ফলতা টু-কাশীপুরের মিল-এরিয়ার খোলা মাঠে জীমূতমন্দ্রে বক্তৃতা প্র্যাকটিশ করিয়া সিদ্ধ হইয়া অসহায় জনতাকে ইচ্ছামত হাসাইতেছে কাঁদাইতেছে, তাহারা হস্তামলকবৎ তাহার এতই আয়ত্তে আসিয়া পড়িয়াছে যে আজকাল "শ্রীরাম চন্দ্রজী কী জয়" ঘোষণা করিবার কালে অরিজিন্যাল শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে না।

ত্রিশ হইতে তেত্রিশ এবং বিয়াল্লিশ হইতে ছেচল্লিশ সনের শেষতক রামচন্দ্র জেলে জেলেই কাটাইল। রাবণচন্দ্র এম. এ. ও ল পাস করিয়া পিতার আগ্রহে ও বদান্যতায় বিলাত গেল এবং সেখানে ডিবেটিংয়ে প্রভূত সম্মান ও গ্রেজ ইনে বার-এট-ল্ ছাপ লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে এনরোল্‌ড্ হইল। হিরণ্যকশিপু পুত্রের অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিতে দেখিতে চক্ষু মুদিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বাল্যের অবদমিত (রিপ্রেস্‌ড্) সমাজ-বিরোধী মনোবৃত্তি রাবণচন্দ্রের কাজে ও চিন্তায় পুনর্মুক্তি খুঁজিতে লাগিল। রাবণচন্দ্র অতীব সঙ্গোপনে উৎকট বামপন্থীদলের পাতিখাতায় নাম লিখাইল।

ইহাই হইল সংক্ষিপ্ত পূর্বইতিহাস। একটা ব্যাসকূটের সম্বন্ধে এখানেই নিরাকৃত হওয়া প্রয়োজন। কাহিনীর শিরোনামাদৃষ্টে রসিক রোমান্টিক পাঠক স্বভাবতঃই অনুমান করিতেছেন, রামচন্দ্রের সুন্দরী স্ত্রীকে অপহরণ করিবার জন্য রাবণচন্দ্র নিশ্চয়ই কাহাকেও মারীচের মত সোনার হরিণ সাজাইয়া পাঠাইয়াছিল এবং সেই হতভাগাই এই ইতিহাসের লক্ষ্য। কল্পনাবিলাসী পাঠক মহাশয়কে আমরা বলিব, ঘটনা মোটেই এরূপ নয় বন্ধু। দেশনেতা শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ চিরকুমার, আ অসহযোগ ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী। সুতরাং সীতাহরণ ও মারীচ-বধ এক্ষেত্রে অবান্তর। এখানে মারীচ কে তাহা বলিতে আমাদের সংকোচ হইতেছে, তবু ঐতিহাসিককে সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে, কাজেই বলিতেছি, মারীচ আমি, তুমি, আমরা, তোমরা অর্থাৎ মারীচ হইতেছে দেশের আপামর জনসাধারণ, সভাশোভাযাত্রা-সংখ্যাবর্ধনকারী জনতা। এই "মারীচ" কথাটা আমরা কলিকাতার বিখ্যাত হৃদরোগবিশারদ পি. জি. হাসপাতালের ডক্টর ব্যানার্জির কাছ হইতে ধার করিয়াছি।

এখন কাহিনীর পরিণতিটা শুনুন।

দেশ স্বাধীন হইয়াছে। সংখ্যাধিক্য দক্ষিণপন্থী রামচন্দ্রের দলের হস্তে শাসনক্ষমতা স্বতঃই ন্যস্ত হইয়াছে। কলির রামচন্দ্র স্বয়ং রাজা হইয়া অপত্যনির্বিশেষে প্রজা-পালন ভার লইতে পারেন না, কারণ কলিতে অনেক পার্টি, অনেক দলাদলি। কলির রামচন্দ্র অন্তরালে থাকিয়া কলকাঠি নাড়েন, নেপথ্যবিধান করেন।

কাজেই রাবণচন্দ্র একদা গভীর নিশীথে চালতা-বাগানে রামচন্দ্রের ভাড়াটে ভবনে উপস্থিত হইয়া বলিল, দাদা, আমি রাবণ। রামচন্দ্র রাবণের গোপন অপকীর্তির কথা দুর্মুখদের মুখে কিছু কিছু অবগত হইয়া বেশ অপ্রসন্নই ছিল, একটু শুষ্ককণ্ঠেই বলিল, তা রাবণ ভায়া, এখানে কি মনে করে?

একটা প্যাক্ট করতে এলাম দাদা।

প্যাক্ট? কিসের প্যাক্ট?

রাবণের বাম চক্ষু ও বাম ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইয়া মৃদু হাসি ফুটিল। বলিল, প্যাক্ট এই রুজিরোজগারের। যা বাজার পড়েছে, তোমার ধোলাই-কারবার তো ধুয়ে-মুছে গেছে। বিয়ে থা কর নি বটে কিন্তু আমি তো জানি, জ্যোঠাইমা মানে তোমার মা আছেন, ভাইবোনেরাও সপরিবারে তোমার কাঁধে চেপে আছে। বক্তৃতা ভাল দিলে নাম হয় বটে কিন্তু এদেশে পয়সা তো মেলে না। আমার কথা যদি জিজ্ঞেস কর তা হলে বলব, এদেশের হাইকোর্টেও অকাট্য যুক্তি আর সূক্ষ্ম লজিকের কোনও দাম নেই। জজেরা আবেগময়ী বক্তৃতা আর হুজুর-হুজুরের ভক্ত। ছেলেবেলায় রামচন্দ্র ঘোষের শাগরেদি করে কাঁচুমাচু হয়ে মামলা জেতা আমার পছন্দ হয় না। কাজেই মক্কেলও জোটে না। বাবার খুব নামডাক রোজগার ছিল, কিছু রেখেও গিয়েছিলেন কিন্তু একে একে তালপুকুরের তালগাছ সব সাফ হয়ে এসেছে দাদা। এখন ভরসা এই প্যাক্ট।

আরে ছোঁড়া, খুলেই বল্ না, কিসের প্যাক্ট?

তুমি ডাইনে নাম করেছ, ডাইনেই থাক, আমি বাঁয়ে যাই। আর যোগসাজসে ডাইনে-বাঁয়ে ধুন্ধুমার বাধিয়ে রাখি। বাজার সরগরম রাখলে—

রামচন্দ্র ধমক দিয়া বলিল, আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিস? বাঁয়ে তো তুই আগেই ভিড়েছিস, আজ এসেছিস আমড়াগাছি করতে। যা, ভাগ্।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগানো গেল না। রামচন্দ্রের নরম মন, তাহা ছাড়া মনে মনে হয়তো ত্রেতার ট্রাডিশন অনুযায়ীই রাবণের প্রতি তাহার টান ছিল। প্যাক্ট

হইয়া গেল। কী সে প্যাক্ট তাহা খুলিয়া বলা সম্ভব নয়, পাঠককে অনুমানে বুঝিতে হইবে।

ধনী ব্যবসায়ী মহলে স্বভাবতঃই রামচন্দ্রের অগাধ প্রতিপত্তি। রাম-রাজত্বের ইহারাই খুঁটি। একবার রাবণ এক বক্তৃতায় 'মেঘনাদবধ' কোট করিয়া বলিয়াছিল, এই রক্তচোষা ধনীরা দক্ষিণপন্থী ভি. আই.পি.দের মাথায় "ধরে উচ্চ স্বর্ণচাদ ফণীন্দ্র যেমতি, বিস্তারি অযুত-ফণা ধরেন আদরে ধরারে।"

স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এবং উচ্চ-বেতন-নিশ্চিন্ত শিক্ষিত সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে লজিক-ম্যাজিক-ওয়ালা রাবণচন্দ্রের প্রসার-প্রতিপত্তি দিনে দিনে পরিবর্ধমান হইতেছিল। ছেলে মেয়েরা হৈ-চৈ চায়, সরকারী কর্মচারীদের ঈর্ষাজর্জরিত চিত্তে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষ, রাবণচন্দ্র দুইটিকেই কাজে লাগাইতে লাগিল।

পশ্চিমবঙ্গের রঙ্গমঞ্চ গোপন প্যাক্টের ফলে কিছুকাল মিলনান্ত নাটকের অভিনয়ে নিরুপদ্রব রহিল। কিন্তু উৎপাতহীন নিশ্চিন্ততা রামপন্থীর পক্ষে বাম, মারাত্মক। কাজেই হঠাৎ একদিন শোনা গেল ট্রাম-স্ট্রাইক হইবে। রামচন্দ্র রাবণের দ্বিমুখীনতার আভাস পাইয়া মনে মনে শঙ্কিত হইতেছিল, ট্রাম-স্ট্রাইক ঘোষণায় সে বিচলিত হইল এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া স্ট্রাইক এবং সমবেদনা-সঞ্জাত হরতাল রদ করিতে মনস্থ করিল।

গভীর রাত্রির অন্ধকারে রাবণচন্দ্র রামচন্দ্রের গৃহাকাশে উদিত হইল। রামচন্দ্র সরাসরি প্রশ্ন করিল, এ কী কাণ্ড শুরু করেছ, এমন তো কথা ছিল না।

চ্যাংড়াদের কন্ট্রোল করতে পারছি না দাদা। তুমি এবারটা ক্ষ্যামাঘেন্না করে সরে যাও। আর এমন ভুল হবে না।

মানে, বাধা দেব না?

দোহাই দাদা, তা হলে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে। তুমিও মরবে, আমিও মরব।

কিন্তু আমি যে ভলান্টিয়ারদের পোস্টিংয়ের হুকুম দিয়েছি। তাদের এখন ঠেকাবে কে?

তুমি নতুন হুকুম ইস্যু কর। গোড়ায় একটু গোলমাল হয়তো হবে কিন্তু তোমার হুকুম পেলেই আমি শেষ রক্ষা করব।

শেষরক্ষা সত্য সত্যই হইল, অর্থাৎ রাবণের জিত, রামচন্দ্রের হার হইল। ট্রাম-বাস পোড়ানো, ইটপাটকেল ছোড়া, বোমা-কাঁদুনে গ্যাসের খেল্ শুরুতেই শেষ হইল, কারণ দক্ষিণপন্থী ভলান্টিয়ারদের কোথাও দেখা গেল না। হরতাল সাকসেসফুল, ট্রাম-ধর্মঘট জয়যুক্ত হওয়াতে রাবণের জয়জয়কার হইল।

কিন্তু খিলাফৎ প্যাক্টের মত, স্বরাজ্যপার্টির প্যাক্টের মত এ প্যাক্টও টিকিল না। দস্যু রত্নাকর শুরুতে রাম নাম উচ্চারণ করিতে অপারগ হইয়া "মরা-মরা" বলিতে বলিতে রাম-নাম-উচ্চারণের পুণ্যবলে পাপমুক্ত হইয়াছিল, রাবণচন্দ্রও বাহিরে রামচন্দ্রের শত্রুর ভূমিকায় অভিনয় করিতে করিতে সত্যসত্যই তাহার ঘোরশত্রু হইয়া উঠিল। তখনই গোল বাধিল। রামচন্দ্র নিজের হাত কামড়াইতে লাগিল কিন্তু তখন উপায় ছিল না। ইদানীং রাবণ নিশাভিসারে রামের কাছে আসা বন্ধ করিয়াছে। রাম জানিয়া বুঝিয়াও বোকা বনিয়া গিয়াছে। সে মনে মনে কঠিন হইয়া রাবণের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

সুযোগ অচিরাৎ মিলিল। রাণাঘাটে বনবাদাড়ে স্টেশনে ক্যাম্পে—যেখানে যত ছিন্নমূল উদ্বাস্তু ছিল রাবণ নানা কৌশল-কসরতে ধীরে ধীরে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদিগকেই মারীচস্বরূপ ব্যবহার করিয়া রাবণ রামচন্দ্রের সীতা অর্থাৎ ক্ষমতা অপহরণে তৎপর হইয়াছিল। এবারও স্থান সেই রামায়ণ-খ্যাত দণ্ডকারণ্য। দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন চলিবে না—ইহাই হইল রাবণের ইস্যু। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের বনবাদাড় ক্যাম্প, কলিকাতার পথঘাট স্টেশন এই অসহায় নিরন্ন বিপন্ন মানুষগুলির দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় দেশের নৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পঙ্কিল ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। মাংসলোলুপ ধনী ব্যবসায়ী মক্কেলদের সামলাইতেই রামের প্রাণান্ত হইতেছে। দণ্ডকারণ্যকে

…যোগ্য ও নিরাপদ করিয়া ইহাদিগকে সেখানে চালান …করিলে রাজ্যের সমূহ বিপদ। রাবণের সমূহ বিপদ …রা অপসারিত হইলে। কলিকাতায় এবং কলিকাতার …শেপাশে ইহারা আছে বলিয়াই "চল্‌বে না" মিছিলে …ডাকে কয়েক হাজার মারীচ পাওয়া যায়; রাজভবন, …ভবন, মহাকরণিকভবন, প্রধানমন্ত্রীভবন ঘেরাও …রিয়া মন্ত্রী-পরিষদকে বিচলিত ও শঙ্কিত করিবার ইহারাই …মাত্র অস্ত্র। সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া প্রতিবাদ মিছিলে …কটি লোক লইয়া কেরোসিনের কুপির মত টিমটিম …রিতে করিতে লালদীঘি অভিযান করিলে বামপন্থীরা …স্পদ হইবে। কাজেই যেন-তেন-প্রকারেণ দণ্ডকারণ্য …রিকল্পনা বানচাল করিতেই হইবে।

দুই পক্ষই প্রস্তুত হইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন …লোকসভায় শ্রীকৃষ্ণের মত শেষবারের জন্য রামভবনে …বনের নিশীথাভিসার হইল। শরৎ মহারাজ কথিত …প্রসঙ্গের সে শিষ্যভাব আর নাই, একেবারে শুরুর …ই দেহংদেহি-ভাব। রাম বলিল, আবার কী মতলবে?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বন্ধু এবং সখা …কৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা শুনিয়েছিলেন। আমি তোমার … সখা এবং ছোটভাইও। দাদা, এখনও বলছি নিবৃত্ত …ও। নবযুগের গীতা তোমাকে শোনাতে এসেছি।

কার্লমার্কসের জবানিতে তো? ও আমার পড়া আছে।

না, আরও নতুন—

লেনিনের?

—না, আরও অভিনব—

স্টালিনের?

—না দাদা, তার পরেরও কথা আছে।

তবে পরের কথা যুদ্ধের পরে হবে। শ্রীকৃষ্ণ অনুশাসন-পর্বে অনুগীতা শুনিয়েছিলেন। তুমি অনুজ, অনুগীতা শোনাতে পার। সেই পর্বে তুমিও এসো, আমি প্রস্তুত থাকব।

দেখ, তোমার সঙ্গে প্যাক্ট যখন ভেঙেই গেছে, …জিরোজগারের কথা আর তুলব না। তোমার কল্যাণের …ন্যে বলছি, প্রতিনিবৃত্ত হও। তুমি হেরে যাবে।

রামচন্দ্রের বক্ষে মত ভীম ঘোষের সিংহ-আত্মা গর্জন

শেষে উভয়পক্ষে যে আন-পার্লামেন্টারি বিশেষণ ও সম্বোধন বিনিময় হইল, ঐতিহাসিকের তাহা রেকর্ডযোগ্য নহে। শেষ-দুইটি বাক্য মাত্র ঐতিহাসিক। রাবণ বলিল, ক্যাপিটালিস্ট-গ্র্যামফেড র‍্যাম, সাবধান, তোমাকে মাটন বানিয়ে চপ করে খাব।

রাম বলিল, দূর হ ভূশণ্ডির মাঠের র‍্যাভেন, কা কা করে আর দিক করিস না।

ইহার পর শেষ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। গড়ের মাঠে অক্টারলনি মনুমেণ্টের পাদদেশে শক্তিপরীক্ষা। রাবণের অর্গ্যানিজেশন নিখুঁত। হাজার হাজার বিপন্ন উদ্বাস্তু মারীচ সেখানে সমবেত হইয়া "চলবে না, চলবে না" ধ্বনিতে ফাটা মনুমেণ্টে আবার ফাট ধরাইতেছে। সমস্ত দিনের আয়োজনের উত্তেজনায় রাবণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে উঠিল সবশেষে। তাহার নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। সে কষ্ট উপেক্ষা করিয়া সে বজ্রনির্ঘোষে বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু প্রেমাস্পদার কানে কানে প্রেমিকের গভীর আবেগকম্পিত মৃদু ফিসফিসের মতো মাইক ঘোষণা করিল—ভাই সব, জান দিয়াও মান রাখিতে হইবে। রক্তপায়ী ছারপোকাদের টিপিয়া টিপিয়া নিঃশেষে রক্তটুকু বাহির করিয়া লইয়া তবে মারিবে। মানুষের প্রাণ লইয়া এইভাবে গেণ্ডুয়া খেলা—মানুষ আমরা কিছুতেই ঘটিতে দিব না। মোটর-কারেই যাহাদের বিলাস-ভ্রমণ তাহারা নিরীহ দরিদ্র পথচারী মানুষকে চাপা দিতে পারিলেই খুশী হয়। কিন্তু পথের মানুষ সমবেত হইয়া যদি ঘুরিয়া দাঁড়ায়, গতির মুখে তাহাদের দুইদশটির প্রাণ হয়তো বলিদান হইতে পারে কিন্তু মোটরকারসহ ধনী বিলাসীকে ছাতুমাত্রে পর্যবসিত করিতে বেগ পাইতে হয় না। আমরা তাহাই করিব, ছাতু করিয়া দিব, ছাতু—

রাবণ হঠাৎ ডায়াসের উপরে এলাইয়া পড়িল। দর্শকশ্রোতাদের মধ্যে প্রথমে একটা অসহায় হতভম্ব ভাব কিন্তু তার পরেই হৈ-হৈ কোলাহল। সভা ভাঙিয়া গেল। বামপন্থী ডাক্তার মজুমদার ডায়াসের উপরেই ছিলেন, তিনি হাঁটু গাড়িয়া পরীক্ষান্তে বলিলেন,

ডাক্তার মজুমদার নিজের গাড়িতে করিয়া করোনারি-শেলাহত অচৈতন্য রাবণকে পি. জি. হাসপাতালে লইয়া গিয়া নিজের প্রতিষ্ঠাবলে কেবিনজাত করিলেন।

মারীচ-সম্প্রদায় উঠি-উঠি করিতেছে এমন সময় গগনবিদীর্ণ করিয়া রামচন্দ্রের জয়ধ্বনি শোনা গেল। দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের পরিত্যক্ত ডায়াস ও মাইক অধিকার করিয়া অচিরাৎ মন্থমেন্টপ্রকম্পী বক্তৃতা জুড়িয়া দিল। যাহারা চিরকাল "রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব" ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকে বক্তার বিষয়বদলে তাহাদের কোনই আপত্তি হইল না। রাম ডাহিন, হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলিতে পারিলে সব সমান। আর হৃদয়বিদারক ভাষা ও ভঙ্গিতে বলিবার ক্ষমতা রামচন্দ্রের ছিল। সে বজ্রনির্ঘোষে বলিল—ভাই সব, গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ঢালিয়া আত্মহত্যা করিও না। যাহারা তোমাদের কল্যাণকামী সাজিয়া তোমাদিগকে হিতাহিতবিবেচনাহীন ভেড়ার মত নিশ্চিত মৃত্যুগহ্বরে নিক্ষেপ করিতে চাহিতেছে তাহারা তোমাদের শত্রু। নিজেদের স্বার্থসাধনে উহারা তোমাদের সর্বনাশসাধনে পশ্চাদপদ যে নয় তাহার প্রমাণ তোমরা বহুবার পাইয়াছ। ভাবিয়া দেখ, তোমাদের বুভুক্ষু মুখে উহারা কি এককণা তণ্ডুল দিতে পারিয়াছে, তোমাদের নগ্নগাত্রে কি একফালি জীর্ণবস্ত্রের আবরণ উহারা দিয়াছে? প্রতারকের কথায় ভুলিও না। ওঠো, জাগো, যাহা শ্রেয় তাহাই বাছাই করিয়া লও—

আকাট-বামপন্থী দুই চারিজন এখানে-ওখানে তখনও ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন তীব্র ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমাদের মা-বোনেদের ইজ্জত লইয়া রাত্রির অন্ধকারে ছিনিমিনি খেলিয়াছে কে? তোমার ধনী পৃষ্ঠপোষকদের দালালরা। আর আজ আমাদের ভাল করিতে আসিয়াছ তুমি? ফাই, ফাই অন ইউ।

হৈহৈ কোলাহল উঠিল। রামচন্দ্র কণ্ঠস্বর উচ্চতর করিয়া কোলাহল থামাইতে গেল কিন্তু দীর্ঘকাল জেলের মধ্যে নানা কায়িক অত্যাচার ভোগ করিয়া তাহার হার্ট জখম হইয়াছিল। নিতান্ত মনের জোরে সে দৌড়ঝাপ বক্তৃতা করিয়া বেড়াইত বটে কিন্তু ভঙ্গুর দেহ আজ আর এতখানি উত্তেজনার ভার সহিতে পারিল না। শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ বাতাহত কদলীর ন্যায় মাইকের উপরেই ঢলিয়া পড়িল।

সন্তর্পণে সশ্রদ্ধভাবে রামভক্তেরা পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বৈদ্যের পরামর্শমতে রামচন্দ্রকে পি. জি. হাসপাতালে লইয়া গেল, সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ কেবিনে তাহাকে ভর্তি করা হইল।

পরদিন প্রাতে দুই পরস্পরবিরোধী উত্তেজনার বশে যখন শহরবাসী দুই দলে বিভক্ত হইয়া শোভাযাত্রা করিতে ও শোভাযাত্রা ভাঙিতে তৎপর হইয়াছে, হাতবোমা, ইটপাটকেল বর্ষণে রাস্তার বাতি, পথনির্দেশক বৈদ্যুতিক চিহ্ন এবং ফায়ারব্রিগেডের আহ্বান-যন্ত্র একদল ভাঙিতেছে এবং অন্য দল লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগে তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতেছে, ট্রাম পুড়িতেছে, বাস পুড়িতেছে এবং ধরপাকড় এমন কি গুলিবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে, পি. জি. হাসপাতালে তখন দুই বন্ধু একই কামরায় মিলিত হইয়াছে। রাবণ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই সুস্থ হইয়াছিল, বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে হাওয়ায় ওড়া পর্দার ফাঁক দিয়া শয্যাউপবিষ্ট রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া অনাবিল উচ্ছ্বাসে তাহাকে কুশল প্রশ্ন করিয়াছে। তাহাকে এক ভক্তিময়ী বামপন্থী গতবারেই একটিন নেসকফি ভেট দিয়া গিয়াছিল। সে নিজের কেবিনে গিয়া নার্সের কাছে দুধ ও গরম জল চাহিয়া লইয়া দুই কাপ কফি পরিপাটি ভাবে প্রস্তুত করিয়া রামচন্দ্রের কেবিনে লইয়া আসিয়াছে এবং রামচন্দ্রও উপহৃত কেকের বিস্কুটের টিন খুলিয়া মুচমুচে নোনতা বিস্কুট বাছাই করিয়া রাবণকে দিয়া নিজেও লইয়াছে এবং পরস্পরকে তারিফ করিতে করিতে কফি সহযোগে বিস্কুট ভক্ষণ অন্তে রামচন্দ্র 'করোনা' চুরুট ও রাবণচন্দ্র 'চারমিনার' সিগারেট ধরাইয়া আরাম করিয়া টানিতেছে দেখা গেল।

কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ হার্টস্পেশালিস্ট ডাক্তার ব্যানার্জি বেলা ঠিক দশটায় রোগী পরিদর্শনে আসিয়া দুই দেশবিখ্যাত রোগীকে একই কেবিনে একই শয্যায় ওই ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। তাঁহার চোখেমুখে একটা প্রশ্নের ভাব ফুটিতে দেখিয়া রামচন্দ্র একটু জবাবদিহি করা আবশ্যক মনে করিল। সেও হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আমরা বাল্যবন্ধু, ডক্টর ব্যানার্জি।

ডক্টর ব্যানার্জির মুখফোড় দুর্নাম আছে। তিনি বলিলেন, রামরাবণে তো বেশ একসঙ্গে বসে কফি-বিস্কুট-তাম্রকূটধূমের সঙ্গে আঁতাত করছেন, ওদিকে যে বেচারা মারীচদের রক্তে কলকাতার রাজপথ ভেসে গেল। মারামারি চলছে এখনও। আর. জি. কর, ন্যাশনাল, নীলরতন, মেডিকাল, ইসলামিয়ার সব বেড ভর্তি, এখন শম্ভুনাথ উপচে আমাদের এখানেও ঠেল মারছে। এমার্জেন্সী ওয়ার্ড আর কোপ করতে পারছে না।

রাম রাবণ উভয়ে একসঙ্গে লজ্জায় মাথা নীচু করিল।

মহাভারত-কথা

অষ্টাদশ দিবসে অষ্টাদশ-অক্ষৌহিণী সেনা নিঃশেষ হইল। যোদ্ধভাবে মহাসমর নিবৃত্ত হইল। বিজেতা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সর্বজনসম্মতিক্রমে হস্তিনাপুরীর সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন।

দীর্ঘকাল তিনি রাজ্যভোগ করিলেন। তিনি দিগ্বিজয় করিলেন, অশ্বমেধ করিলেন, এবং আরও বহু বহু মহাকর্মানুষ্ঠানের অন্তে সশরীরে স্বর্গযাত্রা করিলেন। তাঁহার সেই মহাজীবনের মহাকাহিনী মহামুনি ব্যাসদেব গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ব্যাসদেব চারণধর্মী কবি। মহাভারতের কাহিনী মূলতঃ কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের কাহিনী। সে কাহিনীর আদিপর্ব উদ্যোগপর্ব সমরপর্ব এবং উত্তরকালের দিগ্বিজয়-পর্ব তিনি যাদৃশ ধৈর্য ও নিষ্ঠাসহকারে সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন, রাজ্যশাসন-পর্ব তাদৃশ করেন নাই।

ব্যাসদেব কর্তৃক অনুক্ত ভারত-কাহিনীর একটি অধ্যায় এই নিবন্ধে বর্ণিত হইল।

সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির রণক্লিন্ন ভারতভূমিকে সর্বথা সুসংবদ্ধ ও সুসন্নিবিষ্ট করিতে মনোযোগী হইলেন। ভাগ্য তাঁহার অনুকূল, এক্ষণে পুরুষকারও তাঁহার সহায় হইল। শত্রুপক্ষ সমূলে নির্জিত ও উৎপাটিত। যুধিষ্ঠির বিদ্বান ও জ্ঞানপ্রবীণ। মহাবল ভ্রাতৃচতুষ্টয়, মহাকৌশলী শ্রীকৃষ্ণ ও মহারথ রাজন্যবর্গ তাঁহার অনুগত। মহাজ্ঞানী ঋষিগণ তাঁহার নিত্যসহচর। তিনি রাজধর্মে পারদর্শী, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধী বলিয়া বিখ্যাত, সৌম্যমূর্তি সৌম্যপ্রকৃতি সৌম্যভাষী বলিয়া বিজ্ঞাত। রাজ্যের শৃঙ্খলা-বিধানে এই সমস্তই তাঁহার সহায়ক হইল। স্থান কাল ও পাত্রভেদে তোষণ, শোষণ পোষণ ও শাসন, এই নীতি চতুষ্টয়ের যথোচিত প্রয়োগ দ্বারা তিনি অচিরাৎ সসাগরা জম্বুদ্বীপকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। এই বিচিত্রা মহাভূমির সর্বত্র শান্তি ও সাম্যের বাণী প্রসারিত হইল।

কেবল ইহাই নহে। যাহা কোন রাজা কোনদিন করে নাই, করিবে না—ধর্মান্তরপরায়ণ ম্লেচ্ছ প্রজাবৃন্দের প্রীতিবিধান-মানসে তিনি স্বেচ্ছায় স্বীয় রাজ্যকে খণ্ডিত করিলেন; পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে দুইটি বৃহৎ ভূভাগ স্বীয় শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে ম্লেচ্ছজাতির স্বকীয় আবাসভূমি বলিয়া ঘোষিত করিলেন। আর্যেতর জাতিদিগের মধ্যে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। দানশূর সমদর্শী ধর্মরাজের নাম ও কীর্তি দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

নিয়ত বিরাম ও বিশ্রামবিহীন হইয়া যুধিষ্ঠির রাজ্যের সর্ববিধ উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হইলেন। ভারতের মহিমা প্রচার, মৈত্রী ও বাণিজ্য বিস্তার ও ধনাগমের উদ্দেশ্যে

তিনি কখনও স্বয়ং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু দেশে দেশে ভ্রমণ করিলেন; কদাচ বা স্বরাজ্যে থাকিয়া বিদেশাগত রাজন্য ও রাজদূতগণকে স্বাগত জানাইলেন। দিকে দিকে তাঁহার খ্যাতি, দেশে দেশে তাঁহার সমাদর। ভারতের কেন, পৃথিবীরই কোন রাজা বা শাসক এতাদৃশ বিপুলা কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

কেবল বিদেশে নহে, স্বদেশেও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার তুলনা ছিল না। তাঁহার উচ্চারিত সামান্য বাক্যও কণ্ঠে কণ্ঠে সংগৃহীত ও ধ্বনিত হয়, তাঁহার প্রতিটি নির্দেশ ও বাণীকে রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা আপ্তবাক্য-তুল্য জ্ঞান করে, তিনি পথে বাহির হইলে তাঁহার দর্শন-লাভমানসে অসূর্যম্পশ্যা কুলবালা কুলবধূগণ উন্মুক্ত রাজপথে দৃশ্যমানা হন, রাজ্যের সকল শিশু স্বতঃ তাঁহাকে পিতৃব্য-সম্বোধন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে।

ভ্রাতা ও রাজন্যবর্গকে যুধিষ্ঠির বিশেষ বিশেষ কর্তব্যে নিযুক্ত করিলেন। পররাষ্ট্রের সহিত সদ্ভাব স্থাপন ও রক্ষা করিতে হইলে বহুদর্শী ও বহুভাষী হইতে হয়, অতএব সে কর্তব্যটি তিনি স্বীয় স্কন্ধেই ন্যস্ত রাখিলেন। ভীমবল ভীমসেন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা ও শাসনের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন, মন্ত্রণাসভায় স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের পরেই তাঁহার স্থান নির্দিষ্ট হইল। অর্জুন ও তাঁহার বিকল্পে শ্রীকৃষ্ণ, সেনাবাহিনীর ভার প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বরাজন্যসভায় কোন দৌত্য বা আলোচনা আবশ্যক হইলে তাহার ভারও শ্রীকৃষ্ণের উপরে অর্পিত হইল—বাগ্মিতায় ও বাক্-কৌশলে তাঁহার তুল্য আর কেহই ছিল না।

সর্বভূতে সমদর্শী যুধিষ্ঠির ঘোষণা করিলেন, তাঁহার রাজ্যে মানুষে মানুষে প্রভেদ নাই, তুল্য যোগ্যতাশালী সকলেই তুল্য মর্যাদার অধিকারী হইবে। অভিজাত ও অনভিজাতের, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সামাজিক মর্যাদা-বিভেদ হ্রাস পাইল। জাতি, ধর্ম, ভাষা বা প্রদেশ-ভেদে আদর-ভেদ লুপ্ত হইল। সকলেই সমান, সকলেই তুল্যাধিকারী। প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অব্যাহত হইল। প্রত্যেকের আনন্দ-উৎসবে ও অনুষ্ঠানে যাহাতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য স্থির হইল, প্রত্যেকের প্রতি পর্বদিনে সমগ্র প্রজা ও রাজপুরুষগণ কর্ম-বিরতি উপভোগ করিবেন। ভাদ্রপদের কৃষ্ণা-অষ্টমী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি, এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকও এই তিথিতেই হইয়াছিল। অতএব প্রতি বৎসর উক্ত তিথিটি সর্বজনীন জাতীয় উৎসব ও সমারোহ-দিবস বলিয়া গণ্য হইল। যুধিষ্ঠিরের শাসন-প্রতিষ্ঠা, আগামীকালের দেশবাসীর নিরাপদ জীবন ও সমৃদ্ধির সূচনাস্বরূপ; অতএব তাঁহার নিজস্ব জন্মতিথিটি রাজ্যের সর্বত্র শিশু-মহোৎসবের দিন বলিয়া ধার্য হইল।

এবংবিধ ভূয়িষ্ঠ সদ্বিধান প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণ যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইল। তাহারা সকলে একবাক্যে কহিল, ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের পরে আর কোন রাজা এরূপ সুশাসক ও সুখ্যাত হন নাই। জম্বুদ্বীপে রামরাজ্যের পুনরাবির্ভাব হইল বলিয়া তাহারা আনন্দে অধীর হইল। তাহারা জানিত না রামরাজত্বে একাধিপত্য ছিল রাম-চরণাশ্রিত বানর-সেনার।

রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষের অবসানে ভীমসেন নিবেদন করিলেন, তিনি কর্ম হইতে অবসর চাহেন, তীর্থযাত্রা করিবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ, কেন তোমার এই অকাল নির্বেদ? আমি কি কোন কারণে তোমার অপ্রীতি বা অপ্রত্যয়ের ভাজন হইয়াছি?

ভীমসেন দুই কর্ণ স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, এরূপ উক্তি শ্রবণ করাও পাপ। আপনার সমালোচনা আমার দ্বারা সম্ভবে না, এবং আপনার চরিত্রও ত্রুটি-বিচারের অতীত। আমি অব্যাহতি চাহিতেছি, কারণ এই নিষ্কর্ম কর্মজীবন আমার ভাল লাগিতেছে না। আমি আজন্ম যোদ্ধা, ভীষণ রণক্ষেত্রে ভীষণা গদা স্কন্ধে বিচরণ করাকেই চিরদিন সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি। এই সুখরাজ্যে সর্বত্র শান্তি; আপনি নিরপেক্ষ সর্বাঙ্গীণ শান্তির উদ্গাতা। এই নীতি সর্বথা প্রশংসনীয়, কিন্তু আমার পক্ষে ইহা দুষ্পাচ্য। রণক্ষেত্রের পরিবু

গৃহকোণে, গদার পরিবর্তে লেখনী সঞ্চালন করিয়া আমার দিন কাটিতেছে। ব্যায়ামাভাবে আমার বাহু শীর্ণ ও কটিদেশ পীন হইতেছে। আমি বৃকোদর, ক্রত বৃযোদরে পরিণত হইতেছি। রণহুঙ্কারের পরিবর্তে জৃম্ভনধ্বনি মাত্র আমার কণ্ঠে নির্গত হইতেছে। এই অবস্থা অসহনীয়।

কেন? এই সেদিন-মাত্র তুমি বিদ্রোহী হয়-দ্রবপতিকে পরাভূত করিয়াছ, তাহার অতি-তেজস্বী সেনাপতি রেজভীংকে নির্জিত ও বন্দী করিয়াছ।

ওই একটিমাত্র। গণ্ডূষমাত্র সলিলপানে কি অগস্ত্যের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়? তাহাতে তৃষ্ণার বৃদ্ধিমাত্র। আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না। যতদিন আমার প্রয়োজন ছিল, আমি নির্বিচারে কর্তব্য পালন করিয়াছি। এই সুখরাজ্যে আমি অর্থহীন। আমি যুদ্ধ জানি, সুখশয্যা চিনি না। আমার নয়নদ্বয় নিশাজাগরণ-ক্লান্ত, আমার মধ্যদেশ বাতবেদনা-কাতর। দয়া করুন, এই আলস্য-শয়ন হইতে আমাকে মুক্তি দিন।

যুধিষ্ঠিরের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। সস্নেহে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন, কহিলেন, তোমার ব্যথা আমি বুঝিয়াছি। বেশ, বল, কি তোমার অভিপ্রায়?

ভীম কহিলেন, আমার নিকট হইতে এই কর্মভার ফিরাইয়া লউন। আমি নিরুদ্দেশ তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইব।

কোথায় যাইবে?

তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তীর্থে তীর্থে কিছুদিন ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প আছে, হয়তো দেশান্তরেও যাইব। আর, এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া যদি পরিতৃপ্ত না হই, হয়তো স্বেচ্ছায় যমপুরীর পথেই চলিয়া যাইব।

সে কি কথা! না না, তাহা যাইও না। আমরা সকলে এইখানে রহিলাম, তুমি একাকী যমালয়ে যাইবে কি!

গেলামই বা। বনবাসে, অজ্ঞাতবাসে, বহুবার বহু যাত্রায় আমিই অগ্রগামী হইয়াছি। পূর্বগামী সেনাস্বরূপ আমি গিয়া নবতর দেশ আবিষ্কার করিয়াছি, নিষ্কণ্টক করিয়াছি, আপনারা পরে গিয়া তথায় নির্বিঘ্নে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। হিড়িম্ব, বক প্রভৃতি রাক্ষসবৃন্দ এইরূপেই নিহত হইয়াছিল। তাহারই না হয় পুনরাবৃত্তি হইবে—আমি অগ্রে যমলোকে পৌঁছিয়া আপনাদিগের জন্য স্থান রচনা করিয়া রাখিব। আর বাধা দিবেন না, আমাকে বিদায় দিন।

যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন, সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, দিলাম।

ভীমকর্মা ভীমসেন রাজসভা হইতে অবসৃত হইয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণে প্রতিবেশী নবসৃষ্ট ম্লেচ্ছরাজ্য, ও রাজ্যমধ্যস্থ অনার্য-প্রদেশে মহা উৎসব পড়িয়া গেল। স্নিগ্ধ-প্রকৃতি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে একমাত্র ভীমসেনকেই তাহারা ভয় করিত।

দীর্ঘ দশবৎসর কাল যুধিষ্ঠির নির্বিঘ্নে রাজ্যপালন করিলেন। দেশ-দেশান্তর হইতে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির আগমন ও সমাবেশের ব্যবস্থা করিলেন। ইঁহাদিগের শিল্প-কৌশলে দেশের সর্বত্র বৃহৎ বৃহৎ কর্মশালা ও শক্তিসঞ্চারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল; কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সর্বক্ষেত্রে নবীনতর কর্মোদ্যম ও সমৃদ্ধির সূচনা দেখা যাইতে লাগিল।

একাদশ বর্ষের প্রান্তে পৌঁছিয়া যুধিষ্ঠির ক্লান্তি অনুভব করিলেন। প্রজাবর্গ একান্তভাবে তাঁহারই মুখাপেক্ষী, অমাত্যবর্গ সমস্ত কার্যে কেবল তাঁহারই নির্দেশ চাহিয়া বসিয়া থাকেন। একা তিনি কত পারিবেন? ধর্মপুত্র, তথাপি তিনি মানবী-সন্তান। প্রথম বয়সে সুখ-লালিত রাজপুত্র, মধ্যবয়সে বনবাসে ও রণক্ষেত্রে নানাবিধ অনভ্যস্ত কৃচ্ছ্র বহন করিয়াছেন, এক্ষণে বৃদ্ধবয়সে তাঁহার সে উদ্যমের গতি স্তিমিত হইয়া আসিল। গণনা করিয়া দেখিলেন, বয়স সপ্ততির রেখা স্পর্শ করিয়াছে।

তখন তিনি একদিন ভ্রাতা ও অমাত্যবর্গকে একত্র আহ্বান করিলেন। কহিলেন, আমি কিঞ্চিৎ ক্লান্তি বোধ করিতেছি, অবসর গ্রহণ করিতে চাহি। তোমরা আমার কার্যভার গ্রহণ কর।

তাঁহারা সমস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, আপনি কি দোষে আমাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তোমাদের দোষ নাই। আমিই ক্লান্ত, জরায় আক্রান্ত। শক্তির অবসানেও দুর্বল হস্তে দণ্ডধারণ করিয়া থাকার অর্থ হয় না, তাহাতে রাজ্যের হানি। আমি কিছুই ত্যাগ করিতেছি না, কিঞ্চিৎ অবসর মাত্র চাহিতেছি। আর এই অবসরও চিরদিনের জন্য নহে, সাময়িক মাত্র। বিশ্রামান্তে পুনরায় তোমাদিগের সহিত মিলিত হইব, পুনরায় কর্মভার স্বীকার করিব। আমি এই জাতির সেবক, চিরদিন তাহাই থাকিব।

ভ্রাতারা তর্ক করিলেন না। দেবী দ্রৌপদীও সম্মতি দিলেন। কিন্তু অমাত্য ও রাজপুরুষগণ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। যুধিষ্ঠির না থাকিলে তাঁহাদিগের সমূহ প্রমাদ। যুধিষ্ঠির নিরতিশয় স্নিগ্ধস্বভাব ও ক্ষমাশীল। প্রকাণ্ড-পরিমাণ অন্যায় বা কর্মে অবহেলা করিলেও তিনি মৃদু-ভর্ৎসনার অধিক দণ্ডবিধান করেন না; তাহাও করেন অতি সসংকোচে—যেন তিনি স্বয়ংই অপরাধী। এমন মৃদু বিচার, অন্যায় ও কর্তব্যহানির এমন নির্বিচার ক্ষমা, আর কাহার নিকটে মিলিবে? আর কে আছেন, যিনি সমস্ত অপবাদ অভিযোগ নিজে স্বীকার করিয়া লইবেন তথাপি আশ্রিত অনুচরদিগকে সর্ববিধ শাস্তি ও নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবেন? হায়, যুধিষ্ঠির না থাকিলে এত সুখের রামরাজত্বেরও এইখানেই ইতি!

পূর্ণ সপ্তাহকাল যাবৎ উভয়পক্ষে বিতর্ক ও মিনতি বাক্যের স্রোত বহিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির বারংবার করুণকণ্ঠে কহিলেন, আমার অবস্থাটা বুঝুন, আমাকে কি মারিয়া ফেলিবেন?

রাজপুরুষগণ ততোধিক করুণকণ্ঠে কহিলেন, তবে আপনিই আমাদিগকে মারিয়া ফেলুন। আপনি যদি না থাকেন, তবে আমরা আর কয়দিন।

এই অশ্রুবর্ষণের প্রতিযোগিতায় অবশেষে তাঁহারাই জয়ী হইলেন, কারণ তাঁহারা বহু, যুধিষ্ঠির একক। তাঁহাদিগের অগণিত নয়নের অজস্র অশ্রুপ্লাবনে একাকী যুধিষ্ঠিরের দুইটি মাত্র নয়নের দুইটি মাত্র অশ্রুবিন্দু কোথায় ভাসিয়া গেল। যুধিষ্ঠির তর্কে ভঙ্গ দিলেন। সম্ভবতঃ ইঁহাদিগের ক্রমাগত ও নিয়মিত স্তববাক্যে মোহিতও হইয়াছিলেন। কহিলেন, বেশ, যাইব না।

তখন সেই রাজপুরুষগণ কহিলেন, কিন্তু আপনি শ্রান্ত, এ কথাটিও অবিস্মরণীয়। আপনি আমাদিগের উপরোধ রক্ষা করিয়াছেন, আমরাও আপনার আবেদনপত্র বিবেচনা করিয়া দেখিব।

ক্রমে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, যুধিষ্ঠিরকে দুই মাস কালের জন্য বিশ্রামের অনুমতি দেওয়া হইবে। হিমালয় পৃষ্ঠে স্বনির্ঝর মন্দাকিনী-কুলুকুলিত স্নিগ্ধ উপত্যকাভূমিতে তিনি বিশ্রামার্থে গমন করিবেন, তথায় পর্বতপৃষ্ঠের নিসর্গ বনশোভা ও রাষ্ট্র-কচাকচানভিজ্ঞ সরলচিত্ত পর্বতবাসীদিগের সাহচর্যে মনের ক্লান্তি অপনোদন করিবেন, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে অমাত্য ও সচিববর্গ সেই স্থলে তাঁহার নিকটে নির্দেশ প্রার্থনা করিতে যাইবেন। অথবা হয়তো তিনিই মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনবোধে মর্ত্যভূমিতে অবতরণ করিবেন।

উপত্যকাভূমিতে সর্বসুখপ্রদ গৃহ নির্মিত হইল। যুধিষ্ঠির মহা সমারোহে তথায় উপনীত হইলেন। দুই মাসকাল তিনি সেই গৃহে বাস করিলেন। সেই সময়ের মধ্যে বহু সচিব ও রাজপুরুষ বহু সূত্রে তাঁহার সহিত পরামর্শ বা নির্দেশ প্রার্থনা ব্যপদেশে বিনাব্যয়ে হিমালয় ভ্রমণ সারিয়া লইলেন। একাধিকবার তাঁহাকেও পর্বতবাস হইতে নিম্নভূমিতে ছুটিয়া আসিতে হইল। বিশ্রাম-বিহীন বিশ্রাম ভোগের অন্তে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই বিশ্রাম-ছলনার দ্বারা যুধিষ্ঠিরের ক্লান্তিভার কতদূর অপনোদিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা অন্যের অসাধ্য। কিন্তু এই ঘটনা হইতেই পরবর্তীকালে বহুতর অনিষ্টের সূত্রপাত হইল।

যুধিষ্ঠির সর্বত্র সমাদৃত; তাঁহার প্রকৃতির জন্যও বটে, নীতির জন্যও বটে, সকলের সম্মাননীয়। তিনি সকলকেই

মিত্রজ্ঞান করেন, কাহাকেও বৈরনেত্রে দেখেন না, আঘাত পাইয়াও প্রত্যাঘাত করেন না। পরস্পর মর্মান্তিক বৈরভাবাপন্ন রাজগণও প্রত্যেকে একক ভাবে যুধিষ্ঠিরের বন্ধু বলিয়া গণ্য। তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বৈর কেহ করিতে চাহিলে সে ব্যক্তি জগৎসমক্ষে স্বতঃই ধিকৃত হইবে, এইরূপ আশঙ্কায় এযাবৎ কেহ তাঁহার বা তাঁহার রাজ্যের অনিষ্ট চেষ্টা করে নাই।

কিন্তু তিনি ক্লান্ত হইয়াছেন, কর্মভার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, এই বার্তা বিদ্যুদ্বেগে দিগ্বিদিকে প্রচারিত হইল। রাজ্যের বাহিরে ও অভ্যন্তরে যে সকল অনিষ্টবুদ্ধি এতকাল বিপদের ভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিল, তাহারা অকস্মাৎ উল্লসিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সমুদ্রতীরে অবস্থিত কেরল রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল।

তথাকার অমাত্যমণ্ডলী প্রজাগণের দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কর্মনীতি সর্বাংশে যুধিষ্ঠিরের মনঃপূত নহে, তথাপি প্রজাগণের ইচ্ছাক্রমে তিনি তাহাদিগের পদাভিষেক স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অমাত্যগণও রাজ্যশাসনে নানাবিধ নূতন প্রণালী ও সংস্কার প্রবর্তনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এক্ষণে প্রজাবর্গ অকস্মাৎ সেই অমাত্যমণ্ডলীর কার্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। অমাত্যগণ কহিলেন, তাঁহাদিগের বিরোধীপক্ষগণ কৌশলে প্রজাকে উত্তেজিত করিতেছে। তাঁহারা দ্রোহ দমনের চেষ্টা করিলেন, ফলে বিসংবাদ আরও বৃদ্ধি পাইল।

রাজ্যে বিশৃঙ্খলার উদ্যোগ যখন তীব্র হইল, যুধিষ্ঠির তৎপর হইয়া প্রজাবর্গের নিকটে এক বাণী প্রেরণ করিলেন। বলিলেন, এই অমাত্যবর্গ তোমাদেরই দ্বারা নির্বাচিত। তোমরা যদি ইহাদিগকে না চাহ, কাহাকে চাহ, বল। প্রজারা যুধিষ্ঠিরের বাক্যে তুষ্ট হইল, তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিগণকে একবাক্যে নূতন অমাত্য বলিয়া নির্বাচন করিয়া লইল। যুধিষ্ঠিরের নামের প্রভাব তখনও এইরূপ প্রবল ছিল।

পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তে নবগঠিত ম্লেচ্ছরাজ্য। তাহারা ক্রমাগত সীমান্তপ্রদেশ আক্রমণ করিত, নানাবিধ উপদ্রব সৃষ্টি করিত। ম্লেচ্ছদিগের জন্য পৃথক রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির স্বেচ্ছায় স্বরাজ্যকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে উভয়পক্ষই প্রজাবর্গকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, অতঃপর ম্লেচ্ছভূমি হইতে সমস্ত আর্য-সন্তানকে আর্যভূমিতে লইয়া আসা হইবে, আর্যরাজ্যে অবস্থিত সকল ম্লেচ্ছ তাহাদিগের নিজস্ব রাজ্যে চলিয়া যাইবে, পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্মাবলম্বী জনগণ নিয়ত একত্র বাস করিবার ফলে যে বিড়ম্বনার সৃষ্টি এতাবৎকাল হইতেছিল, তাহা নিরাকৃত হইবে, এই আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই কলহক্লান্ত আর্যগণ দেশবিভাগে সম্মত হইয়াছিল।

ম্লেচ্ছগণ নানাবিধ বলে ও কৌশলে তত্রত্য আর্যসন্তান-গণকে বিপর্যস্ত ও বিতাড়িত করিতে লাগিল, তাহারা সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ভারতভূমিতে আসিয়া আশ্রয়-ভিক্ষু হইল; কোনমতে ভিক্ষামুষ্টি দান করিয়া যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিলেন, এবং ক্রমশঃ রাজ্যের সর্বত্র ইহাদিগকে ভূমি ও কর্ম দিয়া শনৈঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। আর্যভূমিতে অবস্থিত ম্লেচ্ছগণ কিন্তু যে যেমন ছিল রহিয়া গেল, তাহাদিগকে বিতাড়নের কোন উদ্যমই যুধিষ্ঠির করিলেন না। বিভেদনির্বিশেষে সমদর্শন ও প্রজাপালনই তাঁহার রাজধর্ম ছিল। ইহাতে ম্লেচ্ছগণ আশ্বস্ত, আর্যদিগের একাংশ অসন্তুষ্ট এবং ম্লেচ্ছরাজ্যের আর্যদ্বেষী শাসকবৃন্দ উল্লসিত হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, আঘাত করিলেও যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে প্রত্যাঘাত করিবেন না। অতএব ম্লেচ্ছসেনা ক্রমশঃ রাজ্যের সীমান্ত-দেশে অনুপ্রবিষ্ট হইতে লাগিল; যুধিষ্ঠির কখনও বা শান্তির প্রার্থনাবাণী প্রচার করিয়া ক্ষুব্ধ প্রজাকে শান্ত রাখিলেন, কখনও বা ম্লেচ্ছদিগের অধিকৃত বা প্রার্থিত ভূমিখণ্ড ও গ্রাম তাহাদিগকেই ছাড়িয়া দিয়া বৃহত্তর আক্রমণের সম্ভাবনাকে কথঞ্চিৎ ঠেকাইয়া রাখিলেন। এই মহত্ত্বের মূল্য ম্লেচ্ছরা বুঝিল না, তাহারা সাক্ষাতে তাঁহাকে মহানুভব বলিয়া স্তুতি করিত। কার্যোদ্ধার

করিত, স্বগৃহে বসিয়া তাঁহাকে বৃহন্নলাগ্রজ নামে আখ্যাত করিত।

এই ব্যাপার প্রথমাবধিই চলিতেছিল, কখনও মন্দবেগে কখনও বা তীব্রতর গতিতে। এক্ষণে, যুধিষ্ঠিরের বৈকল্য-স্বীকৃতির পর হইতে ম্লেচ্ছদিগের বিক্রম বাড়িল। সীমান্তরেখা ও সীমান্ত-চুক্তি বারংবার ও বিনা দ্বিধায় লঙ্ঘিত হইতে লাগিল।

উত্তর-দেশে, হিমালয়ের পরপারে যবনামা ও তির্যক্-দর্শী চৈনিক জাতির বাস। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের ৭ম ও অষ্টম বর্ষে তাহাদিগের রাষ্ট্রপ্রধান যুধিষ্ঠিরের সহিত মৈত্রীকামনায় জম্বুদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন, উভয় রাষ্ট্রপতির ও উভয় রাষ্ট্রের গভীর সম্প্রীতি ও নীতি-সাম্যের বহুল প্রমাণ সাড়ম্বরে নিখিল বিশ্বে প্রচারিত হইয়াছিল।

যুধিষ্ঠিরের হিমালয়-প্রবাসের বিবরণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল, চীনদেশেও সে বার্তা পৌঁছিয়াছিল। অচিরাৎ একদিন সংবাদ আসিল, চৈনিক সেনা হিমালয়-গিরিবর্ত্ম পার হইয়া ভারতের সীমান্তরেখা লঙ্ঘন করিয়াছে, দেশের অভ্যন্তরে বহুদূর অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং আরও ভূরিতর ভূভাগ সহ সমগ্র হিমালয়-গিরিপ্রদেশকে তাহাদিগের রাজ্যভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

এই সংবাদে ভারতের জনতা উদ্বেল হইয়া উঠিল। স্বীয় দেশের অঙ্গহানি কেহই স্বেচ্ছায় স্বীকার করিতে চাহে না। ম্লেচ্ছরাজ্যের জন্য বিস্তীর্ণ দেশখণ্ড ছাড়িয়া দিয়াও বাঞ্ছিত ফললাভ করা যায় নাই। চীন-প্রধান অল্পদিন মাত্র পূর্বে এই রাজ্যে ভ্রমণ এবং বহুবিধ ভাষা ও ভঙ্গীসহকারে মৈত্রী-বাক্য বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার এই আকস্মিক রূপ-পরিবর্তনকে একান্তরূপেই লবণ-স্বাদ-বিস্মৃতি ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। এই অকৃতজ্ঞতা ও মিথ্যাচরণে ভারতের জনতা বিক্ষুব্ধ হইল। অপিচ, আর্যজাতি নানা-গৌরবদীপ্ত; যবনামা চৈনিকগণ এমন অবলীলাক্রমে তাহাদিগের নাসা মর্দন করিয়া দিল, এই চিন্তা তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। যুধিষ্ঠির অতি কষ্টে তাহাদিগকে শান্ত রাখিলেন, স্বয়ং উপযাচক হইয়া চীনাধিপতির সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলেন। কহিলেন, যুদ্ধে কি ফল। যুদ্ধ করিয়া কি হয় তাহা তো কুরুক্ষেত্রেই সম্যক্ দেখিয়াছি। কুরুক্ষেত্রের পূর্বে আমি আলাপ-আলোচনা দ্বারা কলহের মীমাংসা করিতে চাহিয়াছিলাম। দুর্যোধন তাহাতে স্বীকৃত হইলে এমন করিয়া কৌরবের বংশনাশ হইত না। যুদ্ধে কাজ নাই, আসুন মীমাংসা করি। আপনারা কতটুকু চাহেন?

চীনাধিপতি পুনঃপুনঃ পত্রালাপে ও নিমন্ত্রিত সাক্ষাৎকারে কালহরণ করিতে লাগিলেন। অগত্যা যুধিষ্ঠির তাহাতেই স্বস্তিবোধ করিলেন। ইতিমধ্যে চৈনিক সেনা তাহাদিগের অধিকৃত অঞ্চলে সমর-সম্ভার-বহনক্ষম বৃহৎ বর্ত্ম নির্মাণ করিতে লাগিল, রণসম্ভার ভাণ্ডার ও দুর্গ নির্মাণ করিতে লাগিল, যুধিষ্ঠিরের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির ইহার উত্তরে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রেমপ্রমাদপূর্ণ প্রতিবাদ-লিপি প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

এই সকল ব্যাপারে রাজ্যের সংহতি ও দৃঢ়তা ক্রমশ শিথিল হইল। ইহার কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠির রাজ্যরক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া রাজপদ পরিত্যাগ করেন ও স্বর্গপ্রবেশ-কামনায় হিমালয়ের পথে মহাপ্রস্থান করেন। সে কাহিনী ব্যাসদেব স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠিরের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির বশে ভারতের সমস্ত প্রদেশ একত্র গ্রথিত ছিল তাহার মূলসূত্র ছিন্ন হইল। এবং তাহার ফলে একীকৃত ভারতভূমি অচিরাৎ শতধা বিদীর্ণ ও বহুসংখ্যক পরস্পর-বিদ্বেষী ক্ষুদ্র জনপদে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ব্যাসদেব সে দুঃখের কাহিনী প্রাণ ধরিয়া বিবৃত করিতে পারেন নাই, তাই মহাপ্রস্থান বর্ণনার দ্বারাই তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ইহার সহস্র বর্ষ পরে, পাশ্চাত্ত্য ম্লেচ্ছজাতির শাসনে ভারতভূমি পুনরায় একত্র গ্রথিত হইয়াছিল।

যুধিষ্ঠিরের শাসনকালের দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত আমরা বর্ণনা করিয়াছি। ত্রয়োদশ বর্ষের একটি বৃহৎ ঘটনার বিবরণ দিয়া এই কাহিনী সমাপ্ত করিব।

ম্লেচ্ছ ও চৈনিক জাতির সহিত যে সংঘাত, তাহা বৈদেশিক। তাহাতে পীড়া জন্মে, কিন্তু আত্মঘাত হয় না। বরং বহিঃস্থ শত্রুর উপস্থিতি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ আত্মিক সংহতিকে দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়া তুলে। এইজন্যই এ সকল বিসংবাদ দুঃখদায়ক হইলেও মর্মান্তিক বা সর্বথা বিনাশাত্মক হয় না।

কিন্তু ত্রয়োদশ বর্ষের শেষভাগে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহার ফলে দেশের অভ্যন্তরেই প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। বস্তুতঃ পাণ্ডবসাম্রাজ্যের বিচ্ছেদ ও ধ্বংসের বীজ সেইখানেই উপ্ত হইয়াছিল বলিয়া বহু দূরদর্শীর ধারণা।

জম্বুদ্বীপের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গদেশ। পূর্ব-উত্তর প্রান্তে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। পর্বতাকীর্ণ উচ্চাবচ দেশ বলিয়া ইহাকে অসমভূমিও বলা হইত।

উদ্যোগপর্বে, যখন পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষ সর্বত্র মিত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন, বঙ্গদেশ স্বতঃ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষও হয়তো করিত। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহার মৈত্রী যাচ্ঞা করিলেন না। প্রাগ্‌-জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত নিরতিশয় হীনরুচি ও ক্রুরকর্মা বলিয়া বর্ণিত ছিলেন। তাঁহার দুর্নাম-শ্রবণে যুধিষ্ঠির সন্ত্রস্ত হইলেন। এরূপ ব্যক্তি তাঁহার মিত্র বলিয়া পরিচিত হইলে, তাহার সে দুর্নাম ও তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত অনুচিত কর্মের দায়িত্ব তাঁহাকেও স্পর্শ করিবে। অপিচ, প্রকৃতি-ক্রুরকে কেবলমাত্র সন্ধির শর্ত বা হিতোপদেশ দ্বারা অনভ্যস্ত সৌজন্যের পথে চালিত করা সম্ভব নহে। কোথায় কখন কোন্ ছলে তাহার প্রকৃতিগত নীচতা আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিবে স্থির নাই। এইসকল কথা চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, প্রাগ্‌জ্যোতিষের মৈত্রী তিনি কামনা করিবেন না। প্রস্তাব সাধু। কিন্তু সেই আক্রোশে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্ত স্বেচ্ছায় কৌরবপক্ষ আশ্রয় করিলেন।

কুরুক্ষেত্রে ভগদত্ত অসীম শৌর্য প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার বাহন মহাহস্তীর সহিত যুদ্ধে স্বয়ং ভীমসেন পর্যন্ত কিয়ৎকালের জন্য পর্যুদস্ত হইলেন, এবং তাঁহার যষ্টি-সংখ্যক হস্তিবাহিত রথের তাড়নে অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্য নিহত হইল। অবশেষে অর্জুনের অস্ত্রে স-হস্তী ভগদত্ত নিহত হইলেন।

যুদ্ধান্তে বিজিত-রাজক প্রাগ্‌জ্যোতিষ যথারীতি পাণ্ডবের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। যুধিষ্ঠির শুদ্ধ শাসন মানসে শিনাগেশ-নামক সচ্চরিত্র ও রণকুশল রাজপুত্রকে প্রাগ্‌-জ্যোতিষের শাসকপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

রাজত্বের নবম বর্ষে, প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের পূর্ব-প্রান্তস্থিত পার্বত্য নাগভূমি অকস্মাৎ বিদ্রোহী হইল। নাগজাতি অনার্য ও বনবাসী; অস্ত্রবলে তাহাদিগকে নির্জিত করা অর্জুনাদি বীরগণের পক্ষে আদৌ কঠিন ছিল না। কিন্তু কোমলপ্রকৃতি যুধিষ্ঠির তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি ক্ষমাধর্মী, তাঁহার ক্ষমা-প্রধান নির্দেশে বিদ্রোহ-দমনে নিযুক্ত সেনা নিয়ত সংবৃতায়ুধ হইয়া চলিতে বাধ্য হইল। শেষ পর্যন্ত নাগভূমিকে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ স্বশাসিত অঞ্চল বলিয়া স্বীকার করিয়া যুধিষ্ঠির যুদ্ধের অবসান করিলেন। রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের শেষভাগে এই সন্ধি স্থাপিত হইল।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমি নবসৃষ্ট ম্লেচ্ছরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, এবং তদ্দেশবাসী আর্যগণ ক্রমশঃ পিতৃভূমি হইতে বিচ্যুত হইয়া পাণ্ডব-রাজ্যে আশ্রয়ভিক্ষু হইয়াছিল, সে কাহিনী পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশের যে অংশ তখনও পাণ্ডবরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা স্বল্পায়তন ও ঊষর। বহিরাগত বিপুলসংখ্যক পূর্ববঙ্গীয়-দিগকে স্বচ্ছন্দে ধারণ ও পালন করিতে পারে, এমত শক্তি তাহার ছিল না।

অপিচ, স্বভূমি হইতে বলাদ্‌ভ্রষ্ট ও স্বকার্যদ্বারা অর্জিত দুর্দৈবের ভাজন এই পূর্ববঙ্গীয়গণ স্বভাবতঃই অভিমানী ও স্পর্শচেতন হইবে; তাহাদিগকে বহুসংখ্যায় একত্র সমাবিষ্ট হইয়া থাকিতে দেওয়া সুযুক্তি নহে। অতএব

যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রেরণ করিতেছিলেন ; যেন তাহারা স্বকীয় স্বাজাত্য বিস্মৃত হইয়া উক্ত দেশসকলের সহিত একাত্ম ও ক্রমে তাহার মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায়। এইরূপে বহু বঙ্গদেশীয় উদ্বাস্তু প্রতিবেশী প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত, বহু পূর্বকাল হইতেও বহু বঙ্গবাসী প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে বাসস্থাপন করিয়াছিল ; সে দেশের শ্রী ও সমৃদ্ধি-বিধানে তাহাদিগের কৃতিও সামান্য ছিল না।

রাজা, রাজ্যবাসী প্রজার চরিত্রের ও প্রবৃত্তির প্রতীক-স্বরূপ। ভগদত্ত ক্রূরকর্মা বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছেন। বস্তুত তাঁহার রাজ্যের প্রজারই চরিত্র তাঁহাতে মূর্তিমান হইয়াছিল। তাহারা পার্বত্যজাতি, কঠিন ও পরুষ আচরণে অভ্যস্ত, এবং প্রস্তরময়ী ভূমির প্রস্তরনিভ ক্রোড়ে লালিত বলিয়া বুদ্ধিতে ও হৃদয়বৃত্তিতে প্রস্তরতুল্য। যুদ্ধান্তে বিজয়ী যুধিষ্ঠিরের নিকটে তাহারা অগত্যা আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল, তাঁহার শাসন ও তাঁহার নীতির প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ সে নীতিকে তাহারা অন্তরে গ্রহণ করে নাই। উপলাশী উষ্ট্র-পক্ষী কোমল মাখনপিণ্ড গিলিতে পারে না। যুধিষ্ঠিরের সাম্যনীতি অসমভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিল না।

পাণ্ডবগণ কর্তৃক ভগদত্ত প্রথমে অবজ্ঞাত ও পরে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ স্বভাবতঃই পাণ্ডবগণের প্রতি বিমুখ ছিল, এবং সে বিমুখতা ক্রমশঃ সমগ্র আর্যসমাজের প্রতিই বিবৃত হইয়াছিল। পাণ্ডব-শাসিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ভগদত্তবংশীয় অভিজাতগণ প্রকাশ্যে অথবা গোপনে পাণ্ডব ও আর্য-বিদ্বেষী হইয়া রহিল। বাহ্যতঃ যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করিলেও, অন্তরে তাহারা তাঁহার শাসনকে উপেক্ষা করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। নাগজাতির বিদ্রোহলব্ধ জয়ধ্বনি তাহাদিগের চিত্তে উৎসাহসঞ্চার করিল।

যুধিষ্ঠির বহু বঙ্গীয়কে প্রাগ্‌জ্যোতিষে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহা প্রাগ্‌জ্যোতিষ-বাসীদিগের মনঃপূত হয় নাই। অতর্কিতে একদা তাহারা বলহীন ও সহায়হীন বঙ্গীয়দিগের উপরে আপতিত হইল। তাহাদিগের গৃহ [illegible] কুটির অগ্নিদগ্ধ করিল, রুদ্রমূর্তিতে [illegible] প্রহার করি[illegible] তাহাদিগকে বিনষ্ট ও স্থানভ্রষ্ট করিল। [illegible] ও আ[illegible] পলাতকের আর্তনাদে, অনাথ শিশু [illegible] ধর্ষিতা না[illegible] ক্রন্দনে প্রাগ্‌জ্যোতিষের আকাশ-[illegible] প্রতিধ্বনি[illegible] হইল। নিরীহ মানবের সেই শান্তির রাজ্যকে [illegible] বিপর্যস্ত করিয়া স্ব-সৃষ্ট শ্মশানচারী প্রেততুল্য ভগদত্ত-বংশীয়গণ তাণ্ডব-নর্তনে মত্ত হইল। [illegible] যেন্ডু বঙ্গীয়[illegible] মেঘদর্শনে ভীত হয়, বঙ্গীয়গণ একবার পিতৃপুরুষগণের জন্মভূমি হইতে বিনা অপরাধে ও বিনা অবসরে [illegible] ও বিতাড়িত হইয়াছে। পুনরায় অবিকল তদনুরূপ [illegible] বিতাড়ন-মহোৎসবের আবির্ভাবে তাহারা বিহ্বল হইয়া গেল ; এই আতিথ্যবিমুখ দেশ ত্যাগ করিয়া আশ্রয়লাভ মানসে পুনরায় তাহারা পশ্চিমবঙ্গদেশাভিমুখে [illegible] হইল। পিতা পুত্রকে, পুত্র মাতাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল, পশুবৎ কামোন্মত্ত জনতার [illegible] স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। ভাগ্যদোষে বুদ্ধিভ্রংশ হয় ; মনুষ্যত্ব পুরুষ[illegible] সকল [illegible] মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে।

কিন্তু পলাইতে চাহিয়াও তাহারা যথেচ্ছ পলাইতে পারিল না। উন্মত্ত জনতা তাহাদিগের পথ রুদ্ধ করিল, শকট ও যান ভগ্ন করিল, নিঃসহায় নির্বান্ধব ও নিরীহ পলাতকদিগকে অমানুষিক নির্যাতন করিয়া পৈশাচিক আনন্দ ও উল্লাসে অধীর হইল। একাধিক বৎসর ব্যাপিয়া নিঃশব্দ প্রস্তুতি ও আয়োজনের পরে অকস্মা[illegible] এই কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অতর্কিত ও প্রচণ্ড আঘাতে নিঃসহায় বলহীন আর্যগণ বিহ্বল হইয়া পড়িল। হিতাহিত জ্ঞানরহিত হইয়া তাহারা প্রাণ ও সম্ভ্রমরক্ষার্থে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। আর্যজাতি প্রাণ অপেক্ষাও নারীর সম্ভ্রমকে মূল্যবান জ্ঞান করিত। দুষ্কৃতকারীগণ নারীধর্ষণেই বিশে[illegible] উৎসাহ ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতেছিল। [illegible] নারীর রূপ ও সংস্কৃতি-গৌরব বিখ্যাত ছিল, তাহা[illegible] সভ্য, শিক্ষিত ও মার্জিত ; তাহাদিগের সম্বন্ধে বঙ্গপ্রকৃ[illegible] প্রাগ্‌জ্যোতিষগণের মনে চিরদিনই একটা পা[illegible]

লোলুপতা ছিল। কিন্তু সে লোলুপতা এতকাল দূরতঃ লোভ্রাবেই পর্যবসিত থাকিত, এক্ষণে সুযোগ পাইয়া তাহারা সর্বপ্রকার সংযম ও শোভনতার সীমা লঙ্ঘন করিল। বালিকা হইতে বৃদ্ধা, কেহই তাহাদিগের পশুচিত দুর্বৃত্তার হস্তে অব্যাহতি পাইল না।

সমগ্র রাজ্যে আর্যজাতীয়গণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। অনেকে নিহত আহত ও অন্যথা বিধ্বস্ত হইল, অনেকে পলায়নপর হইল, অনেকে পশুধর্মী মানবের হস্তে পতন অপেক্ষা বন্যজন্তুর সহবাস শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া অরণ্যে গহ্বরে আত্মগোপন করিল। যাহারা পারিল না তাহারা প্রতিমুহূর্তে প্রাণসংশয় বা ততোধিক লাঞ্ছনা গণনা করিয়া কম্পিত কলেবরে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিল।

আহত ও অনাহত পলায়ক আর্যগণ ক্রমশঃ বঙ্গদেশে আসিয়া আশ্রয়প্রার্থী হইল। তাহাদিগের দুর্দশা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বঙ্গবাসী জনগণ বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইল, তাহার নিরাকরণ ও প্রতিবিধান চাহিয়া তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

প্রাগ্‌জ্যোতিষস্থিত রাজপুরুষ ও রক্ষী-বাহিনী উৎপীড়িতদিগকে রক্ষা করিতে আদৌ প্রয়াসী হয় নাই; বরং শরণার্থীদিগকে অবজ্ঞা ও উপহাসে জর্জরিত করিয়াছে; বহুক্ষেত্রে তাহারা স্বয়ং দুষ্কৃতকারীগণের সহিত মিলিত হইয়া লুণ্ঠন ও ধর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, প্রয়োজনবোধে যুবা ও শক্তিমান আর্য পুরুষগণকেই ধৃত ও অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—যেন দুষ্কৃতকারীগণ তাহাদিগের সম্পত্তি ও স্ত্রীগণের প্রতি অবাধে যথেচ্ছ আচরণ করিতে পারে, এরূপ বিবরণও শ্রুত হইল। বঙ্গদেশীয় জনতা, বঙ্গদেশীয় রাজপুরুষগণ রুদ্ধরোষে অধীর হইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের কিছু করিবার শক্তি ছিল না। প্রাগ্‌জ্যোতিষ পৃথক রাজ্যখণ্ড। সাম্রাজ্যের সংবিধান অনুসারে, তথায় শান্তি স্থাপনের বা বিপন্ন উদ্ধারের জন্য স্বকীয় সেনা বা শান্তিরক্ষক প্রেরণের অধিকার বঙ্গদেশের ছিল না। তাঁহারা কেবল যথাশক্তি প্রয়াস করিয়া আগত শরণার্থীদিগকে শুশ্রূষা ও গুড়-চিপিটকাদি আহার্য দ্বারা কোনক্রমে বাঁচাইয়া রাখিলেন। যাহারা তখনও দুর্বৃত্ত-কবলকবলিত তাহাদিগকে রক্ষা বা উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা তাঁহাদিগের সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

তখন অন্য উপায় না পাইয়া, বঙ্গদেশীয় জনতা ও বঙ্গদেশীয় শাসকবৃন্দ, রাজধানী হস্তিনাপুরীতে স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে বার্তা প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদিগের প্রার্থনা, যুধিষ্ঠির স্বয়ং উপদ্রুত অঞ্চলে তাঁহার বাহু প্রসারিত করুন, শৃঙ্খলা স্থাপন ও দুর্গতদিগকে নির্ভয় করুন।

বার্তা পাইয়া যুধিষ্ঠির কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। নানাবিধ পরস্পরবিরোধী চিন্তা ও সংশয় তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

তাঁহার তৎকালে বয়স একসপ্ততিবর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে। দেহ জরাক্রান্ত, কেবল মানসিক শক্তিবলে তাহাকে কথঞ্চিৎ কার্যক্ষম রাখিতেছেন। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান ভরসাস্থল ছিলেন মহাবল ভীমসেন, তিনি আর নাই। অর্জুন আছেন, কিন্তু তিনি যৌবনধর্মী, সংশয়ক্ষেত্রে সর্বথা নির্ভরযোগ্য নহেন।

এই ঘটনা, ইহা কেবল মামুলীক বিশৃঙ্খলামাত্র নহে। রাজনীতির বহু সূক্ষ্মতর ও জটিলতর প্রশ্ন ইহার সহিত জড়িত। সবিশেষ চিন্তা না করিয়া পদক্ষেপ বিপজ্জনক হইবে।

প্রজার উপরে উৎপীড়ন হইতেছে। উৎপীড়িত প্রজার রক্ষণ অবশ্যই রাজধর্ম। কিন্তু উৎপীড়িত বঙ্গীয়দিগকে রক্ষা করিবার আশু উপায়, উৎপীড়ক প্রাগ্‌জ্যোতিষদিগের উপরে প্রত্যুৎপীড়ন। তাহাও উৎপীড়নই বটে। প্রথমক্ষেত্রে উৎপীড়ন করিতেছে অন্যে, রাজা নিষ্ক্রিয়। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে তাঁহাকে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া উৎপীড়ন করিতে হইবে। তাহা প্রজাপালন-নীতির প্রতিকূল কিনা, সেকথা বিবেচ্য। অপিচ উপদ্রুত বঙ্গীয়গণ সংখ্যায় অল্প, প্রাগ্‌জ্যোতিষগণ সংখ্যাবহুল। অল্প-সংখ্যককে রক্ষা করিবার ছলে বৃহত্তর সংখ্যাকে উৎপীড়ন করা বিধেয় কিনা, তাহাও বিবেচ্য। দুইটি অনিষ্ট যখন পরস্পর-বিরোধী হয়, তখন বৃহত্তর অনিষ্টকে

এড়াইবার জন্য ক্ষুদ্রতর অনিষ্টকে স্বীকার করিয়া লওয়াই রাজধর্ম।

কেবল রাজধর্ম নহে, কূটনীতির দিক হইতেও চিন্তা করিতে হইবে। বঙ্গীয়গণ অল্প, দুর্বল। তাহারা রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। রক্ষিত না হইলে তাহারা ক্ষুব্ধ হইবে, হয়তো সম্যক্ বিনষ্ট হইবে। তাহাতে রাজার অপবাদ বটে। কিন্তু প্রাগ্‌জ্যোতিষগণ সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ও প্রবল। সে দেশ তাহাদিগেরই স্বদেশ। শাসন করিতে গেলে তাহারা রুষ্ট হইবে, তাহাতে সমূহ বিপদের শঙ্কা। ক্ষুদ্রতর অভিযোগ হইতে অব্যাহতির জন্য বৃহত্তর বিপত্তিকে স্বেচ্ছায় আহ্বান করা সমীচীন নহে। অল্পের জন্য যে বহুকে হারাইতে ইচ্ছুক হয়, সে বিচারমূঢ়, ইহাই কবিপ্রসিদ্ধি। অতএব, কূটনীতির দিক হইতে বিচার করিলে এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

অথচ একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকাও বিপজ্জনক। উৎপীড়িত হতাশ্বাস প্রজা মৃত্যু-নিঃশ্বাসের সহিত অক্ষম বা রক্ষণ-বিমুখ রাজাকে ধিক্কার দিয়া মরিবে। সে ধিক্কার অন্যত্র ব্যাপ্ত হইয়া বহুতর কণ্ঠে বহুশঃ প্রতিধ্বনিত হইবে। তাহাতে দেশে ও বিদেশে সমূহ মর্যাদাহানি। সে সম্ভাবনাকে আহ্বান করা সমীচীন নহে।

বহুবিধ চিন্তা করিয়া অবশেষে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিলেন। তাঁহার যাবতীয় চিন্তা ও সংশয় নিবেদন করিয়া পরিশেষে কহিলেন, সখে, আমার মনে হইতেছে, তুমি স্বয়ং একবার গিয়া স্বচক্ষে অবস্থা সমীক্ষণ করিয়া আসিলে ভাল হয়। তোমার আহরিত বার্তা ও বিবরণ দৃষ্টে যথাকর্তব্য নির্ধারণ করা সহজ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, শুনিয়াছি, প্রাগ্‌জ্যোতিষ অতি মনোরম স্থান, তাহার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী মুনিজন-মনোহারী। আমি কখনও দেখি নাই, এই ব্যপদেশে একবার ভ্রমণ করিয়া আসিতে আপত্তি নাই। সখা অর্জুনকে কি সঙ্গে লইয়া যাইব?

যধিষ্ঠির কহিলেন, না। অর্জুন বীর, কিন্তু যুবাপ্রকৃতি, অকস্মাৎ উত্তেজিত হইতে পারে। ক্ষেত্র জটিল, সতর্ক হইয়া পদক্ষেপণ আবশ্যক। সম্যক্ অবস্থা না বুঝিয়া অর্জুনকে সেখানে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না। আপাততঃ তুমি একাই যাও।

শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতিঃপথে প্রাগ্‌জ্যোতিষে উপনীত হইলেন, এবং দিবসত্রয় পরিভ্রমণান্তে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির তাঁহাকে একান্তে লইয়া কহিলেন, কি দেখিলে বল।

কৃষ্ণ কহিলেন, রাজন্, তোমার বুদ্ধি কুশাগ্র, তোমার দৃষ্টি বহুদূরপ্রসারী। তুমি ঠিকই ভাবিয়াছ, অকস্মাৎ সে দেশে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না।

কারণ? তাহারা তো প্রজা?

বঙ্গীয়গণ? অবশ্যই। কিন্তু তাহারা ম্লেচ্ছকিল-সেবনাৎ শিলীভূতপৃষ্ঠ; কিছু কিল নূতন করিয়া খাইলে তাহারা মরিবে না। আর একান্তই যদি মরে, সে ক্ষতি অগত্যা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে, মহামারীতে বা জলোচ্ছ্বাসে মরিলে কি করিতে পারিতাম?

তাহারা দুর্বল, ক্ষুব্ধ হইলেও প্রত্যক্ষ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, প্রাগ্‌জ্যোতিষগণ প্রবল, এবং সাম্রাজ্যের প্রতি সম্যক ভক্তিমান নহে। ক্রুদ্ধ হইলে তাহারা বিশেষ অনিষ্টের হেতু হইতে পারে।

কি প্রকারে?

প্রাগ্‌জ্যোতিষের সীমারেখার এক বিস্তৃত অংশ ম্লেচ্ছরাজ্যের সংলগ্ন। বর্তমান বিশৃঙ্খলা-সাধনে বহুতর ম্লেচ্ছ প্রাগ্‌জ্যোতিষগণের সহকারী হইয়াছিল, এরূপ গুজব-কথাও আমি শুনিয়া আসিয়াছি। কঠোর হস্তে শাসন করিতে গেলে প্রাগ্‌জ্যোতিষগণ সে শাসনকে অগ্রাহ্য করিবে বা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে কিনা তাহা চিন্তনীয়; এবং বিদ্রোহী প্রাগ্‌জ্যোতিষভূমি সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ম্লেচ্ছরাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। মনে হয়, এইরূপ আশা মনে লইয়াই ম্লেচ্ছগণও এই কার্যে তাহাদিগকে

উৎসাহিত করিয়াছে। এই ঘটনা আকস্মিক নহে, দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার প্রস্তুতি চলিতেছিল, এবং বহুদিন ধরিয়া অল্প অল্প করিয়া ক্রমে বহুসংখ্যক ম্লেচ্ছ প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

সে কি! আর্যসাম্রাজ্য ছাড়িয়া বিধর্মী ম্লেচ্ছদিগের সহিত মিলিত হইবে, প্রাগ্‌জ্যোতিষের ধর্মজ্ঞান কি এতই লুপ্ত হইবে?

শ্রীকৃষ্ণ স্মিতমুখে কহিলেন, তুমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, তুমি যদি প্রয়োজনানুরোধে প্রজারক্ষণরূপ রাজধর্ম বিস্মৃত হইতে পার, তাহারা তো শিক্ষারহিত বর্বর মাত্র!

যুধিষ্ঠির নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ পুনরায় কহিলেন, কেবল ম্লেচ্ছ নহে। দক্ষিণে পশ্চিমে ম্লেচ্ছ, উত্তরে চৈনিক সেনা সীমান্তে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষে সাম্রাজ্যের বাঁধ শিথিল হইয়াছে, জানিবামাত্র তাহারা সে দেশকে কবলিত করিতে প্রয়াসী হইবে। ম্লেচ্ছগণ আর্য হইতে ভিন্নধর্মী মাত্র; চৈনিকগণ ধর্মদ্বেষী, নাস্তিক। স্বদেশেও তাহারা সর্ববিধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করিয়াছে। চৈনিক বা ম্লেচ্ছ যদি প্রাগ্‌জ্যোতিষ অধিকার করে ও সাম্রাজ্যের দ্বারদেশে আসিয়া বসে, তাহাদের সমূহ অনিষ্টের আশঙ্কা। অতএব এক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় বঙ্গীয়কে অগত্যা বিস্মৃত হওয়াই একমাত্র পন্থা। সমগ্র ভারতভূমির কল্যাণ সর্বাগ্রে চিন্তনীয়, তাহার তুলনায় ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষের আবেগোচ্ছ্বাস তুচ্ছ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিব।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে গোপন প্রকোষ্ঠে মন্ত্রণাসভা বসিয়াছে।

সভা একান্ত ক্ষুদ্র। পাণ্ডব-ভ্রাতৃচতুষ্টয়, দেবী দ্রৌপদী, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেব।

সভার সমক্ষে যুধিষ্ঠির সমস্ত লব্ধ বিবরণ ব্যক্ত করিলেন; এ বিষয়ে তাঁহার মনে যে সকল চিন্তা ও শঙ্কার উদয় হইয়াছে, তাহাও বিবৃত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ও সংগৃহীত তথ্যাদি নিবেদন করিলেন; কূটনীতির দিক হইতে তিনি যে সিদ্ধান্ত ও নিষ্ক্রিয় কর্মপন্থার পক্ষপাতী, তাহাও সবিশেষ যুক্তিসহকারে ব্যক্ত করিলেন।

উভয়ের বিবৃতির অবসানে যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ, ভ্রাতৃগণ, দেবী দ্রৌপদী, এ বিষয়ে আপনাদিগের মতামত ও পরামর্শ আমি প্রার্থনা করি।

ধীমান্ নকুল ও সহদেব একবাক্যে কহিলেন, দেব, আমরা আপনার নিয়ত বশবর্তী। আপনি যাহা স্থির করিবেন, তাহাই আমাদিগের অভিমত।

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস, তুমি স্থিতপ্রজ্ঞ, জিতধী। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

সতাং হি সন্দেহ-পদেষু বস্তুষু
প্রমাণম্ অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তয়ঃ।

অতএব এক্ষেত্রে তোমার আর্য-অন্তর হইতে যে সিদ্ধান্ত স্বতঃ উদ্গত হইবে, তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য ও আচরণীয়।

অর্জুন কহিলেন, দেব, আমার একটি নিবেদন। ম্লেচ্ছরাজ্য হইতে বিতাড়িত ও বিধ্বস্ত বঙ্গীয়গণকে আপনিই অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে আপনিই তাহাদিগকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষ তাহাদিগের অপরিজ্ঞাত দেশ, তত্রত্য অধিবাসীগণ বঙ্গীয় সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি সম্যক্ বন্ধু-ভাবাপন্ন না হইতে পারে, এই সংশয় তাহারা তৎকালে ব্যক্ত করিয়াছিল বলিয়া স্মরণ হইতেছে। বলুন, ইহা কি সত্য নহে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সত্য।

অর্জুন কহিলেন, তাহাদের সেই আশঙ্কা এক্ষণে সত্যে পরিণত হইয়াছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষগণ তাহাদিগকে সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে, ছলেবলেকৌশলে তাহাদিগকে বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করিতে ব্রতী হইয়াছে। আপনি যে আশ্বাস সেই বঙ্গীয়গণকে দিয়াছিলেন, তাহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহা কি আপনার রাজমর্যাদারও হানিকর নহে? এবং তাহা যদি হয়, তবে সেই মর্যাদা রক্ষার্থেই

কি আমরা বদ্ধপরিকর হইতে, প্রাগ্‌জ্যোতিষগণকে সম্যক্ শাসন করিতে বাধ্য হইতেছি না ?

কৃষ্ণ কহিলেন, সখে, রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে বর্জন করিতে হয়। কূটনীতির অনুরোধে ক্ষুদ্র মর্যাদাবোধকেও প্রায়শঃ বিস্মৃত হইতে হয়।

অর্জুন কহিলেন, হা ধিক্! জরাগ্রস্ত জ্যেষ্ঠ স্বীয় রাজকর্তব্য পালনে সাহসী হইতেছেন না ; সেই দুর্বলতাকে কূটনীতির নামে শাকাবৃত করা হইতেছে ! ইহা দেখিবার জন্য আমি কেন বাঁচিয়া আছি। হায়, কেন কর্ণের একাঘ্নী-আঘাতে আমার প্রাণ বিনির্গত হইল না। হে কৃষ্ণ, তুমিই না একদা স্বজন-নিধন-পরাঙ্মুখ অর্জুনকে 'ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ' বলিয়া মহাসমরে প্রবৃত্ত করিয়াছিলে ?

কৃষ্ণ অম্লানমুখে কহিলেন, করিয়াছিলাম, কারণ তৎকালে তাহাই প্রয়োজন হইয়াছিল। এক্ষণে সেই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ শ্রবণ কর—

'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'।

অর্জুন কহিলেন, তবে কি ইহাই বুঝিব, সেই ভাগ্যহত প্রজাগণের রক্ষার্থে আমাদিগের কিছুই কর্তব্য নাই ? হে অগ্রজ, আপনার নিন্দা কখনও শ্রবণ করি নাই ; আজ কি আমাকে নিজমুখে আপনার নিন্দা করিতে হইবে ? গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের হস্তে বন্দী চিরশত্রু দুর্যোধনকে উদ্ধার করিতে আপনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আজ স্বীয় প্রজাকে রক্ষা করিতে আপনি পরাঙ্মুখ হইতেছেন ? এ কি সেই আপনি ? না আপনার বেশধারী অন্য কেহ আজ রাজার আসনে উপবিষ্ট ?

যুধিষ্ঠির নীরব হইয়া রহিলেন।

তখন প্রজ্বলিত বহ্নিশিখার ন্যায় জ্যোতিষ্মতী দেবী দ্রৌপদী সভাস্থলে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহার রোষদীপ্ত আননচ্ছটায় সভাগৃহ উদ্ভাসিত হইল।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ফাল্গুনী, ক্ষুব্ধ হইও না ; জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের ছদ্মবেশে অন্য কেহ ভাবিয়া ইঁহাকে অবমাননা করিও না। ইনিই সেই যুধিষ্ঠির। সত্যসন্ধ, মানবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির। জীবনযুদ্ধে সর্বদা স্থির থাকিতে পারেন বলি ইঁহার যুধিষ্ঠির নাম ; এই অবিচলতা সেই নামে সার্থকতা প্রমাণ করিতেছে। ভুল করিও না, মানবশ্রে বলিয়াই ইনি সাধারণ মানবের দুঃখদৈন্যে নির্বিক থাকিতে পারেন—নরলোকে ও বড়লোকে অনেক তফাৎ

মহারাজ যুধিষ্ঠির! ভাবিয়াছিলাম কথা বলিব এই অপুরুষোচিত মন্ত্রণায় অংশ গ্রহণ করিয়া ইহ সহচারী পাপের অংশভাক্ হইব না। তুমি কথা বলি বাধ্য করিলে।

মহারাজ, তুমি ধর্মরাজ, সত্যসন্ধ। যাহাকে কো কারণে একবার ধর্ম বলিয়া জানিয়াছ, কোনকা কোনক্রমে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হও না, ইহাই তোমার গ আজ তোমার সে গৌরব কোথায় ? প্রজাপালনের ব্রতকে জীবন-প্রারম্ভে বরণ করিয়া লইয়াছিলে, যে ব্র পালনের সুযোগ লাভের জন্য বংশনাশী মহাসমরে ব্র হইয়াছিলে, আজ কোথায় গেল তোমার সে ধর্মপালন কিংবা হয়তো ইহাই তোমার ধর্মনিষ্ঠা—অপরাধীকে ক্ষ করাই তো ক্ষমাধর্মের পরম প্রকাশ !

মহারাজ, ধিক্ তোমাকে। তুমি সত্যসন্ধ, এই খ্যা আশৈশব শ্রবণ করিয়াছি। অতর্কিতে উচ্চারিত মাতৃ হইতে তুমি পাছে ভ্রষ্ট হও, এই বিবেচনায় আমি বি দ্বিধায় পঞ্চপতীত্ব স্বীকার করিয়াছিলাম। আমাকে প জয় করিয়াছিলেন ফাল্গুনী, তাঁহার সম্পর্কে তুমি আমা গুরুস্থানীয়। তথাপি আমি বিচলিত হই নাই। পঞ্চ পতীত্বের গ্লানি ও অবমাননা চিরদিন আমার সহচা হইয়া থাকিবে ; যুগে যুগে দেশে দেশে ইতরজনের মু আমার নাম বক্রহাস্যের সহিত উচ্চারিত হইবে, ই নিশ্চিত জানিয়াও আমি কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধাপ্রকাশ ক নাই। মহারাজ, আজ কোথায় রহিল তোমার সেই সত্য-সন্ধিৎসা ?

কৃষ্ণ কহিলেন, সখি, ক্ষুব্ধা হইও না, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আজীবন অতন্দ্র ও একনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিয়াছেন। আজ যদি তাঁহার সকৃৎ-স্খলন হইয়াই থাকে, তবুও কি তাহা ক্ষমণীয় নহে ?

দ্রৌপদী কহিলেন, না। প্রজাপালনে অতন্দ্র ছিলেন বলিয়াই তাঁহার এই স্খলন অধিকতর মর্মপীড়ার কারণ হইয়াছে। প্রত্যাশা যেখানে নাই, সেখানে হতাশাও নাই, যাহার সামর্থ্য নাই, সে স্বতঃই অক্ষম। যে সামর্থ্য থাকিতেও অক্ষমতার সাধনা করে, সে জ্ঞানপাপী, সর্বথা নিন্দনীয়। আর, স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছে, তুমি তাহার মধ্যে অনধিকার চর্চা করিতেছ কেন?

কৃষ্ণ কহিলেন, সখি, তুমি আত্মবিস্মৃতা হইতেছ। ধর্মরাজকে ও আমাকে এইরূপে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিবে, ইহা তোমার নিকটে প্রত্যাশা করি নাই।

দ্রৌপদী কহিলেন, আমাকে সখী-সম্বোধন না করিলে বাধিতা হইব। কৃষ্ণসখী বলিয়া পরিচয় দিতে আমি গর্ববোধ করিতাম। আজ আপনাকে কৃষ্ণসখী বলিয়া মনে করিতে, তোমার মুখে সখী সম্বোধন শুনিতে আমি গ্লানি বোধ করিতেছি। ধিক্! কৃষ্ণ, তুমিই কি সেই কৃষ্ণ, যিনি কৌরব-সভায় দুঃশাসনকর্তৃক অবমানিতা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন, যিনি দুরাচার শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন, যিনি পরপীড়নপরায়ণ জরাসন্ধের বধে উদ্যোগী হইয়াছিলেন? না, তুমি তাহার ছায়ামাত্র, রাজলক্ষ্মী-রাক্ষসীর গ্রাসজীর্ণ উদ্গারাবশেষ মাত্র। নচেৎ, কোথায় আজ তোমার সেই চক্র, যাহার দ্বারা আমাকে বস্ত্র যোগাইয়াছিলে? আমার দেশের রমণীর লজ্জা অপহৃত ধূলি-লুণ্ঠিত হইতেছে, তাহারা 'হা মধুসূদন' বলিয়া আর্তনাদ করিতেছে, তাহাদিগের সম্ভ্রম-রক্ষায় তুমি উদাসীন কেন? না কি বুঝিব, তোমার লজ্জাহারিত্ব কেবল সখীর ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত, অন্য নারীর লজ্জা-নিবারণে তোমার কোন প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন নাই? তাহা হইলে, ধিক্ আমাকে যে সেইদিন একাকী আমার বন্ধুকে দীনবন্ধু বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, অসঙ্কোচে ও কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহার হস্তের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। আজ বুঝিতেছি, দীনবন্ধু-বেশী একক-সখীর বন্ধুর সেই সাহায্য স্বীকার করা অপেক্ষা আমার চরম লাঞ্ছনা হওয়াও বরণীয় ছিল। সে লাঞ্ছনা দৈহিক লাঞ্ছনামাত্র হইত; তোমার সাহায্য আমার মনের লাঞ্ছনার হেতু হইয়াছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির! তুমি মহারাজ। জগতের সকল [illegible] সকল চিন্তার উপরে, রাজ্যই তোমার অভীষ্ট দেবতা। কৌরবসভায় যেদিন লাঞ্ছিতা হইয়াছিলাম, তুমি নির্বিকার দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছিলে। সেদিন ভাবিয়াছিলাম, তাহা তোমার অসীম চিত্ত-সংযমের প্রমাণ। ভাবিয়া স্বামী-গর্বে স্ফীতা হইয়াছিলাম। হা, আজ বুঝিতেছি, সংযম নহে। তাহা তোমার ঔদাসীন্য মাত্র ছিল। তুমি রাজ্য-লোলুপ, রাজপদের মহিমাই তোমার একমাত্র কাম্য। আমার লাঞ্ছনা দেখিয়া যদি বিচলিত হইতে, উষ্মা প্রকাশ করিতে, হয়তো কৌরবগণ অপ্রসন্ন হইত, আপোষে রাজ্যাংশ-লাভের জন্য তুমি যে তদ্বির করিতেছিলে তাহাতে ব্যাঘাত সৃষ্ট হইত। এই জন্যই আমার অপমানে আর্তনাদে তোমার অক্ষিপল্লব কম্পিত হয় নাই; ভীমসেন রোষে গর্জন করিয়া উঠিলে তাঁহাকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করিয়াছিলে।

আজও তুমি সেই রাজমহিমা-মুগ্ধ রাজা। তোমার প্রজা ধর্মনাশভয়ে, ইতরহস্তে চরম লাঞ্ছনার ভয়ে, আর্তনাদ করিতেছে, তুমি নির্বিকার হইয়া বধিরত্বের সাধনা করিতেছ; পাছে কোন কারণে দুষ্কৃতকারীগণ তোমার উপরে অপ্রসন্ন হয়, পাছে তোমার রাজ্যভোগ-সম্ভাবনা তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়।

তোমাকে ধিক্কার দিব না, তোমার প্রতি উচ্চারিত ধিক্কার স্বয়ং ধিক্কৃত হইবে। কিন্তু প্রশ্ন করি, নিজের পত্নীর মর্যাদা তোমার স্বকীয় ধন, তাহার বিনাশ তুমি সহ্য করিতে পার, সহ্য করিয়া মহত্ত্বের মিথ্যা-গৌরব অর্জন করিতে পার। কিন্তু প্রজা তোমার সর্বথা রক্ষণীয়। রমণী পুরুষের রক্ষণীয়া। আর্তব্যক্তি ক্ষত্রিয়ের রক্ষণীয়।

"ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত, ইত্যুদগ্রঃ
ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ"

বলিয়া, ক্ষত্রকুলতিলক রাজা বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতে। হে ক্ষত্রিয়রাজ, আজ কোথায় তোমার সেই গর্ব? আর্ত-ব্যক্তিকে, রমণীকে, প্রজাকে সর্বথা রক্ষা করাই পরম রাজধর্ম। সে ধর্মে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কোন্ লজ্জায় তুমি রাজাসনে বসিয়া রহিয়াছ? নামিয়া আইস। মহারাজ ভরত-প্রতিষ্ঠিত, মহাবীর ভীষ্ম-রক্ষিত এই মহা-সিংহাসনকে কলঙ্কিত করিও না।

হায়, আজ কোথায় মধ্যমপাণ্ডব মহাবল ভীমসেন! দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণরত পাপমতি দুঃশাসনের বজ্রমুষ্টি তাঁহার হুঙ্কারে শিথিল হইয়াছিল। তাঁহারই অনুরোধে, তাঁহারই আশ্বাসে সেদিন আমি আত্মঘাতিনী হই নাই। আমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া তিনি সেই সভা-ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়াছিলেন; দুঃশাসনের বক্ষ-রক্তে রঞ্জিত হস্তে আমার মুক্ত বেণী বন্ধন করিয়া, দুর্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। আমার পাঁচজন স্বামীর মধ্যে তিনিই পুরুষ নামের যোগ্য ছিলেন।

সেই একবার নহে। বিরাটের পুরীতে দুর্মতি কীচক আমার প্রতি লুব্ধ হইল। সভার সমক্ষে, তোমার সমক্ষে, আমাকে পাদপ্রহারে ভূপাতিত করিল। তুমি নীরব হইয়া রহিলে। উত্তেজিত হইলে দ্যূতক্রীড়ার চাল ভুলিয়া যাইবে, এই আশঙ্কাই তোমার মনে প্রবল ছিল।

কিন্তু ভীমসেন আমার সে অপমান বিস্মৃত হন নাই। সেই রজনীতে একক সমরে মহাবল ও ক্রূরকর্মা কীচককে তিনি বধ করিলেন; তৎপরে তাঁহার তুল্য-বলশালী ঊনশত ভ্রাতাকে বধ করিলেন। হা, আজ কোথায় সেই বৃকোদর, কোথায় সেই অমিতবল লৌহমানব বল্লভ! তিনি থাকিলে আজ আমাকে এরূপে নিষ্ফল আর্তনাদ করিতে হইত না। আমি পঞ্চপতিসনাথা; কিন্তু এরূপ পৌরুষ-রহিত পতির পত্নীত্ব অপেক্ষা আজন্ম বৈধব্যও আমার শতগুণে অধিক সহনীয় হইত।

মহারাজ, তোমার মহিষী বলিয়া গৌরব করিতাম। আর সে গৌরব করিব না। তোমাকে দোষ দিই না। তুমি আজন্ম দ্যূতাসক্ত, সমস্ত জীবন দ্যূত-ক্রীড়াই করিয়া গেলে। রাজ্য, ভ্রাতা, পত্নী, সকলেই বারংবার তোমার সেই দ্যূতের পণ হইয়াছে। কিন্তু রাজ্য-লোভে তোমার সে দ্যূতক্রীড়া; আজ রাজলক্ষ্মীকেই তুমি সেই দ্যূতের পণ করিলে।

তুমি যাহাই হও, আমি তোমাকে পতি বলিয়া জানিয়াছি, আমি আজও তোমার অনুগতা ধর্মপত্নী। তোমার বিরুদ্ধাচরণ আমি করিব না। কিন্তু তোমার ওই ধর্ষিতা-দীর্ঘশ্বাস-কম্পিত রাজসিংহাসনের অংশভাগিনী হইতে আর আমাকে আহ্বান করিও না, এই আমার মিনতি। ধিক্ এ রাজা, ধিক্ আমি এ রাজ্যের রাণী।

মহারাজ, তোমার পত্নী-পরিচয়ে ইহজীবন কাটাইলাম; আমাকে ক্ষমা করিও, যদি ইহজন্মের পরেও আর তোমাকে পতি বলিয়া মান্য করিতে অক্ষমা হই। আমার উপরে ক্রুদ্ধ হইও না। আমি তোমার মত মহাপুরুষ নহি, আমি দুর্বলা নারীমাত্র। নারীর আর্তনাদে আমার চিত্ত মথিত হয়, একদা স্বয়ং দুর্বৃত্ত-হস্তে লাঞ্ছিতা হইয়াছিলাম বলিয়াই সকল নারীর লাঞ্ছনাকে নিজের লাঞ্ছনা বলিয়া মনে করি।

মহারাজ, তুমি রাজ্যশ্রীর স্বামী হইয়াছ, জীবনব্যাপী দ্যূতক্রীড়াবলে লব্ধ সেই মহিষীকে লইয়া সুখে কালাতিপাত কর। আমাকে আর ডাকিও না, আমি তোমার সহিত স্বর্গবাসও করিতে চাহি না। ভাগ্যক্রমে যদি এমন দিন আসে, তোমার সহিত যদি সশরীরেও স্বর্গের পথে যাত্রা করিতে হয়, সেদিন যেন আমি পথেই পড়িয়া মরি, তোমার সঙ্গে তোমার পত্নী-পরিচয়ে যেন স্বর্গের দ্বারে প্রবেশ করিতে বাধ্য না হই, বিধাতার চরণে ইহাই আমার পরম প্রার্থনা রহিল।

দ্রৌপদীর স্বভাবমধুর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ তীব্র ও উচ্চ হইয়া গগনস্পর্শী হইল, কক্ষের প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইল। সে স্বরবিস্তার নিস্তব্ধ হইবার পূর্বেই দেবী অসম-পদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

নির্জন গৃহে ক্রন্দন-বিহ্বলা দ্রৌপদী কক্ষতলে লুণ্ঠিতা হইতেছিলেন।

বঙ্গদেশীয় প্রতিভূগণ দ্বারপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলেন। ভয়ে ভয়ে ডাকিলেন, দেবি!

দ্রৌপদী উত্তর দিলেন না।

প্রতিভূ-প্রধান কহিলেন, দেবি, আমরা এক্ষণে কি করিব?

দ্রৌপদী কথা কহিতে পারিলেন না। মুক্তবেণী মস্তক আর্তবেগে সঞ্চালিত করিয়া বুঝাইলেন, আমি জানি না—আমি জানি না।

প্রতিভূ কহিলেন, দেবি, আমরা ফিরিয়া যাইতেছি। আমাদিগকে একটি বাণী দিন।

দ্রৌপদী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অশ্রুতে আচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলিয়া কহিলেন, কি দিব?

বাণী।

কি বলিব?

যাহা হউক।

কি বলিব। আমার বলিবার কিছু নাই, তাহা কি এতক্ষণেও বুঝ নাই?

দ্রৌপদীর কণ্ঠ অশ্রু-বিকৃত হইল; আমি অসহায়া, পথের ভিখারিণী অপেক্ষাও হীনা। তোমাদিগকে কোন আশ্বাসবাণী আমি দিব? আমাকে ক্ষমা কর।

বঙ্গদেশীয় প্রতিভূ অধ্যবসায়ে অতুল্য। কহিলেন, তথাপি দেবি যাহা হয় একটু কিছু বলিয়া দিন। আমরা ফিরিবামাত্র তাহারা জানিতে আসিবে কি বাণী লইয়া আসিলাম। তাহাদিগকে কিছু তো বলিতে হইবে।

দ্রৌপদীর নয়ন শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল। কহিলেন, কি বলিব?

যাহা আপনার অভিরুচি।

বলিয়া কি হইবে?

আমরা সেই বাণীকে আপনার অভিমত বলিয়া প্রচার করিব; আপনার উপদেশ বলিয়া পালন করিব।

দ্রৌপদী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। নয়নদ্বয় প্রখর হইল। কহিলেন, পারিবে?

অবশ্য পারিব। বলুন দেবি। বলিয়া প্রতিভূ ঝটিতি লেখনী ও ভূর্জপত্র বাহির করিলেন। কহিলেন, বলুন দেবি নির্যাতিত, অবহেলিত বঙ্গবাসীর প্রতি কি আপনার নির্দেশ।

দ্রৌপদী কহিলেন, নির্বংশ হও।

১৫. ৮. ১৯৬০

বিলম্বিত লয়

শ্রীসজনীকান্ত দাস
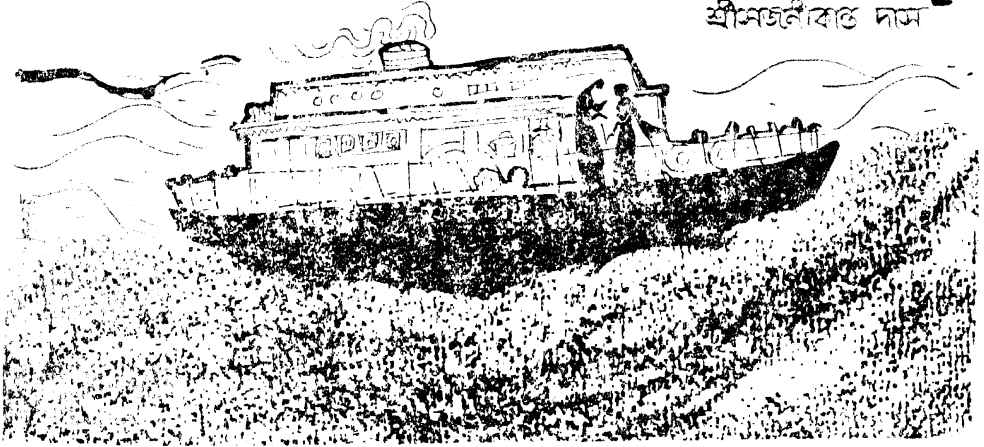
পালিয়ে যেতে আন্দামানে হঠাৎ হ'ল জাহাজ-ডুবি,
জড়াজড়ি ক'রে ম'রে তখন হ'ল স্ফূর্তি খুবই।
দুদিন পরেই ছাড়াছাড়ি—ফুলে-শিথিল বাহুর পাশে
যায় না বাঁধা পরস্পরে ; খবর পেয়ে বাপ-মা আসে।
তোমায় ক'রে কফিনজাত রাখল পুঁতে কবর খুঁড়ে,
কাঁধে চেপে ক্যাওড়াতলায় আমি গেলাম চিতায় পুড়ে।
তুমি রইলে মাটি চাপা, আমি রূপোর ভস্মাধারে ;
খুঁজে বেড়াই পরস্পরে গত দিনের অন্ধকারে।

বছর তিনেক পড়েছিলাম একই সঙ্গে বি.এ. এম.এ.—
কে জানত ছাই, লেপ্‌টে যাব—সতীর্থে কয়, গভীর প্রেমে।
তোমার বাবা খ্রীষ্ট ভজেন, আমার বাবা কেষ্টভজা,
মনে পড়ে তুমি খেলে পেষ্ট্রি-পুডিং, আমি গজা।

প্রথম ছুটির পিরিয়ডে স্কটিসচার্চে কমন-রুমে।
টিফিন সারা হলে মোদের চোখের পাতা মিষ্টি-ঘুমে
জড়িয়ে যেমনি এল অমনি—'টিগরি'র সেই টমাস দেড়ে
এসেই কাঁধে থাবড়া মেরে চেঁচিয়ে বলে, "আছিস বেড়ে!"
হিংস্র তাহার অট্টহাসি ; তুমি দারুণ বিরক্তিতে,
আড়চোখেতে দেখে নিলাম, করিডরের একটি ভিতে
দাঁড়াও গিয়ে ; লজ্জা হল কেন জানি জাগলও ভয়,
হয় নি বটে তখনো তো সরাসরি বাগ্‌বিনিময় !

মুখে মুখে রটল খবর, মিথ্যে খবর রটে বেশি ;
কলেজসুদ্ধ জান্‌ল সবাই, খ্রীষ্টানী জেন্ এলোকেশী
শিবেন দাসের বুকে চ'ড়ে জিভ কেটেছে লজ্জাভরে—
শিবেন দাস সে এই অধমই ; লজ্জাঘৃণায় গেলাম ম'রে !

ক্লাসের শেষে পথে এসে চাইলামও তো তোমার ক্ষমা,
তুমি চোস্ত ইংরেজিতে রাগ যতটা ছিল জমা,
উজাড় ক'রে আমার শিরে গট্‌গটিয়ে গেলে চ'লে
শ্রীচুনী গোস্বামী যথা বল ঢুকিয়ে ই.-বি.-গোলে।
ইংরেজিতে জুতো মেরে মাতৃভাষায় পরের দিনই
চাইতে গভীর অ্যাপলজি হ'ল প্রথম চেনাচিনি।
সেই প্রথমই শেষ হ'ল সেই সর্বনাশা স্টীমার-ট্রিপে,
তোমার বাবা আমার বাবা ধরতে গেলেন একই কীপে।
একে যীশুখ্রীষ্ট ভজেন অন্যজনা কেষ্টভজা,
সমান ব্যথায় চেয়ে দেখেন উড়ছে উজান স্টীমার-ধ্বজা।
তরী তখন তীর ছেড়েছে, আমরা দেখি দাঁড়িয়ে ডেকে
পরস্পরের হাত-নাড়াটাই, বাঁকে স্টীমার গেল বেঁকে।

ভাগীরথী দামোদরের প্রেমের মিলন খানিক বাদে,
অস্তাচলে তাকাই দুজন রেলিং ধ'রে কাঁধে-কাঁধে।
দুইকে কখন তিন ক'রে দেয় রূপনারায়ণ স্নেহ ঢালি—
ত্রিবেণীসঙ্গমে বিশাল ঢেউ-উত্তাল গেঁয়োখালি।

তিমির আসে নিবিড় হয়ে, নারিকেলের উচ্চ চূড়া,
স্নানের ঘাটে কলসি-কাঁখে ঘরে ফিরে যায় বধূরা।
আবছা হয়ে এল ছবি, দাঁড়িয়ে ডেকের একটি কোণে
জানতে কি চাই পরস্পরে কী ভাব জাগে কাহার মনে।

মধ্যরাত্রে মাঝদরিয়ায় রে-রে হাঁকে কালবোশেখী
ডাকাত-পড়ার মতন আসে, আছাড়-পিছাড় কাণ্ড সে কী
চারিদিকে কান্নাকাটি জীবন-ভিক্ষা যমের দ্বারে,
জল-কল্লোল হারিয়ে গেল নরকণ্ঠের হাহাকারে।
দাঁড়িয়ে থাকা দায় হ'ল, জল আছড়ে পড়ে পাটাতনে
কেবিনবদ্ধ করল মোদের হুকুম দিয়ে নাবিক-জনে।
তোমার মুখে ফুটল হাসি, বললে, "এ তো ভালই হ'ল,
ডুয়েট-গানে অনেক বাধা, গাওয়াই ভাল সোলো-সোলো।
বাবা আমার বাপ-মা দুইই, দেখেছি জল তাঁহার চোখে,
আমরা যদি ভুল করেছি, কালবোশেখী করল ও.কে.।"
বলতে বলতে ঝলসে ওঠে মেঘ-মাটি-জল, জাহাজখানা
থরথরিয়ে উঠল কেঁপে, আকাশ-দৈত্য দিল হানা ;
শব্দে ভীষণ মূর্ছাহত এলিয়ে পড়লে আমার বুকে,
ডুবল বজ্রদগ্ধ তরী, সকল ভ্রান্তি গেল চুকে।

তোমার সার্কুলার রোডের সেমিট্রিতে একলা শুয়ে
শুনতে কালের পদধ্বনি, টুপ-টাপ্-টুপ পড়ত ভুঁয়ে
বকুল ঝ'রে বাদল বায়ে, পারতে নিতে গন্ধ চিনে?
বকুল-গ'ড়ে দিয়েছিলাম অনেক খুঁজে জন্মদিনে।
আমি মাইল পাঁচেক দূরে চেৎলা রোডের এক কিনারে
বুড়ো বাবার বাক্সে ছিলাম নক্সাকাটা রৌপ্যাধারে।
দীর্ঘশ্বাসে উড়ে উড়ে পড়ব গিয়ে তোমার কাছে—
নোটের তাড়ার মাঝে বন্দী, বেরবার কি উপায় আছে!
একদিন সেই বেরিয়েছিলাম সকল বাঁধন ছেদন ক'রে—
ভস্মরূপেই বন্ধ হলাম রোমান্টিক মৃত্যুতে ম'রে!

এমনি ধারা বিফলতায় কাটত জীবন চিরকালই,
মহাকালের পেটের খবর জানেন একা মহাকালী!
চেৎলা ছেড়ে বাবা আমার পার্কসার্কাস অ্যাভিন্যুয়ে
পালিয়ে এলেন নীচের ফ্ল্যাটে অতীত স্মৃতি মুছে ধুয়ে।
"ছেড়ে পীঠস্থান কালীঘাট কবর-কসাই-গুণ্ডাপাড়ায়"
আসতে মায়ের আপত্তি খুব, এলেন শেষে বাবার তাড়ায়
তাহার সেল-ট্যাক্সো আপিস, ট্রামের পথেই বেলেঘাটা,
বাসে চেপে যাবেন তেমন নেইকো বয়স, বুকের পাটা।

এমন কঠিন কথার পরে অগত্যা মা সয়েই থাকেন—
আমি ভাবি, মারে কে তায় স্বয়ং কেষ্ট যারে রাখেন!

একদিন কী হ'ল শোনো মেঘ-বাদলে পিছল সে রাত,
নিঝুম নিথুত ভদ্র পাড়ায় পথের বাতি নেবে হঠাৎ।
তক্কে তক্কে চোররা ছিল নতুন ভাড়াটেদের দেখে,
এসেছিল জনছয়েকে তেল-কালি সবাঙ্গে মেখে।
ট্রাঙ্ক-স্যুটকেস-সেলাইকল আর রেডিও সেট-আতরদানি—
মায়ের গয়না ভল্টে ছিল, বাবার সে হাতবাক্সখানি
মাথায় মাথায় নিয়ে গেল তারি সঙ্গে নিল আমায়;
সামনে বিরাট কবরখানা, সেথায় মাথার বোঝা নামায়—
তোমার সমাধিরই ওপর নিত্যঝরা বকুলতলে।
সেইখানেতে ঘণ্টা দুয়েক ভাঙাভাঙি বখরা চলে--
টাকাকড়ি কাপড়চোপড় রুপোর বাসন আতরদানি
সবার শেষে খুল্‌ল তারা হাতবাক্সের কৌটাখানি।
পাত্রখানা দামী বটে, ভেতরের ছাইভস্মগুলো!
ছড়িয়ে দিল মাটির 'পরে, ধুলোর সাথে মিশল ধুলো।
জনমানবহীন চারিদিক কেউ কোথা নেই ডাইনে-বামে
চোরেরা সব পালিয়ে যেতে, আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি নামে।
আমার চিতাভস্ম তোমার মাটি-হওয়া দেহের সাথে—
মিলে গেলাম পরস্পরে মাহভাদর বাদর-রাতে!

শরৎ এল, উড়ে মালী গোলাপ-কলম সেই মাটিতে
পুঁতেছিল যত্ন করেই, আড়াইটি মাস না কাটিতে
রঙীন গোলাপ ফুটল গাছে, যেমন বাহার তেমনি সুবাস।
দেখতে দেখতে এল সবার আকাঙ্ক্ষিত অঘ্রান মাস,
তোমার শুভ জন্মদিবস। পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের যত
ভক্ত তোমার, পুষ্প-অর্ঘ আনল সবাই সাধ্যমত।
এসেছিল টমাস দত্ত কামিয়ে দাড়ি-গোঁফ নির্মূল,
চক্ষু দুটি ছলছলো, হারিয়ে গেছে কথার সে হুল।
হাঁটু গেড়েই ব'সে ছিল—এসেছিল রেজিনা পল,
বকুলতলায় দাঁড়িয়ে তোমার বাবার দৃষ্টি ছিল সজল।
নজর থাকলে দেখতে পেতে আমার বাবা খানিক তফাৎ
দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার মায়ের কাঁধে রেখে কম্পিত হাত।

শুভদিনের শুভ্রপ্রাতে, কবর-ফোঁড়া গোলাপ গাছে
অবাক হয়ে দেখল সবাই একটি গোলাপ ফুটে আছে—
গাঢ় রক্তরাঙা সে ফুল, কেউ কি বুঝল তাহার ভাষা?
রঙের তলায় লুকিয়ে আছে কত যে সুখ, কতই আশা!

সবাই যখন বিদায় হ'ল একা টমাস এল ফিরে,
শ্রদ্ধাভরে চয়ন করে সঙ্গীবিহীন গোলাপটিরে,
লাগায় কোটের বাটন-হোলে, ভেজে তাহার চোখের পাতা
হয়তো বলে, "এলোকেশী, এই বুকেতেই রইল পাতা
আসন তোমার, হে প্রেয়সী, থাকবে যদিন আমি বাঁচি।"
জানল নাকো হতভাগা ওই ফুলেতেই আমি আছি॥
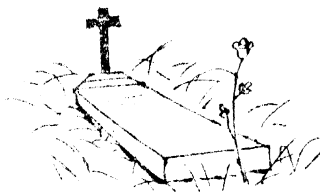
কলকাতার একটি কলেজের একদল তরুণ বাঙালী ছাত্র একসময় বাংলাদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন—উনিশ শতকের দ্বিতীয় প্রহরে।

একজন অবাঙালী পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি শিক্ষক ছিলেন এই ছাত্রদলের দীক্ষাগুরু। তাঁর নাম 'হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও', এবং তাঁর তরুণ ছাত্রদলের নাম 'ইয়ং বেঙ্গল'। কলেজের নাম 'হিন্দুকলেজ'।

নবীনের কলরবে প্রবীণের সমাজে হৃদ্‌কম্পের সঞ্চার হয়েছে অনেকবার। কিন্তু সমাজচৈতন্যের মূল পর্যন্ত সজোরে নাড়া দিয়েছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দল নির্ভয়ে। সমাজতরীর ভরাডুবির আশংকায় স্থিতস্বার্থ প্রবীণেরা সেদিন যে-রকম সাংঘাতিক সোরগোল করে আকাশ ফাটিয়েছিলেন, তার তুলনা এদেশের ইতিহাসে বিরল। তাঁদের আস্ফালনকে নবীনেরা কেল্লার কামান-বিস্ফোরণের সঙ্গে তুলনা করে ব্যঙ্গ করতেন আর বলতেন, 'ও ভয়ে কম্পিত নয় মোদের হৃদয়'। বৃদ্ধদের গোঁড়ামির জবাব দিতেন তাঁরা এই ভাষায়: "The bigots are up with their thunders of fulmination. We hope, perseverence will be the Liberal's answer."

আজকের বিশ শতকের বহুমুখী বেগবান সমাজে প্রবীণ-নবীনের আদর্শসংঘাতে উনিশ শতকের প্রচণ্ড আবর্ত সৃষ্টি হওয়া আর সম্ভব নয়। কারণ সতত-সচল সমাজের বুকে আজ ঝঞ্ঝামদমত্ত বলাকার অস্থিরতা জেগেছে, বেগের আবেগ সঞ্চারিত হয়েছে এবং তার চলার মন্ত্র হয়েছে 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'। সচল-অচলের তীব্র বৈপরীত্য বৈজ্ঞানিক যুগে আজ দ্রুতবিলীয়মান। একশ-দেড়শ বছর আগে উনিশ শতকের বাংলার সমাজে এই সার্বিক সচলতা ছিল না। স্থিতি-গতির বৈপরীত্য ছিল তখন সাদা-কালোর মতন সুতীব্র ও সুস্পষ্ট। কুম্ভকর্ণের অচৈতন্য নিদ্রায় অভিভূত ছিল সমাজ। সামান্য আঘাতে তার অসাড় দেহে চৈতন্যের উদয় হত না। আঘাতের পর আঘাত করে এবং তার প্রচণ্ডতা বাড়িয়ে, ঘুমন্ত সমাজের চৈতন্য জাগানোর প্রধান ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গল' দল। প্রবীণ-নবীনের দ্বন্দ্ব তখন তাই ভয়ংকর নির্দয় রূপ ধারণ করেছিল। একদিকে রক্ষণের সংশয়-ভয়-আর্তনাদ, আর একদিকে ভাঙনের শঙ্কাহীন উল্লসিত কোলাহল—এই দুয়ের এক বিচিত্র অর্কেস্ট্রা রচিত হয়েছিল ডিরোজীয়ানদের যুগে।

নব্যবঙ্গের ফিরিঙ্গি শিক্ষাগুরু ডিরোজিও নিজেও বয়সে তরুণ ছিলেন, ছাত্রদের চেয়ে মাত্র চার-পাঁচ বছরের বড়। তরুণ গুরুর ব্যক্তিত্বের জাদুস্পর্শে বাংলার সুপ্ত তারুণ্যের দীপ্ত প্রকাশ হয়েছিল সেদিন। অবাক হয়ে ভাবতে হয়, একজন ফিরিঙ্গি যুবকের এই ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বের উৎস ছিল কোথায়?

পত্রিকায় পত্রিকায় কতরকমের সংবাদ যে তখন প্রকাশিত হত তার ঠিক নেই। হিন্দুকলেজের নবীন যুবক ছাত্রদের সংবাদ। প্রত্যেক সংবাদে বিবাদের ঝংকার এবং সমাজের সবশ্রেণীর লোকের অভিযোগ শোনা যেত। বিচক্ষণের সতর্কবাণী, ভারী গুরুজনের সব উপদেশ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের নির্মম বাক্যবাণ বর্ষিত হত তরুণ ছাত্রদের উপর অজস্র ধারায়। কেউ ছাত্রদের "কুর্তি এবং টুপি ও মোজা ও দস্তানা প্রভৃতি" ইংরেজী পোশাক দেখে লিখছেন যে, ছেলেরা জোয়ান বয়সে এই পোশাক পরে যদি কোন বাঙালী গৃহস্থ বাড়িতে ঢোকে, এমন কি নিজের পরিবারেও, তা হলে ঘরে সাহেব ঢুকেছে বলে লোকে কলঙ্কও রটাতে পারে। কেউ লিখছেন, "স্বজাতীয় অক্ষর ও ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরেজী চলন হইল এই এক আশ্চর্য্যের বিষয়।" এখানেই অবশ্য আশ্চর্যের বিষয়ের শেষ হয় নি। রামগোপাল রায় যাঁর নাম তিনি R. Roy. লিখছেন দেখে লেখক সাতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে বলছেন, "R লিখিলেই রামগোপাল হয় কিসে জানিব কারণ এই অক্ষরে রামকানাই, রামনাথ ইত্যাদি নাম আছে, আর যদি ওই R. Roy-এর স্ত্রীর নাম কৃষ্ণপ্রিয়া হয় তবে এই অভিনব মতে তাঁহার নাম কি প্রকারে লিখা যাইবেক।"

প্রশ্ন হচ্ছে, রামগোপাল রায়ের স্ত্রী যদি Mrs. Roy লেখেন, তা হলে অন্যান্য শতসহস্র রায়পত্নীরা কি বলে পরিচয় দেবেন? তেমনি যাঁর নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "তেঁহ K. Banerjee, কে বানরজী" লেখেন যদি তা হলেই বা উপায় কি? কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান 'বন্দ্যোপাধ্যায়' হঠাৎ ইংরেজের উৎপীড়নে 'বানরজী' হবেন কেন? এরকম অনেক কুটিল প্রশ্ন ও জটিল সমস্যা "কস্যচিৎ স্বজাতীয়াক্ষরত্যাগে বিরক্তস্যের" মস্তিষ্কাভ্যন্তরে চাক ভাঙা ভীমরুলের মতন ভোঁ ভোঁ করে হুল ফোটাচ্ছিল, এবং কোন উত্তর বা সমাধান তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। চিন্তা করলে বোঝা যায়, বাণ দুটি তিনি ইয়ং বেঙ্গল দলের দুজন চাঁইকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছেন—রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেউ হিন্দুকলেজের ছাত্রদের 'যাবনিক রুটিভক্ষণে', অর্থাৎ মুসলমানের দোকানে রুটিমাংস খাওয়াতে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন। "কস্যচিৎ কালীকিঙ্করস্য" লিখছেন, জনৈক গৃহস্থ ভদ্রলোক নিজের পুত্রকে (হিন্দুকলেজের ছাত্র) সঙ্গে নিয়ে 'জগদম্বার দর্শনে' যান। গঙ্গাজল ও পূজার নৈবেদ্যসহ 'জগদীশ্বরীর সন্নিধানে' উপস্থিত হয়ে তিনি অষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন বটে, কিন্তু তাঁর সুসন্তান তা করেন না। "ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা" যে জগদম্বা তাঁর দিকে তাকিয়ে পুত্রটি 'good morning, Madam' বলে অভিনন্দন জানায়। পুত্রের ব্যাপার দেখে পিতা স্বভাবতঃই হতভম্ব হয়ে যান। এই কি হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফল?

এই সব সমালোচনায় বাইরের পরিবেশ যখন সরগরম, ডিরোজিও তখনও হয়তো আসন্ন ঝড়ের কথা কল্পনা করতে পারেন নি। সমগ্র হিন্দুসমাজের কর্ণধারেরা চারিদিক থেকে পরোক্ষে তাঁকেই বাণবিদ্ধ করছিলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষক তিনি, বিদ্যার সঙ্গে নীতিশিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বও তাঁর ছিল। সে দায়িত্ব পালন না করে তিনি অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন বলে কলেজের কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেন। যে বৈপ্লবিক জীবনদর্শনে তিনি ছাত্রদের দীক্ষা দিয়েছিলেন, প্রাজ্ঞ প্রবীণেরা একবাক্যে বলেন, তার জন্যই নাকি হিন্দুকলেজের ছাত্রদের নৈতিক ঐতিহ্যের প্রতি অবিচল আস্থায় ফাটল ধরেছিল। ডিরোজিওর শাস্তি হয়েছিল পদচ্যুতি। অভিযোগের সমুচিত জবাবও দিয়েছিলেন তিনি, যথাস্থানে আমরা তা প্রকাশ করব। কিন্তু জবাবের চেয়েও বড় জীবনের কথা তিনি ভাবছিলেন মনে হয়। তিনি জানতেন না তখনও যে জীবনের কয়েকটি দিন মাত্র তাঁর অবশিষ্ট ছিল, এবং

বাইশ বছর বয়সেই সমস্ত চিন্তাভাবনা চুকিয়ে তাঁকে ইহজগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে। নিজের ভবিষ্যৎ ভাবনার কথাই তিনি যে কেবল চিন্তা করছিলেন তা নয়, সমাজের উদ্বেগের সঙ্গে, শিক্ষক-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে হয়তো তিনি তাঁর তরুণ ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথাই বেশি করে ভাবছিলেন। যে-ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন :

"Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds —"

সেই ছাত্রদের আদর্শ রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে সমাজের লোকের এত নালিশের কারণ কি? ধর্ম নীতি, মানসিক গুণ, পারিবারিক ও সামাজিক ঐতিহ্য, কোন কিছুর প্রতি সত্যিই কি তাদের কোন আস্থা নেই, শ্রদ্ধা নেই? নোঙরহীন নৌকোর মতন, বন্ধনহীন সমাজ-স্রোতে তারা কি কেবল উদ্দেশ্যহীন করে ভেসে বেড়াবে?

ডিরোজিও নিশ্চয়ই ভাবছিলেন, "তা হলে কি সত্যিই আমার সমস্ত শিক্ষাদান ব্যর্থ হবে? আমার স্বপ্ন, আমার আলোচনা, নবীন জীবন নিয়ে আমার দুঃসাহসিক পরীক্ষা, কিছুই কি সার্থক হবে না? একদিন বাংলার এই সোনার তরুণেরা তাদের কচি কচি ডানা ঝাপটানির পালা শেষ করে অসীম শক্তি নিয়ে নিঃসীম আকাশে মুক্ত বিহঙ্গের মতন পক্ষবিস্তার করবে, বিশ্বের জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করে অমৃতের আস্বাদ পাবে, এই ছিল আমার স্বপ্ন। যা সত্য, যা মহৎ, তার একনিষ্ঠ পূজারী হবে তারা এই ছিল আমার বাসনা। তাই তো আমি বাংলার এই তরুণদের কথা মনে করে স্বতোৎসারিত আন্তরিক ছন্দে লিখেছিলাম :

'And how you worship Truth's omnipotence!
What joyance reigns upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity
Weaving the chaplets you are yet to gain
And then I feel I have not lived in vain.'"

অকালমৃত্যু না হলে ডিরোজিও নিশ্চয়ই অনুভব করতেন যে তিনি বৃথা জীবনধারণ করেন নি। তাঁর ছাত্রদের জীবন-মুকুল বিকশিত হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হল। এ-সত্য অনুভব করার জন্য বেঁচে রইলেন বাংলার তরুণেরা, কেবল উনিশ শতকে নয়, পরবর্তী শতকেও। তরুণদের শিক্ষাগুরু তারুণ্যের মধ্যগগনেই অস্ত গেলেন।

একটি পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি পরিবারে সূর্যোদয় হয়েছিল একদিন। ডিরোজিও জন্মেছিলেন ১০ এপ্রিল, ১৮০৯ সনে।

মৌলালির দরগার কয়েকগজ দক্ষিণে সার্কুলার রোডের উপর বাগান-পুকুরসহ বড় চৌহদ্দির মধ্যে লালবর্ণের দোতলা একটি বাড়ি আছে। দেখলে বোঝা যায়, সেকেলে বাড়ি। এই বাড়িতেই ডিরোজিও জন্মগ্রহণ করেন। বাড়িটি নিঃসন্দেহে বাংলার তরুণদের পীঠস্থানরূপে গণ্য হবার যোগ্য। বাড়ি থেকে কয়েকশত গজ দক্ষিণে পার্ক স্ট্রীটের প্রাচীন গোরস্থানে ডিরোজিওর সমাধি। জন্মস্থান থেকে দক্ষিণে গোরস্থান যতদূর, প্রায় ততদূর উত্তর-পশ্চিমে ডিরোজিওর জীবনের প্রধান কর্মস্থান গোলদীঘির হিন্দুকলেজ। খুব বেশী হলে এই এক কিংবা দুই বর্গমাইল ক্ষেত্রের মধ্যে তাঁর জীবনের বাইশটা বছর সীমাবদ্ধ ছিল দেখা যায়। কিছুদিনের জন্য রুটি ও কবিতার উৎস সন্ধানে ভাগলপুর যাত্রা করা ছাড়া জীবনে এই সীমানা অতিক্রম করার প্রয়োজন হয় নি তাঁর।

কলকাতা শহরে পর্তুগীজদের মধ্যে ডিরোজারিও পরিবারের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। ডিরোজিওর পিতা J. Scott & Co. নামে কলকাতার বিখ্যাত সদাগরী হৌসে ভাল চাকরি করতেন। তাঁর আর্থিক অবস্থাও বেশ ভাল ছিল মনে হয়, কারণ সার্কুলার রোডের গৃহসম্পত্তি তিনি নিজের অর্থেই করেছিলেন। পর্তুগীজরা তখন এদেশের ফিরিঙ্গি-সমাজে অনেকটা উপেক্ষিতের মতন বাস করতেন। তাঁদের গৌরবের যুগ তারও প্রায় একশ বছর আগে সতের শতকেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তাঁরা ছিলেন প্রধানতঃ বণিক, ভাল নাবিক ও যোদ্ধা, শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের অবকাশ এদেশে তাঁরা বিশেষ পান নি।

ডি'রোজারিও পরিবারেও এই বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি প্রবল ছিল বলে মনে হয়। এরকম প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিপালিত হয়ে ডিরোজিও কি করে জ্ঞানবিস্তার কঠোর সাধনায় আত্মোৎসর্গ করার প্রেরণা পেয়েছিলেন, সে প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক।

প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ডি'রোজারিও পরিবারের চেয়ে ড্রামণ্ডের বিদ্যালয়ের কথা বেশী করে মনে পড়ে। এই বিদ্যালয়ে ডিরোজিও ৮' বছর বয়স থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ড্রামণ্ড সাহেব বাল্যকাল থেকে কৈশোর পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে ডিরোজিওর ভবিষ্যৎ জীবনের কাঠামটি সুদক্ষ কারিগরের মতন কেটেকুঁদে গড়ে দেন। তাঁর জীবনে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের এবং বাপ-মা-ভাই-বোনের চেয়ে শিক্ষকের প্রভাব অনেক বেশী দূরপ্রসারী। ডিরোজিওর জীবনের ভাস্কর ছিলেন তাঁর শিক্ষক ড্রামণ্ড, যেমন ইয়ং বেঙ্গলের জীবন-শিল্পী ছিলেন শিক্ষক ডিরোজিও।

ড্রামণ্ডের স্কুলের নাম ছিল 'ধর্মতলা অ্যাকাডেমি'। চাঁদনির কাছে ছিল তাঁর স্কুল। উত্তরে গুমঘর, পশ্চিমে হসপিটাল স্ট্রীট, দক্ষিণে ধর্মতলা এবং পুবে হার্ট সাহেবের ঘোড়ার আস্তাবল। উত্তর-দক্ষিণ-পুব-পশ্চিম চারিদিক থেকেই স্কুলে প্রবেশ করা যেত। বাড়ি থেকে স্কুলে হেঁটে যেতে বালক ডিরোজিওর দশ-পনের মিনিটের বেশী সময় লাগত না। ৮' বছর বয়সে ডিরোজিও স্কুলে ভর্তি হন, চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তিনি যে অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন, পরীক্ষার ফলাফল দেখলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃতী ও প্রতিভাবান ছাত্র হিসেবে আটবছর বয়সে তিনি একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার পান। ডিরোজিওর সাহিত্য ও সাংবাদিকতার অন্যতম গুরু বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক জন গ্র্যাণ্ট একবার তাঁর পত্রিকায় লেখেন : "A boy of the name of Derozio gave good conception of Shylock…it was an interesting sight to behold the native children sitting side by side with the sons of Europeans. This as it should be." গ্র্যাণ্টের এই মন্তব্য থেকে ড্রামণ্ডের স্কুল এবং ডিরোজিওর প্রতিভা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। গ্র্যাণ্ট অবশ্য তখন জানতেন না যে অদূর ভবিষ্যতে এই বালক ডিরোজিওর সঙ্গে তিনি সাহিত্য সাংবাদিকতার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়বেন।

সাহেব ও ফিরিঙ্গিদের স্কুলের মধ্যে কলকাতায় তখন ড্রামণ্ড, শেরবোর্ন ও হার্টম্যান—এই তিনজনের স্কুলের সুনাম ছিল খুব। ধর্মতলায় ছিল ড্রামণ্ডের স্কুল, উত্তর চিৎপুর অঞ্চলে আদিব্রাহ্মসমাজের কাছে ছিল শেরবোর্নের স্কুল, বৈঠকখানায় ছিল হার্টম্যানের স্কুল। কলকাতার প্রাচীন বনেদী বাঙালী পরিবারের সন্তানেরা অনেকে ফিরিঙ্গিগুরু শেরবোর্নের কাছে কাজোপযোগী ইংরেজীবিদ্যা আয়ত্ত করে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। শোনা যায় শেরবোর্নের মা ছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা, তাই বোধ হয় এদেশের ব্রাহ্মণ্যপ্রথানুযায়ী ছাত্রদের কাছ থেকে উৎসব পার্বণের সময় শেরবোর্ন তাঁর গুরুদক্ষিণা আদায় করতে আদৌ কুণ্ঠিত হতেন না। শেরবোর্ন নিজের নামে (Sherbourne Bazar) একটি বাজারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উত্তর কলকাতায়, বাৎসরিক ৪০০৲ টাকা খাজনায় কোম্পানির কাছ থেকে ৯৯ বছরের লিজ নিয়ে। কেবল বিদ্যার প্রতি নয়, বিত্তের প্রতিও যে শেরবোর্নের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তা বোঝা যায়।

হার্টম্যান ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, 'ওল্ড মিশন চার্চে'র অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। বিদ্যার চেয়ে ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশী, তাই এদেশী ছাত্রের অভিভাবকরা তাঁর বৈঠকখানার স্কুলে ছেলে পাঠাতে ভয় করতেন। ক্লাসিকাল বিদ্যায় পারদর্শী বলে হার্টম্যানের খ্যাতি ছিল, কিন্তু ধর্ম-বাতিকের জন্য তাঁর স্কুলের তেমন সুনাম ছিল না। তাঁর সম্বন্ধে একটি বেশ মজার কাহিনী একবার 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে (১৬ এপ্রিল, ১৮০৫) প্রকাশিত হয়েছিল। কাহিনীটি এই : "কয়েকদিন আগে সন্ধ্যাবেলা মিস্টার ও মিসেস হার্টম্যান তাঁদের তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলেন,

যেন সময় রাস্তার উপর হঠাৎ একটি হাতী দেখে ঘোড়া ভয় খেপে। ঘটনাটি ঘটে এসপ্লানেডে। ঘোড়া ভয় পেয়ে গাড়িসহ যাত্রীদের নিয়ে ড্রেনের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ে।" হাটম্যান সপরিবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বাড়ি ফেরেন। ঘটনাটি থেকে বোঝা যায়, ডিরোজিওর ছাত্রজীবনে অন্ততঃ কলকাতা শহরে এসপ্লানেডের মতন জায়গায় হাতী চলেফিরে বেড়াত। অর্থাৎ মধ্যযুগের রক্তমাংসের নীরেট স্তম্ভ নবযুগের কলকাতা শহরে সচল ছিল তখনও।

শেরবোর্ন ও হাটম্যানের সঙ্গে ডিরোজিওর শিক্ষক ডেভিড ড্রামণ্ডের দৈহিক বা মানসিক কোন চেহারার সাদৃশ্য ছিল না। ড্রামণ্ড ছিলেন খাঁটি বিলেতি সাহেব, তার উপর স্কচম্যান। যেমন দুর্ধর্ষ ও একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক, তেমনি বিচক্ষণ ও পণ্ডিত। দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান প্রায় সকল বিষয়েই তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ডিরোজিওর জন্মের বছর চার পরে ১৮১৩ সনে স্কটল্যাণ্ড থেকে ড্রামণ্ড এদেশে আসেন স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থোপার্জন করতে। কিন্তু অন্য কোন বাণিজ্যে মনোযোগ না দিয়ে তিনি অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্‌যোগী হয়ে ওঠেন। প্রথমে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে অর্থসাহায্য নিয়ে তিনি 'ধর্মতলা অ্যাকাডেমি' প্রতিষ্ঠা করেন, পরে নিজে তার অন্যতম স্বত্বাধিকারী হন। তাঁর পিঠের উপর একটি বড় বিসদৃশ কুঁজ ছিল বলে শহরে অনেকের কাছে তিনি 'কুঁজো ড্রামণ্ড' বলে পরিচিত ছিলেন। বাইরের এই দেহ কুঁজের ক্ষতিপূরণস্বরূপ মনে হয় সৃষ্টিকর্তা তাঁকে অসাধারণ সমুন্নত ঋজুমনের অধিকারী করেছিলেন। ড্রামণ্ডের মনের সেই বলিষ্ঠ ঋজুতার প্রকাশ যিনি একবার দেখেছেন তিনি জীবনে কখনও তা ভোলেন নি।

অত্যন্ত সাহসী, মেজাজী ও বিলাসী লোক ছিলেন ড্রামণ্ড। 'গুরুমহাশয়' বা 'শিক্ষক' বলতে আমাদের মনে একটি যে নিরীহ জীবের প্রতিমূর্তি ভেসে ওঠে, ড্রামণ্ডের সঙ্গে তার মিল ছিল না কোথাও। বেশ সুন্দর বড় একটি বাড়িতে তিনি বাস করতেন, সর্বত্যাগী সাধুর মতন নয়, ভোগীর মতন পরমানন্দে আরামবিলাসে। বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে পান-ভোজন ও নাচগান করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। স্কুল-মাস্টার বা গুরুমশায় হলেই যে কৌপীন পরে আত্মপীড়ন করতে হবে, এ নীতি তিনি প্রকাশ্যে অবজ্ঞা করে চলতেন। তিনি বলতেন, টাকার দিক থেকে না হলেও মনের দিক থেকে মানুষমাত্রই সম্রাট, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে, মানবিক রুচি বিকৃত না করে, আত্মতৃপ্তি ও আত্মপ্রকাশের জন্য যা ইচ্ছে তাই সে করতে পারে। ঈশ্বর যদি কেউ থাকেন তো থাকুন, স্বর্গ কোথায় যদি কারও তা সন্ধান করার প্রচুর অবকাশ থাকে তো তিনি করুন, তবে আপাততঃ এই মর্তলোকে মানুষই ঈশ্বর, মানুষই তার সর্বময় কর্তা, এবং মানবচিন্তাই ঈশ্বরচিন্তার নামান্তর। মানুষের চেয়ে বৃহত্তর সত্য পৃথিবীতে আর কিছু নেই। ঘোর সংশয়বাদী ও যুক্তিপন্থী ড্রামণ্ড এ কথা কেবল যে বন্ধুদের বলতেন তা নয়, ছাত্রদেরও বলতেন। 'ধর্মতলা অ্যাকাডেমি'র কুঁজ ওঠা স্কচম্যান শিক্ষককে সকলে তাই ভয় করে চলতেন, বিশেষ করে এদেশী ছাত্রদের অভিভাবকরা। ড্রামণ্ডের সাহচর্যে ছেলেরা নাস্তিক ও অতিশয় যুক্তিবাদী হয়ে উঠে সমাজে ও সংসারে বিপর্যয় ঘটাতে পারে, এই ছিল তাঁদের ভয়। তা হলেও ড্রামণ্ডের শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্যের জন্য এদেশী বা বিদেশী কোন ছাত্রেরই তাঁর অভাব হত না।

ড্রামণ্ডের বাড়িতে যেমন পানভোজন হত, তেমনি দর্শন বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চাও হত। ভোগবিলাসের মধ্যে তাঁর সাহিত্য ও দর্শনবিলাস ছিল অন্যতম। সেইজন্য স্ট্যাণ্ডফোর্ড আর্নট এই কটি কথা লিখে তাঁর ফার্সী ব্যাকরণ একখানি ড্রামণ্ডকে উপহার দিয়েছিলেন: "To David Drummond Esq., who amidst the luxuries of the East never lost his relish for the metaphysics and the muse..." ড্রামণ্ড 'D. D.' নাম দিয়ে সমসাময়িক ইংরেজী পত্রিকায় কবিতা ও সাহিত্যবিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর লেখা কবিতার একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তার খোঁজ-

খবর কেউ বিশেষ রাখতেন না। সাহিত্য বা কবিতার সমাস্বাদনের পরিবেশ তখনও কলকাতায় সৃষ্টি হয় নি। তা হলেও তখনকার বিদ্যোৎসাহী ইংরেজ-সমাজে ড্রামণ্ডের সাহিত্যপ্রতিভার সমঝদার যে দু চারজন ছিলেন না তা নয়। শোনা যায় তাঁর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে কবিতা পাঠ করে মেটকাফ খুশী হয়ে তাঁকে ৫০০ টাকা কাব্যগ্রন্থের জন্য চাঁদা পাঠিয়েছিলেন। ড্রামণ্ড নিজেও একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তার নাম 'Weekly Examiner—A Journal of Politics, News and Literature'। প্রায় বছর দুই চলার পর (১৮৩৯-৪১) পত্রিকাখানি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪৩ সনে এপ্রিল মাসে ৫৬ বছর বয়সে ড্রামণ্ডের মৃত্যু হয়।

সুদূর স্কটল্যাণ্ড থেকে আগত সামান্য একজন স্কুল-মাস্টারের স্মৃতির কোন নিদর্শন কলকাতার মতন বিশাল মহানগরে সযত্নে রক্ষা করা হবে, এমন দুরাশা কেউ করবেন বলে মনে হয় না। আমরাও তা করি না। তবু কেউ যদি খুঁজতে খুঁজতে সার্কুলার রোডের গোরস্থানে ঢুকে খোঁজ করেন, তা হলে ডিরোজিওর গুরু ডেভিড ড্রামণ্ডের একটি নিদর্শন অন্তত দেখতে পাবেন এবং সেটি তাঁর সমাধি। তার স্মৃতিফলকে লেখা আছে:

Beneath lie the mortal remains of
David Drummond, a Native of Scotland,
and for many years a successful teacher of youth
in this city; he departed this life on the
28th April 1843, aged 56 years.
This Monument was erected to the Memory
of the deceased by a few of his friends and
pupils who respected his character, admired
his talents and esteemed his worth.

'ধর্মতলা অ্যাকাডেমি' বা 'উইকলি এক্জামিনার', ড্রামণ্ডের কোন কীর্তির চিহ্ন নেই বলে কোন দুঃখ নেই। কারণ তাঁর সমাধির গায়ে খোদাই-করা এমন কয়েকটি কথা আছে তাঁর সম্বন্ধে যা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সেই কথা কয়েকটি হল—'a successful teacher of youth'—এবং ড্রামণ্ডের নিজের জীবনে না হলেও, তাঁর অন্যতম ছাত্র ডিরোজিওর জীবনপ্রসঙ্গে এ কথার তাৎপর্য যে কত গভীর তা সহজেই অনুমান করা যায়। পর্তুগীজ, ফিরিঙ্গি পরিবারে জাত ডিরোজিও কোথা থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা পেয়ে নবযুগের জীবনদর্শনে তাঁর 'ইয়ং বেঙ্গল' ছাত্রদলকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন, তার আভাস পাওয়া যায় তাঁর নিজের শিক্ষাগুরু ড্রামণ্ডের এই পরিচয় থেকে।

বিদ্যালয় নয়, সাহিত্য-দর্শন-পত্রিকাও নয়, ডিরোজিওর মতন একজন ছাত্র তৈরি করাই হল ড্রামণ্ডের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ড্রামণ্ড ছিলেন 'তরুণদের একজন সার্থক শিক্ষক' এমনই সার্থক যে তাঁর ছাত্র ডিরোজিওই তাঁর হল শ্রেষ্ঠ পরিচয়। সার্থক শিক্ষকের ছাত্র অনেকে শুধু সার্থক শিক্ষকই হয়েছেন, কিন্তু তরুণ যুবকদের সার্থক শিক্ষকের ছাত্র নিজে তরুণদেরই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হতে পেরেছেন, এমন দৃষ্টান্ত বেশী নেই ইতিহাসে। ডিরোজিও তাঁর শিক্ষকজীবনে গুরু ড্রামণ্ডের আদর্শই অনুসরণ করেছেন এবং সার্থক হয়েছেন গুরুর চেয়ে অনেক বেশী।

বাইরের সমাজনেতারা এবং হিন্দুকলেজের কর্তারা যখন শিক্ষক ডিরোজিওর চরিত্র, নীতিবোধ ও মতবাদের বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন, তখন ডিরোজিওর শিক্ষক ড্রামণ্ড জীবিত ছিলেন, কর্মক্ষম ছিলেন। তা যখন ছিলেন তখন জানতে ইচ্ছে হয়, কেন তিনি হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষের সামনে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগের জবাব দেন নি? কেন 'successful teacher of youth' ড্রামণ্ড বলেন নি তখন যে হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্রদের চরম প্রগতিবাদী মনোভাবের জন্য যদি কেউ দায়ী থাকেন তা হলে তিনি দায়ী, তাঁর ছাত্র ডিরোজিও দায়ী নন? কিন্তু এ রকম কোন ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা জানি না, ঘটলে নিশ্চয় ব্যাপারটা খুব নাটকীয় হত। কিন্তু বাস্তব জীবনের সমস্ত ঘটনা নাটকীয় নয় বলে হয়তো ড্রামণ্ডের পক্ষে তখন চুপ করে দর্শকের মতন

ডিরোজিওমুখী ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করাই স্বাভাবিক হবে।

আট বছর ড্রামণ্ডের কাছে শিক্ষালাভ করে চোদ্দ বছর বয়সে ডিরোজিও কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি জানতেন না যে তাঁর ছাত্রজীবনের মতন কর্মজীবনের মেয়াদও মাত্র আট বছর। বিদ্যালয় ছেড়ে প্রথমে তাঁকে বছর দুই সদাগরী আফিসে কেরানীর চাকরি করতে হয়। কিন্তু চারদেয়ালের বদ্ধ পরিবেশে বন্দী হয়ে কেরানীর কলমপেষার একঘেয়ে কাজ করতে কোন তরুণেরই ভাল লাগে না, ডিরোজিওরও লাগে নি। চাকরি ছেড়ে ভাগলপুরে তিনি মাসিমার কাছে কিছুদিনের জন্য চলে যান; সেখানে তাঁর মেসোমশাই জনসন সাহেব নীল কুঠির মালিক ছিলেন। নীলচাষের ধুম পড়েছিল তখন ভাগলপুর অঞ্চলে। কুঠিয়াল জনসনের অর্থের অভাব ছিল না। ডিরোজিও পরম নিশ্চিন্তে কিছুদিন তাঁদের আশ্রয়ে থাকার সুযোগ পেয়ে কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তখন তিনি ষোল বছরের যুবক। ভাগলপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশ, পাহাড় নদী, তাঁর কাব্যমানসের বিকাশে সাহায্য করেছিল। গঙ্গার প্রবাহ আর মুঙ্গের, ভাগলপুর, ভানমিগঞ্জের গিরিশ্রেণীর দিকে চেয়ে ডিরোজিও তন্ময় হয়ে যেতেন কাব্যিক কল্পনায়। কল্পনা মূর্ত হয়ে উঠত ছন্দে—

Ye waters bright that beneath me roll !
Tell me, where is the light of my soul—
On the mountain-top, on the boundless main,
By the pebbly beach, or the desert plain ?
Yet tell me,—burns the vital spark,
Or is it quenched, and my soul all dark ?—
Winds ! that, like winged spirits play
Around my temples, say, O ! say,
Whither my love can be wandering now
Without my garland to bind his brow ?—

এই সময়কার আকুলতা 'The Maniac Widow'-র বেদনায় প্রকাশ হলেও, তরুণ কবি ডিরোজিও এর মধ্যে তাঁর নিজের প্রেমের ব্যাকুলতারই রূপ দিয়েছেন। ভাগলপুরে এইভাবে কবিতা লিখে তাঁর দিন কাটত। সেখান থেকে কলকাতায় 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র সম্পাদক ডক্টর গ্র্যাণ্টের কাছে কবিতাগুলি তিনি পাঠিয়ে দিতেন। 'Juvenis' নামে তাঁর অনেক কবিতা ও সাহিত্যরচনা 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখার সূত্রে এই সময় থেকে গ্র্যাণ্টের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গ্র্যাণ্টের পোষকতায় ও উৎসাহে তাঁর কাব্য-সাহিত্য-চর্চা অবাধে চলতে থাকে, এবং সুধীমহলে অল্পবয়সেই তিনি বেশ খ্যাতি অর্জন করেন।

মনে হয় বছরখানেকের বেশী ভাগলপুরে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি, কারণ ১৮২৬ সনের মাঝামাঝি তার কলকাতার হিন্দুকলেজে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়—"ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক একজন গোরা আর ডি রোজো সাহেব এই দুই জন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন" (সমাচার দর্পণ, ১০ মে, ১৮২৬)। হিন্দুকলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদে তিনি নিযুক্ত হন। তখন ডিরোজিওর বয়স ঠিক সতের।

হিন্দুকলেজ তখন জুনিয়র ও সিনিয়র দুইভাগে বিভক্ত ছিল, একটিকে 'পাঠশালা' ও আর একটিকে 'মহাপাঠশালা' বলত। কলেজ পরিচালনার ভার ছিল তখন একটি 'ম্যানেজিং কমিটি' বা 'অধ্যক্ষ সভার' উপর। গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গানারায়ণ দাস ও হরিমোহন ঠাকুরকে নিয়ে প্রথম অধ্যক্ষসভা গঠিত হয়। কলেজের গবর্ণর ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর ও বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্র। ১৮১৯ সনে ডেভিড হেয়ার কলেজের ভিজিটার বা পরিদর্শক নিযুক্ত হন, ১৮২৪ সন থেকে ডক্টর উইলসন এই পদ গ্রহণ করেন। জানুয়ারি ১৮২৫ সনের রিপোর্টে হিন্দুকলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে উইলসন লেখেন: "The general result of the operations of the Hindu College is to give the students a considerable command

of the English language, to extend their knowledge of History and Geography, and to open to them a view of the objects and means of Sciences." ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে, ইতিহাসে ও ভূগোলে, এবং বিজ্ঞানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়াই হিন্দুকলেজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্যালয়ের এই শিক্ষাদর্শের সঙ্গে ডিরোজিওর নিজের আদর্শের কোথাও যে কোন অসঙ্গতি ছিল তা মনে হয় না। তবু ঘটনাচক্রের এমনই পরিহাস যে চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই আদর্শচ্যুতির অপরাধে ডিরোজিও দণ্ডিত হলেন।

ডিরোজিও হিন্দুকলেজে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করার পর, পরিদর্শক উইলসন বাৎসরিক রিপোর্টে ছাত্রদের শিক্ষার অগ্রগতির কথাই উল্লেখ করেছেন। ১৮২৭ সনে, অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার পরেও তিনি সিনিয়র বিভাগের ছাত্রদের ইংরেজী রচনাশক্তির ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি মন্তব্য করেছেন যে সিনিয়ার ছাত্রদের সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যে আরও গভীর ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন। ১৮২৮ সনে উইলসন লেখেন যে কলেজের প্রথমশ্রেণীর ছাত্ররা পোপের কবিতা, মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট', এবং সেক্সপীয়রের ভাল ভাল নাটকগুলি সম্বন্ধে বেশ চমৎকার জ্ঞানলাভ করেছে। এ ছাড়া ইতিহাস দর্শন গণিত ও বিজ্ঞানেও তাদের উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট। ১৮২৪ সনে যখন তিনি পরিদর্শক নিযুক্ত হন তখন প্রথমশ্রেণীর ছাত্ররা Tegg-এর Book of Knowledge ও Enfield-এর Speaker পাঠ করত, এবং তাতে যেটুকু শিক্ষা তাদের হত তার চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষা এখন (১৮২৮ সনে) পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্ররা পেয়ে থাকে। আর এখনকার প্রথমশ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে আগেকার প্রথমশ্রেণীর কোন তুলনাই হয় না— "Whilst those of the present first-class, admit of no comparison with anything yet effected by the College, and far exceed the expectations which I then expressed or entertained."

১৮১৭ সনে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হওয়ার পর থেকে প্রায় সাত-আট বছর পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা বাড়ে নি বললেই চলে। ১৮২৪ সন পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা একশতের বেশী ছিল না, তার মধ্যে ২৫ জন ছিল পে-স্কলার, বাকি সকলে বিনা বেতনে পড়ত। ১৮২৫ সন থেকে পে-স্কলারের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, ১৮২৬-এর শেষে ২২৩ জন, ১৮২৭-এর শেষে ৩০০ জন এবং ১৮২৮-এর শেষে ৩৩৬ জন হয়। ১৮৫০-৫১ পর্যন্ত পে-স্কলারের সংখ্যা গড়ে ৪৫০ জন ছিল বলা চলে। কেবল ১৮৩০-৩১-৩২ সনে দেখা যায় কলেজের ছাত্রসংখ্যা কিছু কমে গিয়েছিল। এর কারণ উল্লেখ করে কের (J. Kerr) সাহেব বলেছেন: "The falling off...was supposed to be owing partly to the establishment of other schools, partly to the commercial distress which prevailed at that period, and partly to a panic among the natives caused by a supposed interference with the religion of the boys who, under the influence of Mr. Derozio, were fast losing their respect for the venerable customs of their forefathers." কের যদিও অন্যান্য স্কুল প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক সঙ্কটের কথা বলেছেন, তা হলেও ১৮২৯-৩০-৩১ সনে হিন্দুকলেজের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে যে প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল প্রধানত: ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রবৃন্দকে লক্ষ্য করে, তারই ফলে অভিভাবকরা অনেকে তাঁদের ছেলেদের কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেন।

কিন্তু হঠাৎ কী এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হল দু-এক বছরের মধ্যে যার জন্য কলেজের একজন তরুণ বয়সের শিক্ষক ডিরোজিও সমগ্র হিন্দুসমাজের সামনে অপরাধীর মতন কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হলেন? অথচ আগে যে পরিদর্শকের রিপোর্টের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ডিরোজিওর আমলে কলেজের ক্রমিক উন্নতি ছাড়া অবনতি হয় নি। শিক্ষার মানের দিক থেকে, ইংরেজী সাহিত্য দর্শন ইতিহাস

বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে, ছাত্রদের দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করে পরিদর্শক উইলসন নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন, এবং এতদূর উন্নতি যে আশাতিরিক্ত তাও তিনি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। শুধু যে শিক্ষার মান বেড়েছে তা নয়, কলেজের বৈতনিক ছাত্রসংখ্যাও ডিরোজিওর সময় দু-তিন বছরের মধ্যে দ্রুত হারে বেড়েছে, এবং সেটা নিশ্চয় কলেজের উপর অভিভাবকদের আস্থাবৃদ্ধির লক্ষণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। কেবল ডিরোজিওর জন্যই যে কলেজের এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হচ্ছিল তা বলা যায় না, কিন্তু শিক্ষক হিসেবে তিনি তার জন্য অন্ততঃ কিছুটা দায়ী ছিলেন বলা যায়। তা হলে হঠাৎ কেন তাঁরই মাথার উপর পুঞ্জীভূত আক্রোশের মেঘ সশব্দে ফেটে পড়ল, এবং তাঁরই প্রিয় ছাত্রদের ঘিরে প্রচণ্ড ঝড় উঠল সমাজে ?

এককথায় এর উত্তর হল, গুরু ড্রামণ্ডের মতন ডিরোজিও নিজেও ছিলেন (যদিও ড্রামণ্ডের মতন ডিরোজিওর সমাধির স্মৃতিফলকে তা লেখা নেই) 'a successful teacher of youth'—তরুণদের সার্থক শিক্ষক। আরও অনেক শিক্ষক ছিলেন হিন্দুকলেজে, কোন কোন বিষয়ে তাঁর চেয়ে হয়তো তাঁরা অনেক বেশী পণ্ডিতও ছিলেন, ভাল পড়াতেও পারতেন, কিন্তু কলেজের রেজিস্টার-খাতায় ছাড়া ইতিহাসের পাতায় তাঁরা কোন স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি। তার কারণ বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য নিষ্ঠা কর্মক্ষমতা সবই ছিল তাঁদের, ছিল না কেবল ডিরোজিওর মতন জাদুকরী ব্যক্তিত্ব ও চুম্বকতুল্য চরিত্র। তাঁদের পাণ্ডিত্য ছিল, প্রতিভা ছিল না, এবং পাণ্ডিত্যও যা ছিল তা নীরেট পাথরের মতন অচল। কিন্তু ডিরোজিওর পাণ্ডিত্যের চেয়ে প্রতিভা ছিল বেশী, এবং বিদ্যা যেটুকু ছিল তাঁর তা প্রতিভার স্পর্শে চকমকির মতন জ্বলে উঠত। তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা আসতেন তাঁরা কেবল বিদ্যার শীতল চাপ নয়, প্রতিভা-স্ফুলিঙ্গের এই তাপও অনুভব করতেন। গুরু-শিষ্যের শিক্ষক-ছাত্রের তা নিশ্চয়ই, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেও যেখানে কেবল বাধ্যতার চাপ আছে, মনের তাপ নেই, সেখানে বন্ধন কখনও অকৃত্রিম ও অবিচ্ছেদ্য হয় না—হতে পারে না। হিন্দুকলেজে শিক্ষক ডিরোজিওর সঙ্গে তাঁর ছাত্রদের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে হৃদয়ের ও প্রতিভার এই উত্তাপ ছিল বলেই বাইরের জনসমাজে তার প্রকাশ হয়েছিল চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ-ঝিলিকে।

ডিরোজিওর ছাত্ররাই এই আন্তরিক সম্পর্কের কিছু কিছু বিবরণ দিয়ে গেছেন। রাধানাথ শিকদার লিখেছেন যে ডিরোজিওর বিদ্যাভিমান কিছু থাকলেও, তাঁর মতন সহানুভূতিশীল স্নেহপ্রবণ শিক্ষক তখন দুর্লভ ছিল। কোন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার আগে তিনি ছাত্রদের চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দিতেন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কী। ছাত্ররা তাতে লাভবান হত সবচেয়ে বেশী এবং কেবল বিদ্যা আয়ত্ত করেই তাদের তৃপ্তি হত না, জীবনে ও সমাজে তার প্রয়োগ-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় তারা অনুপ্রাণিত হত। আর কোন শিক্ষক ছাত্রদের মনে এরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাতে পারতেন না। রাধানাথ নিজে তাঁর কাছে সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করে বিশেষ উপকৃত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মানুষের জীবনের সবচেয়ে যে বড় শিক্ষা, সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা, তা তাঁরা তাঁদের গুরু ডিরোজিওর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন।

প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর ছাত্র নন অথচ সেযুগের একজন বিশিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শী, গোঁড়া-হিন্দু-সমাজ-পরিত্যক্ত আর-একজন প্রতিভাবান বাঙালী রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন তা উল্লেখযোগ্য। ডিরোজিওর মৃত্যুর বছর তিনেক পরে ১৮৩৪ সনে লালবিহারী দে প্রথম কলকাতায় আসেন লেখাপড়া শেখার জন্য। ডিরোজিয়ান যুগের কলরব তখনও শান্ত হয় নি, বরং মনে হয় যেন গুরুর মৃত্যুর পরে ইয়ং বেঙ্গল দল দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁদের আদর্শ প্রচারে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই পরিবেশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লালবিহারী দে'র ছিল। ডিরোজিও সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি তাঁর ছাত্রদের কাছ থেকে শুনেছিলেন মনে হয়। তিনি লিখেছেন: "হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্ররা বেকন

(Bacon) লক (Locke) বার্কলে (Berkeley) হিউম (Hume) রীড (Reid) ও স্টুয়ার্ট (Stewart) প্রমুখ দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। এই জ্ঞানলাভের ফলে তাঁদের গতানুগতিক চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হতে থাকে। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁরা প্রশ্ন করতে, তর্ক করতে ও সন্দেহ করতে আরম্ভ করেন। তাঁদের এই নতুন শিক্ষাদানের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী ডিরোজিওর। হিন্দুকলেজে ডিরোজিওর 'ক্লাস' ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকমের। ছাত্ররা তাঁর ক্লাসে জ্ঞানবিদ্যার এক নতুন আস্বাদ পেতেন যা আর কোথাও পেতেন না। ছাত্রদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগানোই ডিরোজিওর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হয়তো ছোট জিনিসের সঙ্গে বড় জিনিসের তুলনা করা হবে, কিন্তু তবু ডিরোজিওর ক্লাসের সঙ্গে একমাত্র প্লেটো ও আরিস্ততলের 'আকাদেমি'র তুলনা করা যায়। ক্লাসরুমের বদ্ধ আবহাওয়ায় স্বভাবতই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিষয়ালোচনা খাপ খেত না। কলেজের ক্লাসরুম থেকে ছাত্রদের তিনি তাই তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় ডেকে নিয়ে যেতেন। কিছুদিন পরে আলোচ্য বিষয়ের প্রসারতার দিক দিয়ে বাড়ির পরিবেশও যখন সঙ্কীর্ণ মনে হল তখন তিনি বাইরে ছাত্রদের নিয়ে একটি পাঠচক্র ও বিতর্কসভা গড়ে তুললেন।"

ডিরোজিও কি শিক্ষা দিতেন এবং কেমন করে শিক্ষা দিতেন তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেল। শিষ্যদের চেয়ে গুরু বয়সে মাত্র চার-পাঁচ বছরের বড় ছিলেন, প্রাচীনকালের প্রবীণ গুরুমশায় বা ঋষিদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে না। বিদ্যাভিমান ডিরোজিওর খানিকটা ছিল বলে তাঁর দু-একজন ছাত্র ও বন্ধুবান্ধব উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সামনে অভিমানের প্রাচীর তুলে তিনি ছাত্রদের কোনদিন দূরে ঠেলে দেন নি। বয়সের দিক থেকে ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর যে বন্ধুর মতন মেলামেশার সুযোগ ছিল, তার সদ্ব্যবহার তিনি পুরোমাত্রায় করেছেন। ছাত্রদের বন্ধুর মতন কাছে টেনে নিয়েছেন, এবং সেই টান ক্রমেই প্রবল হয়েছে মনের সরসতার জন্য। ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাঁর কাছে এসেছে এবং তাঁর প্রতিভা পাণ্ডিত্য ও চরিত্র গভীর আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করেছে তাদের মনের উপর। ডিরোজিওর ছাত্ররা তাই যে কেবল বিদ্বান হয়েছেন তা নয়, অসাধারণ চরিত্রবান পুরুষও হয়েছেন অনেকে।

ডিরোজিওর শিক্ষাপদ্ধতির যে অভিনবত্ব ছিল তা কি? অন্যদের সঙ্গে তার পার্থক্য ও বিশেষত্বই বা ছিল কোথায়? প্রথম বিশেষত্ব হল, পুথিগত বিদ্যা কোনরকমে মগজগত করতে তিনি ছাত্রদের কখনও উপদেশ দিতেন না। মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাসমার্ক পাওয়া এবং প্রতিযোগিতায় লটারীর মতন বরাতের জোরে জয়লাভ করার যে শিক্ষাদর্শ, ডিরোজিও শিক্ষক হিসেবে তা ঘৃণা করতেন এবং ছাত্রদেরও ছাত্র হিসেবে তা ঘৃণা করতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞানবিদ্যার অনির্বাণ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলাই শিক্ষকের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। শিক্ষক জীবনে তিনি নিজেও তাই করতেন। দর্শন সাহিত্য বা যে-কোন বিষয় নিয়ে যখন তিনি আলোচনা করতেন, তখন পাঠ্যপুস্তকের বেড়াঘেরা সীমানা ছাড়িয়ে তিনি তার অসীম দিগন্তে একটার-পর-একটা রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করতে করতে যাত্রা করতেন। আলোচনায় বিভোর হয়ে, বিষয়-মাধুর্যে মশগুল হয়ে, তিনি ভুলে যেতেন তাঁর যান্ত্রিক কর্তব্যের কথা। ছাত্ররাও ভুলে যেত ক্লাসের কথা, নির্দিষ্ট পাঠ্যবস্তুর কথা। মনে তাদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগত, অজানাকে জানার ব্যাকুলতা বাড়ত। সাগ্রহে তারা প্রশ্ন করত, নানারকমের প্রশ্ন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, আরও প্রশ্ন করতে ডিরোজিও উৎসাহ দিতেন। সবসময় শিক্ষকই যে তার জবাব দিতেন তা নয়, ছাত্ররা প্রশ্ন করত, ছাত্ররাই তার জবাব দেবার চেষ্টা করত। ক্লাস আর কলেজের ক্লাস থাকত না, বিতর্কসভায় পরিণত হত। এইটাই ছিল ডিরোজিওর শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বিশেষত্ব ও অভিনবত্ব।

কলেজের ক্লাসরুম থেকে ডিরোজিওর বাড়ির

বৈঠকখানায় বসত আলোচনা-সভা। বাড়ির আবহাওয়াও শেষে যখন সভার পক্ষে সংকীর্ণ বলে মনে হল তখন মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ির ঘর ঠিক করা হল সভার জন্য। সভার নাম দেওয়া হল 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' (Academic Association)। মনে হয় ১৮২৭ সন থেকেই এই আলোচনাচক্রের ঘরোয়া বৈঠক শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮২৮-২৯ সনের মধ্যেই অ্যাকাডেমিক সভার খ্যাতি ও প্রভাব বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাগানবাড়ির নিভৃত গৃহকোণ থেকে বাইরের সমাজের মুক্ত প্রাঙ্গণে সোরগোল তুলেছিল তরুণদের এই বিদ্বৎসভা। বিচক্ষণ প্রাজ্ঞরাও সভায় যোগদান করার লোভ সম্বরণ করতে পারতেন না। লালবিহারী দে লিখেছেন: "In this grove of Academus—and the debating society had a garden attached to it, it being held on the premises now occupied by the Ward's Institution—did the choice spirits of young Calcutta hold forth, week after week, on the social, moral and religious questions of the day. The general tone of the discussions was a decided revolt against existing religious institutions···The young lions of the Academy roared out, week after week 'down with Hinduism! down with Orthodoxy!" বাংলার তরুণ সিংহশাবকদের গগনভেদী গর্জন শোনা যেত মানিকতলার বাগানবাড়িতে—যাবতীয় ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, নৈতিক ভণ্ডামি ও নোংরামির বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, যুক্তিহীন শাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধে, প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রিক আর্থনীতিক ও মানসিক দাসত্বের বিরুদ্ধে, নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে, দেবতার বিরুদ্ধে। ঘরে বাইরে তার প্রতিধ্বনি হত। ঘর কাঁপত, সমাজও কাঁপত।

ডেভিড হেয়ার আসতেন সবুজরঙের কোট পরে যুবক সেজে, যৌবন ফিরে পেতেন তিনি যুবকদের সভায় এসে। উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি আসতেন, বিশপ্স কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মিল্স আসতেন, কলকাতার সুপ্রীমকোর্টের চীফ-জাস্টিস আসতেন। ডিরোজিও সভাপতি, সম্পাদক উমাচরণ বসু। সদস্য ও বক্তা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং ডিরোজিওর অন্যান্য ছাত্ররা। আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করতেন একজন। ঈশ্বর আছেন কি নেই? জাতিভেদ ভাল কি মন্দ? প্রতিমাপূজা বর্জনীয় কি না? যুক্তি বড়, না অন্ধ বিশ্বাস বড়? বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, না ক্ষুরধার বুদ্ধির আলোকে ও তর্কে? ব্যক্তিস্বাধীনতা, না সমষ্টি-দাসত্ব—কোন্‌টা কাম্য? এইসব বিষয় নিয়ে দুই পক্ষে যুক্তির জাল বিস্তার করতেন। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের উক্তি ও যুক্তি অনর্গল উদ্ধৃত করা হত বিতর্কের সময়। ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যেত সভাঘরে, কেবল বাক্যবিলাসী বক্তৃতার নয়, সাধনালব্ধ বিদ্যারও। বয়োবৃদ্ধরা অবাক হয়ে যেতেন, বিদেশী ইংরেজ শ্রোতারা হয়তো মনে মনে ভয়ও পেতেন। কারণ ডিরোজিও যে দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং ভারতবর্ষকেই স্বদেশ মনে করতেন, এ কথা তাঁরা জানতেন। জাতে পর্তুগীজ-ফিরিঙ্গি হলেও ডিরোজিও মনেপ্রাণে ভারতীয় ছিলেন। তাঁর তরুণ বয়সের লেখা অনেক কবিতায় এই স্বদেশ-প্রেমের সুর ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। কেবল "জঙ্গিরার ফকির" কাব্যে নয়, ছোট ছোট আরও অনেক কবিতায়। তার মধ্যে ১৮২৭ সনে প্রকাশিত ডিরোজিওর প্রথম কাব্যসংকলনের প্রথম কবিতা 'The Harp of India' একটি চমৎকার নিদর্শন:

Why hang'st thou lonely on yon withered bough?
Unstrung, for ever, must thou there remain?
Thy music once was sweet who hears it now?
Why doth the breeze sigh over thee in vain?

Silence hath bound thee with her
fatal chain :
Neglected, mute, and desolate art thou,
Like ruined monument on desert plain :—
... ... but if thy notes divine
May be by mortal wakened once again,
Harp of my country, let me strike
the strain !

আঠার বছরের তরুণ কবির স্বদেশ সম্বন্ধে এই কল্পনা ও বেদনা বিস্ময়কর নয় কি? "স্বদেশ আমার, তোমার বীণার ছেঁড়া তারে আবার আমায় সুর বাঁধতে দাও!"

ভারত-বীণার ছেঁড়া তারে ডিরোজিও নিজেই যে কেবল সুর বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন তা নয়, তাঁর তরুণ ছাত্রদের মনেও সেই সুরের ঝংকার তুলেছিলেন। বিতর্ক-সভায় রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা সম্বন্ধেও আলোচনা হত। 'Young lions of Bengal' কেবল সামাজিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে নয়, বিদেশীর দাসত্বের বিরুদ্ধেও ঘন ঘন গর্জন করতেন। 'পার্থিনন' নামে সভার একটি মুখপত্রও প্রকাশ করা হয়েছিল। এই 'পার্থিনন' বোধ হয় বাঙালীদের দ্বারা প্রথম প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (১ সেপ্টেম্বর, ১৮৪২) থেকে জানা যায় যে 'পার্থিনন' দুই সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমসংখ্যার বিষয়বস্তু ছিল স্ত্রীশিক্ষা, হিন্দুধর্ম, গবর্ণমেন্টের বিচার বিভাগের ব্যয়বাহুল্য ইত্যাদির আলোচনা সমালোচনা। দ্বিতীয়সংখ্যা ছাপা হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্রাহকদের কাছে তা পাঠানো হয় নি। বাঙালীর প্রথম ইংরেজী পত্রিকার প্রথমসংখ্যা দেখেই গোঁড়ার দল এতদূর শংকিত হয়েছিলেন যে দ্বিতীয়সংখ্যা 'মুদ্রাঙ্কিত' হলেও তাঁরা "গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই।"

'পার্থিনন' বন্ধ হলেও "যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই।" সভার আলোচনা ও বিতর্কের ভিতর দিয়েই সত্যের দুর্গম পথে তরুণ বাংলার দুঃসাহসিক অভিযান চলতে থাকল। ডিরোজিও নিজে কেবল যে এই সভাতেই বক্তৃতা দিতেন তা নয়, মধ্যে মধ্যে অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভাতেও তিনি বক্তৃতা দিতে যেতেন। হেয়ার সাহেব তাঁর পটলডাঙার স্কুলে ডিরোজিওকে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান করে নিয়ে যেতেন। হিন্দুকলেজের ছাত্রগোষ্ঠীর বাইরে কলকাতার তরুণ ছাত্রসমাজের মধ্যে ডিরোজিওর প্রভাব ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। তার ফলে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রসার-প্রতিপত্তিও ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এবং হিন্দুসমাজ ক্রমেই আতংকিত হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু তরুণদের এই আলোচনা-সভা সম্বন্ধে হিন্দুসমাজ এত সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন কেন?

রামমোহন রায়ের 'আত্মীয়সভা' তার অনেক আগে ১৮১৫ সনে গড়ে উঠেছিল। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণপ্রথা ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আত্মীয়সভার বৈঠকেও নিয়মিত আলোচনা হত। কিন্তু ডিরোজীয়ানদের অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের মতন বাইরের সমাজে তা নিয়ে বিশেষ কোলাহলের সৃষ্টি হয় নি। তার কারণ, ১৮১৫-২০ আর ১৮২৫-৩০-এর মধ্যে মাত্র দশ-পনের বছরের তফাত হলেও, সামাজিক পরিবেষ্টনের পার্থক্য তার মধ্যে অনেকখানি ঘটে গিয়েছিল। কতকটা মানুষের জীবনের মতন সমাজ-জীবনেরও বিভিন্ন যুগের ও পর্বের গতিবেগ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তারতম্য ঘটে। জীবনের পর্বে পর্বে, বাল্যে যৌবনে প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে যেমন চলার গতি ও ছন্দ বদলায়, তেমনি যুগে যুগে এবং একই যুগের ভিন্ন ভিন্ন পর্বে সমাজের চলার গতি ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ধারা বদলায়। সামাজিক গতিবিজ্ঞানের মূলসূত্র এই। ডিরোজীয়ানদের সময় ঘটনাবর্তে গতি সঞ্চারিত হয়েছিল অনেক বেশী। আত্মীয়সভার সামাজিক গড়নই (social composition) ছিল অন্যরকমের, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবয়স্কদের প্রাধান্য ছিল তার বৈশিষ্ট্য। রামমোহন নিজেও ছিলেন তখন মধ্যবয়সী ও বিত্তবান। ইয়ং বেঙ্গলের যুগে সমাজের চেহারায় একটা বড়রকমের পরিবর্তন ঘটল, সর্বপ্রথম নতুন পাশ্চাত্যবিদ্যায় শিক্ষিত

মধ্যবিত্ত যুবকশ্রেণীর আবির্ভাব হল সমাজে। একজন মধ্যবিত্ত শিক্ষক তাদের গুরু হলেন। পাশ্চাত্তাবিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত, দুটিরই সামাজিক গুরুত্ব যথেষ্ট। অ্যাকাডেমিক সভার গড়নে এই নতুন মধ্যবিত্তের প্রাধান্য তো ছিলই, আত্মীয়সভার মতন মধ্যবয়স্কের মন্থরতাও ছিল না তার মধ্যে। নবজাত শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের ঐতিহাসিক গতিশীলতার সঙ্গে তারুণ্যের বেগবান প্রাণের আবেগ মিলিত হয়েছিল ইয়ং বেঙ্গলের বিতর্কসভায়। তাই তার ভয়ংকর গর্জনে ও ফেনিল উচ্ছ্বাসে সমাজের জীর্ণ পুরাতন বাঁধগুলি ভাঙবার উপক্রম হয়েছিল। হিন্দু-সমাজের রক্ষকরা সেইজন্য এত বেশী আতঙ্কিত হয়েছিলেন। আতঙ্কের হেতু ছিল। এই সময় আরও কতকগুলি ঘটনা তাঁদের আতঙ্কে ইন্ধন যোগান দিল।

বড় নদীর তীরে দাঁড়িয়ে তরঙ্গভঙ্গের দৃশ্য দেখলে সামাজিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের স্বরূপ সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যায়। তরঙ্গকে আঘাত করে তরঙ্গ, তরঙ্গমালা ভেঙেচুরে মিলেমিশে যায়, আরও বড় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সমাজেও ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্পর্ক এইরকম অবিচ্ছিন্ন। প্রথম ঘটনা দ্বিতীয়কে আঘাত করে এবং তৃতীয়কে ভেঙে সঞ্চার করে পরবর্তী ঘটনাকে ভয়াবহ করে তোলে। ডিরোজিওর জীবনের ট্র্যাজিডি হল, ১৮২৯-৩০-৩১ সনের মধ্যে তিনি এইরকম অবিচ্ছিন্নসূত্রে গ্রথিত কয়েকটি বড় বড় ঘটনা-তরঙ্গের সম্মিলিত আঘাতের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তার প্রচণ্ড ঝাপটায় তাঁর নিজের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ বর্তমান লেখকের তাই ধারণা। সব ঘটনার স্রষ্টা তিনি নন, কিন্তু ঘটনা-চক্রের তিনিই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিক নায়ক।

১৮২৯-এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৩১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত দু বছরে মাত্র ডিরোজিওর জীবন-নাট্যের শেষ অংক রচিত হয়েছে। দু-বছরের এই ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করলে নাটকের করুণ পরিণতি অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না:

১৮২৯, ডিসেম্বর : বেণ্টিক সতীদাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৮৩০, জানুয়ারি : হিন্দুরা 'ধর্মসভা' গঠন করে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ-আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হন।

১৮৩০, মে : পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ সস্ত্রীক কলকাতায় আসেন।

১৮৩০, জুলাই : ডাফ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন (General Assemebly's Institution)

১৮৩০, আগস্ট : ডাফের পরিকল্পনা অনুযায়ী খ্রীষ্টধর্ম-মাহাত্ম্য বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয় প্রকাশ্যে।

১৮৩০, নভেম্বর : রামমোহন রায় ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

১৮৩১, এপ্রিল : ডিরোজিওর বিরুদ্ধে হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষের অভিযোগ এবং ডিরোজিওর পদত্যাগ।

১৮৩১, মে : কৃষ্ণমোহন সম্পাদিত ইয়ং বেঙ্গলের ইংরেজী মুখপত্র *The Enquirer* প্রকাশিত হয়।

১৮৩১, জুন : ইয়ং বেঙ্গলের বাংলা মুখপত্র "জ্ঞানান্বেষণ" প্রকাশিত হয়।

১৮৩১, আগস্ট : কৃষ্ণমোহনের বাড়ি থেকে তাঁর তরুণ বন্ধুরা প্রতিবেশীর গৃহে (ব্রাহ্মণ) গোমাংসের হাড় নিক্ষেপ করে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেন।

১৮৩১, নভেম্বর : গোঁড়া হিন্দুসমাজকে তীব্র বিদ্রূপ করে কৃষ্ণমোহন *The Persecuted* নামে ইংরেজী নাটক রচনা করেন।

১৮৩১, ডিসেম্বর : ডিরোজিও হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান।

টীকা-টিপ্পনি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াও এই কালানুক্রমিক ঘটনাবিন্যাস লক্ষ্য করলে যে-কেউ বুঝতে পারবেন, ডিরোজিওর জীবনের করুণান্ত পরিণতির জন্য তাঁর নিজের

চেয়ে তাৎকালিক ঘটনাচক্র কত বেশী দায়ী। ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়াসহ যদি একটি জ্যামিতিক ডায়েগ্রাম আঁকা সম্ভব হত, তা হলে বোধ হয় ডিরোজিওর দিকে তার সর্বগ্রাসী গতি আরও পরিষ্কার হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠত।

ঘটনাগুলির অন্ততঃ একটা চলতি ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ১৮২৮-২৯ সনে বাংলার তরুণ সিংহশিশুরা যখন তাঁদের শিক্ষক ডিরোজিওর প্রেরণায় কুসংস্কার, মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের গুহাভ্যন্তর থেকে তর্জন-গর্জন করছিলেন, তখন নবযুগের নায়ক রামমোহন রায় পূর্ণগৌরবে কলকাতার সামাজিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্রদের কার্যকলাপ ধ্যানধারণা সম্বন্ধে তাঁর মনে কিরকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল তা তিনি প্রকাশ করেন নি। ১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর বেন্টিঙ্ক অনেক টালবাহানা করে সতীদাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং তার ফলে রক্ষণশীল বিরাট হিন্দুসমাজকে তীব্র কশাঘাত করে তিনি জাগিয়ে তুললেন। ১৮৩০-এর ১৭ জানুয়ারি হিন্দুদের 'ধর্মসভা' স্থাপিত হল, সংহত ও সংঘবদ্ধ হল হিন্দুসমাজ। লোকবল ও অর্থবলের দিক দিয়ে বিচার করলে তার শক্তি বিরাট, সংহত রূপও ভয়াবহ। 'ধর্ম গেল, জাত গেল' রব উঠল, কলকাতার আকাশ ফাটিতে লাগল ধর্মধ্বজীদের হৈ-হল্লায়। তাঁদের সমস্ত আক্রোশ ধাবিত হল হিন্দু-কলেজ ও তার নব্যশিক্ষিত তরুণ ছাত্রদের দিকে। কারণ পাশ্চাত্ত্যবিদ্যাই সর্বনাশের মূল বলে তাঁরা স্থির সাব্যস্ত করলেন।

এমন সময় (২৭ মে, ১৮৩০) পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ এসে পৌঁছলেন কলকাতায়। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দীপনায় অস্থির হয়ে ছিলেন তিনি মনে হয়। আসার মাস দুয়ের মধ্যে তিনি রামমোহন রায়ের প্রত্যক্ষ সহায়তায় 'জেনারেল অ্যাসেম্বলিস্ ইনস্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করলেন (১৩ জুলাই ১৮৩০), এবং লালবিহারী দে'র ভাষায় 'Duff laid the foundation of Christian Education in India'. জোড়াসাঁকোয় ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতেই ডাফ সাহেবের স্কুল খোলা হল, যে-বাড়িতে প্রথম হিন্দুকলেজ এবং রামমোহনের ব্রাহ্মসভাও স্থাপিত হয়েছিল। ডাফ দেখলেন, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চমৎকার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে কলকাতায়, কারণ ইংরেজীশিক্ষিত বাংলার তরুণেরা স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির মূল্য দিতে শিখেছে। যে হিন্দুকলেজে শিক্ষার ফলে তাদের এই চিন্তাশক্তির ও বিচারবুদ্ধির বিকাশ হয়েছে, ডাফের ভাষায় সেটি হল 'the very *beau-ideal* of a system of education without religion.' সুতরাং প্রথমে তিনি ধর্মভিত্তিক শিক্ষার অভাব পূরণ করলেন নিজে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। তারপর সামনে ধর্মের শূন্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে তাঁর কামনার শিখা জ্বলে উঠল। অশিক্ষিত ও গোঁড়াদের মধ্যে আর ধর্মপ্রচার করতে হবে না। শিক্ষিত যুক্তিবাদী তরুণদের কাছে খ্রীষ্টধর্মমাহাত্ম্য ব্যাখ্যানের সম্ভাবনা বিপুল। *India and India Missions* গ্রন্থে তিনি তাই আশায় উদ্ভাসিত হয়ে লিখেছেন, "We hailed the circumstance as indicating the approach of a period for which we had waited and longed and prayed." অতএব ধর্মানুপ্রাণিত পাদ্রি ডাফ খ্রীষ্টধর্মবিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন। হিন্দুকলেজের কাছে যে-বাড়িতে তিনি থাকতেন তার একতলার হলঘরে বক্তৃতা হবে, একাধিক বক্তৃতা। শ্রোতারা বক্তাকে খুশিমতন প্রশ্ন করতে পারবেন, বক্তৃতার পর বিতর্ক হতেও বাধা নেই। হুঁশিয়ার ডাফের লক্ষ্য যে কি তা বক্তৃতার স্থান-নির্বাচন থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। লক্ষ্য হিন্দুকলেজের নব্যশিক্ষিত তরুণের দল, যাদের সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিদীপ্ত মনে কোন বিশেষ ধর্মগোঁড়ামি নেই। যদি তাদের সেই মুক্ত আলোকোজ্জ্বল মানসভূমিতে খ্রীষ্টধর্মের বীজ একটু ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা হলে ফসলের জন্য আর ভাবতে হবে না, সোনার ফসল ফলবে সেখানে। ডাফ লিখেছেন যে অশিক্ষিত অনুন্নত জাতির হাজার-জনকে ধর্মান্তরিত করার চেয়ে কলকাতা শহরের একজন উচ্চবর্ণের সদ্বংশের সুশিক্ষিত তরুণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিতে পারলে শতগুণ সুফল পাওয়া যাবে

বলে তাঁর বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি ধর্মপ্রচারের মহৎ কর্মে ব্রতী হলেন। পাদ্রি হিল সাহেব প্রথম বক্তৃতা দিলেন, অত্যন্ত গরম বক্তৃতা। ভূমিকম্পে মেদিনী কেঁপে ওঠার মতন বক্তৃতার ফলে কলকাতার হিন্দুসমাজ কেঁপে উঠল। ডাফ সাহেবের ভাষায়, "The whole town was literally in an uproar." লালবিহারী দে লিখেছেন, "that lecture fell like a bombshell among the College authorities." ডাফ নিজে হিন্দুসমাজের উপর, বিশেষ করে হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষের উপর এই বক্তৃতার প্রবল প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাষায়: "বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে সারা হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা গুজব দুরন্ত বেগে রটতে আরম্ভ করল, রীতিমত হৈচৈ পড়ে গেল শহরে। বাস্তবিকই সেই বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ যাঁরা না স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁদের বর্ণনা করে বুঝিয়ে বলা তা সম্ভব নয়। বক্তৃতার পর হিন্দুদের একটা বদ্ধমূল ধারণা হল, যে-কোন প্রকারে ফুসলিয়ে বা ভয় দেখিয়ে খ্রীষ্টান পাদ্রিরা এদেশের হিন্দু যুবকদের ধর্মান্তরিত করার সংকল্প করেছেন। শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত কয়েকদিন ধরে অনবরত সভা ডেকে হিন্দুসমাজের পাণ্ডারা খ্রীষ্টান পাদ্রিদের মতলবের কথা জনসাধারণকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন। পাদ্রিদের খপ্পর থেকে কি উপায়ে হিন্দুদের, বিশেষ করে তরুণদের রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে প্রকাশ্য জনসভায় ও সংবাদপত্রে আলোচনা হতে থাকল। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের অভিভাবকরা অনেকে কলেজ-কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলেন এই বলে যে কলেজের বিজাতীয় শিক্ষার ফলেই যুবকদের নৈতিক চরিত্রে ভাঙন ধরেছে। প্রতিদিন এই মর্মে অভিযোগ আসতে থাকল কলেজে। কলেজের পরিচালকরা রীতিমত শংকিত হয়ে উঠলেন। ব্যস্ত হয়ে তাঁরা পরিচালকসভার মীটিং ডেকে এই মর্মে এক প্রস্তাব পাস করলেন যে কলেজের ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েছেন, এবং সেইজন্য কোন ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা-সভায় ছাত্রদের যোগ দিতে তাঁরা নিষেধ করছেন।"

স্বয়ং ডাফ সাহেবের এই বিবরণ থেকেই বোঝা যায়, পাদ্রি হিলের বক্তৃতায় কি প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। সত্যিই তাঁর বক্তৃতাটি বোমার মতন ফেটে পড়েছিল হিন্দুসমাজের মাথার উপর। এক্ষেত্রেও তরঙ্গের সমস্ত আঘাতটা হিন্দুকলেজকেই সহ্য করতে হয়েছিল দেখা যায়। জনৈক "হিন্দুকালেজছাত্রস্য পিতুঃ" লিখেছেন, "প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অবৈধ এবং অনেক বিষয় বিপরীত ইহারা স্থানেং সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে এই সকল দেখিয়া পুত্রের কালেজে যাওয়া রহিতকরণের চেষ্টা করিলাম…"। চেষ্টা করেও অবশ্য অনেক পিতা সফল হন নি, কারণ ছেলেরা কলেজ ছাড়তে চায় নি। কিন্তু তা হলেও এই সময় অনেক পিতা ভয় পেয়ে ছেলেদের কলেজ ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৮২৯ থেকে ১৮৩২ সনের মধ্যে হিন্দুকলেজের ছাত্রসংখ্যা দ্রুতহারে কমে গিয়েছিল, "owing partly to a panic among the natives caused by a supposed interference with the religion of the boys." (J. Kerr)

একদিকে বেণ্টিঙ্কের সতীদাহ-নিবারণ আইন, আর একদিকে ডাফ-হিল প্রমুখ অত্যুৎসাহী পাদ্রিদের খ্রীষ্টধর্ম-অভিযান—এই দুয়ের তরঙ্গস্রোত প্রবল বেগে ধাবিত হল গোলদীঘির দিকে এবং সজোরে আঘাত করল হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠানকে। একজন শিক্ষককে ঘিরেই সকলের সমস্ত আক্রোশ ধূমায়িত হতে থাকল—তিনি ডিরোজিও। ডিরোজিওর দোষ একটি নয়, একাধিক। প্রথম দোষ, তিনি নিজে বয়সে তরুণ, অতএব তরুণ ছাত্রদের যে-কোন মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া ও খেপিয়ে তোলা তাঁর পক্ষে সবচেয়ে সহজ। দ্বিতীয় দোষ, তাঁর অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি। স্বাধীন আলোচনা প্রশ্ন-উত্তর তর্ক-বিতর্কের ভিতর দিয়ে তিনি ছাত্রদের নিজস্ব মতামতের প্রতি এমন একটা অন্ধ অনুরাগ জাগিয়ে তুলেছেন যার মর্যাদা তারা সবসময় রাখতে পারে না এবং যার ফলে তাদের মানসিক স্বেচ্ছাচারিতাই প্রশ্রয় পায়। তৃতীয় দোষ, শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিওর নিজের

মতামত প্রচলিত গতানুগতিক বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার বিপরীত। তাঁর মতে যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়, বুদ্ধিগম্য নয়, তা বেদ-কোরাণ-বাইবেলের আপ্তবচন হলেও গ্রহণযোগ্য নয়। এত দোষ যাঁর তাঁকে ক্ষমা করা যায় না, বিশেষ করে শিক্ষক হিসেবে তরুণ ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র-গঠনের দায়িত্ব তাঁর উপর কিছুতেই দেওয়া যায় না। অভিভাবকরা সমস্বরে কলেজ থেকে ডিরোজিওর পদচ্যুতি দাবি করলেন এবং কলেজের কর্মকর্তারা সেই দাবি বিবেচনা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে জরুরী সভা ডাকলেন।

এর মধ্যে আরও একটি ঘটনা তাঁদের আতঙ্ক ক্রোধ ও উদ্বেগ বাড়িয়ে দিল। ডাফ লিখেছেন, পাদ্রি হিলের বক্তৃতার পরে হিন্দুকলেজের কর্তারা ছাত্রদের সভা-সমিতিতে যোগদান সম্বন্ধে যখন নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন তখন শহরের ইংরেজী পত্রিকাগুলি একবাক্যে কঠোর ভাষায় তাঁদের নীতি 'presumptuous', 'tyrannical', 'absurd and ridiculous', ইত্যাদি বলে সমালোচনা করেছিলেন। এই সব ইংরেজী পত্রিকার মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন *India Gazette* পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ডক্টর গ্রান্ট, ডিরোজিওর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ডিরোজিও নিজে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন সহকারী সম্পাদক হিসেবে। বাইরের শিক্ষিতমহল এবং হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষ এ কথা জানতেন। সুতরাং 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র সম্পাদকীয় সম্বন্ধে গুজব রটে গেল যে ডিরোজিওই তার লেখক। কেউ কেউ লেখার স্টাইল দেখেও সেকথা বলতে লাগলেন। তার দু-চার লাইন আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি :

> We regret much to see the names of such men as David Hare and Rossomoy Dutt attached to a document which presents an example of presumptuous, tyrannical and absurd intermeddling with the right of private judgmet on political and religious questions. The interference is presumptuous, for the Managers as Managers have no right whatever to dictate to the students of the Institutions how they shall dispose of their time out of College. It is tyrannical, for although they have not the right, they have the power, if they will bear the consequences, to inflict their serious displeasure on the disobedient. It is absurd and ridiculous, for if the students knew their rights, and had the spirit to claim them, the Managers would not venture to enforce their own order, and it would fall to the ground an abortion of intolerance.

এই কটূক্তির পর ডাফ সাহেবকে অনুরোধ করা হয় বক্তৃতা চালিয়ে যেতে, এবং কলেজের ছাত্রদের উৎসাহিত করা হয় নির্ভয়ে সমস্ত বিধিনিষেধ অমান্য করে পাদ্রিদের সভায় যোগদান করতে। ডিরোজিওই লিখুন আর ডক্টর গ্র্যাণ্টই লিখুন, 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ভাবে ও ভাষায় যে সংযমের অভাব ঘটেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রমাণাদি থেকে মনে হয় ডিরোজিও নিজেই এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন। হিন্দুকলেজের পরিচালকরা বয়সে সকলেই প্রায় প্রবীণ ছিলেন, এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির দিক থেকে নয়, বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের দিক থেকেও যে তাঁরা সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন, সেকথা মনে রেখে ডিরোজিও যদি তাঁদের নীতির সমালোচনা করতেন তা হলে তাতে সুফল ফলত বেশী। প্রবন্ধটি পড়লে কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বলে মনে হয় না, মনে হয় কোন গোপন বিপ্লবীচক্রের উত্তপ্ত একটি ইশ্‌তেহার। এর পরে ডিরোজিওকে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত রাখা সমীচীন কিনা সে-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য কলেজের কর্তৃপক্ষ যদি সভা ডাকেন তা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

প্রসঙ্গতঃ ডিরোজিওর অসহিষ্ণু চরিত্রের আরও একটি দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়ছে। কলেজের অধ্যক্ষ ডানসেল্‌ম (D'anselme) সাহেবের সঙ্গে—"যিনি অতিখ্যাতাপন্ন বিদ্বান এবং প্রায় আরম্ভাবধি প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিয়া শিক্ষকদিগের সুরীতিক্রমে বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন"—ডিরোজিওর নানাবিষয়ে প্রায় বচসা হত বোঝা যায়। মনে হয় কলেজের বাইরে তাঁর প্রিয় ছাত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করার উদ্দেশ্যে তিনি ছুটির জন্য প্রায়ই অধ্যক্ষকে অনুরোধ করতেন। নির্দিষ্ট সময়ের আগে ডানসেল্‌ম সবসময় তাঁর ছুটি মঞ্জুর করতেন না। তাই নিয়ে ডিরোজিও তাঁকে রূঢ় কথা শোনাতেন। হিন্দুকলেজের হাতে-লেখা নথিপত্রের (১৮৩১, ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের) একটি কার্যবিবরণ থেকে তা বোঝা যায়। কলেজ-কমিটির সদস্যরা এই তারিখের একটি সভায় তাঁকে ডেকে অধ্যক্ষের কাছে দুঃখপ্রকাশ করতে বলেন, এবং ডিরোজিও এই কথা লিখে সই করে দেন, "He regrets that Mr. D'anselme should have supposed he had any intention to treat him with insult or disrespect." ঘটনাটি ছোট হলেও উপেক্ষণীয় নয়, বিশেষ করে ১৮৩১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটনাটি ঘটেছে বলে এর গুরুত্ব আছে।

ডিরোজিওর এই উদ্ধত ও অসহিষ্ণু স্বভাবের জন্য যে হিন্দুসমাজের আক্রোশ তাঁর উপর বিস্ফোরিত হয়েছিল তা নয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে পরিপার্শ্বের ধূমায়িত বহ্নিতে তাঁর তরুণসুলভ উগ্রতা বেশ খানিকটা ইন্ধন যোগান দিয়েছিল। ধীরস্থির শান্তপ্রকৃতির হলেও আগুন হয়তো ঠিকই জ্বলে উঠত—কারণ এ-আগুন শুধু হঠাৎ উত্তেজনার আগুন নয়, মনের আগুন, বুদ্ধির আগুন, নতুন চেতনার আগুন, আদর্শের আগুন—যার প্রধান হোতা ছিলেন ডিরোজিও। তবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই আগুনে যথাকালে অবিবেচকের মতন নিজে ঘৃতাহুতি না দিলে হয়তো তা শিখাবিস্তার করে অতটা তড়িৎগতিতে তাঁকে গ্রাস করতে উদ্যত হত না। অশোভন কটুভাষায় এভাবে কলেজের কর্মকর্তাদের সমালোচনা করার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। তার উপর পত্রিকার পৃষ্ঠায় কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করতে ছাত্রদের উসকানি দিয়ে এবং ডাফ সাহেব ও তাঁর সহযোগীদের খ্রীষ্টধর্মবিষয়ে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে অনুরোধ করে নিশ্চয় গ্র্যাণ্ট অথবা ডিরোজিও হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সামাজিক পরিবেশ অনুকূল হলেও এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁরা অপদস্থ হতেন। প্রতিকূল অবস্থায় ডিরোজিও স্বভাবতঃই ঝড়ের ঝাপ্‌টা সহ্য করতে পারেন নি।

১৮৩১, ২৩ এপ্রিল, শনিবার।

হিন্দুকলেজের পরিচালকমণ্ডলীর জরুরী সভা বসল। সভায় উপস্থিত হলেন কলেজের গবর্নর চন্দ্রকুমার ঠাকুর, সহঃসভাপতি উইলসন, রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব ব্যানার্জি, রামকমল সেন, ডেভিড হেয়ার, রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জি (সম্পাদক)। জরুরী সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে প্রথমেই বলা হল:

> The object of convening this meeting is the necessity of checking the growing evil and the public alarm arising from the very unwarranted arrangement and misconduct of a certain teacher in whom great many children have been intrusted, who it appears have maturely injured their morals and introduced some strange system, the tendency of which is destructive to their moral character and to the peace in society.

এখানে 'a certain teacher' যে ডিরোজিও তা বলাই বাহুল্য। বহু ছেলের নৈতিক চরিত্র গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁর উপর, কিন্তু তাঁর বিচিত্র শিক্ষাপদ্ধতি তার ভিত ভেঙে দিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলার পথ পরিষ্কার

করেছে। এই হল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ। অভিযোগের সপক্ষে তাঁরা সভায় বললেন যে ২৫ জন সম্রান্ত হিন্দু পরিবারের সন্তান এর মধ্যে কলেজ ছেড়ে চলে গেছে, এবং প্রায় ১৬০ জন ছাত্র কলেজে আসা বন্ধ করেছে। অভিভাবকরা বহু চিঠিপত্র লিখেছেন তাঁদের মতামত জানিয়ে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে সভায় কতকগুলি প্রস্তাব পেশ করা হল, তার মধ্যে প্রধান এইগুলি :

ক। ডিরোজিও যেহেতু সমস্ত অনর্থের মূল এবং জনসাধারণের ভীতির কারণ হয়ে উঠেছেন, সেইজন্য তাঁকে কলেজ থেকে অপসারিত করা দরকার এবং ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগও ছিন্ন করা আবশ্যক। (প্রস্তাবের ভাষা এই : Mr. Derozio being the root of all evils and cause of public alarm, should be discharged from the College, and all communications between him and the pupils be cut off.)

খ। উচ্চশ্রেণীর যে-সব ছাত্রের অভ্যাস ও স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে আপত্তিকর রিপোর্ট পাওয়া গেছে এবং যারা ভোজসভায় যোগদান করেছিল, তাদের কলেজে রাখা চলবে না।

গ। যে-সব ছাত্র হিন্দুধর্মের প্রচলিত প্রথাদি পালন করতে চায় না, প্রকাশ্যে ধর্মবিরোধী কথাবার্তা বলে, তাদেরও অবিলম্বে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা প্রয়োজন।

ঘ। মৌখিক শাসনে ফল না পাওয়া গেলে দৈহিক দণ্ডদানের ক্ষমতা দিতে হবে প্রধান শিক্ষককে।

প্রস্তাবগুলি যথারীতি পেশ করার পরে প্রথম ও প্রধান প্রস্তাব, ডিরোজিওর পদচ্যুতি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হল। আলোচনার জন্য বিষয়টি উপস্থাপন করা হল এইভাবে :

Whether the Managers had any just grounds to conclude that the moral and religious tenets of Mr. Derozio as far as ascertainable from the effects they have produced upon his scholars are such as to render him an improper person to be intrusted with the education of youth.

ছাত্রদের মনে ডিরোজিওর নীতি-ধর্মবিষয়ে মতামতের প্রতিক্রিয়া দেখে তাঁর সম্বন্ধে এমন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ আছে কি না যে তিনি তরুণদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের একজন অনুপযুক্ত ব্যক্তি।

চন্দ্রকুমার ঠাকুর বলেন যে তথ্যপ্রমাণ যা পাওয়া গেছে তা থেকে এমন সিদ্ধান্ত করতে তিনি নারাজ যে ডিরোজিও একজন অযোগ্য শিক্ষক।

উইলসন বলেন যে ডিরোজিওর শিক্ষার কোন কুফলের প্রমাণ তিনি পান নি এবং তাঁকে একজন সুযোগ্য শিক্ষক বলেই তিনি মনে করেন।

রসময় দত্ত বলেন যে রিপোর্টে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়া ডিরোজিওর বিরুদ্ধে আর-কিছু তিনি জানেন না বা শোনেন নি।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণের অভাবে ডিরোজিওর চরিত্র বা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ স্বীকার করতে রাজী নন বলে মত প্রকাশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পরিষ্কার জবাব দিয়ে দেন যে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা, কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়।

ডেভিড হেয়ার বলেন যে ডিরোজিওর মতন সুযোগ্য শিক্ষক দুর্লভ এবং তাঁর শিক্ষায় সুফল ফলেছে বলে তাঁর বিশ্বাস।

রাধাকান্ত দেব বলেন যে ডিরোজিওকে তিনি একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন অযোগ্য শিক্ষক বলে মনে করেন, তাঁর উপর তরুণদের শিক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ডিরোজিও যে একজন অযোগ্য ব্যক্তি সে সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে।

রামকমল সেন রাধাকান্ত দেবের মতামত সমর্থন করে ডিরোজিওর অযোগ্যতার কথা ব্যক্ত করেন।

ন'জনের মধ্যে ছ'জন ডিরোজিওর পক্ষে এবং তিনজন বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। যে-ভাবে প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয়েছিল তা ভোটে বাতিল হয়ে গেল দেখে ডিরোজিও-বিমুখ সদস্যরা প্রস্তাবটি ঘুরিয়ে অন্যভাবে আবার পেশ করেন। এবারে তাঁদের প্রস্তাব হল :

> Whether it was expedient in the present state of public feeling amongst the Hindoo Community of Calcutta to dismiss Mr. Derozio from the College.

প্রস্তাবটি ভুমুখো করাতের মতন, যেদিক দিয়েই পাস হোক না কেন, এবারে ডিরোজিও কাটা পড়তে বাধ্য। যোগ্যতা-অযোগ্যতা, শিক্ষার সুফল-কুফল ইত্যাদি প্রশ্ন চাপা দিয়ে একটা গোটা সম্প্রদায়ের আত্মাভিমানের সমস্যাটি বড় করে তুলে ধরা হল সভার সামনে। ডিরোজিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি সত্য না-ও হয় তাতে কি যায় আসে! সত্য হোক, মিথ্যা হোক, কলকাতার হিন্দুসমাজের বদ্ধমূল ধারণা, তিনিই সমস্ত অনর্থের মূল এবং তরুণদের অনাচার-ব্যভিচারের প্রধান উৎসাহদাতা। সমগ্র হিন্দুসমাজের এই ক্ষুব্ধ ব্যথিত ও অপমানিত অভিমানের দিকে চেয়ে ডিরোজিওর পদচ্যুতি 'expedient' বা সমীচীন কি না বিচার করে দেখা উচিত।

এইভাবে যখন প্রস্তাবটি উঠল তখন বাঙালী কর্মাধ্যক্ষদের মধ্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ছাড়া বাকি সকলে তা সমর্থন করেন। কেউ বলেন 'পদচ্যুতি প্রয়োজন', কেউ বলেন 'অবস্থাগতিকে পদচ্যুতি মন্দের ভাল' মাত্র। বিদেশী ইংরেজ বলে উইলসন ও হেয়ার সাহেব হিন্দু সমাজের ক্ষোভ প্রসঙ্গে কোন মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন। প্রস্তাব গৃহীত হয় এই মর্মে—"Resolved that the measure of Mr. Derozio's removal be carried into effect with due consideration for his merits and services." কলেজের কর্মাধ্যক্ষরা ডিরোজিওকে সরাসরি পদচ্যুত করেন নি।

একখানি চিঠিতে উইলসন সাহেব ডিরোজিওকে সভার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। তাতে তিনি ডিরোজিওকে অনুরোধ করেন, স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার জন্য। পদত্যাগপত্রসহ ডিরোজিও পত্রোত্তরে উইলসনকে লেখেন :

> মহাশয়,—পদত্যাগপত্র এই সঙ্গে আপনার কথা মতন পাঠালাম। পত্রখানি পড়লেই দেখতে পাবেন, 'স্বেচ্ছায় পদত্যাগ' সম্বন্ধে আপনার যে অনুরোধ তা আমি গ্রহণ করতে পারি নি। আমার শিক্ষকতাকালে কলেজের কোন অনিষ্ট হয়েছে বলে যদি আমি মনে করতাম, অথবা তার সপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ থাকত, তা হলে আমার দিক থেকে বিনা প্রতিবাদে পদত্যাগ করার যুক্তি আমি মেনে নিতাম। কিন্তু এতখানি স্বার্থত্যাগ করে একটা সাময়িক আঘাত সহ্য করার কি কোন আবশ্যকতা আছে? আমার তো মনে হয় নেই, তাই আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছি না যে আমাকে আপনারা পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন। নির্বিবাদে পদত্যাগপত্র পাঠানো এই কারণে অসম্ভব মনে হল। আমি জানি আপনি মহানুভব ব্যক্তি, আমার সম্মান রক্ষার জন্য এই অনুরোধ করেছেন। কিন্তু কেবল সান্ত্বনায় কি আহতের বেদনার উপশম হয়? প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যদি পদচ্যুত করে আমাকে অপমানিত করাই সাব্যস্ত করেন, তা হলে আমারও সে-অপমান সহ্য করার মতন শক্তি থাকা কাম্য।
>
> কলেজের কয়েকজন হিন্দু কর্মাধ্যক্ষ আমার বিরুদ্ধে যে অসংযত ক্রোধ প্রকাশ করেছেন তা সহজে শান্ত হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং আবার কলেজে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করার কোন সম্ভাবনা দেখি না। তা ছাড়া, কর্মজীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এমন একদিকে চলে যেতে পারি যে হয়তো আর জীবনে

আপনার সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পাব না। আজকে তাই এই সুযোগে আপনার কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। কলেজে কাজ করার সময় আপনার কাছ থেকে যে সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছি তা কোনদিন ভুলব না।… ইতি

এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও

ডিরোজিও এই চিঠির সঙ্গে যে পদত্যাগপত্রটি পাঠিয়েছিলেন তার মর্ম এই :

ম্যানেজিং কমিটি, হিন্দুকলেজ

ভদ্রমহোদয়গণ,—গত শনিবারের জরুরী সভায় আপনারা কলেজের সঙ্গে আমার সম্পর্কচ্ছেদ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন জেনে আমি পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি, কেবল আপনারা আমাকে পদচ্যুত করে অপমানিত না করেন এই আশংকায়।

সভার কার্যবিবরণের মধ্যে স্থান পায় নি এরকম কয়েকটি বিষয়ের প্রতি প্রসঙ্গতঃ এখানে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমতঃ আমার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আপনারা চেষ্টা করেও প্রমাণ করতে পারেন নি। আর যদি অভিযোগ করেও থাকেন, আমি তা এখনও জানি না, এবং আমাকে জানানোর প্রয়োজনও আপনারা বোধ করেন নি। যাঁরা অভিযোগ করেছেন তাঁদের সামনে উপস্থিত হয়ে আমার জবাব দেবার ন্যায্য অধিকার থেকেও আমাকে বঞ্চিত করেছেন। আমার ব্যক্তিগত চরিত্র, মতামত ইত্যাদির আলোচনা-সমালোচনা করেছেন আপনারা আমাকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে। এ কথাও আমি জানি যে কমিটির অধিকাংশ সদস্য আমার বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অপবাদ স্বীকার না করা সত্ত্বেও আপনারা আমাকে কলেজের শিক্ষক-পদ থেকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অপরাধী যে তাকে জেরা করা হল না, সে জানল না তার অপরাধ কি, অথচ তার বিচার ও দণ্ডদান দুই-ই শেষ হয়ে গেল। আশা করি এগুলি সত্য বলে স্বীকার করবেন। তা হলেই হবে, আমি কোন মন্তব্য করব না।

পদত্যাগপত্রের শেষে উইলসন, ডেভিড হেয়ার ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহকে ডিরোজিও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁদের সৎসাহসের জন্য।

ডিরোজিওর চিঠির উত্তরে উইলসন পরে যে চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির নির্দিষ্ট আভাস পাওয়া যায়। উইলসন লেখেন :

প্রিয় ডিরোজিও,

মনে হয় আপনার কথাই ঠিক, কিন্তু তবু কলেজের হিন্দু ম্যানেজারদের সম্পর্কে অতটা রূঢ় মন্তব্য না করলেই ভাল হত। বাস্তবিক তাঁদের খুব দোষ নেই, কারণ সমাজের দাবির কাছে তাঁরা খানিকটা অবস্থাগতিকে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হয়েছেন। তদন্ত বা বিচারের সুযোগ তাঁরা পান নি। আপনার নিন্দাবাদ বা বিরূপ সমালোচনা তেমন কিছু করা হয় নি। কলকাতার লোকের, বিশেষ করে হিন্দুদের, একটা ধারণা হয়েছে আপনার সম্বন্ধে, যেটা কলেজের পক্ষে ক্ষতিকর। সেটা সত্যি না মিথ্যে তা নিয়ে তথ্যপ্রমাণ ঘেঁটে অথবা সাক্ষীসাবুদ ডেকে কোন লাভ হত না। এখনও অন্ততঃ ঘরোয়াভাবে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বলে আমার ধারণা। কিছুদিন তা হবেই।

আপনার বিরুদ্ধে তিনটি গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। সেগুলি কি, ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে আমি জানাচ্ছি প্রশ্নাকারে। প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এমন কোন কথা নেই, যদি দরকার মনে করেন দেবেন।

আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?

আপনি কি মনে করেন যে বাপ-মা'র আদেশ মান্য করা অথবা তাঁদের শ্রদ্ধাভক্তি করা নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়?

আপনার মতে ভাই-বোনের বিবাহ কি দোষের নয়? এইসব বিষয়ে কি কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে আপনি আলোচনা করেছেন?

আমি জানি, আমার কোন অধিকার নেই এসব কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করার। তবু আপনার বিরুদ্ধে হিন্দুদের অভিযোগ কি এবং গুজব কি রটেছে, সেই কথা জানাবার জন্য লিখলাম। এ অভিযোগ যে ভিত্তিহীন, সে কথা সাহস করে বলতে পারলে আমি নিজে খুবই সুখী হতাম, অথবা আপনার যুক্তিপূর্ণ কোন জবাব পেলে আমি কর্মাধ্যক্ষদের দেখিয়ে স্বস্তি পেতাম। নিবেদন ইতি

এইচ. এইচ. উইলসন

লসনের চিঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন ডিরোজিও, সেটি র জীবনের মহার্ঘ্য দলিলরূপে গণ্য হবার যোগ্য। া চিঠি, কিন্তু তার দলিলমূল্যের জন্য অবিকল উদ্ধৃতির বি রাখে।

এইচ. এইচ. উইলসন মহাশয় সমীপে

প্রিয় মহাশয়,

গতকাল সন্ধ্যায় আপনার চিঠি পেয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অন্য জরুরী কাজের জন্য তা দিতে পারি নি বলে মার্জনা করবেন। এখনও পর্যন্ত আমার ব্যাপারে আপনার একটা আগ্রহ আছে দেখে সত্যিই আমি কৃতার্থ বোধ করছি। যে কয়েকটি প্রশ্ন আপনি আমাকে করেছেন তা আমার ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকে এত গুরুত্বপূর্ণ যে উত্তর একটু দীর্ঘ হবে এবং আপনাকে সেটা কষ্ট করে পড়তে হবে ভেবে লজ্জিত হচ্ছি। তবু আপনার মতন একজন স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কাছে এরকম একটি দীর্ঘ চিঠিতে অনেক গুরুবিষয় সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের সুযোগ যে আপনি দিয়েছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর। কারও কাছে এমন কথা আমি কোনদিন বলি নি যে ঈশ্বর নেই। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্বন্ধে মুক্ত মনে আলোচনা করা যদি অপরাধ হয়, তা হলে আমি অপরাধী স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই আমার। এ বিষয়ে নানা মুনির বা দার্শনিকের নানা মত আছে, আমি সেই মতামতগুলি নিয়ে খোলা মনে ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। যাঁরা আস্তিক তাঁদের কথা বলেছি, যাঁরা নাস্তিক তাঁদের কথাও বলেছি, আর যাঁরা অস্তিনাস্তি প্রশ্নই উত্থাপন করতে চান না তাঁদেরও বাদ দিই নি। আমি জানি না, এরকম একটি গুরুবিষয় নিয়ে এইভাবে আলোচনা করার মধ্যে অন্যায় কোথায়! এক পক্ষের কথা অন্ধের মতন বিশ্বাস করব, অন্য পক্ষের যুক্তি শুনব না বা বিবেচনা করব না, এইটাই কি কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা? কি করে তা হলে জ্ঞান পরিপূর্ণ হবে? আর বিশ্বাস যাই হোক, তার ভিতই বা দৃঢ় হবে কি করে, যদি না প্রতিপক্ষের মতামত সম্বন্ধে অবহিত থাকা হয় এবং তার যুক্তি খণ্ডন করার মতন ক্ষমতা থাকে। এদেশের একদল তরুণের শিক্ষার খানিকটা দায়িত্ব কিছুদিনের জন্য আমাকে দেওয়া হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, তাদের একদল গোঁড়া আপ্তবাদী না তৈরি করে সত্যিকার সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ তৈরি করব। তাই সকল বিষয়ে সর্বপ্রকারের মতামত নিয়ে অবাধে আলোচনা করতে আমি তাদের উৎসাহ দিতাম। আমার বিশ্বাস, তা না করলে কোন মানুষেরই অব্যক্ত প্রতিভা ও মানসিক শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না। আমার অনুসৃত পন্থার সমর্থনে লর্ড বেকনের এই উক্তিটি উদ্ধৃত করছি: 'If a man will begin with certainties, he shall end in doubts.' কিন্তু তাতেও দেখলাম যে এক সংশয় থেকে অন্য এক নতুন সংশয় জাগবে মনে, এবং অবশেষে সংশয়াকুল চিত্তের দোলায়মানতা আর শেষ হবে না কোনদিন। সেইজন্য আমি কলেজের ছাত্রদের দার্শনিক হিউমের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, কারণ হিউম অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও ধারাল যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে খণ্ডন করেছেন। কেবল তাই করেই আমি ক্ষান্ত

হই নি। ডক্টর রীড ও স্টুয়ার্টের প্রতিযুক্তি ও উত্তরও (হিউমের) তাদের পড়িয়েছি। হিউমের যুক্তির এত জোরালো প্রতিবাদ আজ পর্যন্ত আর কেউ করতে পারেন নি এবং 'this is the head and front of my offending.' ধর্মবিষয়ে ছাত্রদের জন্মগত ধারণার মূল পর্যন্ত যদি আমার এই শিক্ষার ফলে নড়ে গিয়ে থাকে তা হলে তার জন্য কি আমি দোষী? তাদের মনে কোন বিশেষ বিশ্বাস সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না এবং ক্ষমতাধীনও ছিল না। সুতরাং এই শিক্ষার ফলে কেউ যদি নাস্তিক হয়ে থাকে তা হলে তার জন্য নিন্দাবাদ যেমন আমার প্রাপ্য, তেমনি আস্তিক হয়েছে যারা তাদের জন্য সাধুবাদও নিশ্চয় আমি দাবি করতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের জ্ঞানের সীমা ও মতামতের পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে আমি নিজে এত বেশী সজাগ যে কোন ক্ষুদ্রতম বিষয় সম্বন্ধেও আমি সহজে একটি নির্দিষ্ট মত প্রকাশ করি না। অনুসন্ধানের অনন্ত সমুদ্রে দুর্জ্ঞেয়-সত্যের দ্বীপে যাত্রা করাই জ্ঞানান্বেষণের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে আমার ধারণা। আমার নিজের মনের গড়নও তাই। প্রশ্নহীন সংশয়হীন মন যত শীঘ্র জড়ত্বের জালে জড়িয়ে পড়ে মানসিক অপমৃত্যু ঘটায়, প্রশ্নকাতর সংশয়াতুর মন তত সহজে মানুষকে সন্দেহবাদী বা নাস্তিবাদী করে তোলে না। এটা নয়, ওইটা সত্য, অথবা আমার যা বিশ্বাস সেটাই একমাত্র ধ্রুব সত্য, এমন কথা হলফ করে কোন প্রকৃত সত্যসন্ধানী বা জ্ঞান-তপস্বী কখনই বলবেন না।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা ও তাঁদের আদেশ পালন করা আমি নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি কিনা? বিশ্বাস করুন, আপনার এই প্রশ্নে আমি হতবাক হয়ে গেছি। জীবনে কোনদিন কেউ আমাকে এই ধরনের একটা জঘন্য কদর্য ও অস্বাভাবিক প্রশ্ন যে করবেন, স্বপ্নেও আমি তা ভাবতে পারি নি। আমি পিতামাতাকে শ্রদ্ধেয় মনে করি না, অথবা তাঁদের আদেশ অমান্য করা অন্যায় ভাবি না, আমার বিরুদ্ধে এতদূর হীন অপপ্রচারে যাঁরা আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন তাঁদের শুধু ঘৃণ্য মনে করেও আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। আপনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, এ বিষয়ে আপনাকে কি বলব বুঝতে পারছি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে আমি যদি পিতৃহীন না হতাম তা হলে আমার পিতাই নিশ্চয় এই অপপ্রচারের উচিত জবাব দিতেন। এই বলে জবাব দিতেন যে যাঁরা আমার বিরুদ্ধে এই কুৎসিত অভিযোগ করেছেন, অথবা অন্য যাঁরা এদিক থেকে নিজেদের মহাত্মা বলে মনে করেন, তাঁদের কারও চেয়ে আমি কম পিতৃমাতৃভক্ত নই। খোঁজ করলে দেখা যাবে তাঁদের অনেকের চেয়ে হয়তো পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য জীবনে আমি অনেক বেশী পালন করেছি। সুতরাং আমি আমার ছাত্রদের যে এরকম শিক্ষা দিতে পারি না তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। বরং উলটোটাই আমি করেছি। ছাত্রদের মধ্যে যখনই এই ধরনের কোন মনোভাবের আভাস পেয়েছি, তখনই তাদের রীতিমত ধমক দিয়ে পিতামাতার বাধ্য হতে বলেছি। তবে সমাজে পিতামাতার অনেক তথাকথিত বাধ্য সন্তানকে দেখেছি কুলাঙ্গারে পরিণত হতে, তাই মধ্যে মধ্যে তাদের সাবধান করে দিয়েছি যে পিতামাতার প্রতি বাধ্যতার মুখোশ পরে অমানুষ হওয়ার চেয়ে কিছুটা অবাধ্য অশান্ত হয়েও মানুষ হওয়া শ্রেয়। তা হলেও পিতামাতার প্রতি ছেলেদের ব্যবহার সম্বন্ধে আমি যে কতখানি সজাগ ছিলাম তার দুটি দৃষ্টান্ত আপনার কাছে উল্লেখ করছি। যে দুজন সম্বন্ধে বলছি তারা কলকাতাতেই থাকে, যে-কোন সময় তাদের ডেকেও আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। মাস দু-তিন আগে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (সম্প্রতি তাকে নিয়ে শহরে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল) আমাকে জানায় যে বাড়িতে পিতার নিষ্ঠুর আচরণ তার পক্ষে

অসহ্য হয়ে উঠেছে। বাড়ি না ছাড়লে তার উপায় নেই। আমি যদিও ঘটনাটা সত্যি বলে জানতাম, তা হলেও তাকে বাড়ি ছাড়তে নিষেধ করে বুঝিয়ে বললাম, 'অত অধৈর্য হলে চলে না, বাপ-মায়ের আচরণ অপ্রীতিকর হলেও তা সহ্য করতে হয়। বাড়ি থেকে তাঁরা যদি তোমাকে তাড়িয়ে না দেন, তা হলে নিজে তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে না।' আমার কথা শুনে দক্ষিণা বাড়িতেই রইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েকদিনের জন্য। দু-তিন সপ্তাহ আগে আমাকে না জানিয়ে সে পিতৃগৃহ ছেড়ে আমার বাড়ির কাছে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে এসেছে। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করার পর আমাকে অবশ্য সে তার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল। আমি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে না জানিয়ে তুমি বাড়ি বদল করলে কেন?' তখন সে উত্তর দিল, 'আপনি তো তা হলে কিছুতেই আমাকে বাড়ি ছাড়তে দিতেন না।' এই গেল দক্ষিণারঞ্জনের কথা। মহেশচন্দ্র সিংহ নামে আর একটি ছেলে তার পিতা ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করে, খুড়ো উমাচরণ বসু ও ভাই নন্দলাল সিংহকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়িতে দেখা করতে আসে। আমি তার অশোভন আচরণের জন্য প্রচণ্ড ধমক দিই এবং জানাই যে পিতার কাছে অনুতপ্ত হয়ে সে যদি ক্ষমা না চায় তা হলে তার সঙ্গে আর কোনদিন আমি কথা বলব না, কোন সম্পর্ক রাখব না। এ রকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি, কিন্তু করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

"ভাই-বোনের বিবাহে কোন দোষ নেই বলে কি আপনি মনে করেন?" এই হল আপনার তৃতীয় প্রশ্ন। এ প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর হল, 'না, আমি কখনও তা মনে করি না।' এরকম আজগুবী বিষয় নিয়ে আমি কোনদিন ছাত্রদের কাছে কিছু বলি নি। একটা কথা ভেবে আমি সত্যিই খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি যে এই ধরনের বিচিত্র সব অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে কার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে আবিষ্কৃত হল! আমার সঙ্গে নানাবিষয়ে যাঁরা আলাপ-আলোচনা করেছেন তাঁরা এরকম মিথ্যা রটাবেন বলে আমার মনে হয় না। অন্ততঃ আমার ছাত্রদের মধ্যে এমন মূর্খ কেউ থাকতে পারে যে ভুল বুঝে এইসব রটিয়েছে, অথবা এমন ধূর্ত কেউ থাকতে পারে যে ইচ্ছে করে আমার মতামত বিকৃত করেছে, এ কথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না। আমার মনে হয় একদল দুর্বল চরিত্রহীন লোক, মিথ্যা গুজব ও আতঙ্কই যাদের উপজীব্য, আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপপ্রচারে মত্ত হয়ে উঠেছে। ধর্মবিষয়ে কেউ স্বাধীন চিন্তা করলে তাকে নাস্তিক ও নরাধম বলতে পারে সমাজের লোক, একথা মানি ও বুঝি। কিন্তু অন্যান্য যে-সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন সেগুলি যে এইভাবে কোন সভ্যসমাজে কোন সভ্যমানুষের চরিত্রকে কলঙ্কিত করার জন্য উদ্ভাবিত হতে পারে, তা আপনার চিঠি না পেলে আমার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব হত না। এখন আপনার সহৃদয়তার মুখাপেক্ষী হয়ে বলছি, আপনি নির্ভয়ে এইসব গুজব একেবারে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে ঘোষণা করবেন। গুজব-রটনাকারীদের একথাও বলবেন, 'I am not a greater monster than most people.'

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি জানি, একদল লোক অসীম উৎসাহে আমার সম্বন্ধে নানারকমের গালগল্প করতে আরম্ভ করেছেন। কেবল ব্যক্তিগত-ভাবে আমার সম্বন্ধে নয়, আমার পরিবার সম্বন্ধেও তাদের কুৎসিত কল্পনা ডানা মেলতে শুরু করেছে। একটি গল্প হল, আমার বোনের সঙ্গে (কেউ বলেছেন আমার মেয়ের সঙ্গে, যদিও আমার কোন মেয়ে নেই) একজন হিন্দু যুবকের নাকি শীঘ্রই বিবাহ হবে। খবর নিয়ে জেনেছি, বৃন্দাবন ঘোষাল নামে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই গল্পটি বেশ শ্রুতিরোচক করে সর্বত্র প্রচার করছে। এই গরীব ব্রাহ্মণটির পেশা

হল, প্রতিদিন সকালে উঠে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শহরের সব আজগুবী খবর জানানো এবং রসিয়ে রসিয়ে তাই নিয়ে আলোচনা করা। এই ঘোষালের মতন কিছু পেশাদার গুজব-রসিক চেষ্টা করলে রাতারাতি শিবকেও বাঁদর বানিয়ে ফেলতে পারেন। যাই হোক, এ সম্বন্ধে আর কিছু বলব না, কারণ অপবাদ বা গুজব কোনদিনই স্থায়ী হয় না, অবৈধ উৎপত্তির মতন তার দ্রুত অপমৃত্যুও নিশ্চিত।

আপনার প্রশ্নের উত্তর এইখানেই শেষ করলাম। এখন সবিনয়ে আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি কি? মিথ্যা জনরবের ভয়ে, অথবা কুৎসা-প্রচারকদের তোষণের জন্য, আমাকে কলেজ থেকে কর্মচ্যুত করা কি আপনাদের মতন বিচক্ষণ ব্যক্তিদের পক্ষে সঙ্গত হয়েছে? এ কথা ঠিক যে আপনাদের সভার কার্যবিবরণের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয় নি। কিন্তু একজনের বিরুদ্ধে যখন মিথ্যা জনরব রটে তখন তারই ভিত্তিতে যদি তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়, তা হলে সেটা মিথ্যাকেই সমর্থন করা হয় না কি? কেবল জনরব শান্ত করার জন্য কলেজের ম্যানেজাররা আমাকে কর্মচ্যুত করা সাব্যস্ত করেছেন, এ কথা মেনে নিতে আমি রাজি নই। আগে থেকেই তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন আমাকে তাড়াবার জন্য। অন্ধ ধর্মগোঁড়ামিই আমার প্রতি তাঁদের বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছে। আমার তাই দৃঢ়বিশ্বাস বলে আপনাকে জানালাম, কিছু মনে করবেন না। তা যদি না হত তা হলে এরকম অভিনব কৌশলে, সমস্ত সৌজন্য ও শালীনতাবোধ বিসর্জন দিয়ে, এইভাবে তাঁরা আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতেন না। তাঁদের এই ব্যবহারের কথা যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই গভীর বেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই অবিচারের প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না, কারণ প্রতিবাদ করলে তাঁদের মতামতের মর্যাদা দেওয়া হবে। সেটুকু মর্যাদাও তাঁদের প্রাপ্য বলে আমি মনে করি না।

দীর্ঘ চিঠির জন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, এবং আমার জন্য যে ঝক্কাট আপনি সহ্য করেছেন সেজন্য আবার আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। ইতি,

আপনার একান্ত অনুগত

এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও

কেবল চিঠিখানারই যে এখানে শেষ হল তা নয়, ডিরোজিওর জীবন-কাহিনীরও প্রায় শেষ হয়ে গেল। চিঠির তারিখ ২৫ এপ্রিল ১৮৩১, ডিরোজিওর মৃত্যুর দিন ২৩ ডিসেম্বর ১৮৩১। উইলসন সাহেবকে ডিরোজিও লিখেছিলেন, শিক্ষকের কাজই যে ভবিষ্যতে করবেন তিনি তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বিচিত্র কর্মস্রোতে ভাসতে ভাসতে জীবনের নোঙরহীন তরী কোথায় কোন্ বন্দরে ভিড়বে তা তিনি জানেন না। মনে হয়, শিক্ষকের কাজ আর তাঁর করার ইচ্ছা ছিল না, কবি ও সাংবাদিকের স্বাধীন জীবন কাটানোরই বাসনা ছিল। সে বাসনা পূর্ণ হল না কয়েক মাসের মধ্যে, কিন্তু তার প্রকাশ হয়েছিল তাঁর একান্ত বাঞ্ছিত কর্মে।

চিঠিখানা নিঃসন্দেহে ডিরোজিওর নিজের জীবনের জবানবন্দি। সওয়াল-জবাবের মতন করে এর মধ্যে তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শ ও জীবনদর্শন দুইই ব্যক্ত করেছেন। ১৮২৭ সনে রচিত তাঁর কবিতার এই দুটি লাইন ১৮৩১-এর ২৫ এপ্রিলের পরে রচনা করলে হয়তো সময়োপযোগী হত—

My sceptre from my hand is riven,
Save Honour, all is lost!

সত্যিই কলেজ ছাড়ার পর তিনি যেন সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন, সম্মান ছাড়া আর কিছুই তাঁর সম্বল ছিল না। কিসের সম্মান? তাঁর মতন আত্মাভিমানী তরুণের আত্মসম্মানই বড় সম্পদ, কিন্তু সামাজিক সম্মানও কম কাম্য নয়। আত্মসম্মানের ঔজ্জ্বল্য অভিমানের উত্তাপে

হয়তো আরও তীব্র রূপ ধরেছিল, কিন্তু সামাজিক সম্মান যে তাঁর অন্ততঃ সাময়িকভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর পরমায়ুর দিক থেকে এই সাময়িক ক্ষতিই চূড়ান্ত ক্ষতি বলে আগোপান্ত ঘটনাটা এত বেশী মর্মান্তিক। অথচ মাত্র আট মাসের জন্য হলেও কিসের জন্য তাঁকে এই দুঃসহ অপমান ও কলঙ্কের বোঝা বহন করতে হল? দৈত্যাকার মিথ্যার প্রেতনৃত্যের দাপটে একজন তরুণ শিক্ষকের জীবন পদদলিত হল কেন?

সমাজের নিষ্ঠুর নীতির জন্য। এই নিষ্ঠুরতা বহুকাল ধরে চলে আসছে সমাজে, স্থিতস্বার্থের চক্রান্তে। কেবল রাজনীতির স্বার্থ নয়, অর্থের স্বার্থ নয়, ধর্মের স্বার্থ, শাস্ত্রের স্বার্থ, প্রথা-সংস্কারের স্বার্থ। সাধারণ মানুষকে অজ্ঞতার নিবিড় অন্ধকারে নির্বাসিত করে, মুষ্টিমেয় একদল মানুষ চিরকাল ঈশ্বরের পৌরোহিত্য, পরকালের দৌত্য এবং সমাজের নেতৃত্বের একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করেছে। যখনই কেউ এই সত্যের সঙ্গে মানুষের মুখোমুখি পরিচয় ঘটাতে চেয়েছে, তখনই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তার জীবনে ও সমাজে। বিজ্ঞানের অগ্রদূতকে পিশাচ বলে অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে, স্বাধীনতার সৈনিককে বলা হয়েছে ধ্বংসকামী দানব, সত্যের পূজারীকে বলা হয়েছে প্রতারক, জ্ঞানের সাধককে বলা হয়েছে ভণ্ড তপস্বী। এই কারণে আমাদের দেশে নবযুগের প্রবর্তক রামমোহন অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন, সমাজ-জীবনে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করেছেন, এবং ঘটনাচক্রে বিদেশে তাঁর মৃত্যু না হলে শেষ পর্যন্ত তাকে দেশত্যাগীও হতে হত। ডিরোজিও একই কারণে কলঙ্কিত হয়েছেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে ডিরোজিও সমাজেরও শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন। তরুণ ছাত্রদের তিনি কেবল হিন্দু-কলেজের ছাত্র মনে করেন নি, নবযুগের বাংলার ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়ন্তাও মনে করেছিলেন। অসংখ্য চাকরের মতন তিনি যদি নিশ্চিন্তে চাকরি করে যেতেন, তা হলে চক্রবৎ রুটিনের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে জীবনটা তাঁর আরও দশজনের মতন কেটে যেত, এবং ইক্ষুদণ্ডের মতন পিষ্ট হয়ে রসও তার নিঙড়ে পড়ত মাটিতে। দুঃখের বিষয় সে-পথ তিনি বেছে নেন নি। নবীন বাংলার তরুণ ছাত্রদের তিনি ক্ষুরধার যুক্তি ও শাণিত বুদ্ধির বলে বলীয়ান নির্ভীক সমাজ-সৈনিক তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এই তাঁর অপরাধ।

যে যুক্তি বিদ্যা ও বুদ্ধির জ্যোতিতে ডিরোজিও বাংলার তরুণদের জীবনের পথ আলোকিত করতে চেয়েছিলেন, তার বিকাশ হয় আঠার শতকে। মানব-সমাজে এক অত্যাশ্চর্য বুদ্ধিবিপ্লব ঘটে এবং অজ্ঞানতার সমুদ্রগর্ভ থেকে আলোকোজ্জ্বল যুক্তির উদ্ভব হয়। সতের শতকে বেকন (Bacon) ও লক (Locke) সংস্কার-শৃংখল থেকে মোহাচ্ছন্ন মানববুদ্ধির মুক্তির বাণী ঘোষণা করেন। আরিস্ততলের ন্যায়-অনুমানের পথ ছেড়ে বেকন গবেষণা-পরীক্ষার দ্বারা কার্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয় ও সত্যানুসন্ধানের নতুন পথনির্দেশ করে দেন। জনশ্রুতি, কুসংস্কার, আপ্তবাক্য প্রভৃতি নানারকমের অন্তরায় থাকে এই সত্যের পথে। সেগুলি দূর না করতে পারলে সত্যের আলোক আলেয়ায় পরিণত হয়। লক বলেন যে প্রাচীন দার্শনিকদের মতামত অধিকাংশই অর্থহীন বাক্য ছাড়া কিছু নয়। মানসপ্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অতীত কিছু আমাদের জানবার উপায় নেই। আঠার শতকে বেকন ও লক প্রদর্শিত যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তা আরও কয়েকজন মনীষী ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন, তাঁদের বলা হয় একেশ্বরবাদী বা ডীয়িস্ট (Deist)। এঁরা ছাড়া, ফ্রান্সের এন্‌সাইক্লোপিডিস্টরাও যুক্তিবাদের পথে দুর্দান্ত অভিযান শুরু করলেন। তাঁদের প্রধান সমালোচনার পাত্র হলেন রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা। এঁদের মধ্যে স্বনামধন্য হলেন ভল্টেয়ার, দিদেরো, হেলভিটিয়াস, দা'লেমবের, হলব্যাখ, কণ্ডোর্সে, রুশো ও ভল্‌নি। কেউ ছিলেন নাস্তিক জড়বাদী, কেউ ঘোর সংশয়বাদী এবং

কেউ বা অদ্বৈতবাদী। ভল্টেয়ার, রুশো ও ভল্নি ছিলেন একেশ্বরবাদী। হলব্যাখ, হেলভিটিয়াস, লা মেত্রি ও দিদেরো ছিলেন নাস্তিক। এঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব, এবং পাপ-পুণ্যের পারলৌকিক দণ্ড-পুরস্কারে বিশ্বাস করতেন না। দার্শনিক ডেভিড হিউম ছিলেন সংশয়বাদী, অলৌকিক ক্রিয়ায় (miracles) তাঁর আস্থা ছিল না। স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তিনি ধর্মের উৎপত্তি ও ইতিহাস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠান ও নানা মতকে হিউম চতুর যাজক-পুরোহিতদের স্বার্থজনিত সৃষ্টি বলে প্রচার করেন। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্ত্য সমাজে এই বৈপ্লবিক চিন্তালোড়ন চলতে থাকে। নবযুগের বাংলার নতুন বিদ্যামন্দিরে, বিশেষ করে কলকাতা শহরের হিন্দুকলেজে, এই নব্যচিন্তার বার্তা স্বাভাবিকভাবেই পৌঁছয়। প্রতিষ্ঠাতাদের মতে হিন্দুকলেজ ছিল "the main channel by which real knowledge may be transferred from its European sources into the intellect of Hindusthan." কলেজ প্রতিষ্ঠার এই উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখলে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। কলেজের অধ্যাপক শিক্ষকদের মধ্যে ডক্টর টাইট্‌লার ও ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন প্রমুখ দু-চারজন সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানে পণ্ডিত ইংরেজও ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের ভগীরথ তাঁদেরই হওয়া হয়তো উচিত ছিল। তাঁরা যে একেবারেই তা হন নি তা নয়। কিন্তু ডিরোজিওর মতন শাঁখ বাজিয়ে এদেশের সমাজকে কেউ কাঁপিয়ে তুলতে পারেন নি। তার উপর ডিরোজিওকে নিশ্চয় বিদেশী ইংরেজ বলা যায় না, পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি হলেও ভারতীয়ই তাঁকে বলতে হয়। এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে ভারতীয় ডিরোজিও, তাঁর পূর্বসূরী রামমোহনের মতন, নবযুগের ইউরোপীয় আদর্শের প্রবাহকে বাংলার তথা ভারতের জীবনগঙ্গার সঙ্গে মিলিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

হিন্দুকলেজের আগে, ড্রামণ্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে এদেশী ও বিদেশী ছাত্ররা একসঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা করত। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মিলনক্ষেত্র একজন স্কচ শিক্ষক আগেই ধর্মতলাতে রচনা করেছিলেন। হিন্দুকলেজের মতন তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল না বটে, কিন্তু এদেশে ইউরোপীয় জ্ঞানবিদ্যার 'channel' হিসেবে তার গুরুত্বও কম ছিল না। ধর্মতলার প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের এই ক্ষুদ্র মিলনতীর্থে ডিরোজিও শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষক ডেভিড ড্রামণ্ড শুধু যে স্কটল্যাণ্ডের একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন তা নয়, ঘোর সংশয়বাদী ও যুক্তিবাদী স্কচ দার্শনিক ডেভিড হিউমের গোঁড়া ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। কুসংস্কার ও ধোঁয়াটে আধ্যাত্মিকতাকে তিনি ঘৃণা করতেন এবং জীবনটাকে মনে করতেন জ্যামিতির মতন প্রমাণসাপেক্ষ ব্যাপার। সম্যক্ বিষয়জ্ঞানকে তিনি ঈশ্বর বলতেন এবং বন্ধনহীন বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিকে বলতেন নবযুগের যাজক। যা জ্ঞানাতীত ও যুক্তি-বহির্ভূত, তাঁর মতে তা মানুষের গ্রাহ্য হবার যোগ্য নয়। ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে নতুন যুগচিন্তার এই বীজ ড্রামণ্ড তাঁর ছাত্র ডিরোজিওর মনে বপন করেছিলেন। ডিরোজিওর মানস-জমিনে সেই বীজ অল্পদিনের মধ্যে সোনা ফলিয়েছিল। সেই সোনার ফসলের বীজ ডিরোজিও নিজে আবার হিন্দুকলেজে তাঁর ছাত্রদের মানসক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মাত্র দশ-বার বছর পরের কথা। তাঁর ফসলের ঐশ্বর্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল বাংলার কূপমণ্ডুক সমাজ। নব্যবঙ্গের তরুণদের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও শাণিত যুক্তির তরবারি যখন ধর্ম আচার-অনুষ্ঠান কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার আবরণ ছিন্ন করে জ্ঞানের আলোক বিকীরণের জন্য উদ্যত হয়ে উঠল, তখন সোরগোল পড়ে গেল রক্ষণশীল সমাজে। তাঁদের পাঁজর পর্যন্ত কেঁপে উঠল ভয়ে, রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ে নয়, চিন্তাবিপ্লবের ভয়ে। সমাজে যতরকমের বিপ্লব আছে তার মধ্যে চিন্তাবিপ্লবই সবচেয়ে ভয়াবহ। সেই চিন্তা-বিপ্লবের মারাত্মক লক্ষণ দেখে প্রবীণেরা ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁদের ধূমায়িত আক্রোশ বজ্রের মতন ফেটে

পড়ল তরুণদলের তরুণশিক্ষক ডিরোজিওর মাথার উপর।

বজ্রাহতের মতন ডিরোজিওর জীবন অচিরেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এত অভিশাপ ও দীর্ঘশ্বাসের আগুন বোধ হয় তাঁর সহ্য হল না। কয়েকমাসের মধ্যেই তাঁর জীবনলীলার অবসান হয়ে গেল।

কলেজের কর্তারা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণ করতে পারেন নি। শিক্ষক হিসেবে তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার কথাও প্রায় সকলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অবশ্য রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে অযোগ্য বলেছেন, কিন্তু সেটা সামাজিক কারণে। রাধাকান্ত দেব কলকাতার হিন্দুসমাজের নেতাস্বরূপ ছিলেন, সুতরাং হিন্দুদের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে, প্রতিকূল পরিবেশের কথা চিন্তা করে, তাঁর পক্ষে ডিরোজিওর কোন গুণের কথা উল্লেখ করা সম্ভব ছিল না। রামকমল ও রাধামাধব এসব বিষয়ে ছায়ার মতন তাঁর অনুগামী ছিলেন, তাই তাঁরা তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করেছিলেন মাত্র। সভায় প্রস্তাবের বয়ান বদলে ডিরোজিওর কর্মচ্যুতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল, এবং সেটাও 'with due consideration for his merits and services.'

এ কথা ইতিহাসের নথিপত্রে লেখা আছে, এবং লেখা থাকবেও চিরদিন যে, হিন্দুকলেজের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর জীবন (এবং ডিরোজিও বিদেশী নন, ভারতীয়) গোঁড়া হিন্দুসমাজের নেতারা কলকাতার হিন্দুদের 'present state of public feeling'-এর দোহাই দিয়ে নির্বিকারচিত্তে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

কলকাতার হিন্দুসমাজের 'বর্তমান মানসিক উত্তেজনার কাছে' একজন তরুণের সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ-জীবন এইভাবে নিঃসংকোচে বলিদান দেওয়া যুক্তিহীন ও হৃদয়হীন। কিন্তু যুক্তি ও হৃদয়ের দু-পায়ে ভর দিয়ে মানুষের সমাজ সবসময় এগিয়ে চলে না। তা যদি চলত তা হলে সমাজজীবনে যুগে যুগে সংকটের প্রলয়মেঘ ঘনিয়ে উঠত না। যুক্তি ও হৃদয়ের শক্তি যখন ক্ষয় হয়ে হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, তখনই সমাজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মতন ভেঙে পড়ে, তার আর চলার শক্তি থাকে না। বাংলার সমাজে এইরকম এক সংকটকালে ডিরোজিওর জীবন জনশ্রুতির পূজায় নিবেদন করেছিলেন হৃদয়হীনেরা, কারণ পঙ্গু সমাজের দেহে চলৎশক্তিসঞ্চারের স্বপ্ন দেখেছিলেন ডিরোজিও।

জনতার উত্তেজনা নয় শুধু, স্মৃতিশক্তিও ক্ষণস্থায়ী। হিন্দুকলেজ ও ডিরোজিওমুখী উত্তেজনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি বটে, কিন্তু ডিরোজিও ঝড়ের পর সূর্যোদয় দেখার জন্য দীর্ঘজীবীও হতে পারেন নি। তাঁর 'Morning after a Storm' কবিতার কথা মনে পড়ে—

I wandered forth, and saw great Nature's power.
The Hamlet was in desolation laid
By the strong spirits of the storm; there lay
Around me many a branch of giant trees,
Scattered as leaves are by the southern breeze
Upon a brook, on an autumnal day;
Cloud piled on cloud was there, and they did seem
Like the fantastic figures of a dream,
Till morning brighter grew, and then they rolled away.

ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের কেন্দ্র করে যে-ঝড় উঠেছিল সমাজে তা কালবৈশাখীর মতনই ভয়ংকর। সমাজের

অনেক প্রাচীন বট-অশ্বত্থের মূল পর্যন্ত নড়ে গিয়েছিল সেই ঝড়ে, দু-একটি উপড়েও যায় নি যে তা নয়। স্বপ্নপুরীর দৈত্যের মতন ঘনঘোর স্তূপে মেঘ জমেছিল সমাজের আকাশে। তারপর যখন উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের ভোরের সূর্যালোকে সেই মেঘ কেটে যেতে থাকল, তখন সে-দৃশ্য উপভোগ করার জন্য ডিরোজিও জীবিত ছিলেন না।

শিক্ষকতা ছেড়ে ডিরোজিও সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সাধনায় আত্মনিয়োগ করবেন স্থির করলেন। স্থির করেছিলেন মনে হয় তাঁর কাজকর্মের নতুন ধারা বিচার করে। বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্রদের বিদ্বৎসভার ভিতর দিয়ে জনসমাজে স্বাধীন সংস্কারমুক্ত ভাবধারা প্রচারের পথ যখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, তখন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে সেই পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। ছাপাখানা, বই ও সংবাদপত্র আধুনিক যুগে সামাজিক আন্দোলনের ও জনমত গঠনের শক্তিশালী হাতিয়ার। ডিরোজিও তা বিলক্ষণ জানতেন, তাই পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর স্বাধীন মতামত ও সামাজিক আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে তার পরেও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বা অনুরূপ কোন আলোচনা-সভার বৈঠক বসত কি না জানা যায় না। অন্ততঃ ডিরোজিওর ছাত্রদের সেরকম কোন সভা বসলে বাড়ির মালিক শ্রীকৃষ্ণ সিংহ খুশী হয়েই উৎসাহ দিতেন। কারণ ডিরোজিওর প্রতি সিংহ মহাশয়ের যে কত গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ও সহানুভূতি ছিল তা কলেজের পরিচালক-সভায় প্রকাশিত তাঁর নির্ভীক মতামত থেকে বোঝা যায়। তবে সভার বৈঠক বন্ধ হয়ে যাবারই সম্ভাবনা। বৈঠক বসলে মানিকতলার বাড়িতে হয়তো চড়াও হত ক্ষিপ্ত জনতা। নেতারা লেলিয়ে দিতেন।

পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত ডিরোজিও কেবল নিজে গ্রহণ করে চুপ করে থাকেন নি, তাঁর প্রিয় ছাত্রদেরও কয়েকজনকে তাই করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে অগ্রগণ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স তখন (১৮৩১ সনে) ১৮ বছর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বয়স ১৭ বছর, রামগোপাল ঘোষের বয়স ১৬ বছর, এবং গুরু ডিরোজিওর নিজের বয়স ২২ বছর। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বিতর্কসভায় তিনি তাঁর ছাত্রদের বাগ্মিতা-বিকাশে সাহায্য করেছেন। সভায় কৃষ্ণমোহন ছিলেন "the readiest and most effective speaker, unaffected in manner, calm, and unimpassioned, though sometimes bursting forth into vehemence," এবং যে রামগোপাল ঘোষ পরে তাঁর বাগ্মিতার জন্য 'বাংলার ডেমস্থেনীস' আখ্যা পেয়েছিলেন, অমৃতলাল বসু বলেছেন, "this debating club was to him what the Oxford Club had been to many an English orator." গুরুগম্ভীর জটিল বিষয়ের বিতর্কে ষোল-সতের-আঠার বছরের তরুণদের এই প্রতিভার বিকাশ সত্যিই বিস্ময়কর। বিতর্কসভায় বাগ্মিতার বদলে এবারে স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রতিভার পরীক্ষার সময় এল। সিংহাসনচ্যুত গুরুর কাছে শিষ্যবৃন্দ সমবেত হলেন উপদেশ ও উৎসাহের জন্য। সভাগৃহে বন্দী হয়ে আর বাক্‌যুদ্ধ করলে চলবে না, তরবারির চেয়েও হাজারগুণ শক্তিশালী লেখনী ধারণ করে প্রকাশ্য জনসমাজে মিথ্যার বিরুদ্ধে, ভণ্ডামি ও শঠতার বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতা ও আচার-গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, অজ্ঞানতা ও অশিক্ষা-কুশিক্ষার বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে সংগ্রাম করতে হবে।

আঠার বছরের যুবক কৃষ্ণমোহনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল ইংরেজী *The Enquirer* পত্রিকা মে মাসে (১৮৩১), অর্থাৎ ডিরোজিওর কলেজ ছাড়ার মাসখানেকের মধ্যে। জুন মাসের গোড়াতেই সতের বছরের তরুণ দক্ষিণারঞ্জনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল বাংলা 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা। ডিরোজিও নিজে তাঁর সমস্ত পুঁজিপাটা দিয়ে 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' নামে আর-একখানি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করলেন, ৯ নং কসাইতলা

১১নং বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট) থেকে। পত্রিকার নামকরণ থেকেই বোঝা গেল, কেবল এদেশের হিন্দুসমাজের সংস্কারের জন্য নয়, নিজের নির্যাতিত ও অবহেলিত ফিরিঙ্গি-সমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্যও তিনি বদ্ধপরিকর হলেন।,

'এন্‌কয়ারার' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তরুণ কৃষ্ণমোহন তাঁর লক্ষ্য ঘোষণা করে লিখলেন, "Having thus launched our bark under the denomination of *Enquirer*, we set sail in quest of truth and happiness." দক্ষিণারঞ্জনের বাংলা 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রচারিত হল সংস্কৃত শ্লোকে—

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞান তিমিরংহর।
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

মানুষের অজ্ঞানতার তিমির হরণ করে, দয়া ও সত্যকে সংস্থাপন করে, শঠতাকে সংহার করে জ্ঞানের বিকাশ হোক, এই হল পত্রিকার আদর্শ। বছর দুই পরে 'জ্ঞানান্বেষণ' ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষী পত্রিকায় পরিণত হয়। 'এন্‌কয়ারার' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রধানতঃ হিন্দুসমাজ নিয়ে, এবং 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' ফিরিঙ্গি-সমাজ নিয়ে সত্য-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এডওয়ার্ডস বলেছেন, ডিরোজিও সম্পাদিত 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' পত্রিকাই হল 'the first newspaper that was the recognised organ of Eurasians and which advocated their claims...with an eloquence and ability and a power of argument of which East Indians may well be proud." কৃষ্ণমোহন ও দক্ষিণারঞ্জনকে উপদেশ-পরামর্শ দিতেন ডিরোজিও, হয়তো 'এন্‌কয়ারার' পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে লিখতেনও; কিন্তু নিজে ফিরিঙ্গি বলে দূরে থাকতেন। ফিরিঙ্গি যদি হিন্দুসমাজের সংস্কারক হবার চেষ্টা করেন তা হলে খ্রীষ্টান পাদ্রিদের মতন তাঁকেও যে উপহাসের পাত্র হতে হবে, এ কথা তিনি জানতেন। তাই বোধ হয় দুই হিন্দুব্রাহ্মণ যুবককে তিনি হিন্দুসমাজের সংস্কারযুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং নিজে ফিরিঙ্গি-সমাজের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

সারা জুলাই মাস ধরে (১৮৩১) কলেজের তরুণদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলতে থাকল। উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল মনে হয়। ১৬ জুলাই তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন, "অপর শ্রীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা তাবৎ ক্লাস মেস্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি।" অভিযোগের বহর দেখে বোঝা যায়, বিরক্তি ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাত্রা কোন্ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কলেজের ছাত্রদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধর্মসভার বিষোদ্গিরণও কিছুই বন্ধ হয় নি, ক্রমেই তার উত্তাপে ও গর্জনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল সকলে। জুলাইয়ের শেষে (১৮৩১) 'এন্‌কয়ারার' পত্রিকায় কৃষ্ণমোহন লিখলেন, 'The rage of persecution is still vehement...The heat of *Gurum Shabha* is violent, and they know not what they are doing." গুড়ুমসভার (ধর্মসভা) গর্জন ক্রমেই গগনভেদী হয়ে উঠছে, কিন্তু তারা জানে না কি করছে তারা।

এই পরিবেশে, ২৩ আগস্ট তারিখে (১৮৩১) হঠাৎ একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনার স্থান হল কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি এবং পাত্র হলেন তাঁর তরুণ বন্ধুবান্ধব। কৃষ্ণমোহনের বাড়ির (গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে) উত্তরে ভৈরবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্তী নামে দুজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ২৩ আগস্ট কৃষ্ণমোহন কোন কাজে বাইরে গিয়েছিলেন, এমন সময়

তাঁর বন্ধুবান্ধবরা দল বেঁধে তাঁর বাড়িতে এসে, বৈঠকখানায় বসে সমাজ-সংস্কারের গরম গরম বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে খুব উত্তেজিত ও উল্লসিত হয়ে ওঠেন। অতঃপর সেই উত্তেজনার বশে মেছুয়াবাজারের এক মুসলমানের দোকান থেকে রুটি ও গোরুর গোস্ত নিয়ে এসে বাড়িতেই ভক্ষণ করতে আরম্ভ করেন। ব্যাপারটা তাতেই শেষ হয় না। ভক্ষণান্তে গোমাংসের হাড়গুলি তাঁরা উল্লাসধ্বনি দিতে দিতে পাশের চক্রবর্তীদের বাড়ির ভিতরে নিক্ষেপ করেন। 'গো-হাড় গো-হাড়' ধ্বনি শুনে চক্রবর্তীরা বেরিয়ে আসেন এবং ছেলেদের কীর্তি দেখে স্বভাবতঃই ক্ষিপ্ত হন। ব্রাহ্মণপ্রধান পাড়ায় দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্রোধোন্মত্ত প্রতিবেশীরা কৃষ্ণমোহনের বন্ধুদের চড়াও হয়ে মারতে যান। অনর্গল ধারায় অশ্রাব্য কটূবাক্য ও অভিসম্পাত তরুণদের উপর বর্ষিত হতে থাকে। মারের ভয়ে তাঁরা পলায়ন করেন। কৃষ্ণমোহনের অগ্রজ ভুবনমোহন বাড়িতে ফেরামাত্র প্রতিবেশীরা সমস্বরে দাবি করেন যে তাঁর অনুজকে কিছুতেই আর এ বাড়িতে স্থান দেওয়া চলবে না, আসা মাত্রই বিদায় করতে হবে।

তাই করা হল। কৃষ্ণমোহন বাড়ি ফিরে আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনে বিস্মিত ও দুঃখিত হলেন, কিন্তু উত্তেজিত প্রতিবেশীদের শান্ত করার জন্য গৃহত্যাগ করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর রইল না।

গৃহত্যাগ করেও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। এই সময় তাঁকে অতর্কিতে প্রহার করা, এমন কি হত্যা করারও ষড়যন্ত্র হয়েছিল শোনা যায়। কলকাতা শহরে ভয়ে তাঁকে কেউ বাড়িতে আশ্রয় দিতেও চান নি। অবশেষে বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের বাড়িতে তিনি আশ্রয় নেন। কিন্তু মাসখানেকের বেশী সেখানেও থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। বন্ধুর আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীরা ও সমাজের লোকজন ক্রমেই আপত্তি করতে লাগলেন এবং কৃষ্ণমোহন ২৮ সেপ্টেম্বর বন্ধুর বাড়ি ছেড়ে চৌরঙ্গি অঞ্চলে সাহেবের গৃহে অতিথিরূপে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। শহরের কোন হিন্দুপাড়ায় তাঁর স্থান হল না।

তরুণদের এই আচরণ নিশ্চয় সমর্থনযোগ্য নয়। নিছক কিশোরসুলভ চাপল্যের বশেই যে তাঁরা এই কুকর্ম করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাখির নতুন ঠোঁট উঠলে বা ডানা গজালে যেমন সে ঘন ঘন যাকে খুশি কামড়াতে এবং যেখানে খুশি উড়তে চেষ্টা করে, ডিরোজিওর তরুণ ছাত্ররাও ঠিক তাই করছিলেন। নতুন প্রগতিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংস্কার-মুক্তির স্বাদ পেয়ে প্রথম যৌবনের উদ্দামতায়, তাঁরা নিঃসন্দেহে কিছুটা বেহিসেবী স্বেচ্ছাচারিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তার জন্য কটূবাক্য ও কঠোর সমালোচনা অবশ্যই তাঁদের প্রাপ্য। সেই প্রাপ্য দিয়েও সস্নেহে ও সযত্নে তাঁদের প্রতিভাকে পালন করে ঠিক পথে পরিচালিত করা যেত। কিন্তু তার জন্য দরদ থাকা দরকার এবং তাঁদের প্রতিভার স্বরূপও উপলব্ধি করা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় তখন প্রাচীন ও প্রবীণ সমাজে নব্যশিক্ষিত প্রগতিপন্থী তরুণদের প্রতি এই সহানুভূতি ছিল না। তাই কেবল দুর্মর সমালোচনায় তাঁরা সমাজের শত্রু মনে করে তরুণদের নির্যাতন করেছেন এবং নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছেন সমাজের বুক থেকে।

গো-হাড় নিক্ষেপের ঘটনার পর সমাজে যে কি ভীষণ সোরগোল সৃষ্টি হয়েছিল তা সহজেই কল্পনা করা যায়। আগে থেকেই উত্তেজনার একটা স্রোত বইছিল শহরে, এপ্রিল মাসের শেষে (১৮৩১) ডিরোজিওর পদচ্যুতির সময় থেকে আগস্টের শেষে কৃষ্ণমোহনের গৃহত্যাগের সময় পর্যন্ত তাতে ক্রমেই উত্তাল তরঙ্গের সঞ্চার হতে থাকে। তরুণদের উচ্ছৃঙ্খলতা ডিরোজিও নিশ্চয় সমর্থন করতেন না এবং সেজন্য তাদের শাসনও করতেন। কিন্তু তাঁর শাসন-নিষেধের বাঁধ ভেঙেও তরুণদের উচ্ছল সংস্কার-চেতনা মধ্যে মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে সমাজের বুকে আত্ম-প্রকাশ করত। এই অসংযত উচ্ছলতার প্রকাশ লক্ষ্য করে ডিরোজিও বেদনাবোধ করলেও হতাশ হন নি।

নিরাশ্রয় হয়েও আঠার বছরের যুবক কৃষ্ণমোহন

নিরুৎসাহ হলেন না। 'এন্‌কয়ারার' পত্রিকায় তিনি লিখলেন :

> Persecution, is high for we have deserted the Shrine of Hinduism. The bigots are violent because we obey not the calls of superstition. Our conscience is satisfied we are right... but we will stand persecution. *A people* can never be reformed without noise and confusion...Blessed are we, that we are to reform the Hindu nation, we have blown in the trumpet, and we must continue to blow on.

"আমরা হিন্দুধর্মের আশ্রয়চ্যুত হয়েছি বলে আমাদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হচ্ছে। কুসংস্কার আমরা বর্জন করেছি বলে অতিধার্মিকরা আমাদের উপর খড়্গহস্ত হয়েছেন। বিবেকবুদ্ধির দিক থেকে আমরা যা করছি তা ন্যায্য ও সঙ্গত বলে আমরা মনে করি। নির্যাতন যত নিষ্ঠুরই হোক, তা সহ্য করার মতন প্রচুর শক্তি আছে আমাদের। আমরা জানি কোলাহল না করে, এবং খানিকটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করে একটা জাতির সংস্কার-সাধন করা যায় না। আমরা ধন্য, যেহেতু হিন্দুজাতির সংস্কারসাধনের ভার নিয়েছি আমরা। তার জন্য সংগ্রামের যে ভেরী বাজিয়েছি, তা শত নির্যাতন সহ্য করেও আমরা বাজিয়ে যাব।"

ডিরোজিও একদিন তাঁর তরুণ ছাত্রদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "আমি দেখছি, সদ্যফোটা ফুলের মতন পাপড়ি মেলে তোমাদের প্রতিভার মুকুল ফুটে উঠছে, মনের কপাট খুলে যাচ্ছে একে একে, এবং যে মোহের বন্ধনে তোমাদের প্রচণ্ড ধীশক্তি শৃঙ্খলিত তা ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। পাখির ছানার মতন তোমাদের ডানা-ঝাপ্‌টানি শুনছি আমি, আর কান পেতে আছি কবে নীড়ের বন্ধন ছেড়ে, মুক্ত ডানা মেলে, উধাও হবে তোমরা অবাধ আকাশের দিকে।"

মুক্তপক্ষ তরুণদের সেই শক্তিপরীক্ষা পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়ে গেল ১৮৩১-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে। ভেরী বেজে উঠল সংস্কার-সংগ্রামের। চরৈবেতির মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলার নব্যশিক্ষিত তরুণেরা প্রতিজ্ঞা করলেন, তাঁদের ভেরী থামবে না কোনদিন।

ডিরোজিও বুঝলেন, সামাজিক প্রগতি ও কল্যাণের কামনায় উদ্ভাসিত এই তরুণের দল ভুল করবে অনেক, বাছা বাছা সব ভুল, এবং সংযম-শৃঙ্খলার বাঁধও ভাঙবে বহুবার। কিন্তু দুর্বার তাদের গতি প্রতিরোধ করবে কে?

কবি-দার্শনিক ডিরোজিও স্বপ্নে বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। বাইশ বছর আট মাস বয়সে তাঁর মৃত্যু হল (২৩ ডিসেম্বর ১৮৩১)।

কলেরা রোগে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। অসুখের সময় তরুণ ছাত্ররা প্রায় সবসময় তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেবাশুশ্রূষা করতেন। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর অনুসন্ধানী মনের আকুলতা এতটুকু কমে নি। তরুণদলের একজন 'most spirited lad' মহেশচন্দ্র ঘোষ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত প্রায় সর্বক্ষণ তাঁর কাছে ছিলেন। ডক্টর টাইট্‌লার, ডক্টর উইলসন, ডক্টর গ্র্যাণ্ট, ডেভিড হেয়ার এবং আরও অনেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, এবং রোগশয্যাতেও তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে তিনি আলাপ করার চেষ্টা করতেন। পাদ্রি হিলও (যাঁর বক্তৃতার পরে ডাফের ভাষায় 'The whole town was literally in an uproar') তাঁর সঙ্গে রোগশয্যায় সাক্ষাৎ করে খ্রীষ্টধর্মবিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। মহেশচন্দ্র বলেন, মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ডিরোজিও নিজেকে খ্রীষ্টান বলে স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, "ধর্মবিষয়ে বা ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য কি তা আজও আমি জানি না, আমার অনুসন্ধান শেষ হয় নি

এখনও।" মহেশচন্দ্রের উক্তি মিথ্যা না হবারই সম্ভাবনা, কারণ ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণমোহনের আগে মহেশচন্দ্রই খ্রীষ্টান হয়েছিলেন। অতএব ডিরোজিও নিজেকে খ্রীষ্টান বলে স্বীকার করে গেছেন, এ কথা জানলে তিনি খুশীই হতেন।

'এনকয়ারার' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করার সময় ডিরোজিওর তরুণ ছাত্ররা বলেছিলেন যে জ্ঞানের মহাসমুদ্রে, যুক্তি ও বুদ্ধির পাল তুলে দিয়ে সত্যের সন্ধানে তাঁরা অভিযান করছেন। তাঁদের দীক্ষাগুরু ডিরোজিও, মুক্তমনের পাল তুলে দিয়ে সত্যের সন্ধানে জীবন-নদীর পরপারে পাড়ি দিয়েছিলেন তরুণ বয়সে। তখন তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করার সংকল্প করেছিলেন বাংলার তরুণ ছাত্রদল।

কলকাতা শহরের দক্ষিণ-পার্ক স্ট্রীটের প্রাচীন গোরস্থানে অনেক স্বনামধন্য ঐতিহাসিক পুরুষের সমাধি আছে। এই গোরস্থানেই ডিরোজিওকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কীর্তি ও খ্যাতির কোন স্বাক্ষর নেই সেখানে। এমন কি প্রত্নতাত্ত্বিকের সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে গোরস্থানে না ঘুরে বেড়ালে তাঁর সমাধি খুঁজে পাওয়াও সম্ভব নয়। গোরস্থানের পশ্চিমপ্রান্তে এক কোণে জনৈক মেজর মেলিঙের সমাধির পাশে ডিরোজিও সমাধিস্থ। শোনা যায়, তাঁর মৃত্যুর পরে প্রায় আট শত টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল সমাধিমন্দির নির্মাণের জন্য। কিন্তু পরে সেই টাকার তহবিলের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

ডিরোজিওর স্মৃতির কোন যোগ্য সমাধি নেই বলে লজ্জার কারণ থাকলেও, দুঃখের কারণ নেই। বাংলার তরুণদের মানস-ফলকে তাঁর কীর্তির কথা খোদাই করা আছে; ভবিষ্যতেও থাকবে।

বোধ হয় কোলাহলময় শহরে রাজপথের পাশে কোন গোরস্থানে তাঁর কবিচিত্ত সমাধি কামনা করে নি। স্বরচিত 'The Poet's Grave' কবিতায় তাঁর নিজের সমাধির বাসনাই হয়তো তিনি ব্যক্ত করেছিলেন :

Be it beside the ocean's foamy surge,
On an untrodden, solitary shore,
Where the wind sings an everlasting dirge,
And the wild wave, in its tremendous roar
Sweeps o'er the sod !—There let his ashes lie
Cold and unmourned—

ভবানী মুখোপাধ্যায়

এক

সারাদিন ধরে বিরামবিহীন তুষার বর্ষণে পথঘাট পিচ্ছিল। চলা-ফেরা করা কঠিন, গাড়িঘোড়ার পক্ষেও তেমন নিরাপদ নয়। তবু সেদিকে কারও যেন লক্ষ্য নেই, সব বাধা উপেক্ষা করে দলে দলে লণ্ডনের অভিজাত মহলের নরনারী সুসজ্জিত হয়ে উপস্থিত হচ্ছেন লণ্ডনের সেণ্ট জেমস থিয়েটারে। আজ একটি নতুন নাটকের উদ্বোধন রজনী। নাট্যরসিক লণ্ডনবাসীদের কাছে এই আকর্ষণ দুর্দমনীয়।

নাট্যকার নিতান্ত নবীন নন, এর আগে তাঁর দুখানি নাটক সাফল্যলাভ করেছে, তৃতীয় নাটকটি সম্প্রতি 'হে মার্কেট থিয়েটারে' স্বয়ং প্রিন্স অব ওয়েলসের উপস্থিতিতে উদ্বোধন করা হয়েছে, সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগ তুচ্ছ, ব্যক্তিগত ক্লেশ উপেক্ষণীয়।

নবীন নাট্যকার অসকার ওয়াইলডের "The Importance of Being Earnest" নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী। তাই বিদগ্ধ দর্শকে প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ। এই নাটকই অসকার ওয়াইলডের সাফল্যের স্বীকৃতি। নাট্যকার হিসাবে এই তাঁর সিদ্ধি-দিবস।

সেদিন কিন্তু নাট্যশালার ভিতরে ও বাইরে দুটি নাটকের অভিনয় চলছিল। নাট্যশালার ভিতরে অসংখ্য নাট্যরসিক দর্শকের ভিড় আর বাইরের নাটকের দর্শক দু চারজন থিয়েটার-কর্মচারী ও পাহারাওলা। এই সেই ভিক্টোরীয় যুগের এক নিদারুণ বিয়োগান্ত কাহিনীর সূচনা। অসকার ওয়াইলডের জীবনের উজ্জ্বলতম দিনটিতেই নেমে এসেছিল অভিশাপ আর সর্বনাশ।

সেই শীতের রাতে একজন থিয়েটার-ভবনের দোরে দোরে ধাক্কা দিয়ে বেড়াচ্ছে। ভিতরে যেতে চায়, তার হাতে এক বোঝা শাকসবজি, তার মধ্যে গাজরগুলো বেশ দেখা যাচ্ছে। তাকে কিন্তু কেউ ভিতরে প্রবেশের সুযোগ দিচ্ছে না, সকলেই ভাগিয়ে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন ভিতরে যাওয়া গেল না তখন নিষ্ফল আক্রোশে অভিসম্পাত করে লোকটি চলে গেল।

এই সব গাজর এবং অন্যান্য সবজি নাট্যকারকে ছুঁড়ে

মারার উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল। যে মুহূর্তে দর্শকরা নাট্যকারকে অভিনন্দন জানাবে ঠিক সেই মুহূর্তেই কাজ সারতে হবে এই ছিল বাসনা। মঞ্চস্থ নাট্যকারকে অপদস্থ করার এই সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রতিশোধ-উন্মত্ত মানুষটি অন্য উপায় চিন্তা করলেন। ইনিই সেই মার্কুইস অব কুইনসবেরী।

মার্কুইসের কনিষ্ঠ সন্তান লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাসের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এই নবীন নাট্যকার অসকার ওয়াইলড। কয়েক মাস ধরেই ওয়াইলডকে অপদস্থ করার সুযোগ খুঁজছেন ভদ্রলোক। কিছুতেই ডাগলাস আর ওয়াইলডের বন্ধুত্বের অবসান ঘটাতে পারছেন না। অনেক ভয় দেখিয়েছেন, অনুনয় করেছেন—কিছুতেই কিছু নয়। অথচ এই ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব সারা লণ্ডন শহরের এক মুখরোচক কলঙ্ক কাহিনী। ক্লাবে, মজলিসে, পার্টিতে সর্বত্র এই কুখ্যাত অন্তরঙ্গতার আলোচনা চলে। কাফে রয়্যালে বসে মার্কুইস স্বচক্ষে এই দুই বন্ধুর নির্লজ্জ কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করেছেন। সম্ভব হলে তিনি ওয়াইলডকে গুলি করতেন, তা নয় কতকগুলি নিষ্কর্মা লোক প্রেক্ষাগৃহে বসে সেই ঘৃণিত নাট্যকারের নাটক দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছে—এ দৃশ্য অসহনীয়।

পিতা যেমন অসকার ওয়াইলডের সর্বনাশ সাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প, পুত্র লর্ড ডাগলাসও তেমনই পিতা মার্কুইস অব কুইনসবেরীকে জব্দ করার মতলব আঁটছেন। কেউ কম নয়, দুজনের দেহেই উদ্দাম স্কটিশ রক্ত প্রবাহিত। মার্কুইস অব কুইনসবেরী সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা অবহেলা করেছেন, নিজের স্ত্রীকেও তিনি নির্যাতন করেছেন। লর্ড ডাগলাস তাঁর জননীর পক্ষ থেকেই যেন পিতাকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বন্ধু ওয়াইলডকে নিয়ে পিতার ঈর্ষা ও ক্রোধ লর্ড ডাগলাসের প্রতিশোধ-স্পৃহা পূরণের একটি পথ মাত্র। এই সূত্রে হয়তো মার্কুইসকেও জেলে আটকানো সম্ভব হত।

পিতা-পুত্রের এই বিরোধ কিন্তু অসকার ওয়াইলডের জীবনের বিচিত্র অভিশাপ। এই বিরোধই শেষ পর্যন্ত অসকার ওয়াইলডের জীবনে কলঙ্ক ও চরম সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এসেছে।

সেই দুর্যোগময়ী রজনীর কয়েক সপ্তাহ পরে ওল্ড বেলীর ফৌজদারী আদালতে মানহানির মামলার আসামী হিসাবে অসকার ওয়াইলডের বিচার শুরু হল। তাঁর জীবনের এই শেষ অঙ্ক গ্রীক ট্রাজেডির মতই বিয়োগান্ত। Lady Windermere's Fan নামক নাটকে ওয়াইলডের একটি চরিত্রের মুখে উচ্চারিত এই বাণীটি তাঁর নিজের সম্পর্কেও প্রযোজ্য—

"Misfortunes one can endure—they come from outside, they are accidents. But to suffer for one's own faults—ah!—there is the sting of life."

অসকার ওয়াইলড যেন স্বখাতসলিলেই ডুবে গেলেন। নাট্যকার ওয়াইলডের জীবননাট্যের শেষ অঙ্কের ইঙ্গিতই তাঁর জীবন-কথার মুখবন্ধ।

ভিক্টোরীয় যুগের তিনজন সাহিত্যিকের জীবন অস্বাভাবিকতার দোষে কলঙ্কিত। লুই ক্যারল তাঁর কল্পলোকের এলিসদের নিয়েই জীবন কাটানোর পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁর রুচিবিকার ছিল কিশোরী কুমারীদের প্রতি। রাসকিনের রোমান্স-বিলাস নারীর কৌমার্যে, বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি তাঁর নিদারুণ বিরাগ। বিবাহের পর স্ত্রীর রূপমাধুরী নিয়ে আনন্দময় জীবনের জয়গান করলেও ওয়াইলড রাসকিনপন্থী। লুই ক্যারল তাঁর বিকৃত রুচি নিয়ে উদ্ভট জীবন যাপন করেছেন, রাসকিন শেষ পর্যন্ত মানসিক বিকারের যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, আর ওয়াইলড অসম্মান আর দুর্নামের বোঝা মাথায় নিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করে শেষ পর্যন্ত মানসিক সুস্থতা বজায় রেখেছিলেন।

অসকারের চারিত্রিক ত্রুটির জন্য তিনি স্বয়ং কতখানি অপরাধী তা আজ পর্যন্ত বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে। মনস্তাত্ত্বিক বা মনোবিকলনবিদ সাইকিআট্রিস্টের মতে মানুষের মানসিক ও ভাবাবেগজনিত মনোভঙ্গী সম্পর্কে স্বাধীনতা আছে। প্রকৃতি মানুষের চরিত্র গঠন করে,

আর সেই প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দেয় সমগ্র জীবনের রূপরেখা।

ওয়াইলড সর্বদাই মনে করেছেন যে জীবনের বিচিত্র পরিহাসে তাঁকে নিদারুণ শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে, সে অপরাধ তাঁর স্বকৃত, এ কথা তিনি বার বার বলেছেন। যে প্রেমের কোনও সংজ্ঞা নেই, নাম নেই সেই প্রেমের জয়গান করেছেন অসকার ওয়াইলড, কিন্তু সেই প্রেমই তাঁর জীবনে এক বিরাট বোঝা হয়ে পরিণামে বিচিত্র অভিশাপে পরিণত হয়েছে।

দুই

অসকার ওয়াইলডের পিতৃদেব চক্ষু-চিকিৎসক হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, এ ছাড়া প্রত্নতত্ত্ববিদ ও পুরাতত্ত্ব-গবেষক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। ডাবলিন শহরে তাঁর পূর্বপুরুষরা ইংলণ্ড থেকে এসে ঘর বেঁধেছিলেন। বার্নাড শ, সেরিডান প্রভৃতির মত অসকার ওয়াইলডের পরিবারবর্গ ইংরাজবংশোদ্ভূত। অসকারের প্রপিতামহ র‍্যালফ ওয়াইলড সপ্তদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম ডাবলিনে এসেছিলেন। ধর্মবিশ্বাসে এঁরা প্রোটেস্ট্যাণ্ট খ্রীষ্টান। ওয়াইলডের প্রপিতামহী, পিতামহী এবং জননী সকলেই আইরিশ বংশজাত। এই ডাবলিন শহরেই ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে অসকার ওয়াইলড ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর আর একটি ভাই ছিল দু বছরের বড়, নাম উইলিয়াম, আর পরে একটি বোন আইসোলা অতি অল্প বয়সেই মারা যায়। অন্য মতে ওয়াইলডের জন্ম হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে।

এই পরিবারের সন্তানরা পোরটোরা রয়্যাল স্কুল এবং ট্রিনিটি কলেজে পড়াশোনা করেছেন। অসকারও বাল্য ও শৈশবে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেছেন এবং কৃতী ছাত্র হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কুড়ি বছর বয়সে ম্যাগদালেন কলেজ, অক্সফোর্ড থেকে স্নাতক হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। কবিতা রচনায় শ্রেষ্ঠ হয়ে নিউডিগেট প্রাইজ লাভ করেন।

অসকার ওয়াইলডের প্রথম জীবনীকার রবার্ট সেরাড অসকার চরিত্রে বংশানুক্রম কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা বিশদ ভাবে দেখিয়েছেন। এর ফলে উত্তরকালে তাঁর সকল জীবনীকারই সেই সূত্র ধরে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, এবং অসকারের অপরাধের বোঝা তাঁর পূর্ব-পুরুষদের ওপর চাপিয়েছেন। তাঁর পিতামহীর পরিবারবর্গ আভিজাত্যে কুলীন হলেও 'Very unstable mentality'-র জন্য কুখ্যাত ছিলেন। অসকারের জননী ছিলেন উগ্রস্বভাবের এবং বাতিকগ্রস্ত, আর তাঁর পিতার চরিত্রের খ্যাতি ছিল না।

প্রাচীন যুগের বিখ্যাত লেখক চার্লস মাতুরিন ছিলেন অসকার-জননীর খুল্ল-পিতামহ। উদ্ভট এবং অবাস্তব কাহিনীকার হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল। অসকার-জননী এবং স্বয়ং অসকার এই বাতিকগ্রস্তের দ্বারা পরোক্ষ-ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। এই মাতুরিনের "Melmoth the Wanderer" নামক কাহিনী পড়ে তরুণ বয়সে থ্যাকারে ভয়, আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠায় আকুল হয়েছিলেন। বালজাকও তাঁর রচনা পড়ে তাঁকে বায়রন, মলেয়ার প্রভৃতির সমশ্রেণীর বলেছিলেন, অবশ্য কালের বিচারে আজ তিনি বিস্মৃত। অসকার কিন্তু বালজাকের অভিমত মেনে নিয়েছিলেন, তাঁর আদর্শ লেখকদের মধ্যে বালজাক অন্যতম ছিলেন। বাল্যকালে তাঁর প্রস্তরমূর্তির দিকে গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন ওয়াইলড। ডাঃ ওয়াইলডের যখন বিবাহ হয় তখন তাঁর বয়স ছত্রিশ, স্ত্রীর বয়স পঁচিশ। ডাঃ ওয়াইলড ছিলেন খর্বকায়, স্ত্রী দীর্ঘাঙ্গী। স্ত্রীর আকৃতি সুন্দর, সুদৃঢ় ও সুগঠিত, তার পাশে ডাঃ ওয়াইলড নেহাত অকিঞ্চিৎকর—যেন হাতির গলায় ঘণ্টা। কিন্তু ভদ্রলোকের চরিত্রে আইরিশ বৈশিষ্ট্য ছিল—সীমাহীন লাম্পট্য ও কামুকতার জন্য আইরিশদের অখ্যাতি ছিল।

আকৃতি যাই হোক, ডাঃ ওয়াইলডের রমণীকুলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল, অসংখ্য প্রেমলীলার জন্য তাঁর দুর্নাম ছিল, কিন্তু চিকিৎসক হিসাবে ডাঃ ওয়াইলড বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কুইন ভিক্টোরিয়ার চিকিৎসক হিসাবে তিনি তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন, অবশ্য কখনও চিকিৎসা করেন নি। তা ছাড়া আইরিশ লোকগীতির সংগ্রাহক, প্রত্নতত্ত্ব-গবেষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। সেকলে যখন ইতিহাস

রচনার উপকরণ সংগ্রহের জন্য আয়ার্লাণ্ডে গিয়েছিলেন, তখন ডা: ওয়াইলড তাঁকে বহু ঐতিহাসিক স্থান দেখিয়েছিলেন, প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশেষ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন তাঁর নখদর্পণে ছিল।

জেন ফ্রানসেসকা সাধারণ প্রকৃতির মহিলা ছিলেন না। তিনি কল্পলোকের প্রাণী ছিলেন, সাধারণ মতামত তিনি গ্রাহ্য করতেন না। অতি-নাটকীয় পরিবেশে স্বরচিত স্বপ্নরাজ্যে তিনি বিচরণ করতেন। বাল্যকালে তিনি জোন অব আর্কের পদাঙ্ক অনুসরণে বিপ্লবী নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করে ফেনিয়ানদের শাসন শৃঙ্খলমুক্ত হওয়ার জন্য প্রেরণা দান করেছিলেন। ছদ্মনামে কবিতা ও গদ্য রচনায় বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। Jacta Alea Est নামক একটি রচনা 'Speranza' এই ছদ্মনামে তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখের 'Nation' নামক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তৎক্ষণাৎ সেই পত্রিকা নিষিদ্ধ হয় এবং ভাইসরয় রাজদ্রোহের দায়ে সম্পাদককে অভিযুক্ত করেন। তিনি লিখেছিলেন—"One instant to take breath, and then a rising ; a rush, a charge from north, south, east and west upon the English garrison, and *the land is ours*."

পত্রিকা-সম্পাদক গেভান ডাফির রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচার হল। বিচারকালে যখন অ্যাটর্নি জেনারেল প্রবন্ধগুলির অংশবিশেষ পড়ে ডাফির অপরাধ বর্ণনা করছিলেন তখন জেন শ্রোতাদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—এই রচনা আমার, এর জন্য শাস্তি যদি পেতে হয়, সেই শাস্তি আমার প্রাপ্য।

আদালত তাঁকে থামিয়ে দিলেন, আদালতের সম্ভ্রমহানি হচ্ছে। কিন্তু এই স্বীকারোক্তির ফলে জুরিরা একমত হতে পারেন নি। এর পর ইয়ং আয়ার্লাণ্ড মুভমেণ্টের নেতৃবৃন্দ 'ভ্যান ডিমেন'স ল্যাণ্ড' (এ দেশের আন্দামান) নামক বন্দীশালায় প্রেরিত হলেন। ফেনিয়ান এবং সিনফিনের চেষ্টায় আয়ার্লাণ্ড অবশেষে স্বাধীন রিপাব্লিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ডা: ওয়াইলডের এই বিপ্লব প্রচেষ্টায় গোপন সমর্থন ছিল। মিচেল এবং তাঁর দলবলের কারাদণ্ডের তিন বছর পরে তিনি বিপ্লবী নায়িকা জেনকে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিবাহ করেন।

এই জোন অব আর্কের গর্ভে অসকারের জন্ম। জননীর বাসনা ছিল কন্যাসন্তানের, তাই পুত্র অসকারকে তিনি মেয়েদের পোশাক পরিয়ে সাজিয়ে রাখতেন। জনৈক বান্ধবীকে তিনি লিখেছিলেন—"A Joan of Arc was never meant for marriage, so here I am, bound heart and soul to the home hearth. Behold me, Speranza, rocking a cradle at this present writing in which lies my second son—a babe of one month old the 16th of this month, November, and as large and fine and healthy as if he were three months. He is to be called Oscar Fingal Wilde. Is not that grand, misty and Ossianic ?" ওঁদের বাড়িতে প্রতিদিন বৈঠক বসত। ডা: ওয়াইলডের বাউণ্ডুলের দল মদ্যপান আর নৈশভোজের হুল্লোড়ে মত্ত আর এদিকে তাঁর স্ত্রী ছিলেন সমসাময়িক লেখকদের সাহিত্যিক প্রেরণা। তাঁর প্রদত্ত ভোজসভায় সাহিত্যিক শিল্পী প্রভৃতি প্রতিভাধরদের ভিড় জমত। এই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি-সম্পন্ন জনকজননীর সন্তান অসকার স্বাভাবিক কারণেই অতি অল্প বয়সে আপনাকে অপরের চেয়ে স্বতন্ত্র মনে করতে শুরু করলেন। আট বছর বয়সেই তিনি "learnt the ways to shores of old romance and had seen apples plucked from the tree of knowledge"। অসকারের যখন দশ বছর বয়স তখনই ডাক্তার ওয়াইলড নাইটত্ব লাভ করেন। সুইডেনের সম্রাটের কাছে "অর্ডার অব দি পোলার স্টার" সম্মান লাভ করলেন। রয়্যাল আইরিশ অ্যাকাডেমী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা ও দানের স্বীকৃতিতে 'কানিংহাম মেডাল' দান করলেন। সুতরাং "অসকার ফিংগেল ও ফ্লাহার্টি উইলস্ ওয়াইলড", সাধারণের চাইতে স্বতন্ত্র,

নিজের নামটিকে সংক্ষিপ্ত করে করলেন শুধু অসকার ওয়াইলড।

ডাবলিন তাই অসকার ওয়াইলডকে স্বদেশপ্রেমিক কবি হিসাবে পায় নি। আইরিশ স্বাধীনতা-সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলেছে। এদিকে ইংলণ্ডে আইরিশদের ওপর প্রচণ্ড বিরূপতা, সেখানে নাটকে পরিহাসের চরিত্র আইরিশম্যান। ইংরেজরা বাড়ির চাকর পর্যন্ত আইরিশ-ম্যান রাখতে চান না বলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। আইরিশ আত্মীয়-আত্মীয়াকে লণ্ডনে উপেক্ষা করা হত। তাই স্কুল কলেজ ছেড়ে অসকার ওয়াইলড বিশ্বপ্রেমিক হিসাবে লণ্ডনের সমাজজীবনে প্রবেশ করলেন, সেখানেই তাঁর আইরিশ জীবনের সমাপ্তি।

এই কালেই ডাঃ ওয়াইলডের জীবনে এক প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাবলিনের বিচারশালায় ডাঃ ওয়াইলডের নামে যে কুখ্যাত মামলা শুরু হয়েছিল ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অসকার ওয়াইলডের মামলা যেন তারই পরিশিষ্ট।

মেরী ট্রাভার্স ট্রিনিটি কলেজের এক অধ্যাপকের মেয়ে। চিকিৎসা উপলক্ষে ডাঃ ওয়াইলডের সঙ্গে তাঁর রোগিণী মেরীর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং সেই ঘনিষ্ঠতা পরে শারীরিক অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। বহু অর্থ ও সময় তার পিছনে ব্যয় করেছেন ডাঃ ওয়াইলড। ডাক্তারের স্ত্রী জেন ঘটনাটি জানতে পেরেছিলেন, তবে স্বামীর চরিত্র তাঁর অজ্ঞাত ছিল না, তাই ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্ব দেন নি। মেরী যদিও জানত ডাক্তার একনিষ্ঠ প্রেমিকগোষ্ঠীর মানুষ নয়, তবু সে ডাক্তারকে একান্তভাবে পাওয়ার চেষ্টায় ছিল। ডাক্তার যথাকালে তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে লাগলেন। বাড়ির একজন হওয়ার চেষ্টায় বেশী মেলামেশা করতে গিয়ে মেরী একদিন যখন শয়নকক্ষে উপস্থিত হল, তখন জেন তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। মেরী কিন্তু এত সহজে ছাড়ার পাত্রী নয়। ডাক্তার তাকে পোশাক অলঙ্কার অর্থ ইত্যাদি দিয়ে ভোলানোর চেষ্টা করলেন। উপহারগুলি গ্রহণ করল মেরী প্রেমের পুরস্কার হিসাবে। তারপর ডাক্তার মেরীকে অস্ট্রেলিয়ায় তার ভাইয়ের কাছে পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা করলেন, এমন কি যাওয়ার ভাড়া পর্যন্ত দিলেন। সেই টাকা নিয়ে মেরী লিভারপুল ঘুরে ফিরে এল। আবার একবার টাকা নিয়ে আবার লিভারপুল ঘুরে ফিরে এল মেরী। এতদিনে সে বুঝল ডাঃ ওয়াইলডের প্রয়োজন শেষ হয়েছে। আগ্রহ ও আন্তরিকতার অবসান ঘটেছে। তার ওপর ডাক্তার-গৃহিণীর এই অপমান আর উপেক্ষা মেরীকে উত্তেজিত করে তুলল। সে কিছু পুস্তিকা ছাপিয়ে সর্বত্র বিতরণ করল—বিশেষতঃ ডাক্তারের বন্ধু, আত্মীয় এবং রোগীমহলে। মেরিয়ন স্কোয়ারের বাড়িতে লেডী ওয়াইলডের কাছেও পাঠানো হল।

মেরীর পুস্তিকা-বর্ণিত "Dr. Quilp" তাঁর রোগিণীকে প্রথম ক্লোরোফর্ম করে পরে তার ওপর দৈহিক সংসর্গ করেছেন, এই সব কথা বেশ রসালো করে লেখা ছিল। কেলেঙ্কারির চানাচুর সকলেই মুখরোচক মনে করে, তাই সর্বত্র এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ল। Dr. Quilp-ই যে ডাঃ ওয়াইলড সে আর কারও বুঝতে বাকী রইল না।

লেডী ওয়াইলড ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্রের সমুদ্র-উপকূলে বেড়াতে গিয়েছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে ওই পুস্তিকা বিক্রি করতে চাইত। অবশেষে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি ডাঃ ট্রাভার্সকে একখানি চিঠি লিখলেন—

'আপনার কন্যার অভব্য আচরণের কথা আপনার হয়তো জানা নেই, সে এই সমুদ্রতীরে নিম্নশ্রেণীর খবরের কাগজ বিক্রিওয়ালাদের সঙ্গে মিশে আমার নামে কুৎসা প্রচার করে, এমন কি তার রচিত পুস্তিকাতে তার সঙ্গে ডাঃ ওয়াইলডের অবৈধ সংসর্গের ইঙ্গিতও দিয়েছে। সে যদি তার নাম কলঙ্কিত করতে চায় আমার কিছুই বলবার নেই, কিন্তু তার উদ্দেশ্য আমাকে অপমান করা এবং কিছু অর্থ লাভ। স্যর্ উইলিয়াম ওয়াইল্ডের কাছে সে ভীতিপ্রদর্শন করে অনেক চিঠি লিখেছে। আপনাকে জানানো প্রয়োজন বোধ করি, কোনও ভীতিপ্রদর্শন বা অতিরিক্ত অপমান প্রচেষ্টার ফলে আর টাকা পাওয়া যাবে না। যে কলঙ্কের মূল্য সে চায়, তা সে কখনই পাবে না।

জেন. এফ. ওয়াইলড।'

এই চিঠিখানি কয়েক দিন পরে আকস্মিক ভাবে মেরীর হাতে পড়ে। ডাঃ ওয়াইলড কিছুই জানতেন না, তিনি তখন ডাবলিনে। জানলে কিছুতেই চিঠি পাঠাতেন না। তিনি ফিরে আসার পরও তাঁকে ঘটনাটি জানানো হয় নি, লেডী ওয়াইলড মনে করেছিলেন সমগ্র ঘটনার ওপর যবনিকা পতন হয়েছে।

এই চিঠিটা ভিত্তি করে মিস মেরী ট্রাভার্স এক মানহানির মামলা আনলেন। মানহানি বাবদ ২০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণের দাবি করলেন লেডি ওয়াইলডের কাছ থেকে, ডাঃ ওয়াইলডকেও এই অপরাধে সংযুক্ত করা হল সহযোগী প্রতিবাদী হিসাবে। মামলা শুরু হল।

জুরিদের কাছে বলা হল ক্লোরোফর্ম করা অচৈতন্য অবস্থায় ডাঃ ওয়াইলড তার সঙ্গে অবৈধ সংসর্গ করেছেন। অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়েছেন।

লেডী ওয়াইলডের পক্ষে উকীল মেরীকে প্রশ্ন করলেন—এই ঘটনার কথা কাউকে জানিয়েছিলে?

মিস ট্রাভার্স। না।

তোমার বাবাকে?

না।

কেন জানাও নি?

তাঁকে কষ্ট দিতে চাই নি।

কিন্তু এই ভীষণ ব্যাপারের পরও তুমি ডাঃ ওয়াইলডের কাছে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

বার বার গিয়েছিলে, না যাও নি?

হ্যাঁ।

আর কোনদিন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে?

হ্যাঁ।

দ্বিতীয় অপরাধের পর আবার গিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

আবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে?

হ্যাঁ।

তবু আবার গিয়েছ?

হ্যাঁ।

যে ব্যক্তি তোমার এই সর্বনাশ করেছে তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছ?

হ্যাঁ।

ক্লোরোফর্ম সম্পর্কে মিস ট্রাভার্স বিশেষ কিছু বলতে পারে নি। ক্লোরোফর্ম কি রকম দেখতে তাই জানা নেই। তার গন্ধও জানা নেই, এবং শপথ করে বলতে পারে না ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে কি না। ক্লোরোফর্ম কথাটি বলার উদ্দেশ্য যে তার সংজ্ঞা ছিল না। লেডী ওয়াইলড বেশী মাত্রায় প্রতিবাদ করায় এবং তাঁর স্বামীর চরিত্রে তাঁর সন্দেহ নেই—এই কথা বলায় জুরিরা বিরক্ত হলেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেন—

মেরী কি আপনাকে চিঠি লিখেছিল যে ডাঃ ওয়াইলড তার ওপর অসঙ্গত ব্যবহার করেছেন?

হ্যাঁ, আমি তার জবাব দিই নি, কোনও আগ্রহ প্রকাশ করি নি।

এই কথায় আদালত বিস্মিত হল। সার্ উইলিয়াম জুরিদের সামনে দাঁড়াতে রাজী হলেন না। মেয়েটিও মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। জুরিরা বিচারে মিস ট্রাভার্সের ক্ষতিপূরণ বাবদ মাত্র এক ফার্দিং নির্ধারিত করলেন। অর্থাৎ দুপক্ষকেই শাস্তি দেওয়া হল।

কিন্তু সার্ উইলিয়ামের খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা সমস্ত নষ্ট হল। লেডী ওয়াইলড আর তাঁর পুরনো গরিমায় ফিরতে পারলেন না। তাঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়ল। সকলে বলল, এর জন্য কলঙ্কই দায়ী। কেউ বলল, পাপের ফল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন মারা গেলেন তখন অসকার ওয়াইলড অক্সফোর্ডের আণ্ডারগ্রাজুয়েট।

ডাঃ ওয়াইলড অনেক দিন রোগশয্যায় ছিলেন। এই দীর্ঘকাল ধরে মেরিয়ান স্কোয়ার ভবনে প্রতিদিন প্রাতে একজন অবগুণ্ঠনবতী মহিলা এসে রোগশয্যায় উপস্থিত থাকতেন। কেউ তাঁকে বাধা দিত না, লেডী ওয়াইলড তো নয়ই। তিনি সোজা ওপরে উঠে গিয়ে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসতেন, একবারও মুখের আবরণ খুলতেন না। অসকার বলেছেন, ‘পৃথিবীর কোনও রমণীই হয়তো এই

দৃশ্য দিনের পর দিন সহ্য করত না কিন্তু আমার জননী তা করেছেন, কারণ তাঁর মনে ঈর্ষা ছিল না, তিনি আমার পিতৃদেবকে সত্যই ভালবাসতেন।' লেডী ওয়াইলড এই মৃত্যুপথযাত্রীর মনে শান্তি ও সান্ত্বনার প্রয়োজন বুঝেছিলেন, তাই তিনি মহিলাটির এই নিয়মিত উপস্থিতিতে বিরক্ত হন নি, আর সার্ ওয়াইলড স্ত্রীর করুণা ও মমতায় কৃতজ্ঞচিত্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

তিন

সর্বোত্তম ক্লাসিক্যাল স্কলার হিসাবে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় অসকার পোরটোরা গোল্ড মেডেল পেলেন, প্রশ্নোত্তরের সময় তাঁর উত্তরে সবাই মুগ্ধ হলেন। স্বর্ণ অক্ষরে তাঁর নাম বিত্যালয় প্রাঙ্গণে ফলকে আঁটা হল, অনেক বছর পরে অবশ্য এই নাম মুছে দেওয়ার আদেশ হয় তাঁর শেষ জীবনের দুর্নামের ফলে। প্রকৃতি অবশ্য এই অসম্মানের হাত থেকে অসকারকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন, স্কুল-বাড়ির প্রাচীরে দারুণ ফাটল হওয়ায় সেই ফলক আপনা থেকেই ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল।

ট্রিনিটি কলেজ, ডাবলিনে অসকার ক্লাসিকসে বিশেষ সাফল্যলাভ করলেন, প্রথম দিনের পরীক্ষায় (ব্যাকরণ ও প্রাথমিক তত্ত্ব) মাঝামাঝি, আর দ্বিতীয় উচ্চতর ক্লাসিকসে তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন। অসকারের এই বৈশিষ্ট্য, অঙ্কে কাঁচা, ব্যাকরণে মাঝামাঝি কিন্তু অন্য বিচারে তিনি সর্বোত্তম। ট্রিনিটিতে এক বছর পড়ার মধ্যেই অসকার এমন একটি বৃত্তিলাভ করলেন যা তাঁর সমগ্র কলেজ-জীবনের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু তিনি অক্সফোর্ডে ছুটলেন ভাগ্যপরীক্ষার উদ্দেশ্যে। এই ট্রিনিটিতে তাঁর সহপাঠী ছিলেন এডওয়ার্ড কার্সন, কলেজের পড়াশোনায় অসকার তাঁকে পরাজিত করলেও উত্তরকালে বিচারশালায় কার্সনই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এই অনন্যসাধারণ প্রতিভার সর্বনাশ করেছেন।

অসকার বার্কলে গোল্ড মেডেল আর তাঁর অধ্যাপক মাহাফির প্রসন্ন আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ট্রিনিটি থেকে অক্সফোর্ডে এলেন। রেভারেণ্ড জন পেটল্যাণ্ড মাহাফি ট্রিনিটির জুনিয়র ডীন। সেইকালে তাঁর মত হেলেনীয় পণ্ডিত আর কেউ ছিল না। চার্চ অব ইংলণ্ডের যাজকত্বে অভিষিক্ত হলেও তাঁর স্বর্গপুরী গ্রীসে। নিজের নামের আগে 'রেভারেণ্ড' উপাধি তিনি বর্জন করেছিলেন। ওয়াইলডের মনে তিনি গ্রাস আর রোম নিয়ে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। ট্রিনিটিতে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং উত্তরকালে মাহাফির গ্রীক সমাজ-জীবন সংক্রান্ত গ্রন্থটি ছাত্র অসকার ওয়াইলড পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেন। স্কুলের মত ট্রিনিটিতেও অসকার নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতেন, খেলাধুলায় যোগ দিতেন না, শুধু সহমর্মিতার দিক থেকে পেয়েছিলেন মাহাফির মূল্যবান সংসর্গ।

স্কুলে পড়ার সময় ছোট বোন আইসোলার মৃত্যু হয়। অসকারের জীবনে এই প্রথম শোক। সে সময় তাঁর বয়স মাত্র বারো বছর। বালক অসকারের মনে এই শোক এত নিদারুণ হয়ে বেজেছিল যে তা ভুলতে অনেক সময় লেগেছিল। যে মেয়েটি তাঁর কাছে "a little ray of sunshine dancing about our home" বলে মনে হয়েছিল তার সমাধিতে তিনি নিয়মিত উপস্থিত হয়ে শোক নিবেদন করতেন। কবিতা লেখার গোড়ার যুগে অসকার এই ছোট্ট বোনটির উদ্দেশে সুন্দর একটি কবিতা লিখেছিলেন।

অক্সফোর্ড—অসকার ওয়াইলডের জীবনের এক স্মরণীয় কাল। স্বপ্নের অক্সফোর্ড—মাধুরী যেন আকাশ ছাপিয়ে ঝরছে। অসকার বলেছেন, 'বাবা আমাকে অক্সফোর্ডে পাঠিয়ে আমার জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছেন।' ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াইলড অক্সফোর্ডে উপস্থিত হলেন। বছরে পঁচানব্বই পাউণ্ডের একটা বৃত্তি পেলেন অসকার—ম্যাগদালেন ডেমিশিপ। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মডারেশনে তিনি ফার্স্ট ক্লাস পেলেন আর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় ফার্স্ট হলেন। কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট ঘরটি অসকারকে দেওয়া হল, সেই ঘর তিনি নীল চীনামাটির

পাত্র আর নগ্ন ছবি দিয়ে সাজালেন। মাঝে মাঝে সেই ঘরে কবিতা পাঠের মজলিস বসত।

এরই চার বছর আগে চারুকলার স্লেড প্রফেসার হিসাবে জন রাসকিন অক্সফোর্ডে এসেছিলেন অধ্যাপনা করতে। সেই কালে রাসকিন প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ শিখরে। রাসকিনের বক্তৃতা শোনার জন্য এত ভিড় হল যে ম্যুজিয়মে জায়গা হল না, সকলে রাসকিনকে নিয়ে সেলডোনিয়ানের প্রশস্ত কক্ষে গিয়ে বক্তৃতা শুনতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বক্তৃতা শোনার ব্যাপারে এত উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা যায় না। রাসকিনের বক্তৃতা নাকি অতীব উপভোগ্য এবং অবিস্মরণীয়। আপনাকে জাহির করার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল রাসকিনের। অসকার যখন প্রথমবার অক্সফোর্ডে গেলেন সেই ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাসকিন সপ্তাহে দুদিন বক্তৃতা দিতেন—"Aesthetic and Mathematic Schools of Florence"। রাসকিনের হালচাল জাঁকজমক ভারী মনে লাগল অসকারের, এই জাহির করার ভাবটুকু তিনি রাসকিনের কাছেই পেয়েছিলেন। রাসকিনের চরিত্রের যে যৌন-বিকার পরে প্রচারিত হয় তা হয়তো অসকারও জানতেন। রাসকিন ডীন লিডেলের বাড়িতে তাঁর ছোট্ট মেয়ে এলিসের কাছে নিয়মিত যেতেন। ভিক্টোরীয় যুগের তিনজন যৌনবিকারগ্রস্ত প্রতিভাধর মানুষ একই কালে অক্সফোর্ডে কাটিয়েছেন এও এক বিচিত্র ঘটনা, সেই তিনজনের নাম—জন রাসকিন, লুই ক্যারল আর অসকার ওয়াইলড।

রাসকিনের উপদেশ অনুসারে অক্সফোর্ডের ছেলেরা উঁচু টিলা কেটে পথ বানিয়ে দিলেন। পথ অবশ্য তেমন ভাল হয় নি, কিন্তু এর প্রচার হয়েছিল প্রচণ্ড। অসকার সেই মাটি কাটার দলে ভিড়েছিলেন এবং রাসকিনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সুযোগ পান। কাজের ফাঁকে ফাঁকে রাসকিনের সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের আলোচনা চলত।

অক্সফোর্ডে অসকারের সঙ্গে আলাপ হল ডেভিড হান্টার ব্লেয়ারের, স্কটল্যাণ্ডের এক ব্যারন বংশের উত্তরাধিকারী। এই ছেলেটি কিন্তু অর্থ এবং সামাজিক মর্যাদা ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করল, বেনেডিকটিন মঙ্ক এবং অ্যাবট হিসাবে অধ্যাত্মজীবনের আকর্ষণ তাঁর প্রবল হল। এই বন্ধুটির সঙ্গে প্রোটেস্টাণ্ট অসকার ওয়াইলড বিভিন্ন ক্যাথলিক সমাবেশে হাজির হতেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাসকিনের পদাঙ্কানুসরণে মিলান, পাদুয়া, ভেনিস ও ভেরোনায় তীর্থ করে অসকার আরও গভীর ভাবে ক্যাথলিক ভাবধারায় আকৃষ্ট হন। ইতালীতে কবি অসকার ওয়াইলডের সিদ্ধিলাভ ঘটেছে এ কথা বলা যায়। ইতালী সম্পর্কে তাই বিখ্যাত সনেটে ওয়াইলড বলেছেন—

"I reached the Alps : the soul within me burned
Italia, my Italia, at thy name—"

'ডাবলিন যুনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে' কবি অসকার ওয়াইলডের সর্বপ্রথম কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ, "Chorus of Cloud Maidens" নামক সনেটটি সেই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৮৭৫)। এর পর অক্সফোর্ডে থাকাকালেই তাঁর অধিকাংশ কবিতা লিখিত, উত্তরকালে কারাগারে বসে শুধু "Ballad of Reading Gaol" রচিত হয়। পরে তিনি শুধুমাত্র গদ্যলেখক হিসাবেই আত্মনিয়োগ করলেন।

ক্লাসিক পাঠের প্রভাবেই হোক, কিংবা বন্ধু ডেভিড হাণ্টার ব্লেয়ারের আধ্যাত্মিক সাহচর্যে অসকার ওয়াইলড ধর্মীয় ভাবাবেগে আপ্লুত হলেন। ধর্ম পালনের চাইতে ধর্মতত্ত্বানুসরণেই তাঁর আগ্রহ অধিক।

হাণ্টারের ক্যাথলিক ধর্মানুরাগ অসকারের মনে বিশেষ চেতনা সৃষ্টি করে, তাঁর কাছে ওয়াইলড নিজস্ব ধর্মীয় ধারণা, তাঁর ক্যাথলিজম-প্রীতি ও সেই কারণে পিতা ও পরিজনবর্গের প্রদত্ত বাধার কথাও জানালেন। হাণ্টার ব্লেয়ারের সহযোগিতায় বিভিন্ন রোমান ক্যাথলিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতেন, সেণ্ট এলয়সিয়ুসে ম্যানিং-এর উপাসনা শুনতে যেতেন। ওয়াইলড ভীষণ ভাবে এই ধর্মীয় ভাবাবেগে জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর ঘরে ধর্মসম্পর্কীয় চিত্রাবলী সাজানো হল, এমন কি ম্যানিং-এর ছবিও সেই সঙ্গে টাঙানো

হল। বন্ধুজনেরা তাঁকে "Your Eminence" বলে বিদ্রূপ করতে শুরু করলেন। একজন যাজককে ওয়াইলড তাঁর মনের কথা জানালেন। ধর্মযাজক তাঁকে উপদেশ দিলেন ক্যাথলিক মতে দীক্ষা নিতে, আর বললেন, 'ইতিমধ্যে তুমি কঠোর প্রার্থনা কর আর কম কথা বল।'

আর একজন যাজক বললেন, ঈশ্বরের কল্যাণস্পর্শ এখনও অসকারের শিরে বর্ষিত হয় নি। এই সময় হাণ্টার ব্লেয়ার রোমের তীর্থক্ষেত্রে কাটাবেন স্থির করলেন। অসকারকে তিনি এই তীর্থযাত্রায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। অসকারের হাতে তখন তেমন অর্থ নেই। হাণ্টার ব্লেয়ার সব শুনে বললেন, আমি ইস্টারের ছুটিতে রোম যাচ্ছি, ইতালীর পথে আমি মেনটনে আমার আত্মীয়ের বাড়ি থাকব, সেই সময় মনটিকারলোয় তোমার জন্য দু-এক পাউণ্ড বাজি ধরব, যদি তোমার রোমযাত্রা ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তা হলে এই বাজি আমি জিতবই।

ভক্তের বোঝা ভগবান বয়, সেই দু-পাউণ্ড ষাট পাউণ্ড হয়ে গেল। ফলে ওয়াইলড জেনোয়ায় ওদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে একত্রে রোম যাত্রা করলেন। রোমের ইতিহাস, তার প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, অতীতের গৌরব অসকার ওয়াইলডকে বেশী আকৃষ্ট করল, ক্যাথলিক পীঠস্থান হিসাবে রোমের যে গৌরব সে হয়তো তাঁকে তেমন স্পর্শ করে নি।

হাণ্টার ব্লেয়ার পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক ব্যবস্থা করলেন। ধর্মগুরু পোপ অসকারের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—আশাকরি, ঈশ্বরের পবিত্রবাসে তুমি তোমার সহযাত্রীর অনুগমন করতে পারবে।

অসকার সেদিন নিঃশব্দে সেই আশীর্বাদ মাথায় পেতে নিয়েছিলেন। হাণ্টার বলেছিলেন, 'দীর্ঘপথ আমরা নীরবে ফিরে এলাম। সারাপথ কেউ কোনও কথা বলি নি, আর সেদিনের সেই আশীর্বাদ আমার মনে হয় অসকার অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত স্মরণ রেখেছিল।'

কীটসের সমাধিপার্শ্বে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশে প্রোটেস্টান্ট চার্চের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে অসকার ওয়াইলড নীরবে নতজানু হয়ে বসে রইলেন। তিনি লিখেছেন, সেই দেবশিশুর অতি-সাধারণ সমাধিপার্শ্বে বসে আমার মনে হল যে এই সৌন্দর্যের পূজারীকে তার কালপূর্ণ হওয়ার আগেই হত্যা করা হয়েছে; জেনোয়াতে গাইদো অঙ্কিত সাঁ সেবাস্তিয়ান ছবি দেখেছিলাম, সেই ছবি আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। শত্রুরা গাছের সঙ্গে বেঁধে এক দেবশিশুকে নিপীড়ন করছে, তার মাথায় শুকনো সোনালী চুল, ঠোঁট দুটি লাল, গায়ের রঙ বাদামী।

শহীদ সেবাস্তিয়ান অসকারের মনে এক অপূর্ব প্রেরণা এনেছে। কীটসের সম্পর্কে অসকার তাই লিখেছিলেন—

"Taken from life when life and love
were new,
The youngest of the martyrs here is lain
Fair as Sebastian and as early slain."

রোমের আকাশবাতাস যখন অসকারের মনকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে তখন হঠাৎ মাহাফির চিঠি এল—"Come away with me to Greece and I will make an honest pagan of you."

তৎক্ষণাৎ গ্রীসে ছুটলেন অসকার। মাহাফির মতে—'সব সংস্কৃতির শেষ গ্রীসে, সব গ্রীসের পরিপূর্তি এথেন্সে, এথেন্সের চরম একরোপোলিস আর একরোপোলিসের শেষ কথা প্যানথিওন।' অসকার অবশেষে পশ্চিম আকাশ যখন জ্বলছে, সমুদ্রের ওপর দিয়ে অভিযান লাল সূর্যের, সেই পরম মুহূর্তে গ্রীসে পৌঁছলেন। "I stood upon the soil of Greece at last."

রোমের প্রভাব গ্রীসে কেটে গেল। পরে অক্সফোর্ডে যখন হাণ্টার ব্লেয়ারের সঙ্গে দেখা হল তিনি দেখলেন অসকার সম্পূর্ণ পরিবর্তিত, তিনি 'Hellenized' এবং 'Paganised'। ভাবাবেগাকুল অসকার সবদাই শেষতম প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রভাবেই আত্মহারা হয়েছেন।

*　　　*　　　*

অসকার বলতেন, "The only writers who have influenced me are Keats, Flaubert and Walter Pater and before I came across them I had already gone halfway to meet them."

সেই অক্সফোর্ডের কালে ওয়ালটার পেটার হলেন আর একজন ব্যক্তি—যাঁর প্রভাব অসকারের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। ওয়ালটার পেটার 'art for arts sake' নীতির একজন বলিষ্ঠ প্রচারক। তা ছাড়া তাঁর মত ছিল 'live dangerously', যা কিছু সুযোগ সামনে আসবে গ্রহণ কর। পেটারের আকৃতিতে কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য-স্পর্শ দেওয়ার জন্য অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হয় তিনি গোঁফ রাখলে তবে মানাবে। তিনি তাই করেছিলেন। থাকতেন অতি সাধারণভাবে, কায়ক্লেশে, আর নিজের শারীরিক কুশ্রীতার জন্য দুঃখ করতেন।

এই ওয়ালটার পেটার একদিন অসকারকে বললেন, 'দিনরাত কেবল কবিতা লেখ কেন হে? গদ্য লেখ না কেন? গদ্য লেখা অনেক কঠিন।'

'Renaissance' পড়ার আগে ওয়ালটার পেটারের বক্তব্যটুকু ঠিক বুঝতে পারেন নি অসকার। পনেরো বছর পর অসকার লিখেছিলেন—"Carlyle's stormy rhetoric, Ruskin's winged and passionate eloquence, had seemed to me to spring from enthusiasm rather than from art. I do not think I knew then that even prophets correct their proofs— But Mr. Pater's essays became to me 'the golden book of spirit and sense, the holy writ of beauty.' They are still this to me."

অসকার বলেছেন হয়তো আমি বাড়িয়ে বলছি, কিন্তু অত্যুক্তি যেখানে নেই, সেখানে প্রেমও নেই, আর যেখানে প্রেম নেই সেখানে পারস্পরিক বোঝাপড়া নেই।

চার্লস ল্যাম্ব সম্পর্কে ওয়ালটার পেটার লিখিত একটি প্রবন্ধের বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারে পেটার অতিশয় ক্ষুণ্ণ হন। পেটার চরিত্রের এই ভীরুতা ও উৎকণ্ঠা অসকারের ভাল লাগত না। কারণ আকৃতি ও প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ। তাই এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অসকার বলেছিলেন—'দেখ একবার কাণ্ড! যে মানুষ পেটার হতে পারে কি করে সে এই ধরনের তৃতীয় শ্রেণীর পত্রিকার ইতর উক্তিতে কাতর হয় তা বুঝি না।'

লণ্ডন ইনষ্টিট্যুশনে ওয়ালটার পেটার প্রসপার মেরিমে সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং বিরক্তিকর। যেন আপন মনে কথা বলছেন। সভাশেষে বন্ধুদের প্রশ্ন করলেন—"I hope you all heard me?"

অসকার ওয়াইলড তৎক্ষণাৎ বললেন, "we over-heard you."

পেটার অবশ্য সেদিন হেসে বলেছিলেন, তোমার সব কথারই জবাব তৈরি হয়ে থাকে দেখছি।

কিন্তু অসকারকে পেটার ভালবাসতে পারেন নি। অসকারের রচনার প্রশংসা করতে পারেন নি, এমন কি উত্তরকালে তাঁর সম্পর্কে অতি কদর্য উক্তিও করেছেন।

অসকার এই সব শুনে বলেছিলেন, "Yes, poor dear Pater has lived to disprove everything that he had written." লেখা এক জিনিস আর ক্ষেত্রে কর্মে তার রূপান্তরকরণ অন্য কথা।

অক্সফোর্ডের কাল শেষ হয়ে এল। ভাল ছাত্রের সুনাম অক্ষুণ্ণ রইল। তা ছাড়া কবিতা রচনায় Newdigate Prize লাভ করলেন। বিচারকমণ্ডলী-নির্বাচিত কবিতার বিষয় ছিল সীজারের ভূমি, দান্তের সমাধিস্থান 'Ravenna'। সৌভাগ্যক্রমে ইতালী ভ্রমণ-কালে 'র‍্যাভেনা'য় তরুণ কবি অসকার ব্যক্তিগত স্পর্শে কবিতাটিকে জীবন্ত করলেন। এই কবিতার গুণাগুণ নিয়ে মতভেদ আছে—কেউ বলেন অপূর্ব, চমৎকার উল্লেখনীয় লাইন কবিতাটির সর্বত্র, কেউ বলেন 'rhymed dictionary of mythology'। কবিতা যাই হোক কবি তাঁর কবিতা সেদিন যেভাবে আবৃত্তি করেছিলেন তা নাকি তার আগে কেউ শোনেন নি। সেলডোনিয়ান

থিয়েটারের ইতিহাসে (অক্সফোর্ড) এ এক অপূর্ব স্মরণীয় ঘটনা।

অক্সফোর্ডের অঙ্কের যবনিকা পতনের সঙ্গে অসকারের জীবনের আর একটি অঙ্কের সূত্রপাত। হান্টার ব্লেয়ার বলেছেন অক্সফোর্ডে সব'কিছু আলোচনাচক্রে নেতৃত্ব ছিল অসকারের। মন্তব্য, সূক্ষ্ম উক্তি, সুতীব্র শ্লেষবাক্য, উদ্ভট ধারণা এবং সরস আলোচনায় তিনি ছিলেন দলের মধ্যমণি। এমনই এক আলোচনা সভায় সকলে চলে যাওয়ার পর দু-একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুজনের কাছে অসকার জীবনের অভীপ্সা সম্পর্কে বলেছিলেন—

"God knows! I won't be a dried up Oxford don, anyhow.—I'll be a poet, a writer, a dramatist. Somehow or other I'll be famous, and if not famous I'll be notorious. Or perhaps—I'll rest and do nothing—These things are on the knees of the Gods. What will be, will be."

যা হওয়ার তা হবেই। অসকার একসঙ্গে প্রখ্যাত এবং কুখ্যাত হয়েছেন, আর লেখক, কবি ও নাট্যকার হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়েছেন। অক্সফোর্ডের সোনালী দিনগুলি উত্তরকালে অসকারের জীবনে প্রচণ্ড প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এনেছে সন্দেহ নেই। "Magdalen Walks" নামক কবিতায় অসকার লিখেছেন—

"And even the light of the sun will fade at last
And the leaves will fall, and the bird will hasten away,
And I will be left in the snow of a flowerless day
To think of the glories of spring, and the joys of a youth long past."

চার

লণ্ডনের সমাজে অসকার প্রবেশ করলেন ধীর, মৃদু-চরণে। স্ট্র্যাণ্ডের কাছে সালিসবারি স্ট্রীটে বাসা বাঁধলেন, সেটা ফ্যাশনদোরস্ত সমাজের বাইরে। অথচ গোড়া থেকেই সমাজের শিরোমণিদের সঙ্গে অসকারের জানাশোনা, ডিউক অব নিউক্যাসলের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা, এদিকে হান্টার ব্লেয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব এক বিরাট পাসপোর্ট। পুরনো বন্ধু রোনাল্ড সাউদারল্যাণ্ড-গাওয়ারের বোন ডাচেস অব ওয়েস্টমিনিস্টার অনেক সাহায্য করেছেন। তবু এসব কিছু নয়, আসল জিনিস অর্থ নেই। যেটুকু আয় তা সীমাবদ্ধ, নতুন রোজগারের আশা নেই।

কবিতার বই যা প্রকাশিত হয়েছিল তার সমালোচনা হল "The cover is consummate, the paper is distinctly precious, the binding beautiful, and the type is utterly too"—কিন্তু শুধু তাই নয়, Punch লিখলেন—এই কবিতাগুলি 'Swinburne and water'।

প্রকাশক ডেভিড বোগ লেখকের টাকায় আড়াইশ কপি গ্রন্থ ডাচ হ্যাণ্ডমেড পেপারে ছাপিয়ে, পার্চমেণ্টে বাঁধিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। অথচ আশ্চর্য, চার সপ্তাহে চারবার এই কাব্যগ্রন্থটি ছেপে চারটি সংস্করণ করতে হল। কবির আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু অর্থ না থাকায় সে আনন্দ নিরানন্দে পরিণত।

রাশিয়ার নিহিলিজমের পটভূমিকায় চার অঙ্ক নাটক 'VERA' লিখলেন অসকার ওয়াইলড। শিক্ষানবীস অসকারের প্রথম নাটক সাফল্য লাভ করল না। রুশ পটভূমি অবাস্তব এবং অবাস্তর ভাবে চিত্রিত হয়েছে এই নাটকে, কারণ নাট্যকারের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। 'অ্যাডেলফি থিয়েটারে' নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার কথা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করতে হল।

অসকার নিজে মার্কিন অভিনেত্রী মেরী প্রেসকটকে এই নাটক সম্পর্কে লিখেছেন—বর্তমান য়ুরোপে স্পেন থেকে রাশিয়া পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সাধারণ মানুষের নিদারুণ আর্তনাদে অনেক সিংহাসন ও শাসনতন্ত্র টলমল। আর্টের পরিধিতে সেই সমস্যাটিকে আমি তুলে ধরেছি এই নাটকে। তবে এ নাটক রাজনীতির নয়, এ নাটক আবেগের। এতে কোনও রাষ্ট্রীয় মতবাদ নেই, আছে

মানুষের মনের কথা। আমার স্বপ্নের মানুষ এই নাটকে বিচরণ করছে। ভালবাসছে পরস্পরকে। এই নিয়েই লিখেছি, এই লক্ষ্য নিয়েই তার অভিনয় হবে। এই নাটকটিকে সমালোচকরা যাই বলুন, এর মধ্যে উত্তরকালের অসকার ওয়াইলডের প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট।

বিখ্যাত শিল্পী ফ্রাঙ্ক মাইলসের স্টুডিওতে লিলি ল্যাংট্রি বসে আছেন, তাঁর পোর্ট্রেট আঁকছেন মাইলস, সেই সময় অসকার ওয়াইলড হঠাৎ স্টুডিওতে এসে হাজির হলেন। অনন্যসাধারণ সুন্দরী লিলি ল্যাংট্রি। আজকালকার চিত্রতারকাদের মত একৈকালের সুন্দরীদের অতি দ্রুততালে উত্থান-পতন ছিল না, লিলির সৌন্দর্যের খ্যাতি আজ অনেক কাল পেরিয়েও অম্লান হয়ে আছে। অক্সফোর্ডের বন্ধু ফ্রাঙ্ক মাইলস পেনসিল-স্কেচ-বিশারদ, এবং লিলি ল্যাংট্রির স্কেচ বিভিন্ন ভঙ্গীতে এঁকে এবং প্রকাশ করে তিনিই একরকম লিলির সৌন্দর্যখ্যাতি প্রচার করেন। সালিসবারি স্ট্রীটের যে ফ্ল্যাটে অসকার থাকতেন তারই ওপরতলায় থাকতেন ফ্রাঙ্ক। প্রতিটি মনোহারি দোকানে সেই সময়ে ফ্রাঙ্কের আঁকা লিলির স্কেচ শোভা পেত। প্রথম দর্শনেই অসকার লিখলেন—
"A lily girl, not made for this world's pain."

লিলিকে অসকারের সেদিন ভেনাস ডি মিলোর চাইতে সুন্দরী মনে হয়েছিল। তাই তাঁকে এই প্রশস্তি নিবেদন। অসকার লিখলেন—

"Even to kiss her feet I am not bold,
Being o'ershadowed by the wings of awe,
Like Dante, when he stood with Beatrice."

লিলি অল্প বয়সে বেলফাস্টের বয়স্ক বিপত্নীক মিঃ ল্যাংট্রিকে বিয়ে করেন, তাঁর বাবা লি ব্রেটন ছিলেন ডীন অব জারসী। কিন্তু লিলির সৌন্দর্য ল্যাংট্রির গৃহকোণে আবদ্ধ থাকার সামগ্রী নয়, তাই সারা লণ্ডনে তাঁর রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। একদিন উচ্ছ্বাসের মাথায় শিল্পী ফ্রাঙ্ক মাইলস বলে উঠলেন—"I with my pencil, Oscar with his pen, will make her Joconde and the Laura of this century."

লিলির স্বামী রেস এবং জুয়া নিয়ে মত্ত, সেই হিসাবে অসকার ওয়াইলড সহচর হিসাবে বরণীয়। অসকারের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে লিলি লিখেছেন—"One of the most alluring voices that I have listened to."

তা ছাড়া অসকার তখন Great Aesthete হিসাবে Punch পত্রিকার কার্টুন ছবির বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত না হলেও অসকার সুখ্যাতি অর্জন করেছেন গোড়া থেকেই। সেই অসকার লিলিকে উদ্দেশ করে লিখলেন—"To Helen, formerly of Troy, now of London"—এমন একটি মানুষের কাছে প্রশস্তি লাভ কার না ভাল লাগে!

অসকারের এই ভাল লাগার পিছনে, ভাল পথেই হোক আর মন্দ পথেই হোক, কিছু খ্যাতি অর্জন করা প্রয়োজন এই নীতি ছিল, এ কথাও কেউ কেউ বলেন। লিলির ভক্তবৃন্দের তালিকায় যাঁরা ছিলেন তার মধ্যে প্রিন্স অব ওয়েলস (সপ্তম এডওয়ার্ড) অন্যতম। সমাজ-জীবনে যে প্রচণ্ড বিস্ময়, এবং বহির্জগতেও লিলির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, সুতরাং সেই মেয়েকে প্রেম নিবেদন করার পিছনে নিছক প্রেম নয়, অন্য কিছু ছিল এই কথা অনেকে বলেন। 'The Days I knew' নামক আত্মজীবনীতে লিলি লিখেছেন—'ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার বাড়ির পথে ঘুরে অসকার কবিতার লাইন রচনা করতেন। একদিন ক্লান্ত হয়ে আমারই দোরগোড়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অনেক রাত্রে ফিরতেন মিঃ ল্যাংট্রি, ঘুমন্ত অসকারকে ডিঙিয়ে সেদিন বাড়ি ঢুকতে হয়েছিল তাঁকে।'

দুজনের গভীর প্রেম জমে উঠল। সারা বসন্তকাল উভয়ে একত্র ঘোরাঘুরি করলেন। কিন্তু অসকারের সকল চেষ্টা বৃথা হল। শিল্প বিষয়ে লিলির এতটুকু আগ্রহ নেই, লিলি নিজেই শিল্পের বিষয়বস্তু—চিনি না খেয়ে যে চিনিই হতে চায়। একদিন রাসকিনকে এনে হাজির করলেন লিলির কাছে। পরিচিত হয়ে লিলি কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। এমন কি পোশাকপরিচ্ছদ সম্পর্কেও অসকারের নির্দেশ মানতে লিলি রাজী নয়।

অসকার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, লিলিটাকে নিয়ে পারা যায় না, যা বলি তা কিছুতেই শুনবে না।

তাই নাকি ?

হাঁ, আমি ওকে বলি ওর উচিত প্রতিদিন কালো পোশাক পরে, দুটি কালো ঘোড়ায় টানা কালো ভিক্টোরিয়া গাড়িতে চড়ে পার্কে বেড়ানো, সেই গাড়ির গায়ে রক্তাক্ষরে লেখা থাকবে 'Venus Annodomini'। তা কিছুতেই রাজী নয়।

আরও দুজন অভিনেত্রীকে ওয়াইলড প্রশস্তি জানিয়েছিলেন : একজন সারা বার্নহার্ড, 'Phedre' নামক সনেটটি তাঁকে উৎসর্গীকৃত ; আর এলেন টেরী, তাঁর সম্পর্কিত অসকারের কবিতা এলেনকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। এলেন পরে লিখেছেন—"The most remarkable men I have known were Whistler and Oscar Wilde."

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্র্যাণ্ডের এই বাড়ি ছেড়ে অসকার চেলসিয়ার টাইট স্ট্রীটের বাসায় উঠে গেলেন, সঙ্গে ফ্রাঙ্ক মাইলসও গেলেন। মাইলস সুপুরুষ ছিলেন। এই টাইট স্ট্রীটের বাড়িতেও সালিসবারি স্ট্রীটের বাড়ির মত পার্টি এবং মজলিসে বহু বিচিত্র মানুষ এবং প্রখ্যাত ব্যক্তি হাজির হতেন—প্রিন্স অব ওয়েলস পর্যন্ত। মাইলসের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত অসকারের বিচ্ছেদ ঘটে। কারণটা জানা নেই। কেউ বলেন কবিতা নিয়ে বিরোধ, সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মাইলস পরে হয় আত্মহত্যা করেন, নয়তো উন্মাদাগারে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ঠিক যে কী ঘটেছিল সে কথা অজ্ঞাত।

আর সেই শেষ বসন্তের সঙ্গেই লিলি ল্যাংট্রি বা জারসী লিলির সঙ্গে অসকারের প্রেমেরও অবসান ঘটল।

গিলবার্ট এবং সালিভ্যান অপেরার দল ন্যু ইয়র্কে তখন 'Patience' নাটকের অত্যন্ত সাফল্যজনক অভিনয় করছেন। আমেরিকান ব্যুরো এই নাট্য প্রযোজনার ব্যবস্থাপক। এঁদের হঠাৎ খেয়াল হল এই নাটকের সাফল্য আরও জমবে যদি Aesthete অসকার ওয়াইলডকে আমেরিকায় আনা যায়। একটু অনুরোধ করে তাঁকে যদি উদ্ভট পোশাক পরিয়ে শহরের পথে সূর্যমুখী আর লিলি ফুল হাতে করে শোভাযাত্রাও সাজানো যায় তা হলে চমৎকার হবে। অপেরা Bunthorne চরিত্রের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হবেন অসকার।

অসকার তখন মার সঙ্গে এক নম্বর ওভিংটন স্কোয়ারে আছেন, দ'য়লি কার্টের বিজনেস্ ম্যানেজার কর্নেল মর্স ন্যু ইয়র্ক থেকে 'কেবল' করলেন—"Will you consider offer for fifty readings ?" তৎক্ষণাৎ ওয়াইলড জবাব দিলেন—"Yes, if offer is good."

কর্নেল মর্স যে উদ্দেশ্যেই এই আমন্ত্রণ জানান, এই আমন্ত্রণ গ্রহণের পিছনে অসকার ওয়াইলডের একমাত্র যুক্তি ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের। স্থির হল সকল খরচ কার্টে ব্যুরো বহন করবেন আর টিকিট বিক্রির এক তৃতীয়াংশও তিনি পাবেন রয়ালটি হিসাবে। লিভারপুল থেকে Arizona জাহাজে কীমনাম ইডেন সঙ্গে যাত্রা করে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি অসকার ওয়াইলড ন্যু ইয়র্কে পৌঁছলেন।

যুনাইটেড স্টেটসে পৌঁছে কাস্টমস অফিসারের প্রশ্নের জবাবে অসকার বললেন—"I have nothing to declare except my genius."

সংবাদপত্রের রিপোর্ট তেমন অনুকূল না হলেও, লাঞ্চ, ডিনার, টি, রিসেপশান, ডান্স, ড্রাইভ, থিয়েটার পার্টি প্রভৃতির নিমন্ত্রণ আসতে লাগল শ্রাবণের ধারার মত। এখানে তিনি অর্থ সংগ্রহে এসেছেন, আত্মপ্রচারে এসেছেন সুতরাং একটি আমন্ত্রণও উপেক্ষণীয় নয়। প্রতিটি আসরে অসংখ্য মেয়ে উপস্থিত থাকতেন আর নানা রকমের পোশাকে সেজে আসতেন। অসকারও প্রীত্যর্থে লণ্ডনের রাস্তায় যে পোশাক পরে ঘুরতেন সেই পোশাকে সাজতে শুরু করলেন। যে পোশাকে এসথেটিকসরা সাজতেন, সেই পোশাক পরে অনেকে অসকারের সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত হতেন, টেবিলে সূর্যমুখী এবং লিলি ফুল প্রচুর ভাবে সাজানো থাকত। গৃহকর্ত্রীর আসনের চাইতে কারুকার্যমণ্ডিত সুউচ্চ সিংহাসন মাননীয় অতিথি অসকারের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। দু পাশে রমণীয় রমণীদের

নিয়ে আহারে বসতেন অসকার। মার্কিন নারীর সৌন্দর্যে প্রীত হয়ে অসকার বলেছিলেন—"America reminds me of one of Edgar Allan Poe's exquisite poems because it is full of belles."

এই উক্তি শোনার পর মেয়েদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—Behold the tribute of the belles! এই বলে কয়েকটি গোলাপফুল কবির ওপর বর্ষণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই চতুর্দিক থেকে কবির ওপর পুষ্পবৃষ্টি শুরু করলেন। নন্দনতাত্ত্বিকের যোগ্য অভিনন্দন। পূর্বপরিকল্পনানুসারে অসকার ওয়াইলড অবশ্য বিচিত্র পোশাকে শোভাযাত্রা করে বেরোতে রাজী হন নি। তাতে অবশ্য ব্যবস্থাপকগণ ক্ষুণ্ণ হলেন।

ন্যু ইয়র্কে পৌছনর সাত দিন পরে 'চিকারিং হলে' প্রথম বক্তৃতা দিলেন অসকার ওয়াইলড। সভায় তিল ধারণের স্থান ছিল না। বক্তৃতার বিষয় "ইংলিশ রেনেসাঁস"। সুবিশাল জনতার ধারণা ছিল না অসকারের বক্তৃতার বিষয় সম্পর্কে, তাই অসকার যখন বিচিত্র পোশাকে বক্তৃতা-মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন তখন শ্রোতারা ভাবছিল কিছু হাস্যকর কাণ্ড ঘটবে, কিন্তু অসকার শুরু করলেন—'আপনারা মিঃ সালিভানের চমৎকার গান এবং মিঃ গিলবার্টের রসাল কৌতুক শুনেছেন তিনশ রজনী ধরে, এত রঙ্গরসের পর আপনাদের যদি একটি সন্ধ্যায় কিছু সত্যকথন শোনার অনুরোধ জানাই তা হলে হয়তো নিছক অন্যায় অনুরোধ হবে না—'

সুকণ্ঠ অসকার সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, রাসকিন এবং ওয়ালটার পেটার তাঁর বক্তৃতার মৌল ভিত্তি। সভা সার্থক হল। নন্দনতত্ত্বের জন্য আগ্রহশীল শ্রোতাদের উৎসাহে নয়, অসকারের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত মাধুর্য, বক্তব্যবিষয় পেশ করার বৈচিত্র্য এবং ভঙ্গিমা, মনোহর কণ্ঠস্বর, তা ছাড়া তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিশেষ করে চোখে লেগেছে। তখনকার দিনে অক্সফোর্ডে গড়া মানুষ আমেরিকা তেমন দেখে নি। চার্লস ডিকেন্সের পর যুক্তরাষ্ট্রে এমন সম্মান আর কোনও বক্তা পান নি।

একজন উৎসাহী মহিলা বলেছিল, ন্যু ইয়র্কে আপনার এই সম্মান, বোষ্টনে আপনার পূজো হবে।

হার্ভার্ডের ছেলেরা বাটনহোলে একটি করে বিরাট লিলি ফুল গুঁজে আর হাতে সূর্যমুখী ফুল নিয়ে শোভাযাত্রা বার করল। অসকার বললেন, 'আমার চারদিকে দেখছি এসথেটিক মুভমেন্টের চিহ্ন। কিন্তু আমার চারপাশ দেখে বলতে ইচ্ছে করে—ঈশ্বর, চেলাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।'

ন্যু হ্যাভেনের ছাত্ররাও তাঁকে বিদ্রূপ করার চেষ্টা করেছিল। প্রত্যেকে টকটকে লাল টাই গলায় এঁটে, হাতে একটি সূর্যমুখী ফুল নিয়ে শোভাযাত্রা বার করল, সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে রইলেন এক বিরাটাকৃতির নিগ্রো। বক্তৃতাসভার গ্যালারিতে বসে তারা কিন্তু বক্তাকে বিরক্ত বা বিব্রত করে নি।

লিডভালে খনি শ্রমিকদের আধিপত্য। সবাই বলেছিল যে ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরা কঠিন। অন্ততঃ ম্যানেজার গুলি খাবে, কারণ ওখানকার সবাই রিভলবার ট্যাঁকে নিয়ে ঘোরে ও কথায় কথায় গুলি চালায়।

অসকার অদম্য উৎসাহে সেখানে বেনভেনুতো চেলিনির আত্মকথা পাঠ করে শোনালেন। সবাই খুশী হয়ে প্রশ্ন করল, সেই চেলিনিকে কেন সঙ্গে আনলেন না?

অসকার জবাবে বললেন, আনতুম, কিন্তু মৃত্যু প্রতিবন্ধক, লোকটি মারা গেছেন।

একজন প্রশ্ন করল, কে তাঁকে গুলি করেছিল?

যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালে অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস, লংফেলো, লুইসা এলকট, জেফারসন ডেভিস, হেনরী ওয়ার্ড বীচার, ওয়ালট হুইটম্যান প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পান অসকার। তাঁরা সবাই তাঁকে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে গ্রহণ করলেন।

কামডেনে হুইটম্যানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন অসকার। হুইটম্যানের বয়স তখন তেষট্টি আর ওয়াইলডের সাতাশ। সুইনবার্ন, রসেটি, মরিস, টেনিসন, ব্রাউনিং প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর আলোচনা হল। অসকার এঁদের সকলের সম্পর্কেই বিশেষভাবে আলোচনা করলেন।

বৃদ্ধ হুইটম্যানের খুব পছন্দ হল অসকারকে, তিনি বললেন, আমি তোমাকে অসকার বলেই ডাকি ?

নিশ্চয়ই, আমিও তাই ভালবাসি।

মহাকবির পায়ের কাছে বসে অসকার বললেন, কারও বক্তব্যবিষয়ের মধ্যে যদি তেমন সৌন্দর্য না থাকে বা তাঁর বলার ভঙ্গি যদি মনোহর না হয় তা হলে আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি তাঁর কথা শুনতে পারি না।

হুইটম্যান বললেন, কেন অসকার ? তা কেন ? যে মানুষ সৌন্দর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, সে এমনই মরে আছে। আমার মতে সৌন্দর্য একটি সম্পূর্ণ যোগফল, আকারবিহীন নিছক বিমূর্তন (abstraction) মাত্র নয়।

ওয়াইলড হুইটম্যানের যুক্তি মেনে নিয়ে বললেন, ঠিক বলেছেন। মনে পড়ছে আপনি বলেছেন, "All beauty comes from beautiful blood and a beautiful brain."

এইভাবে দুঘণ্টা আলোচনা চলল। অবশেষে হুইটম্যান বললেন, অসকার, নিশ্চয়ই তোমার তৃষ্ণা পাচ্ছে, একটু ঘোল করে দিই।

বড় এক গ্লাস ঘোল করে অসকারকে দিলেন হুইটম্যান।

আশীর্বাদ করলেন, গুডবাই অসকার! গড্ ব্লেস ইউ!

হুইটম্যান ভারী খুশী হয়েছিলেন। লণ্ডনস্থ এক বন্ধুকে লিখলেন—"Have you met Oscar Wilde? He is a fine, large, handsome youngster and has the good sense to take a fancy on me."

য়ুনাইটেড স্টেটস থেকে কুইবেক, মনট্রিয়েল ও টোরনটো বেড়াতে গেলেন অসকার। নায়াগ্রা প্রপাত তাঁর মনে লাগে নি। আমেরিকা সম্পর্কে ওয়াইলডের অনেক চমকপ্রদ উক্তি আছে, তার মধ্যে আমেরিকান সম্পর্কে—"...American women are charming, but American men—alas!"

আর আমেরিকার কাছে "Art has no marvel, and beauty no meaning, and the past no message." এই তাঁর বাণী।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকাল ভ্রমণেই কাটল। সময় পেলেই অবশ্য 'The Duchess of Padua' নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত সংলাপ লিখেছেন। আশা ছিল মেরী এনডারসন এই নাটকটি প্রযোজনা করবেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে লিলি ল্যাংট্রি ন্যু ইয়র্কে এলেন। তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বললেন, "I would rather have discovered Mrs. Langtry than have made the discovery of America". ন্যু ইয়র্ক রঙ্গমঞ্চে টম টেলর লিখিত 'An Unequal Match' নামক নাটকে লিলি ল্যাংট্রি অবতীর্ণ হন। সেই নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গেই 'New York Herald'-এর গেস্ট ক্রিটিক হিসাবে লিখেছিলেন অসকার। অভিনয়ের প্রশংসা করতে না পেরে অভিনেত্রীর সৌন্দর্য সম্পর্কে লিখেছিলেন—"Pure Greek it is—" ইত্যাদি।

মোটামুটি যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ সফল হয়েছিল অসকার ওয়াইলডের। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে তিনি ইংলণ্ডে ফিরলেন একরকম সাবালক হয়ে। অনেক জ্ঞান বেড়েছে, অভিজ্ঞতাও। বাবদাবুদ্ধি হয়েছে। পুরনো মুদ্রাদোষ বিলুপ্ত। তা ছাড়া 'aesthete' অসকার ওয়াইলডের যে সব বাতিক ছিল তা অন্তর্হিত হয়ে গেল। ইংলণ্ডে প্রবেশ করলেন নতুন সুসংস্কৃত অসকার ওয়াইলড।

পাঁচ

দিনকতক মার্কিন সফরের গল্পগুজবে লণ্ডনের আসর জমিয়ে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অসকার প্যারী ভ্রমণে গেলেন, এবং তিন মাস পরে একেবারে রিক্ত হয়ে ফিরে এলেন। উদ্দেশ্য ছিল মেরী এনডারসনের জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটকটি শেষ করা। গোড়া থেকেই বালজাক সম্পর্কে দারুণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল অসকারের এবং শেষ পর্যন্ত সেই শ্রদ্ধা অটুট ছিল। বালজাক সাদা ড্রেসিং গাউন পরে সন্ন্যাসীর মত ঝলঝলে পোশাকে লিখতেন, অসকারও তেমনই একটি পোশাক তৈরি করলেন। লিখবেন সেই পোশাক পরে, এমন কি বেড়ানোর ছড়িটা পর্যন্ত বালজাকের হাতির দাঁতের ছড়ির অনুকরণে

গড়ানো হল। লেখার সময় আশপাশে প্রখ্যাত লেখকদের গ্রন্থ বা জীবনী ছড়ানো রইল।

অসকার এক বন্ধুকে লিখলেন, 'প্রথম যুগের অসকার এখন মৃত, এখন অসকারের দ্বিতীয় পর্ব, এই অসকারের সঙ্গে পিকাডিলির পথে সূর্যমুখী হাতে নিয়ে যে লম্বাচুল মানুষটি ঘুরে বেড়াত তার কোনও সম্পর্ক নেই, মিল নেই।'

এই সময়েই প্যারীতে অসকারের প্রথম জীবনীকার রবার্ট সেরার্ডের সঙ্গে পরিচয় হল। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হল, অবশ্য এর কিছুকাল পরে অসকারের প্রেমে পড়া এবং পরে সেই প্রেমের পরিণতি হিসাবে পরিণয়ে আবদ্ধ হওয়ার ফলে এই বন্ধুত্বের সূত্র অসকারের দিক থেকে কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। কিন্তু সেরার্ডের প্রীতির অন্ত নেই! শেষ পর্যন্ত এই মানুষটি অসকারের সকল সঙ্কটে অবিচল নিষ্ঠায় সহায়তা করেছেন।

রবার্ট হারবরো সেরার্ড ছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের দৌহিত্র, স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সাহিত্যিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। অসকারের সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ। অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রী না নিয়েই সেরার্ড ফ্রান্সে গিয়েছিলেন, হাতে তেমন অর্থও ছিল না। সেরার্ডের প্রকৃতি ছিল নীতিবাগীশের, তাই বোহিমীয় বাউণ্ডুলে সমাজে না থেকে শহর থেকে দূরে নির্জন গৃহকোণে থাকতেই তাঁর আগ্রহ।

অসকার প্যারীতে পৌঁছে সাহিত্যিক ও শিল্পীসমাজে পরিচিত হওয়ার জন্য তাঁর সেই কাব্যসংগ্রহ 'Poems' সকলকে এক খণ্ড করে পাঠালেন, সেই সঙ্গে একটি করে চিঠি। যথারীতি সৌজন্য সহকারে অনেকে প্রাপ্তি স্বীকার করলেন। এই সংবাদ রবার্ট সেরার্ডের কানেও পৌঁছল, অসকারকে মনে মনে তেমন উচ্চস্থান দিতে পারেন নি সেরার্ড, বরং আত্মপ্রচারক এই স্মার্টবিশমান সম্পর্কে বিরাগ ছিল। ওয়াইলডের ঢঙ এবং কৌশল তাঁর ভাল লাগে নি—অবশ্য এর হেতু নিছক ব্যবসাগত ঈর্ষা এ কথা তিনি পরে স্বীকার করেছেন।

একটা ডিনারে রবার্ট সেরার্ডের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। মনে একটা বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করেই সেরার্ড সে ভোজসভায় যোগ দিয়েছিলেন। অসকারের পোশাক এবং আকৃতি দেখে সেরার্ডের প্রথমটা হাসি পেয়েছিল, কিন্তু ওয়াইলড যখন কথা বলতে শুরু করলেন সেরার্ড মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল যেন প্রাণোন্মাদিনী সুতীব্র সুরা সেই বাক্যে প্রবাহিত হচ্ছে। তবু নীরব রইলেন সেরার্ড।

কথাপ্রসঙ্গে অসকার বললেন, লুভরে ভেনাস দি মিলোর মূর্তি দেখে অপূর্ব আনন্দ পেয়েছি।

সেরার্ড হঠাৎ বললেন, আমি কখনও লুভরে যাই নি, ওই নামটুকু শুনলে আমার প্যারীর সবচেয়ে সস্তায় জিনিস বিক্রির দোকান Grands Magasins dy Louvre এর কথা মনে হয়।

ওয়াইলড বললেন, বাঃ, চমৎকার উক্তি।

পরে সেরার্ড অসকারকে বলেছিলেন যে মনে হয় তিনি অসকারকে ঈর্ষা করতেন।

অসকার শুনে বলেছিলেন, ওটা ঠিক নয়, অপরের সাফল্যে যে মানুষ আনন্দ পায় তার জীবন মাধুর্য ও ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে।

অসকার তাকে নিমন্ত্রণ করলেন সেরার্ডকে। হোটেল ভলটেয়ারে তাকে এসে সেই রাতে ডিনার পর্যন্ত রইলেন সেরার্ড। ডিনারশেষে উভয়ে প্যারীর লাতিন কোয়ার্টারে ঘুরে বেড়ালেন প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত। কেবল বই আর বই সম্পর্কিত আলোচনা হল, দুজনেই কবি-যশঃপ্রার্থী, সুতরাং মানসিক মিল অনেক। ওয়াইলড সুইনবার্ন এবং ওয়ালটার পেটারের কথাই বললেন বেশী করে। এমন কি কার্লাইলের 'ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনে'র নির্বাচিত অংশও আবৃত্তি করে শোনালেন।

রাত দুটোর পর দুই বন্ধু পরস্পরকে বিদায় জানিয়ে পরের দিনের কার্যসূচী স্থির করলেন। সেই রজনীতে দীর্ঘস্থায়ী সুদৃঢ় বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপিত হল। পরে প্যারীর পথে পথে দুজনে অনেক ঘুরেছেন, অনেক আনন্দের দিন একত্রে কাটিয়েছেন। কুড়ি বছর পরে সেরার্ড লিখেছেন—"Each day my admiration for my friend grew almost more enthusiastic."

উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও অন্তরঙ্গতা এইভাবে গড়ে উঠল। সেরার্ড বলেছেন, নিঃসন্দেহে ওয়াইলডের জীবনের এই সর্বশ্রেষ্ঠ কাল, উদ্বেগ আকুলতা চিন্তাভাবনা বর্জিত দিনগুলি পরমানন্দে কেটেছে। এই সময়েই ওয়াইলড অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'The Duchess of Padua' নাটক এবং বিখ্যাত কবিতা "The Sphinx" রচনা শেষ করেন।

এই নাটকের জন্য মেরী এনডারসন এক হাজার ডলার অগ্রিম দিয়েছিলেন। কিন্তু নাটক সম্পূর্ণ হওয়ার পর যখন আমেরিকায় পাঠানো হল তখন আর জবাব আসে না। অবশেষে তার পাঠালেন অসকার। তার জবাব এল যে নাটকটি অপছন্দ হয়েছে। তার পরে অসকার উদাস-ভঙ্গীতে বললেন, "This, Robert, is rather tedious" তারপর সেই 'কেবলে'র কাগজটা ছিঁড়ে গুলি পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। যা ভাল লাগত তা amazing এবং যা খারাপ তা অসকারের কাছে tedious.

অসকারের হাতে তেমন টাকা নেই, তবু সারা প্যারী শহর খুঁজে জেরাড দ্য নারভালের একটি জীবনী অনেক দাম দিয়ে কিনে সেরার্ডকে উপহার দিলেন। বললেন, এই কবির কথা ইংলণ্ডের সাহিত্যিক মহলে আলোচিত হয়; কিন্তু ক্লাসিকের কথা সবাই আলোচনা করে, ক্লাসিক কেউ পড়ে না। তুমি এই বইটা পড়ে একটি ভাল প্রবন্ধ লিখতে পারবে এবং খ্যাতি অর্জন করবে।

চ্যাটারটন, অ্যালান পো, বোদলেয়ারের মত দ্য নারভালেরও শোচনীয় পরিণতি ঘটেছিল। কুখ্যাত পল্লীর একটি ঘরে দ্য নারভালের মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। সেই রাত্রে দুই বন্ধুতে প্যারীর রাজপথে ঘুরে ঘুরে সেই কুখ্যাত পল্লীর সন্ধান করে কাটালেন।

এই সময় গণিকাপল্লীর ওপর একটি কবিতা লিখলেন অসকার—"The Harlot's House"। কবিতাটি সেই-সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিষয়বস্তুতে বিকৃত রুচির আমদানি তখনও প্রসন্নচিত্তে কেউ গ্রহণ করত না। তিন মাস প্যারীতে থাকাকালে অসকার যাদের সঙ্গে মিশতেন তাদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে: শিল্পী, অভিজাত এবং অন্ত্যজ। যে-কোনও সাধারণ মানুষের সঙ্গে অবলীলাক্রমে মিশতে অসকারের বাধত না। আছে সালিশ, চোর, ভিক্ষুক, কবি, পুলিসের চর প্রভৃতি নানাবিধ গুণের অধিকারী। অসকার তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে আলাপ করতেন। এই কারণেই বিচারশালায় সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে অসকার বলেছিলেন—"I would talk to a street arab with pleasure."

আলফঁস দোদে অসকারের মুখে ভেনাস ডি মিলোর উচ্চপ্রশংসা শুনে বলেছিলেন—বাড়াবাড়ি। ভিক্টর হুগোর তখন অনেক বয়স, এক সম্বর্ধনা-সভায় অসকারকে তাঁর পাশে আসন দেওয়া হয়। কিন্তু দু-একটি কথা বলার পর হুগোর ক্লান্ত চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। পল ভেরলাইনকে ভাল লাগে নি, তাঁর কুশ্রী আকৃতির জন্য। জোলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু জোলা অসকারকে দেখে তেমন প্রীত হন নি। দেগাস, পিসারো, সার্জেন্ট, কোকেলাইন প্রভৃতি শিল্পীদের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল, আর সবচেয়ে হৃদ্যতা জমেছিল পল বুর্জের সঙ্গে। ক্রমে অর্থ শেষ হয়ে এল, সেরার্ড আগেই চলে এসেছিল, অসকারও লণ্ডনে ফিরে এলেন।

ছয়

সেরার্ডের আর্থিক সম্বল না থাকার জন্যই হোক বা অন্য কারণেই হোক দুই বন্ধুর মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটে। তারপর হঠাৎ কয়েক মাস পরে একই ট্রেনের যাত্রী হিসাবে দুজনের আবার দেখা হয়। অসকার তখন চার্লস স্ট্রীটে থাকেন, সেখানে থাকার জন্য আমন্ত্রণ করলেন সেরার্ডকে। দুজনের পুনর্মিলন হল বটে, কিন্তু প্যারীর সেই আনন্দ-উজ্জ্বল মুহূর্ত আর ফিরে এল না, সেখানে জীবনের অন্য অর্থ ছিল, এখানে অন্য এক জীবন। তারপর টাকা—সেরার্ড তখন একেবারে নিঃসম্বল বললেই চলে। অসকার তখন আবার বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান, মাঝে মাঝে প্রচুর রোজগারও হয়, তাঁর পকেট থেকে নোট বার করে সেরার্ডকে বলেন, এ আমাদের দুজনেরই টাকা।

সেরার্ড অবশ্য অতটা খুশী হতে পারতেন না, অর্থাভাব তাঁর মনে বিশেষ অশান্তির সৃষ্টি করছিল, তা ছাড়া এই সময় তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ যে উপন্যাস লিখেছিলেন তা মোটেই সফল হল না, কিছুই পাওয়া গেল না।

এমনই একদিন ক্লান্ত সেরার্ড ঘুমে আচ্ছন্ন, সেই ভোরে তাঁকে টেনে তুলে অসকার আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন, বিয়ে করছি।

সেরার্ড ঘুমন্তই জবাব দিলেন, অতিশয় দুঃসংবাদ।

তারপর আবার পাশ ফিরে ঘুমতে লাগলেন।

অসকার বললেন, রবার্ট, তুমি একটি জন্তু—ব্রুট!

কথা আর অগ্রসর হল না। এক রকম সেই থেকেই বন্ধুত্বের উষ্ণ আবেশ শীতল থেকে শীতলতর হয়ে এল।

অসকার ওয়াইলডের আর একজন জীবনীকার বোরিস ব্রাসলের প্রশ্নের উত্তরে সেরার্ড ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যে কথা বলেছিলেন তা এইখানে উল্লেখযোগ্য। তখন সেরার্ডের বয়স সত্তর পার হয়েছে, আর অসকার সম্পর্কিত অনেক ঘনিষ্ঠ তথ্য তিনিই জানতেন। তাই বোরিস ব্রাসল অসকার-জীবনের এই বিশেষ বিতর্কমূলক জ্ঞাতব্য তথ্য বিষয়ে তাঁকেই প্রশ্ন করেন। উত্তরে সেরার্ড বলেন:

"অক্সফোর্ডে পড়ার সময় অসকার সিফিলিসে আক্রান্ত হন, চিকিৎসার জন্য মারকারি ইনজেকসন দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ এই চিকিৎসার ফলেই তাঁর দাঁতগুলি পরে কালো হয়ে যায় এবং নষ্ট হয়। মিস্ কন্সটানস্ লয়েডের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করার আগে তিনি লণ্ডনের একজন ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষিত হন। ডাক্তার অভিমত দেন যে এখন তিনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত এবং নির্বিচারে বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু রোগ তাঁর দেহে ছিল এবং ক্রমশঃ তা প্রকাশিত হতে থাকে। তখন অসকার স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সংসর্গ বাধ্য হয়েই বন্ধ করেন, এবং কোনও বন্ধুর দ্বারা সমকামিত্বে দীক্ষিত হন।"

এই ব্যাধিতেই শেষ পর্যন্ত অসকারের নাকি মৃত্যু হয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দেই অসকার ডাবলিনের কুইন্স কাউন্সেল স্বর্গীয় হোরাস লয়েডের ছাব্বিশ বছরের মেয়ে কন্সটানসের প্রেমে পড়লেন। তখন তাঁর নিজের বয়স ত্রিশ। কন্সটানস সুন্দরী ছিলেন, চমৎকার সোনালী চুল, বড় বড় দুটি উজ্জ্বল চোখ। তাঁকে দেখার কুড়ি বছর পরে একজন মহিলা লিখেছিলেন—"It was a face whose loveliness was derived more from the expression and exquisite colouring than from any claim to the regular lines that constitute beauty."—পৈতৃক অর্থও প্রচুর ছিল কন্সটানসের। সেইজন্য ফ্রাঙ্ক হ্যারিস বলেছিলেন, অসকার টাকার লোভে বিয়ে করেছেন। কথাটা ঠিক নয়, অসকার সত্যি কন্সটানসকে ভালবেসেছিলেন। লয়েড-পরিবার এই বিবাহে সুখী হয়েছিলেন, কন্সটানসের ভাই ওথো অসকারকে লিখেছেন—আর একজন সহোদর হিসাবে তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

বিবাহের পূর্বে অসকার স্ত্রীর কাছে তাঁর অতীত জীবনের সমস্ত কথা প্রকাশ করেছিলেন আর কন্সটানস অতীতের কথা দুঃস্বপ্নের মত ভুলতে বলেছিলেন। ডাবলিনে না থাকলে উভয়ের মধ্যে পত্রবিনিময় হত। সেই চিঠির সাহিত্যিক মূল্য কম নয়। কন্সটানস স্বামীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"Do believe that I love you most passionately with all the strength of my heart and mind." অসকার তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'Poems' একখণ্ড কন্সটানসকে উপহার দেন, তার প্রথম পৃষ্ঠায় কন্সটানসকে উদ্দেশ করে যে কবিতাটি অসকার রচনা করেন, আন্তরিকতা ও প্রেমের গভীরতার জন্য তা স্মরণীয়। সেই কবিতাটির শেষ স্তবক—

"And when wind and winter harden
All the loveless land
It will whisper of the garden,
You will understand."

এই কবিতাটি কবির ভগ্নী আইসোলার মৃত্যুতে রচিত "Requiescat" নামক বিখ্যাত কবিতাটিকেও ম্লান করে দেয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্যাডিংটনে সেণ্ট জেমস চার্চে শুভ-বিবাহ হয়ে গেল। পাত্রীর দাদামশায়ের শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন যদিচ জাঁকজমক বর্জন করা হয়েছিল তবু গির্জাঘরে তিলধারণের স্থান ছিল না। বর-বধূর পোশাক-পরিচ্ছদ নাকি অতুলনীয়, এবং সমস্তই অসকারের পরিকল্পনামাফিক। বিবাহের পর বর-কনে প্যারীতে মধুযামিনী যাপন করতে গেলেন।

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আনন্দের আর সীমা রইল না। ফুল-হাসি এবং যৌবনের গান ছাড়া আর সব তুচ্ছ। রবার্ট সেরার্ডকে এই আনন্দের উৎস দেখালেন অসকার। সেরার্ড দেখলেন স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে অসাধারণ প্রীতি ও প্রেম।

একদিন তিনজনে প্যারীর পথ দিয়ে চলেছেন ফিটন গাড়ি চড়ে, এমন সময় সেরার্ড বললেন, অসকার, আমার হাতের এই ছড়িটা যদি ফেলে দিই, দোষ হবে?

অসকার বললেন, নিশ্চয়ই, একটা কেলেঙ্কারি হবে, হৈচৈ, সোরগোল হবে। কিন্তু হঠাৎ এমন খেয়ালই বা হল কেন তোমার?

সেরার্ড বললেন, এটি গুপ্তি, এই ছড়ির ভেতর একটি তলোয়ার আছে, তোমাদের এত হাসিখুশী দেখাচ্ছে যে মনে হচ্ছে এই তলোয়ার তোমাদের বুকে বসিয়ে দিই।

মিসেস ওয়াইলড হেসে বললেন, ওটা বরং আমাকে দিন। এই আনন্দের স্মরণীয় স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাক এই ছড়িটা।

সত্যিই সেই ছড়ি অনেক দিন ধরে মিসেস ওয়াইলডের কাছে ছিল। অসকার সংসারে প্রবেশ করলেন, চেলসিয়ার টাইট স্ট্রীটের ষোল নম্বর বাড়ি হুইসলারের আঁকা ছবি দিয়ে সাজানো হল। তিনি 'Woman's World' নামক পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন, মাইনে বাৎসরিক তিনশ পাউণ্ড। এখনকার হিসাবে প্রায় দেড় হাজার পাউণ্ড। এই পত্রিকার মালিক ছিলেন বিখ্যাত প্রকাশক ক্যাসেল কোম্পানি। এই সময় আর্নল্ড বেনেটের সঙ্গে অসকারের পরিচয় হয়, আর্নল্ড সাপ্তাহিক 'Women' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মেয়েদের পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে অসকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, অনেক রচনা নিজেই লিখেছেন, তা ছাড়া অলিভ স্ক্রাইনার, মেরী করেলি, আর্থার সিমন্স, অসকার ব্রাউনিং প্রভৃতি তাঁর পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। সম্পাদক নিজে সাহিত্য-পৃষ্ঠায় সমালোচনা লিখতেন। সমালোচক অসকার ডব্লু. বি. ইয়েটসের গোড়ার দিকের কবিতার মধ্যে সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতির পরিচয় পেয়েছেন এবং অধ্যাপক সেণ্টস্‌-বেরীর রচনায় ব্যাকরণগত ভুল লক্ষ্য করে তিরস্কার করেছেন। গোড়ার দিকে কর্মশালার নিয়মনিষ্ঠা মেনে চললেও ক্রমে সম্পাদকীয় চাকরিও একঘেয়ে লাগত অসকারের, তাঁর আগমন ও নির্গমন অত্যন্ত অনিয়মিত হতে লাগল। কর্তৃপক্ষ দু-একবার বলে দেখলেন, তারপর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যার পর তিনি পদত্যাগ করলেন, পত্রিকাটি এর পর আর এক বছর চলেছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পুত্র সিরিল এবং পরের বছর দ্বিতীয় পুত্র ভিভিয়ানের জন্ম হয়। সিরিল প্রথম মহাযুদ্ধের কালে মারা যান, ভিভিয়ান ১৯৪৬ সনে পিতার শেষ গল্পরচনা সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

কন্সটানস অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন। লেডী স্যাণ্ডহার্স্ট চার্চের কাজকর্মেই মত্ত থাকতেন, তিনি ছিলেন কন্সটানসের অন্তরঙ্গ বান্ধবী। বিবাহিত জীবনের শেষ দিকে কন্সটানস মাদাম ব্লাভাটস্কীর তাঁওতায় থিওসফি নিয়ে অত্যন্ত মেতে ছিলেন। কন্সটানস অতিশয় সরলমতি মানুষ ছিলেন। অসকার বলতেন বিবাহের একটি ত্রুটি এই যে দু পক্ষকেই কিছু না কিছু মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়। অসকারও স্ত্রীকে অনেক মিথ্যা বলতেন, তার প্রমাণ একবার বলেছিলেন—গলফ্‌ খেলতেই অনেক সময় লাগে। কন্সটানস তাই বিশ্বাস করে একজনকে লিখেছিলেন—অসকার গলফ্‌ খেলা নিয়েই মেতে আছে।

চার বছর যেতে না যেতেই এই প্রেমের উদ্দাম স্রোতে ভাটা পড়ল। তার অবশ্য প্রধানতম কারণ কন্সটানসের মধুর প্রকৃতি, স্বামীকে তিনি স্বামী বলেই গ্রহণ করেছিলেন, স্বামীর ওপর প্রভুত্ব খাটাতে পারেন নি, অথচ অসকারের

প্রকৃতি ছিল একজনের বলিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণে চলা, কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া। এমন ভদ্র নম্র সেবাপরায়ণা নারী তাই অসকারকে সংসারের শৃঙ্খলে বেশী দিন বাঁধতে পারে নি। অসকার ওয়াইলডের মতে তাই—"The worst of having a romance is that it leaves one so unromantic."

সাত

শিল্পী জেমস ম্যাকনীল হুইস্‌লারের সঙ্গে অসকারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা অবশ্য অবশেষে কলহে শেষ হয়। হুইসলার ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। তখন পর্যন্ত কয়েকটি কবিতার লেখক ভিন্ন অসকারের অন্য পরিচয় নেই। দুজনেই সুরসিক, (অবশ্য এই রসিক কথাটির নিছক বাংলা অর্থে মিলে হবে না; ইংরেজী উইট কথাটির ঠিক বাংলা হয় না, যা হয় তা ভাঁড়ের কাছাকাছি, তাই সুরসিক বলাই ভাল) দুজনেই 'উইট', একেবারে কাঠে কাঠে, তাই শেষ পর্যন্ত যে বিরোধ অনিবার্য তাই ঘটেছে। হুইসলার ছিলেন প্রতিভাধর শিল্পী। শিল্প সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অভিজ্ঞতা-প্রসূত, আর অসকারের জ্ঞান পুঁথিগত। বিরোধ বাধল এই ব'লে যে হুইসলারের কথা নিজের বলে চালাচ্ছেন অসকার, বেমালুম চুরি বলাই চলে। রাসকিন একবার বলেছিলেন—সাধারণের মুখে খানিকটা রঙ আর কালি ছুঁড়ে হুইস্‌লার দুশো গিনি লুটতে চায়।

এই উক্তির জন্য মানহানির মামলা আনলেন হুইসলার। আদালতে ছবি আঁকতে কত সময় লেগেছে এই প্রশ্নের উত্তরে হুইসলার বললেন—সম্ভবতঃ দুদিনের পরিশ্রম।

দুদিনের পরিশ্রমের দাম দুশ গিনি ?

না, সারাজীবনের অভিজ্ঞতার দাম। (Oh no, for knowledge of a lifetime.)

সেই অল্প বয়সে এই উক্তি অসকারের ভারী মনে লেগেছিল, তাই তিনি একরকম যেচে হুইস্‌লারের সঙ্গে আলাপ করেন, পরে দুজনকে প্রায়ই কাফে রয়্যালে ভোজনরত দেখা যেত। তখন অসকার চেলা, আর হুইসলার গুরুর ভূমিকায়।

ইংলণ্ডে ফিরে অসকার ৬৫টি বক্তৃতা-সভায় যোগ দেন। গ্রীষ্মকালে মারগেট, রামস্‌গেট, সাউথপোর্ট প্রভৃতি বিশ্রামবিহারে আর শীতকালে লণ্ডন ও অন্যান্য শহরে আমেরিকার অভিজ্ঞতা বিষয়ে এবং নন্দনতাত্ত্বিক হিসাবে 'আধুনিক জীবনে আর্টের মূল্য' সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন। এইসব সৌন্দর্যতত্ত্বের বক্তৃতায় রাসকিন এবং হুইস্‌লারের বাণী এবং বক্তব্য যথেচ্ছ গ্রহণ করেছেন অসকার, এবং হুইসলার এই অপরাধ ক্ষমা করেন নি। হুইস্‌লারের বক্তব্য এবং বাণী নিজস্ব বলে চালানো এবং সেই সঙ্গে তাঁর বিরোধী রাসকিনের মতামতের প্রশংসা হুইস্‌লারের মনোমত হয় নি। হুইসলার ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫ 'আর্ট ফর আর্টস সেক' এই বিষয়বস্তু নিয়ে বক্তৃতা দিলেন প্রিন্স হলে। সেদিন 'Pall Mall Gazette'-এর তরফ থেকে ওয়াইলড বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত ছিলেন। পরদিনের পত্রিকায় ওয়াইলড-লিখিত রিপোর্ট প্রকাশিত হল। অসকার বললেন, 'হুইসলারের জীবনের এই প্রথম বক্তৃতা। সর্বপ্রকার বক্তৃতার অসারতা নিয়ে তিনি এক ঘণ্টার উপর বক্তৃতা দিলেন।' তারপর চিত্রশিল্পীর ওপর কবির শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে বললেন, "The Poet is the supreme artist and the real musician besides, and is lord of all life and all arts."

রিপোর্টের বক্রোক্তিতে হুইস্‌লার চটলেন, কিন্তু অধিকতর ক্ষিপ্ত হলেন যখন লোকমুখে শুনলেন যে তাঁর প্রিন্স হলের বক্তৃতাটি নাকি অসকারের কাছ থেকেই নেওয়া। হুইসলার লিখলেন—আর্ট সম্পর্কে অসকারের সঙ্গে আমাদের কোথায় মিল? সে আমাদের সঙ্গে এক পাতায় খায়, আমাদের প্লেট থেকে 'মেওয়া' কুড়িয়ে নিয়ে পুডিং তৈরি করে মফস্বলে ফেরী করে।

অসকার অবশ্য এর জবাব দিয়েছিলেন আরও কঠোরতর ভাষায়। যদিচ তাঁর মতে যারা তর্ক করে বৈদগ্ধ্যের দিক থেকে তারা দেউলিয়া, তবু তিনি বলেছিলেন Vulgarity begins at Home and should be allowed to stay there।

এই বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত তাই প্রচণ্ড বিরোধিতায় শেষ হল।

অসকার ওয়াইলডের জীবননাট্যে রবার্ট রসের ভূমিকাটুকু উপেক্ষণীয় নয়, গুরুত্ব মোটেই কম নয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে উভয়ের প্রথম পরিচয়। রবার্টের বয়স তখন সতেরো, অসকারের বয়স একত্রিশ। কুইন্স কাউন্সেল জন রস যখন মারা যান তখন রবার্টের বয়স মাত্র দু বছর। ছেলেদের শিক্ষাদীক্ষা যেন ইংলণ্ডে হয় মৃত্যুকালে তিনি এই নির্দেশ দিয়ে যান। কেম্ব্রিজের কিংস কলেজে পড়তে এসেছিল রবার্ট। সেখানে বছরখানেক থাকার পর রবার্ট রস সব ছেড়ে সাহিত্য ধরল, এবং 'Saturday Review' এবং 'Scots Observer' প্রভৃতি পত্রিকায় তার রচনা প্রকাশিত হল। রবার্ট রস অল্পবয়সেই সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করল, অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হল আর বিশেষ অন্তরঙ্গতা হল এডমণ্ড গসের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত রবার্ট রস এক আর্ট গ্যালারী প্রতিষ্ঠা করে শিল্প সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা করল। রবার্ট রস ছেলেটির জনপ্রিয়তার কারণ তার আত্মপ্রচারের দিকে কোনও লক্ষ্য ছিল না। পরোপকারী এবং স্বার্থহীন এই ছেলেটিকে সবাই তাই পছন্দ করতেন। সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভে রবার্ট রসের কাছে নানাবিধ সাহায্য পেয়েছেন অসকার ওয়াইলড। বয়সের তারতম্য সত্ত্বেও ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব জমে উঠল। এই কালেই অসকার তাঁর বিখ্যাত রূপকথা লিখতে শুরু করলেন।

'The Woman's World' সম্পাদনাকালে বা 'The Pall Mall Gazette' ও অন্যান্য পত্রিকায় সাময়িক রচনাবলী প্রকাশের সময় অসকার ওয়াইলড কয়েকটি ছোটগল্প, রূপকথা, প্রবন্ধ এবং উপন্যাস রচনা করেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে সেগুলি ধারাবাহিক ভাবে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'The Court and Society Review' পত্রিকায় অসকারের "The Canterville Ghost" প্রকাশিত হয়। এই গল্পেই শিল্পী হিসাবে অসকারের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হয়। 'Lord Arthur Savile's Crime and other Stories' নামক গল্পগ্রন্থে এইসব গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। এইরকম আরও কয়েক সহস্র গল্প অসকার লিখতে পারতেন। কথাপ্রসঙ্গে, মদ্যপানের আসরে, নাটকাভিনয়ের অবসরে, ভোজসভায় প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবেশে এমনই অনেক গল্প অসকার বলতেন, সেগুলি তিনি লেখেন নি কিন্তু অপর লোকে সেইসব গল্প পরে লিখেছেন। চটুলতা, রোমান্টিক আবেগ, বুদ্ধির দীপ্তি ও হৃদয়াবেগের সমন্বয়ে অসকারের গল্পের এক নিজস্ব মেজাজ গড়ে উঠেছিল।

এইদিক থেকে আমাদের দেশের শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। শরৎচন্দ্র আসরে বসে চমৎকার মজলিসী গল্প বলতে পারতেন, ভালবাসতেন গল্প করতে। লেখক হিসাবে কুঁড়ে ছিলেন, পরিশ্রমী ছিলেন না শরৎচন্দ্র। অসকারেরও লেখার জন্য কায়িক শ্রম ও সময় ব্যয় করা কষ্টসাধ্য ছিল। যাঁরা অসকারকথিত গল্প স্বকর্ণে শুনেছেন, তাঁদের মতে অসকারের লিখিত কাহিনীতে স্বাদ অনেক কম। অসকার বলতেন, "Writing bores me."

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'The Happy Prince and Other Tales' প্রকাশিত হল। অসকারের রূপকথা পড়ে সাহিত্যপাঠকরা বিস্মিত হলেন। সমালোচকদের উত্তরে অসকার বলেছেন—"I had about as much intention of pleasing the British child as I had of pleasing the British public." অসকারের একজন জীবনীকার বলেছেন, 'এই উক্তি সত্য, তবে একজন আইরিশ বালককে তিনি পুরোমাত্রায় খুশী করেছেন, তার নাম অসকার ওয়াইলড। কারণ হানস অ্যাণ্ডারসন থেকে জেমস ব্যারী পর্যন্ত ছোটদের লেখকমাত্রই ভাবাবেগের দিক থেকে অপরিণতবুদ্ধি।' ১৮৯১, নভেম্বর মাসে 'A House of Pomegranates'

প্রকাশিত হয়। "The young king" গল্পটির প্রতি লেখকের অসীম মমতা ছিল। কারাদণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত অসকার বলতেন—"technically speaking all my works are equally perfect." কিন্তু কারামুক্তির পর বলেছেন—কিছুই হয় নি, আমার রচনাবলী আমার প্রতিভার অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি।

সমালোচকদের মতে এই সময় থেকেই অসকারের প্রকৃতিতে এক বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষিত হল। বাহ্যতঃ রূপকথা সরল এবং নির্দোষ মনে হলেও তার মধ্যে বিকৃত মনোবিকারের প্রবণতা আছে। এই সবই রবার্ট রসের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সমকালীন যুগের অভিব্যক্তি। তাই অনেকের মনে সন্দেহ জাগে রবার্ট রসই অসকার ওয়াইলডের জীবনের দুষ্টগ্রহ। ফ্রাঙ্ক হ্যারিস লিখেছেন—রবার্ট রস নাকি বলে বেড়াত অসকার ওয়াইলডের সেই সর্বপ্রথম 'ছোকরা বন্ধু', এই গৌরব বা অখ্যাতির অধিকারী অ্যালফ্রেড ডাগলাস নয়। যদিচ ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের সব কথার সমর্থন নেই এবং অতিরঞ্জন, মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো, স্বকপোলকল্পিত কাহিনী অপরের ঘাড়ে চাপানোর অভ্যাস প্রভৃতি নানাবিধ বদনাম আছে, তবু এই ঘটনাটি হয়তো সত্য এ কথা মনে করা যায়। সেরার্ডও নাকি এমনই সন্দেহ করতেন। অ্যালফ্রেড ডাগলাস রসকে পছন্দ করতেন। তাঁর মতে রবার্ট রস ভাবালু, নার্ভাস এবং আবেগপ্রধান আত্মপ্রচারবিমুখ মানুষ। অসকারের প্রকৃতি-পরিবর্তন মনোবিজ্ঞানীর বিচার্য বিষয়। আগে যাকে বিকৃতরুচি বা যৌন-বিকার বলা হত, বর্তমানে তার নাম অ-স্বাভাবিক। প্রশ্ন হতে পারে যা স্বাভাবিক তার সংজ্ঞা কি? ফৌজদারী আদালতের রায় প্যাথলজিস্টের বিচারে নস্যাৎ হয়ে গেছে। অসকারের জীবনে কেন এই পরিবর্তন এল, কে তার জন্য দায়ী, তিনি কতটুকু 'স্বাভাবিক' আর কতখানি 'অ-স্বাভাবিক' এইসব সূক্ষ্ম-বিচারের ফল এখনও প্রকাশ পায় নি। মনীষীদের জীবনে কিছু না কিছু যৌন-বিকার বা বৈচিত্র্য দেখা যায়। অসকারও তেমনই একজন উদ্ভট প্রতিভাধর মানুষ, বিকৃত, বিভ্রান্ত, বিপথগামী। এই পরিবর্তনের ধারায় অসকারের ভূমিকা সক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয় সেই কথা বলাও কঠিন তবে অসকার ওয়াইলডের সামগ্রিক জীবনের পরিচ[illegible] এবং অক্সফোর্ডে পাঠদশায় সিফিলিসের আক্রমণ য[illegible] সত্য হয়, তা হলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো কঠি[illegible] হয় না।

দুটি সন্তানের জননী প্রিয়তমা স্ত্রীকে কেন যে অসকা[illegible] পরিত্যাগ করেছিলেন সে কথাও অনুমানের ভিত্তি[illegible] প্রতিষ্ঠিত। অসকার স্বয়ং এই বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। সেই সব মন্তব্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে বীভৎস। তাই জীবনীকারদের মতে রবার্ট রসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার যুগ থেকেই অসকারের প্রকৃতিও পরিবর্তিত, সেই কালেরই মানবিক অভিব্যক্তি রূপকথা ও অন্য রচনায় প্রকাশিত। এই সময়ে অসকার কাজও করেছেন সবচেয়ে বেশী। গদ্যরচনাও ক্রমশঃ একটা আকার এবং লেখকের নিজস্ব ভঙ্গি লাভ করেছে।

অসকারের এই সময়ে লেখা, কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত একটি প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

> মানুষের জীবন আর সাহিত্য; জীবন আর জীবনের অনবদ্য অভিব্যক্তি। মানুষের জীবন সম্বন্ধে গ্রীকরা যেসব নীতি নির্ধারণ করে গিয়েছেন, বর্তমান কালের এই অসভ্যের মধ্যে তার বিচার করা কঠিন। আর অন্য ব্যাপারে তাঁরা যে বিধান দিয়েছেন তা এমনই সূক্ষ্ম যে আমরা তার অর্থ গ্রহণ করতে পারি না। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে যে শিল্পের মধ্যে মানব-জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্য প্রতিফলিত সেইখানেই শিল্পের সম্পূর্ণ সার্থকতা।

এই বিচিত্র প্রবন্ধের অপর এক অংশে অসকার বলেছেন—

> তোমার মতে হয়তো এই জীবন ধর্ম এবং নীতি-বহির্ভূত। কথাটি সত্য। সব শিল্পকর্মই নীতিবিরুদ্ধ, যে আর্ট স্থূল এবং ইন্দ্রিয়জ বা যে-আর্ট নীতিবাদের প্রচারক, সেগুলি অবশ্য ব্যতিক্রম তাদের চেষ্টা মানুষকে সৎ বা অসৎকর্মে প্ররোচিত করা, কারণ সকল কর্মই নীতিশাস্ত্রগত। আর্ট

কোনও কর্মে মানুষকে নিযুক্ত করে না। শুধু একটা মানসিক ভাবান্তর সৃষ্টি করে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে "The Portrait of Mr. W. H." প্রকাশিত হয়। এই রচনাটিকে অতি-প্রাকৃত কাহিনী বলা চলে।. এই রচনার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে অসকার ওয়াইলডের সমকামিতার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সেইকালে কোনও লেখক সমকামিতার প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন বা সহানুভূতি জানিয়ে সাহিত্য রচনা করতে পারেন এ কথা ভাবা যেত না। 'Blackwoods' পত্রিকায় প্রকাশিত এই রচনাটি সর্বসাধারণের নজরে আসে নি, কারণ পত্রিকার প্রচারসংখ্যা বেশী ছিল না। তবু W. H. কিংবা উইল হিউজেস ব্যক্তিটি যে কে তা অনেকে সন্ধান করেছেন।

এই রচনাটি কাহিনাকারে গ্রথিত। সেক্সপীরীয় সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াইলডের পাণ্ডিত্যের পরিচয় এই রচনাটিতে পাওয়া যাবে। উইল হিউজেস নামক একটি তরুণ অভিনেতার ওপর সেক্সপীয়রের যৌন-আকর্ষণ ছিল এই কথাই এই কাহিনীর মূল বক্তব্য। এই তরুণ অভিনেতা ডেসডেমোনা, পোর্সিয়া, রোসালিণ্ড, জুলিয়েট প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করতেন। যুক্তি হিসাবে রচনাটি হয়তো চলে যেত, কিন্তু হিউজেসকে একেবারে জীবন্ত চরিত্রে পরিণত করেছেন অসকার, সেই কারণেই নানা জল্পনার সূত্রপাত হল। এই সূত্র থেকেই সমালোচকরা মনে করেন এই সময় থেকেই অসকারের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে এবং স্বাভাবিক সুস্থ জীবনযাত্রার পরিবর্তে অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করেছেন।

এই রচনা. সকলের নজরে না পড়লেও এর পরবর্তী রচনা 'The Picture of Dorian Gray' আন্দোলনের সৃষ্টি করল। সর্বত্র আলোচনা হতে লাগল এই উপন্যাসটির এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে।

এই উপন্যাসটি অতি সহজ এবং সরল, দ্বৈত ব্যক্তিত্বের বিষয় নিয়ে কাহিনীটি রচিত। এর আগে স্টীভেনসনের 'Doctor Jekyll and Mr. Hyde' প্রকাশিত হয়েছে, এবং সেই কাহিনী সর্বজনপরিচিত।

Lippincott's Magazine নামক মার্কিন নীতি-বাগীশ পত্রিকায় 'The Picture of Dorian Gray' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সেই পত্রিকায় তখন সমকালীন লেখক রচিত একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ শুধু জুলাই, ১৮৯০ সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসঙ্কলনেও এই উপন্যাসকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। সমসাময়িক অন্যান্য লেখকেরা আজ বিস্মৃতির অতলতলে, কিন্তু Lippincott পত্রিকার সম্পাদকরা সেই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটিকে 'মাস্টারপীস' হিসাবে স্থান দিয়েছেন। মহৎ শিল্পকর্ম হিসাবে এই গ্রন্থটি আজ বিশ্বসাহিত্যে 'ক্লাসিকে'র মর্যাদালাভ করেছে।

এই গ্রন্থের বহু রকমের সংস্করণ পাওয়া যায়, এতগুলি বিভিন্ন সংস্করণ আর কোনও গ্রন্থের ভাগ্যে ঘটে নি। অনুমোদিত সংস্করণ ভিন্ন এই গ্রন্থের চোরাই সংস্করণও আছে।

এই গ্রন্থ রচনাকালে অসকার ওয়াইলডের বয়স চল্লিশ; অসকার এই সময় বিশেষ অর্থকষ্টে বিব্রত। এতদিন আর্টের খাতিরে কাজ করেছেন, এই রচনায় হাত দিয়েছেন অর্থের মোহে।

আর্ট বা অর্থ যার খাতিরেই তিনি এই কাজে হাত দিন, এই গ্রন্থে তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। যা তাঁর চরিত্রের ত্রুটি, যা তাঁর চরিত্রের সদ্‌গুণ সব এই গ্রন্থে বর্তমান। ফ্লবেয়ার একদিন আপনাকে মাদাম বোভারী বলে স্বীকার করেছিলেন, অসকারও বলতে পারেন আমিই ডোরিয়ান।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ড লক অ্যাণ্ড কোম্পানি আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ সংযুক্ত করে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। সেই সময়ে প্রকাশক লেখককে অনুরোধ করেন—'ডোরিয়ানকে কি আর একটু বাঁচিয়ে রাখা যায় না? অনুশোচনার ফলে সে কি সৎ হতে পারে না?'

সেদিন অসকার শুধু হেসেছিলেন, কোনও জবাব দেন নি

অসকার ওয়াইলড একদা বলেছিলেন, আমার সমগ্র প্রতিভা ঢেলেছি নিজের জীবনে, আর রচনায় দিয়েছি মনীষা। মানুষটি আর তাঁর রচনাবলী সর্বদর্শনসমন্বয়। ডোরিয়ান গ্রের বিষয়বস্তু তাই বহুবিধ। প্রথমতঃ ওয়াইলডের হেলেনীয় সৌন্দর্যপ্রীতি। দ্বিতীয়তঃ ওয়ালটার পেটারের দর্শনের সমর্থন। ওয়ালটার পেটার বলতেন, "Burn always with this hard gem-like flame to maintain this ecstasy", তৃতীয়তঃ বালজাকের কল্পনাপ্রসূত Peau de Chagrin, এবং হুয়াসমানের মত যত কিছু অদ্ভুত আর অলৌকিক, এবং বিকৃতরুচি, তার সন্ধানমত্ততা।

'A Rebours' উপন্যাসের নায়ক যেন ডোরিয়ান গ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ওয়াইলড এই গ্রন্থটির কাছে ঋণী। তিনি বলেছেন, 'এই গ্রন্থ পীত গ্রন্থ, এমন অদ্ভুত বই ডোরিয়ান আর পড়ে নি—বিষাক্ত বই।' অথচ আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অসকার বলেছেন, কোনও গ্রন্থ কাউকে খারাপ করতে পারে না। অসকারের কাছে সৌন্দর্যতত্ত্ব আর আর্ট দুটি বিভিন্ন বস্তু।

ডোরিয়ান গ্রের মধ্যে সৌন্দর্য আছে; ডোরিয়ান গ্রে তাই সৎ ও অসৎ উভয়বিধ বস্তুর সমন্বয়। অসৎ প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ডোরিয়ানের হাতেই ছিল। সে কিন্তু ধ্বংসাত্মক পথেই পদক্ষেপ করেছে। সেক্সপীয়ার তরুণ অভিনেতা উইল হিউজেসের তারুণ্যের আকর্ষণে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, Picture of Dorian Gray গ্রন্থের আর্টিস্ট বেসিল হলওয়ার্ড তরুণ ডোরিয়ানের প্রভাবে পড়েছেন। ডোরিয়ান একদিকে তাঁর প্রেরণা, আর অপর দিকে ঘাতক।

ওয়াইলডের মতে জীবন আর্টকে অনুসরণ করে, অনুকরণ করে। ব্যক্তিগত জীবনে লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাস ছিলেন ডোরিয়ান আর স্বয়ং ওয়াইলড বেসিল হলওয়ার্ড।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে অসকার ও অ্যালফ্রেড ডাগলাসের প্রথম দর্শন; ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কুইসের বিপক্ষে ওয়াইলডের অবিবেচনা-প্রসূত যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল তার মধ্যে বারবার এই সুবিখ্যাত গ্রন্থের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

ডোরিয়ান গ্রে গ্রন্থের অপূর্ব রচনাশৈলী শুধু অসকার ওয়াইলডের পক্ষেই সম্ভব। দীর্ঘকালের ব্যবধানেও ওয়াইলডের নায়কের রূপ ও যৌবন অটুট রয়ে গেল। ডোরিয়ানের বীভৎস চারিত্রিক ত্রুটি প্রতিফলিত হল ক্যানভাসের পর্দায় আঁকা ছবিটিতে।

ওয়াইলডের রচনার ক্ষুরধার শ্লেষ ও ব্যঙ্গ, অনুপম কাব্যধর্মী গদ্য, সমকালীন যুগের রীতিনীতি সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ এই গ্রন্থটিকে মূল্যবান করে তুলেছে।

উচ্ছৃঙ্খল জীবন আর অভিশপ্ত যৌবনের ব্যথা ও বেদনার অভিনব কাহিনী 'Picture of Dorian Gray'—এ কথা সর্বজনস্বীকৃত।

আমেরিকার 'Lippincott' পত্রিকার প্রতিনিধি লণ্ডনে একটি ছোট্ট ভোজসভায় অসকার ওয়াইলড, বৃটিশ পার্লামেণ্টের আইরিশ সদস্য গিল এবং আর্থার কোনান ডয়েলকে আমন্ত্রণ করেন। কোনান ডয়েল তখন উদীয়মান তরুণ লেখক, পসারহীন ডাক্তার। অসকার সম্পর্কে সেই প্রথম পরিচয়ের কথা কোনান ডয়েল লিপিবদ্ধ করেছেন—"He towered above us all, and yet had the art of seeming to be interested in all that we could say....He took as well as gave, but what he gave was unique."

এই দিনকার আলোচনার ফলেই কোনান ডয়েল 'Lippincott' পত্রিকায় 'The Sign of Four' এবং অসকার 'The Picture of Dorian Gray' উপন্যাস প্রকাশ করেন।

অসকার লিখিত এই উপন্যাসটির প্রথম অবস্থায় একটি গল্পের আকার ছিল, বালজাকের *Peau de Chagrin* বা এডগার অ্যালান পো'র "William Wilson" জাতীয় কাহিনী, পরে এর সঙ্গে অভিনেত্রীর কাহিনী অংশ সংযুক্ত করা হয়, প্রেমে পড়ার ফলে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটল। শিল্পীদের সঙ্গে অসকারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তিনি তাদের স্টুডিওতে অনেক সময় কাটাতেন, চমৎকার মজলিসী লোক হিসাবে অসকারকে সবাই প্রীতির চোখে দেখতেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বেসিল ওয়ার্ড নামক জনৈক

শিল্পীর স্টুডিওতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন অসকার। সেই সময় এক পরম রমণীয় কিশোর কুমারের পোর্ট্রেট আঁকছিল ওয়ার্ড। ছবি আঁকা শেষ হওয়ার পর ছেলেটি যখন চলে গেল তখন ওয়াইলড হঠাৎ বললেন—"what a pity that such a glorious creature should ever grow old!" (এমন সুন্দর প্রাণীও একদিন বুড়ো হবে।) অসকারের মত সমর্থন করে শিল্পী ওয়ার্ড বললেন, এমন যদি হত—ছেলেটি এমনই সুন্দর থাকত, আর ছবিটা বয়সের সঙ্গে জীর্ণ ও বিকৃত হয়ে যেত! এই আইডিয়াটুকু ওয়াইলডকে এক বিচিত্র প্রেরণা দিয়েছে। তাই উপন্যাসের শিল্পীর নাম বেসিল হলওয়ার্ড দিয়েছেন অসকার। এইভাবে ঋণ স্বীকার করেছেন। এই গ্রন্থের লর্ড হেনরী ওটন যেন অসকার চরিত্রেরই প্রতিফলন। জীবন-যৌবন ও রূঢ় বাস্তব সম্পর্কে লর্ড হেনরীর বক্তব্য যেন অসকারেরই কণ্ঠনিঃসৃত উক্তি।

আর্থার কোনান ডয়েলকে এই গ্রন্থ সম্পর্কে অসকার বলেছিলেন—"Between me and life there is a mist of words always, I throw probability out of the window for the sake of a phrase, and the chance of an epigram makes me desert truth. Still I do aim at making a work of art..."

গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে চতুর্দিকে তীব্র নিন্দা শুরু হল। অতি কঠোর সমালোচনা হল। কেউ বললেন, পুস্তক-লেখক ও প্রকাশককে অবিলম্বে দণ্ডিত করা হোক।

আর একটি পত্রিকা লিখলেন এর চেয়ে অসকার ওয়াইলড দরজীর দোকান খুলে সম্মানজনক কর্মে আত্ম-নিয়োগ করুন। লেখকের মস্তিষ্ক, বুদ্ধি, শিল্পজ্ঞান আছে, কিন্তু রুচি বিকৃত।

এখনকার কালে এই জাতীয় গ্রন্থসমালোচনায় বিক্রি বাড়ে, তখনকার কালে নীতির মূল্য ছিল অনেক বেশী, তাই এই সব বিরূপ সমালোচনা। ওয়ালটার পেটারও 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের একটা সমালোচনা করলেন 'The Bookman' নামক পত্রিকায়।

অসকার এর উত্তর দিলেন—"Yes, there is a terrible moral in Dorian Gray—a moral which prurient will not be able to find in it, but it will reveal to all those whose minds are healthy. Is this an artistic error? I fear it is. It is the only error in the Book."

এর কিছু পরে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ সংখ্যা 'Fortnightly Review' পত্রিকায় 'A Preface to Dorian Gray' প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংস্করণে এই নিবন্ধটি গ্রন্থে সংযুক্ত হয়।

অসকার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে লিখেছেন:

"সকল আর্টই রসবস্তুর স্রষ্টা। শিল্পকে প্রকাশ করে শিল্পীকে প্রচ্ছন্ন রাখাই আর্টের লক্ষ্য।

যিনি নূতন ধারায় বা ভিন্ন ভঙ্গীতে রূপবস্তুকে রূপান্তরিত করেন, তিনিই সমালোচক।"

এই নিবন্ধেই অসকার ওয়াইলডের সেই বিখ্যাত উক্তি পাওয়া যায়:

"শ্লীল বা অশ্লীল গ্রন্থ বলে কিছু নেই। গ্রন্থ হয় সুলিখিত নয় কুলিখিত। এই পর্যন্ত।

কোনও শিল্পী কোনও সময়েই বিকারগ্রস্ত নন। তিনি সব কিছুই প্রকাশে পটু।

চিন্তা আর ভাষা শিল্পীর পক্ষে আর্টের হাতিয়ার।

পাপ আর পুণ্য শিল্পীর কাছে শিল্পের উপজীব্য।

আঙ্গিকের দৃষ্টিকোণে সকল আর্টের প্রকৃতি যেন সঙ্গীতবিদের আর্ট। আর অনুভূতির দৃষ্টিকোণে রূপদক্ষের অভিনয়-নৈপুণ্য হল চরিত্রসৃষ্টি।

সকল আর্ট তাই একাধারে সমতল ও প্রতীকধর্মী।

সমতল পার হয়ে যারা অতলে ডুব দেয় তারা বিপদের দায়িত্ব নেয়।

আর্টের আয়নায় প্রতিফলিত হয় দর্শক,—জীবন সেখানে প্রতিফলিত হয় না।"

এই গ্রন্থের মাধ্যমে অসকার নব্য সুখবাদ (Hedonism) সম্পর্কে নিজস্ব দর্শন প্রচার করেছেন। লর্ড হেনরীর মুখনিঃসৃত বাণীর মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকাশ লক্ষণীয়—

'আমার মনে হয় মানুষ যদি নিজের জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়ে তার অনুভূতিকে রূপ দিতে পারে তা হলে জগৎ আনন্দের এমন এক নূতন স্বাদ পাবে যে আমরা আমাদের মধ্যযুগীয় ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়ে হেলেনিক আদর্শে ফিরে যাব—হয়তো হেলেনিক আদর্শের চাইতেও সূক্ষ্মতর, মহত্তর কিছুর সন্ধান পাব। কিন্তু বর্তমানকালে যিনি সবচেয়ে নির্ভীক তিনি নিজের সম্পর্কে শঙ্কিত। যে আত্মবঞ্চনা আমাদের জীবনকে নষ্ট করে তার মধ্যেই যে পিশাচকে আমরা দমন করার চেষ্টা করি তার উজ্জীবন ঘটে। যে আবেগ দমন করার জন্য আমরা সচেষ্ট তা মনের ভিতর পাক খায় আর জীবনটা বিষময় করে তোলে। দেহ একবার মাত্র পাপ করে, আর পাপের হাতে তার নিষ্কৃতি, কারণ সব কর্মই শুদ্ধির পথ। শুধু আনন্দের আস্বাদটুকু বা একটা অনুতাপ মনে জেগে থাকে, আর কিছুই থাকে না। মোহ বা আসক্তির হাত

থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ তার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া।···

···এই যে আপনার গোলাপ-রাঙা যৌবন, এই যে গোলাপ-শুভ্র কৈশোর, এই নিয়ে আপনি আপনার বাসনা-কামনায় বিব্রত, ভয় ও ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত, দিবাস্বপ্ন-নিশীথস্বপ্নের স্মৃতিই লজ্জায় আপনার মুখ রাঙা করে তোলে।'

লর্ড হেনরী অতঃপর ডোরিয়ানকে বলছেন, 'সৌন্দর্যের মধ্যে আছে প্রতিভার অভিব্যক্তি, হয়তো প্রতিভার চেয়ে বড়, এর কোনও কৈফিয়ত নিষ্প্রয়োজন।··· এখন হাসছেন, যখন এই সম্পদ হারাবেন তখন আর হাসবেন না।—বিধাতা আপনার ওপর সদয়, তিনি যা দেন আবার ফিরিয়ে নেন। কয়েক বছর মাত্র পরিপূর্ণরূপে বাঁচবেন, যৌবনের সঙ্গে রূপও চলে যাবে, তখন হঠাৎ আবিষ্কার করবেন তার জয়মাল্য আর আপনার গলায় নেই, তখন যে-অতীতের স্মৃতিটুকু বহন করতে হবে পরাজয়ের গ্লানির চেয়ে তা তীক্ষ্ণ ও নির্মম। প্রতি মাসে আপনি সেই ভয়ংকরের দিকে এগিয়ে চলেছেন, শেষের সেই ভয়ংকর দিন।···জীবনের সোনালী মুহূর্ত অপচয় করবেন না,—বাঁচুন, বাঁচার মত বাঁচুন। যে-অপরূপ জীবন পেয়েছেন তার মাধুরী উপভোগ করুন। নতুন আনন্দ, নতুন উত্তেজনার সন্ধানে ঘুরুন। কোনও কিছুকে ভয় করবেন না, এ যুগে চাই নতুন সুখবাদ। আপনি হবেন তার দৃশ্যপ্রতীক। এমন কিছু নেই যা আপনার করায়ত্ত নয়। মাত্র একটি ঋতুর জন্য এই পৃথিবী আপনার···

যৌবন অতি ক্ষণস্থায়ী। সাধারণ পাহাড়ী ফুলও ঝরে পড়ে, কিন্তু আবার মুকুলিত হয়। লাবারনাম আগামী জুন মাসে আবার আজকের মতই পীত হয়ে ফুটে উঠবে। আর একমাস পরে ক্লেমাটিস লতায় নক্ষত্রের রঙ লাগবে, ক্লেমাটিসের সবুজ আকাশের গায়ে এমনই তারার মত ফুল ফুটবে, আমরা কিন্তু আর যৌবন ফিরে পাব না। যে-আনন্দ কুড়ি বছর বয়সে ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত তা শ্লথ হয়ে আসবে, অঙ্গ অবশ হবে, চেতনার তীক্ষ্ণতা ম্লান পাবে। আমরা ক্রমশঃ পুতুলনাচের পুতুলের মত বিশ্রী হয়ে উঠব।···তারুণ্য! যৌবন! পৃথিবীতে তারুণ্য ছাড়া আর কিছুই নেই—'

(The Picture of Dorian Gray—Chapter II)

অসকারের জীবনের মধ্যে উপরোক্ত উক্তির এক বিচিত্র প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ওয়ালটার পেটারের নন্দনতত্ত্ব একদা অসকারকে যে-শিক্ষা দিয়েছিল তা তিনি পরিপূর্ণরূপেই গ্রহণ করেছিলেন।

এই ডোরিয়ান গ্রের মাধ্যমেই হয়তো লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাসের সঙ্গে অসকারের পরিচয় ঘটে, আর সেই পরিচয় তাঁর জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে যখন উভয়ের প্রথম দেখা হয় তখন ডাগলাসের বয়স কুড়ি—যেন রক্তমাংসের জীবন্ত ডোরিয়ান গ্রে।

আট

সেন্ট জেমস থিয়েটারের মিঃ জর্জ আলেকজাণ্ডার অসকারকে একটি নতুন নাটক লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। লোকটি ফ্যাশনপ্রিয় ছিলেন, সেন্ট জেমস থিয়েটার ফ্যাশনদুরস্ত রঙ্গমঞ্চ, আর সেই রঙ্গমঞ্চে অসকারের মত লেখকের চটকদার নাটক অভিনয় করলে হয়তো জমবে এই তাঁর ধারণা ছিল। তাই তিনি অসকারকে অনুরোধ করলেন একটি নাটক রচনার জন্য। অসকার বললেন, 'কালই একটা প্যানটোমাইম লিখে দেব।'

তখন অসকারের অর্থকষ্ট চলছে, তাই সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাব। একশো পাউণ্ড অগ্রিম দেওয়া হল এবং অসকার তা খরচ করে উড়িয়ে দিলেন। আরও কিছু চাই, কিন্তু নাটক এক লাইনও লেখা হল না।

আলেকজাণ্ডার একদিন বললেন, কবে নাটক দেখব?

ওয়াইলড বললেন, যে কোনদিন খুশী যে কোনও নাটক দেখতে পার। যে রঙ্গমঞ্চে হচ্ছে সেইখানে যাও, আর আশা করি একটা ভাল সীট পেয়ে যাবে।

আমি কোন্ নাটকের কথা বলছি তা তুমি জান?

ভেঙে না বললে কি করে বুঝব?

যে-নাটক আমার জন্য লেখার কথা ছিল।

ওঃ, তাই বল, তা সে তাই এখনও লেখাই হয় নি, দেখবে কি করে?

লিখতে শুরু করেছ কি?

না, কালি-কলম নিয়ে লিখতে শুরু করি নি, তবে মগজে এসেছে। সেখানেই এখন থাক্‌।

তোমার টাকার দরকার নেই?

টাকা! টাকার তো অনেক প্রয়োজন। ভাল কথা, তোমার কাছে আমার ঋণ রয়েছে যে!

তার জন্য ভেবো না।

একটুও ভাবছি না।

এই কথাগুলি হেসকেথ পীয়ারসনকে বলেছেন জর্জ আলেকজাণ্ডার।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে Lake Windermere-এ অবসর যাপনের সময় এই নাটকটি অবশেষে লিখলেন, সব নাটকই

এই ভাবেই লিখতেন অসকার। 'Lady Windermere's Fan' রচিত হল। আলেকজাণ্ডার নাটকটি পড়েই বললেন, চমৎকার হয়েছে, আমি হাজার পাউণ্ড দিয়ে অভিনয়ের পুরো স্বত্ব নিয়ে নিই।

অসকার বললেন, তোমার বিচার ও নির্বাচনশক্তিতে আমার এতই শ্রদ্ধা যে এই উদারতা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করছি।

অসকারের হিসাব ঠিক হয়েছিল, এই নাটকের অভিনয়বাবদ তিনি সাত হাজার পাউণ্ড রয়্যালটি পেয়েছিলেন, তখনকার কালে তেইশ সপ্তাহব্যাপী একই নাটকের অভিনয়, একটি আশ্চর্য ঘটনা।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি নাটকের প্রথম রজনী। নাটকের চমৎকার সংলাপ এবং চটকদার বিষয়বস্তু দর্শককে মুগ্ধ করল। অভিনয়ান্তে দর্শকের আসন থেকে নাট্যকারকে দেখার অনুরোধ হল। অসকার অর্ধদগ্ধ সিগারেট হাতে রঙ্গমঞ্চে হাজির হয়ে বললেন, 'ভদ্রমহোদয় এবং মহোদয়াগণ, আজকের সন্ধ্যাটি বিশেষভাবে উপভোগ করেছি, অভিনেতৃবর্গ চমৎকার নাটকের চমৎকার অভিনয় করেছেন, এবং আপনাদের অভিনয়ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এই সাফল্যে ও আপনাদের এই অভিব্যক্তির জন্য ধন্যবাদ, এই দেখে আমার মনে হয়েছে যে এই নাটক সম্পর্কে আমার মত আপনাদেরও উচ্চ ধারণা।'

কিন্তু এই উক্তির মধ্যে অভব্যতা এবং অর্ধদগ্ধ সিগারেট পানের মধ্যে বে-আদবী দেখে সকলে বিরক্ত হলেন। উইলিয়াম আচার অভিনয় দেখে বললেন, এই নাটক ক্লাসিকের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

ভিনসেন্ট ও'সালিভান লিখিত 'Aspects of Wilde' নামক গ্রন্থে 'Salome' নাটক সম্পর্কে চমৎকার কাহিনী আছে। তিনি বলেছেন, 'অসকার এই বিষয়-বস্তু নিয়ে কিছুকাল ধরে চিন্তা করছিলেন। প্যারীতে অবস্থান-কালে বন্ধুদের এক লাঞ্চ-সভায় ডেকে তিনি এই নাটকের সম্ভাব্য সংলাপ নিয়ে আলোচনা করেন। বাড়ি ফিরে একটি নতুন খাতা টেবিলের ওপর দেখে তৎক্ষণাৎ নাটক লিখতে বসলেন অসকার, কলমের ডগায় যেন আপনি খই ফুটতে লাগল। রাত এগারোটা পর্যন্ত এইভাবে লিখে চলেছেন, তারপর ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি একটি কাফেতে গিয়ে খাবার দিতে বললেন এবং অর্কেস্ট্রার নেতাকে ডেকে বললেন :

'একটি মেয়ে রক্তের ওপর নগ্নপদে নৃত্যপরা, যে মানুষটিকে সে চেয়েছিল এবং হত্যা করেছে এ রক্ত তার। আমার চিন্তার সঙ্গে তাল রেখে একটা কিছু সুর বাজান।'

অর্কেস্ট্রায় নাকি এমন সুর ধ্বনিত হয়েছিল যে যারা কথাবার্তা বলছিল তারা সবাই নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। অসকার বাড়ি ফিরেই 'Salome' নাটকটি শেষ করলেন।

রবার্ট রস অবশ্য এই কাহিনী সমর্থন করেন না, তিনি বলেছেন যে নাটকটি টরকোয়ে নামক অঞ্চলে লিখিত। নাটকটি মূলে ইংরেজীতে রচিত না ফরাসীতে রচিত এই নিয়ে মতভেদ আছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর প্যারীতে ফেরার পর জর্জ কার্জন (পরে ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন) একটি ব্রেকফাস্ট পার্টিতে অসকারকে আমন্ত্রণ করেন। সেইদিন অসকার বলেন, তিনি ফরাসী ভাষায় একটি নাটক লিখছেন সেটি ফ্রান্সে অভিনীত হবে; এবং একদিন তিনি ফ্রেঞ্চ আকাদেমিসিয়ান হবেন। সেই ভোজসভার সকলেই অভিনয় দেখার জন্য ফ্রান্সে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন, কার্জন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যাবেন এই কথা হল। (অক্সফোর্ডে কার্জন এবং অসকার উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, অসকারের ঘরে বসে উভয়ে 'talking and thinking in Greek' করে অনেক সময় কাটিয়েছেন। অসকার বলতেন, কার্জন ভবিষ্যতে অনেক বড় হবেন, তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কার্জন ভারতের ভাইসরয় হয়েছিলেন এবং বলডুইন মাঝে না থাকলে হয়তো প্রধানমন্ত্রীও হতেন।)

এই আলোচনা থেকে মনে হয় অসকার সেই সময় ফরাসী ভাষায় নাটকটি রূপান্তরিত করছেন। অ্যালফ্রেড ডাগলাস ফরাসী থেকে নাটকটি ইংরেজীতে রূপান্তরিত করেন। তিনি বলেছেন 'এই নাটক ইংরেজীতে লেখা এবং ফরাসীতে অনূদিত। পীয়ের লুই এবং আঁদ্রে জিদ্ ফরাসী অনুবাদে সাহায্য করেছেন।' ডাগলাস লিখেছেন, 'সেই সময় অসকার ফরাসীতে তেমন দক্ষতা লাভ করেন নি। তা ছাড়া আঁদ্রে জিদ্ আমাকে বলেছেন অসকারের প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি ছিল ভুলে এবং ত্রুটিতে পরিপূর্ণ।'

কিন্তু আঁদ্রে জিদ্ স্বয়ং লিখেছেন—"He narrated, gently, slowly, he knew French admirably."

এই সূত্রে বলে রাখা উচিত যে ডাগলাসকৃত 'Salome' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ অসকারকে বিরক্ত করেছিল, তিনি সেই অনুবাদে স্কুলের ছাত্রসুলভ ত্রুটি দেখে বলেছিলেন—"a translation unworthy of you as an ordinary oxonian"। শিল্পী বিয়ার্ডসলীর অনুবাদও অসকার অমনোনীত করলেন।

যাই হোক মূলতঃ মেতারলিঙ্কের প্রভাবে রচিত এই নাটকটি অসকার অনেক গুণী ব্যক্তিকে পড়িয়ে শুনিয়ে-ছিলেন, তাঁদের উপদেশমত কিছু এদিক-ওদিক

পরিবর্তনও হয়তো করেছেন। সারা বার্নহার্ডকেও একদিন অনুরুদ্ধ হয়ে এই নাটক পড়ে শোনালেন। সারা তৎক্ষণাৎ নামভূমিকায় অভিনয় করবেন স্থির করলেন।

লণ্ডনের প্যালেস থিয়েটারে নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে স্থির হল। অসকারের উৎসাহের আর সীমা নেই, তারপর রিহার্সাল তিন সপ্তাহ চলার পর সরকারী নির্দেশে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অভিনয় প্রদর্শন নিষিদ্ধ হল। একটা প্রচলিত প্রাচীন আইন অনুসারে ক্যাথলিক রহস্য নাটক অভিনয় আইনসঙ্গত ছিল না।

প্রথম নাটকের সাফল্যের পর এই ঘটনার আঘাতে অতি স্বাভাবিক কারণেই অসকার ভীষণ উত্তেজিত হলেন। সারা বার্নহার্ডও অসকারের ওপর চটলেন—এত সময় এবং উৎসাহ এইভাবে ব্যয়িত হল এই কারণে। একমাত্র 'The World' পত্রিকার সমালোচক উইলিয়াম আর্চার ব্যতীত কোনও সমালোচক, কোনও অভিনেতা এই সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে একটিও প্রতিবাদ জানান নি। এই নিয়ে অসকারের মনে দুঃখ ছিল।

অসকার এত বেশী ক্ষিপ্ত হলেন যে একসময় ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসী নাগরিকত্ব গ্রহণ করবেন স্থির করলেন। 'Punch' পত্রিকায় এই নিয়ে একটি কার্টুন চিত্র প্রকাশিত হয়। অসকারের ক্ষুণ্ণ হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল, এই নাটক নিয়ে তিনি যতখানি চিন্তা করেছেন আর কোনও নাটক নিয়ে তত মাথা ঘামান নি।

হেরডের আদেশে সালোমে রক্তাক্ত রঙ্গমঞ্চে সাতটি ওড়নার নাচ নগ্নপদে নেচে সাধু যোকাননের মুণ্ড রৌপ্যপাত্রে উপহার প্রার্থনা করল। সাধু একদা সালোমের প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সম্রাট হেরড প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যোকাননের ছিন্ন মুণ্ড দিতে আদেশ দিলেন। ঘাতক ছিন্নমুণ্ড সালোমের হাতে দিল, সালোমে মুণ্ডটি আগ্রহে গ্রহণ করল, সম্রাট তাঁর আচকানে মুখ ঢাকলেন, আর হেরোডিয়ার মুখে কুটিল হাসি ফুটে উঠল। তারপর সেই মুণ্ড নিয়ে সালোমের স্বগতোক্তি শুরু হল :

"Ah! Thou wouldst not suffer me to kiss thy mouth, Jokanaan. Well! I will kiss it now. I will bite it with my teeth as one bites a ripe fruit. Yes, I will kiss thy mouth, Jokanaan. I said it; did I not say it? I said it. Ah! I will kiss it now."

হেরডের নির্দেশে সভাভঙ্গ হল, রাজসভার মশাল নির্বাপিত হল। একটি কালো মেঘে আকাশের চাঁদ সম্পূর্ণ ঢেকে গেল, চারিদিকে অন্ধকার। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার। হেরড সোপান অতিক্রম করে চলে যাচ্ছেন, নর্তকীর কণ্ঠনিঃসৃত বিলাপধ্বনি শোনা যাচ্ছে, সহসা চন্দ্রালোক সালোমের দেহে এসে পড়ল। হেরড সেই দিকে তাকিয়ে হুকুম দিলেন—"Kill that woman." সৈনিকরা তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করল, জুডিয়ার রাজকন্যা হেরোডিয়ার কন্যা সালোমের জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীতে Salomeনাটকের ফরাসী সংস্করণ এবং পরবর্তী বছরে ইংরাজী সংস্করণ লণ্ডনে প্রকাশিত হল। জন লেন ছিলেন অসকারের প্রকাশক, তাঁরাই এই নাটক প্রকাশ করলেন। এই নাটক সম্পর্কে সমালোচকদের নিন্দায় 'ডোরিয়ান গ্রে'র নিন্দা ম্লান হয়ে গেল। তা ছাড়া শিল্পী অব্রে বীয়ার্ডসলী অঙ্কিত ছবি নাট্যকার বা সমালোচক কারও কাছে রুচিকর হয় নি। লেনকে অসকার সুনজরে দেখতেন না, একটি নাটকের ভৃত্যের নামকরণ করেছিলেন তার নামে। লেনও ব্যক্তিগতভাবে অসকারকে অপছন্দ করতেন।

'The Times' পত্রিকার সমালোচক লিখেছিলেন—"Salome is an arrangement in blood and ferocity, morbid, bizarre, repulsive—"

বার্লিনের ক্রীনেস থিয়েটারে প্রযোজক রাইনহার্ড 'Salome' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন এবং বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন, সেই থেকেই কবি ও নাট্যকার অসকার ওয়াইলড বিশ্বসাহিত্যের লেখক হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রচার এক সময় শেক্সপীয়ারের সমতুল্য হয়, তাঁর সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়, পরবর্তীকালে একমাত্র জর্জ বার্ণাড শ'র গ্রন্থাবলীর বিক্রয়সংখ্যা অসকারের সমতুল্য হয়।

ক্রমে অসকারের খ্যাতি ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ল, একজন ইংরাজ লেখক নিয়ে ফরাসী সমাজ এর আগে এত মাতামাতি করে নি। ফরাসী সংবাদপত্রে প্রতিদিন অসকারের বাণী বা রচনা থেকে উদ্ধৃতি থাকত।

তুলোস লুত্রেক প্যাস্টেলে অসকারের একটি ছবি এঁকেছিলেন আর সোনালী পটভূমিতে লাল ওয়েস্টকোট পরা অবস্থায় একটি ছবি আঁকলেন উইলিয়াম রথেনস্টাইন।

হার্বার্ট বীরবোম ট্রি একদিন ওয়াইলডকে বললেন, আমার জন্য একটা নাটক লিখে দিন 'Lady Windermere's Fan'-এর মত। বীরবোম ট্রি ব্যবসায়ী ছিলেন না, তাঁর মন ছিল শিল্পীর। তবু তিনি পাঁচ বছর হে মার্কেট থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন, পরে হিজ ম্যাজেস্টিস

থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। অসকার তাঁকে বললেন, আমার 'Salome' নাটকের হেরডের ভূমিকায় আপনাকে চমৎকার মানাবে, কিন্তু বড় ঘরানার বনেদীদের ভূমিকায় আপনাকে একদম মানাবে না।

ট্রি তবু ছাড়বার পাত্র নন, প্রতিদিন অনুরোধ করে শেষ পর্যন্ত অসকারকে রাজী করালেন। ট্রি অসকারকে পছন্দ করতেন, আপনার প্রকৃতির প্রতিফলন লক্ষ্য করেছিলেন তিনি অসকারের মধ্যে। অসকার সম্পর্কে ট্রি বলেছেন—"Oscar was the greatest man I have ever known, and the greatest gentleman."

অসকার একবার বন্ধু ভিনসেণ্ট ও'সালিভানকে বলেছিলেন, 'আমি কারও জন্যে নাটক লিখি না, লিখি নিজের তৃপ্তির জন্য, পরে যদি কেউ অভিনয় করতে চায় তো অনুমতি দিই।'

ট্রির অনুরোধ কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুনতে হল। টরকোয়েতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে অসকার লিখলেন—'A Woman of no Importance'। ট্রি সেই সময় মফস্বলে ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার দল নিয়ে ঘুরছেন। অসকার তাঁদের সঙ্গে তিন দিন গ্রামগোয় কাটালেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠল। ট্রির মুখে অসকারের প্রশংসা আর ধরে না।

নতুন নাটক রিহার্সালে পড়ল, অসকার রিহার্সালে উপস্থিত থাকেন, প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ নাটকের অংশ-বিশেষ একরকম নতুন করেই লিখে দেন। খানাপিনা এবং চমৎকার আলাপ-আলোচনায় এই সময়টা সুন্দর কেটেছে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল তারিখে হে মার্কেটের থিয়েটার রয়াল রঙ্গমঞ্চে এই নাটক প্রথম অভিনীত হল এবং ওয়াইলডের আগের নাটক 'Lady Windermere's Fan'-এর মতই সাফল্য অর্জন করল।

প্রথম অভিনয়-রজনীতে দর্শকরা নাট্যকারকে দেখার বারবার অনুরোধ জানাল। সহসা বক্স থেকে এক বিরাটাকৃতি ভদ্রলোক বললেন, 'ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়া-গণ, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে অসকার ওয়াইলড আজ এই প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত নেই।' বলা বাহুল্য, বক্তা স্বয়ং অসকার ওয়াইলড।

অভিনয়ান্তে 'মার্ভেলাস', 'ইউনিক্', 'ওয়াণ্ডারফুল', 'গ্রেট' প্রভৃতি প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি হল। নাট্যকার ও নট পরস্পরকে অভিনন্দন জানালেন :

অসকার। আমি বরাবরই আপনাকে আমার শ্রেষ্ঠ সমালোচক মনে করে আসছি।

ট্রি। বা রে, আমি তো কোনদিনই আপনার নাটকের সমালোচনা করি নি।

অসকার। সেই জন্যই তো আপনি সর্বোত্তম।

Lord Illingworth চরিত্রটি চমৎকার, নাট্যকার এই চরিত্রটি আপন আদর্শে গড়েছিলেন, তাঁর মুখনিঃসৃত বহু কথা ইলিংওয়ার্থের মুখে বলিয়েছেন এবং 'ডোরিয়ান গ্রে' উপন্যাসের লর্ড হেনরীর বক্তব্যও এখানে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ট্রির ব্যক্তিগত চরিত্রের সঙ্গে ভূমিকাটি বিশেষ খাপ খেয়ে গেল। শেষজীবন পর্যন্ত এই অভিনয়ের প্রভাব তাঁর চরিত্রে ছিল। অসকার বলতেন, "It is a wonderful case of nature imitating art."

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটকের রিহার্সাল শুরু হওয়ার কিছু আগেই অসকার আবার টরকোয়েতে লেডী মাউণ্ট টেম্পলের ভবনে বসে *La Sainte Courtisane* নামক নাটক লেখেন। 'Salome'-এর মত আর একটি নাটক লেখার বাসনা ছিল অসকারের—এই সেই নাটক। এই নাটকের কাহিনী তাঁর কাছে অতিশয় প্রিয়, অনেকের কাছেই এই গল্প বারবার বলেছেন। নাটকটি বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন, এখনও লিখছি এবং চিন্তা করছি। এই নাটকে 'The Portrait of Mr. W. H.' নামক বিখ্যাত রচনার বক্তব্য পুনরুত্থাপন করা হয়েছে। তাঁর বিচারকালে এডা লেভারসনের কাছে এই নাটকার পাণ্ডুলিপি রেখে যান, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীতে এই পাণ্ডুলিপি অসকারকে ফেরত দেওয়া হয়। তারপর পাণ্ডুলিপিটি একদিন ঘোড়ার গাড়িতে ভুলে ফেলে যান।

আঁরি দ্য রেনিয়ার বলেছেন, 'এই সময়ে অসকার ক্লান্ত স্থূলদেহ মানুষের মত কাফে, ক্যাবে, সার্লোতে পর্যায়ক্রমে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সাফল্য মানুষের অনেক সময় বিশেষ ক্ষতি করে, অসকারের জীবনেও তাই ঘটল। দুটি নাটকে যে আর্থিক লাভ হল তাতেই মাথা ঘুরে গেল।

একজন জীবনীকার বলেছেন, 'স্কুল থেকে বেরিয়েই ছোট ছেলে হাতে পয়সা পেলে যেমন যা খুশি তাই করে, অসকারও তাই শুরু করলেন।'

বছর দুই এই ধরনের উদ্দাম জীবনযাত্রার পর অসকার তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন—"In this world there are only two tragedies, one is not getting what one wants, and the other in getting it."

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে-সাফল্যের শিখরে উঠেছিলেন অসকার—তার ফলে তাঁর চারপাশে একটা ঈর্ষা ও বিদ্বেষের জাল সৃষ্টি হল এবং তাঁর বাকী জীবনটুকু আচ্ছন্ন করে রাখল। এই সময়ে তাঁর বার্ষিক আয় প্রায় আট হাজার পাউণ্ড, এখনকার মূল্যমানানুসারে প্রায় চল্লিশ-

পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। অসকারের ভাগ্যলক্ষ্মী এক বিচিত্র রহস্য সৃষ্টি করলেন।

'An Ideal Husband' নাটকটির সম্পর্কে সর্বপ্রথম জুন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কথা উঠলেও, তিনি তখন নাটকটি পরিকল্পনা করেছিলেন মাত্র। 'An Ideal Husband' ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি হে মার্কেটের থিয়েটার রয়্যালে মঞ্চস্থ হয়। প্রিন্স অব ওয়েলস (সপ্তম এডওয়ার্ড) বক্সে বসে নাটকাভিনয় দেখছিলেন। অভিনয়শেষে লেখককে ডেকে অভিনন্দন জানালেন। লেখক বললেন, দু-একটি জায়গা দীর্ঘ হয়েছে, কাটতে হবে।

প্রিন্স অব ওয়েলস বললেন, দয়া করে অমন কর্ম করবেন না। একটি কথারও পরিবর্তন চলবে না।

এই নাটকে লেখকের পূর্ববর্তী নাটকাবলীর সকল গুণ বর্তমান ছিল, তা ছাড়া, সংগঠনে, আঙ্গিকে, রূপায়নে, চরিত্র-চিত্রণে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হল।

এর পর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হওয়ায় একদিন জর্জ আলেকজাণ্ডারকে অসকার বললেন, দেড়শো পাউণ্ড দাদন দিন, একটা নাটক লিখে দেব, আর যদি না পারি টাকা ফেরত দেব। এই হল নতুন নাটক 'The Importance of Being Earnest'-এর সূত্রপাত।

নাটকটি লিখিত হওয়ার পর প্রথমে আলেকজাণ্ডার মনে করেছিলেন এই হালকা কমেডি তাঁর উপযুক্ত নয়, তিনি তাই নাটকটি অন্যত্র পাঠালেন। কিন্তু হেনরী জেমসের নাটকটি সেণ্ট জেমস থিয়েটারে অচল হওয়ায় তিনি 'The Importance of Being Earnest' নাটকটি চেয়ে নিলেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি সেণ্ট জেমস থিয়েটারে 'The Importance of Being Earnest' মঞ্চস্থ হল। সেদিন অতিশয় বিশ্রী আবহাওয়া। অতি তীব্র তুষার-ঝঞ্ঝায় চারদিক আচ্ছন্ন। ব্রুহাম, ভিক্টোরিয়া, হ্যানসম এবং অন্যান্য গাড়ি চলাচল করা কঠিন, তবু সেদিন সেণ্ট জেমস থিয়েটারে দর্শকের অভাব হয় নি। সারা লণ্ডনের রসিক-সমাজ অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। অসকার সেদিন কিন্তু অধিকাংশ সময় স্টেজের ভিতরই ছিলেন। এই নাটক দেখে উইলিয়াম আর্চার লিখেছিলেন—"Farce is too gross and commonplace a word to apply to such iridescent filament of fantasy."

অসকার নিজে বলতেন—"There are two ways of disliking my plays, one way is to dislike them, the other to prefer Earnest."

ওয়াইলড বলেছেন, কমেডি লেখা খুব সহজ। 'ডোরিয়ান গ্রে' বা 'সালোমে'র মত গ্রন্থ লেখাই কঠিনতর কর্ম। এই দুটি গ্রন্থই তিনি প্রচুর পরিশ্রম করে লিখেছেন, তাই মমতাও ছিল বেশী।

যেদিন 'Earnest'-এর প্রথম অভিনয় রজনী, সেই দুর্যোগের রাত্রিতেই মার্কুইস অব কুইনসবেরী সেণ্ট জেমসের দোরে দোরে গাজর আর অন্যবিধ সবজি নিয়ে ঘুরেছেন নাট্যকারকে অপদস্থ করবার জন্যে। সেকথা এই কাহিনীর প্রথমেই বলা হয়েছে। অসকারের জীবন-নাট্যে এইবার সেই শেষ অঙ্ক শুরু হল।

নয়

লিওনেল জনসন ছিলেন ভাল ছাত্র, কবি হিসাবেও বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে অকালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাস ছিলেন লিওনেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের এক সন্ধ্যায় লিওনেল ডাগলাসকে অসকারের টাইট স্ট্রীটের বাসায় এনে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম, সেই সময় ডাগলাসের বয়স মাত্র একুশ, অক্সফোর্ডে দু বছর কেটেছে, দেখায় কিন্তু ষোল-সতেরোর মত। দেবশিশুর মত সুন্দর আকৃতি—যেন তরুণ এডোনিস।

এই পরিচয়ই অসকারের জীবনের প্রচণ্ড অভিশাপ। যদি এই পরিচয় না ঘটত তা হলে পরিপূর্ণ জীবনভোগ করে অসকার হয়তো তাঁর বন্ধু সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের কাছ থেকে নাইটত্ব লাভ করে সসম্মানে পরলোকের পথে পাড়ি দিতে পারতেন, কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশে সবই পরিবর্তিত হয়। যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন-সদৃশ 'ডোরিয়ান' অসকার স্বয়ং সৃষ্টি করেছিলেন সেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনই ডাগলাস-মূর্তিতে তাঁকে গ্রাস করেছে। লিওনেলও খুশী হন নি, তিনি অসকারকে উদ্দেশ করে বিখ্যাত সনেট রচনা করেছেন—"I hate you with a necessary hate"...

কুইনসবেরীর অষ্টম মার্কুইসের তৃতীয় সন্তান অ্যালফ্রেড ডাগলাস। অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর মা স্বামীকে ডিভোর্স করেন এবং ছেলেদের নিয়ে আলাদা থাকতেন। ডাগলাসকে তাঁর মা ছেলেবেলা থেকেই 'Bosie' বলে ডাকতেন, [Boysie (খোকন) কথাটির অপভ্রংশ], সেই নামেই সকলে অ্যালফ্রেডকে সম্বোধন করতেন। মার্কুইস ছিলেন একজন উন্মাদ

প্রকৃতির মানুষ। প্রচুর বিত্ত ও সম্মানের সঙ্গে মার্কুইস ডাগলাস পরিবারের প্রকৃতিগত 'Mad-bad blood'ও উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। পত্নী ও সন্তানদের প্রতি তাঁর মমতা ছিল না, এমন কি মৃত্যুশয্যায় যখন তাঁর বড় ছেলে শেষ বিদায় নিতে এল, তখন তিনি তার গায়ে থুতু ফেলেছিলেন।

পিতা-পুত্রের মধ্যে যে ধরনের পত্রবিনিময় হয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। Unmanly brute, crazy lunatic, persecutor of his wife, bully of his children—এইসব বিশেষণ তাঁর সন্তানপ্রদত্ত।

জ্যেষ্ঠ পুত্র লর্ড ড্রামলানরিগ ছিলেন পররাষ্ট্র-সচিব রোজবেরীর প্রাইভেট সেক্রেটারী, গ্ল্যাডস্টোন তখন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ড্রামলানরিগকে ইংলিশ পীয়রত্বে অভিষিক্ত করার সুপারিশ করেন, স্কটিশ পীয়রদের হাউস অব লর্ডসে বসার অধিকার ছিল না। মার্কুইস অব কুইনসবেরী মনোনীত সদস্য হিসাবে একটি আসন পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শপথ গ্রহণ করতে রাজী না হওয়ায় পুনর্বার মনোনীত হন নি। পুত্র পিতার বিরক্তি ও রোষের ভয়ে এই পীয়রত্ব গ্রহণে রাজী হন নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্কুইস অব কুইনসবেরী লিখিত অনুমতি দান করেন। ড্রামলানরিগ লর্ড কেলহেড হিসাবে পীয়রত্বে উন্নীত হলেন। এক মাসের মধ্যেই মার্কুইস অব কুইনসবেরী কুইন ভিক্টোরিয়া, গ্ল্যাডস্টোন, রোজবেরী প্রভৃতিকে অপমানজনক চিঠি লিখতে লাগলেন। রোজবেরীকে ঘোড়ার চাবুক মারবেন এই আশায় হামবুর্গ পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন এবং রোজবেরীর হোটেলের দরজায় অপেক্ষা করছিলেন এমন সময় প্রিন্স অব ওয়েলস (সপ্তম এডওয়ার্ড) তাঁকে নিরস্ত করেন কৌশলে এবং পদমর্যাদার বলে।

এর পর মার্কুইস দুই পুত্রের পিছনে লাগলেন, অ্যালফ্রেডের বিরুদ্ধে রাগের কারণ অসকার ওয়াইলডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আর দ্বিতীয় পুত্র পার্সির (লর্ড ডাগলাস অব হুইক) ওপর রাগের কারণ সে ডাগলাসকে সমর্থন করত। এমন কি পার্সির তরুণী বধূকে অপমানসূচক অশ্লীল পোস্টকার্ড পাঠাতেন, অথচ তাকে চোখে দেখেন নি কোনওদিন। এই পিতার পুত্র লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাস, অসকারের চোখে তাঁর 'Slim guilt soul, walked between passion and poetry' আর 'red-rose leaf lips that had been made no less for the music of song than madness of kisses.'

কুইনসবেরী যখন অসকার এবং ডাগলাসের ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পারলেন তখনই তিনি পুত্রকে এই অন্তরঙ্গতার অবসান ঘটানোর জন্য আদেশ দিলেন। পুত্র তখন সাবালক, তাই পিতার কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করল না। প্রথমটা পুত্রের নির্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হলেও মার্কুইস বললেন, তোমার ভাতা বন্ধ করে দেব। উভয়ের মধ্যে বিশ্রী পত্রালাপ শুরু হল। অবশেষে একদিন কাফে রয়্যালে লাঞ্চের সময় পিতা-পুত্র এবং অসকারের সাক্ষাৎকার ঘটল। পুত্র পিতাকে নিজেদের টেবিলে আমন্ত্রণ করলেন। প্রথমটা প্রত্যাখ্যান করলেও মার্কুইস শেষ পর্যন্ত ওদের টেবিলে এলেন। অসকারের সঙ্গে পরিচিত হলেন, অসকারের বিচিত্র আলাপাচারে মুগ্ধ হলেন, বেলা চারটে পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা চলল।

কুইনসবেরী এমনই প্রীত হলেন যে ডাগলাসকে লিখলেন, যা সব এতদিন বলেছি তা প্রত্যাহার করছি, আমার বন্ধু লর্ড ডি গ্রে এবং তাঁর স্ত্রী বলেছেন অসকার লোকটি খুবই ভাল, প্রতিভাসম্পন্ন লোক এবং সুন্দর কথা বলেন। আর শেষে এই কথাও লিখলেন—"I don't wonder you are so fond of him; he is a wonderful man." কিন্তু দুমাস যেতে না যেতেই যে-কে-সেই। আবার সেই কঠোর পত্রালাপ শুরু হল। পুত্র পিতার আদেশ পালন করতে রাজী হল না, বরং তাঁর অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলল। ভাতা বন্ধ করার মত নীচ কর্ম যদি করার ইচ্ছে হয়, করতে পারেন।

পিতা তাই করলেন। টাকা বন্ধ হল বটে, চিঠি বন্ধ হল না—উভয়ের চিঠির ভাষা দিন দিন তীব্রতর হয়ে উঠল।

একদিন অসকারের ১৬নং টাইট স্ট্রীটের বাসায় মার্কুইস এসে উপস্থিত। অসকার নির্ভয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন।

মার্কুইস বজ্রনিনাদে বললেন, বসুন।

ওয়াইলড শান্ত গলায় জবাব দিলেন, আমার বাড়িতে বা অন্য কোথাও এ ভাবে কথা বলার অনুমতি আমি কাউকে দিই নি। আপনি হয়তো আপনার চিঠির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছেন। আপনার ছেলেকে আপনি আমার স্ত্রী এবং আমার সম্পর্কে যে সব কথা লিখেছেন একদিন তার জন্য আমি আপনাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাব।

আমি আমার ছেলেকে যা খুশি লিখতে পারি।

আপনি কোন্ সাহসে আপনার পুত্র এবং আমার সম্পর্কে এমন যা তা লিখতে পারেন?

স্যাভয় হোটেল থেকে আপনাকে দূর করে দিয়েছিল ক্ষণিকের নোটিসে। আপনার আচরণই তার জন্য দায়ী।

মিথ্যা কথা।

পিকাডেলিতে আপনি আলাদা ঘর নিয়েছেন ডাগলাসের জন্য।

আপনাকে কেউ মিথ্যা বলেছে। আমি এসব কিছুই করি নি।

মার্কুইস কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন, তিনি তর্ক করতে লাগলেন।

অসকার বললেন, লর্ড কুইনসবেরী, আপনি কি সত্যিই আপনার পুত্র এবং আমাকে অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত করছেন?

জানি না, তবে আপনাকে দেখে তাই মনে হয়, আপনার ভঙ্গিও সেইরকম। যদি কোনদিন সাধারণ রেস্তোরাঁয় আপনাকে আর আমার পুত্রকে দেখি, তা হলে আমি দেখে নেব।

কুইনসবেরীর আইন আমি জানি না, তবে অসকার ওয়াইলডের আইন দর্শনমাত্রেই গুলি করা, আমার বাড়ি থেকে বিদায় হোন।

কুইনসবেরী বক্সিং সম্বন্ধে আইনপ্রণেতা হিসাবে খ্যাত।

একেবারে কুঁকড়ে গেলেন কুইনসবেরী, বললেন, কি বিশ্রী স্ক্যাণ্ডাল।

তাই যদি হয়, সেই স্ক্যাণ্ডালের জনক আপনি, আর কেউ নয়।

অসকারের ভৃত্য ভয়ে কাঁপছিল, অসকার তাকে উদ্দেশ করে বললেন, এই লোকটি মার্কুইস অব কুইনসবেরী। লণ্ডনের সবনিকৃষ্ট পশু। কোনদিন এঁকে এ বাড়িতে প্রবেশ করতে দেবে না। যান, এখন বিদায় হোন।

মার্কুইস মাথা হেঁট করে চলে গেলেন।

রবার্ট রসের সুপারিশে অসকার ওয়াইলড হামফ্রেস, সন অ্যাণ্ড কারস নামক বিখ্যাত সলিসিটর ফার্মের চার্লস হামফ্রেসের সঙ্গে মার্কুইসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য পরামর্শ করলেন। মামলা হয়তো রুজু হত, কিন্তু ডাগলাসের আত্মীয় কারেন্স উইনডহ্যামস্ এম. পি.র উপদেশে অসকার নিরস্ত হলেন। উইনডহ্যামস বলেছিলেন মার্কুইস ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। মার্কুইস ক্ষমা প্রার্থনা না করে স্বয়ং টাইট স্ট্রিটের বাসায় এক হামলা করতে এসেছিলেন।

অসকারের জননী পুত্রের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন, তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন ডাগলাসকে, ডাগলাসও বিশেষ মাতৃভক্ত ছিলেন। ডাগলাসের মেজাজও বাপের মতই ছিল। ডাগলাস-জননী একটি পত্রে দুঃখ করে লিখেছিলেন—"the one of my children who has inherited the fatal Douglas temperament."

অনেক পরামর্শের পর ডাগলাসকে কায়রোতে লর্ড ও লেডী ক্রোমারের কাছে পাঠানো হল। লেডী কুইনসবেরী অসকারকে অনুরোধ করেছিলেন যেন 'Bosie'-র সঙ্গে যোগাযোগ না রাখেন। অসকার কথা দিয়েছিলেন এবং সে কথা রেখেছিলেন।

কায়রোতে সেই সময় তিনজন তরুণ লেখক ছিলেন, ক্যাণ্টারবেরীর আর্কবিশপের পুত্র এফ. ই. বেনসন, রবার্ট হিচেনস ('গার্ডেন অফ আল্লার' লেখক) এবং রেগী টার্নার। এঁরা সকলেই উত্তরকালে উপন্যাস-লেখক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন।

ডাগলাসের সঙ্গে হিচেনসের ঘনিষ্ঠ আলাপ হয় এবং অসকার সম্পর্কে অনেক কথা ডাগলাস তাঁকে বলেছিলেন। ফলে "The Green Carnation" নামে একটি গল্প লেখেন হিচেনস। এই গল্পে হিচেনস ওয়াইলডের জীবন নিয়ে এক বিদ্রূপাত্মক কাহিনী রচনা করলেন, ফলে এতদিন যা সন্দেহ বা কানাকানির মধ্যে ছিল তা সর্বত্র প্রচারিত ও আলোচিত হতে লাগল। ডাগলাস তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন—"He wrote his book 'The Green Carnation' entirely on the strength of and as the result of association with me, for he had not at that time met Oscar wilde"—

ডাগলাসের অবিবেচনাই তাঁর বন্ধুর মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়াল।

লর্ড কিচেনারের সঙ্গে মিশরে ডাগলাসের এক রোমান্টিক যোগাযোগ ঘটে। লর্ড ক্রোমার তুরস্কের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের অবৈতনিক সহকারী হিসাবে ডাগলাসের একটি কূটনৈতিক কাজও যোগাড় করে দেন, কিন্তু তাতে তাঁর মন বসল না। এর পর এথেন্সে চলে এলেন ডাগলাস। একদিন ওয়াইলড চিঠি পেলেন লেডী কুইনসবেরীর কাছ থেকে যে ডাগলাস ওয়াইলডের কাছ থেকে একটি চিঠির জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

ওয়াইলড কোনও উত্তর দিলেন না। আর চিঠিতে ফল হল না দেখে ডাগলাস নিজেই চিঠি দিলেন মিসেস ওয়াইলডকে। অসকার তবু নীরব। ডাগলাস জানালেন আমি প্যারী যাচ্ছি। অসকার প্যারী থেকে চলে এলেন। অবশেষে ডাগলাস এক দীর্ঘ পত্র লিখলেন এবং সেই পত্রে আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন করলেন। পারিবারিক ইতিহাস অসকারের জানা থাকায় অসকার নরম হলেন। উভয়ের মিলন হল। অসকারকে দেখে অ্যালফ্রেডের চোখ

দিয়ে অবিরল জল ঝরতে লাগল, অসকারের হাতটি নিজের হাতের মধ্যে রেখে ছোট ছেলের মত নীরবে বসে রইলেন ডাগলাস।

এই ঘটনার দুদিন পরে কাফে রয়্যালের ডিনার টেবলে উভয়কে দেখলেন কুইনসবেরী। কুইনসবেরী ডাগলাসকে লিখেছিলেন—"With my own eyes I saw you in the most loathsome and disgusting relationship as expressed by your manner and expression......" পত্রশেষে 'your disgusted so-called father' লিখেছেন। পুত্রকেও so-called son বলতেন মার্কুইস।

সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারে 'The Importance of Being Earnest' অভিনয়-রজনীর চারদিন পরে 'Albermarle' নামক ওয়াইলডের ক্লাবে গিয়ে 'To Oscar Wilde posing as a somdomite' এই কার্ডখানি রেখে চলে গেলেন। অনাবশ্যক 'm'-টি অজ্ঞানতাবশতঃ বলেই মনে হয়। দরোয়ান কার্ডখানি রীতিমত ব্যবস্থানুসারে রেখে দিল এবং দশদিন পরে ওয়াইলড যখন ক্লাবে এলেন তাঁর হাতে পৌঁছে দিল। ওয়াইলড কার্ডখানি গ্রহণ করে মার্কুইসের চ্যালেঞ্জ পাঠ করলেন। নির্বুদ্ধিতাবশতঃ ওয়াইলড এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কুইনসবেরীর ফাঁদে পা দিলেন।

দশ

অসকার ওয়াইলডের জীবনের অভিশপ্ত দিন শুরু হল। বিচার আর কারাদণ্ডে এক বিস্ময়কর প্রতিভার সামগ্রিক জীবনের অবসান ঘটল। ওয়াইলডের অপরাধ সম্পর্কে বিচারক বলেছিলেন—"Corruption of the most hideous kind among young men"—

বেচারী অসকার। প্রজাপতিকে যেন জাঁতাকলে পিষে মারা হল। অসকারের মত নন্দনতাত্ত্বিক সূক্ষ্ম-সংবেদনশীল ব্যক্তি বীভৎস ব্যভিচারীর দুর্নামে কলঙ্কিত হলেন।

অসকারের শ্লেষাত্মক কবিতা, গভীর সৌন্দর্যানুভূতি ও মনোভঙ্গী, 'আর্টের জন্য আর্ট' এই নীতির প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ অসকারের জীবনের এই বিচিত্র পরিণতি। এই কল্পনাবিলাসী মানুষটিকে রূঢ় বাস্তবতা ও মধ্যবিত্ত সামাজিক নীতির নিরিখে কি বিচার করা সম্ভব?

বিচারকের রায় শোনার পর আদালতে 'শেম শেম' ধ্বনি উঠেছিল। আদালতের বাইরে সাধারণ স্ত্রীলোকদের দল শোভাযাত্রা করে হল্লা করতে এসেছিল।

অসকার ওয়াইলডের বিচার কাহিনীর বিবরণ 'Trials of Oscar Wilde' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। এই নিবন্ধের মধ্যে স্থানাভাবহেতু তা বিশদভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। এই বিখ্যাত বিচার-কাহিনী সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ এক করুণ কাহিনী—সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস এই যে ওয়াইলডকে একটি নৈতিক প্রশ্নের জন্য সর্বনাশ ও অখ্যাতি বরণ করতে হয়েছিল। সাফল্যের মুহূর্তে ভাগ্য আর নিজস্ব প্রকৃতির ত্রুটির ফলে তাঁর চরম সর্বনাশ ঘটেছে। যে সঙ্কীর্ণমনা জনসাধারণকে তিনি উপহাস করেছেন, 'সবুজ কারনেশন' তাদের কাছে প্রয়োজনহীন।

খ্যাতি ও সৌভাগ্যের পথ যখন সামনে প্রসারিত তখন মার্কুইস অব কুইনসবেরীর আকৃতিতে অদৃষ্টপুরুষ এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। মার্কুইস তাঁর বাইশ বছরের ছেলে অ্যালফ্রেডের কল্যাণার্থে তাকে অশুচিস্পর্শ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলেন। অথচ পিতা-পুত্রে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, পুত্র তার জননীর স্নেহচ্ছায়ায় পরিপুষ্ট। তবু so-called father, তাঁর so-called sonকে ত্রাণ করার জন্য প্রচুর অর্থ এবং সামর্থ্য নিয়োগ করলেন। অসকারের বয়স তখন চল্লিশ। কুইনসবেরীর চরিত্র আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। স্ত্রীর প্রতি পৈশাচিক ব্যবহার ও সন্তানদের প্রতি নির্মম অত্যাচারের ফলে তিনি সর্বত্র অপ্রিয় ছিলেন। অসকারের প্রতি তাঁর অসীম ঘৃণা আর তীব্র বিতৃষ্ণা। তাই

অসকারকে বললেন—'Posing as a sodomite'। নিছক হঠকারিতার বশে ওয়াইলড এই অভিযোগের প্রতিবাদ করলেন। তাঁকে সমর্থন করলেন ও উত্তেজিত করলেন মার্কুইস-তনয় লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাস। নৃশংস কংসসদৃশ পিতাকে জব্দ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ওয়াইলড মার্কুইসকে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত করলেন।

ওল্ড বেইলীর আদালতে সুবিচারের আশায় অসকারের যাওয়া উচিত হয় নি। সন্দেহজনক চরিত্রের বহু নোংরা যুবকের সঙ্গে অসকারের মেলামেশা ছিল। তাদের সঙ্গে করে তিনি স্যাভয় প্রভৃতি বড় বড় হোটেলে নিয়ে খানা খেতেন, আড্ডা দিতেন। অ্যালফ্রেডকে লিখিত ওয়াইলডের কয়েকটি চিঠি নিয়ে আগেই ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা চলছিল। একজন বলেছিল—"A very curious construction could be put on the letters", সেই সঙ্কটময় অবস্থার সামনে দাঁড়িয়েও অসকার বলেছিলেন—"Art is rarely intelligible to the criminal classes."

মার্কুইস তাঁর অভিযোগ সপ্রমাণ করার জন্য ওয়েস্ট-এন্ডের আঁস্তাকুড় থেকে চার্লস ব্রুকফিলডকে পেলেন। চার্লস ব্রুকফিলড সাহিত্যিক মনোবিলাসী মানুষ, কিন্তু বিশেষ অগ্রসর হতে পারেন নি সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তাঁর সঙ্গে অক্সফোর্ডের সময় থেকেই অসকারের পরিচয় ছিল, এবং বিদ্বেষ ছিল। অসকারের একটি নাটকে ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করতেন তিনি। নাট্যকারের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল। কয়েকটি উচ্ছৃঙ্খল যুবককে সাক্ষী হিসাবে সংগ্রহ করে দিল এই ব্রুকফিলড। ওয়াইলড নেহাত অবিবেচকের মত তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন।

অসকারের বন্ধুবান্ধবরা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে দেশত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। সরকারও তাঁকে পালাবার সুযোগ দিয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু শুধু ডাগলাসের অনুরোধে সেই সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন নি। বিচারের পূর্বদিন ডাগলাস, ফ্রাঙ্ক হ্যারিস আর জর্জ বার্নার্ড শ তিনজনে একত্রে লাঞ্চ খেলেন। হ্যারিস ও শ সম্ভাব্য বিপদের কথা উল্লেখ করে অসকারকে বিদেশে যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলেন।

মার্কুইস অব কুইনসবেরীর পক্ষ সমর্থনে দাঁড়ালেন কুইনস কাউনসেল এডওয়ার্ড কারসন। ইনি পরে আইন-মন্ত্রী ও লর্ড হয়েছিলেন। ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে অসকার আর কারসন উভয়ে ছিলেন সহপাঠী। অসকার এ কথা শুনে বলেছিলেন—"No doubt he will perform the task with all the added bitterness of an old friend."

অসকারের এই কথা সত্য হয়েছিল। কারসনের জেরা আজও আইনজীবীদের আদর্শ।

জেরার মুখে অসকার বললেন, চিন্তার মধ্যে সুনীতি-দুর্নীতি বলে কিছু নেই। শুধু আছে দুর্নীতিমূলক ভাবাবেগ।

তা হলে বিকৃত নীতিসম্বলিত গ্রন্থকেও ভাল বলা যায়?

যে-গ্রন্থ প্রকৃত শিল্পকর্ম সে কোনও মতবাদের প্রচারক নয়।

'ডোরিয়ান গ্রের ছবি' বইটিকে বিকৃত রুচির উপন্যাস বলা যায়?

যারা বর্বর এবং অশিক্ষিত তারা তাই মনে করতে পারে।

ডোরিয়ান গ্রের প্রতি বেসিলের স্নেহ ও প্রীতি সাধারণ মানুষের কাছে কি একটি বিশেষ রুচির পরিচায়ক নয়?

সাধারণ ব্যক্তির মত ও মনোভাব সম্পর্কে আমার কোনও জ্ঞান নেই।

কারসন বুঝলেন অসকারের শ্লেষবাক্যের মর্মভেদ করা কঠিন। তিনি অ্যালফ্রেডকে লিখিত চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে বললেন, আপনি ডাগলাসকে কি ভালবাসেন?

না, তাকে আমার ভাল লাগে। চিঠিটি একটি গদ্যকবিতা, সাধারণ চিঠি নয়, এর পর হয়তো 'King Lear' বা সেক্সপীয়রের কোনও সনেট রুচিসঙ্গত মনে হবে না।

সাক্ষ্য এবং জেরার ফলে মামলার অবস্থা বুঝে ওয়াইলডের পক্ষের উকীলরা মামলা তুলে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। তার অর্থ কুইনসবেরীর অভিযোগ মেনে নেওয়া। আদালত তাঁকে দেশত্যাগের সময় দিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে টাকাকড়ি তুলে তিনি দেশত্যাগ করার চিন্তা করছেন এমন সময় গ্রেপ্তার হয়ে আবার আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন।

এইবার তাঁকে প্রশ্ন করা হল—"What is the love that dare not speak its name?

অসকার এই প্রশ্নের যা জবাব দিলেন তা চিরস্মরণীয়। আদালত এবং সাহিত্যের ইতিহাসে অসকারের সেই জবাব আজও পরম মূল্যবান উক্তি হিসেবে স্বীকৃত। এই প্রশ্নের উত্তরে অসকার বললেন :

> "The love that dare not speak its name in this country is such a great affection as there was between David and Jonathan, such as Plato made the very basis of his Philosophy, and such as you find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare. It is that deep, spiritual affection that is as pure as it is perfect... It is in this Century misunderstood, so much misunderstood that it may be described as the Love that dare not speak its name, and on account of it I am placed where I am now. It is beautiful, it is fine, it is the noblest form of affection.' There is nothing unnatural about it."

অসকারের আত্মপক্ষ সমর্থনে এই উত্তর সবকালের বিচারকের দরবারে পেশ করা রইল।

এগার

দু বছর জেলে কারাদণ্ড ভোগ করার পর যখন অসকার কারামুক্ত হলেন তখন তিনি বুঝলেন যে তাঁর দণ্ড যাবজ্জীবনের। এই দু বছর প্রাথমিক শাস্তি মাত্র। সারাজীবন ধরে একঘরের মত সমাজচ্যুতের জীবন যাপন করতে হবে। অসকারের চাইতে স্বল্পখ্যাতিবিশিষ্ট মানুষের পক্ষে হয়তো এই শাস্তি এত নিদারুণ হয়ে উঠত না।

আইন যে শাস্তি দিয়েছিল তার ভোগ দু বছর, সমাজের শাস্তি সারাজীবনের। এই শত্রুপুরীতে অসকারের কয়েকজন মাত্র বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, যাঁরা এই দুর্দিনেও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। তাঁরা একটি পরিকল্পনানুসারে অসকারের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করেন।

রবার্ট রস লণ্ডনে থেকে পাওনা টাকাকড়ি সংগ্রহ করবেন, অসকারের স্ত্রীর সম্পত্তি থেকে তাঁর জন্য বরাদ্দ টাকা জোগাড় করবেন আর একাকী অসকার নির্বাসনে ফ্রান্সের অপরিচিত শহরে দিন কাটাবেন। এই সময় অসকার সেবাসটিয়ান মেলমথ এই ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন। এই সর্বপ্রথম নির্বাসন এবং নিঃসঙ্গের জ্বালা অনুভব করলেন অসকার। রাতে মায়ের স্বপ্ন দেখতেন, চোখে তাঁর কঠিন কঠোর দৃষ্টি, রাতের ঘুম দুঃস্বপ্নে ভেঙে যেত। দিনের বেলা পাহাড় আর প্রান্তরে উদাসীনের মত ঘুরে বেড়াতেন। জেল থেকে ছাড়া পেলেও পুলিস পিছু ছাড়ে নি, তারা নজর রেখেছিল। ফ্রান্সের পুলিস তাঁকে জানিয়েছিল যে, কোনও রকম বেচাল দেখলে তারা শাস্তিদানের ব্যবস্থা করবে। এ ছাড়া কুইনসবেরী-নিযুক্ত প্রাইভেট ডিটেকটিভও ছিল।

বন্ধু রবার্ট রসকে তিনি মনের দুঃখ পত্রে লিখতেন। এই রবার্ট শেষ পর্যন্ত বন্ধুকে ত্যাগ করেন নি। অসকার তাঁকে বলতেন সেণ্ট রবার্ট। স্ত্রীর চিঠি আসত, সঙ্গে ছেলেদের ফোটো। স্ত্রী বছরে দুবার দেখা করার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে দেখার ব্যবস্থা নেই—সে আর এক যন্ত্রণা।

নরমাণ্ডি উপকূলের শান্তি ক্রমশঃ তাঁর মনেও শান্তি ও স্বস্তি দান করল। বার্নিভালে নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মত ডানাভাঙা উদ্দাম পাখির মত অসকার দিন কাটাতে লাগলেন। শহর তাঁর কাছে আতঙ্কর।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল শেষে শরৎকালের গোড়ায় ওয়াইলড মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে লাগলেন। ক্রমশঃই সেই যন্ত্রণা বেড়ে উঠল। Absinthe সেবনের ফলে যন্ত্রণা আরও বাড়ল। ডাক্তাররা দেখে বললেন, অপারেশন করা প্রয়োজন। অপরাশেন সূক্ষ্ম এবং ব্যয়সাধ্য। খরচের কথা শুনে অসকার বললেন, "Ah, well then, I suppose I shall die as I have lived—beyond my means."

জাঁ দ্যুপয়রীয়র ছিলেন হোটেল ডি আলসাসের মালিক। তিনি একদিন বাড়িওলা কর্তৃক গৃহচ্যুত অবস্থায় অসকারকে দেখে বিশেষ দুঃখিত হন। আগেই উভয়ের পরিচয় ছিল, তিনি সকল দেনাপাওনা মিটিয়ে ওয়াইলডকে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন নিজের হোটেলে, এবং চিরদিনের মত সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলেন। তিনিই যন্ত্রণাকাতর অসকারের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। অসকার বারবার মাথায় হাত দিচ্ছিলেন, যন্ত্রণায় কাঁদছিলেন। সকলে মাথায় বরফ দিলেন, মরফিন ইনজেকশন দেওয়া হল। কানের একটি ফোড়া অপারেশনে একটু সাময়িক স্বস্তি পাওয়া গেল। দ্যুপয়রীয়র নিজেই ডাক্তার, এবং ওষুধ পথ্য প্রভৃতি সবই খরচ করতে লাগলেন। এমব্যাসীর ডাক্তার টাকার (Tucker) অসকারকে দেখছিলেন।

২৫শে নভেম্বর আবার অবস্থা বেশ খারাপ হল। সেদিন রবিবার, সকাল থেকেই মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল। কানের সেই ফোড়ার ফলে মস্তিষ্ক ফুলে উঠেছিল—অবস্থা দেখে রসকে টেলিগ্রাম করা হল। এর আগে নভেম্বরের মাঝামাঝি রস চলে যাবে শুনে অসকার কেঁদে ফেলেছিলেন, আর দেখা হবে না বলেছিলেন। তখন রস অতটা বুঝতে পারেন নি।

মৃত্যুর পূর্বরজনীতে সন্তানদের কথা বলতেন অসকার, তাদের স্মৃতি মনে জাগত। বললেন, ভিভিয়ান একদিন সোফায় শুয়েছিল, বয়স তখন এগারো; বললাম, কি করছ? বললে কি জান, বললে—আমি ভাবছি, বিরক্ত করো না।

বারবার ছোট ছেলের মত গলা করে এই কাহিনী বলতে লাগলেন। ৩০শে নভেম্বর অচৈতন্য হয়ে পড়লেন অসকার, দুটো বাজতে দশ মিনিটে হোটেলের মালিক এবং শেষ সময়ের উপকারী বন্ধু জাঁ দ্যুপয়রীয়র তাঁকে বুকে জড়িয়ে আছেন এমন সময় শেষনিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। মৃত্যুর সার্টিফিকেটে বলা হল সেরিব্রাল মেনিনজাইটিস।

ন বছর ধরে ব্যাগনোর সমাধিক্ষেত্রে সামান্য নাম-ধাম তারিখসহ একটি সাধারণ কবরে শুয়েছিলেন অসকার। শেষকৃত্যের ব্যয় বহন করেছিলেন ডাগলাস।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে অসকারের সমস্ত ঋণ পরিশোধের পর বালজাক, সঁপা, সারা বার্নহার্ড, আদেলিনা পাত্তি প্রভৃতিকে যেখানে কবরস্থ করা হয়েছে, সেই Pere Lachaise সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাধিস্থ করা হল। এপস্টাইন কর্তৃক খোদিত একটি সমাধিফলকে সমাধি চিহ্নিত করা হল, অসকারপ্রেমিক ভক্তবৃন্দ সেই তীর্থস্থানে গিয়ে শ্রদ্ধার অশ্রুনিবেদন করেন।

সমাধিফলকে কবির স্বলিখিত চতুষ্পদী কবিতা উৎকীর্ণ আছে:

"And alien tears will fill for him
Pity's long-broken urn,
For his mourners will be outcast men,
And outcasts always mourn."

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

"If Bengal dies, who will live ?
If Bengal lives, who will die ?"

'দিল্লী চল, চল দিল্লী—'

দুর্গম গিরি, কান্তারমরু, দুস্তর পারাবার পার হয়ে তোমার সেই দৃপ্ত কণ্ঠস্বর এসে পৌঁছল। নিশীথ নগরীর নিদ্রাভঙ্গ হল। পরাধীন ভারতের শেষ পলাতক আর স্বাধীন ভারতের পথে অগ্রসর প্রথম পদাতিক ফিরে আসছে দেশের মাটির পায়ে আবার মাথা ঠেকাতে। রুদ্ধদ্বার রাত্রি অবসানে যে তরুণ বেরিয়েছিল মাতৃমুক্তি পণ করে, ফিরে আসছে সেই বীর ফেরারী। বালসূর্যের রশ্মিরক্তিম সেই তরুণ আননে, ভারতের কবির বাণী সে মুখে মুদ্রিত—জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। পলাশীর প্রান্তরে বাঙালীর বিশ্বাসঘাতকতায় বাঙালীর রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল আম্রকানন, প্রায় দু শতাব্দী আগে; বাঙালীর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বাঙালীই এসে পৌঁছেছে আজ সর্বপ্রথম মণিপুরের প্রান্তরে।

তারায় তারায় অগ্নির অক্ষরে উজ্জ্বল হল তোমার আহ্বান:

> রক্তের ডাক এসেছে। ওঠো। জাগো। এক মুহূর্ত দেরি নয় আর। অস্ত্র হাতে নাও। শত্রুপক্ষের সারি ভেদ করে আমরা যাব। মৃত্যুবরণ করে শহীদ হব আমরা। আমাদের বাহিনী যে পথে দিল্লী যাবে, চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে সেই পথ আমরা চুম্বন করব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। দিল্লী চল, চল দিল্লী।

কী ছিল সেদিন তোমার কণ্ঠস্বরে কে জানে! কেঁপে উঠল আসমুদ্র হিমাচল। সুরের আগুন তোমার স্বরে, আগুনের সুর তোমার গানে। নিশীথ নগরীর স্বপ্ন ছুটে যায়, টুটে যায় তন্দ্রা। সমবেত কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় তোমার কণ্ঠনিঃসৃত ঐক্যের ধ্বনি: হিন্দোস্তানের জয়

হোক ! জয় হিন্দ ! দু শতাব্দী নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ-ভারতের চেতনায় শ্রুত হয় অশ্রুতপূর্ব তোমার অভ্যর্থনা । মুহূর্তে তার ঘুম ভাঙে, কবির কণ্ঠ সাড়া দেয় তোমার ডাকে।

রণভেরী বাজে আজাদ হিন্দ ফৌজের :

কদম কদম বাড়ায়ে যা !

আটত্রিশ কোটি মানুষের শোণিত রক্তে তালে তালে নৃত্য করে সেই রণোন্মাদিনী সুর, আর ভয়ে কাঁপে ব্রিটিশ-সিংহের বুক। দুঃসময়ের মহাসমুদ্রের ওপার থেকে ভেসে আসে তোমার কণ্ঠে পরাধীন ভারতের শৃঙ্খল ছিন্ন করার ঝঙ্কার !

ওই দূরে, বহুদূরে, ওই নদীর ওপারে, ওই বনভূমি আর পর্বত পেরিয়ে আমাদের দেশ ; চির-আকাঙ্ক্ষিত আমাদের মাতৃভূমি। ওই মায়ের কোলে শুয়ে শুনেছি প্রথম এই পৃথিবীর ডাক ; আজ ফিরে চলেছি মাতৃভূমির ডাকে, সেই মায়ের কোলে।

শোন। ভারতবর্ষ আমাদের ডাকছে ; ডাকছে এই নবীন ভারতের সেই চিরপুরাতন দিল্লী। ডাকছে আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ ভারতের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ। ভাই ডাকছে ভাইকে ; রক্তের ডাক এসে পৌঁচেছে আজ রক্তে।

পরাধীন ভারতের পথে এসে পৌঁছয় তোমার ডাক !

এই সেই পথ, যে পথের কোথাও দাঁড়িয়ে আছে নিরস্ত্র নিহত মানুষের রক্তে রঞ্জিত জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি ; এই সেই পথ যেখানে আজও জড়িয়ে আছে স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রথম বলি প্রফুল্ল চাকী আর ক্ষুদিরামের দীর্ঘশ্বাস। বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা বয়ে নিয়ে এই পথ গেছে একদিন দেশকে ভালবাসার অপরাধে দেশ থেকে চিরনির্বাসিতদের তপোবন আন্দামানে।

এই সেই পথ, যে পথ দিয়ে এসেছে শকহুনদল পাঠান-মোগল। বহুদূর অতীতে এই পথ দিয়েই গেছেন ভারতের এক রাজপুত্র। সকল কালের সমস্ত বিশ্বের মানবপুত্র গেয়েছে যাঁর উদ্দেশ্যে বারংবার :

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

এই সেই পথ, যে পথ দিয়ে এসে... মরণের অ... এক কালের কণ্ঠস্বর থেকে চিরকালের এই অমৃতবার্তা :

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এই সেই পথ, যে পথ দিয়ে গেছে দেশবন্ধুর নশ্বর দেহ অবিনশ্বরলোকে ; অবিনশ্বরলোক থেকে নশ্বরলোকে আবির্ভাবের প্রথম মুহূর্তে সঙ্গে করে এনেছিলেন যে 'মৃত্যুহীন প্রাণ'—নশ্বরলোক থেকে অবিনশ্বরলোকে ফিরে যাবার আগে তা দিয়ে গেছে যাকে সেই ভারতপথিক আসছে সেখান দিয়ে—এই সেই পথ।

জানি এই পথ দিয়েই আসবে তুমি, তুমিই যে দেশবন্ধুর সেই 'মৃত্যুহীন প্রাণ' !

এই সেই পতন-অভ্যুদয়ে বন্ধুর পথ, যে পথ অতিক্রম করে এসে পৌঁচেছে আজ আর এক ভারতবন্ধুর ডাক :

আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।

তোমার কণ্ঠে সেদিন কথা বলেছিলেন স্বয়ং ভুবনমোহিনী ভারতবর্ষ : ম্যায় ভুখা হুঁ !

ভিক্ষার অন্নে মেটে না এ ভুখা, রাত্রির তপস্যা ছাড়া আসে না দিন। প্রাণ দিতে না জানলে, মৃত্যু জানে না পরাস্ত হতে।

সেই পথেই, দুর্গম অরণ্যপর্বত, দুস্তর সমুদ্র পার হয়ে এসে পৌঁচল একদিন এই ডাক : দিল্লী চল, চল দিল্লী। নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে নিশীথ নগরীর আকাশে বজ্রে বিদ্যুতে আলোকিত হল তোমার উদাত্ত আহ্বান। ঝড় এল। ১৮৫৭-র যে ঝড় একবার উঠে থেমে গিয়েছিল, চৌরিচৌরায় আর একবার সে ঝড় মনে হয়েছিল উড়িয়ে নিয়ে যাবে সিংহলাঞ্ছিত বৃটিশ পতাকাকে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে লেগেছিল সে ঝড়ের দোলা ; শেষবারের মত তোমার মৃত্যুহীন উদাত্ত আহ্বান-আলোকিত প্রলয়ের

জ্যোতিশিখায় মেঘের গর্জনে, বিদ্যুৎবিদীর্ণ সেই আকাশে ঝড় এল। সেই ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল দিনপঞ্জীর পাতা। বেরিয়ে এল লুপ্তপ্রায় অতীতের পৃষ্ঠা থেকে তোমার জীবনের গৌরবোজ্জ্বল একটি দিন—একটি লাল অক্ষরে চিহ্নিত বৎসর। ১৯১৩—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

দুই

প্রেসিডেন্সি কলেজের করিডরে কয়েকজন ছাত্রের ছোট একটা জমায়েত উত্তেজিত আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে।

উত্তেজনার কারণ, র‍্যাভেনশ স্কুল, কটক থেকে সদ্য আগত একটি বাঙালী ছাত্র। আলাপরত একজনের কণ্ঠস্বর আর সকলের কথা ছাপিয়ে কানে আসে সকলের। তার বক্তব্য হচ্ছে র‍্যাভেনশ স্কুলের এই ছাত্রটি একটি বিস্ময়। বিস্ময়ের কারণ তার অসাধারণ মেধাই নয় মাত্র, অনন্যসাধারণ চরিত্রও বটে। কোনও স্ত্রীলোক কেবল তার ছায়া নয়, ছায়ার ছায়ারও ত্রিসীমানায় দুঃসাহস করে না যাবার। বিস্ময়ের বাকি আছে আরও। বালক বয়সেই এই 'বিস্ময়' একবার গৃহত্যাগ করে গিয়েছিল সন্ন্যাসধর্মের রহস্যাতুর আমন্ত্রণে। যারা শুনছিল তাদের মধ্যে একজন মৃদু আপত্তি করে: এতটা সত্য নয়। বাধা পেয়ে গর্জে ওঠে বক্তা: আলবাত সত্য। কি নিবারণ, বল না, আমার কথার প্রত্যেকটি অমোঘ সত্য কি না? নিবারণ কি বলে শোনা যায় না, কারণ ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে মুহূর্তে—ঘণ্টা পড়েছে পিরিয়ড আরম্ভের।

বক্তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় প্রতিবাদী এক কোণে। গিয়ে বলে, সত্যিই বলছি, সত্যি নয়।

কি সত্যি নয়?—বক্তা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

এই যা বলছিলে এতক্ষণ কটকের ছাত্র সম্বন্ধে।—জানায় মৃদুকণ্ঠে আপত্তিকার।

তুমি কি করে জানলে যে সত্যি নয়?—এবারে বক্তার কণ্ঠস্বরেও জানবার আগ্রহ।

একটুখানি নিস্তব্ধতা। লজ্জার অরুণাভা ছড়িয়ে পড়ে এবারে অন্যপক্ষের তরুণ মুখে। সাংঘাতিক অপরাধ করে ফেলার পর দোষ স্বীকারের সময় যেমন গলা হয় কনফেসারের তেমনই অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর আসে: আমিই সেই কটকের ছাত্র—আমার নাম সুভাষ।

সেদিনকার প্রেসিডেন্সী কলেজ মানে বাংলাদেশের সেরা ছাত্রদের ভিড়। দুটি দলে বিভক্ত এই ছাত্ররা। একদল যারা রুপোর চামচে মুখে করে জন্মেছে—আলালের ঘরের দুলাল, তারা বসত যেখানে তার নাম ছিল 'বাবুস বেঞ্চ'। আর একদল ছিল যারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, কিন্তু মেধাবী ছাত্র। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিল প্রেসিডেন্সী কলেজের সুদীর্ঘ ইতিহাসেও ইতিপূর্বে অনুপস্থিত সম্পূর্ণ নতুন একটা দল। কেবল বিলাসী অথবা বইয়ের পোকা নয় এই নতুন দল। জানার চেয়ে অজানা, চেনার চেয়ে অচেনা, নিশ্চিন্ততার বাঁধানো পথের চেয়ে অনিশ্চয়তা আর বিপদের বিপথ আকর্ষণ করে অনেক বেশী এই নতুন দলের নেতাকে। 'আর্য' পত্রিকার সম্পাদক তখন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর পাবকবাণীর একটি স্ফুলিঙ্গ আগুন ধরিয়ে দেয় দলপতির সমস্ত চিন্তায়, কর্মে, স্বপ্নে: "Work that India might prosper, suffer that she might rejoice!"

আগুনের সেই স্পর্শমণি, এই নতুন দলের নেতার নিভৃত চিন্তার নির্জন থেকে ছড়িয়ে যায় সবখানে—সকলের মনে।

প্রেসিডেন্সী কলেজে সেদিন কেবল যে পরবর্তী জীবনে স্বনামধন্য ছাত্ররাই পড়তে আসতেন তা নয়, দেশবিশ্রুত ব্যক্তিরা আসতেন পড়াতে। যোগ্য ছাত্রের সঙ্গে সুযোগ্য অধ্যাপকের মিলন সোনায় সোহাগা যোগ করছিল সেদিন এখানে—ভারতবর্ষের বহু ইতিহাসস্রষ্টা পুরুষের প্রতিভার প্রথম পরিচয়ে প্রদীপ্ত এই প্রেসিডেন্সী কলেজেই। এই কলেজে সেদিন ইংরেজী পড়াতেন যিনি তাঁর নাম ছিল মিস্টার ওটেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে অশোভন মন্তব্যের কারণে ইনি অনায়াসে 'মাদার ইণ্ডিয়া' নামে 'কালো'-বইয়ের রচয়িত্রী

মিস মেয়োর সার্থক পূর্বসূরী হিসাবে মিস্টার মেয়ো বলে পরিচিত হবার দাবি রাখেন। সুভাষের আমলেও অপরিবর্তিত অধ্যাপক ওটেন জানতেই পারেন নি প্রেসিডেন্সী কলেজের অচলায়তনেও প্রস্তুত রয়েছে প্রতিবাদের বারুদ—যার মুখে একদিন তাঁরই একটি ব্যবহার আগুন ধরিয়ে দিল। সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে পবিত্র হল, শুচি হল যে তার প্রতিভায় এই আগুন প্রতিভাত হল জীবনের প্রথম পরীক্ষারূপে। এবং সেই অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাস সৃষ্টিকারী নতুন দলের নেতা—অনাগতকালের অধিনায়ক, নেতাজী সুভাষ।

ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ওটেনের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বারুদ স্তূপীকৃত হচ্ছিল দিনে দিনে।

এরই মধ্যে একদিন ওটেনের ক্লাসের সামনে দিয়ে হৈহৈ করতে করতে যাচ্ছিল একদল ছাত্র। ওটেন ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে অশ্রাব্য ভাষায় তাদের প্রথমে গালাগাল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। বারুদের স্তূপে আগুন ধরে যায় মুহূর্তে। প্রহৃত হন ওটেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের চার দেয়ালের মধ্যে সাদা চামড়ার গায়ে কালো আদমীর হাত ওঠে এই প্রথম। কলকাতার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে যায় সে খবর আগুনের মত খবরের কাগজের মুখ থেকে। এই দুর্ঘটনার সময়ে সুভাষ সেখানে ছিলেন—এই হল তাঁর অপরাধ। অধ্যক্ষ জেমস বললেন: "I want to see the blood of the culprits!"

সুভাষকে জেরা করা হল সবচেয়ে বেশী।

তুমি মেরেছ?

না।

তুমি ছিলে সেখানে?

ছিলাম।

তা হলেও বলবে না?

না।

সুভাষের সেই এক কথা। ছাত্ররা মেরেছে ঠিক, কিন্তু মেরেছে 'under great provocation'। এই এক কথাকে আঁকড়ে ধরে—এক কথায় সে বেরিয়ে গেল কলেজ থেকে। তাকে দিয়ে কেবল একবার একটি কথা বলাবার চেষ্টা হয়েছিল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে; 'যার অন্যায় হয়েছে'—বাস্! এতেই মাফ হত সব অপরাধ। সেই একটি কথা সুভাষের কাছ থেকে একবারের জন্যেও বার করা গেল না। ফলে বেরিয়ে যেতে হল সুভাষকেই। প্রেসিডেন্সী কলেজের দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হবার মুহূর্তে যে যায়, সবাই তাকিয়ে দেখে সে ছাত্র নয়—একমুঠো আগুন। সাহেবরাও তাকিয়ে দেখে। কটকের শ্রেষ্ঠ উকীল জানকীনাথ বসুর পুত্র, প্রেসিডেন্সী কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্যতম, বেরিয়ে যাচ্ছে মাথা উঁচু করে। সেই উঁচু মাথা—যার সামনে একদিন ইতিহাস এসে দাঁড়াবে মাথা নীচু করে। সাহেবরা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে—দুখানা পা হেঁটে যাচ্ছে না, নিষ্ক্রান্ত হবার চেষ্টা করছে—একখানা খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার!

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ওই একবারই কি বেরিয়ে যাওয়া তোমার? না। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে একবার, কংগ্রেস সভাপতির আসন থেকে আর একবার, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির কাছ থেকে শেষবার। আদর্শের সঙ্গে কর্মের যখনই সংঘাত হয়েছে তখনই পদত্যাগ করেছ। দেশে থেকে দেশের মুক্তি অসম্ভব বুঝেছ যে মুহূর্তে সেই মুহূর্তে করেছ দেশত্যাগ। পদত্যাগ করেছ, বিপদ ত্যাগ করো নি কখনও! দেশত্যাগ করেছ, দেশকে পরিত্যাগ করো নি কখনও স্বপ্নে অথবা জাগরণে।

তাই তোমার আসন আজও শূন্য!

তিন

১৯১৯। একজন সাহেব প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বার করে দিল সুভাষচন্দ্রকে। বিদ্রোহীর প্রতি এই বিতাড়নের আদেশ বিক্ষোভের বস্তু—বিস্ময়ের নয়। কিন্তু স্কটিশচার্চ কলেজে যিনি ডেকে নিলেন এই চিরবিদ্রোহীকে, তিনিও আবার আর এক সাহেব—বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে

এই। সেখান থেকে ১৯১৯-এ দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স-প্রাপ্ত সুভাষ যাত্রা করলেন সাতসমুদ্র তেরো নদীর ওপারে। জন্মশত্রু সিংহের গুহায় তরুণ শার্দুল। British Lion-এর সঙ্গে Springing Tiger-এর প্রথম সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ হল ব্রিটিশসিংহের ডেনে—ইংলণ্ডে। সিংহের গুহায় সিংহকে পর্যুদস্ত করবার উন্মাদনায় বাবার কথাতে রাজী হলেন, সতীর্থদের বিস্ময় সঞ্চার করে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে। 'আই', 'সি' এবং 'এস'—তিনটি অক্ষরের দিকে সেদিন তাকিয়ে থাকত তেত্রিশ কোটি মানুষ। কথামালার শৃগালের মত তাদের লোভী দৃষ্টির নাগালের বাইরের দ্রাক্ষাফলকে অতিশয় টক মনে করে চলে আসার পাত্র ছিলেন না সুভাষ। দ্রাক্ষাফল উপড়ে এনে তাকে ভোগ না করে ফেলে যাবার জন্যে এলেন ইংলণ্ডে।

ইংলণ্ডে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া একমাত্র তাঁরই যোগ্য। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়ার জন্ম প্রেসিডেন্সী কলেজের দুর্ঘটনায়। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ায় যার প্রকাশ সেটির জন্ম রাগ থেকে নয়—অনুরাগ থেকে। শত্রুর মধ্যেও গুণের পরিচয় পেলে মহৎ চরিত্রে যে অনুরাগের সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী হয়, সেই অনুভূতির প্রকাশ দেখি তাঁর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ায়। এও তাঁরই যোগ্য: 'এখানকার লোকেদের সময়জ্ঞান খুব প্রখর। এদের অনেক দোষ আছে, কিন্তু গুণও এত আছে যে তার কাছে মাথা নীচু করতেই হয়।' ইংরেজ চরিত্রের সেই গুণ ভূষিত করেছিল একদিন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী চরিত্র বিদ্যাসাগরকে।

এই গুণের সঙ্গে সুভাষের চরিত্রে যা যুক্ত হয়ে তাঁকে সকলের মধ্যে সকলের চেয়ে আলাদা করে তুলেছিল, লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রমহলে তা তাঁর নারী মদ এবং তরল আমোদের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য। তুলনাবিহীন সর্বপ্রকার সংযমের কারণে উচ্ছৃঙ্খলতম ভারতীয় ছাত্রও যমের মত ভয় করত সুভাষকে। কিন্তু সেই মুখে যেমন স্বজাতির সামান্যতম পতনে ভয়ঙ্কর রাগের ছবি, তেমনি আবার ত্রুটি স্বীকার করামাত্র অভয়ঙ্কর অনুরাগের অকৃত্রিম হাসি একই সঙ্গে মেঘ ও রৌদ্রের মত খেলা করে। রাগকে অনুরাগ দিয়ে, অশ্রুকে হাসি দিয়ে, মৃত্যুকে জীবন দিয়ে পরাস্ত করাই ছিল সুভাষচন্দ্রের সারাজীবনের একমাত্র স্পোর্টস; তাঁর চেয়ে বড় স্পোর্টসম্যান রাজনীতির ক্রীড়াঙ্গনে দেখা গেছে কিনা সন্দেহ।

লণ্ডনে আট মাস মাত্র পড়ে ১৯২০ সনে সুভাষ আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; তাঁর স্থান হয় চতুর্থ।

১৯১৩ সনে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। লণ্ডনে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর পৌছলে হাউস অব কমন্সে ডায়ার নিন্দিত হলেও ব্রিটিশ-জনমত-অভিনন্দিত হল সেই ঘাতকই। রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করলেন 'নাইট' উপাধি। গান্ধী ভারতীয়দের আহ্বান করলেন সর্বপ্রকার সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিতে।

সুভাষের বয়স যখন তেইশ, আই. সি. এস.—ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, তখনও পর্যন্ত ভারতীয় চাকরির স্বর্গে পৌছবার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দেবার অধিকার অর্জন করবার মুহূর্তেই নিরাপদ বন্দরের কাল হল শেষ। অকূল অজানা সমুদ্রের ডাক এলো স্বাধীনতা-হীনতার সন্ধিক্ষণে। হীনতার সঙ্গে সন্ধি করতে রাজী হলেন না সুভাষ; স্বাধীনতার সঙ্গে হল স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিকের রাখীবন্ধন।

১৯২১ সনে সুভাষ ইস্তফা দিলেন। আণ্ডার-সেক্রেটারীকে বললেন: 'একই সঙ্গে ব্রিটিশরাজের এবং ভারতের সেবা আমার দ্বারা অসম্ভব।' বন্ধুকে দেশে চিঠি দিলেন: 'শুনে দুঃখিত হবে, আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করেছি……'।

দাসত্বের স্বর্গ থেকে বিদায়মুহূর্তে মনে পড়ে সুভাষের দীনহীনা অশ্রুআঁখি জননী জন্মভূমির মলিন মুখ। বুক

চিরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস, চোখ ফেটে উদ্গত অশ্রু। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ আবৃত্তি করে :

'হে জননী পুত্রহারা,
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হতে ঝরি পড়ি তব মাতৃস্তন
করেছিল অভিষিক্ত—আজি এতক্ষণ
সে অশ্রু শুকায়ে গেছে। তবু জানি মনে
যখনি ফিরিব পুনঃ তব নিকেতনে
তখনি দুখানি বাহু ধরিবে আমায়,
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ,.....'

দেশে ফিরে পিতা জানকীনাথকে জানালেন : কেবলমাত্র পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য অবলম্বন করেই আমরা যদি নিজের আদর্শ গড়ে তুলতে যাই, তবে কি সে আদর্শ এক অদ্ভুত বিসদৃশ ব্যাপার হবে না? কলকাতা থেকে বোম্বাই গেলেন গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সুভাষ গান্ধী-পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন আর গান্ধী তার জবাব দেন। সন্তুষ্ট হন না সুভাষ। ফিরে আসেন কলকাতায়। দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় সুভাষচন্দ্রের। একজন বিপুল বিত্তবান, পসার ত্যাগ করে নেমেছেন আন্দোলনে; আর একজন স্বর্গের দাসত্ব ত্যাগ করে নামতে চাইছেন দেশের দুঃখ দূর করতে। দেখা হয় আগুনের সঙ্গে বারুদের, বারিধারার সঙ্গে তৃষিত চাতকের, পথপ্রদর্শকের সঙ্গে পথিকের। দেখা হয় গুরুর সঙ্গে শিষ্যের। সিমলেপাড়ায় যেমন একদিন দেখা হয়েছিল রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দের। বিবেকানন্দকে দেখেই চিনেছিলেন রামকৃষ্ণ। সুভাষকে দেখেই চিনলেন দেশবন্ধু। এরই জন্যে অপেক্ষা করে ছিলেন তিনি। রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন বিবেকানন্দ : আমাকে ঈশ্বরদর্শন করাতে পারেন আপনি? দেশবন্ধুকে প্রশ্ন করেন সুভাষ : আমাকে স্বাধীনতার পথ দেখাতে পারেন আপনি? রামকৃষ্ণর মধ্যেই বিবেকানন্দ সেদিন দেখতে পেয়েছিলেন রাম এবং কৃষ্ণকে একাধারে। দেশবন্ধুর মধ্যে সুভাষচন্দ্র দেখতে পেলেন নিজের দেশকে।

দেশবন্ধুকে প্রণাম করলেন সুভাষ। দেশবন্ধু—প্রাণহীন মৃত্যুর দেশে যিনি এনেছিলেন সঙ্গে করে মৃত্যুহীন প্রাণ—সেই দেশবন্ধুকে প্রণাম করলেন সুভাষ। বিবেকানন্দকে সর্বস্ব দিয়ে ফকির হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। সুভাষকে দেশবন্ধুর প্রাণহীন মৃতদেহ যাবার আগে দিয়ে গেছে মৃত্যুহীন প্রাণ! সেই সুভাষকে আশীর্বাদ করলেন দেশবন্ধু—জরার দেশে যিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন চিরযৌবন—সেই সুভাষকে আশীর্বাদ করলেন দেশবন্ধু।

গঙ্গার সঙ্গে যমুনার, জীবনের সঙ্গে যৌবনের মিলন হল। স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং সুভাষচন্দ্রের জীবন-সংগ্রামের ইতিহাসচিহ্নিত সেই বৎসর হচ্ছে ১৯২১।

চার

সুভাষচন্দ্রের কালোত্তীর্ণ জীবন-মহাকাব্যে পরবর্তী স্মরণীয় তারিখ হচ্ছে—১৯৩৯। তারিখটা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসেও অবিস্মরণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই বৎসর ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অদ্বিতীয় যোদ্ধা সুভাষচন্দ্রের পক্ষেও, তাঁর আদর্শের সঙ্গে কংগ্রেস-হাইকম্যাণ্ডের আদর্শের, মনের সঙ্গে মতের, বিবেকের সঙ্গে কৌশলের জীবনের মূল নীতির সঙ্গে রাজনীতির সংঘাতে আর এক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নিঃসংশয়ে। প্রথমবারের যুদ্ধে ত্যাগ করেছিলেন ব্রিটিশরাজের দাসত্ব, দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে অস্বীকার করলেন কংগ্রেস-প্রভুত্বকে। প্রথমবার আই. সি. এস. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন স্বর্গের সিঁড়ি, দ্বিতীয়বার কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচিত হবার পর তবেই স্বেচ্ছায় রেহাই দেন কংগ্রেসপতিকে সুভাষচন্দ্র জীবনে দেশ এবং দেশবন্ধু ছাড়া আর কারুর কাছে তাঁ

কোনও ঋণ নেই। প্রথমজনকে প্রণতি এবং দ্বিতীয়জনের কাছে নতিস্বীকার ছিল সুভাষচন্দ্রের নিত্যকর্ম।

১৯২১ সনে তিনি কংগ্রেস-রাজনীতিতে যোগদান করেন; ১৯৩৯ সনে তিনি কংগ্রেস-রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসেন। যিনি একদিন প্রবেশ করেছিলেন এখানে আর যিনি একদিন বেরিয়ে গেলেন এখান থেকে—সেই দুজন এক হয়েও 'এক' ব্যক্তি নন। যিনি ঢুকেছিলেন তিনি ছিলেন কংগ্রেসী বিচারে 'বিদ্রোহী সৈনিক', যিনি বেরিয়ে গেলেন তিনি ইতিহাসের পাতায়—আক্রমণোদ্যত জীবন্ত শার্দুল। ইংরেজকে 'কুইট ইণ্ডিয়া' বলবার আগে কংগ্রেস তার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবককে বলেছিল: কুইট কংগ্রেস। ইংরেজ বিয়াল্লিশের আন্দোলনে 'কুইট ইণ্ডিয়া' করে নি। সুভাষ কেবল কংগ্রেস নয়, ইণ্ডিয়া কুইট করলেন। তিনি সেই ইতিহাসনির্দিষ্ট নায়ক যিনি নির্দেশ পেয়েছিলেন নিজের অন্তর থেকে—তিনি ইণ্ডিয়া কুইট না করলে একজন ইংরেজকেও 'কুইট ইণ্ডিয়া' করানো যাবে না। কংগ্রেসের অফিসিয়াল ঐতিহাসিকের মতে দেশের স্বাধীনতা আনার একমাত্র কৃতিত্ব কংগ্রেসের। ভাবী কালের ইতিহাস নিজের হাতে মুছে দেবে এই অসত্যের চেয়েও মিথ্যা অর্ধসত্য; অন্ধকূপহত্যার মিথ্যা মুছে দিয়েছে যে ইতিহাস তার কণ্ঠ সেদিন শ্রুত হবে আবার: পলাশীর প্রান্তরে গঙ্গায় যে স্বাধীনতার সলিলসমাধি ঘটেছিল, তাকে আবার তুলে আনবার জন্যে শেষ আঘাত হেনেছিলেন সুভাষচন্দ্র মণিপুরের প্রান্তে। এই স্বাধীনতার নবসূর্যোদয় সম্ভব হয় নি একা কংগ্রেসের কৃতিত্বে; এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগ ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লের, অরবিন্দ-রবীন্দ্রের; এবং দেশবন্ধু আর তাঁর দেশকে স্বাধীন করবার স্বপ্নে আকুল দেশত্যাগী সুভাষচন্দ্রেরও।

১৯৩৯ সনে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসবার মুহূর্তে ভারতীয় রাজনীতিবিদেরা সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন সুভাষের রাজনৈতিক মৃত্যু। ধূম উদ্‌গীর্ণ না হলেই যাঁরা মনে করেন নির্বাপিত হয়েছে অগ্নি তাঁরাই কেবল সুভাষকে মনে করেছেন চিরকাল ট্যাক্টলেস ইমোশনের স্তূপ—কংগ্রেসের অগ্রগমনের পথে বাধাস্বরূপ অচলগিরি মাত্র। এই বিশেষ অজ্ঞ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের উত্তর দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র ৩০শে এপ্রিল ১৯৪৪ সনে; সুভাষচন্দ্রের সৈন্যবাহিনী ভারতের মাটিতে তখন পা দিয়েছে। সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে সেদিন ভারতের পূর্ব-সীমান্তে অপূর্ব উদ্দীপনায়: ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লেশ, পথশ্রম আর মৃত্যু—আজ এ ছাড়া তোমাদের আর আমার কিছুই দেবার নেই, তবে যদি জীবনে ও মরণে আমাকে তোমরা অনুসরণ কর,...আমি তোমাদের স্বাধীনতা ও জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেব।

অচলগিরি নয়—এ পাবকবাণী উচ্চারিত এক জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মুখে।

এ বাণী সান্ত্বনার নয়, স্বাধীন ভারতে পদার্পণ না করা পর্যন্ত শান্ত না হবার 'কঠোর সন্তোষ'-এর প্রতিশ্রুতি। স্বরাজ এনে দেবার মিথ্যা স্তোকবাক্য নয়। ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের মাটিতে; একজন ভারতীয় হয়েছিলেন সর্বোচ্চ অধিনায়ক, এই স্বাধীন সরকার ঘোষণা করেছে মন্ত্রিসভার নাম, ডাকটিকিট ছাপা হয়েছে, নিজেদের ব্যাঙ্কনোট ছাপা চলছে তখন।

এক ঘণ্টার জন্যে হলেও, একমুহূর্তের জন্যে হলেও ভারতের আকাশে উড্ডীন হয়েছিল স্বাধীন ভারতের জয়পতাকা!

আজাদহিন্দ সরকার স্থায়ী হয় নি এই কারণে যারা বলে সুভাষচন্দ্রের হার হয়েছে তারা জানে না যে কালের কষ্টিপাথরে এই অমূল্য 'হার'-এর তুলনায় হীরামাণিক্য-খচিত জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নহার-এর মূল্যও যৎসামান্য।

ইংরেজ ভারতের মাটি পরিত্যাগ করেছে চরকাকাটা, কচুরীপানা তোলা, অসহযোগ, অথবা আমরণ উপবাসের ভয় দেখানোয় বিড়ম্বিত অথবা উদ্বিগ্ন বোধ করে নয়। ইংরেজ ভারত ত্যাগ করেছে সেইদিন যেদিন সে বুঝেছে

বিশ্বপরিস্থিতিই তাদের ভারতবর্ষ আঁকড়ে থাকার প্রতিকূলে; আর বুঝেছে তার আগে, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যখন সঞ্চারিত করেছেন সুভাষ স্বাধীনতার স্বপ্ন, যখন হিন্দু-মুসলমানকে গ্রথিত করেছে আজাদহিন্দ ফৌজ একজাতি একপ্রাণ একতার সূত্রে। সেইদিনই জেগেছে নবভারতের জনতা। সেই জাগ্রত জনতার সঙ্গে আর চলবে না 'ডিভাইড অ্যাণ্ড মিসরুলে'র চালাকি, বুঝতে পেরেই চলে গেছে চতুর বণিক। যাবার আগে সুভাষের অনুপস্থিতির সুযোগে ভাগ করে দিয়ে গেছে ভারতকে যাতে কোনদিন আর জোড়া না লাগে এমন নিপুণভাবে। যাবার আগে শেষ অস্ত্রে ঘোষণা করেছে অখণ্ড ভারতের কাল হল শেষ।

অর্ধশতাব্দীর সংগ্রামে যারা দিল সব তারা প্রায় পেল না কিছুই। বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হল তাদের, যাদের সমিধে স্বাধীনতার যজ্ঞ উদ্‌যাপিত—সমাধি হয়ে গেল তাদের স্বাধীন ভারতেই। এর চেয়ে বড় ভাগ্যের পরিহাসের কথা ইতিহাসে আজও অলিখিত। অর্ধশতাব্দীকাল কংগ্রেসের এই সংগ্রামে অগণিত হিন্দু মুসলমানের কারাদণ্ড, ফাঁসী, দ্বীপান্তর, অন্তরীণ কেন? কারণ, মিলিত হিন্দু মুসলমানের স্বাধীন ভারতবর্ষ আনবে কংগ্রেস। সেই সংগ্রামের ঐতিহ্য-বিস্মৃত, জাতির জনকের উপদেশ-বিস্মৃত, আত্মবিস্মৃত কংগ্রেস গদির লোভে মেনে নিল সর্বনাশা দেশভাগ—বর্তমানের সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে ভবিষ্যৎ কতকাল ধরে কে জানে!

কংগ্রেস বিস্মৃত হোক, আমরা বিস্মৃত হতে পারি না সেই কাজীর বিচারের কাহিনী। দুই স্ত্রীলোকের একটি সন্তানকে নিজের বলে দাবি করার সেই অবিস্মরণীয় কাহিনী। কাজী কেটে ভাগ করে নিতে বলেন আধাআধি। যার সন্তান তার মাতৃহৃদয় হাহাকার করে ওঠে, অন্যজন মেনে নেয় ভাগ। কাজীর বুদ্ধির কষ্টিপাথরে কষা হয়ে যায় সন্তান কার। দ্বিধাবিভক্ত এই ভারতবর্ষে এই কাহিনী ভাবায় আমাদের। ভাবি, সেই মাতৃহৃদয়বঞ্চিত আর এক স্ত্রীলোক, পরের সন্তানকে কেটে ফেলায় আপত্তি না করায় যে ধরা পড়ে যায় কাজীর বিচারে; ভাবি তার চেয়েও কি হৃদয়হীন তাঁরা, বর্তমানে যাঁরা ভারতভাগ্যবিধাতা—ভারতের গদিতে আসীন যাঁরা আজ গদা হাতে!

সুভাষচন্দ্রের আজাদহিন্দ ফৌজ ভারতের এই কলঙ্ক দূর করবার কীর্তিতে ইতিহাসের স্রষ্টা।

মণিপুরের প্রান্তে পৌঁছেও আজাদহিন্দ ফৌজ শেষ পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে গেছে এটুকুই মাত্র যারা মনে রাখবে তারাই চিরকাল নিজেদের স্বার্থে ইতিহাসকে বিকৃত করে। আজাদহিন্দ ফৌজের অস্থায়ী সরকার, তার ডাকটিকিট, স্বাধীন ভারতে তার পতাকা উত্তোলন—এই সবকিছুর চেয়েই বড় বলে বিবেচিত হবে যে কাজ তা ওই হিন্দু-মুসলমানের মিলন। ইংরেজ বিতাড়নের প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ এই ফৌজের পতাকাতলে সুভাষচন্দ্র ১৮৫৭-র পর আর একবার তাঁর আদর্শ, ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বের সম্মোহনী শক্তিতে ব্যর্থ করতে পেরেছিলেন ইংরেজ শাসনের সাফল্যের অব্যর্থ কারণ 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতি। এবং যে মুহূর্তে ইংরেজ বুঝেছিল সেনাদের মধ্যেও ছড়িয়ে গেছে সুভাষের মিলিত হিন্দু-মুসলমানের হিন্দুস্থানের স্বপ্ন এবং সাধনা; তাদের সমবেত কণ্ঠে যখন বজ্রনিনাদে ঘোষিত হয়েছে হিন্দুস্থানের জয় হোক, জয় হিন্দ—তখনই তারা মনে মনে প্রস্তুত হয়েছে, আজ অথবা কাল এদেশ ত্যাগ করে যেতে হবে তাদের। কুইট ইণ্ডিয়া করেছে তারা কংগ্রেসের আওয়াজে নয়। আজাদহিন্দ ফৌজ হেরে যাবার আগেই হারিয়ে দিয়ে গেছে তাদের ওই এক অস্ত্রে; হিন্দু মুসলমানের মিলিত-কণ্ঠে যেই উঠেছে সেই গান: কদম কদম বাড়ায়ে যা—সেই কদম কদম পিছু হটতে আরম্ভ করেছে ব্রিটিশসিংহ।

যাবার আগে ভাগ করে দিয়ে গেছে ভারতকে। আজাদহিন্দ ফৌজ ভাগ্যবিড়ম্বিত না হলে, অনুপস্থিত না থাকলে সুভাষচন্দ্র, জাতির জনকের সতর্কবাণী বিস্মৃত না হলে হিন্দুস্থানে এবং পাকিস্থানে ভেদবুদ্ধির চারা পুঁতে

যেতে পারত না ধুরন্ধর ব্রিটিশ রাজনীতি। এই চারা আজ আর চারা নেই—চারিয়ে গেছে দেশব্যাপী নানা আত্মঘাতী রক্তাক্ত কলহের মধ্যে। এবং বিষবৃক্ষরূপে তার দেখা দেওয়ার দিন দূরে নয় আর। সে দুর্দিনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে এখনই। সুভাষচন্দ্র উপস্থিত থাকলে সর্বশক্তিতে বাধা দিতেন কংগ্রেসের এই নির্বোধ আচরণকে। রাজনীতিবিদেরা তাঁকে আবার হঠকারিতার অভিযোগে নিন্দিত করতেন। সুভাষ আবার প্রমাণ দিতেন যে তিনিই ঠিক, তাঁরাই বেঠিক। আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠনের আগে যিনি মাথাগরম এবং ভাবপ্রবণ বলে নিন্দিত এবং আজাদহিন্দ গঠনের পর যিনি তাঁর কঠোরতম সমালোচকের দৃষ্টিতেও সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠক বলে অভিনন্দিত সেই সুভাষ আর একবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতেন আমাদের চোখের ওপর। প্রমাণ হয়ে গেছে সুভাষের অনুপস্থিতিতেই আজ যে ভারত ভাগ মেনে নিয়ে এমন ভুল করেছে কংগ্রেস, এমন জট পাকিয়েছে যে দিন থেকে দিনে সে জট খোলার পরিবর্তে আরও জটিল থেকে জটিলতর হবার পথে। সুভাষের উপস্থিতিতে এই জট পড়তেই পারত না ঐক্যের গ্রন্থিতে।

রাজনীতিজ্ঞরা বোঝেন নি। রাজনীতির ঊর্ধ্বে অসীমকালে পরিব্যাপ্ত যাঁর দৃষ্টি—বুঝেছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ। সুভাষচন্দ্রকে অভিষিক্ত করেছিলেন অনাগত কালের নায়কত্বে:

"বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে বাণীদূত পাঠিয়েছিলাম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে ও মনে তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্যরূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণশক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার পুরস্কার বহন করে।"

অরুণালোকে উদ্ভাসিত আকাশ থেকে এসে পড়ে অস্তোন্মুখ সূর্যের শেষ আশীর্বাদ; স্পর্শ করে তরুণ ভারতের হৃদয়ের অধীশ্বর সুভাষচন্দ্রের মুকুটহীন মাথা। সেই মাথা—যা কারুর কাছে নত হয় নি আজও—তার উদ্দেশে প্রণাম জানায় আজ সমগ্র দেশ অবনত মস্তকে।

পাঁচ

১৯২১ সনে গান্ধীর সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতেই সুভাষ বুঝেছিলেন গান্ধীর নীতি মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধার বিষয়, কিন্তু গান্ধীর রাজনীতি স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকের আদর্শ নয়। গান্ধীর সম্পর্কে দেশবন্ধুর এই উক্তি: "গান্ধী আন্দোলন আরম্ভ করেন চমৎকার, নির্ভুল কৌশলে গড়ে তোলেন তা; ক্রমাগত সাফল্যে আন্দোলনের চরম শিখরে ওঠেন—কিন্তু তার পরেই তাঁর স্নায়ু বিকল হয় আর তিনি থতমত খেতে থাকেন।" [···"but after that he loses his nerve and begins to falter."] এটি সুভাষচন্দ্রেরও মনের কথা। গান্ধীর কাছ থেকে অপ্রসন্ন মনে ফিরে তিনি যান দেশবন্ধুর কাছে। এবং মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারেন এঁর কাছেই রাজনীতির দীক্ষা নিতে তিনি নিয়তি-নির্দিষ্ট। দেশবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক গুরু মাত্র নন, দেশবন্ধুর অস্তিত্বের একটা অংশ হয়ে ওঠেন তিনি। এই দেশবন্ধুর মৃত্যুর ফলেই হিন্দু-মুসলমানে মিলন হয় নি। আজ সুভাষের অনুপস্থিতিতেই যেমন সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়েছে ভারতবর্ষে।

১৯২১-এ কংগ্রেসে ঢোকেন সুভাষ, ১৯৩৯-এ বেরিয়ে আসেন। এর মধ্যে ১৯২৪ সনে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে

স্বরাজ্যদল কর্পোরেশন নির্বাচনে মেজরিটি পায়। সুভাষচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদে নিযুক্ত হন; তখন তাঁর বয়স সাতাশ। এই পদে সুভাষচন্দ্র প্রমাণ করে দেন ইস্পাত দিয়ে গঠিত তিনি। লোকের বদলে চাদর-বাঁধা চেয়ারে চেয়ারে হাহাকার পড়ে গেল। সকলের আগে আসেন সুভাষ; সকলের পরে যান। প্রত্যেকটি লোকের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি লিপিবদ্ধ করার খাতা নিজে পরীক্ষা করেন। প্রত্যেকটি ফাইল পড়ে তবে স্বাক্ষর দেন, প্রত্যেকটি অর্ডারের তলায় সই দেন নিজের হাতে। ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়, কর্পোরেশনের কাজ বন্ধ হয় না তখনও। সুখের পায়রাদের দিন শেষ হয়, পাকা ঘুঘুদের শুরু হয় অশেষ দুর্দিন।

কর্পোরেশনের ইতিহাসে সেই প্রথম এবং সেই শেষবার প্রমাণ করে দেন সুভাষ: Where there is a will there is a way—ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। কলিকাতা পৌরসভার ইতিহাসে সেই প্রথম বিনাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটি পৃথক শিক্ষাবিভাগের জন্ম হল। যোগ্য লোক বাছাই করে এডুকেশান অফিসারের চেয়ারে বসালেন। স্বাস্থ্য অ্যাসোসিয়েশনে সাহায্যদান, একাধিক ডিসপেন্সারির উদ্বোধন, শিশু ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা—কলিকাতা কর্পোরেশনকে সেই সর্বপ্রথম কলিকাতার নাগরিকদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান করে তুলল।

কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন জনৈক কোটস। শ্বেতাঙ্গরা সেদিন পদে পদে বুঝিয়ে দিত এদেশীয়দের যে তারা প্রভু; কারণ তারা সাহেব। এদেশীয়রাও তাদের বুঝতে দিতেন প্রতিমুহূর্তে যে বড় পদ অধিকার করলেও ভারতীয়রা তাদের দাস; কারণ তারা মোসাহেব। সেই আমলে কোটস এলেন সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে। হাতে জলন্ত চুরুট। এসেই টেবিলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন। সুভাষ তাকালেন একবার জলন্ত চুরুটের দিকে; জলন্ত চুরুটের চেয়েও অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন একপলক। চুরুটের আগুন নিভে গেল তদ্দণ্ডেই। আর একবার তাকালেন টেবিলের ওপর বসা কোটসের দিকে; কোটস উঠে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে।

বিদ্যাসাগর সাহেবের টেবিলের ওপর জুতোসুদ্ধ পা তুলে দেবার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন নি; নিজের পায়ের চটি—বিদ্যাসাগরী চটি বলে বাংলার অন্যতম ঐতিহ্য হয়ে উঠেছিল যা সেদিনই—তা তুলে দিয়েছিলেন সাহেবের নাকের ওপর। স্যার আশুতোষ রেলগাড়ির কামরা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন সাহেবের কোট; সাহেবের রোষকষায়িত দৃষ্টির উত্তরে হেসেছিলেন। সাহেব, স্যার আশুতোষের জুতো তার আগেই ফেলে দেওয়ায়, সাহেবকে বলেছিলেন বাংলার বাঘ যে সাহেবের কোট বোধ হয় আশুতোষের জুতোজোড়াকে ফিরিয়ে আনতে গেলে। চুপ করে গিয়েছিল সাহেব; বুঝেছিল, এ কথা যাঁর, তিনিও বাংলার বটে, তবে তিনি শুধু 'বেঙ্গল' নন—'রয়াল বেঙ্গল'!

কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার থেকে শুরু করে শ্বেতাঙ্গরা এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে সারা কর্পোরেশন জানল যে, চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের চেয়ারে যিনি এসে বসেছেন তাঁর কাছে ভোটের শিকে ছেঁড়া রাজনৈতিক ফলার নয় এই সৌভাগ্য; এই পদ পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা নয়। মনে পড়ল তাদের এর আগে—অনেক আগেই, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস—ভারতীয়দের স্বর্গের সিঁড়িতে ওঠবার যোগ্যতা অর্জন করে সুভাষ স্বেচ্ছায় বর্জন করে এসেছেন সেই চাকরি। কলিকাতা কর্পোরেশনে সেদিন তিনি এসেছেন, ভারতীয়রাও শাসনকার্য পরিচালনায় অনুপযুক্ত নয় যে উপযুক্ত সময় এলে তা বোঝা যাবে—এরই প্রমাণ আগে থেকে রেখে যাবার কারণে। স্বদেশীয় ত্রুটি সহ্য করবার পাত্র নন এই লোক যেমন, তেমনই বিদেশীর ভ্রূকুটিও এঁর কাছে সমান অসহ্য।

কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ পদে সেদিন যে ছটফট করছিল সে সাতাশ বছরের যুবক সুভাষ নয়, পিঞ্জরের সোনার

শেকল কেটে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল 'স্প্রিংগিং টাইগার'!

ছয়

কেবল গান্ধীর রাজনীতি সম্পর্কেই নয়, নেহেরু-চরিত্রের দ্বিধার বিষয়েও সুভায নির্দ্বিধায় বলেছেন :... 'এ কথা বললে হয়তো ভুল হবে না যে তাঁর (জহরলালের) মাথা আছে বামপন্থীদের সঙ্গে, কিন্তু হৃদয় বাঁধা আছে মহাত্মা গান্ধীর কাছে।' গান্ধীভক্তদের সম্পর্কেও তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট : 'কংগ্রেসের যত মাথা সব একটি লোকের কাছে বাঁধা' [দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল]। গান্ধীর রাজনীতি আপোসের নীতি ; সুভাষের সংগ্রাম আপোসহীন। সেই ১৯৩২-এর ২রা জানুয়ারি নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসীদের সঙ্গে ধৃত সুভায ওই তারিখের দুদিন আগে এক পত্রে লিখছেন তাঁর বন্ধুকে : 'যদি পূর্ণ-প্রস্ফুটিত পুষ্পের সুবাস চাও তবে কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হও আগে ; প্রসন্ন প্রভাতের সূর্যোদয়ের সাক্ষাৎ পেতে কর রাত্রির তপস্যা ; পরাধীনতার দ্বার ভঙ্গ করে যদি আনতে চাও জ্যোতির্ময়ী স্বাধীনতা, তবে জয়গান কর জীবনের, যৌবনের ; দুঃখের দাপ্তিতে, আত্মত্যাগের তৃপ্তিতে নিঃসঙ্কোচে দাও মুক্তির মূল্য।'

জীবনে কোনও অবস্থার কাছে, কোনও ব্যক্তির কাছে নত হয় নি সুভাষের এই ব্যক্তিত্ব। স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী স্বদেশভূমি। তার পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর যে কোনও প্রার্থনাতেই আত্মা অতৃপ্ত, আশা অপূর্ণ। দেশবন্ধুর দর্পণেই তিনি কেবল প্রতিবিম্বিত হতে দেখেছিলেন পরাধীন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি সেই প্রথম দিনেই। তাই দেশবন্ধুকে দেশের সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে, বন্ধুর পথ এড়াতে হবে বলে যিনি কখনও রাজী হন নি বিবেকের সঙ্গে আপোস করতে, প্রতিজ্ঞা থেকে এক পা-ও সরে আসতে, পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত স্বরাজের দ্বিতীয় আর কোনও অর্থ শেষদিন পর্যন্ত যাঁর কাছে স্বীকৃত হয় নি—সুভাষচন্দ্রের কাছে সেই দেশবন্ধুই ভারতের অদ্বিতীয় নেতা।

এই দেশবন্ধু কেবলমাত্র ভাবের উচ্ছ্বাসে স্বরাজ আসবে মনে করতে পারেন নি। চরকা, কচুরীপানা পরিষ্কার, অথবা অহিংসার ইনার ভয়েসের ভয়ে ব্রিটিশসিংহ ভারত ছেড়ে পালাবে ভাববার মত ভাবপ্রবণ অবিবেচক পুরুষ ছিলেন না চিত্তরঞ্জন দাশ। রাজনীতিতে যোগদান করবার আগে কুবেরের ঈর্ষাযোগ্য অর্থের উৎস বিপুল পসার পরিত্যাগ করে এসেছেন ধুরন্ধর ব্যবহারজীবী সি. আর. দাশ। একদিকে ছিল পূর্ণ স্বরাজ, আর নয় কিছুই না, এই নীতি ; অন্যদিকে, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—চাণক্যের এই রাজনীতির তিনি যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন।

এবং তার প্রমাণ দিয়েছিলেন মুসলমানদের সঙ্গে স্বরাজ্য-প্যাক্টে। ইংরেজের হিন্দু-মুসলমান ভেদনীতির মূলেই কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন তিনি। মুসলমানরা যাতে আলাদা দাবি তোলার কোনও কারণ না পায়, কংগ্রেসের মাধ্যমেই যাতে তাদের দাবি গৃহীত হয় এই উদ্দেশ্যে তিনি সেদিন মুসলমানদের প্রাপ্যের তুলনায় কিছু বেশীই দিতে চেয়েছিলেন। যারা সেদিন আপত্তি করেছিল এতে, আজ তারা অনেকেই স্বাধীন ভারতে বেঁচে নেই। থাকলে দেখে যেতে পারত যে যাঁরা কয়েকটা বেশী চাকরি মুসলমানদের দিতে আপত্তি করেছিলেন, তাঁরাই, 'পরে উহাদিগকে মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ করিয়া বিশ্বের বৃহত্তম ইস্লামিক রাজ্য পাওয়াইয়া দিয়াছেন'।

এই দেশবন্ধুর শিষ্য সুভাষ। যৌবনের দুর্বার গতিবেগ, আর জীবন্ত আবেগের প্রতিমূর্তি সুভাষ। কিন্তু কেবল বেগ অথবা আবেগসর্বস্ব নন। কিছুতেই নন—কোনওদিন নন। তার প্রমাণ, হরিপুরা কংগ্রেসে

সভাপতি সুভাষচন্দ্রের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন। জহরলালকে এই কমিটির চেয়ারম্যান করলেও এর পরিচালনার ভার ন্যস্ত করেন কে. টি. শাহ, মেঘনাদ সাহাদের ওপর। স্বাধীন হলেও ভারতের সংগ্রাম শেষ হবে না সেদিন, শুরু হবে নতুন করে—দেশের আভ্যন্তরীণ শত্রু অন্ধমোহ, কুসংস্কার এবং আত্মসন্তুষ্টির বিরুদ্ধে। এই কথা স্মরণে রেখে ভারত স্বাধীন হবার এক যুগ আগে যিনি এই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা উপস্থিত করেন কংগ্রেস-মণ্ডপে তিনি কি শুধুই স্বপ্নবিলাসী?

গান্ধী যত আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন পরাধীন ভারতে, তার মধ্যে গুজরাটের অন্তর্গত বরদৌলি করবন্ধ আন্দোলন সাফল্যের সবচেয়ে সমীপবর্তী হবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয় গান্ধীরই নির্দেশে। চৌরীচৌরায় কতকগুলি লোক থানা পোড়ায় এবং পুলিসকে হত্যা করে। এই অপরাধে, ১৯২২-এর ৭ই ফেব্রুয়ারি যে আন্দোলন-আরম্ভের চরম পত্র ভাবিয়ে তুলেছিল ব্রিটিশ সরকারকে, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি এই হিংসাত্মক কার্যের অজুহাতে গান্ধী প্রত্যাহার করে নিলেন সেই সম্ভাব্য সবশ্রেষ্ঠ কংগ্রেস আন্দোলন। এই প্রত্যাহারে দেশবন্ধুর প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন সুভাষ এইভাবে: "I could see that he was beside himself with anger and sorrow at the way Mahatma Gandhi was repeatedly bungling."

সুভাষ অনেক বেশী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যতীন দাসের আত্মবলিদান গান্ধীকে বিচলিত না করায়। জেলে রাজবন্দীদের উপযুক্ত মর্যাদারি দাবিতে ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুকদেব এবং যতীন দাস আমরণ অনশন আরম্ভ করেন। ১৯২৯ সন। অন্য তিনজন অনশন প্রত্যাহার করলেন। যতীন দাস জলস্পর্শ করলেন না। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ-কারাগারের কেউ তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে। দিনের পর রাত্রি আসে, রাত্রির পর দিন। কারাগারের অন্ধকারে অর্ধচেতন একটি বন্দী জেগে থাকে তখনও, ঘুমিয়ে পড়লে যদি জোর করে খাইয়ে দেয় কিছু! কারাগারের বাইরে আকাশে আসন পাতা হয় শরতের। নিরুপম নীলে, শিউলি ফুলের সুরভিতে আসে আশ্বিন। মহাপূজার মন্ত্র উচ্চারণের এগিয়ে আসে পুণ্য লগ্ন। শুধু রাত্রির তিমিরে জ্যোতির্ময়ী তপস্যায় জেগে আছে যতীন দাসের মৃত্যুর চেয়ে সত্য এক মহৎ জীবন। ১৩ই সেপ্টেম্বর মহাপূজার বোধন হবার আগেই সমাপ্ত হয় বিজয়া, বিসর্জনের বাজনা বেজে ওঠে আশ্বিনের আকাশে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে মাতৃপূজার মন্দির-প্রাঙ্গণে আত্মবলিদান করেন যতীন দাস; আমরণ অনশনের মহাব্রত উদ্‌যাপিত হয় জীবন-দানের শাশ্বত মহিমার মধ্যে।

গান্ধী সেদিন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় স্বাস্থ্য, খাদ্যের ওপর পাতার পর পাতা অপব্যয় করেছেন; ব্যয় করেন নি কেবল যতীন দাসের আত্মোৎসর্গ বিষয়ে একটি অক্ষর, অথবা একটি আঁচড়ও। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেছেন যে লিখলে অপ্রিয় মন্তব্য করতে হত বলে একটি কথাও লেখেন নি। তরুণ সুভাষ এতদূর বিচলিত হয়েছিলেন গান্ধীর অবিচলিত থাকায় যে আত্মজীবনীতে তার উল্লেখ না করে পারেন নি: "In this connection the attitude of the Mahatma was inexplicable. Evidently the martyrdom of Jatin Das which stirred the heart of the country did not make any impression on him. The pages of 'Young India' had nothing to say about the incident."

দেশবন্ধুর অবর্তমানে সুভাষ ছাড়া গান্ধীর বিরুদ্ধে তখনও কংগ্রেসে শ্রুত হবার মত কণ্ঠস্বর মাত্র একজনেরই ছিল। জহরলাল নেহরুর সেই তখনও পর্যন্ত অবাধ্য কণ্ঠ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হল লাহোর কংগ্রেসে গান্ধীর প্রস্তাব-

মত সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায়। সুভাষের মতে জহরলাল এর পর থেকেই গান্ধীর কথায় উঠতে বসতে আরম্ভ করেন।

ঠিক এই একই অস্ত্রে ধরাশায়ী করতে চেয়েই সুভাষচন্দ্রকে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির পদে আমন্ত্রণ করেন স্বয়ং গান্ধী ১৯৩৮-এ। যে অস্ত্রে জহরলালকে নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়েছিল সে অস্ত্র ব্যর্থ হল সম্পূর্ণ হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির অনমনীয় চরিত্রের ও 'দেশবন্ধু'-আদর্শের বর্মে প্রতিহত হয়ে। কংগ্রেস সভাপতির আসনে বেসুরো গাইলেন সুভাষচন্দ্র।

হরিপুরায় কংগ্রেসের সেবার ৫১-তম অধিবেশন। ৫১টি জয়তোরণের তলা দিয়ে ৫১টি বলদবাহী শকটে আরূঢ় সুভাষচন্দ্র প্রবেশ করলেন পরাধীন ভারতের সর্বোচ্চ আসনের দিকে। সমবেত দর্শকের সম্মুখে সেই রাজনৈতিক রাজ্যাভিষেকে গগন বিদীর্ণ করে উঠল সুভাষের জয়ধ্বনি।

সুভাষের মধ্য দিয়ে জয় হল যার, বিজয় ঘোষিত হল যার সে হচ্ছে নবীন ভারত। তরুণের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে যাঁর জীবনে, ভারতপথিক সেই সুভাষচন্দ্র নবীন ভারতের নেতৃত্বের প্রতীক। তাঁর প্রতি অর্পিত মাল্য, নবীন ভারতেরই কণ্ঠে অর্পিত বিজয়মাল্য।

বিজয়ভাষণে ব্যক্ত হল আর একবার অপরাজিত কণ্ঠস্বর: 'স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসকে শক্ত হাতে ক্ষমতা অধিকার করতে হবে। ভারতে শিল্পবিপ্লব আসবেই, বৃটেনের মত ধীরে ধীরে আসবে না, রাশিয়ার মত দ্রুতবেগে আসবে। তার জন্যে গভর্নমেণ্টকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। শুধু ক্ষমতা অধিকার করলেই চলবে না, কংগ্রেস পার্টিকে দেশের পুনর্গঠনের দায়িত্বও নিতে হবে ওই সঙ্গে। ইয়োরোপীয় বিপ্লবের ইতিহাসে দেখা যায় যে তা না করলে বিশৃঙ্খলা আসে।'

এই উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সুভাষচন্দ্র জন্ম দিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম জাতীয় পরিকল্পনা সেই পরাধীন ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়েই। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতে গান্ধীর দলের দুজন ছিলেন, কিন্তু জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি যেই জানালেন যে কুটিরশিল্পেও বিদ্যুৎ ব্যবহার করার প্রস্তাব আছে এই কমিটির, সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীভক্তরা পদত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন।

বিদ্যুৎ হচ্ছে বিদ্রোহী যৌবনের, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের অগ্রদূত। নতুন যুগের প্রত্যূষে যে প্রবীণ বুদ্ধিমান নিত্যই শুধু সূক্ষ্ম বিচার করে, ভ্রজলোকের সান্ত্বনা খোঁজে সে; বজ্রালোকে তার শাস্ত না হবারই কথা।

চিরবিদ্রোহীকে কাছে টেনে ঘুম পাড়াতে চেয়েছিল অহিংসার বাঁশী; ফণা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে সে ঘুমিয়ে-পড়ার পরিবর্তে। তার মাথায় মণি হয়ে জ্বলছে পরাধীন ভারতের অনির্বাপিত প্রাণবহ্নি। যুগসঞ্চিত বর্বর ব্রিটিশের পৈশাচিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ভারতের পুঞ্জীভূত ক্রোধের এক পদ্মরাগমণি!

১৯৩৯-এ সেই চিরবিদ্রোহী বীর জাতির জনকের সুস্পষ্ট নির্দেশ অগ্রাহ্য করে দ্বিতীয়বার সভাপতির পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের এই ঐতিহাসিক শক্তিপরীক্ষা সুভাষের সঙ্গে গান্ধীর শিখণ্ডী সীতারামায়ার নয়—নবীনের সঙ্গে প্রবীণের, যুবকের সঙ্গে স্থবিরের, আপোসবিরোধী বিদ্রোহের সঙ্গে অসম্মানজনক শর্তাধীন সন্ধির।

সাত

১৯৩৯—ত্রিপুরী কংগ্রেস। সুভাষচন্দ্রের জীবনের সন্ধিক্ষণে এল ১৯৩৯-এর ত্রিপুরী কংগ্রেসে সম্মুখযুদ্ধের আহ্বান। বহু যুদ্ধের নায়ক ক্ষতবিক্ষত সুভাষের জীবনে একই সঙ্গে চরম দুর্ভাগ্যের এবং পরম সৌভাগ্যের দ্যোতক সেই ১৯৩৯। ইয়োরোপে বেজে উঠেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণভেরী। সুভাষের জীবনেও এসেছে যুদ্ধের আহ্বান। সুভাষের সঙ্গে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ সীতারামায়া।

কিন্তু খুঁটির জোরে লড়ছে সে, নিজের জোরে নয়। রাজাগোপালাচারী সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন সুভাষচন্দ্রের রণবিজয়ের মুহূর্তে: 'সুভাষ হচ্ছে ফুটো নৌকা!' সীতারামায়ার বিরুদ্ধে বিজয়ী সুভাষকে সেদিন ভোট দেয় নি প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে বাংলাদেশের দল। সুভাষচন্দ্রের জয়লাভের পর ৮০টি গাধার গলায় প্রফুল্ল ঘোষের দলের ৮০ জনের নাম বিজ্ঞাপিত করে বেরুলো শোভাযাত্রা। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর মতে 'শোভাযাত্রার নগরী কলকাতা'—উক্তি সার্থক করেছিল কলকাতা সত্যসত্যই সেই একদিন।

গান্ধী সীতারামায়াকে দাঁড় করিয়েছিলেন ইচ্ছে করেই। সেদিন কংগ্রেসের যে কেউ সুভাষের বিরুদ্ধে দাঁড়াত সেই হারত। সীতারামায়ার হার গান্ধী নিজের গলায় পরলেন অগত্যাই: 'Sitaramaya's defeat is my defeat!'

১৯৩৯-এর ১০ই মার্চ আরম্ভ হল ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন। অসুস্থ সভাপতি সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে সভাপতির ছবি নিয়ে বেরুলো শোভাযাত্রা। সভাপতি এলেন স্ট্রেচারে শুয়ে। শত-সহস্র কাতর অনুরোধেও রাজকোট ত্যাগ করে গান্ধী এলেন না ত্রিপুরীতে; ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের মধ্যে রাজাগোপালাচারী, সর্দার প্যাটেলরা উপস্থিত হলেন, কিন্তু মঞ্চে গ্রহণ করলেন না আসন—গিয়ে বসলেন সাধারণ দর্শকদের চেয়ারে। সুভাষচন্দ্রের লেখা পড়লেন অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু, হিন্দি অনুবাদ পড়ে শোনালেন আচার্য নরেন্দ্র দেব। সভাপতির ভাষণ কান পেতে শুনল নিস্তব্ধ সভাস্থল: ছ মাসের মধ্যে ব্রিটেন ভারতকে স্বাধীনতা না দিলে আবার আরম্ভ হবে আইন অমান্য আন্দোলন।

সুভাষের প্রস্তাব, যাদের ভোটে সুভাষচন্দ্র নির্বাচিত হয়েছিলেন, এবারে তাদের বিরোধিতায়ই পরাস্ত হল।

গোবিন্দবল্লভ পন্থকে দিয়ে সুভাষের ইচ্ছামত ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পথ বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রস্তাব এলো যে গান্ধীর অনুমোদন ছাড়া নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারবেন না সভাপতিও। কংগ্রেস-সংবিধানে বেআইনী এই প্রস্তাব পাস হয়ে গেল; এবং এই অস্ত্রেই সুভাষচন্দ্রকে পেছন থেকে হত্যা করল কংগ্রেস।

গান্ধী জানতেন সুভাষ কংগ্রেসে ভাঙন ধরানোর চেয়ে কংগ্রেস থেকে সরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করবেন। সদস্য নির্বাচনে গান্ধী রাজী হলেন না। সুভাষের সভ্যনির্বাচনের ক্ষমতা আগেই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অচলাবস্থার মধ্যে সভাপতির পদ ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন সুভাষ-চন্দ্র—২০ বছর আগে ব্রিটিশরাজের দাসত্ব ত্যাগ করে এসেছিলেন যেমন করে, অবিকল তেমনই ভাবে নিজের আদর্শে অবিচলিত থেকে কংগ্রেস-রাজের চাকরিতেও ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মহল সেদিন সুভাষের অবশ্যম্ভাবী রাজনৈতিক মৃত্যু ছাড়া আর কিছু দেখতে পান নি; কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন এই পদত্যাগ সুভাষচন্দ্রের পতন। সবমহিমান্বিত দেশপ্রেমের উন্নততম শিখরচূড়া থেকে অধঃপতন বলে যাকে মনে না করে পারেন নি তাঁরা তাকেই সুভাষচন্দ্রের জীবনসংহিতাকার হিউ টয় মনে করেছেন:

"This incident has been seen by many as the beginning of Bose's fall from the heights of sacrificial patriotism. It was indeed his second turning point. The first, he would have claimed, had been the result of a British injustice, now it was the injustice of his own people, his own comrades. For he had been democratically elected in preference to Gandhi's nominee; he was President, leader, by the will of the people, inspite of the will of Gandhi. Those who had voted for him had known his views and had deliberately chosen

them. His popular mandate had been denied by intrigue, intrigue not only against himself, but against the democracy which had elected him. He had been forced to show himself to the Congress as a leader who had failed. That was the grievous injustice."

কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন কংগ্রেসের সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক। অনেকদিন ধৈর্য ধরেছিলেন; সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন কংগ্রেসকে। আশা করেছিলেন অভিজ্ঞতার তিক্ত অশ্রুজলের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হবে কংগ্রেসের অন্ধ চোখেও যে স্বাধীনতার সংগ্রাম কেবল আপোসের দ্বারা সম্ভব নয়। রক্ত না দিলে, রক্তাক্ত না হলে দেখা দেয় না পরাধীনতার কৃষ্ণবর্ণ দিগন্তের নিশাবসানে জবাকুসুম-সঙ্কাশ দিবাকর।

বারংবার হানা দেবে, দ্বারে দ্বারে পাবে মানা, তবু থামবে না তুমি। স্বাধীনতার পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পথে যুগ যুগ ধাবিত হে যাত্রী, নিরাপদ বন্দরের কাল হল শেষ।

তারই সঙ্গে এসেছে আদেশ: তুফানের মাঝখানে নূতন সমুদ্রতীর পানে দিতে হবে পাড়ি।

তোমার সেদিনকার একটি কথায় তারই প্রতিধ্বনি পাই: 'বাঁধা রাস্তার বাইরে অজ্ঞেয়ের সন্ধানে যে অভিযাত্রী জীবন, সেই জীবনই আমাকে বেশী করে টানে। এই জীবনে যেমন যন্ত্রণার শেষ নেই, তেমনই রোমাঞ্চও অশেষ। যেমন আছে রাত্রির অন্ধকার তেমনই রয়েছে রাত্রিপ্রভাতের রমণীয় সূর্যোদয়। আমি আমার দেশবাসীকে আহ্বান জানাই—এস, আমার সঙ্গে এস এই সব খোয়াবার, আবার সব পাবার সর্বনাশা পথে।'

ইতিহাসের হাত ছিল সেদিন তোমার বেরিয়ে আসার পেছনে, হে বিজয়ী বীর। কংগ্রেসের সঙ্গে সেদিন সন্ধি করলে, কংগ্রেসের আদর্শবিরোধী ভারতবিভাগ মেনে নেওয়া এই সরকারের অধীনে হতে পারতে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী অথবা কোনও প্রদেশে রাজ্যপাল। কংগ্রেসের ইতিহাসে হতে অন্যতম নেতা—কালের ইতিহাসে হতে পারতে না নেতাজী সুভাষ।

তাই বলি, হে বিজয়ী বীর, তোমার জন্যে নয় ঘরের মঙ্গলশঙ্খ; সন্ধ্যার দীপালোক নয়, নয় প্রেয়সীর অশ্রুজল। তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে কেবল কালবৈশাখীর আশীর্বাদ, শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ। পথে-বিপথে কণ্টকের অভ্যর্থনায়, গুপ্তসর্পের গূঢ়ফণায়, ঈর্ষান্বিত হৃদয়ের নিন্দায় বাজে তোমার বিজয়শঙ্খ; সেই জেনো তোমার জন্যে বহন করে আনে রুদ্রের প্রসাদ। স্বাধীনতার অমৃতের অধিকার চেয়েছিলে তুমি! সে তো সুখ নয়, সে নয় বসন্তের আবেশহিল্লোল। মৃত্যু তোমাকে

আট

মধ্যপন্থায় আজীবন অবিশ্বাসী আপোসহীন মনোভাবের মূর্ত প্রতীক সুভাষচন্দ্রের জীবনে একটি অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। যারা মনে করে নিল সুভাষের রাজনৈতিক জীবনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হল ত্রিপুরীতে, তারা তখনও ভাবতে পারে নি সুভাষের জীবনের চরম অধ্যায়ের সেই আরম্ভ। সুভাষ অশেষ শক্তির উৎস। যতবার প্রতিপক্ষরা ভেবেছে সুভাষের দিন শেষ, ততবার সুভাষ প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর জীবনের শক্তি অশেষ। আপাত-হারকে তিনি কখনও পরাজয় বলে স্বীকার করেন নি; কংগ্রেসের কাছে অন্যায় যুদ্ধে এই হারকেও তিনি নীলকণ্ঠের মত গলার হার করলেন। তিন বছরের জন্যে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত সুভাষকে ডেকে আনলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা কী হবে এ বিষয়ে তাঁর মত জানাটা হল এ আমন্ত্রণের

উপলক্ষ মাত্র; লক্ষ্য হল যদি দুরন্ত দামালকে সামলানো যায়! অপমান করবার পর চেয়ার এগিয়ে দিল কংগ্রেস। ত্রিপুরী কংগ্রেসে যে কথা বলেছিলেন তারই পুনরুক্তি করলেন সুভাষ: ইংরেজকে এই সুযোগে আক্রমণ কর।

সুভাষের নয়—এ হুঙ্কার আক্রমণে উদ্যত জাগ্রত শার্দুলের। কংগ্রেস সেই শেষবারের মত বুঝল ঝুটো খাতিরের তাপে যে গলে সেই বরফ নয় সুভাষের হৃদয়; তুষার-গলানো রৌদ্রালোকে দেখা যায় যে পর্বতশ্রেষ্ঠকে সেই হিমালয়-হৃদয় সুভাষের। কোনও লোভে যা টলে না, কোনও অনুনয়ে যে নিজের আদর্শের আসন থেকে নড়ে না। কত আঘাত, কত ঝড়, কত বৃষ্টি মেঘ বয়ে যায় হিমালয়ের বুকের ওপর দিয়ে, তবুও মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর! আঘাতে যে টলে না, বিপদে হয় না অস্থির। বৃষ্টি, মেঘ, ঝড় মিথ্যা; শত শত শতাব্দীর সত্য শুধু হিমালয়। ওটেন, আই. সি. এস, ত্রিপুরী কংগ্রেস মিথ্যা, সত্য শুধু সেই বাণী যা সুভাষের লেখনীতে উজ্জ্বল হয়ে আছে ১৯২৭ সনের ৮ই মে ইনসিন জেল থেকে দাদাকে লেখা চিঠিতে:

'মনের মধ্যে আঁকা মূর্তিগুলো নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যবিধাতা। আমরা তো হলাম তাল তাল মাটি; আমাদের দেহের কৌটায় বৈশ্বানরের স্ফুলিঙ্গ। আমাদের কাজ এই ভাবমূর্তির পায়ে নিজেদের ডালি দেওয়া। এইভাবে উৎসর্গ করা জীবন কখনও বৃথা যায় না। আমাদের ঐহিক ও দৈহিক অস্তিত্বে যত ধাক্কাই আসুক আমি যে আদর্শের জন্যে লড়ছি, পরিণামে তার জয় যে হবেই—আমার এ বিশ্বাসের একচুল এদিক ওদিক হয় নি। কাজেই শরীর কেমন থাকল, অদৃষ্টে কী আছে না আছে—এসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

...দোকানদার নই, আমি দর কষাকষি করি না, কূটনীতির পিচ্ছিল পথে আমি চলতে চাই না—ও আমার ধাতে নেই। আমি নীতি নিয়ে লড়েছিলাম। বাস্, মিটে গেল। দেহাশ্রয়ী জীবনটা এমন কিছু মূল্যবান নয় যে, দরদস্তুর করে তাকে টিঁকিয়ে রাখতে হবে। বাজারে যে জিনিসের যে দাম, আমার কাছে সে জিনিসের ঠিক সেই দাম নয়। আমি মনে করি না শারীরিক কিংবা আধিভৌতিক কষ্টিপাথরে জীবনের সার্থকতা অসার্থকতা যাচাই করা যায়।...আমাদের লড়াই এই মরদেহটার জন্যে নয়, পার্থিব সুখের জন্যে নয়।...আমাদের মল্লযুদ্ধ রক্তমাংসের সঙ্গে নয়—রাজত্বটার সঙ্গে, প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার সঙ্গে, এই পৃথিবীর অন্ধকারের কর্তাদের সঙ্গে, যারা উচ্চাসনে বসে আছে তাদের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে।

...যেদিকে স্বাধীনতা ও সত্যের আদর্শ আমরা সেইদিকে; দিনের পর রাত্রির মত এ আদর্শের জয় হবেই হবে। আমাদের দেহ এলিয়ে পড়তে পারে, দেহ ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু যদি বিশ্বাস অটুট আর মনোবল বজায় থাকে, জয় আমাদের অনিবার্য। আমাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা যেদিন সার্থক হয়ে উঠবে, সেদিন আমাদের মধ্যে কে থাকবে কে না থাকবে—তা ঠিক করবার মালিক বিধাতা। নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি বাঁচার মত বাঁচতে পেরে আমি সুখী—...'

এই সুভাষকে যারা বলে রাজনীতিতে অপরিপক্ব তারা মানবজীবনের মূলমন্ত্র বিস্মৃত; সবার উপরে সত্য যে মনুষ্যত্ব তার বিচারে রাজনীতির চেয়ে নীতি বড়। এবং এই মনুষ্যত্বের গান যেন সুভাষেরই জীবনের যৌবনের জয়গান।

কংগ্রেস ছেড়ে যাবার এক মাসের মধ্যে সুভাষ নতুন রাজনৈতিক দল ফরোয়ার্ড ব্লকের জন্ম দিলেন। ১৯৪০-এ রামগড় কংগ্রেসের পালটা জবাব দিলেন আপোসবিরোধী সম্মেলন ডেকে। এই সম্মেলনও মিলনের নয়, ব্রিটিশের সঙ্গে বিরোধের কথাই নতুন করে আবার বললেন। সুভাষহীন-কংগ্রেস সম্পর্কে ব্রিটিশের ভয় চলে গেছে, তারা বুঝে নিয়েছে, 'কংগ্রেস শুধু কথাই বলে, কাজের বেলায় দশ হাত দূরে থাকে।'

ডালহৌসি স্কোয়ারে অন্ধকূপ হত্যার কলঙ্কিত অসত্য স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের মধ্যে দিয়ে আরম্ভ হল সুভাষের নতুন আন্দোলন। সুভাষ জি. ও. সি. হওয়ায় যারা হেসেছিল তারা এবারেও উপহাস করল। ইংরেজরা হাসল না। ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হল।

সুভাষ কখনও বিশ্বাস করেন নি যে অসহযোগ আন্দোলন করে ইংরেজ তাড়ানো সম্ভব। ভারতের মুক্তি আসবে ভারতের বাইরে থেকে সশস্ত্র আক্রমণে—তাঁর এই বিশ্বাসই আত্মগোপন করেছিল অবশ্য সুভাষের সেদিনকার এই উক্তিতে: 'অবশেষে ঠিক করলাম আমিই কাজের ভার নিয়ে দেশের বাইরে যাব।'

এই লক্ষ্যে স্থির, সংগ্রাম আরম্ভের জন্যে অস্থির সুভাষ, 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখলেন: 'Day of Reckoning' ['হিসাব নিকাশের দিন']; রাজদ্রোহের মামলা রুজু হল সুভাষের নামে। মুক্তির দাবিতে অনশন আরম্ভ করলেন বন্দী সুভাষ। কারাগারের অন্ধকার অন্তরাল থেকে আমরণ অনশনের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়চিত্ত বিদ্রোহী দেশের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করলেন অভয়বাণী। দেশ থেকে চলে যাবার আগে, কংগ্রেস থেকে চলে আসবার পর এই তাঁর অন্তিম আবেদন। আবেদন নয়—বন্দীর মাতৃবন্দনা:

'এই মরজগতে কিছুই অমর নয়। অবধারিত মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে সমস্ত পার্থিব বস্তুরই অন্তিমে; মৃত্যু নেই শুধু মানুষের সাধনার, আর তার স্বপ্নের। আদর্শই শুধু মৃত্যুঞ্জয়। দুঃসাধ্য ব্রত উদ্‌যাপনের মধ্যপথে যদি আসে মহিমান্বিত মৃত্যু—তবুও মৃত্যু হবে না তার আত্মার, তার আদর্শের। আদর্শের বীজ রক্তবীজের মতই মাটিতে পড়ে মরে না, অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে; মহীরুহের জন্ম হয় একদিন বহু শতাব্দীর ব্যবধানে। একের ভাবাদর্শ আর স্বপ্নের উত্তরাধিকারী হয় উত্তরকাল। বিপুলা এই পৃথ্বী জুড়ে নিরবধি কালের এই হচ্ছে সত্য: দুঃখ স্বীকার আর আত্মত্যাগের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে হয় না দুঃশাসনের অবসান।

'দেশের অগণিত মানুষকে বলে যেতে চাই—দাসত্বের চেয়ে দুর্বহ নেই আর কিছু এ কথা ভুলো না। ভুলো না অন্যায়ের সঙ্গে আপোস না করার চেয়ে বড় ন্যায় আর কিছু নেই। জীবন পেতে হলে দিতেই হবে জীবন। শহীদের শবের ওপরেই সব দেশে সব কালে সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতার উৎসব।'

অনশনের ছদিন না যেতেই ছেড়ে দিল তাঁকে ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু মামলা উঠিয়ে নিল না। এলগিন রোডের বাড়ির সামনে পাহারা দিতে লাগল পালা করে লাল পাগড়ি। ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪১— রাজদ্রোহের অপরাধের বিচারের পরবর্তী তারিখ পড়ল। সেইদিন তাঁকে আনতে গেল যে পুলিসের গাড়ি, সে গাড়ি ফিরে গেল আসামী ছাড়াই। সুভাষচন্দ্র তখন কোথায় বলতে পারল না কেউ।

সুভাষচন্দ্র জেল থেকে বাড়ি আসবার সময় না-পালাবার প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ 'পেরলে' বেরিয়েছিলেন। শুচিবায়ুগ্রস্ত কেউ-কেউ তাঁর এই প্রতিশ্রুতিভঙ্গকে নিন্দা করেছে। তারা ইতিহাস থেকে কোনও পাঠ গ্রহণ করে নি বলেই মনে হয়। না হলে তাদের মনে পড়ত ইতিহাসের আর এক অবিস্মরণীয় চরিত্র মারাঠা বীর শিবাজী পালিয়েছিলেন ঔরংজেবের কয়েদখানা থেকে ফলের ঝুড়িতে। ঔরংজেব তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এনে আটক করে রাখলে যদি অন্যায় না হয়ে থাকে তা হলে ঔরংজেবের কারাগার থেকে তাঁরও ফলের ঝুড়ির মধ্যে আত্মগোপন করে বেরিয়ে যাওয়া কাপুরুষের কাজ হয় নি; পুরুষসিংহ শিবাজী চরিত্রের তা কলঙ্ক নয়। সুভাষচন্দ্রের আমলেই টেররিস্ট ধিংড়াকে যখন অভিযুক্ত করা হয় এই বলে যে যুদ্ধ ঘোষণা করবার আগে অতর্কিতে একজনকে আক্রমণ করা—সে ব্যক্তি শ্বেতাঙ্গ হলেও পুরুষোচিত নয়, তখনই ধিংড়া সেই ঐতিহাসিক প্রত্যুত্তর করেছিলেন যে

অত্যাচারীর সঙ্গে অত্যাচারিতের যুদ্ধ সমস্ত সময়ই চালু আছে, যখনই সুযোগ পাবে তখনই নিপীড়িত জবাব দেবে, অত্যাচারীর টুঁটি টিপে ধরে জবাব দেবে তার পীড়নের। ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের স্বাধীনতাসংগ্রাম চলছেই, নতুন করে তা জানাতে যাব কাকে? একবারই কেবল সময় আসবে তার, আমাদের সংগ্রামের শেষে ভারতের বিজয় এবং ব্রিটিশের পরাজয় ঘোষণার।

সুভাষের এই পলায়ন কাপুরুষের কাজ নয়; ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের দেশ থেকে অন্তর্ধান! দেশের মুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত দেশের মাটিতে না ফেরার দুর্জয় সঙ্কল্পই এর একমাত্র পাথেয়। তাঁর চলে যাওয়ার পথের প্রত্যেকটি ধূলিকণা অমিতবীর্য এক পুরুষের পায়ের চিহ্নে চিরকালের জন্যে পরম পবিত্র হয়ে রইল।

নয়

দেশ থেকে অন্তর্ধান করবার আগে সুভাষচন্দ্র বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে ভারতের বড়লাটকে চিঠি দিলেন; সে চিঠির ভাষা সুভাষের চরিত্রের মতই অনমনীয়। এর পরই আরম্ভ হল এলগিন রোডের ভারত-বিখ্যাত সেই বাড়িতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাঁর ঐতিহাসিক নির্জনবাস। বাড়ির সামনে দিবারাত্র পাহারায় নিযুক্ত কংসের প্রহরী। সুভাষকে দেখতে পায় না তারা, কেবল একটা ছায়াকে আসতে যেতে দেখে দেওয়ালের গায়ে। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত যাচ্ছে আসছে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে। সেই ছায়া দেখেই তারা নিশ্চিন্ত হয় নির্জনবাসীর কায়া সম্পর্কে। কয়েকজন বন্ধু আসে দেখা করতে; প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি তাদেরও ওপরে। তারা এসে দেখে আজীবন শ্মশ্রুবিহীন সুভাষের মুখভতি দাড়ির অরণ্য। সুভাষের কথায় ফেটে বেরোয় সংসার-বৈরাগ্যের সুর। রাজনৈতিক ব্যর্থতার অব্যর্থ ফ্রাসট্রেশান [!] আক্রমণ করছে তাদের প্রিয় বন্ধুকে বুঝে তারা দুঃখিত হয়, কিন্তু বিস্মিত হয় না। রাজনীতির জগতে রাজনীতির ওপরে নীতিকে স্থান দিতে গেলেই স্থানচ্যুত হতে হয় শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারীকেও। সুভাষের পতন ও বৈরাগ্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে ফিরে যায় তারা। দেওয়ালে আবার আসা-যাওয়া শুরু হয় ছায়ার। লাল পাগড়ি নিশ্চিন্ত হয় আবার। সেদিনকার তারিখ হচ্ছে ১৬ই জানুয়ারি।

২৬শে জানুয়ারি এগিয়ে আসে। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার সঙ্কল্পদিবস, আর সুভাষের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচারের দিন। জাতির জীবন এবং জাতির নেতার দিনপঞ্জীতে রক্তক্ষরা একটি দিন এগিয়ে আসে ধীর কিন্তু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের পায়ে পায়ে ভর করে।

আবার আসে দুজন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। একজনের গালে দাড়ি, আর একজনের গাল দাড়ির অরণ্যমুক্ত— মসৃণ। ব্রিটিশের চর চোখ রাখে, তারা বেরিয়ে যায়। ১৭ই জানুয়ারির শেষ রাতে আসে সেই দুই গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসীই। সেই একজন দাড়িওলা এবং আর একজন গোঁফ-দাড়ি কামানো। সাক্ষাতের পর একসময়ে তাঁরা বেরিয়ে এসে ওঠেন অপেক্ষমান গাড়িতে। প্রহরীদের চোখ গিয়ে পড়ে দেওয়ালে; সেখানে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত ছন্দে তালে আসছে যাচ্ছে ছায়া। নিশ্চিন্ত হয় তারা।

নিশ্চিন্ত হতে পারে না কেবল ১৭ই জানুয়ারির সেই শেষরাত। পরাধীন ভারতের রাত্রি ভোর হতে দেরি কত আর এই প্রশ্ন তখন আসছে যাচ্ছে দেওয়ালে যার দিকে তাকিয়ে সরকারের চর ভাবতে পারে নি যে ওই ছায়া সেদিন আর তাদের লক্ষ্যের নয়! তাদের সতর্ক পাহারার অলক্ষ্যে সুভাষই দাড়িওলা গেরুয়াধারী হয়ে বেরিয়ে গেছেন তাদেরই চোখের ওপর অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে। সঙ্গে সেই দাড়ি-গোঁফ কামানো আর একজন যাঁকে দেখে তারা নিঃসন্দেহ হয়েছিল যে যাঁরা দুজন এসেছিলেন তাঁরা দুজনই চলে গেলেন কেবল। দেওয়ালে ছায়া নড়ে এই

দুজন আগন্তুকের মধ্যে একজনের। আরও দুদিন সুভাষের প্রক্সি দিলেন তিনি। দেওয়ালে আসতে যেতে লাগল সেই ছায়া আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা। সুভাষের খাবারের থালা যায় আর খালি বাসন ফিরে আসার খেলাও চলতে লাগল সেই আটচল্লিশ ঘণ্টা। তারপর একসময়ে ছায়ার পেণ্ডুলাম নড়ল না আর, খাবারের থালায় মুখ দিল না কেউ।

এল ২৬শে জানুয়ারির সেই পরমাশ্চর্য এক প্রভাত। আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ লোকের রক্তে বয়ে গেল বিদ্যুতের শিহরণ। সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের কাহিনী বহন করে নিয়ে এল স্বাধীনতা দিবসের সূর্য। সাত লাখ গ্রামে গাঁথা ভারতের পথে-প্রান্তরে, মন্দিরে-মসজিদে, নগরে-পল্লীতে, প্রাসাদে-পর্ণকুটিরে ছড়িয়ে গেল সেই বার্তা। বিস্তৃত হল সমুদ্রপারে, বিশ্বব্যাপ্ত হল সেই বিস্ময়বার্তা। তারায় তারায় অগ্নির অক্ষরে উচ্চারিত হয়ে রইল সেই কাহিনী চিরকালের কানে।

ঠিক সেই মুহূর্তে পেশোয়ার পরিত্যাগ করে জামরুদ কেল্লা ছাড়িয়ে কাঁচা সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছেন একজন। লোকে জানে—তিনি মৌলভী জিয়াউদ্দীন। মৌলভী জিয়াউদ্দীন নয়, সুভাষচন্দ্র নয়, সেই মুহূর্তে জন্ম নিয়েছেন পরাধীন ভারতের শেষ পলাতকের জীর্ণবাস ত্যাগ করে স্বাধীন ভারতের পথে পরবর্তীকালে অগ্রসর প্রথম পদাতিক নেতাজী সুভাষ।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে ঠাকুমার কোলে শুয়ে রাজপুত্রের তলোয়ার হাতে রাক্ষসকে মেরে রাজকন্যা-উদ্ধারের রূপকথা নয়, ভারতের সবচেয়ে দুঃসময়ের দুদিনে মায়ের শৃঙ্খলমুক্তির কারণে সর্বস্ব পণ করে শত্রুপুরীর ভিতর দিয়ে, প্রহরীর চোখের ওপর দিয়ে উধাও হয়ে যাবার দুরন্ত এক দুঃসাহসীর অপরূপ কথা।

অনুমান করি কল্পনায়, শীতজর্জর পৌষপ্রখর ঝিল্লিমুখর পেশোয়ারের অন্ধকার রাতে ভারতের স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের নবপ্রভাতের স্বপ্নচোখে অগ্রসর সেই অভিযাত্রী দুর্গম মরু-পর্বত-প্রান্তর দুস্তর সাগর পার হবার পথে প্রার্থনা করছেন; অন্তরের অন্তস্তল থেকে মৃত্যুঞ্জয় আত্মার সৌরভ জড়িয়ে আছে যে-প্রার্থনার সর্বাঙ্গে: "রুক্ষ দিনের দুঃখ পাইতো পাব, চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।"

১৭ই জানুয়ারির সেই শেষরাত্রে মৌলভী জিয়াউদ্দীন-বেশী সুভাষকে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে দিয়ে গেলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পথ ধরে তাঁর গাড়ি চলত কেবল রাতের অন্ধকারে। উত্তর-ভারতের দিকে অগ্রসর এক ট্রেনে সুভাষকে উঠিয়ে দিয়ে গোমো থেকে ফিরে গেলেন তিনি। পেশোয়ারে সুভাষের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন শ্রীযুক্ত ভগৎরাম। দুদিন ছিলেন এখানে; তখন আর মৌলভী নন—পাঠান। ভগৎরাম হলেন রহমৎ খাঁ। পুশ্‌তু এবং ফার্সি উচ্চারণে হিতে বিপরীত হতে পারে সন্দেহে সুভাষ মূকবধির সাজলেন। তিনি জানতেন তাঁর নিরুদ্দেশের দুঃসংবাদ ব্রিটিশ সরকারের কানে যাওয়া মাত্র সারা দেশ তন্ন তন্ন করে তছনছ করে ফেলবে তাদের চর। স্বর্গ মর্ত্য পাতালে এমন একটি পাথরও থাকবে না যা একবার না একবার উলটে দেখবে তারা নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানে, অথবা তাঁকে ধরতে পারার সাহায্য হতে পারে এমন তুচ্ছতম কোনও হদিশের অনুসন্ধানে। সুভাষের সেই অনুমান সত্য প্রমাণিত হতে দেরি হয় নি যে পরবর্তী কয়েকদিনের ইতিহাস তারই পর্যাপ্ত সাক্ষী।

সুভাষের সংগ্রাম যে স্বপ্নবিলাস ছিল না তার সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল পরিচয় তাঁর এই পলাতক দিবসেই প্রদীপ্ত হয়েছে। কত দিন কত বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে; কত সতর্কতায়, কত ধৈর্যে, কত বিচক্ষণতায় এবং কি দূরদর্শী সেই পরিকল্পনায় প্রস্তুত এই পরাধীন ভারতের ইতিহাসে এই অভূতপূর্ব পলায়নের প্রত্যেকটি পর্ব, প্রতিটি পদক্ষেপ। এই সুভাষকে চিনেছিলেন শুধু

মহাত্মা গান্ধী। সুভাষের প্লেন-অ্যাক্সিডেণ্টের খবর শুনে তিনি বিশ্বাস করেন নি। কেন বিশ্বাস করেন নি প্রশ্ন করলে বলেছিলেন: 'কোন প্রমাণ আমার হাতে নেই, কিন্তু এ কথা ঠিক যে, সুভাষের বুদ্ধির তুলনা নেই; হয়তো কোন প্ল্যান তার ছিল এবং আত্মগোপনের সুবিধার জন্য 'দুসরা কিসিকো লাশ জ্বালা দিয়া হোগা'।'

মহাত্মা গান্ধীর এই কথাই যেন শেষ পর্যন্ত সত্য হয়। স্বাধীন ভারতের এ ছাড়া আর কোনও প্রার্থনা নেই আজ।

পেশোয়ার থেকে কাবুলের পথে পা বাড়ালেন রহমৎ খাঁ ওরফে শ্রীযুক্ত ভগৎরাম। এগিয়ে নিয়ে চললেন পাঠানবেশী মূকবধির সুভাষকে। পেশোয়ার থেকে কাবুলের এই পথই ভারতবর্ষের দুর্গমতম পথ। খাইবার গিরিসঙ্কটের প্রবেশমুখে পাহারা দিচ্ছে জামরুদ দুর্গ। দুর্গে পৌঁছবার আগেই সুভাষচন্দ্রের গাড়ি বড় পাকা রাস্তা ছেড়ে নামল কাঁচা মেঠো পায়ে-হাঁটা-পথের ওপর; কিছুদূরে এগিয়ে গাড়ি এগুলো না আর। গাড়ি ছেড়ে হাঁটা আরম্ভ হল দুজনের। উপজাতিদের গাঁয়ে রাত কাটিয়ে আরও দুজন সশস্ত্র পাঠান সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললেন আফগান সীমান্তের দিকে। কাবুল-নদী পার হয়ে এসে পৌঁছলেন আড্‌ডা শরীফে। সে রাত কাটল এক মস্‌জিদে। সেখান থেকে লালপুরায়। চতুর্থ দিনে আবার কাবুল-নদী পার হয়ে উঠলেন বড় রাস্তায়। আফগানিস্থানের এত ভেতরে ততদিনে ঢুকে গেছেন যে পাসপোর্টের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সশস্ত্র পাঠান-রক্ষীরা ফিরে গেল নদী পার করে দিয়ে; তাদেরও প্রয়োজন নেই আর। ক্লান্ত সুভাষ পথের ওপরই ঘুমিয়ে পড়লেন; গাড়ির সন্ধানে বেরুলেন ভগৎরাম। সন্ধ্যাবেলায় লরির মাথায় উঠে বসলেন মালপত্রের ওপর ভগৎরাম আর সুভাষ।

বরফঢাকা উপত্যকা পেরিয়ে কাবুলে পৌঁছলেন এক রাত এক দিন পর। লাহোর গেটে এসে সেই লরি থামল। ঠাণ্ডায় অবসন্ন দুজন বেরুলেন দিন-রাতের একটা ডেরা খুঁজতে। লরিচালকদের সরাইখানায় পাওয়া গেল জায়গা; সরাইখানার সেই রাত বুঝি আর কাটে না:

'বাইরে সারারাত ধরে প্রচণ্ড হিমেল হাওয়া বয়ে যায়; দরজা খুলে রাখা যায় না তাই। দরজা বন্ধ করলে ধোঁয়ায় ভরে যায় ঘর। শুকনো কাঠে আগুন জ্বালাই দুজন। বরফে জমে যাওয়া শরীর যদি চাঙ্গা হয় একটু। সন্ধ্যাবেলায় ভগৎরাম বাজার থেকে মোমবাতি, শুকনো রুটি আর কাবাব নিয়ে এল। আমি রুটি খেতে পারছি না দেখে ভগৎরাম আমাকে চা এনে দেয়। চায়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে সেই রুটি খেতে লাগলাম আমি।'

পর পর তিনদিন কাবুলে রুশ দূতাবাসে ঢোকবার চেষ্টা চলল। ভগৎরাম ফার্সি না জানায় নিদারুণ অসুবিধা হয়; সুভাষচন্দ্র তখনও কালা আর বোবা সেজে বসে আছেন সরাইখানার সেই নোংরা অন্ধকারে আরও নোংরা আর দুর্গন্ধযুক্ত জামাকাপড় পরে। বাইরে বাঘের গায়েও ছুঁচের মত বেঁধবার মাঘের বাতাস; দুর্দান্ত ঠাণ্ডা। রুশ দূতাবাসের গাড়ি পথের মধ্যে আটকেও তাদের ভাল করে বোঝানো গেল না উদ্দেশ্য; ভাষাই বাধা হয়ে দাঁড়াল। মরিয়া হয়ে ইতালীয় দূতাবাসে ভগৎরামকে পাঠান সুভাষ। সেখান থেকে স্বাগত অভিনন্দনের সঙ্গে ছাড়পত্রের প্রতিশ্রুতির সুসংবাদ নিয়ে ফিরলেন ভগৎরাম। সুভাষের মনের অবস্থা সেদিন তাঁর নিজের কথায়: 'বার্লিনে কিংবা রোমে যেতে চাইছে না আমার মন, কিন্তু আমি নিরুপায়।'

কিন্তু সরাইখানার নিরাপদ অন্ধকারে এসে হানা দিয়েছে ততক্ষণে পুলিসের টিকটিকি, গন্ধ পেয়েছে বুঝি গোপন কিছুর। ভগৎরাম প্রশ্নের উত্তরে পুশ্‌তুতে জানায় তারা মুসাফির, আর বোবা-কালা সঙ্গের লোকটি তার বড় ভাই। ওর জন্যেই দরগার পথে বেরুনো, কিন্তু দরগার পথ বরফে ঢাকা, তাই বাসের অপেক্ষায় এই সরাইখানায় তাদের দিন কাটানো। চলে যায় পুলিসের

লোক, তবে খালি হাতে যায় না—বাঁ হাতে নিয়ে যায় তাই, পুলিসের লোকের ডান হাতের জানতে নেই যা।

তিনদিন বাদে ফিরে আসে আবার। প্রশ্ন করে: দরগার পথ কি এখনও খোলা পেলে না? রহমৎ খাঁ ওরফে ভগৎরাম তখনও জানে না যে বাস চলছে। তাই ভগৎরাম তখনও বাসের অপেক্ষায় আছে বলতে ধমকে ওঠে সি আই-ডির লোক: ওসব বুজরুকি রেখে দাও, বাসস্ট্যাণ্ড থেকেই আমি আসছি। ভগৎরাম কথা না বলে বার করে দেয় দশ টাকার একখানা নোট। টিকটিকিও কথা বলে না আর। কথা বলার ফুরসত কোথায়!

সরাইখানায় থাকা যায় না আর। সুভাষের জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে পাশে এসে দাঁড়ান যিনি তাঁর নাম উত্তমচাঁদ। নাম অথবা ছদ্মনাম জানি না। শুধু জানি, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেই স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মত আরও দুটি নাম হল—ভগৎরাম ও উত্তমচাঁদের। সুভাষের নাম যতবার করি ততবার নাম করি তোমাদের; ভগৎরাম আর উত্তমচাঁদ—সুভাষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চিরকাল নাম করার যোগ্য তোমরা।

আরও ছ হপ্তা কেটে যায়। ইতালীয় দূতাবাস থেকে প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রচেষ্টা কোথায়? রুশ দূতাবাস থেকেও মেলে না সাড়া। সুভাষ মনে মনে একার চেষ্টাতেই বেরিয়ে পড়বার মতলব আঁটেন। আর ঠিক সেই সময়েই, ১৮ই মার্চ ইতালীর দূত জানায় সব ব্যবস্থা পাকা। ওই তারিখেই ওরলান্দো মাসসোত্তা, এই নতুন ছদ্মনামে ছাড়পত্র নিয়ে রুশ সীমান্তের দিকে রওনা হয়ে যান নেতাজী সুভাষ। কাবুল থেকে বোখারার সেই দুর্গম পথ। হিন্দুকুশের আকাশউদ্ধত উঁচু পাহাড়, তাসকুরগানের গিরিনালা; প্রাচীন পবিত্রতীর্থ মাজার-ই-শরীফ, অরণ্য আদিম বিষণ্ণ অক্সাস, পাটা কেসরের প্রাগৈতিহাসিক পারঘাট, সমরখন্দের বুক চিরে কলের চিমনির ধোঁয়ার মুখে লেখা নবযুগের অগ্রগতির বার্তা সরে যায় ছবির মত। সারা পথ একবারের জন্যেও গতিরুদ্ধ না করে সুভাষ মস্কোয় পৌঁছলেন, কিন্তু স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলেন না। ১৯৪১-এর ২৮শে মার্চ আকাশপথে উড়ে গেলেন বার্লিনে।

কাবুলে থাকার সময়েই তাঁর কাছে প্রশ্ন করা হয় যে, ভারতবর্ষে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দলাদলির দরুন দেশের ঐক্য কেমন করে সম্ভব হবে। সুভাষ তার উত্তরে বলেছিলেন:

'দেশে তৃতীয়পক্ষ অর্থাৎ বৃটিশরা যতদিন থাকবে ততদিন অসম্ভব হবে। যদি কোনও ডিক্টেটর বিশ বছর ভারতবর্ষকে রাখতে পারে কড়া ডিসিপ্লিনের চাকার তলায়, তবেই সম্ভব হবে এই ঐক্য। বৃটিশসিংহের ল্যাজ গুটনোর পরও কয়েক বছরের জন্যে ভারতে প্রয়োজন হবে একনায়কত্বের। এবং তা ছাড়া আর কোনও শাসনব্যবস্থায় কাজ দেবে না ভারতবর্ষে। ভারতের স্বার্থের জন্যেই স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হবে একজন একনায়কের। ভারতের রোগ একটা নয়, আর সর্বাঙ্গে কবচ ধারণ করা যায় না কিছুতেই। ভারতের এই অসংখ্য রাজনৈতিক রোগের একমাত্র দাওয়াই হচ্ছে—ডিক্টেটরশিপ। কাজেই ভারতের সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে একজন কামাল পাশার।'

সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিতকার হিউ টয় অতঃপর মন্তব্য করেছেন: ভারতবর্ষে কামাল পাশার ভূমিকায় তিনি কাকে কল্পনা করেছিলেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না একটুও।

আমরা কেবল তোমার পায়ের দাগ আজও লেগে আছে যেখানে সেই পুণ্য পবিত্র যাত্রাপথের দিকে অভিভূত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকব; আর বলব তোমার উদ্দেশেই যেন রচিত হয়েছিল রক্তের অক্ষরে লেখা এই বিচিত্রবাণী:

"তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও,—তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না,·· তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড় পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়;—কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল,—সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজ-বিদ্রোহী! তোমাকে শত কোটী নমস্কার!"

দশ

৪ঠা জুলাই ১৯৪৩। সুদূর সিঙ্গাপুর থেকে বেতার-তরঙ্গে ভেসে এল জাগ্রত এশিয়ার কণ্ঠস্বর: চল দিল্লি। আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ লোকের ভারতবর্ষ জেগে উঠল। দুলে উঠল তাদের বুক। পরাধীনতার আফিমে আচ্ছন্ন রক্তের নদীতে বান ডাকল নবজাগরণের। জীবনের শুকনো গাঙে নামল যৌবনের বন্যার উদ্দাম উন্মাদনা! জাগ্রত নবযৌবনের দূত নেতাজী সুভাষ। তাঁর মুখে সেদিন আহুতি পেল অগ্নির ভাষা, অপরাজিত জীবনের জয়বার্তা ঘোষিত হল দিকে দিকে। রোমাঞ্চ হল তারায় তারায়: মুক্তির দিন আসে; আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদের জয়ের আর স্বাধীনতার পথে নিয়ে যাব, স্থির লক্ষ্যে দেব পৌঁছে। ৯ই জুলাই, ১৯৪৩। ষাট হাজার সমবেত ভারতীয়ের এক সভায় গর্জন করে উঠল আবার সেই উদাত্ত কণ্ঠ। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টিকে গ্রাহ্য করল না সেদিন কেউ; সুভাষ ব্যাখ্যা করলেন আজাদহিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্য:

'আমি ছিলাম বৃটিশ-জেলে। এগারবার তারা আমাকে বন্দী করেছে। সেই কারাগারের অন্ধকারেই লৌহ-প্রাচীরের কঠিন হৃদয় ভেদ করে একদিন আমার কাছে এসে পৌঁছল স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা। সেই আলোয় আমি দেখলাম কারাগারের রুদ্ধকক্ষের নিরাপত্তা আমার জন্যে নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যেই আমার ভারতবর্ষের বাইরে যাওয়া দরকার। সে পথে বাধা হোক যত দুস্তর আমার প্রতিজ্ঞা হবে তত দুর্বার, তত দৃঢ় তাকে অতিক্রম করার। সেই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে প্রার্থনা করলাম। দেশ থেকে পালাবার আগে আমার প্রয়োজন জেল থেকে বেরুবার। সেই উদ্দেশ্যে আরম্ভ করলাম আমরণ অনশনের ব্রত। আয়ার্লণ্ডে কি ভারতে ব্রিটিশ সরকারকে মুক্তিসর্তে বাধ্য করতে পারে নি কেউ, জেনেও ঐতিহাসিক কর্তব্যপালনে আরম্ভ করলাম অনশন। সাত দিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ভয় পেয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। তাদের মতলব ছিল আমাকে কিছুদিন পরে আবার তাদের খাঁচায় পোরবার। তার আগেই আমি স্বাধীন দেশের মাটিতে পা দিলাম।

আমার ভারত ত্যাগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতার জন্যে ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশসিংহকে আক্রমণে পর্যুদস্ত করা। জাতীয় মুক্তি আসবে কোন্ পথ দিয়ে আজ আমার শত্রুমিত্র দুজনকেই তা স্পষ্ট করে শোনাতে চাই। পূর্ব এশিয়ায় জন্ম নিয়েছে ভারতীয়দের প্রথম স্বাধীন সৈন্যদল—আজাদহিন্দ ফৌজ! এই ফৌজ যেদিন আক্রমণ করবে ব্রিটিশসিংহের পতাকা অস্বীকার করে সেদিন পরাধীন ভারতের জনসাধারণ এবং সৈনিক উভয়ের মধ্যেই আসবে বিপ্লব। বাইরে এবং ভেতরে আক্রমণের জাঁতাকলে পড়ে কচুকাটা হবে সেদিন ইংরেজ-সরকার। ভারত পৌনে দুশো বছর পর ফিরে পাবে

তার স্বাধীনতা কেবল এই পথেই। এই জন্যে অক্ষশক্তির কি মনোভাব ভারত সম্পর্কে তা জানবার প্রয়োজন হবে না যদি ভারতের ভেতরে এবং বাইরে ভারতীয়রা নিজেদের কর্তব্য পালন করে অকাতরে। ব্রিটিশসিংহের উদ্যত নখরের জবাবে উদ্যত নখর; হিংস্র চক্ষুর পরিবর্তে হিংস্র চক্ষু প্রদর্শন ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আসবার দ্বিতীয় কোনও পথ খোলা নেই আর।

তাই বন্ধুদের বলি পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ ভারতীয়ের এই হোক একমাত্র রণহুঙ্কার! সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি চাই। আর তারই জন্যে চাই ৩ লক্ষ সৈন্য, ৩ কোটি ডলার অর্থ। আরও চাই ভারতীয় নারীর এক বাহিনী। ১৮৫৭-য় ভারতের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের অগ্রদূত ঝান্সির রাণীর যারা হবে যোগ্য উত্তরাধিকারিণী। আমাকে এই সর্বাত্মক প্রস্তুতি দাও, আমি তোমাদের দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। সে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র হবে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে আসলে অদ্বিতীয় এক রণাঙ্গন।'

তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরের কালো ছায়ায় তখন বাংলার আকাশ ঢেকে গেছে, তার বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে দুর্ভিক্ষের দীর্ঘশ্বাসে। এক লক্ষ টন চাল পাঠাতে চেয়েছিলেন নেতাজী, ব্রিটিশ সরকার তা পাঠাতে দিল না।

৮ই আগস্ট নেতাজী হলেন আজাদহিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক। ২৫শে আগস্ট বেতারে তাঁর প্রথম 'অর্ডার অফ দি ডে': ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রদূত আজাদহিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করলাম স্বহস্তে। বিভিন্ন ধর্মের ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ ভারতীয়ের সেবায় নিযুক্ত বলে নিজেকে মনে করি। এই স্বাধীনতার যুদ্ধে আমরা জয়যুক্ত হবই। আমাদের সেই সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। সেই সংগ্রামের ধ্বনি হচ্ছে—চলো দিল্লি। এই ধ্বনি ভারতের জয়ধ্বনি। লালকেল্লায় যেদিন উড্ডীন হবে স্বাধীন ভারতের পতাকা, আর সেখানে প্যারেড করবে আজাদহিন্দ ফৌজ, সেদিন শেষ হবে এই সংগ্রাম—তার আগে নয়।

পূর্ব এশিয়ায় আজাদহিন্দ ফৌজ গঠন এবং আজাদহিন্দ সরকারের জন্ম সম্ভব হত না যাঁর সহযোগিতা ছাড়া—তিনি হচ্ছেন রাসবিহারী বসু—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় একটি নাম।

আজাদহিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদে নেতাজীর প্রথম হুকুমনামার তারিখ হচ্ছে ২৫শে আগস্ট, ১৯৪৩; আর সুভাষচন্দ্রের ইয়োরোপে পদার্পণের তারিখ হচ্ছে ১৯৪১-এর মার্চ। এই সময়টায় তিনি হিটলারের সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হন প্রধানতঃ গোয়েবল্‌সের বিরুদ্ধতায়। এমন কি মুসোলিনী যখন হিটলারকে বললেন যে বসুকে তিনি পালটা সরকার গঠন করে আরও প্রকাশ্যে কাজে নামতে বলেছেন তখনও গোয়েবল্‌স্ 'নোট' করেছেন তাঁর দিনপঞ্জীর পাতায়: 'আমরা এই প্রস্তাবটি বিশেষ পছন্দ করছি না, কারণ আমাদের মনে হয় এখনও সেরকম রাজনৈতিক চাল দেবার সময় হয় নি।' হিটলারেরও মত ছিল অনুরূপ। মুসোলিনীর অভিমত পরিবর্তিত করতে পারলেও হিটলারকে টলাতে পারলেন না সুভাষচন্দ্র। তিনি চেয়েছিলেন অক্ষশক্তির সঙ্গেই আজাদ-হিন্দের পক্ষ থেকে ত্রিদলীয় ঘোষণা। হিটলারের সঙ্গে কথা বলে বুঝলেন এখানে ভারতীয় সৈন্যরা, জার্মেণী জয়ী হলে, জার্মাণ শক্তির কাছে পরাভূত হবে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটবে অনেককালের জন্যে। তিনি তীব্র প্রচারকার্য চালাতে থাকলেও মুষড়ে পড়লেন। ১৯৪৩-এর ৮ই ফেব্রুয়ারি জার্মাণীর কিয়েল বন্দর ত্যাগ করে সাবমেরিনে পার হলেন ১৮ সপ্তাহের বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথ। সাবাং থেকে কর্নেল ইয়ামামোতো তাঁকে নিয়ে যান টোকিওতে।

দু বছর চেষ্টা করেও হিটলারকে যে ঘোষণায় রাজী করাতে পারেন নি তিনি, তোজোর তাতে সম্মতি দিতে ৪৮ ঘণ্টার বেশী সময় লাগল না। তোজোর ঘোষণায় উৎফুল্ল সুভাষ অভিনন্দন জানালেন এই বলে:

জাপান ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, এই ঘোষণা এক ঐতিহাসিক ঘটনা– ইতিহাসের অমর অধ্যায়।

এশিয়ায় তাঁর সিদ্ধির পথ দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুত করেছিলেন একটু একটু ভারত থেকে অনেকদিন আগে পলাতক আর এক বীর—রাসবিহারী বসু।

১৯শে জুন, ১৯৪৩। প্রথম প্রেস-কনফারেন্স সুভাষের এশিয়ায়। সেখানে বললেন : আইন-অমান্য আন্দোলনকে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপান্তরিত না করা পর্যন্ত, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত ভারত স্বাধীনতালাভের যোগ্য হবে না কোনওমতেই।

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে গর্জন করে উঠল তাঁর কম্বুকণ্ঠ : 'অক্ষশক্তিকে বিশ্বাস করবার প্রয়োজন নেই, ভারতবর্ষের বিশ্বাস দাবি করেন তিনি নিজে—সুভাষচন্দ্র। ব্রিটিশের প্রলোভন অথবা ভীতিপ্রদর্শন তাঁকে টলাতে পারে নি; আর কোনও শক্তিও সেপথে তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হবে, সন্দেহ নেই। ব্রিটিশেরা স্বেচ্ছায় সুজলাসুফলা মলয়জশীতলা, ভুবনমনোমোহিনী, নির্মল-সূর্যকরোজ্জ্বল এই ভারতবর্ষকে পরিত্যাগ করে যাবে, এ কথা যেন কেউ না ভাবে। অর্থনীতির কারণেই তাদের ভারতবর্ষকে শাসনের নামে শোষণের প্রয়োজন হবে চিরকাল। তিন সম্মিলিত অক্ষশক্তি আক্রমণ করেছে ইংলণ্ডকে। এই সুযোগের জন্যে ভারতের কৃতজ্ঞ হবার কথা অক্ষশক্তির কাছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আনবার সংগ্রামে রক্ত দেবে না তারা, প্রথম পবিত্র রক্তবিন্দু ভারতের মাটিতে ভারতীয়ের হতে হবেই। সেই বীরের রক্তের বিনিময়েই কেবল স্বাধীনতা অর্জন এবং রক্ষা সম্ভব।'

সমগ্র এশিয়া সাড়া দেয় সেই ডাকে।

সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ ব্যর্থ হয় নি। ইয়োরোপে এবং এশিয়ায় যুদ্ধের প্রকৃত নায়কদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করে বুঝেছেন যুদ্ধের গতি কোন্ দিকে; ইংলণ্ডের বিপদ কোন্ দিক থেকে আসছে এবং তার কতটা সুযোগ ভারত কি ভাবে নিতে পারে। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেশে বসে আর কারুরই লাভ করার সৌভাগ্য হয় নি। ১৯৪৩-এর ৯ই জুলাই প্রবল বর্ষণের মধ্যেও অবিচলিত দণ্ডায়মান ষাট হাজার শ্রোতার সামনে তাই নিঃসঙ্কোচে বলতে পেরেছিলেন সেদিন :

'ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কোন স্বদেশী নেতা নেই যিনি আমার মত এত দিকে এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বলে দাবি করতে পারেন।'

১৯৪৩, ১লা আগস্ট জাপানীরা বর্মাকে স্বাধীন করে দেয়। সুভাষচন্দ্র এই উপলক্ষে এক ভাষণে বলেন : 'রেঙ্গুনে যেমন সরকারী ভবনে উড্ডীন স্বাধীন বার্মার ময়ূরকেতন, তেমনই দিল্লির লালকেল্লায় উড়বে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জয়পতাকা।'

ফিল্ডমার্শাল কাউন্ট তেরোচি তখন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাপানীদের সর্বাধিনায়ক। তিনি আজাদহিন্দ ফৌজের ওপর আস্থা রাখতে বারণ করছিলেন সুভাষকে। কারণ, আজাদহিন্দ ফৌজ মূলতঃ ইংরেজের সৈন্য ছিল একদিন। এবং ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধে হেরে যাওয়া এই ফৌজরা ইম্ফল সংগ্রামের কঠোরতা সহ্য করতে সক্ষম হবে না। তারা চেষ্টা করবে আবার ইংরেজদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে। জাপানী সৈন্যের ওপরই যুদ্ধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দিতে বললেন তেরোচি নেতাজী সুভাষকে। নেতাজী তার উত্তরে জানালেন : জাপানীদের রক্তে এবং ত্যাগে নয়, ভারতের স্বাধীনতা আনবে ভারতবাসীর রক্ত এবং ত্যাগ। এই তাঁর বিপ্লবী বিবেকের সুস্পষ্ট নির্দেশ। একে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা নেই বলেই তিনি দেশত্যাগ করে এসেছেন। এখনও একে ত্যাগ করার অর্থই হচ্ছে আদর্শ পরিত্যাগ করা—যার অপর একমাত্র অর্থ নেতাজীর অভিধানে অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়।

এদেশে একশ্রেণীর দেশদ্রোহী যখন সুভাষকে অক্ষশক্তির ক্রীড়নক, জাপানের দালাল বলে হেয় প্রতিপন্ন করবার উৎকট প্রচেষ্টায় কাণ্ডজ্ঞানলুপ্ত, এবং আর একদলের মুখপাত্র যখন নেতাজী এলে—বাঁশের লাঠি নিয়ে, ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দারের ভূমিকায় অবতীর্ণ, ঠিক তখনই নেতাজী জাপানের সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করতে উদ্যত। দেশদ্রোহী আর খাঁটি বিদ্রোহীতে, অভিনেতা আর নেতায় এইখানেই সবচেয়ে বড় পার্থক্য মাথা উঁচু করে আছে চিরকাল।

সুভাষের ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির কাছে হার মানেন কাউন্ট তেরোচি। একটি সর্তে তিনি লড়তে দিতে রাজী হন আজাদহিন্দ ফৌজকে। আজাদহিন্দ ফৌজের একটি রেজিমেন্টকে তিনি সঙ্গে নেবেন পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে। অর্থাৎ এই রেজিমেন্ট যদি জাপানী ফৌজের সঙ্গে লড়াইয়ে সমানতালে পাল্লা দিতে পারে তবেই আজাদহিন্দের বাকী বাহিনী লড়বার সুযোগ পাবে—নইলে নয়। তেরোচির প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে নূতন উদ্যমে উঠে-পড়ে লাগলেন নেতাজী সুভাষ। যারা অলস, কর্মবিমুখ, বিশৃঙ্খল এবং বিশ্বাসঘাতক তাদের উদ্দেশ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন নেতাজী সুভাষ; দূর হয়ে যেতে বললেন আজাদহিন্দের দল থেকে। এই ফৌজে কেবল কষ্টসহিষ্ণু, সুশৃঙ্খল এবং দেশপ্রেমিকদেরই স্থান। মাইনে এবং রেশন বাড়িয়ে দিলেন। নিজে তদারক করে বেড়াতে লাগলেন শিবিরে ঘুরে ঘুরে। ফৌজ তৈরি হতে লাগল জোর কদমে। শাহনওয়াজ খাঁর নেতৃত্বে সুভাষ-রেজিমেন্ট প্রতীক্ষা করতে লাগল মণিপুর রণাঙ্গনে ডাকের জন্যে। এ ছাড়া বালকসেনার দল এবং মেয়েদের নিয়ে তৈরী ঝান্সিবাহিনীও গঠিত হল ইতোমধ্যে।

১৭ই অক্টোবর ১৯৪৩। ফিলিপাইনের স্বাধীনতা-উৎসবে তিনি বক্তৃতা দিলেন। স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের অস্তিত্ব ঘোষণার সময় এল এবার। জুন মাসেই তোজোর সম্মতি পাওয়া গেলেও সিঙ্গাপুরে হিকারি-কিকানের সঙ্গে দীর্ঘকাল টানাহেঁচড়ায় দেরি হয়ে যায়। ২০শে অক্টোবর রাত্রি প্রভাত হবার আগেই প্রস্তুত হয় অস্থায়ী আজাদহিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্র—সুভাষচন্দ্রের নিজের হাতে যার খসড়ার জন্ম। আজাদহিন্দ সরকারের প্রচারমন্ত্রী শ্রীযুক্ত আয়ারের বর্ণনায় সেই রোমাঞ্চকর রাত্রি জীবন্ত হয়ে আছে: 'একগোছা সাদা কাগজে পেন্সিল না তুলে, না কেটে একবারও, লিখে চললেন সারারাত একা সুভাষচন্দ্র। এক পাতা শেষ হয় আর চলে যায় টাইপ হতে। টাইপ হবার পরও নড়চড় হয় না একটি কমা-সেমিকোলনেরও। যখন লেখা শেষ হয় তখন রাত্রিও শেষ হয় প্রায়। রাত জাগার নিদর্শন অসংখ্য কফির কাপের গোল দাগ টেবিলময় লেগে রয়েছে তখনও।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ১৯৪৩-এর ২১শে অক্টোবর। ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকারের ঘোষণার গৌরবে বিভূষিত সেই চরম উত্তেজনার পরম উদ্দীপনার অবিস্মরণীয় একটি দিন। আজাদহিন্দ সরকারের জন্ম হল সেই তারিখে। সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে সুভাষচন্দ্র বললেন: অস্থায়ী সরকার গঠনের পেছনে ভারতের অসামরিক জনসাধারণের সমর্থন তো আছেই, এমন কি বৃটেনের অধীনে ভারতের সৈন্যদেরও আছে সহানুভূতি। বিপ্লব শুরু হবে ভারতের মাটিতে আমাদের ফৌজের পদার্পণে, যার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের সুনিশ্চিত অবসান।

বৈকালিক অধিবেশনে সুভাষবিরোধী ইয়ামামোতোর উপস্থিতিতে পড়া হল ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র। জাতীয় পতাকায় আপাদমস্তক আচ্ছাদিত সেই ভবনে সেদিন তিলধারণের স্থান নেই। নেতাজী সুভাষ এবং তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যরা দণ্ডায়মান সৈনিকের পোশাকে। মাইক্রোফোনের মুখে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। প্রাচ্যের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতাদের সম্ভাষণ এবং আজাদহিন্দ ফৌজের 'গার্ড-অফ-অনার' সমাপ্ত হবার পর

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সুভাষচন্দ্র পড়লেন, সুভাষচন্দ্র নয়, নেতাজী সুভাষ :

'ঈশ্বরের নামে আমি এই পবিত্র শপথ নিচ্ছি। ভারতবর্ষকে এবং আমার দেশের আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ মানুষকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার স্বাধীনতাসংগ্রামে, আমি সুভাষচন্দ্র বসু, আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত পুণ্যকর্তব্যে নিরত থাকব।

আমি চিরদিন এই ভারতের দীনসেবক হয়ে থাকব এবং আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ ভাইবোনদের কল্যাণ-সাধন হবে আমার জীবনের স্বপ্ন, সাধনা।

স্বাধীনতালাভের পরেও স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামেও শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করবার অঙ্গীকার করলাম।'

মন্ত্রীসভার সদস্যেরাও তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করল একে একে। 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা' জাতীয় সঙ্গীত আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সবাই। নেতাজী সুভাষ, ইয়ামামোতো, মন্ত্রীসভার সদস্যরা অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ান। হর্ষধ্বনি, করতালি আর শ্লোগান ওঠে মুহুর্মুহু।

কল্পনায় ফিরে যাই সেই ঐতিহাসিক দিনটিতে। সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে। ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নে আর সংগ্রামের প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ সেই রক্তচিহ্নিত দিনটির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াই একবার। কল্পনায় ভেসে ওঠে কল্পনাতীত এক বাস্তব। দেশ থেকে দূরে দেশকে তীব্রভাবে ভালবাসার কারণে জীবনে বহুবার নিপীড়িত এক বিদ্রোহী বীর; দেশকে স্বাধীন করবার সংগ্রামে দেশত্যাগী এক মহানায়ক; ভারতের যে স্বাধীনতা পলাশীর প্রান্তরে নিমজ্জিত, মণিপুরের প্রান্তে তাকে আবার তুলে আনার প্রতিজ্ঞায় শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাওয়ার সংকল্পে স্থির, দিল্লির লালকেল্লায় ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড্ডীন করবার উন্মাদনায় অস্থির নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা সত্য হবার সময় যখন সন্নিকট তখন ধারণায় আনবার চেষ্টা করি তাঁর মনের অবস্থা।

শেষ হয়ে গেছে ক্যাথে সিনেমায় ঘোষণানুষ্ঠান। উৎসব-অন্তে ফিরে গেছে যে যার; মন্ত্রীদেরও বিদায় দিয়েছেন নেতাজী একে একে। তারপর গিয়ে দাঁড়িয়েছেন যাঁর ছবির সামনে তাঁর নাম দেশবন্ধু, যাঁর ছবি কোনও ভারতীয়ের মন থেকে কোনওদিন মোছবার নয়। দেশের স্বাধীনতার সূর্যোদয় হবার ব্রাহ্মমুহূর্ত যখন অন্ধকারতম রাত্রির অবসানে আসন্নপ্রায় তখন দেশের এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব দেশবন্ধু নেই পাশে। গভীর আনন্দের মধ্যেও তাই সুগভীর বেদনার দুফোঁটা জল নেতাজীর চোখে সেদিন কি টলমল না করে পেরেছে ?

ফাঁসীর মঞ্চে যারা জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে; নির্জন কারার অন্ধকারে করে গেছে রাত্রির তপস্যা— সেদিন সিঙ্গাপুরে ভারতের অস্থায়ী আজাদহিন্দ সরকার ঘোষিত হবার মুহূর্তে তারা এসে দাঁড়িয়েছে নেতাজীর অলক্ষ্যে। আর যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজের সন্তানকে স্বাধীনতা সংগ্রামের যূপকাষ্ঠে দিয়েছে বলি, যাদের নাম হারিয়ে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে, যারা দিয়েছে সব, পায় নি কিছু, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যারা অজ্ঞাত অখ্যাত শহীদ—তাদের কথাও মনে পড়েছে নিশ্চয়ই সেদিন আজাদহিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের; মনের স্মৃতিপটে নিশ্চয়ই উদিত হয়েছে তাদের রক্তাক্ত চিত্র।

আর মনে পড়েছে নিশ্চয়ই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডীযাত্রার সেই অবিস্মরণীয় ছবি। যুক্তকরে প্রণাম জানিয়ে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা করেছেন আশীর্বাদ।

অতীত ভারতের একটি দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটছে সেদিন অনুমান করি কল্পনায়, ভারত থেকে দূরে সিঙ্গাপুরের সেই ক্যাথে প্রেক্ষাগৃহে। গান্ধীজীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে নেতাজী। জাতির জনকের প্রতিকৃতির সম্মুখে দণ্ডায়মান বিদ্রোহী সন্তান। দ্রোণের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে একলব্য।

দ্রোণের পায়ে একলব্য গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন তাঁর

গুরুর ইচ্ছায় দক্ষিণপাণির অংশ ; জাতির জনকের করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সুভাষ স্বেচ্ছায় তাঁর অর্জিত অধিকার।

২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুর সিনেমা হলে আজাদহিন্দ সরকার ঘোষিত হয়। ৭-১৩ সামরিক প্রতিনিধি, ১৬-২১ পরামর্শদাতা, ২২ জন মন্ত্রী। সুভাষচন্দ্রের পরিচয় হল—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী, আজাদহিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাপতি। আজাদহিন্দ সরকারকে জাপান, ব্রহ্মদেশ, ক্রোটিয়া, জার্মেণী, ইতালি, ফিলিপিন, নানকিং, মাঞ্চুকুও এবং শ্যাম স্বীকৃতি দিল।

বৃহত্তর এশিয়া সম্মেলনে তোজো সহানুভূতির প্রমাণ-স্বরূপ আন্দামান এবং নিকোবর দান করলেন আজাদহিন্দ সরকারকে। নেতাজী দ্বীপ দুটির নতুন নামকরণ করলেন শহীদ এবং স্বরাজ দ্বীপ। যুদ্ধের চুক্তি হল এই যে আজাদহিন্দ বাহিনী জাপসৈন্যের সঙ্গে সমানে লড়বে। কম্যাণ্ড থাকবে জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষের হাতে।

বর্মার ভিতর দিয়ে ইম্ফল আক্রমণে জাপানীরা প্রস্তুত হল ১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে। জাপান প্রস্তাব করল যে সুভাষ-রেজিমেণ্টকে টুকরো টুকরো করে জুড়ে দেওয়া হোক জাপানী দলের সঙ্গে। নেতাজী বললেন, না। The first drop of blood to be shed on Indian soil should be that of a member of the I. N. A.! ৩রা ফেব্রুয়ারি সুভাষ-রেজিমেণ্ট ট্রেনে উঠল, নেতাজীর চোখে টলমল করে দু ফোঁটা আনন্দের অশ্রুজল।

আরাকান থেকে সুসংবাদ আসে। আজাদহিন্দ ফৌজের মেজর এল. এস. মিশ্রের পর্যবেক্ষণের গুণে মাও ভ্যালিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে ব্রিটিশ-বাহিনী। ১৩ই মার্চ আজাদহিন্দ ও জাপানী ফৌজ সম্মিলিতভাবে প্রবেশ করল ভারতের মাটিতে প্রথম। তোজো দুদিন বাদে জাপানী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করলেন: অধিকৃত এলাকা শাসন করবে আজাদহিন্দ অস্থায়ী সরকার। ৭ই এপ্রিল মণিপুর যুদ্ধের চরম মুহূর্তে সুভাষের ধারণা তিন সপ্তাহের মধ্যে ইম্ফল জয় হবে। এবং সেখান থেকেই আরম্ভ হবে আজাদহিন্দ ফৌজের ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম। এইদিনে তাঁর সৈন্য ভারতের ভূমি স্পর্শ করেছে। নেতাজীর জীবনের অবিস্মরণীয় সেই একদিন।

নেতাজী তখনও মেমিওতে।

মণিপুরের যুদ্ধের রসদ-সংগ্রহের আয়োজন-সভায় নেতাজী নগদে ও গয়নায় ৫০ লক্ষ টাকা তোলেন।

মাতাগুচি ইম্ফল কোহিমা রাস্তা ভেঙে দেবার অর্ডার দিলে, আপত্তি করলেন নেতাজী। মাতাগুচি শুনলেন না; বললেন: ইম্ফলকে লেকে পরিণত করে মনের আনন্দে মাছ ধরব। ইম্ফল-কোহিমা; ইম্ফল-শিলচর দুটি রাস্তাই কেটে ইংরেজদের পালাবার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হল নেতাজীর সুস্পষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও। এই নির্দেশ অমান্য করে মাতাগুচি কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনলেন তা দেখবার জন্যে রইলেন কেবল সুভাষ; মাতাগুচি তার অনেক আগেই মণিপুরের জলে মাছের বদলে কুমীর দেখে সরে পড়েছেন। ২৬শে জুলাই তোজো পদত্যাগ করেন এবং নেতাজী মণিপুর-সংগ্রামের ব্যর্থতা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন।

১৯৪৪-এর শেষ তিন মাসে জাপানীরা পিছু হটেছিল ইরাবতীর তীর থেকে। আজাদহিন্দ ফৌজ এখান থেকেই আরম্ভ করে মণিপুরে দ্বিতীয় অভিযান। আরাকান থেকে খবর আসে, ব্রিটিশ সৈন্য মান্দালয়ের ৫০ মাইলের মধ্যে এসে গেছে। তবুও অদম্য নেতাজীর অনুপ্রেরণায় অগ্রসর হলেন মেজর ধীলন আজাদহিন্দ ফৌজ নিয়ে মণিপুরের দিকে। ইরাবতী পার হয়ে গেল আজাদহিন্দ বাহিনী সংঘর্ষ সত্ত্বেও। কিন্তু লেফ্‌টেন্যাণ্ট হরিরাম এবং অন্যান্যদের বিশ্বাসঘাতকতায় বিচলিত নেতাজী মাউণ্ট পোপা ফ্রণ্টে পাঠালেন শাহনওয়াজকে। শাহনওয়াজ দেখলেন পোপার ঘাঁটিতে ঠিক আছেন

সাইগল; কিন্তু নিয়াঞ্জুতে ধীলন অন্তবিধের মধ্যে আছেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারি শাহনওয়াজের সরজমিন তদন্তের রিপোর্ট পেয়ে তৎক্ষণাৎ মিচিলা থেকে পোপা যেতে চাইলেন নেতাজী। শাহনওয়াজরা বারণ করে, নিজের জীবন বিপন্ন করার অধিকার নেই প্রিয় নেতার। নেতাজী উত্তর দিলেন: আমাকে মারবার মত বোমা ইংরেজ আজও তৈরি করতে পারে নি। শ্রীঅরবিন্দকে আলিপুরের বোমার মামলা চলার সময়ে গণৎকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল: তোমাকে ধরে রাখতে পারে এমন কারাগার আজও তৈরি হয় নি। সে কথা সত্য প্রমাণিত হয়। সুভাষের ভবিষ্যদ্বাণী নেতাজীর সম্পর্কেও মিথ্যে হবার নয়।

১৩ই মে পেগুতে শাহনওয়াজ এবং ধীলন আত্মসমর্পণ করলেন তাউঙজীনের জীবন-মরণ যুদ্ধে অপূর্ব শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেবার পর। ২০শে এপ্রিল জাপানীদের রেঙ্গুন থেকে সরে যাওয়ার দুঃসংবাদ আসে। ২৩শে এপ্রিল তারা জানতে চায় নেতাজী অতঃপর কি করবেন। জাপানীরা তাঁর জন্যে গাড়ি দিতে চাইলে বলেছিলেন: আমি বাম নই, নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্যে চাই না নিরাপত্তা। মে মাসে ব্রহ্মদেশে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের শেষ হয়। ১৩ই আগস্ট সংবাদ পাওয়া যায় জাপানের আত্মসমর্পণ-প্রস্তুতির দুঃসংবাদ। ১৪ই আগস্ট নেতাজী একটি দাঁত তোলান। তখন তিনি সিঙ্গাপুরে।

সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাঙ্কক যাত্রার জন্যে ১৬ই আগস্ট সকাল সাড়ে নটায় প্লেনে ওঠেন নেতাজী। প্লেনে ওঠবার আগে হাত নেড়ে বিদায় অভিবাদনে বলেন: আবার দেখা হবে। জয়হিন্দ!

আমরা জানি আবার দেখা হবে, সত্য হবে তোমার বিদায়বাণী। আমরা জানি তুমি আসবে আমাদের জীবনে, আমাদের যৌবনে। আমাদের রক্তে, আমাদের অস্থিমেদমজ্জায়। তোমার জন্মভূমিতে ফিরে আসবে তুমি। দ্বিধাবিভক্ত দুর্ভাগ্যপীড়িত এই দেশে তোমার শঙ্খ আজ ধুলায় পড়ে। যে শঙ্খের মুখে তোমার একটি ফুৎকারে এসে দাঁড়িয়েছিল মিলিত হিন্দু মুসলমানের আজাদহিন্দ ফৌজ। সেই অপরাজিত জীবনের শঙ্খে তোমার যৌবনের ফুৎকার স্বাধীন ভারতের আকাশ থেকে সমস্যার কৃষ্ণকান্ত মেঘ নিমেষে দেবে দূর করে। পৌনে দু শতাব্দীর পরাধীনতার গ্লানি মুহূর্তে নিঃশেষ হবে। শেষ হবে অবসন্নতার অমারাত্রি। মৃত্যুহীন আদর্শের অপূর্ব আলোকে ভরে যাবে এই পূর্বদিগন্ত। অস্তাচলের অন্ধকারে বিলীয়মান সূর্য যেমন রাত্রির তিমির ছিন্ন করে দেখা দেয় দিগন্তে আবার, তেমনই আবার দেখা দেবে তুমি দ্বিগুণতর দীপ্তিতে এই ভূমিতেই। হয়তো অন্য কোনও ভূমিকায়, হয়তো আর কোনও দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনের দুশ্চর তপস্যায় জ্যোতি-দীপ্ত তোমার প্রসন্নাননে সেদিন প্রমূর্ত হবে কবির ঘোষণা: মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সকলের জীবনে জীবন পাবে তুমি; জয়যুক্ত হবে সেদিন তোমার বাণী: এক জাতি! একপ্রাণ! একতা!

এই পৃথিবীতে যতবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, সপ্তরথীর বিরুদ্ধে অভিমন্যুর, মৃত্যুর উত্তরে জীবনের প্রতিবাদ হবে জাগ্রতকণ্ঠ, ততবার ধ্বনিত হবে তাদের কণ্ঠে তোমার কণ্ঠস্বর। মৃত্যুহীন আদর্শের জন্যে মহাপ্রাণ বলি দেবে যতবার মানুষ, ততবার তাদের মৃত্যুতে ঘোষিত হবে তোমারই মৃত্যুহীন জীবনের জয়বার্তা।

স্বাধীন ভারতের পথে অগ্রগামী নায়ক, কানে আসে এখনও তোমার কণ্ঠনিঃসৃত অমর আহ্বান: চল দিল্লি।

তোমার সেই আহ্বান আমরা ভুলি নি। বাঙালীর হৃদয়ের হে মুকুটহীন রাজা! তুমি বলেছিলে, নতুন দিল্লিতে যেদিন উড্ডীন হবে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা, লালকেল্লায় যেদিন কদম কদম বাঢ়ায়ে যা-র খুশীর গান গেয়ে যাবে আজাদহিন্দ ফৌজ সেদিন শেষ হবে এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম।

নতুন দিল্লির আকাশে আজ উড্ডীন ভারতের জয়কেতন। তার বাতাসে প্রতিধ্বনিত আজ তোমার ঐক্যধ্বনি: জয়হিন্দ। তবুও শেষ হয় নি সংগ্রাম। বাইরের শত্রু নিধন হয়েছে। ঘরের শত্রু ভীষণমূর্তি ধারণ করেছে। সেই বিভীষণের বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত তোমার সংগ্রাম নয় সমাপ্ত। নতুন করে সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে আজ স্বাধীন ভারতে। দুরন্ত জীবনসংগ্রাম। সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে গর্বান্ধ নিষ্ঠুর কালো-ব্যবসায়ে উন্মত্ত; সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে যারা দেশে দেশে প্রদেশে প্রদেশে সাম্প্রদায়িকতার জোগাচ্ছে ইন্ধন; সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে যারা শিশুর খাদ্যে, রোগীর ঔষধে ভেজালের কালো-কারবারের টাকার জোরে আরও কালো করে তুলছে বিচারের প্রহসন। সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে যারা অন্যায় করছে আর যারা অন্যায় সহ্য করছে।

সবচেয়ে বড় সংগ্রাম তাদের সঙ্গে যারা ঘরের শত্রু বিভীষণ, ডেকে নিয়ে আসছে বিদেশী আক্রমণকারীকে। বিদেশী জারজ পিতার আদেশে মাতৃহত্যায় উদ্যত— পরশুরামের কুঠারের সঙ্গে আজ কঠোর সংগ্রাম।

লুব্ধ যারা, ক্ষুব্ধ যারা, মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা আত্মার দৃষ্টিহারা সেই শ্মশান-কুক্কুরদের বীভৎস হানাহানিতে মানুষের দেবতাকে ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে, সংগ্রাম তারই বিরুদ্ধে আজ সর্বাগ্রে। এরাই চাইছে স্বাধীন ভারতকে কবর দিতে আবার; নাট্যের কবররূপে বাকী রাখতে শুধু ভস্মরাশি, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি। তারই বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম আজ। সেই সংগ্রামে হে মহাতাপস তোমারই মহৎ জীবনের অগ্নিবাণী উচ্চারিত: 'পরাজয় আমাকে নিরাশ করে না। আমি যোদ্ধা, আশা আমার চিরসঙ্গী।'

দিল্লি দূর অস্ত্। দিল্লি অনেক দূর। আজও।

দিল্লি অনেক দূর আজও তাদের কাছ থেকে যে অসংখ্য অগণন মানুষের জন্মে শত শহীদের রক্তের স্রোতে, সহস্র জননীর অশ্রুধারায় দিল্লিতে উড্ডীন আজ ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জয়পতাকা। দিল্লি অনেক দূর আজও সেই অন্নহারা আশ্রয়হারা মানুষদের হৃদয় থেকে যারা নিজের বাসভূমে আজ পরবাসীর মত শঙ্কিতচিত্তে জীবনের প্রহর গুনছে। দিল্লি অনেক দূর আজও তাদেরই কারণে যারা দুরতিক্রম্য বাধার মত দাঁড়িয়ে আছে প্রবঞ্চনার দুর্ভেদ্য প্রাচীরের আড়ালে।

দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে এই দেশ কেবল ভৌগোলিক দিক থেকে নয়। দ্বিখণ্ডিত ভারত বিভক্ত হয়েছে আবার। তার একদিকে রয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অসাধারণ, অন্যদিকে অসংখ্য অগণ্য অতি সাধারণ। একদিকে অতিরিক্ত প্রাচুর্য, আর একদিকে অতি রিক্ত অবস্থা। একদিকে কয়েকজনের অফুরন্ত বিলাসের চূড়ায় নিশ্চিন্তে বাস, অন্যদিকে দুবেলা দু-মুঠোর অভাবে অর্ধ-উপবাস। নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের শবের ওপরে সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ত উৎসব দ্বিখণ্ডিত ভারতকে খণ্ড খণ্ড করতে উদ্যত আজ।

স্বাধীন ভারতবর্ষে তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে। তাকে তুলে নাও আবার!

তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ কর।

আজকের এই ভারতবর্ষ যেদিন অতীতের ইতিহাসে পরিণত হবে সেই অনাগত কালের কানে রেখে গেলাম একটি অবিস্মরণীয় নাম; আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ মিলিত হিন্দু-মুসলমানের হয়ে বিনম্র বিমুগ্ধ চিত্তের একটি প্রণাম। এবং এই পরাধীন ভারতের শেষ পলাতক আর স্বাধীন ভারতের পথে অগ্রসর প্রথম পদাতিকের জীবন্ত সংগ্রামের ইতিবৃত্তের দিকে তাকিয়ে তাদের বিস্ময় বাধা মানবে না।

ঠাকুমার কোলে শুয়ে রূপকথা শোনবার দিন শেষ হয়ে যাবে সেদিন। ঠাকুমার কোলে শুয়ে সেদিন তারা শুনবে, হে বিজয়ী বীর, তোমারই জীবনের অপরূপ কথা।

ভবিষ্যতের উপন্যাস

অরবিন্দ পোদ্দার

আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি অভিভাষণে বলেছিলেন, "এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যেদিন সে (অর্থাৎ, বাংলা সাহিত্য) আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।" কথাটা তিনি আধুনিক বাংলা উপন্যাসের প্রসঙ্গেই বলেছিলেন ; ছত্রিশ বছর পর বাংলা উপন্যাস হাল-আমলে কি পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে, সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

রুশ-সাহিত্যকে (অতিসাম্প্রতিক সাহিত্যের কথা বলছি না, টলস্টয় পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর রুশ-উপন্যাসের যে ধারা, তার কথা বলা হচ্ছে) পশ্চাদপটে রেখে বাংলা উপন্যাসের আলোচনা আজও ধৃষ্টতা। বাঙালী কেন, অন্য কোন দেশের কোন ঔপন্যাসিকই টলস্টয়ের মত মহৎ নন ; তাঁর 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস্' গ্রন্থে মানুষের অন্তর্লোক ও বাহিরবিশ্বের, তার প্রাত্যহিক ঘরকন্নার সীমা ও সার্বভৌম সত্তার যে পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার সঙ্গে তুলনীয় অন্য কোন উপন্যাস পৃথিবীতে নেই। আবার, মানবাত্মার অতলস্পর্শী গভীরে ডস্টয়েভস্কি যেমন করে ডুব দিয়েছেন বিশ্বের অন্য কোন ঔপন্যাসিক তেমন গভীরতায় প্রবেশের অধিকার লাভ করেন নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এই বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ফরাসী ঔপন্যাসিক প্রুস্ত বিপর্যস্ত মানব-চৈতন্যের বিশ্লেষণে যে নৈপুণ্য ও সাফল্য অর্জন করেছেন সাহিত্যে তার তুলনাও একান্ত বিরল। সুতরাং, নিজের দেশের উপন্যাসের সাফল্যের কথা বিবেচনা করার আগে এই কীর্তিস্তম্ভগুলোর সম্মুখে আমাদের মাথা নত করে দাঁড়াতে হয় ; মনে সংশয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, ওই দিকপালদের পাশে আমরা কি, আমাদের রূপসৃষ্টির ঐশ্বর্যই বা কতটুকু !

আমরা প্রারম্ভে তাই এ কথা ঘোষণা করতে পারি, শরৎচন্দ্রের আশা চরিতার্থ হয় নি—অদূর ভবিষ্যতে চরিতার্থ হওয়ার সম্ভাবনাও অল্প। বাংলা উপন্যাসের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে কয়েক বছর আগে। সাহিত্যের বিশ্বমর্যাদা লাভ করার পক্ষে এই সময়টা খুব দীর্ঘ নয় ; আবার, আধুনিক জীবনপ্রবাহের দ্রুত রূপান্তরশীল সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্ত অল্পও নয়। এই কালের মধ্যে কোন উপন্যাসে যদি আমরা সমগ্র দেশের চিত্ত-সংবেদনার কলরোল শুনতে পেয়ে থাকি তো তাদের সংখ্যা যে অত্যন্ত অল্প, তা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়া, অন্যান্য উপন্যাস বলে আখ্যাত রচনা নিছক গল্প-বলা কাহিনীমাত্র। প্রশ্ন হতে পারে, উপন্যাসে গল্প কি অনিবার্য নয় ? নিশ্চিত। অবশ্যই স্বীকার্য, যে যে উপাদান আশ্রয় করে উপন্যাস আপনরূপে স্ব-মহিমায় গড়ে ওঠে, গল্প তার অন্যতম, কিন্তু একমাত্র নয়। পাঠকচিত্তে গল্পের যে আবেদন তা চিরন্তন, শাশ্বত ; কিন্তু, সে আবেদন মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তির নিকট, যা সময়ের অনুবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণ শুনে অথবা পাঠ করেই তৃপ্ত। অত্যন্ত প্রাজ্ঞজনের অন্তরেও সেই আদিকালের মানবশিশুটি আজও বেঁচে রয়েছে ; তার নিত্যকালের জিজ্ঞাসা, 'তারপর ?' 'আর তারপর ?' শরৎচন্দ্রের উপন্যাস যে সংখ্যাহীন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও রূপকারের অপটুত্ব সত্ত্বেও আজও পঠিত হয়, সমাদৃতও হয়, তার বিশেষ বিশেষ কারণের মধ্যে এও একটি যে তা গল্পে সরস।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চিন্তা কর্ম ও ভাবনা অত্যধিক কাল-সচেতন, কালের বোধে সীমিত। কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা ঘটে বা ঘটতে পারে, কি কথার
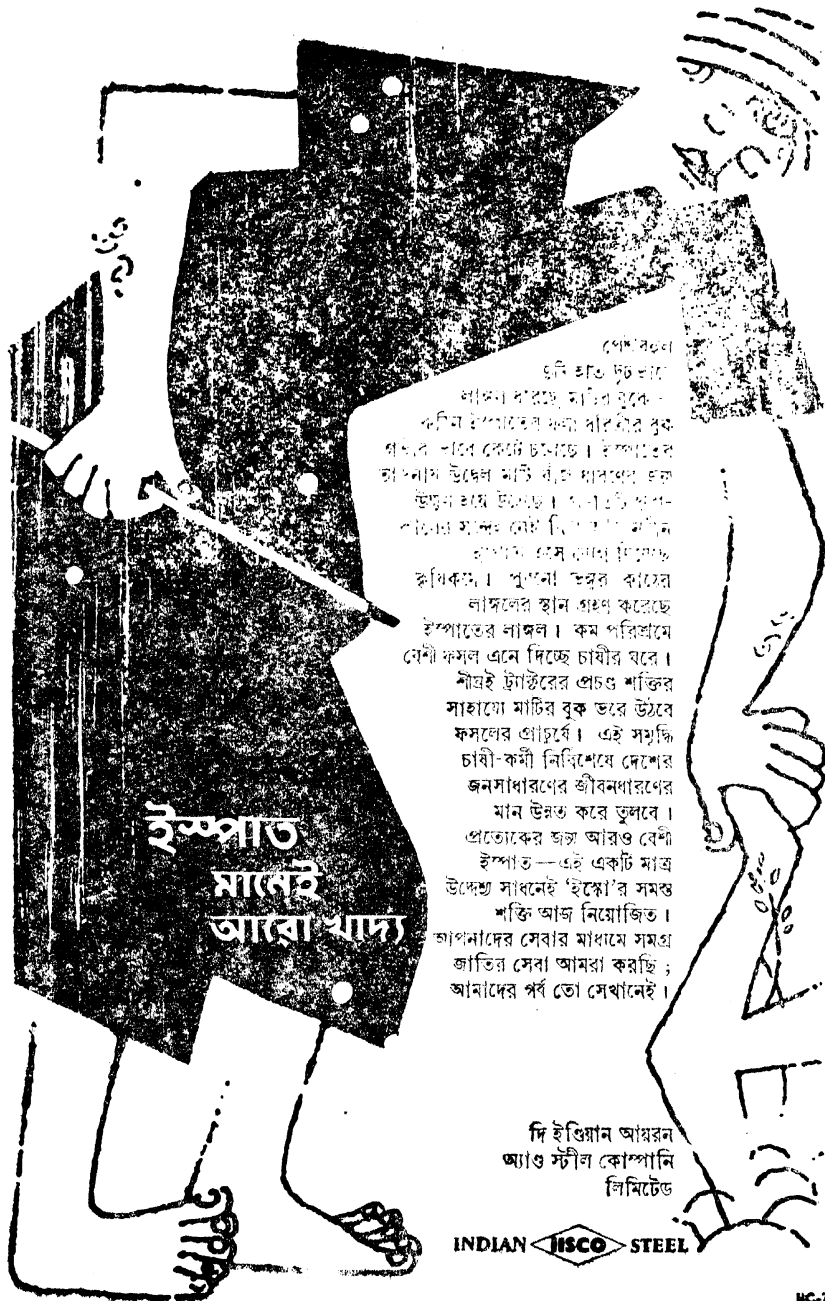
ইস্পাত মানেই আরো খাদ্য
কৃষিকাজে। পুরনো ভঙ্গুর কাঠের
লাঙ্গলের স্থান গ্রহণ করেছে
ইস্পাতের লাঙ্গল। কম পরিশ্রমে
বেশী ফসল এনে দিচ্ছে চাষীর ঘরে।
শীঘ্রই ট্রাক্টরের প্রচণ্ড শক্তির
সাহায্যে মাটির বুক ভরে উঠবে
ফসলের প্রাচুর্যে। এই সমৃদ্ধি
চাষী-কর্মী নির্বিশেষে দেশের
জনসাধারণের জীবনধারণের
মান উন্নত করে তুলবে।
প্রত্যেকের জন্য আরও বেশী
ইস্পাত—এই একটি মাত্র
উদ্দেশ্য সাধনেই 'ইস্কো'র সমস্ত
শক্তি আজ নিয়োজিত।
আপনাদের সেবার মাধ্যমে সমগ্র
জাতির সেবা আমরা করছি;
আমাদের গর্ব তো সেখানেই।
দি ইণ্ডিয়ান আয়রন
অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি
লিমিটেড
INDIAN IISCO STEEL
IIC-77 BEN

পর কি কথা আসে বা আসার সম্ভাবনা, তার একটি চিত্র, হয়তো বা অস্পষ্ট, আমাদের চৈতন্যে উদ্ভাসিত। সেজন্য আমাদের বেশীর ভাগ কথায়, বেশীর ভাগ কর্মে সময়ের পারম্পর্য লক্ষণীয়। কিন্তু আমাদের দিনলিপিতে সময় ছাড়াও অন্য অনেক উপাদান আছে যা মানবসভ্যতার ঐতিহাসিক বিবর্তনের জটিলতা, হৃদয়াবেগের বিচিত্র প্রক্ষেপ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে জন্মলাভ করেছে। তাদের একটিকে আমরা বলতে পারি মূল্যের চেতনা। অবশ্য কোন্ অভিজ্ঞতা মূল্যবান, কি হলে একটি অনুভব ও তার অভিব্যক্তি মূল্যবান হয়ে ওঠে, মানুষে মানুষে মূল্যের বোধ এক কি স্বতন্ত্র, এসব জিজ্ঞাসায় মতভেদ স্বাভাবিক; কিন্তু সত্য কথা, আমরা বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা বা অনুভব বা আচরণকে মূল্য দিয়ে থাকি, মূল্য না দিলে আমাদের চলে না, এবং এই মূল্যের চেতনাই মানবেতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে, তার সংস্কৃতিকে করেছে বেগবান। সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে দুটি স্বতন্ত্র অথচ সৃষ্টিশীল ঐক্যের পরিমাপে ওজন করা চলে; একদিকে তা কাল-শাসিত, অন্যদিকে অনুভবের তীব্রতায় অর্থাৎ মূল্যের বোধে উজ্জ্বল। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক; সাহিত্যের পাতায় এ ধরনের উক্তি প্রায়শঃই চোখে পড়ে, 'মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখিয়েছিলাম, কিন্তু কী ভালই লাগল, এই রকমের উচ্ছ্বাসে সময় এবং মূল্য দুয়েরই স্বাক্ষর বর্তমান।

সার্থক উপন্যাসকে, তেমনি গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের চেতনায় প্রোজ্জ্বল হতে হয়। এই মূল্যের প্রশ্নের সঙ্গে অনেক জটিল প্রশ্ন জড়িত; তার আলোচনায় অগ্রসর হব না। শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিধিতে মূল্যের চেতনা ও পরিমাপ একরূপ; কিন্তু ব্যক্তিও তার বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে অন্বয় অথবা বিরোধের সম্পর্কে সম্পর্কিত। সেই বৃহত্তর সত্তা তার পরিবার, সমাজ, দেশ অথবা বিশ্ব। এই বিশ্বে মূল্যের বোধ ও পরিমাপ আর এক রূপ। সত্তার এই বৃহত্তর স্বরূপে, জাগতিক ও মানবিক সম্পর্কের সমগ্রতায় উপন্যাস যখন মানুষকে আবিষ্কার করে, তখনই তা অতলস্পর্শী ঐশ্বর্যের অধিকার লাভ করে। এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রেখেই সম্ভবতঃ কোন কোন সমালোচক উপন্যাসকে মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। উপন্যাস মহাকাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় তখনই যখন বিরোধের মধ্যেও জীবনের সমগ্রতাকে সে তুলে ধরে, খণ্ডিতের মধ্যেও অস্তিত্বের অখণ্ডতার স্বীকৃতি থাকে; এবং যখন জীবনের অবাঞ্ছিত দুর্দৈবগুলোকে অবান্তর প্রেরণার অতিব্যাকুলতায় শুধু ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে নয় দেশের সমগ্র জনসত্তার হৃদয়-কলরোলে উপস্থাপিত করা হয়, তখন সত্যসত্যই আমরা মহাকাব্যের অখণ্ড রস আস্বাদন করি। টলস্টয়ের 'ওয়র অ্যাণ্ড পীস্' বোধ করি এই অর্থেই মহাকাব্য।

বাংলা উপন্যাসে এই বৃহত্তর মহত্তর মূল্যচেতনার স্বাক্ষর বিরল; যদিও অন্য দিক থেকে 'মহাকাব্য' সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। সম্প্রতিকালে আয়তনে বিপুল উপন্যাস রচনার একটা অত্যন্ত-সচেতন প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে; দু একটি ইস্পাত নগরীকে কেন্দ্র করে একাধিক উপন্যাস রচিত হয়েছে। একটি গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ আমার হয়েছিল; দেখেছি, লেখক যতটা কলেবরসচেতন, ততটা রূপসচেতন নয়। আয়তনে আর সব উপন্যাসকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য যতটা দৃঢ়সঙ্কল্প, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্যের তাঁর ততখানিই অভাব। 'মহাকাব্য' তো যুগযুগান্তরের প্রবাহিত জীবনধারার আবর্ত থেকে গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে। সেই আবর্তকে ইতিহাসের আন্তর বেদনার সমগ্রতায় উপলব্ধি করা, তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া, বোধের দীপ্তিতে তাকে প্রকাশের বাণী দেওয়ার জন্য যে মনীষা, মননশীলতা, সংযম ও ধৈর্য অত্যাবশ্যক—কোন বাংলা মহাকাব্যিক উপন্যাসপ্রচেষ্টায় তার কোন পরিচয় নেই। ব্যর্থতা তাই অনিবার্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, এই ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও উপন্যাস ব্যাপ্তি অর্জন করেছে—এ কথা অবশ্য স্বীকার্য।

সার্থক, অথবা মূল্যায়নের মান নীচু করে বলা যায় মোটামুটি ভাল উপন্যাসে কোন না কোন ভাবে মূল্যবোধের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত রচনায়ই এর স্বাক্ষর মিলবে; সে স্বাক্ষর অস্বচ্ছ হোক, রক্ষণশীল হোক অথবা সনাতন হিন্দু আচার-সম্মতই হোক—মূল্যের চেতনা তাঁর অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীর সামাজিক, বা ব্যক্তিক আচরণে ও বোধে অবশ্য-লক্ষণীয়। অবশ্য বলা যায়, এই মূল্যচেতনা যদিচ স্বতঃস্ফূর্ত এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রগাঢ়, তথাপি তা ব্যক্তিক সীমায় সর্বাহতরূপে সীমিত। সেখানে ব্যক্তির বৃহত্তর সত্তার পরিচয় যেমন অনুপস্থিত, তেমনি বৃহত্তর শ্রেয়সের বা মূল্যের বোধও অত্যন্ত অস্পষ্ট। দুঃখের বিষয়, মূল্যের এই সনাতন সংকীর্ণ বোধও একশ্রেণীর আধুনিক বাংলা উপন্যাসে দেখা যায় না; বিশেষতঃ, যে সব উপন্যাস 'পোশাকী শুচিতার' অন্তরালের সংবাদ পরিবেশন করায় আগ্রহশীল। সেখানে অবচেতন মনের ক্ষুধার পীড়নে মানুষের মানবত্ব বিনষ্ট, সুতরাং, তার পশু-সত্তাকে আলোয় উচ্ছ্বসিত করার প্রতি উপন্যাসকারের নজর অধিক। কিন্তু, এক্ষেত্রেও, মানব-চৈতন্য বিশ্লেষণে ফ্রয়েডের যে নৈপুণ্য তার আভাসমাত্র মেলে; তাই এদের রস অম্লরস। অপরিণত অক্ষম রূপকারদের রচনার বিচার বাদ দিলাম, কিন্তু 'বারো ঘর এক উঠোন'-এর মত অত্যন্ত নিপুণ রূপকর্মও শুধুমাত্র মানবিক মূল্যবোধের অভাবে কিভাবে অবহেলায় ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে তা আমাকে মর্মান্তিক পীড়িত করেছে। পক্ষান্তরে, দীপক চৌধুরীর কয়েকখানি উপন্যাসে মানবিক বোধ, সুস্থির মূল্যের চেতনা ও একটি ঐতিহাসিক কালের জীবনসাধনার সমগ্রতাকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। তাঁর রচনা প্রজ্ঞার দীপ্তিতে সপ্রতিভ, যেমন সপ্রতিভ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের রচনা। বাংলা উপন্যাসে মূল্যচেতনার এই বলিষ্ঠ আবির্ভাবকে, শিল্পবিচারে ত্রুটিপূর্ণ হলেও, আমি ইতিপূর্বে এক আলোচনায় উপন্যাসের পক্ষে শুভচিহ্ন বলে স্বাগত জানিয়েছিলাম। শুধু পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থগুলিই নয়, বাংলা উপন্যাসের সামগ্রিক পরিচয় গ্রহণ করলে এই আশাই মনকে আনন্দিত করে যে, উপন্যাস দীর্ঘকালের অক্ষমতার আবরণ ভেদ করে সূর্যালোকে প্রবেশ করতে চলেছে।

বলা বাহুল্য, মননশীলতার মানদণ্ডে আধুনিক কালের উপন্যাস ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার উপন্যাস থেকে বহুগুণে দক্ষ; এই দক্ষতা একদিকে এনেছে সূক্ষ্ম কারুকারিতা, অন্যদিকে তাতে পৌরুষের ঋজুতাও যে কিছুটা না এসেছে তা নয়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য' সিরিজের উপন্যাসগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; শুধু তা-ই বা কেন, এদের থেকে অনেক নীরস উপন্যাসেও গভীর মননশীলতার স্বাক্ষর মেলে।

শরৎচন্দ্র উপন্যাসের পাতায় পাতায় নাটকীয় সংঘাত ও পরিবেশ রচনায় অত্যন্ত কুশলী ছিলেন। তাঁর জীবনের বোধে ও চরিত্রের উপলব্ধিতে হৃদয়ের স্থান মুখ্য বলে তাঁর নারীপুরুষ উচ্ছ্বাসে ভঙ্গুর। "বলিয়া ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল," "ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল," "বলিতে বলিতে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল," ইত্যাদি ধরনের বিবৃতি সর্বত্র ছড়ানো। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে হৃদয়-সংঘাত নেই বলি নে, কিন্তু প্রতিটি কথা বা কর্মই সংঘাত এবং উচ্ছ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে না; শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অবশ্যম্ভাবীরূপে করে। এটা নিঃসন্দেহে দুর্বলতার লক্ষণ, শক্তির লক্ষণ নয়। সেজন্য রাসবিহারী এবং কতকাংশে আশুবাবু ও বিপ্রদাস ছাড়া সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে বলিষ্ঠ পুরুষ-চরিত্র আছে কিনা সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। এমন কি, গৃহদাহের সুরেশও আপন শক্তির চেতনায় আত্মসমাহিত নয়। অন্যান্যরা হৃদয়বৃত্তির অতিশয়তায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে কোমল। তাই, সময়ের অনুবর্তনে সংঘটিত ঘটনাবলী ও আকস্মিকের সম্ভাবনা পাঠককে ধরে রাখলেও মন ভরে ওঠে না; অসতর্ক অনিপুণ রূপকর্মের অপূর্ণতায় মন ক্ষুব্ধ হয়।

কিন্তু আধুনিক কালের অক্ষম শিল্পীও কস্মিনকালে পূর্ব-কথিত দুর্বলতার পরিচয় দেবেন না। তাঁর রূপসৃষ্টি আরও বেশী সচেতন ও বিশ্লেষণপ্রয়াসী। তেমনি, আধুনিককালের কোন সার্থক ঔপন্যাসিকই কাহিনীর ধারা প্রতিহত করে কোন চরিত্র সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে বসবেন না। কোন চরিত্রের শঠতা অথবা সততা অথবা পৌরুষ প্রতিপন্ন করা যদি কাম্য হয়ে থাকে, তবে ঔপন্যাসিকের রায়েই তা সিদ্ধ হবে না, যদি না কাহিনীর বিবর্তনের মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওই সত্য প্রকাশিত হয়ে আসে। রূপকর্মের এই সমস্যা সম্পর্কে আধুনিক উপন্যাসকারদের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর; পূর্বকালে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও এই সজাগ দৃষ্টির অভাব ছিল বলে লেখককে একটি-দুটি বিশেষণ ব্যবহার করে রায় দিতে হত। আজ তা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ রূপসৃষ্টির আলোচনায় বলেছিলেন, "সে (আধুনিকতা) বললে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজ্ঞতা; তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে, অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্ম-ঘোষণাকে।...কেবল জোরের সঙ্গে বলতে চায় 'আমি দ্রষ্টব্য'। তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাবভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলনবিশি দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা। এই সত্য ধর্মনৈতিক নয়, ব্যবহারনৈতিক নয়, ভাবব্যঞ্জক নয়, এ সত্য সৃষ্টিগত। অর্থাৎ সে হয়ে উঠেছে বলেই তাকে স্বীকার করতে হয়।" আত্মগত সৃষ্টিসত্যের নিয়মে উপন্যাসকে হয়ে ওঠার, গড়ে তোলার, কর্মের প্রতিই আধুনিক উপন্যাসকার মনোযোগী।

বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বস্তুবোধ ও রুচির অভিব্যক্তি অত্যন্ত স্থূল; তা ছাড়া সাহিত্যের পাঠক-সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে। কিন্তু অধিকাংশ পাঠক যেমন কোন স্থির মূল্যবোধে আশ্রয়শীল নন, তেমনি মননশীলতায় উজ্জ্বল রূপসৃষ্টির সমাদর করতেও তাঁদের মন অভ্যস্ত হয় নি। তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য ইদানীংকালে একপ্রকার রচনার আবির্ভাব হয়েছে, যা যুগপৎ ভ্রমণকাহিনী ও গল্প, বা ভ্রমণ ও উপন্যাস। গভীর কোন সত্যের আলোকে আলোকিত হওয়া বোধ করি এদের উদ্দেশ্য নয়; তাই এদের চিত্তজয়ী কোন আবেদন আছে বলে মনে হয় না। এতে যেমন না থাকে উপন্যাসের পরিব্যাপ্ত স্বাদ, তেমনি থাকে না ভ্রমণ-কাহিনীর তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাসবোধের দীপ্তি—কেমন যেন কয়েক শো পাতায় ছড়ানো এক তরলতা। এই শ্রেণীর রচনার যেমন কালজয়ী কোন আবেদন নেই, তেমনি এর দ্রুত প্রসারে আতঙ্কিত হবারও কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। অবশ্য, উপন্যাস যে মুহূর্তে আত্মগ্লানির লজ্জা অতিক্রম করে সদরদরজা পার হয়ে বাইরের পথে পা বাড়িয়েছে, তখন সামগ্রিক চেষ্টায় তাকে বিশ্বমুখী করার প্রচেষ্টাই রূপস্রষ্টাদের নিকট কাম্য।

হাল-আমলে যে কোনও রচনাই যে শ্রেষ্ঠত্বের সার্টিফিকেট কপালে নিয়ে বাজারে উপস্থিত হচ্ছে, তার কারণ বোধ করি সাহিত্যের মূল্যায়নের সুস্থ মানদণ্ডের অভাব। অথচ, বাংলা সাহিত্য যখন সৃষ্টির প্রাচুর্যে অজস্র সম্ভাবনায় আপনাকে প্রায় নিঃশেষ করে দিচ্ছে, তখনই প্রয়োজন সুস্থির মানদণ্ডের। রূপের ক্ষেত্রে—সেটা সাহিত্যসৃষ্টিই হোক অথবা অন্য কোন চারুশিল্পই হোক মানুষের যা সৃষ্টি তা তার অন্যবিধ কর্মের তুলনায় কালজয়ী। তাই, রূপের একটি নিজস্ব, স্বতন্ত্র, আলোয় উচ্ছ্বসিত জগৎ কল্পনা করা সম্ভব, যেখানে যুগযুগান্তরের সমস্ত সার্থক সৃষ্টিই একই সঙ্গে অস্তিত্বশীল; সেই জগতে উন্নীত হয়ে বাংলা উপন্যাস রুশ উপন্যাসের সঙ্গে, অথবা ফরাসী উপন্যাসের সঙ্গে, সহ-অস্তিত্বশীল হতে পারবে কি না, সার্থক মূল্যায়নের ভিত্তিতে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। রূপকর্ম কি বৈশিষ্ট্যে আলোকিত হলে সেই সৌন্দর্য-বিশ্বে প্রবেশাধিকার লাভ করে, শিল্প-সমালোচনা সেই মানের নির্ণায়ক। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তদ্রূপ শিল্পমান আমাদের বাংলাদেশে আজও পর্যন্ত নির্ণীত হয়

প্রসাদ বনস্পতি
পূর্ব ভারতে এই
বনস্পতির
কাটতিই সবার ওপরে
গিন্নীদের আদরের জিনিস
ভারতের পূর্বাঞ্চলের ঘরে ঘরে গিন্নীরা 'প্রসাদ' পেলে অন্য কোনও বনস্পতিই চান না এবং তার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে।
প্রসাদ বনস্পতি পূর্ব ভারতের সবথেকে বড়ো এবং আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত কারখানায় সবচেয়ে বিশুদ্ধ উপাদানে তৈরী হয়। এখানে বনস্পতির উৎকর্ষতার মান সতর্কভাবে রক্ষা করা হয়। 'ট্যাগর-টপ' ঢাকনা থাকায় টিনগুলি ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক। আবার, খালি টিনটি ভাঁড়ারের জিনিসপত্র রাখবার কাজে আসবে।
Prasad
VANASPATI
MADE FROM
VEGETABLE OILS ONLY
প্রসাদ
CONTAINS
2 KILOS NETT
KUSUM PRODU
আজই একটিন কিনুন
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা
EVEREST KV.BIA BEN.
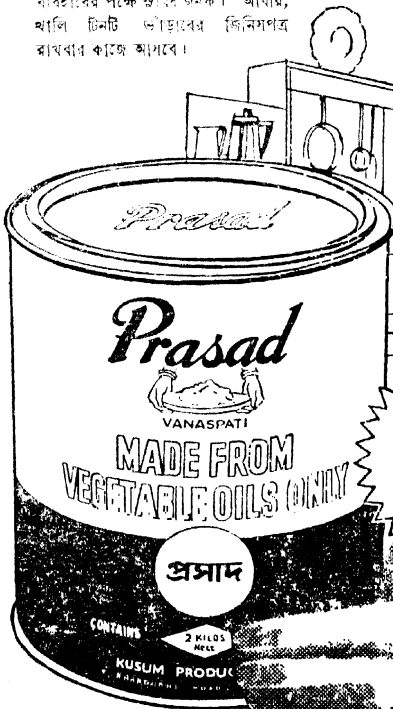
নি ; হয় নি যে তা যে-সব গ্রন্থের বাজার-কাটতি অত্যধিক অথবা যে-সব উপন্যাস সম্প্রতিকালে রবীন্দ্র-পুরস্কার বা অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছে তা থেকেই প্রমাণিত হবে।

অর্থাৎ, বাংলা উপন্যাসের বিদগ্ধ পাঠকসমাজ আজও অস্তিত্বহীন। বাংলা উপন্যাসকে যদি ইয়োরোপের সীমায় পৌছে দিতে হয়, তা হলে তার পূর্বসর্ত হিসেবে বিদগ্ধ পাঠকসমাজের আবির্ভাব সম্ভব করে তুলতে হবে। সেই পাঠকই উপন্যাসকে মহৎ সৃষ্টির পথ দেখাবে—যেখানে ব্যক্তিবিশেষ নয় মানুষ, ব্যক্তিক দুঃখবেদনা নয় মানবিক সুখদুঃখবেদনা।

উপন্যাস শুধুমাত্র গল্প বলা গদ্য নয়, মানব-জীবনের গদ্য। এই গদ্যের লক্ষ্য, মানবজীবনকে ইতিহাসের প্রেরণায় স্থানকালের সমগ্রতায় গ্রহণ করা, এবং গ্রহণ করে তাকে রসের প্রাণ দেওয়া। অন্য শিল্পকর্মের তুলনায় তার উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য হল, সে মানুষের অন্তরজীবনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যরূপে প্রকাশ করতে চায়, অন্তরকে বাইরের সম্পর্কে ধরতে চায়। এখানে ব্যক্তি তার অন্তরসম্পদ নিয়ে প্রকৃতি-পরিবেশ, সমাজ-পরিবেশ এবং সমাজেরই অন্তরাবরণ ভাব-পরিবেশে, সংস্থাপিত হয়, এবং বিচিত্র ঘাত-সংঘাতের ভিতর দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। সুতরাং, উপন্যাসের বস্তুবোধ, তার জগৎ, তার বিশ্ববোধ কাব্য-নাটক-সঙ্গীতের জগৎ থেকে পৃথক। অন্যান্য শিল্পের জীবনরূপায়ণ থেকে এর জীবনরূপায়ণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; তার বিস্তৃতি বিপুল কিন্তু গভীর।

বলা বাহুল্য, বাংলা উপন্যাস সেই বিপুলতা সেই গভীরতা আজও অর্জন করে নি, অর্জন করার সম্ভাবনা সবে দেখা দিয়েছে মাত্র ! প্রবন্ধের শুরুতেই শরৎচন্দ্রের যে উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে তিনি সব মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের সাহিত্যে জীবন্ত করে তোলার মধ্যে মহৎ সাহিত্যের আবির্ভাবের আশা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য দুঃখতাপসহা মানুষকে উপন্যাসের পাতায় স্থান দিলেই তা মহৎ হবে, এমন কোন কথা নেই, যদি না রূপকর্ম নিপুণ হয়। অন্য পক্ষে এও সত্য, উপন্যাসের প্রাঙ্গণ থেকে মানবিক আকৃতি, তীব্র 'অনুভূতি ও দুঃখবেদনার জ্বালা কোন মতেই বাদ দেওয়া চলে না। কালের বেদনা ও পরম্পরা আমাদের অনেকের নিকট দুঃসহ বলে মনে হতে পারে, তেমনি মানুষের প্রতিও আমাদের অপরিসীম ঘৃণার কারণ থাকতে পারে। কালকে জয় করার, তার উর্ধ্বে ওঠার, তাকে কার্যতঃ অস্বীকার করার চেষ্টা যদিও বা করা চলে, যেমন করে থাকেন যোগীরা বা যেমন করেছিলেন এ যুগের গোড়ার দিকে ইউরোপ আমেরিকার কোন কোন ঔপন্যাসিক (গারট্রুড্ স্টেইন, জেমস্ জয়েস প্রভৃতি), কিন্তু মানুষকে উপন্যাসের প্রাঙ্গণ থেকে কোনক্রমেই বিসর্জন দেওয়া চলে না। যদি দেওয়া হয় তো বন্ধ্যা আকাশে নিস্পন্দ বায়ুগর্ভ কথার ফানুস ওড়ানো হবে শুধু।

এ কারণেই শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত পীড়াদায়ক তরল ভাবপ্রবণতা এবং হৃদয়রসও আমাদের সহ্য হয়, কিন্তু মানবিক বোধের অভাবে ক্লিষ্ট কাহিনীর বিবরণপাঠে মন বিদ্রোহ করে ; পশু-আমির পীড়নে ক্লান্ত হয়ে মানুষ আমি বিদ্রোহ করে। আমার বিশ্বাস, এই সত্য একালের ঔপন্যাসিকদের চৈতন্যে যেমন উদ্ভাসিত নয়, তেমনি মননশীল প্রজ্ঞার দীপ্তির অভাব তাঁদের মানব-অভিজ্ঞতা অভিনব দিগন্তে অগ্রসর হতে দুঃসাহসী করছে না।

শরৎচন্দ্রের স্বপ্নকে যদি সার্থক করতে হয় তো নতুন বন্দরের দুর্গম পথে বাংলা উপন্যাসকে অবশ্যই যাত্রা করতে হবে।

নূতনত্ব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবিতা হইতে অতি সহজেই
বাদ দেওয়া যায় ছন্দ,
গীতের সঙ্গে কিবা দরকার
বাদ্যটা কর বন্ধ।
নৃত্যেতে কেন বৃথা হিল্লোল ?
লাফাও, ঝাঁপাও, দেবে দাও দোল,
চিত্রে কেবল রেখাই থাকুক—
রবে না রঙের গন্ধ।

২

কালে কালে শুধু হতেছে কৃষ্টি
একঘেয়েমিতে পূর্ণ,
কালাপাহাড়ের কুঠার চালায়ে
করিতে হইবে চূর্ণ।
এই যে হরফ, এই যে বানান—
বড় একঘেয়ে, বড় বেমানান,
এর বনিয়াদ যাক বরবাদ
সংকার হোক তূর্ণ।

৩

এখনো—এখনো মেয়েরা পরিবে
হার চুড়ি বালা দুল্ কি ?
অলঙ্কারের বদলে চলুক
এখন আবার উল্‌কি।
সায়া শাড়ি পরা হল বহুদিন
ফেরানীর পুনঃ আসুক সুদিন
ভাঙিবে না হায়, রহিয়া যাবেই
একঘেয়েমির ভুল কি ?

৪

কত দিন হল—চলিয়া আসিছে—
একঘেয়ে সব খাদ্য,
চাল কেন ? খাও ঘাস ও বিচালী,
খাইবারে কর বাধ্য।
দুধ খাইয়াছ—খাওনা গোবর,
সেই তো গব্য সবার উপর।
সার লয়ে কর নব কারবার
যার যতটুকু সাধ্য।

৫

সেই যে আদিম প্রণয়ের ধারা
বদলায় নাই বিন্দু,
একই ভাবের সৃষ্টির ধারা
অটুট রয়েছে কিন্তু।
কিছু বদলাতে কিছু বাদ দিতে,
হবেই হবেই নূতনে তুষিতে,
সজল করিতে হবে মরুভূমি
শুকাইতে হবে সিন্ধু॥

●

নিমগাছ

শ্রীকালিদাস রায়

বড়ই মিঠা হ'লো যে নিমপাতা,
নিমের ফুলের গন্ধ পেলে
চমকে উঠে চাই।
পথে যেতে গুটিয়ে নিয়ে ছাতা
একটুখানি জুড়াই, যদি
নিমের ছায়া পাই।
মনে পড়ে নিরিবিলি
তালপুকুরের ধার,
বনে ঘেরা ঘাটে সে নিমগাছ।
ঝিকিমিকি বিকালবেলা
ছায়ার তলে তার
ছিপটি ফেলে বসে থাকা,
ধরছি যেন মাছ।
চন্দনে নিম পরিণত,
মিষ্ট নিমের পাতা।
কেন ? শুধু তুমিই জানো
অন্যে জানে না তা'॥

●

ভেট-তত্ত্ব

গোপাল ভৌমিক

ভেটের উপর চলেছে দুনিয়া
ভোটের উপর নয়,
ভালমত ভেট পারবে যে দিতে
হবে তার হবে জয়।
ভেট মানে শুধু টাকা বা পয়সা
ভাবে যদি কেউ মনে
যীশু না হলেও সে জন যে শিশু
বুঝে নেবে গুণীজনে।
চোখে দেখা যায় দেখাও যায় না
এমন অনেক ভেট
আছে যদি বলি, শুনে অনেকের
মাথা হতে পারে হেঁট।
দেবতা তো এক, ভক্ত অনেক,
ভেটের রকমফের
তাই প্রতিদিন হয় বলে দেখি
নানান রকম জের।
ফুলবেলপাতা দুধকলা ভেট
এ-যুগের রীতি নয়
শ্রীমুখের বাণী শুনে গদগদ
হলে তার হবে জয়।
কূটনীতিবিদ অনেকে আবার
দেয় শুধু হাসি ভেট,
হাসির ছর্‌রা খেয়ে ফেটে যায়
যাক অপরের পেট।
আর একদল ভেট দিতে পারে
কথার তুবড়িবাজি—
প্রভাব এড়িয়ে যাবে দূরে সরে
কে এমন আছে গাজী?
সময়মতন কাজ ভেট দিয়ে
কেউ চায় ফল পেতে—
ততটা ফসল জোটে না যদি বা
মাটি থাকে পুড়ে তেতে।
ভেট দিতে যারা জানে না তাদের
গা জ্বালাই শুধু সার—
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে যে, খঞ্জ
হয়ে যায় গিরি পার॥

বুদ্ধিবিত্ত

অসিতকুমার

ফার্স্ট স্টেজ

[প্রথম প্রহরে প্রভু···ইত্যাদি বাংলা প্রবচন]

হৃদয় বেকার। বিকল চিত্ত
আজ বাড়ে কফ কালকে পিত্ত
কফিহাউসের চাতালে নিত্য
বসে আমাদের বুদ্ধিবিত্ত।

*   *   *

কার মস্তকে বুলিয়ে হস্ত
ভাগ্যের পথ হবে প্রশস্ত
এই চিন্তাই জবরদস্ত
চারিদিকে চাবি আঁটা।

হায় সিনেমার সে কোন্ লাইনে
মওকা মিলবে। ঠিকানা পাই নে!

যে দিকে তাকাই বাঁয়ে কি ডাইনে
বড় বড় ঢেরা কাটা।

অ্যাড্‌ভান্সড্‌ স্টেজ

কতকাল আমি ছেড়েছি আড্ডা, ইয়াকি ইত্যাদি,
বুশশার্ট ছেড়ে ধরেছি অঙ্গে অধ্যাপকীয় খাদি।
মাঠের মাটিতে খাই নে বাদাম, পুড়ে পুড়ে ঠাঠা রোদে,
মাঝে মাঝে শুধু সিনেমায় যাই, শ্রীমতীর অনুরোধে।
সন্ধ্যাবেলাটা বাড়িতেই কাটে। রাস্তায় বড় কাদা।
ছেলেপুলেদের উপদেশ দিই। বিপদে পড়লে চাঁদা॥

রেনিগেড

"কোন স্বর্গবঞ্চনার পাতকে সে পলাতক···ইত্যাদি"
—প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিষন্ন বোসের নাম শুনলাম সেদিন আবার
কলেজে বিষন্ন ছিল অত্যন্ত নিপুণ এক ছেলে
এহেন বিষন্ন নাকি ডুবিয়েছে নামটি বাবার
কাকে যেন বিয়ে করে বসে গেছে বেদম সেকেলে।
ফরাসী কবির বই হাতে নিয়ে অতি অবহেলে
কফির পেয়ালা কোলে বলেছে সে ইজমের নাম
এখন সে সারাদিন আপিসে কলম ঠেলে ঠেলে
ঘরেতে ঘুমোয় এসে। মননের এই পরিণাম॥

হাত-ঘড়ির গান

সন্তোষকুমার দে

হাতে হাতে সব হাতঘড়ি বাঁধা
হাতকড়িরই তা নামান্তর,
চলে দিন রাত নিরন্তর—
—টিক্ টিক্ টিক্, টিক্ টিক্ টিক্॥

ভয়ে আড়চোখে চুপি চুপি দেখি
কাঁটা ঘুরে যায় কোন্ দিকে
মনে মনে জানি বন্দী কে,
খাঁচার পাখির মত পাখা ঝাপটাই
কানে তবু শুনি সেই স্বর—
—টিক্ টিক্ টিক্, টিক্ টিক্ টিক্॥

প্রভাতের আলো আগুনের মত
ঝিলিক মারিয়া যায় কাচে,
দুপুরেও ঘড়ি হাতে আছে।
সারাদিন ধরে করি ছুটাছুটি
মাথা কুটি নেই অবসর।
—টিক্ টিক্ টিক্, টিক্ টিক্ টিক্॥

রাতের তিমিরে যদি ঘরে ফিরে
কিছুখন চাই বিশ্রাম
তখনও চলে ঘড়ি, চলে অবিরাম,
আর তার সাথে ভেসে চলে যায়
সোঁতে ভাসা জীবনপ্রহর—
—টিক্ টিক্ টিক্, টিক্ টিক্ টিক্॥

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

[কয়েকজন বদ্ধ-পাগলের অর্থহীন কল্পনা চুরি করিয়া বিরচিত]

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

একটি কুকুরের কাহিনী

শহরের রাজপথ। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। গরম দুপুর
হেথায় হোথায় আহা জলের কলের কালো গায়ে
জল শুঁকে শুঁকে ফেরে বৃথা এক তৃষ্ণার্ত কুকুর,
পায় না জলের গন্ধ; পিচের গরম লেগে পায়ে
ফোসকা প্রায় পড়-পড়, কিন্তু তবু পড়ে না পড়ে-ও
পড়িবে ইহার পায়ে? ছি ছি, এ যে তুচ্ছ সারমেয় !!!

*   *   *

হায় সরমার পুত্র, তোরও কি তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে?
কিন্তু তোরে কে দেবে সরবৎ কিংবা রেফ্রিজারেটার থেকে
জল?

সঙ্গীহীন পদাতিক, এত যে ঘুরিস পথেঘাটে,
করে কি কেয়ার কেহ? তুই তোর আপন সম্বল,
আপন নির্ভর রে কুকুর! তোর মিছে ফরিয়াদ;
বেদরদী বিধাতার পেয়েছিস রুদ্র আশীর্বাদ।

*   *   *

তৃষ্ণার্ত কুকুর তবু দুরন্ত তৃষ্ণার কথা ভাবে,
কল থেকে কলান্তরে নাক দিয়ে শুঁকে শুঁকে চলে।
ভাবি নারিকেল যথা সুপ্ত হয়ে থাকে ডাবে ডাবে;
কিংবা বহু ফুল যথা পরিণাম খুঁজে মরে ফলে;
চীনে রেস্তোরাঁয় যথা রেশু ফোঁকে, নয়ন করুণ,
আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে হাড়িডসার বাঙালী তরুণ।

*   *   *

কুত্তার তৃষ্ণার্ত চোখে সাইন-বোর্ড-প্রতিবিম্ব জাগে:
"চৈনিক ধোলাইখানা।" কুত্তা-চিত্তে জাগে কৌতূহল;
চীনের ধোলাই ধীরে বাংলায় নবীন অনুরাগে
পাতিছে আসন।. আহা, এত প্রেম হবে কি বিফল?

কায়েম হয়েছে জুতো, এবার ধোলাই হবে তাই।
পিয়াসী কুকুর একা কেঁদে ফেরে "জল কোথা পাই?"

*   *   *

ওপাশে কলেজ এক, ছাত্রদল গিশ্‌গিশ্‌ করে
বিদ্যার বাজারে যেন। মনে হয় মৌমাছির চাক,
মধু নয়, ঝোলাগুড়ে ঠাসা; যেন কাটিখোট্টা ঝড়ে
মলয়ের মৃদু সুর ডুবে গেছে, জেগে আছে পাঁক।
ও যেন কসাইখানা, ঠুলি চোখে পরেছে সবাই;
কত ভবিষ্যৎ হোথা বর্তমানে হতেছে জবাই।

*   *   *

কলেজ পিছনে ফেলে সারমেয় হয় অগ্রসর,
তৃষ্ণায় আকণ্ঠ ভরা, ঠোঁট দিয়ে জিভ চেটে চেটে।
সহসা সম্মুখে তার দেখা দেয় মস্ত ছবিঘর,
তারি পাশে আবহাওয়ায় উত্তেজনা পড়িতেছে ফেটে।
ম্যাটিনী টিকেট তরে ফুটপাথের 'পরে দণ্ডবৎ
ঝাঁ ঝাঁ রোদে প্রতীক্ষিছে বাংলার বহু ভবিষ্যৎ।

*   *   *

রঙীন পোস্টারে এক স্বচ্ছ-স্বল্প-বসনা উর্বশী
লোলুপললিতলাস্যে চিৎ-শয়নে শায়িতা সোফায়;
নীরবে সে যেন কহে, "আঁখি কেন রেখেছ উপোসী?"
কটাক্ষ-কোদাল দিয়ে বহু চিত্ত যেন সে কোপায়,
ইঙ্গিতে ইশারা করে "ভুলে গিয়ে ছোড়্‌দায় বড়্‌দায়
চলে এস ধন্য হতে মোরে দেখে রূপালী পর্দায়।"

*   *   *

অদূরের বিপণিতে পণ্য বহু রূপালী পত্রিকা
রূপালী পর্দার বহু নট-নটী চিত্র-সম্বলিত;
কি খান পরেন তাঁরা তারি বহু বিচিত্র তালিকা
রূপালী পত্রিকা-পাতা হতে হয়ে গোগ্রাসে গিলিত

অনেক সবুজ চিত্ত করে আহা আরও যে সবুজ—
জল খুঁজে খুঁজে ফিরে বোঝে না সে কুকুর অবুঝ।

*	*	*

সে পড়ে না রূপালী পত্রিকা, তাই জানে না খবর
চলচ্ছবি দুনিয়ার, নাহি জানে হালচাল তার।
(হায় রে কুকুর! বল্ তোর ভাই এ কি শাপে বর?
কিংবা তার বিপরীত? ওরে, এ যে বিচিত্র সংসার
যেথা মোরা করি বাস, অথবা বাসের অভিনয়
ক্ষীণভিত্তি ক্ষুদ্র ঘরে চিত্ত ভরা নিয়ে নিত্য ভয়।)

*	*	*

কুকুর পড়ে না গল্প, রম্য-রচনা বা উপন্যাস,
কিংবা চিত্র-তারকার বকলমে লেখা আত্মকথা;
নাহি বোঝে রাজনীতি; কি নিয়ে কাটায় বারো মাস
সেই জানে; আনমনে ল্যাজ নেড়ে ঘোরে যথাতথা,
কভু ঘেউ ঘেউ করে, কখনও বা একেবারে চুপ,
চতুষ্পদী চোখে দেখে দুইপদী পৃথিবীর রূপ।

*	*	*

হোথায় বেতার-যন্ত্রে বাজে বাংলা আধুনিক গান
সকরুণ থরথর নাকীস্বরে মড়াকান্নাসম।
বাংলার সঙ্গীত আহা হয়েছে কি হেন ক্ষীণপ্রাণ?
রে ভাগ্য-বিধাতা, তুই কেন এত হলি রে নির্মম?
সঙ্গীতে, সাহিত্যে, শিল্পে কোথা গেল সে মর্দানা সুর?
কোথা সেই দৃঢ় ঋজু মেরুদণ্ড? জানে না কুকুর।

*	*	*

যা ছিল সোনার বাংলা, পেতলের হয়ে যাবে তা কি?
অথবা সীসের? আহা কে রুখিবে দ্রুত নিম্নগতি
বাংলার তরুণ বিনে? জাগিতে এখনও কত বাকি
ওরে কুম্ভকর্ণ জাতি? খেয়েছিস যে লাথি সম্প্রতি
সে শুধু কলির সন্ধ্যে, সুক্ত যথা ভোজনের আগে;
সে-ই বুদ্ধিমান ওরে প্রথম লাথিতে যেবা জাগে।

*	*	*

এখনও রুখিয়া দাঁড়া তোর সর্ব প্রাণশক্তি নিয়ে,
ঘরোয়া কোন্দল ভুলে, রে দুর্ভাগা কোণঠাসা জাতি!
হাতী যদি খাদে পড়ে, অনেকেই যায় লাথি দিয়ে,
মরে না সে জাত তবু যে জাত না হয় আত্মঘাতী।
যদিও সম্মুখে কালো অসংখ্য দুস্তর বিঘ্ন বাধা,
তবুও দুর্গম পথে আলোর সাধনা হোক সাধা।

*	*	*

ওগো কথাশিল্পীদল, দোহাই দোহাই তোমাদের,
পিঁয়াজ রসুন দিয়ে পচা মাল চালায়ো না আর।
তরুণ-বখানো লেখা মহানন্দে লিখেছ তো ঢের;
লেখনী সংযত কর, আর দফা সেরো না বাংলার।
যদি পার সে সাহিত্য সৃষ্টি কর লেখনীর আগে,
নবজীবনের মন্ত্রে বাংলার তরুণ যাতে জাগে।

*	*	*

জাগাতে না পার যদি, অন্ততঃ তাদের বখায়ো না;
আপনার স্বার্থে জাতি-মেরুদণ্ডে ধরায়ো না ঘুণ।
বাংলার সবুজে আজও আবাদে ফলিতে পারে সোনা,
সেথায় ছড়ায়ে ঘুঁটে ওগো বন্ধু দিও না আগুন।
মুমূর্ষু জাতিরে দিতে তোমরাই পার নব প্রাণ
যদি বোঝ হাতে থাকা লেখনীর দায়িত্ব মহান্।

*	*	*

কিন্তু একি? একেবারে ভুলে গেছি কথা কুকুরের!
চলে সে জলের খোঁজে পিচ ছেড়ে ফুটপাথ বেয়ে
দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে; কি তফাত মধু ও গুড়ের
জানে না বেচারা আহা, শুধু ছল ছল চোখে চেয়ে
কুকুরপ্রেমীর উক্তি ভাবে বুঝি মুখ করে কালো:
"মানুষেরে যত চিনি, কুকুরেরে তত বাসি ভালো।"

*	*	*

শোন্ রে কুকুর ভাই, এ কি, তোর চক্ষে কেন জল?
জল খুঁজে খুঁজে কি রে জল দেখা দিল তোর চোখে?
মুছে ফ্যাল চক্ষু ওরে, অশ্রু নয় পথের সম্বল।
ও দেখে তৃষ্ণার জল দেবে না দেবে না কেউ তোকে।
যত হোক ঝাঁ ঝাঁ রোদ, যত হোক গরম দুপুর
জল না মিলিবে তবু হায় ওরে তৃষ্ণার্ত কুকুর॥

কুয়াশা

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আজি বিশ্বপ্রকৃতি অবগুণ্ঠনে, চাহে না নয়ন মেলি
তার অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো রয়েছে ধূসর কুয়াশা চেলী !
যেন দীর্ঘশ্বাসের বিক্ষোভে কোন্ হতাশা দুর্নিবার
এই নিখিলের বুকে টানে নিষ্ঠুর আবরণ বারে বার !
আজি জেগে ওঠে তবু রুদ্ধ পরাণে মগ্ন-চেতনা মাঝে
শত বঞ্চনাভরা মর্ম-আরতি কল্পনা-রূপ সাজে !

মোরা অতীতের স্মৃতি-বন্দনা-গানে রহিয়াছি তন্ময়,
কবে বিজয়সিংহ বিজয়বাহিনী করিল লঙ্কা জয়।
কবে দীপঙ্করের জ্ঞানের গরিমা প্রাচী দিগন্তে জ্বলে,
আর সোনার ভারত লাগিয়া জগৎ চেয়েছিল কুতূহলে !
সেই অতীতের গীতি, অতীতের গাথা অতীত-গর্ভে থাক্,
আজি নূতন জগতে নূতন দিশায় এল 'নূতনের ডাক'।

আজি আঁখি মেলি যবে চাহিবারে চাই জীবনের চারিধারে,
ঘন কুয়াশার ঘোর পৃথ্বীর কোলে নেমে আসে চুপিসারে !
একি কু-আশায় মাতি মানুষে মানুষে বিভেদ প্রাচীর তোলে
একি ভ্রান্ত নেশার কুহকে ভুলিয়া আশা-তরঙ্গে দোলে !
প্রাণে বিন্দু বিন্দু ম্লান কুহেলিকা রয়েছে জমাট বেঁধে,
তাই মনের আকাশে কুণ্ঠিত এক প্রার্থনা ওঠে কেঁদে।
নীচে কর্মসিন্ধু কল্লোলি ওঠে আঁধারে আত্মহারা—
বুঝি জ্যোতিহীন পথে গতিহীন প্রেম ফুঁসিছে পাগলপারা।

একি কঠিন নিয়তি জাতির ভাগ্যে নীরন্ধ্র আঁধিয়ার
তাই দুর্জয় যত সংগ্রাম শত ভেঙে পড়ে চারিধার !
বল, কোন্ অভিশাপে দুর্যোগ আসি করে সব খান্ খান্—
হয়, শুভ-কল্যাণ-ব্রতের সাধনা নিঃশেষে ম্রিয়মাণ।
তাই মৃত্তিকা আজি ধরে নাকো বুকে পূর্ণ শস্য-ডালা,
কূলে বহতা নদীর জলে রহে না যে স্নেহের পরশ ঢালা।
আজি বন-বৈভব হারায়েছে তার অন্তর সুষমায়—
তার পাতায় পাতায় মর্মর-ধ্বনি কম্পিত নিরাশায়।

আজি জনপদে যত সম্পদ তবু বঞ্চিত জনগণ,
এই জ্ঞানের দুয়ারে অবরোধ রচি বিভেদের আয়োজন !
তবু সাম্যবাদের মর্ম নিঙাড়ি সবারে বাঁধিতে চায়,
মায়ামরীচিকাসম হাতছানি দিয়ে দুস্তর সাহারায়।

তুলি অহঙ্কারের কুহেলী-প্রাচীর করিয়ে সমাজ-সেবা,
যদি গণদেবতায় করি আবেদন, শুনিতে চাহিবে কেবা ?
এ যে সর্বনাশের সাধনা চলেছে, মৌলিক অধিকারে
জানি, সবাই ঘুরিছে আপন কক্ষে, আর কে ফিরাবে তারে !
তাই মনঃসাধ আর মতবাদে জাগে দুর্বোধ ব্যবধান—
নিয়ে বুকে ক্রূর হাসি, মুখে ভালবাসা-অভিনয়-অভিমান।
তাই কু-ঝটিকা আসি কুজ্ঝটিকায় ঢেকে দিল দশ দিক,—
সেথা ভিন্ন দলের ছিন্ন গব চাহিল নির্নিমিখ।

আজি ভাবের কুয়াশা, ভাষার কুয়াশা, কর্মের কুয়াশায়
এই লোকধর্মের স্বচ্ছতা কেন কুয়াশায় ডুবে যায় !
তাই ক্ষুব্ধ প্রাণের অবরোধে কাঁদে শৃঙ্খলে বাঁধা মন—
এই মৃত্যুগহনে, কে করিবে বল, জীবনের আবাহন !

তবু আশার আলোক-বিন্দু জ্বলিছে মানস-কল্পনায়,
চির-চঞ্চল সে যে আবেগোচ্ছল জাগ্রত মহিমায়,
তার আদি নাই তার শেষ নাই কভু, সৃষ্টি-বহ্নি সে যে,
নিতি মূর্ছনাভরা সঙ্গীত তার অণুতে উঠিছে বেজে !

তারি স্পন্দন-লীলা তারায় তারায় আকাশে বাতাসে জাগে,
সে যে চিরন্তনের অভিসারে চলে অসীমের অনুরাগে।
তবে একদা বুঝি বা অতীন্দ্রিয়ের পূর্ণ পরশ মাগি
এই স্তব্ধ নিথর কুহেলিকা ভেদি জীবন উঠিবে জাগি ॥

কবি ও সন্ধ্যা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

গোধূলি শেষ, সন্ধ্যা যেন সেজেছে রূপসীবা,
মাথায় তারা-কনকচূড়া রূপালী বাঁকা চাঁদ,
হিমেল ছায়া-আঁচলে তার ঢেকেছে চারুগ্রীবা,
বেণীতে নিশিগন্ধা ফোটে, নয়নে অবসাদ।
চলিতে পথে শুধায় হেসে—"কেন এ সাজ তব,—
কাহার তরে এ রূপ অভিনব?"
বাতাস-কাঁপা কাননে তুলি স্বরের প্রবাহিনী,
"তোমারি তরে"—বলিল হেসে সন্ধ্যা বিলাসিনী।

মাঠের তৃণগন্ধ আসে, দীঘির কাঁপে জল,
উতলা বায়ু আছাড়ি পড়ে কদমকেয়া-বনে,
বিটপীশাখে ভুলেছে পাখি কূজন-কোলাহল,
দিনের শেষে তন্দ্রা নামে ক্লান্তিভরা মনে।

অবাক চোখে সন্ধ্যাপানে চাহিয়া ধীরে কহি—
"কাহার তরে সেজেছ রূপময়ি?"
সহসা মোর মাথার 'পরে পড়িল ফুল ঝরি
"তোমারি তরে"—বলিল হেসে সন্ধ্যা জাদুকরী।

আকাশে ধীরে ফুটিছে তারা, বাতাসে মাদকতা,
বিজন পথধূলিতে আলো-ছায়ার আলিপনা,
দেউলে কোথা শঙ্খরবে টুটিছে নীরবতা,
নদীর তটে জোছনা দেয় ছড়ায়ে মণিকণা।
শুধায় হেসে—"কাহার তরে রূপের দীপ জ্বালো?
কাহারে বল, বেসেছ তুমি ভালো?"
ঝিল্লীরবে বাজায়ে মৃদু কাঁকন-রিণিঝিণি,
"তোমারে কবি"—কহিল হেসে সন্ধ্যা মায়াবিনী॥

●

সম্ভাবনা

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

বহুক্রোশ পার হয়ে কোন দ্বীপে ক্লান্ত পাখি ফেরে,
সাগরে ডানার ছায়া। এ সাগর আমার মনের
মিতালি পাতিয়ে বুঝি অতলান্ত নীলসিন্ধু সনে
সর্পফণা শঙ্খচূড় তীরে বসে লক্ষ ঢেউ গনে।

কত নদী মোহনার কূলভাঙা উত্তাল জোয়ারে
স্বপ্ন-বুকে সাগরের ঢেউগুলি যেন দীর্ঘশ্বাস
অফুরন্ত আন্দোলন। এ বিপ্লব কেন, কি হারিয়ে?
কি চেয়েছে মনে নেই সূর্যময় আকাশে তাকিয়ে।

প্রলয় তুফান কালবৈশাখীতে সে তাই কি চায়?
তারাজ্বলা নীলাকাশ কোটি কোটি স্বপ্নচক্ষু মেলে
সহস্র বছর ধরে চেয়ে আছে।
মৃত্তিকার দ্বীপ
অঙ্কুরের মত আজ দেখা দিল নিষ্পাপ নতুন॥

●

গোচর

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

পায়ে ফোটে চষা মাটি
বোশেখের রোদে ঝামা ইট,
তবু ভাল লাগে—
মাথায় গামছা ঢেকে
মন্থরগতিতে মাঠে চলা ;
সূর্যের আগুনে পুড়ে
মরে কত সাময়িক কীট ;
ছক-কাটা দাগে
আবার এগিয়ে যাওয়া,
তেষ্টায় শুকিয়ে ওঠে গলা।

স্নেহের সবুজ নেই
বাবলার বিশুষ্ক শাখায়,
তবু ভাল লাগে—
ওর কাছে চেয়ে নিতে
পাণ্ডুর একটুখানি ছায়া ;
জিভ দিয়ে জমি চাটে,
মাঝে মাঝে ভীরু চোখে চায়
আশেপাশে আগে
একটি নিরীহ জীব ;
দেখে কি হয় না বল মায়া॥

●

ছায়ামুখ

সলিল মিত্র

হৃদয়ে যা আঁকা আছে সে তো জানি তব মুখছবি।
স্মৃতিরাও নিত্যসঙ্গী। মন-পথে পায়ে পায়ে চলে,
নামে কি বা আসে যায় ঋতুপর্ণা না হয় মাধবী,
তুমি শুধু তুমি থাক : সূর্যমুখী নাই যদি হলে !
আমার ক্রন্দসী তৃষ্ণা কেঁদে ফেরে বেহাগের সুরে,
কামনাকে কেন্দ্র করি মন মোর হয় জ্যামিতিক—
রোমাঞ্চিত উজ্জীবন হৃদয়ের অন্তর্দেশ জুড়ে—
প্রমত্ত উদ্দাম আশা রক্তে নাচে আদিম নির্ভীক।

সূর্যমুখী মন নয় : সন্ধ্যার মালতী-মন চাই ;
তোমাকে বিস্ময়ে ভাবি ফাগুনের স্তিমিত বেলায়—
প্রত্যাশার মূর্ছনাতে এ মনের অনেক কথাই
তোমার কবোষ্ণ বুকে গান হয়ে ঝরে যেতে চায় !
বর্ণালী বিস্ময়ে শুধু চেয়ে থেকে খুশিয়ালি মন
দর্পণের প্রতিবিম্বে ছায়ামুখ করে অন্বেষণ।

●

জন্মদিন

মন্মথ রায়

[একাঙ্ক বিচিত্রা]

—আজ তোমার জন্মদিন।

—ও, তুমি এসে গেছ ?

—প্রত্যেক জন্মদিনেই আসি।

—ভাগ্যিস তোমাকে কেউ দেখতে পায় না। শুনতে পায় না কেউ তোমার কথা। তাই রক্ষে। নইলে জন্মদিনে মৃত্যুর দেবতা তুমি আমার পাশে বসে আছ। সবাই আঁতকে উঠত।

—এ দিনটিতে তোমাকে যারা ভালবাসে, তারাই আসে তোমার কাছে। আমিও তাই এসেছি। তারা তোমাকে চায়। আমিও তোমাকে চাই।

—হ্যাঁ, ঠিক। তারা আমাকে চায়। তারা আমাকে দিতে চায়। তুমি আমাকে চাও। তুমি আমাকে নিতে চাও।

—বটেই তো। তাদের দেওয়া যখন ফুরবে, তখনই আমি তোমাকে নেব। জান তো, নিঃস্ব আর কাঙালের উপরেই আমার লোভ। হ্যাঁ, একজনের যখন কিছুই থাকে না, কিছুই রইল না, তখনই আমি তাকে বুকে টেনে নিতে পারি। তার আগে নয়। তাই প্রতি জন্মদিনে আমি ছুটে আসি দেখতে, তোমার এখনও কি আছে।

—কিন্তু এখনও তো আমার সবই আছে।

—হ্যাঁ আছে। স্ত্রী আছে। পুত্র কন্যা আছে। বন্ধু আছে। প্রচুর আত্মীয়স্বজন রয়েছে। কিন্তু তাদের নিয়ে গর্ব করবার মত এখনও তোমার কিছু আছে কি ? তা যদি না থাকে তবে তো তারা থেকেও নেই।

—চুপ। আমার স্ত্রী আসছেন।...এস গো। দেরি কেন ?

—স্নান সেরে পুজো করে এলাম। কই, পা দুখানি কই ? প্রণাম করি।

—এতকাল ঘুম থেকে উঠেই এই দিনটিতে সবার আগে আমাকেই করতে প্রণাম।

—এতকাল তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানতাম না। তুমিই ছিলে আমার একমাত্র ইষ্ট। দীক্ষা নেবার পর থেকে জেনেছি, ওটা মায়া। জগৎটা, সংসারটা সচ্চিদানন্দের। তুমি আমার সেই সচ্চিদানন্দের দান, তোমাকে প্রণাম করে তাঁকেই প্রণাম করছি আজ।

—নতুন কথা শুনছি গো।

—গুরু বলেছেন, এইটাই একমাত্র সত্য। আজ এই দিনটিতে তাঁকে আসতে বলেছিলাম, তিনি এসেছেন। যাই, তাঁর ভোগের আয়োজন করতে দেরি হয়ে গেছে।

—কিন্তু আমাকে সকালের ওষুধটা দিতেও দেরি করে ফেলেছ সুরমা।

—এই যাঃ! ওষুধটা ফুরিয়ে গেছে। আনাই হয় নি। আচ্ছা, আমি আনাচ্ছি।

* * *

—কি বুঝছ ?

—হ্যাঁ, বুঝছি।

—সুরমা দেবী তো চলে গেছেন। এবার প্রাণ খুলে আমাকে বল না, তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানেন না তোমার স্ত্রী—এ গর্বটা কি তোমার এখনও আছে ?

—হ্যাঁ, সেটা এখন ভেবে দেখার বিষয় বটে।

—মানুষের দোষই ওই। ভাঙে তো মচকায় না।

—চুপ, রমেন আসছে। আমার ছেলে।

* * *

—বাবা, কী বিপদ দেখেছ ?

—বিপদ ? কি বিপদ রমেন ?

—তোমার পা দুখানি বের কর। আগে প্রণাম করি। তারপর বলছি।

—দীর্ঘজীবী হও বাবা। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। কিন্তু বিপদটা কী ?

—বিপদটা ঘটিয়েছেন বিধাতা। তোমার জন্মদিনেই হচ্ছে সুনন্দার জন্মদিন।

—কে সুনন্দা ?

—বাঃ। সুনন্দাকে তুমি ভুলে গেলে ? তোমার বন্ধু অশোক সেনের সেই ধিঙ্গি মেয়েটা। যাকে তুমি আনন্দময়ী বলে ডাক।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আনন্দময়ী।

—সেই আনন্দময়ীর জন্মদিন আজ। আমি লিখে-ছিলাম বাবার জন্মদিনও আজ। কি করে বর্ধমান যাই বল। তা এখন ট্রাঙ্ককল এসে উপস্থিত। আমি না গেলে উৎসবই নাকি হবে না।

—না না, তুমি যাবে বইকি বাবা। অশোক আমার বাল্যবন্ধু। আর ওই আনন্দময়ী সুনন্দা—একদিন আমার ঘরের লক্ষ্মী হয়ে আসবে, এ আশাও আমি রাখি। তা বেশ, এ বাড়ির নেমন্তন্নের ভোজপর্বটা তো দুপুরে। ওটা মিটিয়ে দিয়েই তুমি বেরিয়ে পড়। বেলাবেলিই পৌঁছে যাবে বর্ধমানে।

—টেলিফোনে আমিও তাই বললাম বাবা। কিন্তু শুনছে না। বলছে এবেলাই এস। তুমি যাই বল বাবা, মেয়েটা বড় অবুঝ।

—তা বেশ, এখুনি রওনা হও। এদিককার ব্যাপার—আচ্ছা সে হবে এখন।

—সে তুমি ভেবো না বাবা। আমাদের ওই নতুন চাকরটা যেমন চালাক তেমনি চটপটে। ম্যানেজ করে দেবে। আচ্ছা বাবা, তা হলে আমি এই আটটা তেইশের গাড়িতেই—

—এসো।

* * *

—কি বুঝলে ?

—হ্যাঁ, বুঝছি।

—ছেলে তো চলল আটটা তেইশের গাড়িতে।

—যাক না। মমতা, আমার মেয়ে—ট্রেনটা বোধ হয় লেট আছে। নইলে এতক্ষণ এসে পড়বার কথা। বাঁকুড়া গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। সে এসে পড়লে একাই একশো। ওই বুঝি এসে গেছে।…কিন্তু—কিন্তু তোমাকে তো চিনলাম না মা।

—আমার প্রণাম নিন। আর চন্দনকাঠের এই খড়ম-জোড়া নিন। মমতাদি আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁরই সহকারী শিক্ষয়িত্রী। আমার নাম রমা মিত্র।

—বেশ মা, বেশ। আশীর্বাদ করি সুখী হও। সার্থক হও। কিন্তু মমতা—সে এল না কেন ? ভাল আছে তো ?

—ও, সে জানেন না বুঝি ? স্কুলে এবার রেলের কনসেশান পাওয়া গেছে—ভারতের সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখার জন্য। স্কুলের শিক্ষিকারা সব দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছেন কাল। আজ আপনার জন্মদিন বলে প্রথমটায় মমতাদি যেতে চাইছিলেন না। কিন্তু সেক্রেটারী চঞ্চলবাবুর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। জানেন, ভারি মজার লোক এই চঞ্চলবাবু। বলছিলেন অজন্তা ইলোরায় গিয়ে নিজেদের খুঁজে পাবে তোমরা।

—তা তুমি গেলে না যে মা ? নিজেকে হারাও নি বুঝি ?

—আমিও যেতাম। কিন্তু কিছুদিন থেকে মায়ের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। বিদেশে চাকরি করি। এই ছুটিছাটাতেই যা একটু সুযোগ পাই বাপ-মায়ের সেবা-শুশ্রূষার। ট্রেন থেকে সোজা আপনার এখানেই চলে এসেছি। হ্যাঁ, মমতাদি ওই খড়মজোড়া আজই সকালে দেবার জন্য বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন যে। আচ্ছা, আমি তবে আসি।

—এসো মা, এসো। তোমার মা হয়তো তোমার পথ চেয়েই আছেন। না, আর দেরি করো না।

* * *

—কি, বুঝলে ?

—হ্যাঁ, এটা বুঝছি, অনেকের কাছ থেকেই ধীরে ধীরে আমি দূরে চলে আসছি।

—আর তত কাছে আসছ আমার। ওই যে আবার কে আসছে।

—আরে, এসো এসো—তাপস এসো। তোমার এত কাজের মধ্যে মনে করে যে আজ এসেছ—

—আসব না ? তুমি কি বলছ সূর্যদা ? যত কাজই থাক্, তোমার জন্মদিনে আমাকে আসতেই হবে। আমার মাসিকপত্র 'মশালে'র নামকরণ করেছিলে তুমি। তোমার লেখার আগুনে তখন বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার কতটা কেটে গিয়েছিল তা জানে দেশের লোক। তোমারই আশীর্বাদে দাদা, এবার আমার 'মশালে'র পূজাসংখ্যায় বেরুচ্ছে তিন তিনটে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। এক ডজন বড় গল্প। কবিতা আমি গুনি না। জানই তো এই পূজা-সংখ্যাটাই হল আমাদের নববর্ষসংখ্যা। দু লাইন আশীর্বাদ লিখে দাও দাদা।

—লিখে আর কি আশীর্বাদ করব। 'মশালে'র এই বার্ষিকসংখ্যার জন্তে একটা ছোটগল্প লিখে রেখেছি। ওটা নিয়ে যাও। ওই আমার আশীর্বাদ।

—দাদা, তুমি হলে গিয়ে বাংলাদেশের প্রবীণতম সাহিত্যিক। তোমাকে এই ছেলেছোকরার দলে মিশিয়ে মুড়ি-মিছরির একদর করতে পারব না। তা সে যে যাই বলুক। তুমি বরঞ্চ একটা আশীর্বচন লিখে দিলে এদের যাত্রাপথ সুগম হয়ে উঠত। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি বরঞ্চ সম্পাদকীয়তে লিখে দেব, তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিয়েই আমাদের নববর্ষের জয়যাত্রা শুরু হল। চলি। আমার আবার একগাদা প্রুফ। এমন হয়েছে—মরবার সময় নেই।

*　　*　　*

—কি বুঝলে ?

—হ্যাঁ, সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

—আমার ঘর অস্তাচলের ওপারে। কিন্তু তাই বলে খুব দূরে নয়। এক নিমেষেই যাওয়া যায়।

—কিন্তু আমাকে নেবার জন্তে তোমারই বা এত আগ্রহ কেন ?

—সেটা তুমি ভুলে গেছ। এবং আশ্চর্য, যদি আজ আমি তা তোমাকে মনে করিয়ে দিই, বুঝেও তুমি না বোঝার ভান করবে। তোমার প্রতি জন্মদিনেই তো তোমাকে তা বলি। তুমি শুধু অবিশ্বাসের হাসি হাস।

—রাগ করছ কেন ? বল না, শুনি। আমার প্রতি তোমার এ প্রেম কেন ?

—কারণ তুমি ছিলে আমার। পৃথিবীর হাতছানিতে চুপিচুপি পালিয়ে এসেছ আমার বুক থেকে। ফিরে পেতে চাই আমি তোমাকে।

—কি যে তুমি বল, আমি বুঝি না। পালিয়ে যদি এসে থাকি, ভুল করি নি কিছু। শুনেছি তুমি আলোহীন প্রাণহীন পাষাণ। তাই তোমাকে আমার এত ভয়। যেতে চাই না আমি এ পৃথিবী ছেড়ে। জীবনে যত দুঃখই আসুক, যত নৈরাশ্যই জমা হোক, সবাইকে ছাপিয়ে তবু থাকে এমন কোনও সম্পদ, যার জন্তে মনে হয়, যত কাঙালই আমি হই না কেন, তবুও আমি সম্রাট।

—হ্যাঁ, এ গর্ব মানুষ করে থাকে বটে। কিন্তু এটাও কি সত্য নয় যে মানুষের কোনও সাম্রাজ্যই শেষ পর্যন্ত টেকে নি। ধ্বংস হয়ে গেছে। চুরমার হয়ে গেছে। আমি শুধু বলতে চাই, তোমার সাম্রাজ্যও যাবে। ভাঙন ধরেছে। প্রতি জন্মদিনে দেখতে আসি আর কত বাকী।

—বড় নিষ্ঠুর তুমি। শুধু নিষ্ঠুর নও, পৈশাচিক আনন্দ দেখছি তোমার চোখে। কিন্তু তুমি জেনো, তোমার আশা পূর্ণ হতে, আমাকে পেতে, তোমার এখনও ঢের ঢের বাকি।

—কোন্ অহংকারে এ কথা তুমি বলছ। চোখের উপর দেখছ না কি একে একে তোমার সকল অহংকার চূর্ণ হচ্ছে ?

—দেখছি। কিন্তু জানবে, এই পৃথিবী ধ্বংসের চেয়ে বড়—অনেক বড়। এত রূপ, এত রস, এত গান, এত গন্ধ আছে মানুষের জীবনে—ফুরবে না তা কোনদিন। এক দিকে হবে ক্ষয়, আর এক দিকে লাভ। শোন মৃত্যু—

—বল।

—আমার বাড়ির দুয়ারে রাজপথের ধারে পড়ে আছে এক কুষ্ঠরোগী। কুৎসিত, কদাকার, বীভৎস। দেহের মাংস খসে পড়ছে। কিলবিল করছে পোকা। দেখেছ ?

—হ্যাঁ, আমি সবই দেখি।

—লোকটাকে মৃত্যুকামনা করতে শুনেছ কখনও ?

—মুখে করেছে। কিন্তু মনের ইচ্ছা বাঁচতে। কিন্তু কেন ? কেন বাঁচতে চায় বলতে পার ?

—তবে শোন, কেন বাঁচতে চায়। দীনদুঃখী একটা ভিখারিণী রাতে এসে ওর কাছে বসে। ঘাগুলো ধুয়ে দেয়। ভিক্ষে করে যা পায় তা থেকে ওকেও খাওয়ায়। হয়তো প্রেম। হয়তো দয়া। কিন্তু এই-টুকু পাবার জন্তে ওর যেমন লোভ; ওইটুকু পেয়ে তেমনই গর্ব। কেউ যদি ভিক্ষে না দেয়, লোকটা তাকে শুনিয়ে দেয়, নাইবা দিলে তুমি ভিক্ষে, ভিক্ষে দেবার লোক আমার আছে।—ওর কাছে তবে তুমি হার মেনেছ মৃত্যু।

—আপাততঃ।

—অবশ্য আমি এত মূর্খ নই যে বলব আমরা অমর। মরব আমরা একদিন নিশ্চয়, কিন্তু তোমার সঙ্গে লড়াই

করে মরব বন্ধু। সগৌরবে লড়াই করব। আর তারই নাম হচ্ছে জীবন। ওই, কে আসছে! ক্রমাগত হারছি। তুমি এগিয়ে আসছ। ভাবছি, আজ কি তোমাকে রুখতে পারব না আমি?

—দেখ।

*　　*　　*

—আরে, এস এস বিপদভঞ্জন। তোমার কথা আজ যেন কেন বারবার মনে হচ্ছিল। না না, কোনও মামলা-টামলায় পড়ি নি। ভাবছিলাম, তুমি আর আমি এক-বয়সী। জন্মদিনে তাই তোমার কথা মনে হচ্ছিল।

—আরে, আমারও তো মন ছটফট করছিল তোমার কাছে ছুটে আসতে। কিন্তু তার কি জো আছে? আসব বলে বেরিয়েছি এমন সময় মক্কেল এসে উপস্থিত। পুলিস-কেসের আসামী। তুমি বলেছিলে সকাল সকাল আসতে, কিন্তু পড়ে-পাওয়া টাকা ফেলে আসতে পারি নে। কাজেই বসতেই হল।

—না না, টাকার চেয়ে বড় কিছু নেই। আমার জন্মদিনে নেমন্তন্ন রাখতে তোমার ক্ষতি হলে আমারই কি ভাল লাগত?

—তুমি ভাই আমার জন্যে যেসব ক্ষতি সহ্য করেছ, আমার কোনও ক্ষতি দিয়েই তাকে মাপা যাবে না সূর্যদা। ছিলাম বিপ্লবী। জেল খেটেছি, নতুবা এ-গর্তে সে-গর্তে পালিয়ে থেকেছি পুরো সাতটি বছর। এই সাত-সাতটি বছর তুমি আমার স্ত্রীপুত্রের মুখে ভাত জুটিয়েছ।

—থাক্, থাক্, ওসব কথা থাক্। কেসটা বেশ কিছুদিন চলবে? মানে, কেসটায় টাকা আছে তো?

—হ্যাঁ, বেশ টু-পাইস পাবার কেসই এটা। আসামী দুজন। একজন তো খুবই বড়লোক। আর একজন অবশ্য খুবই গরীব। তা মামলার খরচ অবশ্য বড়লোকের ছেলেটিই চালাবে। কিন্তু যা চার্জ, শুনে আমার গা ঘিনঘিন করছে।

—বল কি! কি কেস হে?

—জঘন্য। গরীব লোকটি হচ্ছে একটি বুড়ো বাপ। আর বড়লোকের ছেলেটি হচ্ছে একটি নরপশু। বুড়ো তার ষোড়শী মেয়েটিকে নিজে নিয়ে গেছে এক পার্কের ঝোপে। ওই পশুর হাতে তুলে দিয়ে, দূরে পাহারা দিয়েছে নিজে, যাতে কেউ ওদিকে না যায়।

—আশ্চর্য! বুঝছি, পেটের দায়ে বুড়ো এই—কিন্তু ঘেন্নায় মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।…কে, ওখানে কে হাসছে?

—কই? হাসছে আবার কে!

—ও।…তা এরা ধরা পড়ল কি করে?

—ওই মেয়েটারই কোনও 'লাভার' হয়তো ব্যাপারটার গন্ধ পেয়ে অ্যান্টি-করাপ্‌শান্ পুলিসকে পূর্বেই খবরটা দিয়ে রেখেছিল—কাজেই এরা একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে।

—কিন্তু মানুষ কি এত নীচে নেমে গেছে? না না, হয়তো ওই 'লাভার'ই পুলিসকে হাত করে কেসটা সাজিয়েছে।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে। ডিফেন্সও তাই হবে। কিন্তু আসামীরা আমার কাছে কবুল করেছে, ঘটনাটা সত্য। বড়লোকের ছেলেটি পাঁচশো টাকার নোট আমার হাতে গুঁজে দিয়ে পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, আমায় বাঁচান উকিলবাবু।

—তুমি বিপদভঞ্জন বোস। আশা করি ওদেরও বাঁচাতে পারবে, আর নিজেও বেঁচে যাবে ওদের টাকায়। তোমারও তো সামনে মেয়ের বিয়ে।

—না ভাই, এ কেস আমি নিই নি।

—নাও নি!

—না। আমিও মেয়ের বাপ।…ঘেন্না করল।

—কিন্তু তোমার মেয়ের বিয়েতে টাকার এত দরকার। কেসটা তুমি নিলে না?

—না। কেসটা শোনা অবধি নিজেকে কেমন যেন অশুচি বোধ হচ্ছে। তাই ছুটে এলাম একটা মহৎ লোকের পরশ পেতে।

—আরে আরে, একি! একেবারে যাকে বলে আলিঙ্গন যে। তা ভালই, আমার জন্মদিনে তোমার মত একটা খাঁটি লোকের ছোঁয়া পেলাম। জন্মদিন আমার সার্থক হল বিপদভঞ্জন। একি, চললে যে!

—কাছারির বেলা হয়ে গেছে।

—আরে, মিষ্টিমুখ করে যাবে না?

—টাকার বড় দরকার। আজ একটা জটিল রেন্ট স্যুট আছে। সকাল সকাল গিয়ে তদ্বির করতে হবে। মিষ্টি খাব বিকেলে এসে।

*　　*　　*

—কি ? মরতে তবে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ?

—ও, তাই বুঝি তুমি হোহো করে হাসছিলে ? ভাগ্যিস আর কেউ শুনতে পায় নি। কিন্তু হোহো করে জয়ের হাসি হাসবার পালা বোধ হয় এবার আমার। মানুষ আজ কত নীচে নেমে গেছে এ কথাও যেমন ঠিক, মানুষ আজ কত উপরে উঠতে পারে তাও তো দেখা গেল বন্ধু। এমন বন্ধু-ভাগ্যে গর্ব করে বাঁচা চলে। চলে নাকি ?

—হ্যাঁ। মনে হচ্ছে এ-বছরটিতেও তোমাকে আমি পাব না। আচ্ছা আজ তবে চলি। ও, না, আবার কে আসছে। আচ্ছা, তবে একটু বসেই যাই। দেখি, ইনি এসে তোমার পরমায়ু বাড়ান কি কমান।

*　　*　　*

—অমল যে! এসো এসো। এবার দেরি যে! বাঃ, কি সুন্দর সব ফুল। আচ্ছা অমল, তোমার শ্যামলী মা তিনি তো আর শ্যামলী নেই, পাকা বুড়ি হয়েছেন। তা তিনি এখনও কি নিজের হাতে তাঁর বাগানটির পরিচর্যা করেন ? না না, এ ফুল আমার পায়ে রাখছ কেন ? দাও, আমার হাতে দাও।

—কিন্তু শ্যামলী মা এ ফুল আপনার পায়ে রেখে আপনাকে প্রণাম করতে বলেছেন আমায়। তাঁর আদেশ অমান্য করার সাহস আমাদের নেই সার্।

—ও, তোমার শ্যামলী মা একটি বাঘা বুড়ী হয়ে দাঁড়িয়েছেন দেখছি। বেশ, তাঁকে বলো, আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আশীর্বাদ করছি—তাঁর জীবন আরও সার্থক হোক। তোমাকে আশীর্বাদ করছি—দীর্ঘজীবী হও। হ্যাঁ, যে কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, শ্যামলী তাঁর বাগানের কাজ এখনও কি নিজের হাতেই করেন ? ফুলের বাহার দেখে তাই কিন্তু মনে হচ্ছে অমল।

—অনাথ আশ্রমের অত বড় বাগান। এ-বয়সে অত বড় বাগানের কাজ তাঁকে আমরা কেন দেব করতে—যেখানে আমরা তাঁর শত শত ছেলেমেয়ে রয়েছি। তবে জানেন সার্, ওঁর নিজের ঘরের সামনে যে ছোট্ট বাগানটি, সেখানে কারও ঢোকার হুকুম নেই। তার কাজ করেন তিনি নিজেই। আচ্ছা সার্, শুনেছি, ওই বাগানের ফুলগাছগুলো নাকি আপনার নিজের হাতের ?

—শুনলেই হল ? ওরে বোকা ছেলে, কি করে তা হয় ? তোদের শ্যামলী-মা'র ওই বাড়িতে থেকে আমি যখন এম. এ. পড়ি তখন আমার বয়স ছিল কুড়ি-একুশ। শ্যামলী তখন ম্যাট্রিক ক্লাসে। সে আজ কতকালের কথা বল্ দেখি। হ্যাঁ, তা বছর চল্লিশ হবে। চল্লিশ বছর বুঝি কোনও ফুলগাছ বেঁচে থাকে রে বোকা ছেলে!

—না না, সে আমরা শুনেছি। এখনকার গাছগুলো নাকি আপনার সেই গাছগুলোরই কাচ্চা-বাচ্চা।

—এসব কে বলেছে রে অমল ? শ্যামলী বুঝি ?

—না না, তিনি বলেন নি। তবে এ কথা কিন্তু আর সবাই বলে। আজ যখন এই ফুলের ঝাঁপিটি আমার হাতে তুলে দিলেন তখন আমি খুব সাহস করে শ্যামলী মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা যা শুনি সেটা সত্যি কি ? আমার কথায় তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, এ ফুল আমার গুরুদেবের পায়ে রেখে তাঁকেই জিজ্ঞেস করিস অমল।

—বটে, এ কথা বলেছেন শ্যামলী ? আর কি বলেছেন শ্যামলী ?

—বেশী কথা আজকাল তিনি বলতে পারেন না। তাঁর যে খুব অসুখ।

—অসুখ! জানি নে তো। কী অসুখ ?

—সে জানার উপায় নেই। মুখ বুজে সয়ে থাকেন সব যন্ত্রণা। আজকাল কথা বলেন কম, কিন্তু মুখে সেই হাসিটি লেগেই আছে।

—আমাকে যেতে বলেছেন ?

—কি করে জানলেন সার্ ?

—আমার মন বলছে।

—শ্যামলী মা বলেছেন, তাঁর আশ্রমে এসব ফুলের চেয়েও আরও শত শত সুন্দর ফুল ফুটেছে। আপনাকে গিয়ে দেখে আসতে বলেছেন। আপনি নাকি সেখানে আজ বহুকাল যান নি। আজ যেতেই হবে আপনাকে। আশ্রমের গাড়ি নিয়ে এসেছি। চলুন সার্।

—সেই শত শত ফুলের একটি তো দেখছি তুমি। যাব, আমি যাব। তুমি পূজোর ঘরে গিয়ে প্রসাদ নাও। আমি তৈরি হচ্ছি।

*　　*　　*

—এবার কি বুঝছ ?

—বুঝছি তোমার পরমায়ু অনেক। কিন্তু এ কি সেই শ্যামলী—যে ছিল একটি ধনী পতিতার মেয়ে, যার গার্জেন-টিউটর ছিলে তুমি ?

—হ্যাঁ বন্ধু।

—তা দেখছি, তোমার শিক্ষাতেই পতিতার মেয়ে হয়েছে পতিতপাবনী।

—হ্যাঁ বন্ধু। জীবনে এইটেই আমার সবচেয়ে বড় গর্ব।

—আর গুরুটিকেও সে ভোলে নি।

—হ্যাঁ বন্ধু।

—গুরু আর শিষ্যা তোমাদের দুজনের জন্যেই দেখছি আমাকে অপেক্ষা করতে হবে আরও অনেককাল। তা করব। আনন্দের সঙ্গেই করব। হ্যাঁ, এই আশীর্বাদ করেই মৃত্যু আজ বিদায় নিচ্ছে। চলি আমি আমার অন্ধকার রাজ্যে—যাত্রা কর তুমি তোমার আনন্দলোকে। বিদায়।

—বিদায়।

৯ ভাদ্র ১৩৬৭

সুশীল রায়

আজ একটি ভিখারী-ছেলে ভিক্ষা চাহিয়া বিরক্ত করিয়াছিল। তাহাকে একটি চড় মারিয়াছি। চড়টা একটু জোরেই মারিয়াছিলাম, হাত এখনও জ্বালা করিতেছে।

শুধু হাত জ্বালা করিতেছে না, ভিতরেও বেশ জ্বালা বোধ করিতেছি। মেজাজ তখন ভাল ছিল না, এখন অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে দেখিয়া হয়তো কেহ বলিল, যত তেজ আমার উপর, আর ভিখারীর উপর। গায়ের ঝাল ঝাড়ার বেশ সোজা জায়গা।

কথাটা তবে পরিষ্কার করিয়া বলি। প্রথমতঃ, জনৈক ছোকরা-সম্পাদক আমার লেখার উপর এমন টিপ্পনী কাটিয়া সম্পাদকী সন্দর্ভ লিখিয়াছেন যাহাতে মেজাজ খাপ্পা হইয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ, আমার বিশ্বস্ত প্রকাশক আমার গ্রন্থের বিক্রয়ের যা হিসাব দিয়াছেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নাই। তৃতীয়তঃ, আমার কাছে তখন নাছোড়বান্দা এক তরুণ সাহিত্যিক নির্বিকার বসিয়া। তাঁহাকে বিদায় দিবার নানাবিধ কৌশল করিয়া হতাশ হইয়াছি। তিনি অযথা কেবলই হাসিতেছেন আর বকিতেছেন, আর আমারই কবিতার লাইন আওড়াইয়া তাহারই ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। মনে হইতেছিল, তিনি আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছেন। বড়ই অসহ্য ঠেকিতেছিল, ইহার চেয়ে তিনি যদি অশ্রাব্য ভাষায় আমাকে গালি পাড়িতে পাড়িতে ঘরের বাহির হইয়া যাইতেন তাহা হইলে আমি অনেক আরাম পাইতাম। এই অবস্থায় ভিতর-ভিতর তাতিয়া উঠিয়াছি। ভিতর-মহলে আমার এই শোচনীয় অবস্থার কথা বেতারেই ঘোষিত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। ও-মহলের রসবোধ কম নয়; তিনি আমার এই রোমহর্ষক অবস্থাটা বুঝিয়া নিশ্চয় মজা মারিতেছেন—এ কল্পনাও আমাকে আরও গরম করিয়া তুলিয়াছে।

এমন সময় "বাবু গো" বলিয়া নিখুঁত অভিনয়ের করুণ সুরে ভিখারী-ছেলেটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বার-দুই তাহাকে নরম গলায় জানাইলাম—এখানে কিছু হইবে না, হইবার আশা নাই। তাহার পর সুর একটু চড়াইয়া বলিলাম, হবে না, এখন যাও। তাহাতেও সে গেল না, আবার ডাকিল, "বাবু গো"—। এবার তাহার ডাকে সাড়া দিলাম। এবং যা ঘটিল তা আপনারা জানিয়াছেন।

ফলে, ভিখারী-ছেলেটি তো পলাইলই, তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুটি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, আচ্ছা, আজকে আসি।

আমার স্ত্রীর নাম আধুনিক রুচিসম্মত নয়। অতএব তাঁর নামোল্লেখ না করিয়া তাঁহাকে ক বলিয়া উল্লেখ করিব।

ভিখারীটিকে মারিয়া অবধি ঘণ্টা-দুই যাবৎ মনোকষ্ট পাইতেছি। মেজাজের মাথায় অমন আহাম্মকের মত কাজ একজন ভদ্রলোকের সামনেই করিয়া বসায় লজ্জাবোধও করিতেছি। বসিয়া বসিয়া নানা কথা ভাবিতেছি।

এমন সময় ক আসিয়া বলিল, যত তেজ আমার উপর আর ভিখারীর উপর। গায়ের ঝাল ঝাড়ার বেশ সোজা জায়গা। আর সবার কাছে একেবারে কাদার মানুষ। ছি ছি, নিরীহ ছেলেটা! সারাদিন হয়তো ওর খাওয়াই জুটবে না।

ক-এর কথায় কর্ণপাত যেন করিতেছি না, এইরূপ ভান করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ক বলিল, আমি এবার একটা ইন-আউট করাব। সারাদিন আউট করে রাখব। রাত্রে যখন ঘুমবে তখন ইন করে এসে শোব। অনর্গল আড্ডা মেরে মেজাজ হবে অগ্নিশর্মার মত, আর নিরীহরা পাবে শাস্তি।

বললাম, ক, ভিতরে যাও। আমি এখন ভাবছি।

কী ভাবছ?

বলিলাম, তুমিও তো কম নাছোড়বান্দা নও! ভাবছি, কেন তুমি ভিতরে যাচ্ছ না।

ক হাসিল, আমিও না হাসিয়া পারিলাম না। কিন্তু ভিখারী-ছেলেটির চড় খাইবার পরমুহূর্তের মুখের করুণ ভাবটি চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। বলিলাম, একদিন ধরে এনে খাইয়ে দিতে হবে।

ক বলিল, কাকে? '

বলিলাম, তোমার ভাইকে না। ওই ভিখারীটাকে।

ক চটিয়া উঠিল, বলিল, জানি। আমার ভাই খেতেও চায় না। ভেবেছিলাম, তোমার আড্ডার কোনও—

মুখ একটু বিকৃত করিয়া নীরবে হাসিয়া থাকিব, আমার মুখের ভাব দেখিয়াই সে সম্ভবতঃ কথা শেষ করিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ক বলিল, লজ্জাও করে না। তুমি বলেই হাস। আমি হলে মরমে মরে থাকতাম।

ক-কে কী করিয়া বুঝাইব যে, মরমে আমিও বাঁচিয়া নাই! আমিও অবিরত ওই ছেলেটির কথাই ভাবিতেছি। কিন্তু ক তাহা বুঝিতেছে না, ইহাতেও মর্মাহত হইতেছি।

সত্য কথা বলিতে কি, আমি একটু ভাঙিয়া পড়িয়াছি। কর্মফলের উপর একটু বিশ্বাস আছে, সেইজন্যই মনে মনে ভীত হইয়া উঠিয়াছি। আমি নিশ্চিত যে, আমার এই কর্মের উপযুক্ত ফল আমাকে ভোগ করিতে হইবে।

ভয়ে ভয়ে সারাদিন বাড়ির বাহির হইলাম না। কাহারও সঙ্গে দেখা করিলাম না। হিসাব করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলাম —ক আমাকে এতক্ষণ যেভাবে ভর্ৎসনা করিল তাহাতে সব শোধবোধ হইয়া গেল কি না। হিসাবে বারবারই ভুল হইতে লাগিল, অঙ্ক মিলাইতে পারিলাম না।

' আবার ভাবিলাম, এতক্ষণ যে মনোকষ্ট ভোগ করিলাম তাহার ওজন চড়ের ওজনের সমান কি না। কিন্তু নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিলাম না। সাপের বিষ তুলিতে ওঝারা নাকি সাপকেই ডাকিয়া পাঠায়, আমারও ভিখারী-ছেলেটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।—

এই চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলাম।

ছেলেটিকে একদিন পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিব। কেবল তাহাকে খাওয়াইলেই তাহার ক্ষুধা মিটিবে কি না

তা অবশ্য জানি না। তার মাও থাকিতে পারে, বাবাও থাকিতে পারে—দুজনের চোখ নাও থাকিতে পারে। তা ছাড়া, রোগা রোগা কয়েকটি ছোট ভাইবোন থাকাও অসম্ভব নয়। তার সংসারটি আমি যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, ইহাকে কষ্টকল্পিত চিত্র বলা চলে না। এমন তো সত্যই বিস্তর আছে।

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া ছিলাম, সোজা হইয়া বসিলাম। ছেলেটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। তাহাকে একবার পাইলে তাহার সংসারটিও চাক্ষুষ দেখিয়া আসা চাই।

ক বলিল, এখন খাবে না? ও-বেলা তো প্রায় ভাতে হাত দিয়ে উঠলে।

রুচি নাই বলিলে মেয়েলী শোনায়। তাই উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

পরদিন একাধিকবার অপদস্থ হইলাম। বুঝিলাম, কর্মের ক্রিয়া শুরু হইয়াছে। প্রকাশক জানাইলেন, আমি যদি হিসাব নিয়া অমন কড়াকড়ি করি তাহা হইলে তিনি আমার সম্মান রাখিতে অক্ষম হইবেন। তাঁহার কথায় মনে হইল, তখনও আমাকে তিনি অপমান করেন নাই। ছোকরা-সম্পাদক কাগজেই ঢুকিয়াছিলেন, রাস্তায় পাইয়া বেশ মিষ্টি করিয়া দু-কথা শুনাইয়া দিলেন; তাঁহার মতে কাব্যচর্চা আমার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, কেন না আমার লেখা 'পেশল উরস-ভেদ করি···' লাইনটির উরস কথাটির অর্থ উরু করিলে তার অর্থ জঘন্য হইয়া যায়, এবং অভিধানে উরস শব্দের অর্থ যাহাই থাক, এক্ষেত্রে উরু অর্থ ধরাই স্বাভাবিক—তিনিও তাই ধরিয়াছেন।

অপমানে মাথা ভারী হইয়া উঠিয়াছে। মাথা নীচু করিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, আজও বাহির না হইলেই হইত। এমন সময় সেই তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুটি আমার পাশে আসিয়া উপস্থিত। বিনয়ে গলিতে গলিতে তিনি বলিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতেছেন—তাঁদের 'দুর্জয় সংঘে'র সম্পাদক তাঁহাকে নাকি আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। তাঁহার পরম-সৌভাগ্য নাকি এই যে, রাস্তায়ই আমাকে তিনি ধরিতে পারিয়াছেন।

বাড়ি ঢুকিয়াই অবাক হইলাম। দেখিলাম, উঠানের এক কোণে বসিয়া পরম আনন্দের সহিত ভিখারী-ছেলেটি আহার করিতেছে। পাশে উবু হইয়া বসিয়া ক তাহার সঙ্গে কথা বলিতেছে। তৃপ্তিতে বুক ভরিয়া উঠিল।

শুনিলাম, ছেলেটি নাকি নিজেই ধরা দিয়াছে। আজও সে নাকি "বাবু গো—" বলিয়া হাজির। গলার স্বর শুনিবামাত্র ক নাকি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ক বলিল, প্রায়শ্চিত্ত কর। বসে খাওয়াও।

আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম দেখিয়া ক জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে কেউ এসেছেন বুঝি?

বলিলাম, হ্যাঁ।

ক অবাক হইয়া তাকাইল আমার মুখের দিকে।

বলিলাম, আমাকে দুর্জয় সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি করতে চান। কি বল, যাব?

ক একটু ভাবিয়া বলিল, একে এখন ভরপেট খাইয়ে নাও। ওসব পরে হবে। যাবে না কেন, নিশ্চয় যাবে।

চলিলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে ভিখারী-ছেলেটির সঙ্গে হনহন করিয়া হৃষ্টচিত্তে চলিলাম। চলিলাম তার গৃহাভিমুখে।

LIFEBUOY
LIFEBUOY SOAP

শেষের ফুলটি

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

সবাই জানেন, দ্বাদশ বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস হল সভ্যতা। শহর নগর গ্রাম মুছে গেল ধরণীর বুক থেকে, কুঞ্জ আর বনানী সব ধূলিসাৎ হল, বাগ-বাগিচাও। শিল্প আর কারুকার্যও রক্ষা পেল না।

পুরুষ রমণী আর শিশুরাও শেষে পশুর অধম হল।

প্রভুভক্ত কুত্তাগুলো নিদারুণ হতাশায় ছেড়ে গেল অকৃতজ্ঞ প্রভুদের।

পৃথিবীর প্রাক্তন প্রভুদের করুণ অবস্থা দেখে মূষিকের দুঃসাহস গেল বেড়ে।

বইপত্র চিত্রাবলী আর সঙ্গীত হল অদৃশ্য এই পৃথিবী থেকে এবং মানুষ চুপচাপ বসে রইল হাত-পা গুটিয়ে।

বছরের পর বছর গেল কেটে।

এমন কি জীবিত কজন সেনাপতি ভুলেই গেলেন শেষ যুদ্ধের পরিণতির কথা।

ছেলেমেয়েরা বড় হল, বোকা-দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল এর-ওর দিকে, কারণ পৃথিবীতে তখন আর প্রেম বলতে কিছু নেই।

একদিন এক তরুণী সহসা দেখতে পেল একটি ফুল—পৃথিবীর শেষের ফুলটি।

সে আর সবাইকে ডেকে বলল, ওগো, শেষের ফুলটিও যে মরো-মরো!

তার সে কথায় কান দিল শুধু এক লক্ষ্যহীন তরুণ।

দুজনে—ওই তরুণ আর তরুণী সযত্নে সজীব করে তুলল ফুলটিকে।

একদিন এক মৌমাছি এসে বসল ফুলটায়, এবং একটি শিস-দেওয়া পাখি।

অল্প দিনেই দেখা দিল দুটি ফুল এবং পরে চারটি এবং শেষে আরও—আরও।

কুঞ্জ আর বনানী হল মুঞ্জরিত।

তরুণী প্রসাধনে হল মত্ত।

তরুণ আবিষ্কার করল, তরুণীর স্পর্শ রোমাঞ্চকর।

পৃথিবীতে আবার দেখা দিল প্রেম।

তাদের সন্তান-সন্ততি বেড়ে উঠল সুস্থ সবল দেহে এবং তারা দৌড়তে শিখল—হাসতেও।

কুকুরগুলো ফিরে এল ল্যাজ নেড়ে নেড়ে।

তরুণ শিখল, পাথরের পর পাথর সাজিয়ে কেমন করে আশ্রয় তৈরি করতে হয়।

শীঘ্রই দেখা গেল, সবাই ঘর বাঁধতে ব্যস্ত।

শহর নগর গ্রাম উঠল গড়ে।

পৃথিবী আবার পেল সঙ্গীতের সঙ্গ—

এবং কথক আর কৌশলীর,

এবং দর্জি আর চর্মকারের,

এবং শিল্পী আর কবিকুলের,

এবং ভাস্কর আর কর্মকারের,

এবং সৈনিকের,

এবং লেফট্‌ন্যান্ট আর ক্যাপ্টেনের,

এবং জেনারেল আর মেজর-জেনারেলের,

এবং ত্রাণকর্তাদের।

কতকগুলি লোক একটা জায়গা পছন্দ করে নিল বাস করবার জন্যে এবং অন্যেরা আর একটা জায়গা।

শীঘ্রই দেখা গেল, যারা উপত্যকায় গিয়েছিল, তারা পাহাড়ে বাস করতে চায়।

আর যারা পাহাড়ে বাস করছিল, তাদের মনে হল উপত্যকাই উপযুক্ত স্থান।

ওই ত্রাণকর্তারা, ঈশ্বরের নির্দেশমতই তাদের এই অস্থিরতার সুযোগ নিল।

এবং এই পৃথিবীতে আবার দেখা দিল যুদ্ধ।

আর, এবার প্রলয় এমন মূর্তিতেই দেখা দিল যে পৃথিবীতে আর তেমন কিছুই থাকল না!

শুধু থাকল—

একটি পুরুষ,

একটি নারী

আর একটিমাত্র ফুল।

[ব্যঙ্গরসিক ও চিত্রশিল্পী জেমস থারবার লিখিত 'Fables for Our Time & The Last Flower'থেকে অনূদিত।]

থামতে জানা

শ্রীবিরূপাক্ষ

একবার সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায় মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কোন এক জলসা শুনতে যাবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করতে থাকেন।

শরৎচন্দ্র দিলীপকুমারকে বললেন, না ভাই দিলীপ, ও সব কালোয়াতী গানটান আমি বুঝি না—তুমিই যাও।

দিলীপকুমারও নাছোড়বান্দা। কেবল বলতে থাকেন, দাদা, এ সেরকম জলসা নয়। ঘরোয়া ব্যাপার—এখানে যে কালোয়াতটি আসবেন তিনি একজন খুব উঁচুদরের গুণী, আপনি তাঁর গান শুনলে মোহিত হয়ে যাবেন। চমৎকার গান, একবারটি শুনেই আসবেন নয়, চলুন।

শরৎচন্দ্র সব শুনে একটু চিন্তিতভাবে বলে উঠলেন, হুঁ, তুমি যা বলছ দিলীপ, সবই বুঝলুম—গুণী লোক, গানও গায় ভাল, কিন্তু থামে তো?

দিলীপকুমার ও উপস্থিত কয়েকজন এ কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের এই প্রশ্নটি হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। আমরা অর্থাৎ ভারতবাসীরা অনেক কিছু শিখেছি কিন্তু কোথায় থামতে হয় সেইটেই শিখি নি। আমাদের গান থামে না, বক্তৃতা থামে না, উপদেশ থামে না, গালাগালি তো থামতেই চায় না—এ এক জ্বালা!

আমরা ছেলেবেলা থেকে উপদেশ শুনতে আরম্ভ করলুম—তা আর থামল না। গুরুজনরা আমাদের ভাল করবার জন্যে এত উপদেশ বিতরণ করলেন যে সমস্ত করণীয় কার্য ভুলে গেলুম। এ যেন গভর্ণমেণ্টের নিত্য নতুন আইন পাস ও তা অনুসরণের নির্দেশ—সমস্তগুলো যারা মুখস্থ থাকলে সুপ্রীমকোর্টের জজ হওয়া যায়, নইলে পদে পদে আইন লঙ্ঘন করে দশ-পনেরো বছর হাজতবাস করতে হয়। এই করো না, তাই করো না, এই কর, তাই কর বলতে বলতে আমাদের আর কোন কিছু করতে হল না, একেবারে কাজের বার হয়ে গেলুম। তাঁরা যদি উপদেশ একটু স্বল্পমাত্রায় দিতেন—উপকার হত। মাত্রা বাড়াতেই বিপদ হয়ে গেল।

এঁদের পর আরম্ভ হল মাস্টারমশাইদের উপদেশ, তারপর অফিসের কর্তাদের, তারও পরে বন্ধুদের। সর্বশেষে বাড়ির লোকদের। কেউ কখনও থামলেন না—এঁদের সকলের হাত এড়িয়ে একটু গড়ের মাঠে গিয়ে যে দুদণ্ড নিশ্চিন্তে হাওয়া খাবেন তারও জো নেই; সেখানেও মনুমেণ্টের তলায় লাউডস্পীকার খাটিয়ে নেতাদের দুর্ধর্ষ নির্দেশ শুনতে শুনতে মাথা-টাতা সব ঘুলিয়ে যাবে।

তার ফলে কাজকর্ম ছেড়ে হয়তো ধর্মঘট করে বসে রইলেন—শেষে নাকখত দিয়ে আবার কেঁচোর মত অফিসে ঢুকুন; আর আগে যাঁরা বাবা দাদা বলে সবিনয়ে বাত-চিত করতেন, পরে তাঁদের কাছ থেকে সম্বন্ধীসুলভ আপ্যায়ন লাভ করে পশ্চাতে ঠোকর খেয়ে চিত হয়ে গড়াগড়ি খান!

অথচ এ দুর্ভোগ হয় না, যদি যথাসময়ে থামবার আর্টটা সকলের জানা থাকে। হুম্‌হাম করে তম্বিতম্বা পর্যন্তই ভাল—কিন্তু গুম্ করে লোকের পিঠে কিল বসিয়ে দেবেন না কখনও, তা হলেই সর্বনাশ! প্রতিপক্ষকে কখনও কিলের ওজন বুঝতে দিতে নেই। বাকযুদ্ধ করে কেল্লা ফতে করুন কিন্তু খবরদার নিজে থেকে কখনও সত্যি যুদ্ধ করতে যাবেন না—মারা পড়বেন। কিন্তু মজা এমন যে একবার আবেগ এলে তার বেগকে ঠিক তালমাফিক থামাবার কায়দা দেশবাসীর জানা নেই।

কোন্‌দিকের কথা বলব? আমরা বন্ধনকে স্বীকার করি না কিনা—সবেতেই মুক্ত, তাই কোনকিছু বাঁধা-বাঁধির মধ্যে থাকব কেন? কথা ছেড়ে দিন—যেখানে কোন কথাই নেই, সেখানেও শুধু আ—আ করেই আড়াই ঘণ্টা আমরা চালিয়ে দিতে পারি। থামতে বয়ে যাচ্ছে!

এই কলকাতা শহরে বিরামবিহীন ভাবে তিন দিন তিন রাত হাফ্-আখড়াই গানের আসর বসেছে নিজের চোখে দেখেছি। একবারও গান থামল না। সূর্য তিনবার উঠল, তিনবার ডুবে গেল, আখড়ার লোকেদের হাঁ বন্ধ হল না; গেয়েই চললেন। একদল ওঠে তো সঙ্গে সঙ্গে আর একদল বসে পড়ে, যেন বাঙালীর নেমন্তন্ন বাড়ি, ফার্স্ট ব্যাচের খাওয়ার পর সকড়ি তোলবারও টাইম দেয় না, সেকেণ্ড ব্যাচ হুড়মুড় করে উঠে পড়ে—কোন বিরতির অবকাশ নেই।

পঞ্চাশ বছর আগেও এদেশে থিয়েটার চলত সারারাত ধরে। ভোরের দিকে ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে দর্শকদের, চড়চড় করে রোদ উঠে গেল, তখনও আলিবাবার নাচ চলছে। আবার এর মধ্যে মজাও দেখেছি, নিমীলিত-চক্ষু নিদ্রাকাতর সঙ্গীকে ধাক্কা মেরে তাঁর বন্ধু দর্শক বলছেন, এই চোখ চা না—দেখ্ না, বেশ ভাল সখীদের নাচ হচ্ছে। সে বেচারী ঈষৎ চক্ষুটি খুলেই আবার বুজে ফেললে ও হাই তুলতে তুলতে বলে উঠল, ও আর দেখব কি? বেটারা সব বাদ দিয়ে দিয়ে এখন প্লে করছে। বলেই কাঁধটা চেয়ারের পৃষ্ঠদেশে দিয়ে কেতরে পড়ল।

আশ্চর্য! কোম্পানিও থামবে না—এঁরাও টিকিটের পয়সা উস্থল করবার জন্যে থিয়েটারে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বসে থাকবেন। কোথাও কারুর থামা পড়ার যো নেই!

যদি বলেন, ওসব আগের যুগে হত, লোকের রসবোধের সূক্ষ্মতা তখন আসে নি, এখন প্রগতির যুগে ওসব চলত না। তা হলে আমি এর উত্তরে প্রগতিবাদীদের জিজ্ঞাসা করব যে, যে-পাড়ায় মশাইরা থাকেন সে কি চৌরঙ্গীর ওপর না আর কোথাও সাহেব-পাড়ায়?

উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম বা মধ্য কলকাতার কোথাও কি কখনও থাকেন নি? পাল-পার্বণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কি কখনও হয় নি আপনাদের চত্বরে? সকাল ছটা থেকে রাত সাড়ে বারোটার আগে পুলিস আইন দেখিয়েও ফুলিশদের ভাড়া-করা লাউডস্পীকারের বিদিকিচ্ছিরি আওয়াজ থামাতে পেরেছেন?

আগে তবু বাড়ির হাতার মধ্যে উঠোনে বা দালানে রস জ্বাল দেওয়া হত, এখন দেড় মাইল দূরে থাকলেও যে ভেঁয়ান বসে তাতে মাথা টনটন করিয়ে দেয়, দেখেন না?

আসলে থামার আর্ট কেউ জানে না এদেশে।

আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক কিছুতে বাড়ি ছাড়লেন না, বাড়িওয়ালা আদালতের পেয়াদা এনেও ভাড়াটেকে ওঠাতে পারলেন না। শেষে যে ব্যবস্থা করলেন, তাতে শুধু সেই ভাড়াটে নয়, আমরা আশেপাশে যেসব লোক অন্য বাড়িতে ছিলুম তারাও পাড়া ছেড়ে পালালুম।

মশাই, এক ডজন গলা-ভাঙা লোক জড় করে ছিয়াত্তর না আটাত্তর ঘণ্টা অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা হল। ওঃ, সে অসহ্য! থামাবে কে? ধর্মের ব্যাপার, পুলিসের আওতার বাইরে—কাছাকাছি মসজিদ, চার্চ, হাসপাতাল কিছু নেই, অতএব প্রাণ ভরে নাম গাও! সেই নামের ঠেলায় লোকেরা স্ব স্ব পিতৃদেবের নাম বিস্মৃত হয়ে গেছলো সে সময়।

একটু থাম্—রামঃ! বললে আবার বেশী মাতন শুরু হয়। অখণ্ড কীর্তন কি না, থামলেই বৈকুণ্ঠের সুতো ছিঁড়ে যাবে, অতএব চালাও! এইভাবে কেত্তন চলে, দোলের সময় বাড়ির পাশে থানা থাকলে খচখচ ঘচমচর ঠেলায় কর্ণকুহর বধির করে ছেড়ে দেয়—থামবার নাম কেউ করে না। সবই ভগবানের উদ্দেশে তো পাঠানো। ভগবান যদি এই আসুরিক চিৎকার শুনেও নিজের বাসা ছেড়ে না পালান, তা হলে 'থ্যাঙ্ক গড্' বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমাদের।

ঋষিরা বলেছেন, চরৈবেতি—আরও এগিয়ে চল বাবা, থেম না, তবেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু আমরা সেদিকে না এগিয়ে যত বিদ্ঘুটে ব্যাপারের দিকে যদি সর্বদা এগোতে থাকি, তা হলেই যে সর্বনাশ! অনেক ব্যাপারে থেমে যাওয়াটা যে নিতান্ত আবশ্যক—এটা বোঝানো যায় কী করে?

শিক্ষিত অশিক্ষিত কেউই তো বোঝেন না। বক্তা বক্তৃতা দিতে উঠলেন, বিশেষ অধ্যাপক বা কাগজের সম্পাদক হলে তো কথাই নেই—থামবার নাম করবেন না
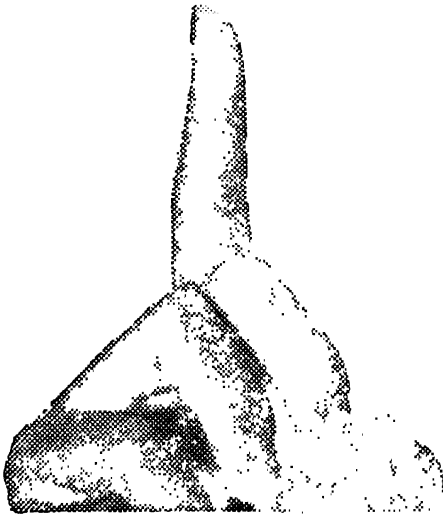
লোকে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথমে মেঝেতে পা ঘষল, তারপর ঘনঘন বেমক্কা জায়গায় করতালি দিতে শুরু করল, আসনের অর্ধেক খালি হয়ে গেল—তবু হুঁশ নেই! পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান শ্রোতাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে তিনি মহাপ্রস্থান করবেন। ভবিষ্যতে আর কোন লোক এসে যে দুটো জ্ঞানের কথা বলে আপনার মাথার ফাঁক ভরাট করে যাবেন সে সুবিধে তাঁরা দেবেন না।

একবার একটি ইংরিজি কাগজে একটা কার্টুন বেরিয়েছিল—তার দুটি অংশ। প্রথম অংশে দেখা গেল—একটি বিরাট হল, লোক গিজগিজ করছে আর একজন বক্তা বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। দ্বিতীয় অংশে পরিচিতি লেখা রয়েছে, "দু ঘণ্টা পরে"—সেই বক্তাই বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন, পাশে শুধু একটি লোক বসে আছেন। সমস্ত হল খালি, শূন্য চেয়ারগুলি শুধু পড়ে আছে। পরিশেষে বক্তা পরিতাপের সুরে বলে উঠলেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, আজকাল কেউ জ্ঞানের কথা শুনতে চায় না, মানুষকে ভাল কথা বলতে গেলে সে পালায়, কিন্তু সেরকম ধৈর্যশীল শ্রোতা যে একেবারে নেই তা বলতে পারি না, এখনও ভাল কথা শোনবার জন্য লোক রয়েছেন—নইলে, আমার পাশে এই এতক্ষণ একটি ভদ্রলোক ধৈর্য ধরে বসে থাকবেন কেন? আজকের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা পর্যন্ত পালিয়ে গেছেন কিন্তু ইনি হল পরিত্যাগ করেন নি, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে বসে থেকে একটি আদর্শ শ্রোতার দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গেলেন, সেজন্য তাঁকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছি না।

তখন দ্বিতীয় বক্তা গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন, 'ডোণ্ট ফরগেট্ স্যর, আই অ্যাম্ দি নেক্সট্ স্পীকার' অর্থাৎ আমি আপনার পরের বক্তা এইটে ভুলে যাবেন না।

আমার মনে হয় এর পরে কার্টুনে আর একটি অংশ আঁকা উচিত ছিল। "তিনঘণ্টা পরে"—দ্বিতীয় বক্তা বক্তৃতা করে চলেছেন, তিনি চেয়েও দেখছেন না যে তাঁর পাশে প্রথম বক্তা দাঁতমুখ ছর্কুটে অজ্ঞান হয়ে চেয়ারে ঢ'লে পড়েছেন—একটি লোকও তাঁর চোখেমুখে জল দেবার জন্য উপস্থিত নেই।

বাস্তবিক কয়েকজনের কাণ্ডজ্ঞানহীন বিরাম-বিহীন বক্তৃতাপ্রবাহ মানুষকে অস্থির করে তুলতে পারে।

নারী পুরুষ কেউ কম যান না। বাড়িতে মহিলাদের দেখুন—সকাল থেকে কাকচিল বসবার জো নেই! চাকর, ঝি, ছেলেপুলে, কর্তা কাউকে ভাগে কম দেবেন না—স্বয়ং বীণাপাণি মহারাণীদের কণ্ঠে ভর করে জলতরঙ্গে ঝালা বাজিয়ে চলেছেন। এই হল না, ওই করলে না, একে দেখলে না, সেটা আনলে না, ওঁর জন্যে হাড়মাস ভাজা হয়ে গেল ইত্যাদি ভাল ভাল কথা কত শুনবেন শুনুন!

মহিলাদের এই অবিশ্রান্ত বকা একটা রোগ। প্রাতঃকাল থেকে রাত্তিরে যতক্ষণ না আড় হয়ে নাক ডাকাচ্ছেন, ততক্ষণ বকার বিরাম নেই।

সম্প্রতি একটি বিলিতি কাগজে পড়লুম যে কোন এক কুমারী চুয়ান্ন ঘণ্টা অবিশ্রান্ত বকে কথা-বলার রেকর্ড স্থাপন করেছেন। অবশ্য এ একটা এমন কিছু নয়—আমাদের নারীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে এলে ঠাকরুণকে তিনবার ইংলিশ চ্যানেল পার করিয়ে দিত। এ বিষয়ে আমাদের মেয়েদের হারাবে, এটা ভাবতেও পারা যায় না।

তবে আমি কেবল ভাবি উক্ত মহিলাটির যিনি স্বামী হবেন, কিংবা হয়েছেন, তিনি যদি রামকালা না হন, তা হলে বেশীদিন ঘর-সংসার করতে পারবেন বলে তো মনে হয় না। এটা বললুম এইজন্যে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি।

আমাদের এক ভবপিসী—পিসেমশাই সম্ভবতঃ তাঁর বচনের চোটে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, সেই বিধবা মহিলাকে বত্রিশ বছর আমাদের বাড়িতে দেখেছি। প্রাতঃকাল ভোর চারটের সময় উঠে কলে গিয়ে চেঁচাতে শুরু করলেন, তারপর গঙ্গাস্নানে চেঁচাতে চেঁচাতে চললেন, ঘণ্টাদুয়েক পরে রাস্তায় চিৎকার করতে করতে ফিরলেন, সারাদিন লোকজন বাড়ির বৌ-ঝি প্রত্যেকের সঙ্গে ঝগড়া করে, রাত্তিরে ভাইপোদের আপিস থেকে ফেরার পর, প্রত্যেকের কুচ্ছো জানিয়ে, রাত বারোটা নাগাদ শুলেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বিড়বিড় করে বকতেন। এঁর

বিবরণী খবরের কাগজে বেরুলে, বোধ হয় একাদিক্রমে গালাগালি দেওয়ার রেকর্ড ভঙ্গ করার জন্য, আজকের দিনে কোন প্রতিযোগিতায় একটা মোটা রকমের পুরস্কার পেয়ে যেতেন।

অবশ্য শুধু পিসিরাই এরকম ব্যাপারে দোষী নয়, দু-চারজন পিসেমশাইও এদেশে আছেন যাঁদের বাচনিক সুধাবর্ষণের ফলে পৃথিবী অন্ধকার দেখতে হয়।

অত কথা ছেড়ে দিন—পরনিন্দে, পরের কেচ্ছা, বিশেষ যদি আবার তার সঙ্গে নারী জড়িত থাকে তা হলে লোকের কাছে তা খুব শ্রুতিমধুর লাগে, কিন্তু তারও পরিমাণ ঠিক না থাকলে যে মারপিট হয়ে যায়, এও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি।

পাড়ায় চায়ের দোকানে সেধোবাবু আর কেঁদোবাবু বলে দুটি ভদ্রলোক সকাল সন্ধ্যে বসে বসে আড্ডা জমাতেন—কী ভাব উভয়ের! দুজনে যাকে বলে, হরিহর আত্মা। বয়েস উভয়েরই পঁয়ষট্টি পেরিয়ে গেছে তবু এ বয়সে দুজনের মধ্যে সবদা প্রীতির টাগ-অব্-ওয়ার্ চলত।

সেধোবাবুর শরীর খারাপ হলে কেঁদোবাবুর শরীর ম্যাজম্যাজ করত, আবার কেঁদোবাবুর সর্দিতে গলা খুসখুস করলে, সেধোবাবুর কাসি বেড়ে যেত। একজন কোনদিন একটু আসতে বিলম্ব করলে, অপরজন দোকানী-প্রদত্ত হুঁকোয় একটা টান মেরেই অপরের শরীরগতিকের খবর নিতে হনহন করে তার বাড়ির দিকে ছুটে যেতেন। এ হেন বন্ধুদের মধ্যেও একদিন শুধু এক ব্যাপারের পুনরাবৃত্তির ফলে, ছাতা পেটাপিটি হয়ে যাবার উপক্রম হল ও পরে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। অথচ যে-জিনিসটাকে উপলক্ষ করে ব্যাপারটা ঘটল তা উভয়ের কারুরই স্বার্থবিরোধী ছিল না—শুধু একঘেয়ে ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি পরস্পরের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিল।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলি। সেধোবাবুর পাড়ায় কোন এক ভদ্রলোক নাকি চটে গেলেই তাঁর স্ত্রীকে ঠেঙাতেন—এই সংবাদটি সেধোবাবু যেদিন বেশ রসিয়ে কেঁদোবাবুকে বললেন, সেদিন তিনি সেটি বেশ উপভোগ করেছিলেন। ঠেঙানো, ঠেঙানোর কারণ, স্ত্রীর চরিত্র, স্বামীর চরিত্র ইত্যাদি সবকিছু সংবাদ নিয়ে রীতিমত খুশীও হয়েছিলেন নিশ্চয়—নইলে সেধোবাবুর প্রাত্যহিক বক্তৃতার মধ্যে এটি একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হল কি করে?

প্রত্যহ এই ব্যাপার শুনতে শুনতে কেঁদোবাবু ক্রমশঃ অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলেন। অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করার চেষ্টা করতেও ত্রুটি করলেন না। তাঁকে দূর থেকে আসতে দেখলেই বেশ গম্ভীর ভাবে খবরের কাগজ পাঠে মনঃসংযোগ করতে লাগলেন—সেধোবাবু কিন্তু খুঁটি ছাড়েন না—উক্ত নারী-পুরুষের নব নব কেচ্ছা শুনিয়ে চলেছেন।

কেঁদোবাবু একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে বলেও ফেললেন, দুর ভাই, ছাড়ান দে ও-সব কথা, অন্য কথা পাড়্।

তাতেও সেধোবাবুর কোন অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করা গেল না। পরিশেষে বন্ধুকে দূর থেকে আসতে দেখলে কেঁদোবাবু পালাতে শুরু করলেন, কিন্তু এক পাড়ায় থেকে কদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবেন? দেখা হতে লাগল আর কেচ্ছা শুরু হল—বুয়েছ কি না···

দিন পনেরো তাঁর হাত এড়াতে কেঁদোবাবু হাজারীবাগ পালিয়ে গেলেন, কিন্তু ফিরে আসতেই সেধোবাবু পাকড়ালেন তাঁকে। একটা দুটো অন্য কথা বলেই, বুয়েছ কেঁদো, তুমি তো ছিলে না, এতদিন তাই সব মজার কাণ্ড বলতে পারি নি···কাল রাত্তির দশটার সময়, আবার বুয়েছ কি না, বৌটাকে ধরে দিলে ঠেঙানি!

কেঁদোবাবু খেপে উঠে ছাতাটা বাগিয়ে ধরে হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন, বেশ করেছে, ও তার বউকে ঠেঙিয়েছে, তোর বাবার কি? তোর বউ থাকে, তুই ঠেঙাগে যা। খবরদার, সেধো, ফের যদি ওই কথা আর তুলেছিস, তা হলে এই ছাতির বাঁট দিয়ে তোর মাথার ঘিলু আমি বার করে দেব—হাঁ।

বাস্! সেই থেকে জন্মের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

দেখুন, যথাসময়ে থামতে না জানলে অপরের কেচ্ছা শোনাও কী যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। ঠিক সময়ে থামবার কৌশল না জানলে বিপদ ঘটবেই।

চতুর্দিকে আমাদের এত যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে কেন? কারণ, আমরা থামতে জানি না। নাচ, গান, হুজুগ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা, মহাপুরুষদের শ্রাদ্ধ, গালমন্দ কিছুই বাদ পড়ছে না—অবাধ, নিরঙ্কুশ, স্বাধীন ও অশ্রান্ত ভাবে আমরা একটা বিষয় নিয়েই অবিরাম মোচ্ছব চালিয়ে যাচ্ছি—থামবার নাম নেই আমাদের।

কিন্তু থামা দরকার। রসিক মাত্রেই কোথায় থামতে হয়, ঠিক জানেন। ভগবানকে বলা হয়, রসো বৈ সঃ, তিনি রসস্বরূপ, প্রকৃত সুরসিক। তার প্রমাণ—যথাসময়ে তিনি আমাদের নাচনকোঁদন ও আস্ফালনকে একেবারে জন্মের মত থামিয়ে দেন। নচেৎ আমাদের অবিরত মুখভেঙানি দেখতে দেখতে ও শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শুনতে শুনতে মানুষ বোধ হয় পাগল হয়ে যেত।
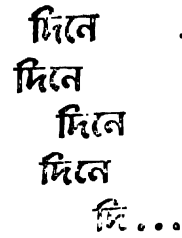
শিক্ষণীয়

রাণু ভৌমিক

ব্রহ্মা সরস্বতীকে বলিলেন, বৎসে, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি—শ্রবণ কর।

আজ্ঞা করুন।—কৃতাঞ্জলিপুটে সরস্বতী দণ্ডায়মানা হইলেন।

উপবেশন কর।

ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি সভ্যতার সংজ্ঞা জানিতে চাহিয়াছ?

সরস্বতী সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়িলেন।

অপ্রকৃতকে প্রকৃতরূপে চালানোই সভ্যতা।

সে কি!—সরস্বতী চমকাইয়া ওঠেন।

নিম্নে দৃষ্টিপাত কর।—ব্রহ্মা বলিলেন, কিছু দেখিতেছ কি?

অসংখ্য মণিমাণিক্যখচিত দ্যুতিময় ভূষণ-ভূষিতা এক নারী। এ যে ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে ইন্দ্রাণীকেও পরাজিত করে…

ইহা গ্রহণ কর।—একখণ্ড স্বচ্ছ ধাতব পদার্থ ব্রহ্মা সরস্বতীর হাতে দিলেন।

এ কি! কোথায় হীরকদ্যুতি, মুক্তার স্বচ্ছতা, স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য!

নকল।—ব্রহ্মার মুখে মৃদু হাসি।

আবার দৃষ্টিপাত কর।—পরক্ষণেই আদেশ করেন তিনি: কি দেখিতেছ?

কি অপূর্ব সুন্দরী!—সরস্বতীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ: স্বর্গের উর্বশীও এত সুন্দর নয়।

মর্ত্যের লোকদেরও সেই ধারণা। তাই ওর নাম উর্বশী-উত্তমা। কিন্তু…

কিন্তু কি?

আমার মত ভিন্ন।

কেন?

প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মা সেই ধাতব পদার্থটি আগাইয়া দিলেন। মুহূর্তেই সেই অপরূপার কৃত্রিম পোশাকের নীচের থলথলে দেহ এবং সুর-অঙ্গরাগের অন্তরালে বলিরেখাঙ্কিত কুৎসিত মুখ প্রকট হইয়া উঠিল।

ওইদিকে দেখ।—ব্রহ্মা আবার বলিলেন।

সরস্বতী দেখিলেন, অধ্যয়নক্লিষ্ট শীর্ণদেহ কয়েকটি ছাত্র প্রাণপণে লিখিবার বিফল চেষ্টা করিতেছে এবং তাহাদের পাশে বসিয়াই ধূম্রপানকলঙ্কিত হস্তে একটি ছাত্র পুস্তক দেখিয়া মহানন্দে লিখিয়া যাইতেছে। ছেলেটির পাশে একটি কাগজে ছোরা ও লাঠি অঙ্কিত এবং সে মধ্যে মধ্যে কোন একটি গানের সুর ভাঁজিতেছিল। ব্রহ্মা গম্ভীরমুখে বলিলেন, এই ছেলেটিই সমবেত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী নম্বর পাইবে।

ক্রুদ্ধা সরস্বতী বিনা বাক্যব্যয়ে ব্রহ্মার হাত হইতে ধাতব পদার্থটি ছিনাইয়া লইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই শিহরিয়া উঠিলেন, এ কি! এই ব্যক্তি সাহিত্যসম্রাট সম্মানে ভূষিত হইতেছে! ইহাকে যে আমি অশ্লীল অর্বাচীন লেখার জন্য অভিশাপ দিয়াছিলাম।

সে অভিশাপে ইহার কিছুই হয় নাই। কারণ, তোমার আশীর্বাদপুষ্ট প্রাচীন সাহিত্যিকদের নকল করিয়াই ইহার সাহিত্যকীর্তি। মজা এই যে—

কি?—প্রশ্ন করেন সরস্বতী।

পুরস্কারদাতা বিচারকরাও জানেন যে ইনি পরস্মৈপদী।

তবে? রুদ্ধকণ্ঠে সরস্বতী জানিতে চাহেন।

তবে! নকলকে আসলের মত চালানই সভ্যতা।

ভ্রূকুটিকুটিল চোখে সরস্বতী ব্রহ্মার দিকে তাকান। হঠাৎ তাঁহার মনে হয় ব্রহ্মার অপর তিনটি মুখ সম্মুখের মুখটি অপেক্ষা অনেক সুন্দর। সেই মুখগুলির হাসি অনেক বেশী স্বর্গীয়, চোখের দীপ্তি উজ্জ্বলতর। তিনি ধাতব পদার্থটি ব্রহ্মার দিকে তুলিয়া ধরেন। ব্রহ্মা দ্রুত সরিয়া গিয়া স্বীকারোক্তির ভঙ্গীতে বলেন, নকল।

ফুলের জলসায়

দক্ষিণারঞ্জন বসু

এমনটি আর কোথাও দেখি নি। দেশে-প্রবাসে কোথাও না। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল মিউজিয়ামে এসে আমার চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। এতক্ষণে দুটি চোখ আমার যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চারদিকে শুধু প্রাসাদ আর প্রাসাদ। শুধু অন্তহীন ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। মন পীড়িত হয়ে উঠেছিল তাতে। একটু ব্যতিক্রম খুঁজছিলাম। ইট কাঠ লোহা পাথরের এই রুক্ষতার মধ্যে একছিটে মিষ্টি সবুজের রেখা খুঁজে পেতে চাইছিলাম।

যা চেয়েছিলাম, এখানে এসে তাই পেলাম। বরং বেশীই পেলাম। এই বোটানিক্যাল মিউজিয়ামে দেখলাম, দিকে দিকে যেন অসংখ্য প্রজাপতির ভিড় জমেছে। যেন রামধনুর রঙ মুখে মেখে হাজার রকমের ফুল এখানে চোখ মেলেছে। কী তার তীব্র আকর্ষণ! কী তার নয়নাভিরাম রূপ! একবার তাতে চোখ লাগলে সে চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। আমিও পাঁতিপাঁতি করে সে ফুলের উৎসব লক্ষ্য করছিলাম। লক্ষ্য করছিলাম আর ভাবছিলাম, কোথায় এলাম, কোন স্বর্গের নন্দন কাননে!

আমার সঙ্গে স্টুডেন্ট গাইড। সে জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে?

সুন্দর, চমৎকার!

হ্যাঁ, এ ফুল যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়। সবাই এর প্রশংসা করে।

নিশ্চয়ই করবে। সুন্দর মুখ আর সুন্দর ফুলের প্রশংসা না করে উপায় কী? নইলে যে—

খুনী বলে ঠাওরাবে সকলে, না?—গাইড আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে হাসল। সেই হাসির স্ফুলিঙ্গ লাগল তার দুটি চোখেও। আমিও হাসলাম। বললাম, সে কথা তো কবিরা বলেছেন। দার্শনিকরাও বলেছেন। পৃথিবীর সকল ভাষায় সকল সাহিত্যেই তা বলা হয়েছে। যা সুন্দর তা-ই আনন্দময়। তাই কল্যাণের আকর। সর্বত্র তার সমান আকর্ষণ। কিন্তু একটা কথা যে কিছুতেই বুঝতে পারছি নে।

কি? বলুন সে কথা।

সেই সুন্দরকে এখানে খাঁচায় আটকানো হয়েছে কেন? এই কাচের খাঁচায়? এ কি তোমাদের ভোগমুখী সভ্যতার উৎকট লক্ষণ? যাকে চাই, তাকে বেঁধেছেঁদে আপন করে চাই। সে যেন কোনমতেই হাতের মুঠো থেকে ফসকে যেতে না পারে সেজন্য সতত হাস্যকর চেষ্টা।

আপনি কি এই ফুলগুলোকে কাচের বাক্সে রাখবার কথা বলছেন?

হ্যাঁ, আমি উত্তর দিলাম।

ছাত্রটি বলল, ওগুলো যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অমূল্য সম্পদ মিস্টার বোস। শুধু এই উত্তর আমেরিকায়ই নয়, সারা দুনিয়া জুড়ে এ ফুলের সুখ্যাতি। এগুলো তো খুব যত্ন করেই রাখা প্রয়োজন।

ফুল ফুটবে, আবার ঝরবে। একদিন যে হেসেছিল আবার একদিন তার চোখে নামবে কান্না। এই কান্নার পর আবার একদিন হেসে উঠবে সে। আবার ফুল ফুটবে। এইভাবেই চলবে তার পরিক্রমা। কিন্তু কোনো ফুলকেই তো শাশ্বত করে রাখা যায় না। চিরকাল তার হাসিকে ধরে রাখা যায় না। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার এমন খেয়াল হলো কেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের?

গাইড আবার হাসল আমার কথা শুনে। আবার সেই হাসির ঢেউ লাগল তার স্বচ্ছ দুটি চোখের পাতায়। সে বলল, আপনি কি আসল ফুলের কথা বলছেন মিস্টার বোস?

হ্যাঁ। তাই তো।

কিন্তু এগুলো তো আসল ফুল নয়।

আসল ফুল নয়! তবে?—একটা বিস্ময় যেন আমার দু চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল।

ছাত্রটি বলল, কাছে এসে দেখুন, এ সবই কাচের ফুল। বিচিত্র বর্ণের কাচ দিয়ে এ সব ফুল ও ফুলগাছ

সোনার মেয়ের
হরিন চোখে
রূপের নাচন দেখে...
LTS. 11-X52 BG

এবং কোথায়ও বা তার ফল গড়ে তোলা হয়েছে। খুব পাকা জহুরী না হলে দূর থেকে আসল-নকলের ব্যবধানটি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবে না। আসলে, আসল আর নকলের ব্যবধানও খুব একটা নেই। আপনি নিজেই একবার লক্ষ্য করে দেখুন না।

গাইডের কথায় গ্লাস-কেসের খুব কাছে এসে মাথা নুইয়ে বেশ ভালো করে ফুলগাছগুলোর বৈশিষ্ট্য বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম। আসল-নকলের তফাত ধরা পড়লো এতক্ষণে।

সত্যি তো! খুব নিপুণ শিল্পী এগুলো গড়ে তুলেছে। তাদের একাগ্রতা, তাদের সাধনা যেন বাঙ্ময় হয়ে আছে এখানকার প্রতিটি লতায়, প্রতিটি পাতায়, প্রতিটি ফুলে। শিল্পীর সাধনায় এখানে রচিত হয়েছে একটি অপরূপ উদ্যান।—গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি মুগ্ধ হলাম। মুগ্ধ হয়ে উন্মুখ হয়ে উঠলাম এ উদ্যানের সৃষ্টির ইতিহাস ও স্রষ্টার পরিচয় জানবার জন্য। আমার গাইডই সে ব্যবস্থা করে দিল। তার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের একজন পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ হলো।

মিউজিয়ামের সেই কর্তাব্যক্তির মুখেই এই উদ্যান-রচনার ইতিহাস শুনছিলাম। জার্মাণ শিল্পী লিওপোল্ড ব্লাচকা (Leopold Blaschka) ও তাঁর ছেলে রুডলফ হলেন এই কৃত্রিম মাল্‌ঞ্চের স্রষ্টা। কাজটা আরম্ভ করেছিলেন শিল্পী লিওপোল্ড। ১৮৭৭ সন থেকে ১৮৯৫ সন পর্যন্ত দীর্ঘ আঠার বছর ধরে কাজ করার পর লিওপোল্ডের ওপারের ডাক এল। তিনি মারা গেলেন। পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য এগিয়ে এলেন শিল্পী রুডলফ। ১৮৯৫ সন থেকে ১৯৩৬ সন পর্যন্ত তিনি কাজ করলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি শ্রেণীর ফুলের একটি করে নমুনা এখানে ধরে রাখবার পরিকল্পনা ছিল গোড়াতে। যদিও সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬৪টি কুসুম-পরিবারের অন্ততঃ সাত কোটি ফুলের নমুনা আছে এখানে। আছে নানান রকম ফল। আছে বিভিন্ন ফলের পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের নমুনা। আছে হাজার হাজার ফুলের বিভিন্ন অংশের বিবর্ধিত উদাহরণ। দর্শকেরা এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়। ছাত্ররা এ দেখে শেখে। কাজেই এই কৃত্রিম উদ্যান একদিকে যেমন মানুষের সৌন্দর্যের তৃষ্ণা মিটিয়ে চলেছে, অন্যদিকে পূর্ণ করছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রয়োজন।

পরে দেখলাম, এই উদ্যানের সৃষ্টির কথা ও স্রষ্টাদের সংক্ষিপ্ত সচিত্র পরিচয় সামনেই বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে গ্লাস-কেসের মধ্যেই।

ফিরে আসবার পথে আমার গাইডকে আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, এমন সুন্দর সৃষ্টিকে তোমরা পিঞ্জরবন্দী করে রেখেছ কেন?

আমার প্রশ্নে যেন আঁতকে উঠেছিল গাইড। খানিকক্ষণ তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে। তারপর বলেছিল, সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসকে আপনারা কোথায় রাখেন? নিশ্চয়ই রাস্তায় ছড়িয়ে রাখেন না।

ছাত্রটির এ কথার ইঙ্গিত মোটেই অস্পষ্ট নয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল মিউজিয়ামের এই কৃত্রিম উদ্যানকে কর্তৃপক্ষ খুব মূল্যবান সম্পত্তি বলে বিবেচনা করেন। এবং সত্যি সত্যি এ তাই। তারই জন্য এর সংরক্ষণের এমন সুন্দর ব্যবস্থা। সেদিন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দর ফুলের জলসা থেকে প্রসন্ন মনে হোটেলে ফিরছিলাম। সে রঙ মন থেকে আজও মুছে যায় নি। কোনদিনই যাবে না।

অথ পাঠক-কথা

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এদেশে পাঠক নিয়ে চিন্তা শুরু হয়েছে দীর্ঘদিন আগে। এ যুগে নয়, পুরাকালে। সত্যদ্রষ্টা মুনি ঋষিরাই এই চিন্তা শুরু করেছিলেন। শ্রুতি বলেছেন, সাধারণ পাঠক আর ব্রহ্মতত্ত্ব পড়ছে না, শিষ্যরাও তা বর্জন করতে চাইছে গুরুত্বের জন্য। অর্থাৎ সমাজটা হালকা হয়ে গেছে। ভারি কিছু পড়াতে হলে তাকে লঘুভাবে পরিবেশন করতে হবে। এই প্রয়োজনেই সাহিত্যে নতুন রীতির প্রবর্তন হল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব পরিবেশন করা হল গল্পের আকারে।

রাজর্ষি জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে নানা দেশ থেকে বহু ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়েছেন। রাজর্ষির ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা শোনবার ইচ্ছা হল। তিনি এক সহস্র পয়স্বিনী গাভীর প্রতি শৃঙ্গে দশটি স্বর্ণ পদক বিলম্বিত করে রাজসভায় ঘোষণা করলেন: যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতাম্। মানে, আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ তিনি এই সহস্র গাভী অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।

সভাস্থ সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। এ বড় দুঃসাহসের কাজ, অহঙ্কারের কাজও বটে। কেউই উঠে দাঁড়াতে সাহসী হচ্ছেন না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য হঠাৎ তাঁর শিষ্যকে আদেশ করলেন: সামশ্রব, এই গাভী আমার আশ্রমে নিয়ে যাও।

কী।—সমবেত কণ্ঠে গর্জন করে উঠলেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়: এত বড় স্পর্ধা! তবে এস, বিচার হোক।

বিচার শুরু হল। রাজর্ষি জনকের সভাপতিত্বে তর্ক-যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। অশ্বল, আর্তভাগ, ভুজ্যু, উষস্ত, কাহোল—একে একে সকলেই পরাস্ত হলেন। তারপর উঠলেন বচক্নু কন্যা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, ভারতের শ্রেষ্ঠ মনস্বিনী। গল্প জমে উঠল।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ আমরা পড়ি না। ছোট ছোট নিবন্ধে পড়ি গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য বিচার, কিংবা মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?

প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে মহাভারতের যুগেও এই ক্ষোভ দেখেছি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস দেখলেন যে, দিন দিন মানুষের স্মৃতি কমে আসছে। সকল শিষ্যের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ স্মরণ রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। বেদ তখন ত্রয়ী নামে পরিচিত। ত্রিধা বিভক্ত—ঋক্, সাম, যজুঃ। ঋগ্বেদে পদ্য, সামবেদে গীত ও যজুর্বেদে গদ্য অংশ। বেদব্যাস এই বেদকে চার ভাগ করলেন। যাগযজ্ঞে অপ্রয়োজনীয় অংশকে অথর্ববেদের অন্তর্গত করলেন। তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। দেখছিলেন যে, শিষ্যরা পরিশ্রমী নয়। বেদের শিক্ষা আরও সহজে তাদের বিতরণ করতে হবে। তাই একখানা সরল গ্রন্থ লিখলেন। প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে বেদের অর্থপ্রচারের চেষ্টা করলেন। এই গ্রন্থের নাম হল পুরাণ-সংহিতা। তার শ্লোকসংখ্যা চার লক্ষ। বেদব্যাস বেদ পড়ালেন চারজনকে, ও পুরাণসংহিতা ছয়জন শিষ্যকে। এঁদের মধ্যে তিনজন আরও তিনখানি পুরাণ রচনা করলেন। শিষ্যদের নামে নাম হল সাবর্ণি সংহিতা, শাংশপায়ন সংহিতা ও অকৃতব্রণ সংহিতা। এই থেকেই আঠার মহাপুরাণ ও ছত্রিশ উপপুরাণ। একশো বছরের মধ্যেই এই সমস্ত রচনা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। মহর্ষি শৌনক নৈমিষারণ্যে যে যজ্ঞ করেছিলেন, সে সময় সমস্ত পুরাণ পাঠ করে শোনানো হল।

এ তো গেল সে যুগের পাঠকের কথা। এ যুগের

পাঠকের কথা এখনও কেউ লেখেন নি। তবে এ যুগের মানুষের কথা লেখা হয়েছিল কল্কিপুরাণে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, আঠারটি মহাপুরাণ আর ছত্রিশ উপপুরাণের তালিকায় কল্কিপুরাণের স্থান নেই। মহাভারত ভাগবত ও অন্যান্য অনেক পুরাণে কল্কি অবতারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কলিকালে কল্কি অবতার হবেন। এখনও তাঁর জন্ম না হয়ে থাকলেও কলিকালের মানুষের কথা সত্যে পরিণত হয়েছে। রামের জন্মের পূর্বে যেমন রামায়ণ রচনা, তেমনি কল্কিপুরাণ। কলির আবির্ভাবের অনেক আগেই পুরাণকার কলিযুগের বর্ণনা করে গেছেন।

পুরাণকার বললেন :

প্রতিদানে ক্ষমাশক্তৌ বিরক্তিকরণাক্ষমে।
বাচালত্বঞ্চ পাণ্ডিত্যে যশোঽর্থে ধর্মসেবনম্॥

ক্ষতি করতে না পেরে মানুষ ক্ষমা করবে, আর বিরাগ দেখাবে অক্ষমের প্রতি। পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য লোক বাচাল হবে, আর ধর্মসেবা করবে যশের জন্য।

তারপর :

ধনাঢ্যত্বঞ্চ সাধুত্বে দূরে নীরে চ তীর্থতা।
সূত্রমাত্রেণ বিপ্রত্বং দণ্ডমাত্রেণ মস্করী॥

ধনী হলেই লোকে সাধুর সম্মান পাবে, আর দূরদেশের জলকেই তীর্থ মনে করবে। গলায় সূত্র নিয়েই লোকে বিপ্র হবে, আর দণ্ড হাতে নিলেই হবে পরিব্রাজক।

পুরাণকার নারীকেও বাদ দেন নি। বলেছেন :

স্ত্রিয়ো বেশ্যালাপসুখাঃ স্বপুংসা ত্যক্তমানসাঃ।

আর :

স্ত্রিয়ো বৈধব্যহীনাশ্চ স্বচ্ছন্দাচরণপ্রিয়াঃ।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আর মন থাকবে না, তারা বারনারীর মত আলাপ-সুখে মত্ত হবে। আর স্বেচ্ছাচারিণী হবে। কাজেই বিধবা তারা কোনদিন হবে না।

পুরাণকার নিজেও তাঁর পাঠক সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই কালিদাসী ঢঙে বর্ণনা করেছেন :

তস্যাঃ স্মরক্ষোভ নিরীক্ষণেন
স্ত্রিয়ো বভূবুঃ কমনীয়রূপাঃ॥
বৃহন্নিতম্বস্তনভারনম্রাঃ
সুমধ্যমাস্তৎ স্মৃতিজাত রূপাঃ॥

তাঁর নায়ক কল্কি যখন সিংহলরাজকন্যা পদ্মাবতীর প্রথম সাক্ষাৎ পাচ্ছেন, তাঁর সেই নায়িকা-সম্ভাষণ উদ্ধৃত না করাই ভাল। এখনও বোধ হয় সমাজে সে অবস্থা আসে নি। তবে আসতেও আর বোধ হয় বেশী দেরি নেই। আধুনিক সাহিত্যে তার লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

এদেশে যে একদিন হিন্দু কোড বিল পাস হয়ে সামাজিক জীবনে স্বাধীনতা অবাধ হবে, বাল্মীকি বেদব্যাস তা জানতেন না। তা জানলে বলতেন না যে, ধর্মের জয় হবে। এ কথা বলে আর পাঠকের মনোরঞ্জন করা যায় না। বর্তমানের লেখক তাঁর প্রাণমন অর্পণ করছেন পাঠকের মনোরঞ্জনে। সাহিত্য কি সমৃদ্ধ হচ্ছে?

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
ঠাকুমারও পছন্দঃ ঠাকুমা কি আজকের লোক- তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতা। তিনিও খুশী হয়েছেন লক্ষ্মীর সানলাইট সাবানে কাচা কাপড় দেখে। কি ধপধপে ফর্সা, আর ঝকঝকে রঙীন।
লক্ষ্মী জানে যে অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায় এবং লক্ষ্মী এটাও দেখেছে যে ধুতি, সার্ট, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব কিছুই আশ্চর্য্য রকম সাদা ও উজ্জ্বল হয় সানলাইটে। সানলাইটের কার্য্যকরী, প্রচুর ফেনা ময়লার প্রতিটী কণাকে বার করে দেয়, কাপড় আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার পরিবারের কাপড় কাচার জন্য আপনিও সানলাইট সাবান ব্যবহার করুন না কেন?
SUNLIGHT SOAP
সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে
2681C-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভার কর্তৃক লিঃ, প্রস্তুত।

দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি

নারায়ণ দাশশর্মা

১। প্রথম পাতা: স্ট্যাটিস্টিক্স

ইংরেজীতে যে বলে থাকে, মিথ্যা তিনরকম—মিথ্যে, ডাহামিথ্যে আর স্ট্যাটিস্টিক্স; আমরা, স্বভাবতঃ মিষ্টভাষী বাঙালীরা, তেমন করে বললে পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের ওপর বড়ই অন্যায় করা হবে। ওই ইংরেজী প্রবচনটির বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিত এই: সত্য তিনরকম—সত্যি, বউয়ের কাছে তিন সত্যি, আর পরিসংখ্যান।

সেই গল্পটা আপনারা সবাই শুনেছেন। সেই যে, দক্ষিণ আফ্রিকার জাঁদরেল প্রধানমন্ত্রী স্মাট্‌স যখন কালা আদমীর চাইতে সায়েবরা ক্রমবিবর্তনের ধাপে দু-সিঁড়ি উঁচুতে রয়েছে এই তথ্যটা পার্লামেন্টে প্রমাণ করার জন্যে জুতসই স্ট্যাটিস্‌টিক্স চেয়ে পাঠালেন পরিসংখ্যানের সেরা পণ্ডিতের কাছে; আর তিনদিন তিনরাত একনাগাড়ে লাইব্রেরীর পর লাইব্রেরী ঘেঁটে শেষ করেও সেই পণ্ডিত মশাই পরিসংখ্যান কায়দা করতে পারলেন না; তখন স্মাটস্ সায়েব যা করেছিলেন—সেই গল্পটা? ঝুড়ি ঝুড়ি সংখ্যার ফুলঝুরি ফুটিয়ে পার্লামেন্টকে হতবাক করে তারপর বুড়বাক্ হয়ে যাওয়া পণ্ডিতের বিস্ময়কে আশ্বস্ত করেছিলেন উনি এই কথা বলে, "আরে মশায়, আপনিই যে পরিসংখ্যান কায়দা করতে পারলেন না তিনদিন বসে, পার্লামেন্টের সাধ্য কি তিনঘণ্টার মধ্যে সেইসব বানিয়ে বলা সংখ্যার ভুল ধরবে?"

এ গল্পটা, আমার বিশ্বাস, একেবারেই বানানো গল্প। কিন্তু পরিসংখ্যান নিয়ে যত কথা শুনেছেন তার সবগুলো বানানো নয় তাই বলে।

যেমন ধরুন, যে ভদ্রলোক ভাঁটার সময় খিদিরপুরের ছোটগঙ্গা হেঁটে পেরোতে গিয়ে সে-বছর ডুবে মারা গিয়েছিলেন তিনি যে সেচ-বিভাগের পরিসংখ্যান থেকেই জেনেছিলেন, ভাঁটার সময় টালির নালার গড়পড়তা গভীরতা মাত্র দু ফুট দেড় ইঞ্চি—এটা তো আর বানানো কথা নয়। চার ফুট আর শূন্য ফুটের গড় যে মাত্র দু ফুট, এই সোজা কথাটা না বোঝাতেই এই বিপত্তি। গড়ের গড়খাইতে নিমজ্জন।

গড়ের মজায় শুধু ইনি নন, অনেকেই মজেছেন আরও। বিলেতের 'পাঞ্চ' পত্রিকা একবার গড়ের পায়ে গড় করে লিখেছিল, "সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারলুম, এদেশের প্রত্যেকটি পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীলোকের গড়পড়তা ২'২-টি করে সন্তান আছে; আমরা বলি কি, ওই দশমিক ভগ্নাংশ বাচ্চা নিয়ে মেয়েদের নিশ্চয়ই ভারী অসুবিধে হচ্ছে, সরকার থেকে সাহায্য-টাহায্য দিয়ে আরও আট দশমিক সন্তান প্রসব করার জন্যে ওদের উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাতে করে প্রতিটি মায়ের ছেলে-পুলের সংখ্যা ভাঙাচোরা না থেকে গোটা-গোটা হতে পারে।" এমন একটা সঙ্গত প্রস্তাবে কেন যে ব্রিটিশ সরকার কান দেন নি আমি তো কিছুতেই ভেবে পাই না।

ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আমি সেদিন এক লরি ড্রাইভারের সাফাই শুনেছিলাম। বেচারী নাকি কাকে চাপা দিয়ে ভবযন্ত্রণা ঘুচিয়ে দিয়েছিল। পুলিস বলে, লরিটা ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে ছুটছিল সে-সময়; কিন্তু পরিসংখ্যান দেখিয়ে ড্রাইভার প্রমাণ করে দিলে মশাই, যে তার গাড়ির স্পীড গড়পড়তা ঘণ্টায় পাঁচ মাইলেরও কম ছিল। কেন না, চাপা দেবার আগেকার চব্বিশ ঘণ্টায় লরিটা মোট একশো আট মাইল রাস্তা চলেছে, অর্থাৎ একশো আট ডিভাইডেড বাই চব্বিশ ইকোয়েল্‌স্ টু চার পয়েন্ট পাঁচ মাইল্‌স্ পার আওয়ার; গড় হিসাবে একরকম গড়িয়ে গড়িয়েই চলছিল গাড়িটা। তবু যদি কেউ তার নীচে চাপা পড়ে মারা যায় তবে ড্রাইভারের দোষ কী?

আমি তো সত্যি বলতে কি কোন দোষ দেখতে পেলাম না ওর। একটা লোক মারা গিয়েছে তা না হয় মেনেই নেওয়া গেল, কিন্তু লোকটা ওই লরির নীচে চাপা না পড়লেও তো মরতে পারত। ভেবে দেখতে গেলে, লোকটার মারা যাবার সময় তো আসলে ঢের আগেই হয়ে গিয়েছে ; বাঙালীর গড় আয়ু একুশ বছর পার হবার পরও সে যে বেঁচেছিল তা থেকেই বোঝা যায় পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ওপর লোকটার একদম শ্রদ্ধা নেই ; গড় সম্বন্ধে একদম আইডিয়া নেই ওর ; কাজেই, আইডিয়ার একান্ত অভাববশতঃই, গড়ে পাঁচ মাইল স্পীডে চলা একটা গাড়ির ধাক্কায় অক্কা পেয়ে সেই জ্ঞানহীন লোকটা অবশেষে প্রমাণ করে গেল—স্ট্যাটিস্‌টিক্সকে হেলাফেলা করা কতখানি বিপজ্জনক।

২। দ্বিতীয় পাতা : পলিটিক্স

ইংরেজদের আর একটি কহাবৎ হচ্ছে, দেয়ার ইজ নাথিং আনফেয়ার ইন্ লভ অ্যাণ্ড ওয়ার—প্রেমে ও রণে অন্যায় বলে কিছু নেই। আমরা, বাঙালীরা, ও দুটো ব্যাপারেই একরকম অভিজ্ঞ—সিনেমার প্রেম এবং ডকুমেন্টারীর যুদ্ধ পর্যন্তই আমাদের অধিকাংশের দৌড় ; দু-চারজনের কপালেই শুধু উড়ো আপদের মতন প্রেমের কটাক্ষ ও যুদ্ধের বোমা এক-আধটা স্প্লিণ্টারের খোঁচা দিয়ে থাকবে। কিন্তু অন্য একটা ব্যাপারে আমরা ইংরেজদের চাইতে সকলেই বেশী সুদক্ষ—তা হচ্ছে পলিটিক্স। আমরা তাই ইংরেজী ওই কহাবৎটি একটু বদলে নিয়েছি, দেয়ার ইজ নাথিং ফেয়ার ইন্ পলিটিক্স—রাজনীতিতে ন্যায় বলে কিছু নেই। সবই অন্যায়।

ইংরেজদের রাজনীতি তেমন একটা আসে না, এর কারণ বোধ করি ওদের রাজা আছে। অর্থ থাকতে যেমন অর্থনীতির মারপ্যাঁচ ভাল খেলতে চায় না মাথায়, রাজা থাকলেও তেমনি রাজনীতিতে উৎসাহ জাগতে চায় না প্রজাদের। অর্থনীতির প্রেরণা দেয় ফাঁকা পকেট, রাজনীতির প্রেরণা নৈরাজ্য। আমরা সবাই রাজনীতিবিদ্ আমাদের এই প্রজার রাজত্বে।

আর পলিটিক্স মানেই পার্টি-পলিটিক্স ; দলের মাদল না বাজাতে পারলে রাজনীতির মহুয়ায় আমরা তেমন সোয়াদ পাই না। আমরা তিন কোটি বাঙালী শেষ পর্যন্ত তিন কোটি দল বানাব হয়তো, কিন্তু দলছাড়া হয়ে পার্টির সাইনবোর্ড কপালে না টাঙিয়ে পলিটিক্স করতে পারব না। যত মত তত পথ নয়, আমাদের মটো হচ্ছে যত মাথা তত মত। না, তাই বা কেন, মাথার চাইতেও মতের সংখ্যা হবে বেশী ; যত লোকের মুখ থেকে রাজনীতির মত বেরোয় হামেশা, বাংলাদেশে তত লোকের সকলের কি মাথা আছে সত্যিই ?

এবং এরাই বলে থাকে, মাথা থাকলেই মাথা ঠোকাঠুকি হয়। তা হয়তো হয়—যেমন ভেড়ার মাথার সঙ্গে ভেড়ার মাথায় ; কিন্তু শুধু মাথা না থেকে তার মধ্যে যদি মগজ বলে একটুখানি নরম বস্তুও থাকে তবে মাথা থাকলেই ঠোকাঠুকি কেন হবে, আমি বুঝতে পারি না।

প্রত্যেকটি বাঙালীই রাজনীতিতে এক্সপার্ট হলেও এরই মধ্যে আবার নানান রকম ইতরবিশেষ আছে ; অর্থাৎ রাজনীতিবিদ্‌দের প্রত্যেকের ইতরতা একপ্রকার নয়, তাতে কারও কারও বিশেষ অধিকার আছে। চায়ের দোকানে, সিনেমা-ঘরের কিউতে, ট্রামে এবং রকে যাঁরা পলিটিক্স করেন, অন্যত্র নয়—তাঁরা হচ্ছেন সৌখীন পলিটিশিয়ান ; পলিটিক্স এঁদের পেশা নয়, কেন না ভাল হোক, মন্দ হোক, অন্য একটা পেশা আছে এঁদের : কারও পেশা কলম পেষা, কারও বিড়ি পাকানো, কারও বা শুধু বেকারী। যাঁদের এসব কিছু নেই, তাঁরা হন পেশাদার পলিটিশিয়ান। আমাদের ছেলেবেলায় যাঁরা অন্য কিছু করার কায়দা না পেয়ে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিশ করতেন, আমাদের ছেলেদের আমলে এখন সেই গুড-ফর-নাথিং-এর দল পলিটিক্সের পেশাদার হন। সে যুগে নামের সঙ্গে ওঁরা জুড়তেন এইচ-এম্-বি ; এ যুগে এঁরা জোড়েন এইচ্-এম্-ভি—হিজ মাস্টার্স ভয়েস।

জানি, বন্ধুরা আমাকে সিনিক বলবেন ; আর শত্রুরা আন্দাজ করবেন, নিশ্চয় আমি গত ইলেকশনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলাম এবং আমার জামানত বাজেয়াপ্ত

হয়েছে। কিন্তু ছিটগ্রস্তই বলুন আর ইলেকশনে মার খাওয়াই বলুন, পলিটিক্স এবং পলিটিশিয়ান সম্বন্ধে আমার ধারণা আমি বদলাতে পারব না।

যীশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন, পাপকে ঘৃণা কর কিন্তু পাপীকে নয়। সেই উপদেশ ভেঙেচুরেই আমরা অনেকে ইষ্টমন্ত্র বানিয়েছি: ঘুষকে হজম কর কিন্তু ঘুষিকে নয়। সে পর্যন্ত যদি বা আমি সহ্য করতে প্রস্তুত, তবু এ কথা আমি শুনব না যে পলিটিশিয়ানকে বর্জন করেও আমাদের পক্ষে পলিটিক্সকে বর্জন না করা সম্ভব। প্রথমটিকে যদি আমি 'স্থানত্যাগেন' মন্ত্রে পূজা করি, তবে শেষেরটিকেও অন্ততঃ 'হস্তসহস্রেণ' মন্ত্রজপে এড়িয়ে চলব।

কেন না, সংবিধানের খসড়াপ্রণেতা স্বর্গত ভীমরাও আম্বেদকার তাঁর তপশীলী দলের জন্য যে নির্বাচনী প্রতীক বাছাই করেছিলেন, তা আসলে—বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি—আমাদের দেশের পলিটিক্সেরই যথার্থ প্রতীক। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, শিক্ষাহীন, উদ্যমহীন, বিবেকহীন চল্লিশ কোটির পশুশালায় পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ছায়ানুসারী যে রাজনীতি—তা একটি বিরাটকায় শ্বেতহস্তী ছাড়া আর কী?

৩। একটি কুঁড়িঃ ফিলসফি

আত্মার তত্ত্ব বোঝবার জন্য নচিকেতাকে যমালয় পর্যন্ত ধাওয়া করতে হয়েছিল; আমার জ্ঞানস্পৃহা এবং দুঃসাহস দুই-ই নচিকেতার চাইতে অনেক কম—আমি যমের বাড়ি না গিয়ে যমুনার বাড়িতে গিয়েছিলাম পরশু সন্ধ্যেবেলায়।

যমের বোন যমুনা নয়, এ যমুনা আমার স্ত্রীর বোন—শালী। শালী বলেই তাচ্ছিল্য করবেন না যমুনাকে; সে ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, কলেজের অধ্যাপিকা।

ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা ইংরেজী-বাংলা-সংস্কৃত-পালি নানান ভাষায় কত না শাস্ত্র থেকে কোটেশন শুনিয়ে শুনিয়ে নানারকম আত্মার ব্যাখ্যা বোঝাল সে। কিন্তু আমার মাথায় যদি একটুও ঢুকত সে সব!

শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট যমুনা একেবারে অদার্শনিক শালীজনোচিত কপট কোপ দেখিয়ে বলল, "আত্মা কি আপনার বাইনোমিয়াল থিয়োরেমের 'ঈ', যে নিটোল একটি ডেফিনেশন বানিয়ে দেব তার? আত্মা অনুভব করার বস্তু, দর্শনের তত্ত্ব; ওটা গণিতের ফর্মুলা নয় মশাই। যান, বাড়ি গিয়ে ঘুমোন। রাত সাড়ে দশটা বাজল।"

সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন যমুনাকে 'আত্মা'-র গাণিতিক ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিচ্ছি; স্কুলের ক্লাস সেভেনের মেয়েকে বোঝানো যায়, এত সোজা!

স্বপ্নে পাওয়া সেই ডেফিনেশন যমুনাকে অবশ্য শোনাই নি আমি; যমুনার দিদিকেও না। কিন্তু আপনাদের শোনাতে ক্ষতি কী? আপনারা তো আমার স্ত্রী কিংবা শালী নন। শুনুন তবে:

মৌল স্বতঃসিদ্ধ—Brevity is the soul of wit (অর্থাৎ উইটের আত্মা হচ্ছে সংক্ষেপ I)

অর্থাৎ, B = S of W

অথবা, $S = B \text{ of } \frac{I}{W}$

মানে, Soul is the brevity of wit reversed.

অর্থাৎ উইটের ঠিক উলটো ব্যাপারটিকে সংক্ষিপ্ত করলে যা দাঁড়ায় দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় তাকেই বলে আত্মা।

উইটের সেই উলটো ব্যাপারটি কী, সে কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। হামেশাই দেখতে পাই তাদের, সেই হাফ উইট ব্যর্থ বিদূষকদের, জীবনের সর্বক্ষেত্রে। কিন্তু সোজাসুজি সাদা কথায় আমি বলতে চাই নে বুদ্ধির সেই বিপরীত কথাটি কী, যা সংক্ষিপ্ত করলে গাণিতিক ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় আত্মার সংজ্ঞার্থ। বলতে চাই নে, পাছে আপনার আত্মা দুঃখ পায়!

৩২শ বর্ষ,
১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৭

সংবাদ-সাহিত্য

বিজয়া

দীর্ঘ শারদীয় অবকাশ অন্তে আসামের অভারতীয় বিভেদমন্যতা, উড়িষ্যা-বিহার-উত্তরপ্রদেশের বন্যার বন্যতা, শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্তের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায়কালীন বদান্যতা এবং প্রসিদ্ধ বামাচারী সাধক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শিলিগুড়িতে ছিন্নমস্তীয় আত্মহন্যতা সত্ত্বেও দুর্গতিনাশিনীকে ধন্যবাদ, আমরা ৺বিজয়ার প্রীতিবন্ধনে আবার মিলিত হইতে পারিতেছি। আমাদের অনুগ্রাহক গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের এবং যাবতীয় সহৃদয় পাঠকদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। আসন্ন নবনির্বাচন ও আদমসুমারির দামামাধ্বনি এবং ঢক্কানিনাদ এখনই আকাশবাতাস মুখরিত করিতেছে। আগামী কয়েক মাস সাহিত্যদশমহাবিদ্যার প্রধানতঃ প্রচারমহিমাই প্রকট হইবে। এই ডামাডোলের বাজারে আমাদের শান্ দেওয়ার কোনও কাস্তে নাই। কাজেই বিশেষ শঙ্কা ও সঙ্কোচের সঙ্গে আমাদিগকে চিরাচরিত রুটিন মানিয়াই চলিতে হইবে; আমাদের পাঠকদের কোনও মজার আস্বাদ এই মাজুরকা-নৃত্যের আসরে দিতে পারিব তেমন ভরসা হয় না। মাজুরকা হইতেছে পোল-নৃত্য এবং পোলিং-ব্যাপারে আমরা নিতান্ত আনাড়ি। পূর্বাহ্ণেই অক্ষমতা নিবেদন করিয়া রাখিতেছি।

গোপালদার পুনরাবির্ভাব

গোপালদা দীর্ঘকাল গা-ঢাকা দিয়াছিলেন। গত চৈত্র মাসে হিমালয়-মাহাত্ম্য আমাদিগকে প্রণিধান করাইবার প্রয়াস করিয়া সেই যে তিনি সরিয়া পড়িয়াছিলেন বিজয়ার সম্ভাষণ ছলে এতদিন পরে পুনরাবির্ভূত হইলেন। ডাক-মোহরের ছাপ দেখিতেছি লাডাকের প্রধান শহর লের। তাঁহার প্রীতিসম্ভাষণ-পত্রের আরম্ভটা বিচিত্র। লিখিয়াছেন, "ভায়া হে, সমুদ্র-সমতল হইতে ১১৫৩৮ ফুট ঊর্ধ্বে পশমের গুদামে বসিয়া গৌহাটি, বার্লিন, দার্জিলিং, কঙ্গো, অ্যালজিরিয়া, উনো ও বুয়েনস-আয়ার্সের যে সংবাদ শুনিতেছি তাহাতে মানুষের পাশবিকতা ও পশ্বাচার দৃষ্টে স্তম্ভিত হইতেছি। বিশেষ করিয়া বুদ্ধ তথাগতের এই পবিত্র তথ্যতের পাদদেশে উপবিষ্ট হইয়া মানুষে মানুষে এই বীভৎস হানাহানি বড়ই বিসদৃশ ঠেকিতেছে। তোমরাও যে ভাবে মনিবের চেন গলায় পরিয়া কেন্দ্রীয় খুঁটিবদ্ধ অবস্থাতেই পরস্পরের লেজে কামড় মারিতেছ, তোমাদিগকেও পশু ছাড়া আর

কিছুই মনে করিতে পারিতেছি না। পশুকে আবার প্রীতিসম্ভাষণ জানাইব কি? কাজেই বিরত থাকিলাম।”

গোপালদা পত্রমধ্যে তিনটি কবিতা পাঠাইয়াছেন, কবিতাগুলি পড়িয়া মনে হইতেছে, যতই রাগ করুন, আমাদের আশা একেবারে ছাড়েন নাই, শেষ কবিতাটিতে তো বেদনায় বিগলিত হইয়া চোখের জল ফেলিয়াছেন। কবিতাগুলি তাঁহারই দেওয়া শিরোনামাসহ নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

দেশীয় সংবাদ-পত্রের প্রতি

নিবিড় তিমিরে কে হবে তোমরা আলোর বার্তাবহ?
ঘুমন্ত দেশে ভোরের খবর কে এনেছ কহ কহ।
সারা পৃথিবীর পীড়িত মানুষ ধীরে তুলিতেছে মাথা,
একে একে ভাঙে রাজ্যবাদীর রাজশিয়রের ছাতা।
যারা এল বহু শাসন সহিয়া অত্যাচারীর পাদুকা বহিয়া
আফ্রিকা আর এশিয়ায় তারা খুলিছে “নতুন খাতা”।
মোর স্বদেশের বিমূঢ় মানুষে যুগের নূতন বাণী
তোমরা শুনাও ভীত মানুষের ঘুচাও আত্মগ্লানি।
কোন্ বলে বলী জনসাধারণ শোষক-শাসক-শক্তি হরণ
করিয়াছে, সহি' মৃত্যুসাধন-বেদনা দুর্বিষহ—
কহ তা সবারে কহ,
মুক্তি-বার্তাবহ॥

পরাধীনতার পঙ্ককুণ্ডে মোরা পড়ি অহরহ
কী জ্বালা সয়েছি, মুক্তি লভিতে কী করেছি সবে কহ।
সে মহাযজ্ঞে কত বীরপ্রাণ নিঃশেষে হ'ল বলি,
শোণিতসিক্ত সেই পথচলা কাঁটা-কঙ্কর দলি'
পেনু কতটুকু আলোর আভাস শত বছরের সেই ইতিহাস
ঝিমাইয়া পড়া স্বদেশবাসীরে জাগাও সে-কথা বলি।
এসেছি কি মোরা বাধাবিঘ্নিত সেই সাধনার শেষে—
তোমরা খবর ভাল জানো, দাও সে খবর এই দেশে।
ভাঙিয়া পাষাণ-কারার প্রাচীর ফাঁসীর মঞ্চ করি চৌচির
পার হয়ে মোরা এসেছি কি সেই শোষণের কালিদহ?
কহ তা' সবারে কহ,
মুক্তি-বার্তাবহ॥

ছিন্ন খণ্ড ভারত আবার মিলিছে কি প্রত্যহ,
ওগো দৈনিক, প্রতিদিন প্রাতে সেই সমাচার বহ।
ভ্রাতৃবিরোধ যদি থাকে ভাই, কর তার অবসান
উস্কানি দিয়ে আগুনে ক'রো না আর ঘৃতাহুতি দান,
কোথাও ঘটিলে বিশেষের ভুল টেনো না দোহাই সাধারণমূল,
ছবি-সংবাদে দীর্ঘ করো না ক্ষণিকের খতিয়ান।
তোমার কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠুক প্রেম-মিলনের ভাষা,
কলহ-কুয়াশা কাটাইয়া আনো ভায়ে ভায়ে ভালবাসা।
যুগান্তরের গ্লানি কর দূর, সাদা-বাজারের আনন্দ-সুর
নিয়ে এসে দেশে দীন গোপালের শুভাশিস্ সবে লহ।
মিলনের কথা কহ,
মুক্তি-বার্তাবহ॥

ছিন্নমস্তা

ছিন্নমস্তা আপন শোণিত আপনি করিছে পান,
লালে লাল হল ধূলামাটি জল, লাল হ'ল আসমান।
মোরা দেখিতেছি ভয়ে বিস্ময়ে
আপন কুঠার আপন হৃদয়ে
উঠিছে পড়িছে—চৌদিক জুড়ি জাগিছে মহাশ্মশান,
তাণ্ডব তালে টলিছে মেদিনী, শিব লাজে ম্রিয়মাণ।

কবর-মাটিতে চিতার ভস্মে জাগো রে আবার দেশ,
মৃত্যুর আছে শেষ জানি, জানি জীবনের নাই শেষ!
থামিবে একদা এই তাণ্ডব,
শিবের স্পর্শে জেগে উঠে শব
আবার ধরিবে প্রাণ-পবিত্র আলো-ঝলমল্ বেশ—
আত্মঘাতের শোণিত-প্লাবনে ধুয়ে যাবে ঘৃণা-দ্বেষ।

ওরে ভয় নাই, যদিও জেগেছে ভীষণ ভয়ঙ্কর,
মরু-দাবদাহ ঢেকে দিবে দেখা শ্যাম শোভা মনোহর।
কেটে যাবে গ্লানি, কেটে যাবে মেঘ
রবে না স্মরণে এই উদ্বেগ,
এ গৃহ-আহবে যে প্রশ্ন জাগে পাব তার উত্তর,
মৃত্যু-মূল্যে চিনিতে পারিব কে আপন, কে বা পর।

শিবা-সারমেয়-চিৎকার আজ শুনিস্ না তোরা কানে,
শিব যে কোথায় ধূলায় গড়ায় শিবানী একাই জানে।
সম্বিৎ ফিরে পাইয়া সহসা
আপনি হেরিলে আপনার দশা
শিহরিয়া শ্যামা, লজ্জায় পুনঃ খুঁজে পাবে কল্যাণে।
কমলা-রূপেতে ছিন্নমস্তা শোভা পাবে এইখানে॥

দিনশেষের প্রার্থনা

দেবতা, তোমারে প্রণাম করিয়া অজ্ঞাত পথ চলি,
দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, পদে পদে পরাজয়।
সমুখে আকাশ আশার আলোকে কচিৎ উঠিছে ঝলি
নিবিড় তিমিরে করিতে নিরাশ্রয়।
ভুল ও ভ্রান্তি জীবনে অনেক ঘটিয়াছে বার বার,
আঁকাবাঁকা পথে চলিয়াছি ঘুরে ঘুরে।
তরুণ দিনের প্রখর দাহনে যা ছিল চমৎকার
শেষ দিনমানে কাঁদে পূরবীর সুরে।
দৃষ্টি স্বচ্ছ ভাবি' বিজ্ঞান-অঞ্জন-শলাকায়
দূর গ্রহলোকে করেছি দৃষ্টিপাত,
যে দেবতা মোর অন্তরে ছিল তাহারে উপেক্ষায়
দানবী লীলায় করিয়াছি করাঘাত
যক্ষপুরীর দুয়ারে দুয়ারে প্রমত্ত উল্লাসে—
যা মিলেছে দেখি সব ফাঁকি সব মেকী,
জড়ের ধোঁয়ায় ভারি করিয়াছি জীবনের নিঃশ্বাসে,
দেবতা বিমুখ, হায়, পরিণাম এ কী!
রূপের নেশায়, যশের নেশায় রূপার মুকুরে মুখ
দেখিয়া দেখিয়া আপনারে ছিনু ভুলে,
আপন দম্ভ-বিস্ফোরণেই প্রাণ করে ধুক্ ধুক্
ভীতি-শিহরণ লেগেছে মর্মমূলে।
শূন্যে ফানুস পুড়ে ফেটে যায়, জীবনের অঙ্কুর
আঁধার মাটিতে কাঁদিছে প্রকাশ খুঁজি—
দেবতা, আবার মৃত্তিকারসে নভোজ্বর কর দূর,
আলোকে ফুটিতে দাও আঁধারের পুঁজি।
মাটিই সত্য, সত্য আমার নিকটে যাহারা আছে,
সত্য আমার সংসার-পরিবেশ,
তারাই সত্য যারা সুখে দুখে মোর মুখ চেয়ে বাঁচে,
সত্য আমার দীন দরিদ্র দেশ।
মাটির মানুষ, ধূলার ধরায় যেথাই যে জন থাকো
হয়ো না মত্ত ক্ষণিকের স্পুটনিকে,
ধ্বংস-দেবতা আপনিই আসে। প্রাণ ভ'রে তাঁকে ডাকো
স্নেহে-প্রেমে যিনি গড়েন এ সৃষ্টিকে।

গোপালদার শারদীয় সাহিত্য-পরিক্রমা—"মরা হাতী লাখ টাকা"

গোপালদা লিখিয়াছেন, "ভায়া হে, এতক্ষণ তো গুরুগম্ভীর দর্শনের কচকচি করিলাম, এখন একটু লঘু প্রসঙ্গে অবতরণ করা যাক। বাংলা দেশে ইহাই রেওয়াজ। খোদ বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান শেষ হইতে না হইতে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের শখের বাগানে 'ভ্রমর' হইয়া দুই এক কিস্তি চোঁ বোঁ করিয়া শেষ পর্যন্ত জামাতা রাখালের পাল্লায় পড়িয়া 'প্রচার' অর্থাৎ প্রোপাগাণ্ডার চার ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে চারে যে মৎস্যদেশে কাজ হয় নাই তাহার প্রমাণ 'প্রচারে'র ক্রমাবনতি এবং চারি বৎসরেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের অদৃষ্ট বঙ্কিম অপেক্ষা প্রসন্নতর ছিল না। 'সাধনা'স্তে 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে'র দার্শনিকতা তাঁহার ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যন্ত পৌঁছায় নাই এবং তাঁহাকেও শেষ পর্যন্ত প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ [তাল] পত্রে'র উপর পুচ্ছ নাচাইবার জন্য নবীন ও কাঁচাদের আহ্বান করিতে হইয়াছে। ঘরোয়া 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'ভারতী' এবং স্বদেশী 'ভাণ্ডার' সামান্য মুখবদল মাত্র। বিংশ শতকের বাংলায় একমাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'দাসী' ও 'প্রদীপে'র ট্রেনিং লইয়া স্বদেশে 'প্রবাসী' থাকিয়া দীর্ঘকাল গুরু-গাম্ভীর্য বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। তোমারও ট্রেনিং তাঁহার কাছেই শুরু তাই তুমি এখনও টিকিয়া আছ। তোমাদের গুরু-শিষ্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যিক কৃতিত্ব অপেক্ষা রেড়ো গোঁ এই দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য কতখানি দায়ী সে বিচার করিয়া তোমাদিগকে ছোট করিতে চাহি না।

তবে এবার তোমার শারদীয় সংখ্যাটি নাড়িয়া চাড়িয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে তুমিও ভোল পালটাইতে চলিয়াছ। ভালই করিতেছ। আমি শ্রীগোপাল শর্মা পূর্বাপর সকল বিষয় বিবেচনাপূর্বক বহাল তবিয়তে সুস্থ চিত্তে ঘোষণা করিতেছি যে শারদীয় সংখ্যার সর্বপঞ্জিকা-গ্রাহ্য পুরাতন ঐতিহ্য বর্জন করিয়া তুমি যে নূতনত্ব সম্পাদন করিয়াছ তাহা প্রশংসনীয়। বস্তাপচা মামুলী প্রেমের গল্পে পীড়িত পাঠক-সমাজ আরাম পাইয়াছে।

ভাবিতেছ, ভারতের উচ্চ প্রত্যন্ত দেশে আত্ম-নির্বাসনে থাকিয়া সমুদ্র সমতট বাংলা দেশের শারদীয় সাহিত্যের সহিত আমার যোগাযোগ সম্ভব হইল কেমন করিয়া! খুব সহজে ব্রাদার। মহামান্য দালাইলামার সহযাত্রী এক তরুণ লামা বাংলা "রোমাঞ্চ" গল্প পড়িবার জন্য পাগল। সঙ্গে অঢেল সোনা আনিয়াছেন। তাহাই কাগজে আর নিকেলে রূপান্তরিত করিয়া ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ দিল্লী যাইতেছেন এবং সঙ্গে বোঝা বোঝা বাংলা সাময়িক পত্র লইয়া আসিতেছেন। এবারের পূজার ফসল প্রায় পুরাপুরিই আসিয়াছে। তাঁহার এই নীহারিকা-বিলাসের কল্যাণে আমি আমার জাত-ভাইদের "সুবিপুল" সাহিত্য-কীর্তি পর্যালোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। বিহঙ্গ-নয়নে দর্শন মাত্র নহে, একেবারে গভীরে তলাইয়া যাওয়া; চিটেগুড়ের মটকায় পড়িলে বেচারা মক্ষিকার যে অবস্থা হয় আমার সেই অবস্থা হইয়াছে কিন্তু শ্রীমধুসূদনের কৃপায় একেবারে গলিয়া যাই নাই।

তাই মোদ্দা কথাটা লিখিতেছি—এবারকার গুরুভার শারদীয় নব-সাহিত্য-সম্ভার অতি পুরাতন সেই প্রবাদ-বাক্যই প্রমাণ করিয়াছে—মরা হাতী লাখ টাকা। এই মরা হাতীর দলে রবীন্দ্রনাথও আছেন—ডেড্ এলিফেন্ট রূপে। তাঁহার সেই সর্বজনমুখস্থ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা-কাণ্ডের প্রতিবাদে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে লেখা "সার"-উপাধিত্যাগের ঐতিহাসিক পত্রের খসড়ার ব্লকছাপ হাতে দুই স্মৃতিপ্রমত্ত পালোয়ান—অমল হোম ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ দুই পত্রিকার রণাঙ্গণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। 'আমিত্বের প্রসারে'র দুই নিরাকার ভার্সন অতিশয় কৌতুক-কৌতূহলপ্রদ। একজন আবার জোড়ে নামিয়াছেন, দেশের জোরবরাত!

এবারকার শারদীয় সাহিত্যে একটা বিশেষ লক্ষণীয়—চলচ্চিত্র ও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রভাব। লোকপ্রিয়তমদের নামে যুগকে নামাঙ্কিত করিলে বলিতে হইবে—বাংলা-সাহিত্যে এখন সেন-যুগ ও গুপ্ত-যুগ একসঙ্গে চলিতেছে। ফল ভাল হয় নাই। দেখিতেছি মরাহাতীদের মধ্যে ঐরাবতস্থানীয়রাও চিত্রায়ণ-মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গল্প ফাঁদিয়াছেন, এমন কি, কোন্ ভূমিকায় কে অভিনয় করিবেন সেটা পূর্বাহ্নে স্থির করিয়া লইয়াই ঘটনা ও সংলাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন; পুস্তু, গাড়োয়ালী, সাঁওতালী, বর্মী কোন ভাষাই বাদ নাই। এই গেল সেন-প্রভাব। ওদিকে গুপ্ত-প্রভাবে অতি সাধারণ ঘরোয়া কাহিনীই এমন জটিল করা হইয়াছে যে গল্পটা গল্প না চীনা হেঁয়ালী তাহা ভাবিতেই খানিকটা সময় যায়। আশ্চর্য এই, সিনেমা যাঁহাদের একান্ত উপজীবিকা ছিল সেই শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র বোধ হয় অতি-পরিচিত অবজ্ঞায় ইহার মায়া কাটাইয়াছেন। শৈলজানন্দের স্মৃতি-কথা "অনেক দিনের অনেক কথা"য় পাক্ষিক সাহিত্য-পত্রিকা 'মাধুরী' আপিসের ছবিটি ছায়া-ছবির অপেক্ষায় আঁকা নয় বলিয়াই মনের মধ্যে গাঁথিয়া যায়। তেমনি প্রেমেন্দ্রের বড় গল্প "অন্য এক নাম"। এবারকার তোমাদের শারদীয় কথাসাহিত্যে আমার ধারণা ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। "সাপ" গল্পে প্রেমেন্দ্র খুবই সূক্ষ্ম মুনশীয়ানা দেখাইয়াছেন বটে কিন্তু একটু স্থূল না হইলে চিরন্তন সাহিত্য হয় না। ডিকেন্স বালজাক টলস্টয় দৃষ্টান্ত। "অন্য এক নাম" গল্পে বড় ভাণ্ডারীর চরিত্র চিরন্তন। অসংস্কৃত ভাষায় এমন সংস্কৃত শাশ্বত সত্য সেই বলিতে পারে যে জীবনকে পুরাপুরি দেখিয়াছে। ভাণ্ডারী দেখিয়াছে।

চিরন্তন সত্যের দিক দিয়া 'বনফুলে'র "হাটে-বাজারে" উপন্যাস সার্থক সৃষ্টি। 'তৃণখণ্ড' 'বৈতরণীর তীরে' ও 'নির্মোকে'র ডাক্তারটিই পরিপক্ব দার্শনিক মূর্তিতে "হাটে-বাজারে" দেখা দিয়াছেন। ডাক্তারের যে পরিণাম "হাটে-বাজারে" কল্পিত হইয়াছে তাহা শুধু ভারতীয় নয়, মানব-দর্শনসম্মত।

মরা হাতীদের একজন কিন্তু নানা আধ্যাত্মিক অনুশীলন সত্ত্বেও কেচ্ছা-সাহিত্যের নাগিমায়া কাটাইতে পারেন নাই। শুনিয়াছি তিনি হাকিম থাকাকালে আদালতের লাচ্ছেদার কাহিনীকে অর্থকরী কাজে লাগাইতেন। আলোচ্য গল্পে তিনি কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেচ্ছাকে কাজে লাগাইয়া উৎকট রুচির পরিচয় দিয়াছেন।

মোটের উপর, কথাসাহিত্যে এবার পূজার বাজারে জীবিত বাচ্চা হাতীরা তেমন জুত করিতে পারে নাই। প্রবন্ধ-সাহিত্যে তোমার তিনটি জীবনী-প্রবন্ধই সুলিখিত হইয়াছে এবং অভিনবত্বে গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। বর্তমান সাহিত্যের হালচাল সম্পর্কে তোমার জুনিয়র খোশনবীস যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন আমি তাঁহার সহিত একমত। মরা হাতী শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় "ড্রাগনের দাঁত" প্রবন্ধে স্বজাতিকে কামড়াইবার জন্য নিজের দাঁতটা একটু বেশী ব্যবহার করিয়াছেন, কে কবে তাঁহাকে উড়িয়া আখ্যা দিয়া তাঁহার আত্মাভিমানে ঘা দিয়াছিল এতদিন পরে আমাদকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি সেই ঝালটা ঝাড়িয়া লইয়াছেন। তিক্ততার বাহুল্যে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিও ভাসিয়া গিয়াছে।

কবিতা-প্রসঙ্গ আর তুলিব না। আমি প্রাচীনপন্থী, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস, সাবিত্রীপ্রসন্ন, প্রভাতমোহন, প্রেমেন্দ্র, অজিত, বুদ্ধদেবকে পাইলেই পড়ি কিন্তু তোমাদের ওই অতি আধুনিক কবিতা। উহার ফাঁকির গোলকধাঁধায় ঢুকিতে পারি এত বড় পি. সি. সরকার এখনও হইতে পারি নাই। অতি-আধুনিকই যেখানে প্রবল সেখানে ও প্রসঙ্গ বর্জন করাই ভাল। বাচ্চা লামার কৃপায় এবারের বিজয়ায় আমার যে সাহিত্য-রসোপলব্ধি হইয়াছে তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধের নিকট কৃতজ্ঞ আছি।"

"খতিয়ে দেখি"

"ড্রাগনের দাঁত" সম্পর্কে গোপালদার বিরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও আমরা বলিব প্রবন্ধটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং প্রত্যেক বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য। প্রবন্ধটি আমাদিগকে সত্যসত্যই ভাবিত করিয়াছে কারণ ভারতবর্ষের সর্বত্র একদা-মহিমান্বিত বাঙালীর উন্নাসিকতা লইয়া যে বিদ্বেষ-প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে ধূমায়িত হইতে দেখিতেছি তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি নবসৃষ্ট মহাভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখিতে হইলে মস্তিষ্কগর্বিত বাঙালীকেই সতর্ক সাবধান ও অবহিত হইতে হইবে। ভারতবর্ষের সুনিবিড় পরাধীনতা-অমা-যামিনীর ভোরে বাঙালীই সর্বপ্রথম জাগরিত হইয়া স্বাধীনতার কলধ্বনি তুলিয়াছিল এবং দিগ্বিজয়ের ঝোঁকে ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রসারিত হইয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। আজ প্রতিষ্ঠা গিয়াছে কিন্তু বাঙালীর সর্বভারতব্যাপী অবস্থান বজায় আছে। ঐক্য ও প্রেমসূত্রে বাঁধা না পড়িলে সর্বত্র পকেটভুক্ত সংখ্যালঘু বাঙালীকে উৎখাত হইতেই হইবে। সহ-অবস্থানের প্রথম সূত্র উন্নাসিকতা বর্জন। অন্নদাশঙ্কর সে-কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদার্হ।

দিল্লীর পার্লামেন্ট মহলের গোপন সংবাদ পাইলাম, বাঙালী-সমস্যাই সেখানে এখন প্রধান। যে বাঙালী আপনিই দমিয়াছে তাহাকে দাবাইবার জন্য অর্থাৎ মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিবার জন্য সারা ভারতবর্ষ যেন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী অনেক তেরীমেরী করিয়াছে, এখন কিছুকাল তাহাকে শান্ত হইয়া তেরীমেরী সহিতে হইবে। বনেদীয়ানা হইতে বিচ্যুত মানুষ অধৈর্য দেখাইলেই তাহার পতন দ্রুত ও অনিবার্য হইয়া উঠে। বাঙালীকে এখন শম দম তিতিক্ষা সন্তোষ প্র্যাকটিশ করিতে হইবে। এই কাজে তাহার প্রধান সহায় হইতে পারে দৈনিক সংবাদপত্র। গোপালদা তাঁহাদের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন, আমরাও জানাইতেছি।

বাঙালী দমিয়া গিয়াছে বইকি! বাংলাদেশের নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্পনগর দুর্গাপুরের হালচাল যাহা জানিলাম তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম দক্ষিণ-ভারত পাঞ্জাব উত্তরপ্রদেশ এই পবিত্র স্থানে বাঙালীর হাতে তামাক খাইবার জন্য সমবেত হইতেছে। বড় বড় পোস্টে, যন্ত্র-নাড়াচাড়ার অর্থাৎ টেক্‌নিক্যাল কাজে বাংলাদেশের দুর্গাপুরে বাঙালীর সংখ্যা শতকরা দশের বেশী হইবে না।

চেয়ারে চাদর বাঁধিয়া পানদোক্তা চিবাইতে চিবাইতে রবীন্দ্রনাথের "দুরন্ত আশা"র মূর্তিমান বাঙালীরা সগৌরবে সেখানে ষাট টাকা মাহিনার কেরানীগিরি করিতেছে। অবাঙালী পেয়াদাদের বেতন তাহার অধিক। যে 'ইস্কন' আজ তেরটি ব্রিটিশ ফার্মকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া স্টীল প্ল্যান্টের কাজ চালাইতেছে তাহাতে বাঙালী নাই বলিলেই চলে, গোটা সাউথ ইণ্ডিয়া—নর্থ ইণ্ডিয়া বিশেষ করিয়া বাংলা-দেশের কাঁধে চাপিয়া বসিতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুপরিকল্পিতভাবেই এইরূপ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সমগ্র প্ল্যান্টের কাজের দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিয়া যখন ইস্কন বিদায় লইবে তখন দেখা যাইবে বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যাহারা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইতেছে তাহাদের মধ্যে বাঙালী একটিও নাই। যে সকল জুনিয়র বাঙালী ইঞ্জিনীয়ার আজ সেখানে বহাল আছে তখন আর তাহারা কেহই থাকিবে না। দুর্গাপুর বাংলাদেশে একটি গোয়া হইয়া নানা সমস্যার সৃষ্টি করিবে। বাংলাদেশের শিরে যদি সর্পাঘাত হইয়া থাকে, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে সে শিরটি বেমালুম কাটিয়া ফেলিয়া গরু গাধা ছাগল যে কোনও জানোয়ারের মুণ্ড সেখানে লাগাইবার এখনও সময় আছে।

অর্থাৎ এখন খতাইয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। কী দেখিব—আমরা স্থানান্তরে ছন্দোবদ্ধভাবে তাহার একটা ফিরিস্তি দিয়াছিলাম। সেই ফিরিস্তিই নীচে পুনর্মুদ্রিত করিলাম:

একদিন তো সবই ছিল, আজকে কোথা গেল সে সব?
রামমোহন আর বিদ্যাসাগর মধু দীনবন্ধু কেশব—
এসেছিলেন বঙ্কিমও তো দর্শাতে বঙ্গের গৌরব;
এসেও ছিলেন, চলেও গেছেন—বঙ্গবাসী পেয়েছে কী
আজকে এস সে হিসেবটা সবাই মিলে খতিয়ে দেখি।

এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তস্য শিষ্য নরেন্দ্রনাথ
ভারতবাণী প্রচার ক'রে করেছিলেন প্রতীচী মাত।
ভারত দিব্যজীবন 'পরে করিয়ে ধরার দৃষ্টিনিপাত
অরবিন্দ এলেন গেলেন আশার কথা কতই লেখি—
একুনে ফল কী হয়েছে, এস হিসেব খতিয়ে দেখি।

এসেছিলেন বঙ্গ-রবি বিশ্বভুবন আলো ক'রে,
উদয়ে তাঁর বাঙালী কি জাগল কেহ নতুন ভোরে?
কিম্বা তারা রাত রয়েছে ভেবেই আছে ঘুমের ঘোরে—
রবির কিরণ হেথায় কি হায়, বিফল পাষাণ-ছাদে ঠেকি।
জন্মশতক-জয়ধ্বনির মাঝেই হিসেব খতিয়ে দেখি।

বঙ্গভূমির অঙ্গে আঘাত হানতে গিয়ে লর্ড কর্জন
শুনতে যে পাই খুঁচিয়ে বাঘে শুনেছিলেন ঘোর গর্জন;
ব্যাঘ্র যদি, কাঁপছে কেন—কাঁদছে শুনে ফেউ-তর্জন?
কিম্বা ছিল চামটা বাঘের আজকে ধরা পড়ল মেকী!
'রাহুলাটের রিপোর্ট'খানার সত্যাসত্য খতিয়ে দেখি।

স্বাধীনতার একক পথিক বঙ্গ-নেতা সুভাষচন্দ্র,
ব্রিটিশশাসন-লৌহকারায় বজ্র হেনে মুক্তি-রন্ধ্র—
কীর্তি তাঁরি শুনেছি তাই, সেই বাঙালী ক্রমেই বন্ধ
ভগ্ন বঙ্গ-চতুঃসীমায়, সেথাও feel করছে shaky!
কেন এমন ঘটল এস, কারণটা তার খতিয়ে দেখি।

শিক্ষা-পদমর্যাদাতে ছিল এমন যার অভিমান,
মাদ্রাজী আর পাঞ্জাবীতে কাটছে কেন তাহার দু'কান;
"ছিল"র কোনো দাম নাই ভাই, "আছে" যদি না দেয় প্রমাণ—
বুদ্ধি যাহার ছিল সে আজ কেন বুদ্ধির এমন ঢেঁকি!
সবাই এসো মিলেমিশে নিখুঁত হিসাব খতিয়ে দেখি॥

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র সুলভ সংস্করণ ও কালোবাজারের সুবিপুল সম্ভাবনা

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আগামী বৈশাখ মাসে 'রবীন্দ্ররচনাবলী'র সুলভ সংস্করণ ২৫ হাজার সেট মুদ্রিত হইয়া মাত্র ৭৫ টাকা সেট মূল্যে বিক্রীত হইবে। পনের টাকা আগাম জমা দিয়া নাম রেজিস্ট্রি করিলেই চলিবে, বাকি দাম কিস্তিতে কিস্তিতে আদায় করা হইবে। এই সুসংবাদে আনন্দিত হইতে পারিতেছি না অনেকগুলি কারণে। প্রথম কারণ, বিজ্ঞাপনদৃষ্টে মনে হইল অধুনাপ্রচলিত ২৬ খণ্ড রচনাবলীই তেরখণ্ডে বাহির হইবে। আমরা রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক

উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী একত্র পাইব এইরূপই আশা করিতেছিলাম। ছাব্বিশ খণ্ডে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' সম্পূর্ণ হয় নাই। অচলিতসংগ্রহ দুই খণ্ড আগেই বাহির হইয়াছে এবং রবীন্দ্র-রচনার বহু অংশ এখনও গ্রন্থাবলীভুক্ত হইতে বাকি আছে। সমগ্র রচনা বাহির করিতে হইলে ২৮ (২৬+২) খণ্ডের অতিরিক্ত আরও অন্ততঃ ৮ খণ্ড প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন দেখিয়া মনে হইল এগুলি প্রকাশের কোন ব্যবস্থাই হইতেছে না। মাত্র ২৬ খণ্ড অসম্পূর্ণ প্রচলিত রচনাই পরিবেশিত হইতেছে। এই উৎসবে অসম্পূর্ণ রচনাবলী দেশের লোক চাহে নাই।

দ্বিতীয় কারণ, বর্তমানে চালু রচনাবলীতে অনেক ফাঁক আছে। বহু গ্রন্থে ভ্রমক্রমে বর্জিত বহু প্রবন্ধ কবিতা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। রচনাবলীর ভূতপূর্ব তত্ত্বাবধায়ক শ্রীপুলিনবিহারী সেন বিশেষ যত্নে রচনাবলীর "গ্রন্থ পরিচয়" অংশে নষ্টোদ্ধারকাজে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি গত ত্রিশ বৎসরের সাধনায় এই কার্যে যতখানি পারদর্শী হইয়াছেন তেমনটি আর কাহাকেও দেখি না। শুনিয়াছি সুলভ সংস্করণের কাজে তাঁহার হাত থাকিবে না, অর্থাৎ অসম্পূর্ণ রচনাবলী যেমন অবস্থায় আছে সেইভাবেই মুদ্রিত হইবে। অসম্পূর্ণ দান অসিদ্ধ। ইহার জন্য এত তোড়জোড়ের প্রয়োজন ছিল না।

তৃতীয় কারণ সর্বাপেক্ষা মারাত্মক এবং ভয়াবহ। এতাবৎকাল রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া ব্যবসায়ে কালো-বাজারের কোনও অবকাশ ছিল না। বিশ্বভারতী যদি অধিক মূল্য দাবি করিয়া থাকেন, তাহার মুনাফা রবীন্দ্রনাথই পাইয়াছেন। ভুঁড়োপেট ব্যবসায়ীরা বাংলা-দেশের মানুষের অশন-বসন-প্রসাধন-পরিবহন-মান-ইজ্জত সকল ব্যাপারেই কালোবাজারের করালদ্রংষ্ট্রা বিস্তার করিয়াছে। বাকি ছিল শিক্ষা ও সাহিত্য। শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ভুঁড়োপেটদের অনুপ্রবেশ যে ঘটিয়াছে তাহার প্রমাণ মিলিতেছে তথাকথিত টিউটোরিয়াল ব্যুরোগুলির পরিচালন-ব্যাপারে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের ধূমে। একমাত্র বাকি রহিল সাহিত্য। এবারে এই 'রবীন্দ্ররচনাবলী'র পঁচিশ হাজারী সুলভ সংস্করণের কল্যাণে সাহিত্যেও কালোবাজার প্রবেশ করিবে। কানাঘুষায় এখনই শুনা যাইতেছে যে ভুঁড়োপেট ব্যবসায়ী মহলে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কালোবাজারে লক্ষ টাকা কালোবাজার চালু রাখার কাজে লাগিবে ইহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। পনের টাকা জমা দিয়া হাজার হাজার সেট আয়ত্ত করিয়া পরে বর্ধিত মূল্যে বেচিবার সুযোগ যদি ব্যবসায়ীরা পায় তাহা হইলে এই সুলভ সংস্করণ প্রচারের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হইবে। দরিদ্র রবীন্দ্র-ভক্তদের সেই কালোবাজারের দরেই যদি রবীন্দ্ররচনাবলী সংগ্রহ করিতে হয় তাহা হইলে যে গবর্মেন্টের ক্ষতি, বিশ্বভারতীর ক্ষতি এবং রবীন্দ্রনাথের অপমান হইবে সেই কথাটাই আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উপলব্ধি করিয়া সাবধান হইতে বলি। আগামী জন্ম-শতবর্ষ উৎসবে ধনী ব্যবসায়ীরা যেন দরিদ্র জনসাধারণের রবীন্দ্র-সাহিত্যরস উপভোগের বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে সেজন্য বিশেষ সতর্কতা এখন হইতেই অবলম্বন করিতে হইবে।

আবার বলি—(১) 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' যেন সম্পূর্ণ রচনাবলী হয়। (২) যেন বানান ও পাঠের ভুলে অপাঠ্য না হয় এবং (৩) সুলভ সংস্করণ যেন সত্যকার রসিক ভক্তজনের পক্ষে সুলভ হয়।

বাঙালীবিরোধী চক্রান্তের একটি দৃষ্টান্ত

গত ২২ অক্টোবর তারিখের 'যুগান্তরে' "দেহ-ব্যবসায়ের স্বর্গ" শিরোনামায় বোম্বাইয়ের 'ব্লিৎস' পত্রিকায় প্রবন্ধচ্ছলে বাংলাদেশের যে কুৎসা প্রচারিত হইয়াছে বঙ্গবিরোধী চক্রান্তের তাহা একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। 'যুগান্তর' এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন :

"উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট—আসাম হাঙ্গামার পর হইতে ইহা ক্রমশঃই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে এবং এই ব্লিৎস পত্রিকা প্রবন্ধান্তরে আর একদফা বাঙ্গালী কুৎসা রটনা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রবন্ধের সূচনায় বলা হইয়াছে, কলিকাতার গণিকালয়-গুলিতে তিলধারণের স্থান নাই (এতো গণিকা!), নবাগতাদের সংখ্যা হইবে কয়েক হাজার এবং তাহারা রাস্তায় খোলাখুলি তাহাদের শিকার খুঁজিয়া ফেরে।

শিকারের সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। যে ব্যবসায় ছিল অন্ধকারের তাহা আজ সারা দিবসের পণ্য এবং রেস্তোরাঁ, বোর্ডিং, হোটেল পার্ক বা রকেও পাওয়া যায়।... একজন সমাজসেবিকা প্রবন্ধকারকে নাকি বলিয়াছেন, বিশ্বাস করুন এই সব মেয়েরা [সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ৮৮০০০] অধিকাংশ আপনার আমার পরিবার হইতে আসিয়াছে।"

ধর্ম-ব্যবসায়ীর স্বর্গ বোম্বাইয়ের পত্রিকায় যখন কলিকাতার এই মনোরম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে কলিকাতার তথা বাংলাদেশের অবস্থা সত্যই শোচনীয়। শোচনীয় এই কারণে যে বোম্বাইয়ের সঙ্গে বাংলার কোনও দিক দিয়া কোনও বিরোধ না থাকায় বরং বহু বিষয়ে বহু মিল থাকা সত্ত্বেও 'ব্লিৎস'কে দিয়া এই বঙ্গবিরোধিতা বাংলাদেশে ব্যবসায়সূত্রে অবস্থিত কোনও ধনী শক্তিশালী দল করাইতেছেন। আসাম-দুর্ঘটনার সময় কলিকাতার বিশেষ মহল্লার চাঞ্চল্য বোম্বাই পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আসাম গোলযোগের পিছনেও ইঁহারা ছিলেন অনেকে এইরূপ সন্দেহ করিয়াছেন। কেন্দ্রে টাকার জোরে ইঁহারা স্বাধীন ভারতবর্ষে বহু অঘটনই ঘটাইয়াছেন, সুতরাং কলিকাতাকে নরককুণ্ডে পরিণত করিবেন তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই।

তাই বলিতেছিলাম, বাঙালী আজ জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঁচিতে হইলে তাহাকে নিঃশেষে মরার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। বাংলাদেশ আজ সত্যসত্যই ভারতবর্ষের যাবতীয় পঙ্কিল নর্দমার সমাবেশে নরকে পরিণত হইয়াছে। আমরা এখানকার বাসিন্দা, সুতরাং পঙ্কোদ্ধারের দায়িত্ব আমাদেরই। অন্যের উপর দোষারোপ করিয়া লাভ নাই। অতিরিক্ত লোভে এবং উদারতায় ভুল আমরাই করিয়াছি। অবিমৃষ্যকারিতা-বশতঃ শাইলকদের কাছে ঋণ করিয়া বসিয়া আছি। আজ মাংসলোলুপদের প্রাপ্য মাংস ওজন করিয়া তাহাদের ঋণ মিটাইয়া দিয়া তবে নূতনভাবে বাঁচিবার সাধনা করিতে হইবে। বাঙালী শান্ত থাকুক, স্থির থাকুক, তবেই আবার ধীরে ধীরে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্

কাজেই বাঙালীকে এবারে ভাবের স্বর্গ হইতে মাটিতে নামিয়া দাঁড়াইতে হইবে। সাহিত্য, সংস্কৃতি—কালচারের অভিমান এখন থাক্। হে বাঙালী, ভীষণ-ভয়ঙ্করের মুখামুখি দাঁড়াও, ভয় দূর কর। অভীঃ হও।

মরণ যখন ঘনিয়ে আসে জীবন তখন শোনায় প্রেমের কথা,
রহস্যময়, এ বিচিত্র খেলা তোমার বুঝতে পারি নাকো—
ভয়ে যখন ভাঙছে স্বপন, তখন কেন স্বপ্ন ব্যাকুলতা,
শ্মশান-ভূমির ধূসরতা শ্যামল শোভায় মিথ্যা কেন ঢাকো!
আজো দেখি কল্পলোকের দূতেরা সব করছে আনাগোনা,
আকাশ-গাঙে ছিপ ফেলে কি আজকে তারা-ধরার সময় হ'ল—
ছিঁড়েছে জাল এখন কেন নতুন ক'রে হতেছে জাল বোনা?
নগ্ন যাহা, সত্য যাহা দেখাও তাহা, মোহাবরণ তোল।
অপরূপকে দেখেছি যে সবুজ ধানে, নীলের গভীরতায়,
দেখেছি তায় আকাশ-ছোঁয়া তুষারধবল হিমাচলের চূড়ে,
দেখেছি তায় নিশীথ রাতে বধূর যখন ঘোমটা খ'সে যায়,
মুকুল ঝরা আমের ডালে কোকিল ডাকে ব্যাকুল-করা সুরে।
দেখেছি তায় মেঘলা দিনে পেখম তোলা অধীর শিখীর নাচে,
মধ্যদিনের প্রখর দাহে আলিসাতে কপোতকূজন মাঝে,
মায়ের বুকে মুখটি রেখে দেখেছি তায় শিশু যেথায় বাঁচে,
দেখেছি তায় পাখীরা সব ফেরে যখন ক্লান্ত পাখার সাঁঝে।

বজ্রানলে পৃথ্বী জ্বলে, বহ্নিজ্বালা ছড়ায় দিকে দিকে,
এমন দিনে হে মহারাজ, শোনাও আদেশ অগ্নিদহন ভাষে,
রহস্যময়, বাণী তোমার রক্তলিখায় যাও না লিখে লিখে,
শূন্যপথে কানে আমার সেই বাণীরই আভাস যেন আসে।
ভাঙাগড়ার খেলায় তোমার বজ্রবীণা শুনতে সবায় দাও,
তোমার শান্ত মধুর লীলা জীবন ভ'রে অনেক দেখিলাম—
আজকে প্রভু, সেই আবরণ আপন হাতে তুমিই খুলে নাও,
নয়ন ভরে দেখি এবার মহৎ ভয়ের ভীষণ পরিণাম॥

['সমাবেশ']
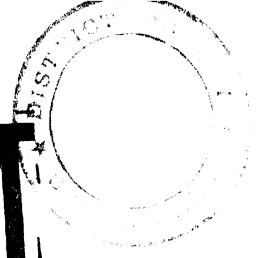
'বেস্ট ব্রেন' এবং সৃজনী কল্পনা

অচ্যুত গোস্বামী

দৈনিক পত্রিকার রবিবারের সংখ্যায় দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন থাকে। এই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপনগুলির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলে দেখতে পাওয়া যায়—যে-সব পাত্রীর পিতারা পাঁচ হাজার কি দশ হাজার কি তদূর্ধ্ব পরিমাণ পণ দিতে সক্ষম তাঁরা অবধারিতভাবে তিন শ্রেণীর পাত্র চান—ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার অথবা গেজেটেড অফিসার।

নেহাত পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বলে বিষয়টাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। এর ভিতর দিয়ে সমাজের চোখে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক সবচেয়ে মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় তার একটা নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায়। সংখ্যায় খুব অল্প হলেও বাঙালীদের মধ্যে কিছু-সংখ্যক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী আছেন। পাত্রের বাজারে তাঁদের কিন্তু তেমন কোন চাহিদা নেই। আমি দেখেছি মাসে দু-তিন হাজার রোজগার করেন এমন ব্যবসায়ী সামান্য একটু ফরসা রঙের লোভে নিতান্ত সাধারণ ঘরের নিতান্ত স্বল্পশিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। কাজেই সমাজের এই পক্ষপাতিত্বের কারণ নিছক বিত্ত নয়। বিত্তের সঙ্গে আরও একটা জিনিস চাই—কালচার। পূর্বাগত সংস্কার অনুযায়ী শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীদের কালচার সম্পর্কে অনেকের মনেই সন্দেহ আছে। কিন্তু সমাজের সমস্ত লোকের সর্ববাদীসম্মত বিশ্বাস এই যে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার এবং গেজেটেড অফিসারের মধ্যে দুটি জিনিসের রাজযোটক মিল ঘটেছে—বিত্ত এবং কালচার।

এই তিন শ্রেণীর লোকের কালচারের সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন একটু খোঁজ নেওয়া যাক।

যে ডাক্তারের পসার আছে তিনি সাধারণতঃ কী বই পড়েন?

এই ডাক্তার তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত এক ঘণ্টা সময় চেম্বারে রুগী দেখেন। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে নিয়ে (বা না নিয়ে) ঠিক দুটো পঞ্চাশে তিনি চেম্বারে আসেন। এই দশ মিনিট তাঁর কালচারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সময়। হাতের কাছে থাকে কিছু আমেরিকান ফ্যাশান ম্যাগাজিন। তারই একখানা তিনি হাতে তুলে নেন। শুধু পাতা উলটিয়ে যেতে হয়—এ সব ম্যাগাজিন পড়ার জন্য নয়। সারিবদ্ধ বিচিত্র ভঙ্গীর বিরল-বসনা মার্কিনী নারীর বর্ণাঢ্য চিত্র তাঁর অলস চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়। অ্যানাটমি তাঁর পেশা হলেও এসব চিত্র তাঁর স্নায়ুতে এখনও সামান্য উষ্ণতা সৃষ্টি করে। সেইটুকুই তাঁর প্রয়োজন। তারপর তিনটে বাজবে। এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি কুড়িটি পেশেণ্টকে দেখবেন। রুগীপিছু গড়পড়তা তিন মিনিট করে সময়—দক্ষিণা বত্রিশ টাকা। চারটে বাজবে। তাঁর গাড়ি ছুটবে কোনও হসপিটালের দিকে। সেখান থেকে তাঁর নিজস্ব নার্সিংহোমে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন

রুগীর বাড়ি থেকে কল্ আসছেই আসছেই আসছেই। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা। কর্মযজ্ঞ শুরু হবে আবার পরদিন ভোর ছটা থেকে।

কাজেই এই কর্মব্যস্ত মানুষটির পড়ার কখনও সময় হয় না। তবু দৈব বলে একটা কথা আছে। কিন্তু সেই দৈবাতের মধ্যেও দুটো জিনিসকে তিনি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে এড়িয়ে চলেন। এক নম্বর—বঙ্গভাষা নামে একটি ভাষায় লেখা সাহিত্য। দু নম্বর—বিদেশের মেডিক্যাল রিসার্চ সংক্রান্ত যে-সব জার্নাল নিয়মিত তাঁর ঠিকানায় আসে।

যে ডাক্তারের এখনও পসার জমে নি তিনি কী বই পড়েন?

তাঁর সময় অনেক। তবে মনটা একটু খারাপ থাকে। তিনি পাড়ার থিয়েটার-গ্রুপের পেট্রন। এবং সেই হিসাবে মন্মথ রায়, অপরেশ মুখুজ্জেদের দু-একখানা নাটকের বই তাঁকে পড়তেই হয়। এসব নেহাত দায়ে পড়ে পড়া—বাংলাদেশের নাটকের মান যে কত নীচু তা তিনি ভালই জানেন। কিন্তু তাঁর মনের মত পড়ার জিনিসও কিছু কিছু আছে কিনা বলা শক্ত হলেও এটুকু বলা চলে যে মন খারাপের অজুহাতে তিনি বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাসই বেশী পড়েন সময় কাটানোর জন্য।

যেসব ইঞ্জিনিয়ার সরকারী চাকরি করেন তাঁদের কাজের সঙ্গে সাধারণ কেরানীর কাজের কোন তফাত নেই—এক মাইনের তফাতটা ছাড়া। ডি. পি. আই. দপ্তরের শিক্ষাবিদরা যেমন অফিসে বসে ছেলে পড়ান, তাঁরাও তেমনি অফিসে বসে ব্রীজ বা বাড়ি তৈরি করেন—অর্থাৎ কেরানীরা সামনে কাগজ মেলে ধরে জায়গাটা দেখিয়ে দিলে তাঁরা সেই জায়গায় সই মারেন। কাজেই সরকারী ইঞ্জিনিয়ারদের আর গেজেটেড অফিসারদের কথা একসঙ্গে আলোচনা করা চলে। 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' এবং 'স্টেটসম্যান' নিয়মিত তাঁদের বাড়িতে আসে। প্রথমটা পাতা ওলটানোর জন্য, দ্বিতীয়টা বড় হরফের লেখাগুলো পড়ার জন্য। তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন যে দেশের তাঁরা সেরা ইন্টেলেকচুয়ালস। কিন্তু ভাগ্যদোষে তাঁরা সরকারী চাকুরে (এই ভাগ্যদোষটুকু ঘটানোর জন্য অবশ্য তাঁদের জন্মের প্রথম দিন থেকেই সাধনা শুরু হয়েছিল)। তাঁদের হাত-পা বাঁধা। তাঁরা যদি লিখতেন তবে তাঁরা 'তথাকথিত' শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অনায়াসে ছাড়িয়ে যেতে পারতেন। ভাগ্যদোষে অবাধ স্বাধীনতায় লেখার সুযোগ নেই বলে অগত্যা তাঁরা লেখেন না। ঘরে বসে যে-কোন বই পড়ায় অবশ্য আইনগত বাধা কিছু নেই। কিন্তু বুদ্ধিজীবীসুলভ মানসিক অসন্তোষের দরুন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পড়তে প্রায়ই তাঁরা অনিচ্ছা বোধ করেন। কাজেই সংস্কৃতির তৃষ্ণা মেটানোর জন্য তাঁরা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়েন। কোন বাঙালীর লেখা বই অবশ্য নয়—কারণ তাঁরা ইন্টেলেকচুয়ালস্। সাধারণতঃ তাঁরা বিলিতী ডিটেকটিভ বই-ই নির্বাচিত করেন। আগাথা ক্রিষ্টিদের চেয়ে এখন পিটার চেনিরাই বেশী জনপ্রিয় হচ্ছেন। পুরনো বইয়ের স্টলে দু টাকা জমা রেখে চার আনা করে দিলে একখানা করে বই পাওয়া যায়। পনেরো দিন লাগে একখানা বই শেষ করতে। কাজেই পাবলিক লাইব্রেরির মেম্বার হওয়ার চেয়ে এইভাবে বই পড়লেই খরচ কম পড়ে।

যেসব ইঞ্জিনিয়ার ফীল্ড ওয়ার্ক করেন তাঁরা কী বই পড়েন? এর জবাব দেওয়া খুব সহজ। তাঁরা কিছুই পড়েন না, এমন কি খবরের কাগজখানাও নয়। তাঁদের জীবনটা চালাকি নয়—মাঠেঘাটে ঘুরে পয়সা রোজগার করতে হয় তাঁদের। যদিও গাড়ি আছে, কিন্তু এ দেশের গাড়িতে এয়ারকণ্ডিশনিংয়ের ব্যবস্থা অত্যন্ত বিরল। গাড়িতে রেডিও এবং রেফ্রিজারেটারও ফিট করা থাকে না। গাড়ি বটে—আরাম কোথায়? সন্ধ্যাবেলায় তাঁরা বাড়িতে এসে ইজিচেয়ারে সটান শুয়ে পড়েন। চাকর গরম জল নিয়ে এসে পায়ে ফুটবাথ দেয়। স্ত্রী-কন্যারা চারপাশে মোতায়েন থাকেন কখন কী আদেশ হয় তামিল করার জন্য। তাঁদের পিছনে অবশ্য দু-একজন ঝি-চাকর থাকে—আসল কাজটা তারাই করে।

এই হচ্ছে আধুনিক বঙ্গের কুলটুর শিরোমণিদের একটি নিখুঁত চিত্র। স্ট্যাটিস্টিকস্ নিলে দেখতে পাওয়া যাবে এ চিত্র মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। এঁদের জন্যই দশ হাজার

পঁচিশ হাজার পণ দিতে সক্ষম কন্যার পিতারা হাঁ করে বসে থাকেন। এবং নিঃসন্দেহে এঁরাই একসময়ে ছিলেন দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র। স্কুলবোর্ডের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের তালিকায় যাদের নাম প্রথম দশ-জনের মধ্যে থাকে তাদের কিছু মেধা আছে এ কথা অস্বীকার করা ঠিক নয়। সেই ছেলেরা পরে কোথায় হারিয়ে যায় কেউ বড় একটা খোঁজ নেন না। শিক্ষার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বা এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাদের খুব কদাচিৎই দেখতে পাওয়া যায়। আসলে এই-সব ছেলেরা হারিয়ে যায় না—উপরোক্ত কুলটুর শিরোমণিদের মধ্যেই তারা বিরাজ করে। পরীক্ষায় ভাল ফল করার মেধা থাকার ফলে তাদের সামনে জীবনে উন্নতি করার পাকা সড়ক প্রসারিত থাকে। স্বভাবতঃই ডাইনে-বাঁয়ের অনিশ্চিত পথে তারা পা বাড়ায় না।

নতুন শিক্ষা সংস্কারের ফলে পঁচিশ বছর পরে আমাদের দেশের এই বেস্ট ব্রেনদের অবস্থা কী দাঁড়াবে তারও একটু খোঁজ নেওয়া যাক। অনেকদিন ধরেই ব্রেস্ট ব্রেনরা বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছেন—বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগবশতঃ নয়, প্রসপেক্টের প্রতি বিরাগ নেই বলে। তথাপি পুরনো শিক্ষাব্যবস্থায় ইণ্টারমিডিয়েট মান পর্যন্ত তাঁদের কিছু পরিমাণ ইংরেজী আর বাংলা সাহিত্য পড়তে হত। ভাল ফল করার তাগিদে তাঁরা এ পড়াটা যত্ন করেই পড়তেন। তারই ফলে পরবর্তী কালে যদিও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁরা কোনই সম্পর্ক রাখেন না তবু তাঁদের সঙ্গে সামান্য দু-পাঁচ মিনিট কথা বলে সেটা ধরা যায় না।

কিন্তু নতুন শিক্ষাসংস্কারের ফলে এই অবস্থা আর থাকবে না। এখন একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেদের ইংরেজীতে একটি লাইনও পড়তে হবে না। তারা অবশ্য ইংরেজী শিখবে—শুধু লিখতে শিখবে, পড়তে শেখার প্রয়োজনটা আধুনিক শিক্ষাবিদরা স্বীকার করেন না। বাংলার ক্ষেত্রে অবস্থা একটু স্বতন্ত্র—শতখানেক পৃষ্ঠার একখানা চটি সংকলনগ্রন্থ ছাত্রদের পড়তে দেওয়া হবে। এই একশো পৃষ্ঠার সাহিত্যবিদ্যা সম্বল করে বাংলার ব্রেস্ট ব্রেনরা ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং বা এম্. এস্-সি. পাস করে বেরিয়ে এ দেশের কুলটুর শিরোমণিদের দলপুষ্ট করবেন এবং কন্যার পিতাদের জিহ্বাগ্রে লালাক্ষরণের কারণ হবেন। কারণ, নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা পাস করার পর বিজ্ঞানের ছাত্রদের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

কাজেই অনায়াসে অনুমান করা যায় পঁচিশ বছর পরে আমাদের ছাত্রাবস্থার বেস্ট ব্রেনরা, পরবর্তীকালের কুলটুর শিরোমণিরা বুক ফুলিয়ে সগর্বে ঘোষণা করবেন যে তাঁরা জীবনে একখানাও সাহিত্যের বই পড়েন নি। দৈবের মার বলা যায় না। দৈবাৎ মনের ভুলে বা সদিজ্বর হওয়ায় সাময়িক মানসিক দুর্বলতাবশতঃ কেউ হয়তো এক-আধখানা বই পড়েও ফেলতে পারেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা তিনি সযত্নে গোপন রাখবেন সম্মান-হানির ভয়ে। কারণ এ কথাটা তখন আর ঢাক-ঢাক-গুড়গুড়ের ব্যাপার থাকবে না (যেমন এখন আছে) যে সাহিত্যটা নিকৃষ্ট মেধাসম্পন্নদের পাঠ্য।

হাসির ব্যাপার নয়। আমাদের জনকল্যাণমূলক সরকার এই বিধান দিয়েছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পককেশ শিক্ষাবিদরা পাঠ্যক্রম তৈরি করার সময় ধরে নিয়েছেন যে বেস্ট ব্রেনদের সাহিত্যপাঠের দরকার নেই। সাহিত্য নিকৃষ্ট মেধাসম্পন্নদের জন্য।

পুরনো আলোচনায় ফিরে আসি। কন্যার পিতারা যাদের বেস্ট কালচার্ড বলে মনে করেন তাদের কথা বলছিলাম। আমি বলেছি যে এ দেশের মোস্ট কালচারড্‌রা সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না। তবে কি কন্যার পিতারা একটা ভুল ধারণা পোষণ করেন? না সাহিত্যপাঠ কালচারের একটা অপরিহার্য অঙ্গ এই ধারণাটাই বর্তমানে সেকেলে হয়ে গিয়েছে। মহেঞ্জোদরোতে পয়ঃপ্রণালী আবিষ্কার করে আমরা ধরে নিয়েছি সেটা একটা উচ্চস্তরের সভ্যতা ছিল। উল্লিখিত ব্যক্তিদের বাথরুম ও ল্যাট্রিনের মার্বেল-স্টোন পারিপাট্য দেখে তাঁদের কালচারের উচ্চতা পরিমাপ করব না কেন? পারিবারিক রীতিনীতি, সাজসজ্জা, প্রসাধন দ্রব্যাদি, সুবেশ আগন্তুককে দেখে

মোলায়েম হাসির সঙ্গে অভ্যর্থনা করা আর আগন্তুকের মলিন বসন থাকলে চট্ করে মুখটাকে গম্ভীর এবং মেজাজটাকে তিরিক্ষি করে ফেলা—এ সবই কালচারের অঙ্গ।

শুধু তাই নয়। কালচারের আরও অঙ্গ আছে। সবচেয়ে প্রধান দুটি হল বিজ্ঞানের দান—রেডিও এবং সিনেমা। তার সঙ্গে যোগ করা যাক সিনেমার অনুসারী আধুনিক রঙ্গমঞ্চ এবং সঙ্গীত ও নৃত্যের আসরাদি। কালচারের এই দিকগুলো সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা করার দরকার আছে। এক কথায় এই কালচারকে বলা যায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইলেকট্রিসিটির দান।

এই ইলেকট্রিক-কালচারের প্রসঙ্গে সিনেমার কথাটা প্রথমেই আলোচনা করতে হয়। কারণ আচার-ব্যবহার-সজ্জাদিকে যদি কালচারের স্থিতিশীল অংশ বলি, তবে সিনেমা সাহিত্য ইত্যাদিকে বলতে হয় গতিশীল অংশ। এই গতিশীল কালচারের মধ্যে একমাত্র সিনেমার সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত বেস্ট ব্রেনদের কিছু কিছু সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর হয়। কারণ রেডিওটা বাড়ির মেয়েরা এবং শিশুরা দখল করে বসে থাকে। ইচ্ছে থাকলেও তাদের মধ্যে বসে রেডিও শোনা যায় না। তাতে প্রেস্টিজ নষ্ট হয়। কাজেই মাঝে মাঝে সিনেমায় যাওয়াটাই জীবন্ত কালচারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার একমাত্র উপায়। সেখানে ছ আনা থেকে সাড়ে তিন টাকা অবধি দামের টিকিট পাওয়া যায়।

সিনেমা এক আশ্চর্য জায়গা। সিনেমার সঙ্গে একমাত্র শ্মশানেরই তুলনা করা চলে। শ্মশান সম্পর্কে যেমন কবি বলেছেন—এখানে আসিলে উচ্চ-নীচ ধনী-দরিদ্র এক হইয়া যায়—সিনেমা সম্পর্কেও সেই কথা বলা চলে। বেস্ট ব্রেন এবং ওয়ার্স্ট ব্রেনদের মোলাকাত হয় এখানে। বসবার জায়গার তফাত থাকলেও দেখার জিনিসের তফাত নেই। মাঝারি ব্রেনরাও আসে এখানে, তবে তারা আবার কিঞ্চিৎ সাহিত্য-টাহিত্যও পড়ে বলে তাদের একটু স্বতন্ত্র করে দেখছি।

শ্মশানে মানুষের মৃতদেহের শেষ কৃত্য করা হয়, সিনেমায় মানুষের মৃত মনের শেষ কৃত্য করা হয়। একটু ব্যাখ্যা করে বলি।

শারীরধর্ম থেকে মনোধর্মে অগ্রগমনকেই আমরা সভ্যতার পথে যাত্রা বলি। বর্বর মানুষের সঙ্গে পশুর মৌলিক প্রবণতাগত তফাত খুব সামান্যই ছিল—ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং প্রজননই ছিল উভয়ের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কালক্রমে বর্বর মানুষের চোখে হয়তো সূর্যাস্তের বর্ণালি বা বন-পুষ্পের বর্ণ ও সৌরভ পার্শ্ববর্তী দৃশ্যগুলির তুলনায় একটু স্বতন্ত্র গৌরব অর্জন করেছে। শিল্পবোধের সেইটেই সূচনা। পায়ে চলার মধ্যে দিন-রাত্রি বা ঋতুচক্রের আবর্তনের মধ্যে তারা একটা রিদম্ আবিষ্কার করতে পেরেছে। তার থেকে নাচ ও সঙ্গীতের জন্ম। এমনি করে অতি ধীরে ধীরে যে শিল্পবোধ জন্মলাভ করেছে তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত একান্তভাবে ইন্দ্রিয়-নির্ভর ছিল। প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীদের নিয়ে যেসব আদিম কাহিনী রচিত হয়েছিল সেগুলো পরিবেশিত হত সঙ্গীত নৃত্য অভিনয় কথকতা ইত্যাদির মাধ্যমে। তখনও আমরা ইন্দ্রিয়ের আধিপত্যকে অতিক্রম করতে পারি নি। যেদিন আমরা পড়তে শিখলাম সেদিন আমাদের এক আশ্চর্য মুক্তি ঘটল। সমস্ত পৃথিবীর দরজা জানলা বন্ধ করে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে নির্জীব করে রেখে আমরা তালপাতার উপরে লেখা কালো কালো পিঁপড়ের সারির মত কতকগুলো অক্ষর বা প্রতীক পড়ে পড়ে শুধুমাত্র মনের কল্পনার সাহায্যে এক আশ্চর্য সৌন্দর্যলোক আপন মনে গড়ে তুললাম। আমাদের মানসদৃষ্টির সামনে বাড়িঘর লোকজন প্রকৃতিজ সৌন্দর্য গড়ে উঠল। এই মানসজগৎ বাস্তবজগতের মতই কিন্তু হুবহু এক নয়। বাস্তবে আমরা যা চাই তা পাই না, কিন্তু এখানে তা আছে। বাস্তবের যে অংশ ইন্দ্রিয়গ্রামের অনায়ত্ত, মনের জগতে তা ধরা পড়ে। বাস্তবে আমাদের কাছে অপর মানুষের মন ও হৃদয় অনধিগম্য। মনোজগতের স্বচ্ছদেহী মানুষদের মন আমাদের সামনে অনাবৃত হয়, তাদের হৃদয়কে আমরা স্পর্শ করতে পারি।

এমন কি ইন্দ্রিয়-নির্ভর শিল্পগুলিরও সাধনা ইন্দ্রিয়-

নির্ভরতার চেয়ে অতিরিক্ত কোন আবেদন সৃষ্টি করা। কোন সুন্দর মুখের ফটোগ্রাফ এবং শিল্পীর আঁকা পোর্ট্রেট আমি দেখেছি। বাইরের চোখের বিচারে ফটোগ্রাফটি বেশী সুন্দর। শিল্পী যেন ইচ্ছে করে মুখখানির অপূর্ণ সামঞ্জস্যকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। কিন্তু মনের চোখ দিয়ে দেখতে পেলাম শিল্পীর চিত্রে মুখখানির আড়ালে যে মুখের মালিকটি ছিলেন তাঁর চরিত্র ধরা পড়েছে। ফটোগ্রাফের মধ্যে শুধুই বাইরের রেখাগুলো।

এ কথা হয়তো ঠিক—ইন্দ্রিয়ানুভূতিই সমস্ত শিক্ষা-বোধের ভিত্তি। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে ইন্দ্রিয়নির্ভরতার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে আমরা তার অসাধারণ ব্যাপ্তি গভীরতা এবং বৈচিত্র্য সম্পাদন করতে পেরেছি। শিল্পবোধের সাহায্যে আমরা যে মনোজগৎ রচনা করেছি, সেই মনোজগতের আলোতে আমরা আমাদের বাস্তব জীবন-যাত্রাকে নতুন করে পুনর্নির্মাণ করেছি। আমাদের বাস্তব আবেগ-অনুভূতিতে যে এত জটিলতা রহস্যময়তা এবং মাধুর্য, তার কারণ শুধুই অর্থ নৈতিক জীবন নয়। তার কারণ আমাদের শিল্প-সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য। এ কথা বললে ভুল হয় না যে পশু-পাখি বাস করে মাটির পৃথিবীতে; মানুষ বাস করে তার নিজের তৈরী মনের পৃথিবীতে।

এই শিল্প-প্রতিভার আশ্চর্য স্ফুরণের পিছনে রয়েছে মানব-মনের একটি শক্তি—সৃজনী কল্পনা। কাব্য-সাহিত্য উপভোগ করা ও সৃষ্টি করার পিছনে এই একটি প্রেরণাই কাজ করে—সেটা সৃজনী কল্পনা।

কিন্তু বিজ্ঞানকে ধন্যবাদ, ইলেকট্রিক সংস্কৃতির প্রধান বাহন সিনেমা এই সৃজনী কল্পনার দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছে। আমাদের সেই অনেক আগের ইন্দ্রিয়-নির্ভরতার যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সৃজনী কল্পনা যে মনেরই বিকশিত রূপ! তার দাসত্বের কি কোন প্রশ্ন ওঠে? ইন্দ্রিয়গ্রাম মনোরাজ্যের বাইরের জিনিস, মনের পাঁচটি দরজা, কিন্তু মন নয়। তার দাসত্বকে আমরা সভ্যতা বলে গ্রহণ করছি।

সিনেমার মধ্যে ভাল ছবি খারাপ ছবি আছে। কিছু কিছু খুব ভাল ছবি আছে যা স্মরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য। সেই তারতম্যের আলোচনায় এখন গিয়ে লাভ নেই। সিনেমার শিল্প-প্রকৃতিই আপাততঃ আমার আলোচ্য বিষয়। সিনেমার শিল্প-প্রকৃতিই এমন যে তাকে দর্শকদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে পরিতুষ্ট করতে হবে। চক্ষু এবং কর্ণ তো বটেই, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও একেবারে বঞ্চিত হয় না। সুন্দর মুখ, শোভন দৃশ্যাদি, চিত্তাকর্ষক আবহ-সঙ্গীত না হলে সিনেমা অচল।

সিনেমার একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্যের স্থিরচিত্র নেওয়া যাক। সেটি ফোটোগ্রাফ, চিত্র নয়। জীবনের বাইরের রূপ-রেখা, অন্তরের রূপ নয়। মনের রূপকে পর্দায় প্রতিফলিত করা খুবই শক্ত বলে প্রতিভাবান পরিচালকরা নানা পন্থার আশ্রয় নিয়েছেন—প্রতীকের ব্যবহার, মন্টাজ, সুপার ইম্পোজিসন ইত্যাদি। তথাপি দীর্ঘায়ত দৃশ্যাদি বা দীর্ঘ সংলাপ যে সিনেমায় বিরক্তিকর, তার কারণ এই সব সময়ে নায়ক-নায়িকার প্রাণহীন ছায়াধর্মিতা দর্শকের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সিনেমার দ্রুতগতি এই ছায়াধর্মিতার অনুভূতিকে ভুলিয়ে রাখার জন্যই দরকার। তা ছাড়া এই দ্রুতগতির ফলে কয়েকটি ইন্দ্রিয়কে খুব পরিশ্রম করতে হয়। অঙ্গ পরিচালনায় আমরা যেমন একজাতের আনন্দ পাই, এই দ্রুত ইন্দ্রিয়-চালনাতেও তেমনি আনন্দ আছে। গতিশীলতা ইন্দ্রিয়গুলিকে দারুণভাবে পরিশ্রান্ত করে, মন ইন্দ্রিয়প্রেরিত ইম্প্রেশনগুলি গ্রহণ করতেই এত ব্যস্ত থাকে যে তার আর কিছু করার অবকাশ থাকে না। কিন্তু গতিশীলতাও একঘেয়ে হয়ে ওঠে বলে সিনেমায় পর পর কতকগুলি নাটকীয় মুহূর্ত দরকার। নাটকীয় মুহূর্তগুলির পিছনে যে বিপুল মানসিক প্রক্রিয়া থাকে সিনেমায় তা অনুপস্থিত; নাটকীয় মুহূর্ত যে বিপুল দীর্ঘস্থায়ী মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং পরিবর্তন সৃষ্টি করে সিনেমায় তার পরিচয় দেওয়াও সম্ভব হয় না। কাজেই সিনেমা যারা বেশী দেখে তাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে জীবন বুঝি কতকগুলি নাটকীয় মুহূর্তের সমষ্টিমাত্র। জীবনে তারা যথেষ্ট নাটক দেখতে পায় না বলে জীবন

সম্পর্কে তাদের মনে এক কৃত্রিম অসন্তোষ গড়ে ওঠে। সেই অসন্তোষ থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য আরও বেশী সিনেমায় যায়। এবং আরও বেশী অসন্তোষ নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে।

আরও বেশী অসন্তোষের কারণ সিনেমার আবেদন নিছক শারীরিক, শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রামের কাছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে তা শেষ পর্যন্ত পরিতৃপ্তি যোগাতে পারে না। সিনেমা ভোগের দৃশ্য দেখায়, ভোগ্য পণ্য সরবরাহ করে না। অথচ সিনেমার আলিঙ্গন চুম্বনাদির দৃশ্য তার স্থূলত্বের দরুনই মনের কল্পনার সঙ্গী হয়ে আমাদের ভাবলোকের বাসিন্দাও হতে পারে না। ইলিয়াডের কাব্যে হেক্টর আর একিলিসের যুদ্ধ. দম্ভ আর প্রকৃত বীরত্বের মধ্যে সংগ্রামের এক নিদর্শন হিসাবে মনে চিরজাজ্জ্বল্যমান থাকে। সিনেমার পর্দায় এই যুদ্ধ এক নারকীয় বীভৎসতা মাত্র। কাজেই সিনেমার দৃশ্য না পারে আমাদের সৃজনী কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে আমাদের মানস-লোকের সঙ্গী হয়ে উঠতে, না পারে ইন্দ্রিয়গুলির হাতে প্রকৃত ভোগ্য পণ্য তুলে দিতে। সেইজন্য সিনেমা যারা বেশী দেখে তাদের মনে এক অর্থহীন অসন্তোষ প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়ায়। সিনেমার ফলাফল সম্পর্কে আরও বেশী আলোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন আছে, কিন্তু আপাততঃ এই পর্যন্ত।

আমি আগে যে কথাটা বলেছিলাম—সিনেমায় মৃত মনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়—এখন বোধ করি কথাটা তত অসম্ভব বলে বোধ হবে না। সিনেমা নিছক একটি ইন্দ্রিয়-নির্ভর শিল্প ; সিনেমার আবেদন প্রধানতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামের কাছে। আমাদের সৃজনী কল্পনার সাহায্য না নিয়ে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়সংশ্লিষ্ট স্নায়ুগুলোকে উত্তেজিত করেই সিনেমা আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি করে। এবং এই আবেগ অনুভূতিগুলি খুব কদাচিৎই আমাদের কল্পলোকের স্থায়ী সঙ্গী হয়ে উঠতে পারে। শহরের প্রায় সব লোকই কমবেশী সিনেমা দেখে। কিন্তু যাদের মন জীবনের গভীর অনিশ্চয়তার সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে ভয় পায়, যাদের মন পুরস্কারহীন শারীরিক পরিশ্রমের চাপে কুব্জ হয়ে গেছে, বা যাদের মন আপন অহঙ্কারের গহন দুর্গের বাসিন্দা হয়ে জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছে, তাদের পক্ষে সিনেমা অপরিহার্য। অর্থাৎ যাদের মন মরে গেছে, যাদের মধ্যে সৃজনী কল্পনা মরে গেছে তাদের সিনেমা না দেখলে বা অনুরূপ আনন্দের ব্যবস্থা (যেমন নাইট ক্লাব ইত্যাদি) না থাকলে চলে না।

আবার বলি, সৃজনী কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে এমন ছবিও আছে। কিন্তু সেগুলো সিনেমা-শিল্পের ব্যতিক্রম, তার প্রকৃতির বিরোধী।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে সঙ্গীতের দুজন শরিক আছেন—একজন গায়ক, একজন শ্রোতা। দুজনেই সৃষ্টি করেন—একজন সুর দিয়ে, অপরজন মন দিয়ে। মাঝে মাঝে কলকাতা রেডিওর গান শুনে আমার মনে হয়েছে যে রেডিও-যন্ত্র এমন এক নাইটিঙ্গেল-লাঞ্ছিত অমানুষিক যান্ত্রিক মিষ্টত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যে তা শুধু ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্তি দেয়। এই পরিতৃপ্তি এমন নিরেট যে স্নায়ুমণ্ডলী ঝিমিয়ে পড়ে, মনের সৃজনী কল্পনা এক নিদ্রালুতার আবেশে Lotus Eaters-দের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন ধরনের গান শুনে দেখেছি যে তাতে একই ধরনের মানসিক আবেশ সৃষ্টি হয়। কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়কে প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিতৃপ্তি দিলে মন পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বলেই আমার বিশ্বাস। এবং তখন বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য 'সি এ টি ক্যাট, ক্যাট মানে বিল্লি' জাতীয় গানের দরকার হয়।

খুব আতঙ্কের সঙ্গে আমি লক্ষ্য করছি যে এই ইলেকট্রিক-সংস্কৃতি আধুনিক রঙ্গমঞ্চকে পুরোপুরিভাবে গ্রাস করতে চলেছে। আধুনিক নাট্যপরিচালকরা বিশ্বাস করতে ভুলে গেছেন যে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যদি জীবন্ত হয়, নাটক যদি নাটকীয় হয়, তবে নিছক অভিনয়ের সাহায্যেই দর্শকের সৃজনী কল্পনাকে জাগ্রত করে আবেগ সৃষ্টি করা যায়। তাঁরা আজকাল আলোক-সম্পাতের সাহায্যে নাটকীয়তা সৃষ্টি করেন, হঠাৎ কর্কশ বাদ্যধ্বনি করে দর্শকের হৃৎপিণ্ডকে চমকিত করে তাঁরা নাটকীয় অনুভূতি সৃষ্টি করেন। অভিনয় প্রায় গৌণ

হয়ে পড়েছে, ভাল নাটকের কোন প্রয়োজনই নেই—যে কোন নাটকই যথেষ্ট ভাল। আমার তো বিশ্বাস কয়েক টুকরো কালো রঙ-করা কাগজ কয়লার মত করে মঞ্চের উপর সাজিয়ে রাখলে তাই কয়লা-খাদের প্রতীক হিসাবে গণ্য হতে পারে। যাঁরা নাটক দেখতে যাবেন, তাঁরা কয়লার খাদ দেখতে যাবেন না, কয়লার খাদের জীবন-যাত্রার অনুভূতি জাগে এমন অভিনয়-নৈপুণ্য এবং নাটকীয় ঘটনাই দেখতে যাবেন। আলোকসম্পাতের সাহায্যে যে কয়লার খাদ এবং কয়লার খাদে বন্যার দৃশ্য সৃষ্টি করা যায়,এ চমৎকার খেলাটা ম্যাজিসিয়ানদের হাতে তুলে দিলেই তো হয়।

আসল কথা সিনেমা ও রেডিও যার উপর দাঁড়িয়ে আছে, রঙ্গমঞ্চও তাকে আশ্রয় করতে চাইছে। আমাদের সৃজনী কল্পনাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে, শুধুমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে, স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি করতে চাইছে। মানুষের অভিনয়-ক্ষমতার প্রয়োজন ক্রমশঃ কমে আসছে ; ভাল নাটকের প্রয়োজনকে ইতিমধ্যেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

এই ইলেকট্রিক-সংস্কৃতির সংস্পর্শের জন্য শহরের লোক পতঙ্গের মত ছুটছে। কারণ প্রথমতঃ এই সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ আনন্দ দেয়। দ্বিতীয়তঃ এ সব উপভোগের জন্য মনের সক্রিয়তার প্রয়োজন হয় না। তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়-গ্রামকেও চেষ্টা করে সক্রিয় রাখতে হয় না। শিথিল নিষ্ক্রিয় ইন্দ্রিয়কেও উত্তেজিত করতে পারে ইলেকট্রিসিটির এমন ক্ষমতা আছে। প্রধান সুবিধাই এই যে মনের সক্রিয় প্রয়াস ছাড়াই ইলেকট্রিক-সংস্কৃতি উপভোগ করা যায়। পরিণাম ফলগুলোও এক দুই করে বলে দেওয়া যায়। মূল্যবোধ হ্রাস পায়, সৃজনী কল্পনা বিনষ্ট হয়, সৌন্দর্য সৃষ্টিতে মানবীয় প্রয়াসের মূল্য গৌণ হয়ে পড়ে।

সাহিত্যের উপরেও ইলেকট্রিক-সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে। কিন্তু সে আলোচনা অন্যত্র করা ভাল।

এবার আমরা আসল আলোচনায় ফিরে আসি। আমাদের বেস্ট ব্রেনরা সাহিত্য পড়েন না, কিন্তু ইলেকট্রিক-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। সেইজন্যই কন্যার পিতারা যখন তাঁদের সংস্কৃতিসম্পন্ন বলে মনে করেন তখন ব্যাকরণে ভুল হয় এ কথা বলা চলে না।

বেস্ট ব্রেনরা সাহিত্য পড়েন না সাহিত্য নিকৃষ্টতর ব্রেনদের রচনা বলে। আমরা কি কল্পনা করতে পারি যে, যে ডাক্তার প্রতিটি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছেন, এফ. আর. সি. এসের মত কঠিন পরীক্ষা এক বছরে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তিনি বি.এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ বঙ্কিমের উপন্যাস পড়বেন? কিন্তু সিনেমা দেখতে যাওয়ায় কোন বাধা নেই। সেটা মনের ব্যাপার নয়, নিছক শারীরিক সুখের ব্যাপার।

তা হলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে আমাদের বেস্ট ব্রেনরা শুধু সেই সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন, যে সংস্কৃতি কেবলমাত্র শারীরিক তৃপ্তিবিধানের ব্যবস্থা করে। এই ঘটনাটি থেকে এই শ্রেণীর লোকদের চরিত্রের একটা মোটামুটি পরিচয়ও আমরা পেতে পারি। তাঁরা উৎকৃষ্ট মস্তিষ্কের অধিকারী, কিন্তু জীবনে তাঁরা শুধু শারীরিক সম্ভোগই অনুসন্ধান করে বেড়ান। তাঁদের শরীর খুব পটু নয়—প্রায়ই অম্বল বা আমাশায় ভোগেন। কাজেই ইলেকট্রিক-সংস্কৃতি তাঁদের অপরিতৃপ্ত ভোগতৃষ্ণাকে খানিকটা মেটায়। শারীরিক সম্ভোগের প্রতীক হচ্ছে টাকা, কারণ টাকা দিয়ে সম্ভোগ কেনা যায়। কাজেই ভোগতৃষ্ণাকে কোনক্রমেই শারীরিক দিক দিয়ে মেটানো যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁরা সেই চির-অপরিতৃপ্ত কামনার দ্বারা চালিত হয়ে অর্থ—আরও অর্থের পিছনে একচক্ষু হরিণের মত ছুটে বেড়ান।

সৃজনী কল্পনা এঁদের নেই, অনুভূতিশীলতায় এঁরা শারীরবৃত্তির থেকে বেশী উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। অথচ এঁদের মেধা আছে। মেধা আছে বলেই আসামে বাঙালী নির্যাতন হওয়ার পর কী করে একই সঙ্গে বাংলার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করেও দিল্লিস্থ প্রভুদের বিরাগভাজন না হতে হয় তা তাঁরা জানেন। ডি-ভি-সি, দণ্ডকারণ্য, কোক-চুল্লী প্রভৃতি পরিকল্পনার ব্যর্থতার পরেও তাঁদের চাকরি যায় না বুদ্ধি আছে বলে। সাধারণ কেরানী একবারের বেশী দুবার যোগে ভুল করলে চাকরি যায়।

মানবিক বুদ্ধি, আধা-মানবিক অনুভূতি ও কল্পনা এবং পাশব ইন্দ্রিয়াসক্তি—এই তিনের সমন্বয়ে আমাদের বেস্ট ব্রেনরা তৈরি। এই বেস্ট ব্রেনরা আমাদের দেশকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। মন্ত্রীমহোদয়গণ, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ থেকে শুরু করে গেজেটেড অফিসার পর্যন্ত এঁদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের মানসিক গঠন, তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার দরকার আছে বইকি দেশবাসীর।

আমার বিশ্বাস কোন একোয়ারী কমিটী নিয়োগ করলে তারা সহজে আবিষ্কার করতে পারবে যে আমাদের বেস্ট ব্রেনদের মনের সামঞ্জস্যহীন বিকাশ ঘটে। তাঁদের বুদ্ধি যতটা বিকশিত হয় অনুভূতি সেই পরিমাণে অবজ্ঞাত থাকে। ফলে বুদ্ধি শুভবুদ্ধিতে পরিণত হয় না। বিভিন্ন কাজে তাঁরা যতখানি অনায়াসপটুত্ব লাভ করেন, সেই পরিমাণে তাঁদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে না। ফলে গঠনমূলক বা উদ্ভাবনমূলক পরিকল্পনায় তাঁরা শক্তির পরিচয় দিতে পারেন না। তাঁরা অত্যন্ত আত্মসুখ-সর্বস্ব হয়ে পড়েন। অথচ একটু কল্পনাশক্তি থাকলে তাঁরা বুঝতে পারতেন নিজের সুখের কথা কম ভাবলে তবু বরং সুখী হওয়ার কিছু সম্ভাবনা থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আমাদের যে রিক্ততা তার কারণ সৃজনী কল্পনার অভাব। গবেষণার উদ্দেশ্য যদি হয় ডিগ্রি-লাভ, ডিগ্রিলাভের উদ্দেশ্য যদি হয় অর্থপ্রাপ্তি, তবে গবেষকের কাছে গবেষণার নিজস্ব মূল্য কিছু থাকে না। গবেষণা একটা নীরস উপদ্রব, ভবিষ্যতের সুখের আশায় কিছুদিনের জন্য তা নীরবে সহ্য করতে হয়। বাড়িয়ে বলছি না, অবিকল এই মনোভাব নিয়েই তরুণ বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে ঢোকেন।

সৃজনী কল্পনার অভাবে আমাদের দেশটা মরে যেতে বসেছে। আমাদের রাজনীতিক নেতারা যাঁর যার কেরিয়ার তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। কেরিয়ার কেন? না, সুখ পাওয়ার জন্য। এটুকু তাঁদের কল্পনায় আসে না যে দেশকে তৈরি করতে পারলে তাতেও কিছু আনন্দ পাওয়া যায়। বিরাট বিরাট পরিকল্পনার ইঞ্জিনিয়াররা অমন বিরাট নির্মাণযজ্ঞে কোন সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করেন না। স্বভাবতঃই তাঁরা সুযোগ পেলে আত্মস্বার্থ-চরিতার্থতার পথ খোঁজেন।

আমি এমন কথা বলছি না যে বেস্ট ব্রেনদের মধ্যে অনুভূতি ও সৃজনী কল্পনার অভাবের একমাত্র কারণ সাহিত্যপাঠে অবহেলা। কিন্তু সাহিত্যপাঠের প্রতি অবজ্ঞা যে অন্যতম কারণ এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। এটা স্পেশালাইজেশনের যুগ বলে বিভিন্ন ব্যক্তিরা যাঁর যাঁর বিষয়ের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হন। এইভাবে তাঁর মনের একদেশদর্শী বিকাশ ঘটে। দেশের জনসমষ্টির সঙ্গে তিনি নিজের মনের সংযোগচেতনা হারিয়ে ফেলেন। এই মানসিক বিচ্ছিন্নতা স্বার্থপর চিন্তার উর্বর ক্ষেত্র। সেইজন্যই যাঁরা বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা বাণিজ্যের ছাত্র, বিশেষ করে তাঁদের কিছু সময় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পড়ার প্রয়োজন খুব বেশী। সাহিত্য পড়ার জন্য খুব বেশী প্রস্তুতি বা আয়াসের প্রয়োজন হয় না, কারণ সাহিত্যের কোন টেকনিক্যাল ভাষা নেই। অথচ সাহিত্যের ভিতর দিয়ে অপর মনের সঙ্গে, দেশের ও বিশ্বের মনের সঙ্গে নিজের মনের সংযোগ স্থাপিত হয়। অবশ্য শুধু সাহিত্যপাঠই যথেষ্ট নয়, জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের কিছু সম্পর্ক আছে এই বিশ্বাস নিয়ে সাহিত্যপাঠ করা উচিত।

সাহিত্য অনুভবক্ষমতাকে বাড়ায়, সৃজনী কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে। কবিতার রূপকল্প আর বিজ্ঞান-গবেষকের হাইপথেসিস বা অনুমান একই সৃষ্টিপ্রেরণার দুই ভিন্ন প্রকাশ। খবর নিলে দেখা যায় যে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে গভীর সাহিত্যানুরাগ বিদ্যমান ছিল।

কিন্তু এসব কথা বলে লাভ কি? ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদরা থ্রি. ইয়ার ডিগ্রি কোর্সের পাঠ্যসূচি রচনা করার সময় সিদ্ধান্ত করেছেন যে বিজ্ঞানের ছাত্রদের—অর্থাৎ এ দেশের বেস্ট ব্রেনদের, সাহিত্যপাঠের কোন আবশ্যকতা নেই।

খাঁটী

সত্যপ্রিয় ঘোষ

শ্রী অসিতকুমার ধর মহাপুরুষ নয়। অসাধারণও নয়। এ যে অসিত সম্পর্কে অন্য লোকের মত তা নয় (বস্তুতপক্ষে ও সাধারণ' কি অসাধারণ এ নিয়ে কেউই এ পর্যন্ত কিছু ভাবেই নি হয়তো), আসলে এই মত অসিতের নিজের সম্পর্কে নিজের।

এবং এই মতামত বিষয়ে অসিতের আন্তরিকতায় সন্দেহ করলে সত্যি অন্যায় করা হবে।

নিজেকে সে নির্ভেজাল মানুষ বলেও ভাবে না। অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে নিজের মধ্যে স্তরে স্তরে জমে থাকা গলদগুলি ধুয়েমুছে সাফ করে ফেলতে পারে নি, এই আত্মগ্লানিতে সদাই সে বিষণ্ণ, বিরক্ত এবং চিন্তিত।

মনের এই বোঝা নিয়ে সে জীবনের ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, যদি কোথাও একটু ভার কমে, যদি মিথ্যা আর ভেজালের বেসাতিতে ভরা এই দুনিয়ার হাটে কোথাও এতটুকু বিশুদ্ধ বাতাসের সন্ধান পাওয়া যায় এই হতাশাভরা আশায়। জ্যান্ত কোন খাঁটী মানুষের সন্ধান আজ পর্যন্ত অসিত পায় নি এই তার আক্ষেপ।

এই জন্যে জনতার চাইতে নির্জনতার মধ্যেই অসিত পালিয়ে থাকতে চায়।

এমনি করতে করতে কবে না জানি তুমি সাধু হয়ে যাবে। ঘুম থেকে উঠে দেখব তুমি নেই, পালিয়ে গেছ। তোমার বাপু খামকা এসব চিন্তায় কী দরকার।— অসিতের বউ সুনীতির খনখনে ধাতব গলায় মাঝে-মাঝে এমনি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়।

তাতে অবশ্য অসিতের বৈরাগ্য বেড়েই যায়, নিজের স্ত্রীরই লঘুগুরু জ্ঞান নেই ভেবে কখনও বা সে খেদে তলিয়ে যায়, কখনও বা অগ্নিমূর্তি ধারণ করে।

এমনি অবস্থায় এবারকার পূজো কাটাতে সে হাজারীবাগে এসেছে। শহরে নয়—সেখানে হট্টগোল, রোড-স্টেশনে—যেখানে ডাকাত পড়লেও কেউ ডেকে জিজ্ঞেস করবার নেই। এ জায়গাটা এবার সে নির্বাচন করেছে অফিসের টাইপিস্টের মতামত শুনে। টাইপিস্ট এখান থেকে ঘুরে গেছে শুনে সে জিজ্ঞেস করেছিল জায়গাটা কেমন, উত্তরে সে বলেছিল, জনমানবশূন্য। চতুর্দিকে তাকালে মনে হয় যেন একটা বোবা কান্না থিতিয়ে আছে। তবে জলটা ভাল। ডিসপেপসিয়ার পক্ষে ধন্বন্তরি। রাক্ষুসে খিদে হয়। ওই শুনেই অসিতের মনটা আনচান করে উঠেছে এই থিতনো বোবা কান্নার সমুদ্রে সুনীতিকে এনে ফেলতে, যদি তাতে ওর ক্রনিক বাচালতা ব্যাধির উপশম হয় এই আশায়; আর সেই ফাঁকে সে ঘটি-ঘটি জল খাবে যদি তার নিজের পেটেরও কিছু সুরাহা হয়।

উঠেছে রেলের হলিডে হোমে। অসিত রেলের চাকুরে, শেয়ালদায় অ্যাকাউন্টস্ অফিসের লোয়ার ডিভিশন কেরানী, আগে থেকেই দরখাস্ত করে হলিডে হোমে জায়গা পেয়েছে।

বাঃ, এ তো দিব্যি! কী সুন্দর বাগান, কতরকম ফুল গো! ওই, দেখ দেখ পেয়ারা! এদিকে আবার কত বাতাবি দেখ! গাছভর্তি যে গো! এত কে খাবে? দেখেশুনে বাক্যি হরে যায় যে। ও! আবার দোলনা? আমার এখুনি দুলতে ইচ্ছে করছে। চল না, আমাকে একটু দোল খাইয়ে দাও। তারপরে ঘর দেখব—সেখানে না জানি আবার কোন্ রহস্য। উঃ! আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।

থিতনো বোবা কান্নার সমুদ্রে পা দিতে-না দিতেই সুনীতির এই প্রতিক্রিয়া দেখে অসিত একেবারে হতভম্ব। খ্যাক করে সে ধমকে উঠল: ঢ—

বলতে চেয়েছিল সে ঢলানী। ঢলাঢলি করার আর সময় পেলে না। কিন্তু রাগের অগ্নিস্রোত তার বক্তব্যের বোমাটাকে হঠাৎ এমনিভাবে তার মুখের মধ্যে ফাটিয়ে দিল যে তা সুনীতিকে জখম করবার বদলে, সেই বিস্ফোরণে নিজেই সে নাকালের একশেষ হল।

সুনীতি অসিতের বিকৃত মুখের আকৃতিটাকে ভেংচে উঠে শরীর দুলিয়ে বলে উঠল, কী রোগ রে বাবা! এমন নন্দনকাননের মত বাগানবাড়ি, দেখে চোখ জুড়োয়,

অমন গাছ-ঝাঁকানো পেয়ারা আতা বাতাবি আরও কত-কী, দেখে নোলা টসটস করে, তাতে কোথায় মেজাজ ঠাণ্ডা হবে, না এ দেখি উল্টোচণ্ডী! খাঁড়া উঁচিয়েই আছে! দাঁড়াও বাবা, আমি কটা ফুল মাথায় গুঁজে নিই।

আরে আরে, ফুল ছেঁড়া নিষেধ। ওই দেখ লেখা আছে।—কিন্তু কথাটা শেষ হবার আগেই অসিতকুমার পটপট করে ছেঁড়া বড় বড় চারটে গোলাপকে সুনীতির মাথার দু পাশে ঘুঁটের মত থাবড়ানো ডবল খোঁপার দিগন্তে লটকানো দেখতে পেল।

কোথাও কেউ দেখে ফেলল কিনা এই ভয়ে অসিতের হৃৎকম্প হল। এখনও কুলির মাথা থেকে মাল নামানো হয় নি, এখনও ঘরের দখল পাওয়া যায় নি—তার আগেই এমন বেআইনী কথাবার্তা আর কাজ? স্ত্রীর হঠকারিতায় শ্রীঅসিতের মুহূর্তের জন্য বিপত্নীক হতে ইচ্ছে হল। চার নম্বর ঘর বরাদ্দ আছে কুলিকে জানানো ছিল, সে সোজা বাড়িটার পেছন দিককার বারান্দায় এসে মাল নামিয়ে দিয়ে, অসিতকে নিয়ে মালির সন্ধানে চলল।

খুঁজতে হল না। মালি গোঠুয়া এসে সবিনয়ে বলল, এদিকে আসুন বাবু।

অফিসঘরে এসে কেয়ারটেকারের কাছ থেকে অসিত সব বুঝে নিল।

হলিডে হোমের সাজসরঞ্জামের ঘটা দেখে অসিতের পেটের মধ্যে কেমন করতে লাগল। এত বাড়াবাড়ি তার হজম হয় না, কোন ব্যাপারেই না, কখনই না। ধোপদুরস্ত শয্যা-উপকরণগুলো, টকটকে দামী কম্বলগুলো না হয় সইয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু রান্নার আর ভাঁড়ার ঘরের এতরকম টুকিটাকি, এমন সব পদার্থ—যা অসিত কখনও চোখে দেখে নি, যেসবের নামও কখনও শোনে নি; স্টেনলেস স্টীলের সব বাসনপত্র—যার একখানা থালার দাম ষোল টাকা, চায়ের জন্য অত-সব অনাবশ্যক পদার্থ, লক্ষরকম ছুরি বঁটি মশলাপাতির কৌটো, তার ওপর আবার তাস, ক্যারাম, ব্যাডমিণ্টনের সরঞ্জাম—এসব কী ঠাট্টা? পনেরো দিনের জন্যে নিরিবিলি হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে এসেছে সে এখানে, তা কেন তার দম বন্ধ করে দেবার এই কুপ্রচেষ্টা? এসব দেখলে সুনীতি যা শুরু করবে তারপরে তাকে আর সামলানো যাবে? পনেরোদিন-কা বাদশাকে বেগম ও বাদশাজাদা-জাদীদের নিয়ে ফের কলকাতার ছকু খানসামা লেনে ফিরে যেতে হবে না? তখন কি হবে? কে তখন সুনীতিকে সামলাবে? রেলের কর্তারা? যাঁরা বাহাদুরী করে এমনি ইন্দ্রপ্রস্থ সাজিয়েছেন রেলের তৃতীয় শ্রেণীর জীবদের জন্যে? দেখেশুনে অসিতের পিত্তি জ্বলে যায়। ভাবল সে প্রত্যাখ্যান করবে এত সব সাজসরঞ্জাম, যার একটা হারিয়ে কি চুরি গেলে গলায় গামছা দিয়ে দাম আদায় করে নেওয়া হবে তার কাছ থেকে; আর সেইসব অবিশ্বাস্য দাম যা রেলের খাতায় লেখা আছে। কিন্তু ভাবনাই সার হল, যতক্ষণ সে 'আমার এত সব দরকার নেই' এই কথাকটি বলবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারল তার আগেই গোঠুয়া একপ্রস্থ মাল তার ঘরে দিয়ে এসে আর এক প্রস্থ মাথায় তুলছে।

বোকার মত সে মালপত্র-তালিকার নীচে একটা সই করে দিয়ে নিজের স্ত্রীর সম্মুখীন হতে চলল।

দূর থেকেই সে সুনীতির চিৎকার শুনতে পেল: এ কলকাত্তিয়া, হামকো বালবাচ্চাকে লিয়ে দো-তিনঠো বাতাবি নেবু পাড়কে দেগা? সেই কখন খায়া হায় সব, দেখছ না ভুখ লাগ গিয়া। বেশ পাকা পাকা আর বড়া দেখকে পাড়েগা, কেমন?

অসিত ঘরে এসে দেখল সুনীতি মহাব্যস্তভাবে পেয়ারা চিবোতে চিবোতে গোঠুয়াকে দিয়ে ঘর সাজিয়ে-গুছিয়ে নিচ্ছে। চার ছেলেমেয়ের বড়টির বয়স আট আর ছোটটির আড়াই, তাদের সবকটা হাতের মুঠোয় পেয়ারা—সবাই ব্যস্ত।

সবাই খুশী, সবাই মত্ত।

হলিডে হোমের এলাহী ব্যবস্থা দেখে তার আড়াই বছরের ছেলেটা থেকে শুরু করে সাড়ে সাতাশ বছরের বউটা পর্যন্ত কেউই মুষড়ে পড়ে নি দেখে অসিতকুমার নিজে ভারি মুষড়ে পড়ল। বিলাসিতার এই ছলনার ফাঁদে এরা মুহূর্তেই ধরা দিল। এদের ভবিষ্যৎ কী—এই চিন্তায় অসিতের থুতনি ঝুলে পড়ল।

দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে অসিতকুমার একটি সিগারেট ধরাতে যাবে এমনি সময় সে চমকে উঠল।

কী ব্যাপার, আপনি এখানে?

কমার্শিয়াল অফিসের বড়বাবু মুচকি হাসলেন। বললেন, বোদের ইচ্ছায়। কী বেরসিক জায়গায় এসে পড়েছি, ব্বাপ, কেউ ডেকে কথা বলে না হাসে না খেলে না। তবু মন্দের ভাল বোদে একটা চেনা মুখ এনে ফেলেছে এই মরুভূমিতে। দুটো মনের কথা বলা যাবে।—

এই পর্যন্ত বলে শ্রীভবেশকিঙ্কর দাস বিশাল একটা হাই তুললেন, তুড়ি দিলেম, তারপর হাত দুটো শূন্যে ছুঁড়ে জড়তা মেরে সোডার বোতল খোলার মত শব্দ করে বললেন, বোদে হে, পাপী তরাও!

ভবেশকিঙ্করকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অসিতের আত্মারাম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। বাচালতার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় অসিত সুনীতিকে এখানে এনে ফেলেছে, পনেরো দিনে যদি উপকার কিছু দেখা যায় তখন না হয় বেশীদিনের জন্যে ফের আসা যাবে। কিন্তু এ কী, এ যে আর এক বাচাল! একা রামে রক্ষে নেই লক্ষ্মণ দোসর! পুজোর এই ভিড় ঠেঙিয়ে আসার সমস্ত ধকলটাই মাঠে মারা গেল। এখন ঘরে সেঁদিয়ে থাকলে সুনীতি, বাইরে বেরুলেই ইনি— জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ!

কবে এলেন?—অসিত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, আর কদিন আছেন?

কে জানে কদ্দিন আছি, বোদে যে-কদিন রাখে।— ভবেশ নিস্পৃহভাবে বললেন, থাকব কি, থাকতে মোটে ইচ্ছে হয় না। পারি তো এই মুহূর্তে পালিয়ে যাই। বাজারে কিচ্ছু পাওয়া যায় না, কিছু না বলতে একেবারে কিছুই না' বাজার-বাজার বলছি বটে, আসলে বাজার বলে এখানে কোন পদার্থই নেই! একটা গাছের তলায় ভোর-রাত্তিরে দু-চারজন এসে বসতে না বসতেই ফুস্! মাছ যা পাওয়া যাবে সেই তখন। তার আবার দর-ফর কিছু নেই। বাঘা-বাঘা সব ডাক্তিবাবুরা ছড়ি হাতে চাকর নিয়ে সেই শেষ রাত্তির থেকে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। বড় একটা রুই কি কাতলা এল, সবাই শ্যেনপক্ষীর মত তার ওপর ছোঁ মারলেন। যাঁর চাকর সবচাইতে ষণ্ডা সে মাছটা কেড়ে নিয়ে থলিতে পুড়ে নিল আর তার বাবু দুখানা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে কোমর বেঁকাতে বেঁকাতে মর্নিং ওয়াকে চললেন।

বলেন কী!—অসিত আঁতকে উঠে বলল।

আর বলছি কী!—ভবেশকিঙ্কর ভুঁড়ি চুলকোতে চুলকোতে বললেন, এখানকার এক এ. এস. এম-এর শালা অপদার্থ বেকার। সে বেটা এখানে নানান বিজনেস করে। রেলের একখানা কার্ডপাস নিয়ে রোজ দুপুরের গাড়িতে চলে যায় কলকাতায়। সেখান থেকে বিশ টাকার মাছ কিনে ফিরতি ট্রেনে চলে এসে সেই বরফ-দেওয়া পচা মাছ চার টাকা সেরে পঞ্চাশ টাকায় ঝাড়ে। এই তো বাজার! চেঞ্জাররা এক-একজন রোজ তিরিশ-চল্লিশ টাকা নিয়ে বাজারে আসে, তারা নির্বিবাদে সেই টাকা বাজারে ফেলে দিয়ে যা পায় তাই নিয়ে চলে যায়। তাদের মেয়েরা নাক সিঁটকে মন্তব্য করে, দুর! কী জঙ্গলে এনে ফেলেছে, এর চেয়ে কলকাতা অনেক ভাল। ছুটি কাটাতে যত সব ভূতের মধ্যে এনে ফেলেছে, কিচ্ছুটি পাওয়া যায় না!

ভয়ে অসিতের বুকের মধ্যে গুড়গুড়িয়ে মেঘ ডাকতে লাগল। মনের মধ্যে খাড়া বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল।

দুধ?—অসিত জানতে চাইল: পাওয়া যায় তো?

অসিতের মুখের অবস্থা দেখে বড়বাবু ঝিরঝিরিয়ে হাসলেন। বললেন গলা নামিয়ে, ভয় কী। আমি ব্যবস্থা করে দোব এখনি। ওই ওদিকটায় আছে রামসাগর তালাও, তার পাশে গোয়ালাদের বাস। আমি কয়েকজনের সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছি। নয়তো ওরা যা পাজি, গিয়ে দুধ চাইলে আগে হিসেব চাইবে দুধখানেওলা বালবাচ্চা কঠো হ্যায়। যদি বললে বালবাচ্চা নেহি হ্যায়, আমি স্বয়ং দুধখানেওলা হ্যায় তো সোজা রাস্তা দেখিয়ে দেবে, এক পো দুধও দেবে না। এ হচ্ছে, বুঝলে, রেশনিংয়ের ইল এফেক্ট। গোয়ালা যে গোয়ালা সেও বিদ্যে শিখে নিয়েছে, তার কাছে গিয়েও হিসেব দাখিল কর তবে দুধ পাবে! আরে বাবা, বালবাচ্চা নেহি হ্যায় তো নগদ পয়সা তো হ্যায়, তুই বেটা গোয়ালা, পয়সা গুনে নিয়ে দুধ দিবি। উঁহু, ওখানে সেলফ্-গভর্মেণ্ট!

অসিত সহসা খুশী হয়ে বলল, তা হলে তো বলতে হয় এখানকার গোয়ালারা অনেস্ট—খাঁটী। সত্যিকারের বিচারবুদ্ধি আছে।

কেন!—ভবেশ আকাশ থেকে পড়লেন।

সাপ্লায়ের চাইতে বোধ করি ডিম্যাণ্ড বেশী।—অসিত

উজ্জ্বলতর মুখে বলল, তাই ওরা দুধ খাদের জন্যে না হলেই নয় সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্যেই—

কচুপোড়া!—ভবেশ মুখ বিকৃত করে বললেন, এ কি বাংলাদেশ যে হা দুধ! হা দুধ! এ যে গোমাতার মুল্লুক, এখানে মানুষের চেয়ে গরুর আদর বেশী। দুধ খেতেই তো এদেশে এয়েছি বাপ। ব্যাপার তা নয়। দুধ যত চাও তত পাবে, কিন্তু গোয়াল থেকে নয়। গোয়ালে ওরা ভেজাল মেশাবে না, এই ওদের সেন্টিমেন্ট। তাই গোয়াল থেকে সব দুধ বিক্রি হয়ে গেলে চলে কী করে! এই হচ্ছে রহস্য। সেয়ানা ওরা কম? যখন এয়েছি তখন লিলু মাহাতো টাকায় দেড় সের করে দিচ্ছিল, চেঞ্জারদের সংখ্যা দু-চারজন বাড়তেই পাঁচ পো।

আপনি বুঝি এক নম্বর?—সুনীতি এসে শ্রীভবেশকিঙ্কর দাসকে জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্নের ধরন দেখে ভবেশ ভেবাচেকা খেলেন।

তাইতে অসিত খেঁকিয়ে উঠল সুনীতিকে: এক নম্বর মানে? এক নম্বর কী? কথা বলতে শেখ নি, চুপ করে থাকতে পার না?

ওমা, কী গেরো! অন্যায়টা—

আরে না না, বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি।—ভবেশ ব্যাখ্যা করলেন: খামকা বকাঝকা কেন আবার। উনি বলতে চেয়েছেন আমি এক নম্বর ঘরের লোক।

দেখলে?—সুনীতি তখন উলটে আক্রমণ করল অসিতকে: উনি তো আর তোমার মত বোকা—

জিভ কেটে সুনীতি সামলে নিল নিজেকে।

একগাদা নিমপাতা চিবিয়ে খাওয়ার মত মুখ করে অসিত স্থানত্যাগ করল।

নতুন পরিবেশ এবং চারপাশের মানুষজন কায়দাকানুন সম্পর্কে সম্যেধিলাভ করতে অসিতের দিন তিনেক লেগে গেল। প্রতিটি মানুষ আর প্রতিটি ব্যাপারের কতটুকু খাঁটী আর কতটুকু ভেজাল তা সে মনে মনে সব আঁচ করে ফেলল। তার মনের আদালতে অনেকের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের হয়ে গেল। কিন্তু পাঁচ নম্বর ঘরের পরিবারটা সম্বন্ধে তার একটু ধাঁধা লেগেছে, ওদের সম্পর্কে সুনীতি রিপোর্ট দিয়েছে, লোকটা রোগা হলে হয় কি, পেটে যেন বিদ্যে আছে মনে হয়। আর বউটার রিস্টওয়াচ আছে, বাচ্চাও মোটে একটা। শাঁখা-ফাঁখার ধার ধারে না, সিঁদুরও নেই-নেই ভাব, আবার ভেবেচিন্তে কথা বলে। এ নিশ্চয় চাকরি-করা-মেয়ে, তুমি দেখে নিও, সমস্ত লক্ষণ মিলে যায় একেবারে। ভালই, লোক ওরা খারাপ না, বরটা যদিও একটু কাছাখোলা। তবে ওদের ঝিটা না, খু—ব! আমার মত পাঁচ-সাতটাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচে দিয়ে আসতে পারে।

যা মেজাজ! সুনীতি যাই বলুক, এদের সকলের সঙ্গেই অসিতের নিজেরও আলাপ হয়েছে, তার প্রাথমিক বিচারে এরা সকলেই 'নট গিল্‌টি' পেয়েছে, চূড়ান্ত রায় যদিও আরও প্রমাণসাপেক্ষে মুলতবী আছে।

ইতিমধ্যে অসিত মানবচরিত্রের আর একটি অধ্যায় অধ্যয়ন করে ফেলল—হাটবারে হাটে যাওয়া নিয়ে। প্রতি বুধবার এখানে হাট বসে এবং ওই একদিনেই গোটা সপ্তাহের জিনিস কিনে রাখা এখানকার রেওয়াজ। আগামীকাল হাট, দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে ভবেশকিঙ্কর এসে ডাক দিলেন, ধর, বেঁচে আছ নাকি?

কোলের মেয়েটাকে কিছুতেই ঘুম পাড়াতে না পেরে অসিতের চোখ দুটো তখন রাক্ষসের মত জ্বলছে, পারলে সুনীতিকে চিবিয়েই খেয়ে ফেলে, কারণ সুনীতি তখন হাত-পা ছড়িয়ে দশ-বাঁও ঘুমের তলায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে তার চোখের সামনেই। ভবেশকিঙ্করের ডাক শুনে অসিত মেয়েটাকে কাঁধে ফেলে বারান্দায় চলে এল।

ভবেশ বারান্দায় ওঠেন নি, বাইরে দাঁড়িয়েই বললেন, জরুরী পরামর্শ ছিল একটা, দাঁড়াও।—তারপর পাঁচ নম্বর ঘরের উদ্দেশে গলা তুলে ডাকলেন, বলি শোভনবাবু, ঘুমোলেন নাকি? ও শোভনবাবু?

শোভন দত্ত তখন আরাম-কেদারায় দু-পা ছড়িয়ে দিয়ে নন্দলাল বসুর ছবির অ্যালবামে মগ্ন। ভবেশকিঙ্করের ডাক শুনে আঁতকে উঠে সে স্ত্রী ইরার দিকে তাকাল। ইরা তখন ছড়া বলে বলে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে নিজের ঘুমের ওষুধ হিসেবে স্থূলকায় একটি বাংলা উপন্যাস সবে বুকের ওপর তুলেছে। ইরা চোখ পাকিয়ে বলল, বুড়ো তো আচ্ছা লোক! যাও বাইরে যাও, ঘরের মধ্যে ডেকে আনতে হবে না। জ্বালাতন বিশেষ!

শোভন পর্দা ঠেলে বারান্দায় চলে এল।

আসুন একটা পরামর্শ করা যাক।—বলে ভবেশকিঙ্কর সতর্কভাবে চারিদিক দেখে নিলেন কেউ তাঁদের লক্ষ্য করছে কিনা। চোখ-ইশারায় শোভন আর অসিতকে আরও কাছাকাছি করে নিলেন (ঘোর ষড়যন্ত্র পাকানোর একটা থমথমে ছায়াকে ভবেশের মুখের ওপর নড়তে দেখে ওদের দুজনেরই তখন প্রাণ ধড়াস ধড়াস করছে), খুব খাটো গলায় ভবেশ থেমে থেমে বললেন, কাল তো হাট। এইবেলা একটা কিছু ঠিক করতে হয়, কী বলেন ? তুমি কিছু ভেবেছ, অসিত ?

এ বিষয়ে ভাববার কী আছে তা দুজনেই প্রাণপণে ভাবতে লাগল।

আলু বা তরিতরকারির দিকে ঝুঁকে দরকার নেই, কী বল ? হাঙ্গামাই সার, মার্জিন বিশেষ কিছু থাকে না, এ বেটারাও তো সেয়ানা হয়ে গিয়েছে। যা দিনকাল ! গত হাটের দিনে আমি ঘুরে ঘুরে সব দেখেছি তো, এক ডিম আর মুরগীতে কিছু পড়তা থাকে, আর হাতের কাছে পছন্দসই কিছু পড়ে গেল তো কিনে রাখতে পার। পোড়া দেশ, কিছুই তো পাবার জো নেই। যাই হোক, ডিমটা একটু বেশী করেই প্রকিওর করা যাবে, কী বল ?

ডিম।—ক্ষোভে ফেটে পড়ল অসিত : ঘোড়ার ডিম ছাড়া এ তল্লাটে অন্য কিছুর তো সন্ধান দেখি না। একটা ডিমের জন্যে এখানকার সমস্ত দোকানদারদের শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছি। যত দাম চাও দেব, তবু দে বাবা একটা ডিম। তা সবাই কেবল মাপ চায়, বলে আগে দেখুন—যেন আমি ভিখিরি !

যা বলেছেন—শোভন সমর্থন করল : লোকে বাজার করে পয়সা দিয়ে। কিন্তু এই স্বর্গরাজ্যে দেখছি পয়সা হলেই হয় না, দাঁতও দেখাতে হয়, সব কটা দাঁত না বের করে দোকানদারের সঙ্গে কথা বলারই উপায় নেই—কি ছেলে কি মেয়ে ! আগে গিয়ে বত্রিশপাটি বিকশিত করে অবান্তর কথা বলুন, তারপর চুপিচুপি ডিমের প্রসঙ্গ।

এই রসিকতায় ভবেশকিঙ্করের ভীষণ হাসি পেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনি বড়বাবু তো, হাসলেন না। দারুণ সংযমে উদ্গত হাসিটা গিলে ফেললেন, মুখটা ক্ষণিকের জন্য বিকৃত হল। বললেন, কালকে প্রচুর ডিম আসবে হাটে। কিন্তু বসা হাট থেকে কিনে তো কিছু ফয়দা নেই, চার আনা করে জোড়া নিয়ে নেবে—সেয়ানা হয়ে গিয়েছে তো। হাটে এসে বসবার আগেই ব্যাপারীদের ধরতে হবে। চারদিকের গাঁগুলো থেকে সব আসে তো। হেঁটে আসে গোরুর গাড়ি করে, আসে দূরদূরান্তর থেকে। আমার সব জানা আছে, কোন চিন্তা নেই, আমি শর্মা এখানে তো আর নতুন নয়—এই নিয়ে চতুর্থ বার এলাম। তা শোন, তিনটে পোস্টিং করতে হবে। ধানোয়ার রোড দিয়ে মাইল তিনেক গিয়ে একটা মোড়ের মাথায় একজন দাঁড়াবে, ওখানে দাঁড়ালেই ম্যাক্সিমাম ট্যাপ করা যাবে, তার এক ফার্লং গ্যাপ দিয়ে দিয়ে আরও দুটো পোস্টিং। ধর ডিম নেবে, তো ফার্স্ট ম্যান বলবে : কত করে ? ওরা চোদ্দ পয়সা কি চার আনা চাইবে নির্ঘাত। তাতে বলবে, দু আনা করে হয়তো দাও, যা আছে সব নিয়ে নিই। দেবে না ওরা, এগুতে থাকবে। সেকেণ্ড পোস্টও প্রথমে বলবে, দু আনা, তারপরে দশ পয়সা পর্যন্ত অফার দেবে। যদি দিয়ে দেয় তো সব কটা হাতিয়ে নিতে হবে। না দিলেও থার্ড পোস্টে গিয়ে ওরা কাত হয়ে যাবে। থার্ড পোস্টও যখন বলবে দু আনা, তখন ওদের ধাঁধা লেগে যাবে, নিজেরাই তখন দাম কমিয়ে তিন আনায় দিতে চাইবে। চাইলে আর কথা নেই, যে কটা আছে সব নিয়ে নাও। সাইকোলজিকাল এফেক্ট আর কি !

হতভম্ব অসিত আর শোভনের পলকহারা দৃষ্টির সামনে ভবেশকিঙ্কর অতঃপর এখানকার হাট এবং ব্যাপারীদের সাধারণ চরিত্র বিষয়ে আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব ও তথ্য সবিস্তারে বললেন।

শোভন বলল, এ যা ব্যাপার দেখছি, আমার দ্বারা হবে না। আমার বদলে সুরোদি যাবে, এক্সপার্ট আছে।

ভবেশ অনুমোদন করলেন। খুশী হয়েই বললেন, তা বেশ, ছাতাটা নিয়ে যায় যেন।

সুরোদি শোভনদের একাধারে ঝি, অভিভাবিকা এবং সমস্ত রকম আপদবিপদে রক্ষাকর্ত্রী। তার বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে কিন্তু তার সম্বন্ধে খ্যাতি এই যে, সে যে-কোন পুরুষের বাবা !

অসিত তখন মনে মনে বিচার করছে, সামান্য ডিম কেনা নিয়েই মানুষের জীবনে এত ভেজাল !

ভবেশ বারবার করে সাবধান করে দিলেন এই প্ল্যান হলিডে হোমের আর কেউ যেন জানতে না পারে। কারণ লোক যত বেশী হবে ভাগাভাগি হবে তত—তাতে করে তাদের ভাগে ডিম কম পড়ে যাবে।

পরে অসিতের ধারণা হয়েছে, হাটে যেখানে চার আনা জোড়া ডিম বিকিয়েছে সেখানে তারা এই কায়দায় তিন আনা করে নিয়ে আসতে পারলেও সম্পূর্ণ ব্যাপারটা এমন জঘন্য এক দুঃখ-স্মৃতি হয়ে তার জীবনে থাকবে যা সে কোনদিন ভুলতে পারবে না। হাট বসবে দুপুরবেলা, কিন্তু তারা বেরিয়েছে সেই সাতসকালে। কোনরকমে এক কাপ চা গিলে ভবেশকিঙ্করের সেই অনর্গল কানের পোকাখসানো বকবক বকবক শুনতে শুনতে মাইল তিনেক ধাওয়া করে যাওয়া, একা রাস্তায় ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা লোকঠকানো ফাঁদ পেতে দাঁড়িয়ে থাকা এবং তারপর একগাদা ডিম, মাছ, মুরগী আর এটা সেটায় দু হাত বোঝাই করে সেই তিন মাইল ঠেঙিয়ে ফিরে আসবার সময় যখন আধ মাইল রাস্তা বাকি, হঠাৎ ঝপঝপিয়ে বৃষ্টি নামল—তখন সেটাকে বিধাতার নিষ্ঠুর ঠাট্টা বলেই মনে হল অসিতের।

এই প্রসঙ্গে অসিত সুবোদিকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছে—ওর সৎসাহস এবং মেজাজ দেখে। পয়লা পোস্ট হিসেবে সুরোদিকে সবচাইতে দূরে অর্থাৎ সাড়ে তিন মাইল তফাতে জনমানবশূন্য রাস্তায় এক গাছের তলায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে তারা পিছিয়ে এসেছিল। সে দাঁড়িয়েছিল তিন মাইলের মাথায় আর ভবেশকিঙ্কর স্বয়ং আরও একটু পিছিয়ে গিয়ে—অর্থাৎ কিনা সেইটেই মোক্ষম ফাঁদ। ভবেশ সুরোদির কাছ থেকে তার বেঁটে ছাতাটা চেয়েছিলেন, কারণ তাঁকে যেখানে দাঁড়াতে হবে সেখানে রোদ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্যে গাছটাছ কিছুই নেই, কিন্তু সুরোদি দেয় নি। স্পষ্ট বলে দিয়েছিল চাঁচাছোলা মৈমনসিংহী ভঙ্গীতে, আমার মাথা নাই? রোদ্দুর আমার মাথায় লাগত না? এতে অসিত মনে মনে ভারী খুশী এবং সুরোদির এই সৎসাহসের মধ্যে নিখাদ খাঁটিত্বের সন্ধান পেয়ে উল্লসিত হয়েছে। এর ওপর আবার সুরোদিকে আধঘণ্টাটাক বাদেই যখন ফিরতে দেখা গেল একটিও ডিম সংগ্রহ না করেই আগুনচোখে আগুনমুখে আগুন গতিতে, 'কী হল?'—তার এই প্রশ্নের উত্তরে যখন সুরোদি খেঁকিয়ে উঠে 'অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি' বলে শূন্য থলি দুলিয়ে চলে গেল তখন অসিত এই মেজাজকে মনে মনে কুর্নিশ করেছে আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে---ভগবান, আগামী জন্মে আমাকে আর কিছু না হোক, এমনি খাঁটী মেজাজ দিও। এই যে দড়িবাঁধা ছাগলের মত ভবেশকিঙ্করের টানে-টানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমার এমনি পাপ যেন এ জন্মেই শেষ হয়।

হলিডে হোমের নাম 'আনন্দ ভবন', কিন্তু অসিতের দিনরাতগুলো কাটতে থাকে এমনি গ্লানির মধ্যে। লাভের মধ্যে সে দেখছে শুধু তার উদরের উন্নতি, এখানকার কাকচক্ষু টলটলে মিষ্টি জল আর মাইলের পর মাইল রাস্তা তার পেটের মধ্যে যেন একটা বকাসুরের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সুনীতির তো কিছুই হয় নি, বাচালতা কমার বদলে বরং আরও ভিরুলেন্ট আকারে দেখা দিয়েছে। দিনরাত সে বকেই চলেছে, যাকে পাচ্ছে তার সঙ্গেই তোফা জমিয়ে ফেলেছে, পেয়ারা গাছগুলো চিবিয়ে শেষ করছে, আতাগাছে আতাগুলোকে গাছে পাকতে দিলে শেষে যদি বেহাত হয়ে যায় এই ভয়ে কাঁচাই ছিঁড়ে নিয়ে আটার ড্রামে রেখে পাকাচ্ছে। একদিন তো মাছি আর বোলতা ভনভন-করা অলস দুপুরের অবসরে গোঠুয়ার ছেলে রামখেলাওনকে চার আনা বকশিশ কবুল করে বাতাবিলেবু গাছটা থেকে ঝুড়িখানেক লেবুই পাড়িয়ে নিয়ে ঘরে লুকিয়ে ফেলল, গাছটা ফরসা হয়ে গেল!

একদিন দুপুরে তাসের আসর বসেছে। মুরগীর মাংস খেয়ে ফুর্তিতে ভুরভুর করতে করতে ভবেশকিঙ্কর এসে ডাক দিয়েছিলেন, কই গো ধর, হয়ে যাবে নাকি একহাত? বলি ও সুনীতি, করছ কী? এস দেখি, তোমাকে ব্রে বানাই। বোদে হে! সবই তোমার ইচ্ছে। ও শোভনবাবু, তাসটা নিয়ে আসুন না মশাই।

বারান্দায় সতরঞ্জি বিছিয়ে অতঃপর ব্রে-র আসর জমে গেছে পাঁচজনে—ভবেশকিঙ্কর, অসিত, সুনীতি, শোভন আর ইরা।

অসিতের মোটেই ইচ্ছে ছিল না এখন তাসে বসতে। অর্ধনিমীলিতনেত্রে সে আশ্বিনের ঝিমন্ত দুপুরের রোদে ঝিরঝিরে হাওয়ায় সজনে গাছের পাতা-ঝরার দৃশ্য দেখছিল আর আত্মচিন্তা করছিল। এমন সময় তাস!

কিন্তু ভবেশকিঙ্করের কাছে সে সর্বাবস্থায় তেলা-পোকার কাছে কাঁচপোকার মত আত্মসমর্পণ করে, না করে যেন তার উপায় নেই।

খেলা জমিয়ে রেখেছেন ভবেশকিঙ্করই। খারাপ তাস পেলেই চোখমুখ শোচনীয় করে বলে উঠছেন, বোদে, জল দে! আর তাই শুনে শোভন হাসছে খুব। ইরাও হাসছে, তবে খুব মেপে মেপে। সুনীতি এত সামান্য কারণে হাসবার পাত্রী নয়, সে আপনাতেই মশগুল, খারাপ তাস পেলেই সে ওরে ব্বাস বলে হেঁচকি তোলার মত শব্দ করছে, আর সঙ্গে সঙ্গে অসিত কটমটিয়ে তাকাচ্ছে তার দিকে, কিন্তু সুনীতির ভ্রূক্ষেপ নেই।

সৌজন্যের খাতিরে (হয়তো ইরা আছে বলেই) ভবেশ একসময় স্বগতোক্তি করেছেন, বোদে খারাপ শব্দ নয়। আমি ভগবানের নিকনেম দিয়েছি 'বোদে'। বোদে বলে ডাকলে বেশ সাড়া পাওয়া যায়।

বোদেকে ডেকে ডেকে আপনি বেশ ভাল তাসগুলো হাতিয়ে নিচ্ছেন।—সুনীতি বলল।

বলতেই আর যাবে কোথায়, অসিত দাঁত খিঁচিয়ে উঠল: বড় যে ফটফট করছ, তুমি ওঁর চেয়ে ভাল খেলা জান বলতে চাও?

ও মা, তা আবার কখন বললাম!

তবে চুপ করে থাক।—অসিত আদেশ দিল, খেলতে বসেছ খেলবে, বাজে বকবে না।

একটু পরেই সুনীতি 'মাইনাস' করতে পেরেই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছে। তাইতে অসিত আবার রেগে উঠল। কিন্তু এবার সুনীতিও ছেড়ে কথা কইল না, সেও উলটে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: কেন তুমি আমাকে বারবার অপমান করছ বল তো। নিজে খেলতে পার না ভাল, কেবল পয়েণ্ট খাচ্ছ, আমি তো খাচ্ছি না তাই হিংসে। হিংসের বিষে কেবল জ্বলেপুড়ে মরছ।

অসিত তাস ফেলে দিয়ে উঠে পড়বার উপক্রম করল। ভবেশ ওর হাত ধরে অনেক কষ্টে ওকে সামলালেন।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দুজনের ঝগড়া বেধে গেল—চুরি করে অন্যের হাতের তাস দেখা নিয়ে। সুনীতির এই বদ অভ্যাস আছে, কিন্তু এটা সে করে নিজেরও অজানতে। কিন্তু অসিতের তা জানা আছে। তাই সুনীতি ইরার তাস দেখবার চেষ্টা করতেই অসিত ডাক দিয়ে উঠেছে, কিন্তু সুনীতি তা মানবে কেন। ক্রমে এই নিয়ে একসময় ভীষণ ঝগড়া বেধে যাবার উপক্রম হল। কিন্তু এই পরিস্থিতিটাও ভবেশকিঙ্কর অনেক কষ্টে সামলালেন এবং ইরা সরে বসে সতর্কতা অবলম্বন করল।

ভবেশের ব্রে হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিল। তাঁর তখন বিরাশি, তার পরেই অসিতের সত্তর, ইরার পঞ্চাশ, শোভনের চোদ্দ এবং সুনীতির মাত্র পাঁচ। এই অবস্থাতে হঠাৎ আবার দাঙ্গা লেগে গেল। কারণ সেই দানের শেষাশেষি ইরা সহসা প্রতিবাদ জানাল সুনীতিকে, ও মা সে কী, আপনার হাতে চিড়িতন আছে? তা হলে যে আগে পাস দিলেন? কী একটা যেন পাসালেন?

না না, হতেই পারে না।—সুনীতি জোর গলায় প্রতিবাদ করল।

কিন্তু প্রতিবাদে ফল হল না। ইরা তার নিজের পাওয়া পিটগুলোর থেকে খুঁজে বের করে সুনীতির ভুলটা হাতেনাতে প্রমাণ করে দিল।

সুনীতি লজ্জা পেল ভীষণ। আরক্ত মুখে বলল, ঠিক আছে, আমার শাস্তি হোক, আমার নামে পঁচিশ লিখে দিন।

লিখছিল শোভন। সে হেসে বলল, না না, ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। এ দানটা বাতিল। দিন ভবেশবাবু, তাস দিন।

অসিত উঠে গেল বিনা বাক্যব্যয়ে। কোথায় গেল ভেবে সবাই ধাঁধায় পড়ে গেল।

তাস দেওয়া হয়ে গেছে। সবাই অপেক্ষায় আছে অসিতের জন্য। কিন্তু অসিত আর আসে না।

সুনীতি বলল, ও আর আসবে না। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে বোধ হয়।

ভবেশ চিৎকার করে কয়েকবার ডাকলেন। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

হঠাৎ জ্বরে-পড়ে-যাওয়া বড় ছেলে পুণ্যের শিয়রে পাখা হাতে প্রায় সারাটা রাতই বিনিদ্র কাটিয়ে দিয়ে শেষ রাতের দিকে অসিত তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। ভোরের প্রথম মোরগের ডাকেই তার সেই তন্দ্রা ছুটে গেল। ছেলের কপালে হাত দিয়ে দেখল জ্বর কমে গেছে, উত্তাপ স্বাভাবিক। দারুণ উৎকণ্ঠা তার বুক থেকে নেমে গেল।

সুনীতির দিকে তাকিয়ে দেখল সে তখনও বেহুঁশের মত ঘুমোচ্ছে, সারারাতে একবারও তার ঘুম ভাঙে নি।

না ভাঙুক, ছেলের জ্বর নেমে তো গেছে, সেই ঢের। নিঃশব্দে অসিত উঠল। জামাটা গায়ে দিল। শীত-শীত লাগছে। জাম্পারটা খুঁজে গায়ে চড়াল। আলোয়ানটাও টেনে নিল। তারপর অ্যালুমিনিয়মের দুধের পাত্রটা।

মনে পড়ল এখানকার পাট আজকেই শেষ।

পা টিপে টিপে কারও ঘুম না ভাঙিয়ে চুপিসাড়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

শিশিরে ভেজা লাল কাঁকরে ছাওয়া পথ হলিডে হোমের ফটক পর্যন্ত। শিউলির গন্ধমাখা শরতের হাওয়া তার শরীরের গ্লানি অনেকখানি টেনে নিল।

আশ্রম রোড বরাবর সে চলল, লিলু মাহাতোর গোয়ালে দুধ আনতে।

পেছন থেকে ডাকল শোভন, অসিতবাবু নাকি ?

অসিতের বিরক্তি লাগল। এই সময়ে তার কথা বলতে ভাল লাগে না, কারও সঙ্গেই না। অসিত থমকে দাঁড়াল। ভাবল, তবু রক্ষে এই যে ভবেশকিঙ্কর নয়, শোভন দত্ত।

আপনার তো অদ্যই শেষ রজনী ?—শোভন জিজ্ঞেস করল।

হুঁ। কাল সকালের গাড়িতে যাব।

পুণ্যর জ্বর কেমন ?

কমের দিকে। রেমিশন হয়েছে।

তারপর চুপচাপ। রাস্তার দু পাশে সারিবদ্ধ সব বাগানবাড়ি ফুলের সমারোহে উদ্ভিন্ন। সেখানে দু-একজন করে বৃদ্ধ ছাড়া আর কারও ঘুম ভাঙে নি এখনও। কুয়াশা পড়েছে ঘন হয়ে। পূর্ব দিগন্তে পরেশনাথ পাহাড় এখন লুপ্ত।

আজ আপনার ওয়াইফ এলেন না যে ?—অবশেষে আসতই নীরবতার ধ্যান ভেঙে দিয়ে বলল।

এমনই।

আপনার ওয়াইফকে আমি যতটা স্টাডি করেছি—অসিত একটু গুম হয়ে থেকে ফের বলল, তাতে আপনাকে সুখী মানুষ বলে মনে হয়।

শোভন হাসি চেপে বলল, কি রকম ?

ভবেশবাবুর কাছে শুনেছি উনি বি. এ. বি. টি.। তাই তো ?

তা ঠিক।

অথচ দেখুন কী সংযম। একটি বাড়তি কথা কখনও শুনলাম না। আমি অনেক গ্র্যাজুয়েট দেখেছি যাদের বিদ্যের সঙ্গে বুদ্ধি প্লে করে না। খাঁটী শিক্ষা না হবার ফলে যত বাজে চেঁচামেচি, মিথ্যে কথা আর অসংযমে এদের চরিত্র এমন যে, অশিক্ষিতদের সঙ্গে এদের ডিফারেনশিয়েট করা যায় না।

একটু দম নিয়ে অসিত আবার শুরু করল, আপনাকে প্রথম দর্শনেই আমার ভাল লেগেছিল। তারপর আপনার ওয়াইফকে যখন দেখলাম, বুঝলাম আপনি প্রকৃত সুখী লোক। প্রকৃত ভাগ্যবান। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি, বাইরে আপনার ওয়াইফকে তো বেশ ভালই মনে হয়, ভেতরেও তিনি তাই তো—মানে সাংসারিক খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিদ্যের সঙ্গে ওঁর বুদ্ধি খেলে তো ?

শোভনের হাসি পেল, কিন্তু অসিতের গুরুগম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাসতে সাহস করল না, শুকনো মুখেই জবাব দিল, তা খেলে।

অসিত আরও জানতে চাইল, আপনার মেয়ের অসুখবিসুখ হলে রাত জাগে কে ? আপনি একা, না উনিও জাগেন ?

শোভন হাসি চাপতে গিয়ে হেঁচে ফেলল। তারপর জবাব দিল, উনিও জাগেন।

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে অসিত এবার চূড়ান্ত রায় দিয়ে দিল, খাঁটী শিক্ষার ফল। আপনি প্রকৃতই সুখী লোক। দেখেও আনন্দ হয়। আমার হাজারিবাগ আসা সার্থক।

শোভন অবাক হয়ে অসিতের মুখের দিকে তাকাল।

ওয়াইফ যদি খাঁটী হয়—অসিত একটি সিগারেট ধরিয়ে বলল, তা হলে কত শান্তি। আমারটি ভেজাল।

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে

শ্রীদীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

ওল্‌ড্‌ গোরিও [৩]

"I am hungry, Laure, will ever my two immense desires be satisfied---to be famous and to be loved?" [বোনকে লেখা বালজাকের চিঠি]

এই চিঠিতে বালজাকের দুটি দুরন্ত জীবনতৃষ্ণার নাম উচ্চারিত। অনুচ্চারিত তৃতীয়টির নেশা ছিল কিন্তু আরও তীব্র, আরও মধুর। দুটি নয়—তিনটি তারা জ্বলজ্বল করেছে জীবনভোর বালজাকের ভাগ্যাকাশে। সেই তিনটি তারার নাম: খ্যাতি, প্রেম আর ঐশ্বর্য। দুর্যোগের ঘনঘটা ব্যর্থতার অন্ধকার মেঘ বিরহের অশ্রুজল বারংবার ঢেকে দিতে চেয়েছে তাদের, কিন্তু মুছে দিতে পারে নি কোনওদিন। দুর্বার বেগে অগ্রসর, বাধার সম্মুখে দুর্নিবার দুরাশার তুরঙ্গে সওয়ার, ব্যর্থতায় বিক্ষুব্ধ, প্রতিজ্ঞায় অবিচল, দীর্ঘপথের বন্ধুর দুরত্ব অতিক্রমের অপেক্ষায় অস্থির, রাত্রির তিমির-অন্তে সুনিশ্চিত সুপ্রভাতের প্রতীক্ষায় স্থিরচিত্ত বালজাকের হাসিকান্নার হীরাপান্নায় গাঁথা 'দি কমেডি হিউমেন'-এর পৌষফাগুনের আকাশেও দপদপ করে জ্বলছে যে তিনটি তারা—তারা ওই খ্যাতি, প্রেম আর ঐশ্বর্য।

কেবল বালজাক নয়, সভ্যতার প্রত্যুষ থেকে সকল কালের সমস্ত মানুষের ঊর্ধ্বশ্বাস যাত্রার উদ্যম যাকে ছুঁতে না পেরে হার মানে নি, ছুঁতে পেরে মনে করেছে তাদের হার—সে ওই অবধারিত নক্ষত্রত্রয়—খ্যাতি, প্রেম আর ঐশ্বর্য। মানবজীবনের মহাভারত একই সঙ্গে এই না পেয়ে হার-না-মানার এবং পেয়ে হার-মানার মহৎ নাটক। বালজাকের নিজের জীবন-নাট্য যেমন এর ব্যতিক্রম নয়, তাঁর নাট্যজীবনও তেমনই ওই তিনটি তারার আলোয় আলোকিত।

খ্যাতি প্রেম আর ঐশ্বর্যের সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত এই মানুষই অশ্রুসিক্ত 'দি কমেডি হিউমেন'-এর রক্তাক্ত মডেল।

কাদার তাল থেকে যে তৈরি করে পুতুল সে কুমোর; সেই পুতুল যার অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় মুহূর্তে হয়ে ওঠে প্রতিমা—সেই-ই শিল্পী। পাথর কেটে যে বানায় পথ সে মজুর; সেই পাথরে যে ফুল ফোটায়, সেই-ই শিল্পী। যার ছবিতে মানুষের মুখ অবিকল ধরা দেয় সে আলোকচিত্রী; যার তুলিতে মানুষের মনের বিকলতাও ফুটে ওঠে—সেই-ই শিল্পী। মানুষের মুখের হাসি যার রচনায় শুধু হাসিই হয়ে থাকে, তার বেশি কিছু হয় না; মানুষের চোখের জল যার সৃষ্টিতে কেবল কাঁদায়, ভাসায় না—সে artisan; হাসির চোখে জল যে দেখতে পেয়েছে, অশ্রুর মুকুরে যার প্রতিবিম্বিত অনুরাগের সূর্য-তারা—কেবল সেই-ই artist। মানবজীবনের মহত্তম ট্রাজেডির নাম তাই শুধু বালজাকের লেখনীতেই হতে পেরেছে, 'দি কমেডি হিউমেন'। মানুষের ট্রাজেডি এই নাট্যোপন্যাসে কমেডি; তার কমেডি এখানে ট্রাজেডি। খ্যাতি প্রেম আর ঐশ্বর্যের সংগ্রামে মানুষের পরাজয় এখানে জয়; আর তার জয় হয়েছে তার চরম পরাজয়। সাফল্য ও ঈর্ষার রৌদ্র-মেঘে, হাসিকান্নার রাগে-অনুরাগে, অভাব ও ঐশ্বর্যের আলো-ছায়ায়, বিশ্বাস এবং বিশ্বাসঘাতকতার সাদা-কালোয়

হার মানা এবং হার-না-মানার বিরামবিহীন অন্তর্দ্বন্দ্বে আলোড়িত মানবজীবনের মহাভারত 'দি কমেডি হিউমেন'—জীবনের কুরুক্ষেত্রে জয় এবং পরাজয় যেখানে কালের কষ্টিপাথরে তুল্যমূল্য।

এবং 'ওল্ড্ গোরিও' সেই সমগ্র মানবজীবনকাব্যের অবশ্যম্ভাবী ভূমিকা; বালজাকের মানবচরিত্রের স্মরণীয় মানচিত্র 'দি কমেডি হিউমেন'-এর অবিস্মরণীয় পটভূমিকা।

'ওল্ড্ গোরিও'র এবং তার সঙ্গে আরও দু-হাজারের বেশী চরিত্রের সমাবেশে বিশালকায় 'দি কমেডি হিউমেন'-এ হাত দিতে বালজাকের জীবনের মধ্যাহ্ন কখন অপরাহ্ণে এবং অপরাহ্ণও কখন অকাল-সায়াহ্নে গড়িয়ে গেছে বালজাক নিজেও তা জানতে পারেন নি। তাঁর জীবন এবং সাহিত্য-যাত্রার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; বরং তা দুর্গম এবং বন্ধুর। উপরে উদ্ধৃত পত্র রচনার সময়ে তিনি গ্রাসাচ্ছাদনের কারণেই কেবল:

"He worked at a white fever, turning out stories after a set formula. He wrote sixty pages a day. In three years, under various pseudonyms, he completed thirty-one volumes of adventure—and still he was neither loved, nor famous."

সাহিত্যের সেই সব সবজান্তা ভবিষ্যদ্বক্তা, যাঁরা সব দেশে-কালে নিঃসঙ্কোচে রায় দেন, দ্বিধা করেন না এতটুকু বলতে যে—বেশী লিখলেই বাজে লিখতে হয় এবং বেশীদিন বাজে লিখলে তাকে আর লিখতেই হয় না বেশীদিন—পৃথিবীর অনেক সাহিত্যরথীরই রচনার ভয়াবহ সংখ্যা হয়তো তার বিপক্ষে রায় দেয় কিন্তু বালজাকের মত এই উক্তির এমন জীবন্ত প্রতিবাদ সম্ভবতঃ সাহিত্যের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই। গুণের এবং সংখ্যার ওজনে অদ্বিতীয় 'দি হিউম্যান কমেডি'-কারের আবির্ভাবই যেন সাহিত্যের বিশ্বনাথদের পদে পদে অপদস্থ করতে।

মহৎ লেখার জন্ম দিতে যে-সব অস্ত্রে শান দিতে বলে গেছেন সব যুগের সাহিত্যশাস্ত্রকারেরা এবং উচ্চারণ করে গেছেন নিষেধের বাণী যেসব ক্ষেত্রে, বালজাক তার প্রত্যেকটি 'হ্যাঁ'-কে 'না' এবং 'না'-কে 'হ্যাঁ' করবার জন্যেই যেন কলম হাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিশ্বসাহিত্যের কুরুক্ষেত্রে।

সাহিত্যের শাস্ত্রকারেরা যখন বলেছেন মহৎ রচনা মহত্তর সাধনা, ধৈর্য এবং সংযমের পরাকাষ্ঠা ছাড়া অসম্ভব, তখন বালজাক সম্পর্কে তাঁর সমালোচক বলছেন: "There was no literary crime that he did not commit at that time, his pen was at the service of anyone who cared to pay for it,…" বৈয়াকরণরা সাহিত্যের পান থেকে ব্যাকরণের চুন খসলে যখন খড়্গহস্ত, বালজাকের ব্যাখ্যাকার কিন্তু তখনও না বলে পারেন না যে: "It is generally agreed that Balzac wrote badly. He was a vulgar man (but was not his vulgarity an integral part of his genius?) and his prose was vulgar. It was prolix, pretentious and too often incorrect. Emile Faguet, a very distinguished critic, in his book on Balzac has given a whole chapter to the faults of taste, style, syntax and language of which the author was guilty.…Now it is admitted that Charles Dickens wrote English none too well, and I have been told by cultivated Russians that Tolstoy and Dostoevsky wrote Russian very indifferently. It is odd that the four greatest novelists the world has known* should have written their respective languages so ill. It looks as though to write well were not an essential part of the novelist's equipment; but that vigour and vitality, imagination, creative force, observetion, knowledge of human nature, with an

interest in it, and sympathy with it, fertility and intelligence are more important." [Great Novelists and their Novels]

টাকার জন্যে লিখতে নিষেধ করেছেন সাহিত্যের মহাজনেরা। কিন্তু বালজাকের বেলায় দেখি: 'One hundred and seventy thousand francs in debt by the time he is forty. Rapid figuring. The interest alone on that amount would come to six thousand francs a year.···He writes a novel in three days, completes another in six weeks with only eighty hours of sleep—an average of two hours a day—···"

সাহিত্যজীবনের শুরুতে শুনেছিলেন বালজাক: "In the future do anything but write"; হাস্যমুখে কেবল অদৃষ্টকে নয়, সাহিত্যের পরীক্ষিত সমস্ত রীতিনীতি মিথ্যে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন বালজাক। করতে পেরেছিলেন তার কারণ জীবনে এবং সাহিত্যজীবনে স্বাস্থ্যরক্ষার ধার ধারেন নি তিনি কোনওদিন। স্বাস্থ্যই তাঁকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে আজীবন। করতে পেরেছিলেন তার কারণ, প্রাণোজ্জ্বল বীর্যোচ্ছল বালজাকের কপালে যে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছিল জীবনের জয়টিকা, তার নাম—প্রতিভা।

সমস্ত প্রচলিত রীতিনীতিকে যে শিকার করে এবং সমস্ত যুগের বিশ্বনাথদের করে অস্বীকার 'দি হিউমেন কমেডি'র জন্ম দিয়েছে সেই-ই—কোনও দেশে কোনও কালে নিরূপিত হয় নি যার সংজ্ঞা, সেই বিশ্লেষণের অনায়ত্ত, ব্যাখ্যার অতীত, সমস্ত সৃষ্টির উৎস, প্রতিভা যার নাম মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় নয় কিছুতেই।

'দি হিউমেন কমেডি' বিশ্বসাহিত্যের বিস্ময়; কিন্তু 'ওল্ড্ গোরিও' বিস্ময়ের অতীত বস্তু—বালজাকের প্রতিভার পদ্মরাগমণি।

'ওল্ড্ গোরিও'কে বালজাকের বিপুল রচনার অরণ্যে বনস্পতির সম্মান দেবার কারণ প্রদর্শন করতে ব্যস্ত সমারসেট মম বলছেন: "It is not easy out of Balzac's immense production to choose the novel that best represents him.···I have chosen Old Man Goriot for several reasons. The story it tells is continuously interesting. In some of his novels Balzac interrupts his narrative to discourse upon all kinds of irrelevant matters, but from this defect Old Man Goriot is on the whole free. He lets his characters explain themselves by their words and actions as objectively as it was in his nature to do. Old Man Goriot is well-constructed,...."

মম যে 'continuosly interesting'-এর কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সঙ্গত। যে 'objectively'-লেখার প্রশংসা করেছেন তাও সত্য। কিন্তু কেবল মাত্র এই কারণে 'ওল্ড গোরিও' বিশ্বের দশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের একটি—এর চেয়ে অসঙ্গত উক্তি আর কিছু হতে পারে না। Continuously interesting বলে কোনও বই বেস্ট সেলার হতে পারে; সেই সঙ্গে অবজেকটিভ রাইটিংয়ের কল্যাণে আকর্ষণ করতে পারে বিদগ্ধজনের দৃষ্টি। কিন্তু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম পরিগণিত হতে কেবল ওই দুই গুণ নয় পর্যাপ্ত।

'ওল্ড্ গোরিও'র অনুবাদক এম্. এ. ক্রফোর্ড 'ইনট্রোডাকশানে' লিখছেন: "I can only say to the reader, 'Here's richness!' and leave him to explore it, assuring him, if he has not yet read any novels of the Comedie humaine, that Old Gorio is one of the most delightful to begin with."

'Delightful to begin with' বললে বিশেষ করে এই বইটি অনুবাদের কারণই কেবল অনুধাবনযোগ্য হয়; হতে পারে। কিন্তু delightful বলে কোনও রচনা 'দি

কমেডি হিউমেন'-এর ফসলশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতে পারে কি ?

মম অবশ্যই 'continiously interesting'-ই যে বালজাকের 'ওল্ড্ গোরিও'র একমাত্র ভূষণ তা বলতে চান নি। চরিত্রের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র জানতেন বালজাক। মমের আলোচনায় বালজাকের সৃষ্টিক্ষমতার এই দিকটা আলোকিত হয়ে আছে : "...they live and breathe ; and you believe in them, I think, because Balzac so intensely believed in them himself." প্রমাণ হিসেবে তিনি তুলে ধরেছেন ডক্টর Bianchon-এর চরিত্র। এই সৎ এবং বুদ্ধিমান [মমের চোখে] চরিত্রটি বালজাকের একাধিক উপন্যাসে দেখা দিয়েছে। অক্ষরের অস্থিমজ্জায় গঠিত ডক্টর Bianchon কিন্তু বালজাকের চোখে রক্তমাংসে সজীব হয়ে ওঠে এতদূর যে মম্ লিখেছেন : "...when Balzac was dying he said : 'Send for Bianchon. Bianchon will save me'."

এবং পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের একটি—এই তকমা 'ওলড্ গোরিও'কে দিতে গিয়ে 'Of Human Bondage'—বিংশ শতাব্দীর শেষ সৃষ্টিধর্মী মহৎ উপন্যাসের স্রষ্টা বলতে বিস্মৃত হন নি যে :

"Old Man Goriot is noteworthy also because in it we meet for the first time one of the most thrilling characters Balzac ever created. Vautrin. The type has been reproduced a thousand times, but never with such striking and picturesque force, nor with such convincing realism. Vautrin has a good brain, willpower and immense vitality. It is worth the reader's while to notice how skillfully Balzac, without giving away a secret he wanted to keep till the end of the book, has managed to suggest that there is someting sinister in the man. He is jovial, generous and good-natured ; he is strong, un-commonly clever, self-possessed ; you not only admire him, you sympathise with him, and yet he is strangely frightening. You are fascinated by him, as was Rastignac, the ambitious, well born young man who comes to Paris to make his way in the world ; but you feel in the fellow's company the same instinctive uneasiness as Rastignac felt. Vautrin may be a figure of melodrama, but he is a great creation."

স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, মম্ বালজাকের 'ওল্ড্ গোরিও'কে বুঝতে পারেন নি। কেন বুঝতে পারেন নি সে কথা আগে বলেছি ; মহত্তম রচনা বোঝবার নয়, বাজবার। ওস্তাদ যখন ভৈরবী আলাপ করে তখন তা শুনতে শুনতেই যার মনের আকাশ না ভরে যায় ভোরের আলোয়, সে শ্রোতা মাত্র—ভোক্তা নয়। কেবল কানকে যা তৃপ্ত করে তা বাদ্যযন্ত্র মাত্র। ইন্দ্রিয় পার হয় মর্মে গিয়ে বাজে যা, এই ধূলিধূসর মর্ত্যলোক থেকে যা তুলে নিয়ে যায় একটু উর্ধ্বে, অমর্ত্যলোকের যা অবারিত করে দ্বার তা কিন্তু বাদ্যযন্ত্র নয় ; তা গুণীর হাতে মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়েছে বাদ্যযন্ত্র থেকে বীণায়—সরস্বতার হাতেই যার কেবল শাশ্বত অবস্থান। রচনার ক্ষেত্রেও যে লেখা কেবল বুদ্ধিকে স্পর্শ করে তা চিত্তাকর্ষক, কিন্তু তা চিরকালের ধন নয়। যে বিস্ময়কর রচনায় নতুন আর এক বিশ্বরচনা সম্ভব না হয়, যে রচনা পড়তে পড়তেই পাঠক না বিস্মৃত হয় পারিপার্শ্বিক, তার মনের আকাশে যা না ধরায় আর একটু রঙ, সেও লেখা ; কিন্তু সে লেখা নয় কিছুতেই—যা ধরণীর তলে, গগনের গায়, সাগরের জলে, অরণ্যছায় আর একটুখানি নবীন আভায় রঙীন করে দিয়ে যায় সংসার-মাঝে দু-একটি সুর, করে দিয়ে যায় আরও মধুর ; দু-একটি কাঁটা দূর করে দিয়ে যে ছুটি নেয় তবেই।

আর সে লেখা কেবল তারই জন্যে লেখা যার শুধু

মাথা নেই—হৃদয়ও আছে। যে কেবল বুদ্ধিমান নয়—হৃদয়বানও বটে। যে শুধু বিদগ্ধ পাঠক নয়—সহৃদয়হৃদয়ও বটে।

মমের মত 'ওল্ড্ গোরিও'র অনুবাদকও বালজাকের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেন নি। 'ওল্ড্ গোরিও' সম্পর্কে ক্রফোর্ডের বক্তব্য হচ্ছে এই মাত্র:

"The work is quite complete in itself, and requires for its enjoyment no knowledge of any other volume of the Comedie humaine, the great series to which it belongs. At the same time, the immense fertility of the author's mind, the breadth of his sympathies, and the range and multiplicity of his interests that sought an outlet in the whole vast undertaking are reflected in this small part of it; so that it gains by being part of a major plan."

'ওল্ড্ গোরিও' বিশ্বসাহিত্যের বিস্ময় 'দি কমেডি হিউমেন'-নিরপেক্ষ সুখপাঠ্য সৃষ্টি বলে নয়। বস্তুতঃ কোনও সাহিত্যসৃষ্টিই সে কারণে মহৎপদবাচ্য হয় নি কোনওদিন; হবেও না কোনও কালে। মহত্ত্বের যে একমাত্র মাপকাঠি বিশ্বসাহিত্যের বিচারশালায় চিরগ্রাহ্য তা হচ্ছে—বৃহৎ বক্তব্য। হয় কোনও একজনের, নয় অনেকজনের অর্থাৎ গোটা একটা যুগের প্রতিনিধি নয় যে উপন্যাস তা স্মরণীয় হতে পারে নানা কারণে, কিন্তু কোন যুক্তিতেই তা অবিস্মরণীয় সৃষ্টি নয়।

চিরকালের বীণায় সত্য শুভ ও সুন্দরের বাণী যখনই বেজেছে তখনই কেবল সে লাভ করেছে বীণাপাণির বরমাল্য।

বালজাকের 'ওল্ড্ গোরিও' একটা যুগের পূর্ণ চিত্র; তার সম্পূর্ণ ইতিহাস। সেই যুগের—যে যুগ প্রথম পৃথিবীটা কার—এই নিরুত্তর জিজ্ঞাসার উদ্ধত উত্তরে উদ্দীপিত হয়েছিল এই বলে যে পৃথিবী টাকার! বালজাকের আগে কোনও রচনায় অনুপস্থিত এই যুগের রক্তোক্ত মর্মমূল যে উপন্যাসে প্রথম উদ্‌ঘাটিত এবং সেই কারণে সাহিত্যের অবিস্মরণীয় কীর্তি—তারই স্মরণীয় নাম: 'ওল্ড্ গোরিও'। আমরা অতঃপর তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হব জানবার জন্যে কেন 'ওল্ড্ গোরিও' বিশেষ এক যুগের কথা হয়েও চিরযুগের কাহিনী।

[ক্রমশঃ]

আদিম

সন্তোষকুমার অধিকারী

পেরোলাম অনেক স্বপ্নের পথ কল্পনা-বিলাসে।
এবার বিবিক্ত মন চেতনার সুতীক্ষ্ণ আলোকে
রিক্ততায় অবহিত। পুঞ্জীভূত ম্লান অবিশ্বাসে—
দেখেছি জীবন ছিন্ন অনির্বাণ যন্ত্রণার চোখে।
জেনেছি প্রলাপমাত্র, এ পৃথিবী মানুষের নয়।
সদিচ্ছা করুণা, মৈত্রী বাক্য শুধু—প্রয়োগে শাণিত।
অলীক অর্থের ফেরে সৃষ্টি করি বিচিত্র জগৎ,
অথচ জান্তব লোভে এ হৃদয় হয়েছে চিহ্নিত।

দেখেছি বিদ্যুদ্দীপ্তি, অন্ধকারে বিচ্ছুরিত মন।
দুরন্ত হিংসায় তবু শকুনি-ইচ্ছার সঞ্চরণ।
বর্বর নিষ্ঠুর লোভে যেন সেই আরণ্য আঁধার,
সভ্যতার পলিমাটি পলকে হারায় দুর্নিবার
জলস্রোতে। জেলে যাই করুণার সুতীব্র 'নিওন'
অথচ হৃদয়ে এক আদিম বন্যতা সুগোপন॥

যদি সে আবার ডাকে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

যদি সে আবার ডাকে সাড়া দেব, যাব তার সাথে
যেখানে অরণ্যপথ কিংবা মৌনপর্বত শিখর ;
সন্দিগ্ধ হব না আর, ক্লান্ত হাত রেখে তার হাতে
শুনব নির্জন পথে বালুতটে সমুদ্রের স্বর।
বন্ধ্য কামনারা যত ছত্রভঙ্গ প্রতীক্ষার বাণে,
আকাঙ্ক্ষার মরালীকে ছিন্ন করে সময়-শিকারী ;
মাঘের স্তম্ভিত শীত ফাল্গুনের বনে হিম আনে,
অতৃপ্ত উদ্যোগ আজও যেন কোনও খর তরবারি।

তথাপি দুর্মর আশা, সচকিত হব তার ডাকে,
হাড়ের পাহাড়ে ফের সবুজের স্নিগ্ধ সঞ্চরণ ;
যেখানে হীরকদ্যুতি অন্ধকারে বিচ্ছুরিত থাকে—
সে স্নিগ্ধ হৃদয়মনে সমন্বিত হবে এই মন।

গভীর আশায় আমি বারবার বাহুর বিস্তারে
সঞ্চারিত হতে চাই, শুষ্ক ক্ষেতে চাই জলধারা ;
হৃদয়ে আহত পাখি জটায়ুর মত পাখা নাড়ে,
সভ্যতার জ্বালামুখে প্রস্তরিত ত্রাসের ইশারা।

সর্বদা প্রস্তুত তবু সে কেবলি মায়াবী প্রচ্ছদে
বাড়ায় বিচিত্র তৃষা ধাবমান আহত জগতে॥

●

বর্ষাশেষে

আর্যপুত্র সুপ্রিয়

এবারের বর্ষাশেষে কিছু তো খবর পাওয়া গেছে।
আবিল বানের জল অলক্ষিতে পদ্মপত্রে এসে
থমকিয়ে টলমল করেছিল দুই-একবার—
এক ফোঁটা যার,
চমকিয়ে দেখি আজ,
হয়ে গেছে সুকঠিন শিশিরের মত।
দৃষ্টির সীমায় এসে
এনেছে সে
নবতর সঞ্জীবনী আলোর আন্দাজ।
এর পর আপনারই লীলায় হঠাৎ,
ভয় হয়, অন্য কোনদিন,
এই স্থূল আলোকের প্রাণ
তরুণ রবির মোহে আবার কি হবে বাষ্পসাৎ!
কিংবা এক অকাল বর্ষণে
আপন তারল্য সত্তা
ফিরে পাবে অন্য কোন অনাদৃত ক্ষণে।

●

রূপকথা

উমা দেবী

নিশীথ-সমুদ্র জলে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসে যে দীপ্ত সঙ্গীত
আমি তাহা শুনি নিত্য। ভরে নিই বেদনার আনন্দ সম্বিৎ
দেহযন্ত্রে। অন্ধকারে ভরে ওঠে স্বপ্ন-পারাবার—
নদ-নদী ফুলে ওঠে রতিযন্ত্রণার
তীব্র সুধারসে। আর সেইক্ষণে অনেক মমতা
বারবার ক্ষমা করে বারবার ভেঙে-যাওয়া প্রেমের
সততা।

অন্ধকার ছায়া নয়। সে তো এক রক্তিম লালসা
হৃদয়কে ঘিরে থাকে। প্রমত্ত প্রকট ভালবাসা
বয়ে যায় সুড়ঙ্গের গুপ্তপথে, ধমনীর ললিত স্পন্দনে
সবকিছু পেয়ে গিয়ে কিছু না পাওয়ার এক স্তিমিত ক্রন্দনে।
রসায়িত হয়ে ওঠে জীবনের গুপ্ত-কোষগুলি—
কে যেন বুলায় দেহে মমতায় নিলীন অঙ্গুলি।
সে মুহূর্তে তীব্রতম বাসনার সুখ-যন্ত্রণায়
বিগুণিত দেহকোষ সহস্রধা ফেটে যেতে চায়।

অন্ধকার—অন্ধকার—
ভরে তোল হে নিশীথ—মননের গভীর জোয়ার
দাঁড়াক নিকটে এসে গোপন প্রেমিক সেই—ভয়াল,
সুন্দর—
দূর স্রোতে ভেসে-আসা নিকট মুহূর্তে মনোহর—
সর্বেন্দ্রিয় রুদ্ধ করে সর্বেন্দ্রিয়ে যার আগমন—
অরণ্য-হৃদয় করে শান্ত তপোবন।
নিশীথ-সমুদ্র জলে আলোক-তরঙ্গে ভাসে যে নব সঙ্গীত
স্মরণ করাবে সেই মুহূর্তেই দুজনার একক সম্বিৎ।

●

নিদ্রা

কুমুদ ভট্টাচার্য

আছ, এইটেই তোমার জানা।
নেই, সেটি তোমার জানার এলাকায় পড়ে না।
সুতরাং ভাবনাটা কিসের!

জানার মধ্যে 'নেই' নেই।
না-জানার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড
তার সমস্ত অতীত আর ভবিষ্যৎকে নিয়ে।
তুমি আজকের দিনটিকে নিয়েই খুশী হও।

প্রতি রাত্রির নিদ্রায় তুমি থাকো না।
সুতরাং না-থাকায় তুমি অনভ্যস্ত নও!
প্রতি প্রভাত তোমাকে জাগিয়ে দেয় বলে,
না জাগালে কী করতে!

যাকে, ভয় করছ সে কি নিদ্রা ছাড়া আর কিছু?
দীর্ঘতায় ছাড়া দুটোতে প্রভেদ কী!

●

পৃথিবীর প্রার্থনা

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

মেঘ নেই খরশূন্যে : আনন্দের অশ্রুবাষ্পে আকাশের
বুক ভরে দাও,
মায়াবী মেদুর ঐ কোমল-কাজল মেঘে ধরণীর নয়ন জুড়াও।

রঙ নেই এ শ্মশানে : অরণ্যের নীল হতে এক কণা রঙ
দাও ঢেলে,
একটি আনন্দ-লতা অঙ্কুরিত হোক এই বন্ধ্যা বালু ঠেলে।

রস নেই এ ভুবনে : লাবণ্যের শ্যামসুধা এক ফোঁটা
ছিটাও হরষে,
হৃদয় রঙীন হোক, জীবন শ্যামল হোক সবুজের সেই
সোমরসে।

রূপ নেই এ নিখিলে : অমৃতের পূর্ণ-ঘটে রঙ-করা
তুলিটি ডুবিয়ে
ছিটাও সৃষ্টির মুখে, করো তারে অপরূপ অনন্তের রঙেতে
ছুবিয়ে।

ফুল নেই এ দিগন্তে : নন্দনের স্বর্ণ-বৃন্ত পারিজাত
পুষ্পের কেশর
এখানে ছড়াও কিছু : অনঙ্গের অঙ্গরাগে হোক তারা
বসন্তের বর।

পাখি নেই এ আকাশে : অদৃশ্য দিগন্ত হতে সুন্দরের
ভুরুর নাচন
দেখাও একটুখানি : জাদু লেগে পাখি হোক, প্রজাপতি-
পাখা হোক মন।

মায়া নেই এ মানসে : মমতার মর্ম হতে তুলে আনো
একটি নিঃশ্বাস,
ঢালো এ শুষ্ক প্রাণে, বুক হোক বিগলিত বেদনার সুধার
নির্যাস।

প্রেম নেই এ পাষাণে : আনন্দের রাঙাঠোঁটে এ পাথর
একটু ছোঁয়াও :
অমৃতের সুধামৃতে শিলা হোক ফুল-তনু প্রাণভস্ম ফুলে
ভরে দাও।

●

সংশয়

সুনীলকুমার লাহিড়ী

ফিরে কেন বাঁধো আজ অবেলায় মায়ার জালে ?
আগমনী-সুর বাজাও কেন যে বিদায় কালে !
যা পেয়েছি মোর অক্ষম গানে গিয়েছি রাখি—
দৈন্য আমার, লজ্জা আমার রাখি নি ঢাকি—
অকপটে আমি প্রকাশ করেছি আপনারে পলে পলে ;
সে দীন-লজ্জা মহা-গৌরবে মণি হয়ে জ্বলে বক্ষতলে।

ছেঁড়া তারগুলো বেঁধে কি আবার সাধার পালা ?
কুসুম চয়নে ভরিব কি তবে পুরানো ডালা ?
আবার নয়নে লাগিবে কি সেই নেশার ঘোর ?
ফুল-উৎসবে বসন্ত-নিশি হবে কি ভোর ?
কি জানি আবার দ্বিধা-বিজড়িত শঙ্কিত ভীরু মনটি বাহি
শেষকথা মোর শেষবার শুধু যাবে কি গাহি ?

●

ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা বিচার

ইতিহাস বাস্তব ঘটনানির্ভর, আর উপন্যাস কল্পনাশ্রয়ী। সুতরাং 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' কথাটিকে শোনায় 'সোনার পাথরবাটি'র মত। কিন্তু পৃথিবীর ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেরা প্রমাণ করেছেন, ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে কথাশিল্পীর তন্নিষ্ট (objective) দৃষ্টি ও সহৃদয় অনুভূতি মিশ্রিত হয়ে রসোত্তীর্ণ উপন্যাস রচিত হওয়া সম্ভব।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা বিচারপ্রসঙ্গে প্রথমে 'ইতিহাস' ও ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাসের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন; না হলে এরূপ বিচারকার্যে পদে পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা।

এক সময়ে মনে করা হত ইতিহাস ও কাহিনীর মধ্যে কোন সূক্ষ্ম ভেদরেখা টানা যায় না। বস্তুতপক্ষে 'ইতিহাস' কথাটির গ্রীক-মূল—যার অর্থ হল অনুসন্ধানের সাহায্যে কোন খবর জানানো। Augustine Birrell তাই ইতিহাসের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এভাবে :

"The natural definition of history...is the story of man upon earth, and the historian is he who tells us any chapter or fragment of that story."

কিন্তু এই যে মানুষের কাহিনী সে কি সত্য-নিরপেক্ষ? আধুনিক সমালোচক মনে করেন, যে মুহূর্তে এ কাহিনী কোন যথাযথ বা লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনা থেকে চুলমাত্রও বিচ্যুত হয় তখন তা ইতিহাসধর্ম-বর্জিত হয়ে রূপান্তরিত হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে A. T. Sheppard বলেন :

"To my mind, the moment any chapter or fragment of that story wanders by a hair's breadth from exact and established fact, the historian ceases to be historian and becomes an historical novelist."*

কিন্তু ইতিহাসের ধর্ম সম্পর্কে এ ধারণা লোকের বরাবরই ছিল এমন কথা বলা চলে না। আমাদের দেশে তো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বাস্তব-নির্ভর ইতিহাস লেখবার রেওয়াজ খুব বেশী দিনের নয়; এমন কি পাশ্চাত্য দেশেও ইতিহাস লেখবার প্রথম যুগে Bede প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনাশ্রয়ী ঘটনার মিশ্রণ ঘটাতে কুণ্ঠিত হন নি। তাঁদের বিশ্বাস ছিল সত্য ঘটনার উপর কল্পনাসমৃদ্ধ মনোরঞ্জনী প্রলেপ ব্যবহার করতে না পারলে সে ইতিহাস ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাছে হৃদয়গ্রাহী হবে না। এ প্রসঙ্গে Dean Inge বলেন :

"The motives for falsifying history are in exact proportion to the interest of posterity in knowing the truth. Falsified history has perhaps had more influence than true history."

কিন্তু কল্পনারঞ্জিত ইতিহাস সাধারণ পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এ ধরনের ইতিবৃত্তকে কখনও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেন নি। Sir Robert Walpole এ ধরনের ইতিহাসের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে তাঁর ছেলেকে সোজাই বলেছিলেন : "Read anything but history, for history must be false." Lord Chesterfield-এর মতে "History is only a confused heap of facts." আর ইতিহাস সম্পর্কে Carlyle-এর বক্তব্য হল : "...it is the essence of innumerable Biographies;

* Sheppard. A. T.—The Art and Practice of Historical Fiction—p. 12.

a distillation of rumours, the letter of Instructions which the old generations write and posthumously transmit to the new."

তা হলে আদর্শ ইতিহাসের রূপ হবে কী—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। এ সম্পর্কে মেকলের ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। মেকলে বলেন :

"The perfect historian must possess an imagination sufficiently powerful to make his narrative affecting and picturesque; yet he must control it so absolutely as to content himself with the materials which he finds, and to refrain from supplying deficiencies by additions of his own. He must be a profound and ingenious reasoner; yet he must possess sufficient self-command to abstain from casting the facts in the mould of his hypothesis."

কিন্তু ইতিহাস রচনায় সত্য উপস্থাপনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে Cervantes এবং Gradgrind যে মন্তব্য করেছেন তাতে ইতিহাসের প্রকৃত ধর্ম পাঠকের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে :

"History is like sacred writing, because truth is essential to it..."—Cervantes.

"Now what I want is facts—stick to facts, sir!"—Gradgrind.

এবার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধর্ম কী তা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা যাক।

উপন্যাসের ধর্মবিশ্লেষণে মনস্বী রাসকিন একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন : উপন্যাস হল "A feigned, fictitious, artificial, supernatural, put-together-out-of-one's-head thing."

বর্তমান বাস্তবধর্মিতার যুগে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বিচারে রাসকিনের "feigned, fictitious, artificial, superficial" প্রভৃতি লক্ষণগুলি স্বীকৃত হবে না সত্য, কিন্তু উপন্যাস যে "put-together-out-of-one's-head thing" এতে সন্দেহ নেই।

ঐতিহাসিক উপন্যাস হল Mr. Gradgrind প্রোক্ত তথ্য (facts) ও রাসকিনের "put-together-out-of-one's-head thing"-এর অপূর্ব সংমিশ্রণ।

গত এক শতাব্দী ধরে বহু চিন্তাশীল লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। একটা বিষয়ে প্রায় সকল লেখকই একমত—ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের বিচরণভূমি হল অতীতে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সমালোচক A. T. Sheppard বলেন : "An historical novel must of necessity be a story of the past in which imagination coms to the aid of fact." John Buchan বলেন : "an historical novel is simply a novel which attempts to reconstruct the life and recapture the atmosphere, of an age other than that of the writer."

এখানে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞার আর একটু বিস্তারও লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস শুধু অতীত ঘটনানির্ভর নয়, এ ধরনের উপন্যাসে অতীত জীবন পুনর্গঠন ও অতীত পরিবেশের পুনস্থাপন-প্রয়াসও দেখা যায়। এই যে অতীত, সে কতকালের অতীত? John Buchan বলেন : "The age may be distant a couple of genrations or a thousand years." কিন্তু শুধুমাত্র নিরঙ্কুশ কল্পনার সহায়তায় অনির্দিষ্ট অচিহ্নিত অতীতকে নিয়ে উপন্যাসে ইতিহাস-সচেতন পাঠকের মনে আবেদন সৃষ্টি করতে না পারারই সম্ভাবনা। সেজন্যে Jonathan Neild ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা বিচারে আর একটু সতর্কভাবে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি বলেন : "A novel is rendered historical by the introduction of dates, personages, or events, to which identification can be readily given."

Arnold Bennett ভিন্নতর প্রেক্ষিত থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক তাঁর রচনায় এমন একটি যুগের পুনর্সৃষ্টি করেন যে যুগে তিনি বর্তমান ছিলেন না (the first thing about an historical novel is that the author re-creates in it an age in which he did not live.)।

বেনেটের উক্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞাকে মর্যাদা দিতে গেলে আলেকজাণ্ডার ডুমার 'The she-wolves of Machecoul' বা টলস্টয়ের "Sevastopol" উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকার করাই চলে না; কারণ দুজন ঔপন্যাসিকই উপন্যাস-বর্ণিত কালসীমার মধ্যে বা কাছাকাছি কোন সময়ে জীবিত ছিলেন।

'অতীত' কথাটি অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট বলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বর্ণিত কালকে একটি নির্দিষ্ট সীমায় চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন Leslie Stephen। তাঁর মতে অন্ততঃ ষাট বছরের অতীত জীবনকে নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হতে পারে (স্কটের মতে অবশ্য পঞ্চাশ বছরের অতীত; বস্তুতপক্ষে তাঁর 'Waverly' উপন্যাসের উপশীর্ষ-নাম তিনি দিয়েছিলেন—"'Tis fifty years since.")। চিন্তাশীল সমালোচক A. T. Sheppard-ও মনে করেন, পঞ্চাশ বছরের অতীতকে নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করা যেতে পারে; কারণ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যৌবন পরিণত হয় বার্ধক্যে, মধ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধরা সংসার থেকে বিদায় নেয়। শুধু তাই নয়, পঞ্চাশ বছর কালের ব্যবধানে আদব-কায়দা, পোশাক-আশাক, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সমস্তই বিবর্তিত বা পরিবর্তিত হয়; ধ্বংস ও অনিবার্য পরিবর্তন গত যুগের ঐশ্বর্যময় জীবনের উপর ম্লান ছায়া বিস্তার করে, এবং সে জীবনকে সমসাময়িক জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের বর্ণনীয় জীবনকে কোন নির্দিষ্ট কালসীমায় সীমাবদ্ধ করতে গেলে ঔপন্যাসিকের স্বাধীন কল্পনার ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়। সেজন্যে জার্মান ঔপন্যাসিক Freidrich Spielhagen তাঁর বিখ্যাত "Technik des Romans" নামক গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এভাবে: "The historical novel is one that portrays a time on which the light of the living generation's memory does not fall any longer in its full force."

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ণয়ে এই মধ্যপন্থা অবলম্বন করলে সমস্যার সমাধান বোধ হয় সহজতর হয়ে আসে। যে জগতে আমরা একদিন বাস করতাম সে জগৎ যখন কালের ব্যবধানে আমাদের চোখের সামনে রহস্যময় রূপ নিয়ে দেখা দেয়, এবং সে বিখ্যাত কুহেলিকাচ্ছন্ন জগতে প্রবেশ করে যখন আমরা সৌন্দর্যের মধু আহরণ করি তখনই হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম। শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রসঙ্গে তাই A. T. Sheppard তাঁর 'The Art and Practice of Historical Fiction' গ্রন্থে বলেছেন:

"The really great historical novelists, it seems to me, are those who invest and surround their characters—the men and women 'of lost years' with the haze of wistfulness and glamour which is comparable to that gloss or film on pre-historic implements and weapons; time's own work, not to be copied by any human tool or process."

শেপার্ডের উক্ত সংজ্ঞা মেনে নিলে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রশ্নাতীত কৃতিত্বের অধিকারী হলেন—Scott, Dumas, Ainsworth, Lytton, Hugo, Bernard Capes, Henry, Hewlet, Manzoni, Merezhkovsky, Jokai, Sabatini এবং Mary Johnston. স্কটের পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী রোমান্টিক লেখকদের মধ্যে Cervantes, Bunyan, Defoe, Lever, Smollet,

Fielding প্রভৃতি প্রথমোক্ত লেখকদের মত এত উচ্চশ্রেণীর শিল্পনৈপুণ্যের অধিকারী না হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসশিল্পী হিসেবে তাঁদের নামও অনুল্লেখ্য নয়।

॥ দুই ॥

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি

ঐতিহাসিক উপন্যাসের মুখ্য উপকরণ সংগৃহীত হয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে। সেজন্যে অনেকের ধারণা ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা বুঝি সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক উপন্যাসের চাইতে সহজতর। শেষোক্ত ধরনের রচনায় শিল্পীকে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বা সন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে উপন্যাসের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় লেখককে বিষয়বস্তু বা চরিত্র-পরিকল্পনার জন্যে তেমন হাতড়ে বেড়াতে হয় না। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা সম্পর্কে এ লোকপ্রচলিত ধারণা যে কতটা ভ্রমাত্মক তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় 'The Path of the King,' 'Mid winter' প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক John Buchan-এর মন্তব্য থেকে। Buchan বলেছেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস হল সকল শ্রেণীর উপন্যাসশিল্পের মধ্যে কঠিনতম সৃষ্টি। জনৈক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক অকুণ্ঠভাবে এমন স্বীকৃতিও জানিয়েছেন, প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে তাঁর যে সময় ব্যয় হয়েছে তার পঞ্চমাংশ সময়ে তিনি ইতিহাসাশ্রিত রোমাণ্টিক উপন্যাস লিখতে সক্ষম হয়েছেন। এই দু' ধরনের (ইতিহাস-কেন্দ্রিক) উপন্যাস রচনায় যিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তিনি প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার দুরূহতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।

সকল শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা দুরূহতম—এর অন্যতম প্রধান কারণ, এ ধরনের উপন্যাস রচনায় লেখককে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জগৎকে অতিক্রম করে প্রবেশ করতে হয় বিগত যুগের এমন একটি জগতে যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় শুধু পুঁথিগত। কিন্তু আধুনিক ঔপন্যাসিকের মত লোকচরিত্রজ্ঞান না থাকলে ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টিতে তাঁর ব্যর্থতার সম্ভাবনা পদে পদে। এ ছাড়া এমন অনেক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকা দরকার যা শুধু পুস্তকের সাহায্যেই লভ্য। যেমন, যে বিগত যুগের ঘটনা নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করবেন সে যুগের রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, আইন-কানুন, চিকিৎসাপদ্ধতি ধর্মশাস্ত্র, বংশানুক্রম, প্রাচীন ভৌগোলিক ও স্থানিক তথ্য, পোশাক-আশাক প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা যদি স্পষ্ট না হয় এবং অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রাচীন যুগের যথাযথ বর্ণনা যদি তিনি দিতে না পারেন, তা হলে কালানৌচিত্য-দোষে সে ঐতিহাসিক উপন্যাস ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অতীত জগৎ সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান, মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের আয়ত্তে থাকা চাই একটি সূক্ষ্ম শিল্পকৌশল—যে কৌশলের সহায়তায় তিনি সহজেই আবিষ্কার করতে পারেন বিপুল ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে প্রবল সংঘাতময় ঘটনা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র। এ ছাড়া স্ব-যুগের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতিও ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতার মূলে। কিন্তু এ স্বচ্ছন্দ জীবন-পরিচিতি শুধুমাত্র জনতার সঙ্গে অবাধ মেলামেশা বা কল্পনার জানলা দিয়ে জীবনকে দেখার মধ্য দিয়ে লাভ করা যায় না। তার জন্যে চাই সর্বযুগের জীবনের প্রতি স্রষ্টার অন্তহীন সহানুভূতি।

কালনিরপেক্ষ ও নির্বিশেষ মানব-জীবনের সঙ্গে একাত্মতার ফলেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বাস্তবিকপক্ষে শ্রেষ্ঠত্ব ও স্থায়ী মূল্য অর্জন করে। পৃথিবীর সমস্ত উৎকৃষ্ট উপন্যাসের সার্থকতার মূলেও রয়েছে একটা সহৃদয় মানবতার স্পর্শ—যে স্পর্শ স্রষ্টা, চরিত্র ও পাঠককে একই অদৃশ্য সূত্রে বিধৃত করে। ইতিহাস-বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক যখন পাঠক-মনের অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপন করতে পারেন তখনই হয় এই শ্রেণীর উপন্যাস সার্থক।

অতীত যুগের মর্মমূলে প্রবেশ করবার জন্যে অতীত যুগের ভাষা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের পক্ষে অপরিহার্য। অবশ্য লেখকের নিজের ভাষায় প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষকভাবে লেখবার ক্ষমতা থাকা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

পুরাতত্ত্বজ্ঞান তাঁর ভাষাকে যদি আর্য-ভাবাপন্ন করে তোলে তা হলে সে ঐতিহাসিক উপন্যাস মনোমুগ্ধকর কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টি সত্ত্বেও সাধারণ পাঠকের কাছে আবেদনহীন হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি বিচারে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় বোধ হয় লেখকের কল্পনাসমৃদ্ধি ও সৃষ্টিপ্রতিভা। ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনাকে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক একান্ত সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত করতে বাধ্য এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চাইতেও উল্লেখযোগ্য বিগত যুগের রীতিনীতি, সুর ও মেজাজকে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক জীবন্ত করে তুলবেন তাঁর সৃষ্টি-কর্মে। ইতিহাসের জড় কঙ্কালকে সজীব ও সরস সৃষ্টিকর্মে রূপান্বিত করবার জন্যে যে ক্ষমতার প্রয়োজন সে শক্তিকে হাডসন অভিহিত করেছেন—"Creative imagination" ও শেপার্ড চিহ্নিত করেছেন—"Realistic imagination" বলে। এই creative বা realistic imagination যে কত দুর্লভ শক্তি তা ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকমাত্রই উপলব্ধি করেন। অতীত ঘটনাকে অবলম্বন করে কল্পনা-সমৃদ্ধির সাহায্যে বর্ণাঢ্য রূপ ও রসজগৎ সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজ; বস্তুতপক্ষে ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের ঔপন্যাসিকমাত্রই এ ধরনের শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু শুধুমাত্র রসকল্পনার উপর আত্যন্তিক নির্ভরতার ফলে বহু লেখকের ঐতিহাসিক উপন্যাসও যে নিছক রোমান্সে পর্যবসিত হয়েছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আলেকজাণ্ডার ডুমার উপন্যাস। এমন কি স্কটের সমালোচকেরাও এ বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের রচনাকে কালানৌচিত্যদোষে (anachronism) দোষী করতে ছাড়েন নি। যতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা শুরু হয় নি, ততদিন পর্যন্ত না হয় ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে সত্যভ্রষ্টতার জন্যে ক্ষমা করা যেত। কিন্তু বর্তমান ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠার যুগে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের পক্ষে ইতিবৃত্তকারের দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ যুগের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে একদিকে যেমন একনিষ্ঠভাবে ইতিহাসের দাবি মানতে হয়, আর একদিকে তেমনি শিল্পের দাবিও মানতে হয়। ইংরেজী সাহিত্যে স্কটের পূর্বে বহু উপন্যাসশিল্পী ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন সত্য, কিন্তু ইতিহাসের আনুগত্য-হীনতার জন্যে Walter Raleigh সে সমস্ত লেখককে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার অধিকারী বলেই মনে করেন নি। Sir Walter Raleigh ("Secundus") তাঁর বিখ্যাত 'The English Novel' নামক গ্রন্থে বলেছেন: "The historical novelist who preceded Scott chose a century as they might have chosen a partner for a dance, gaily and confidently, without qualification or equipment beyond a few outworn verbal archaisms." ঐতিহাসিক সত্য উপস্থাপনে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতির পরিচয় দিলেও অধ্যাপক Saintsbury তাই Scott-এর উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন: "Scott created historical novel after some thousand years of unsuccessful attempt."

ঐতিহাসিক উপন্যাসের টেকনিক কত দুরূহ, স্কটের উপন্যাসের সমালোচনা থেকে তা কতকটা অনুমান করা যায়। ভিক্টোরীয় যুগের কোন কোন সমালোচক স্কটের উপন্যাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও অনেক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও সমালোচক স্কটের উপন্যাসকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন, কিংবা এত ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশংসা করেছেন যে তাকে অপ্রশংসার সামিলই বলা চলে। যেমন, কারলাইলের মতে 'ওয়েভারলি' উপন্যাসে স্কটের বড় কৃতিত্ব হল, সেগুলো খুব দ্রুত লিখিত এবং পৃথিবীর সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে সবচাইতে বেশী অর্থকরী হয়েছিল। টেইনও স্কটের উপন্যাসের শিল্পমূল্য বিচার অপেক্ষা জনপ্রিয়তার কথাটাই সগর্বে উল্লেখ করেছেন। Leslie Stephen স্কটের বিখ্যাত 'Ivanhoe', 'Kelinworth', 'Quentin Durward' প্রভৃতি উপন্যাসকে ঐতিহাসিকতা বিচারে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। Miss Marjorie

Bowen স্কটের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও পরবর্তী লেখকদের উপর তাঁর প্রভাব স্বীকারে দ্বিধান্বিত। আর্নল্ড বেনেটের মতে স্কটের উপন্যাস যে শুধু মৌলিকতাহীন তা নয়, বিগত যুগের চিত্রাঙ্কনেও স্কট সব সময় সত্যের অনুসরণ করেন নি। স্কটের কোন কোন ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষ প্রশ্নাধীন হলেও এ শ্রেণীর পরবর্তী রচনার উপর তাঁর প্রভাব সমালোচক-মহলে স্বীকৃত। তথাপি স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে এত বিরূপ সমালোচনা দেখে আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা যে কত কঠিন শিল্প-প্রয়াস সে সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়।

॥ তিন ॥

ঐতিহাসিক উপন্যাসের গঠন-প্রকরণ

উক্ত আলোচনার পর ঐতিহাসিক উপন্যাসের আঙ্গিকশৈলী কি রকম হওয়া উচিত সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি নিয়ে য়ুরোপে বহুকালব্যাপী অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র মত আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাসও রচিত হয়েছে। এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ করবার ফলে জনৈক সমালোচক ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধারণায় উপনীত হয়েছেন :

"It must preserve dignity and avoid grandiloquence, preserve atmosphere and avoid the archaic carried to extremes, preserve accuracy of background and avoid the crowding out of the human interest, preserve strength and avoid the needlessly coarse and ruthless and morbid, preserve the dramatic without being melodramatic, preserve proportion without sacrificing detail."*

ইতিহাসের গাম্ভীর্য থাকবে অথচ ভাবোচ্ছ্বাস থাকবে না, পরিবেশসৃষ্টি অকৃত্রিম হলেও চরম আর্যভাবাপন্ন হবে না, পটভূমিকাসৃষ্টি যথাযথ হবে অথচ মানবীয় আবেদনের ভিড় থাকবে না, বলিষ্ঠতা (প্রাচীন যুগের) সংরক্ষিত হলেও অনাবশ্যক কর্কশতা, নিষ্ঠুরতা বা অসুস্থ মনোভাববর্জিত হবে, নাটকীয় উপাদান থাকলেও অতি-নাটকীয় হবে না, এবং বর্ণনার খুঁটিনাটি অক্ষুণ্ণ রাখলেও পরিমিতিবোধের পরিচয় থাকবে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণে এর থেকে সুচিন্তিত মতামত আর বোধ হয় হতে পারে না।

কিন্তু আদর্শকে বাস্তবে রূপ দান করা চিরকালই শিল্পীর পক্ষে দুরূহ কর্ম। উপরে আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাসের আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছে তা আদৌ কার্যে পরিণত হবে কি না তা সন্দেহজনক। এ পর্যন্ত যত শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছে সেগুলিও সর্বপ্রকারের দোষমুক্ত নয়। এ ধরনের উপন্যাসশিল্পীর শিল্পরচনা নেহাত দৈবপ্রভাবে না হলে প্রায়ই আদর্শে পৌঁছতে সক্ষম হয় না। তবুও আদর্শকে সামনে রেখে প্রত্যেক শিল্পীরই শিল্পরচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি কি হবে এখন তাই আমাদের বিবেচ্য। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লর্ড লিটন বলেন, ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের প্রথম প্রয়াস হবে মননগ্রাহ্য একটা মহৎ ও অখণ্ড বিষয়ের পরিকল্পনা। চিত্রশিল্পী যে ভাবে ভাবদৃষ্টি দিয়ে তাঁর শিল্পরচনার একটা কাঠামো প্রথমে মনে মনে তৈরি করে নেন, উপন্যাস-শিল্পীকেও ঠিক সে ভাবেই অগ্রসর হতে হবে।*

তারপর প্রশ্ন ওঠে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন। মানুষের জীবন-কাহিনীর মত ইতিহাসের কাহিনীও বহুবিস্তৃত। এই সুবিপুল ঘটনাপুঞ্জ থেকে কোন ঘটনা উপন্যাসের উপযোগী হবে ঐতিহাসিক উপন্যাস

* Sheppard, A. T.—The Art & Practice of Historical Fiction. p. 82.

* "To my mind a writer should sit down to compose a fiction as a painter prepares to compose a picture. His first care should be the conception of a whole as lofty as intellect can grasp."—Lytton.

লিখতে গেলে লেখক প্রথমেই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান ছড়িয়ে আছে উপন্যাসের যে কোন যুগে। যে কোন কাহিনী, নিঃসঙ্গ শ্মশান, ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা, ধ্বংসোন্মুখ নগরী, কিংবা ছোট একটি কবিতাংশের ভেতরও এ ধরনের উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করতে লেখককে বেগ পেতে হয় না।

কিন্তু কোন্ বিষয়টি গ্রহণ করলে তা রসগ্রাহ্য শিল্পসৃষ্টিতে পরিণত হবে তা ভেবে লেখক প্রথমে বিভ্রান্ত হন। তাঁর সামনে দ্বিতীয় বিভ্রান্তি আসে উপন্যাসের নাম নির্বাচনে। দু' যুগের কাহিনী নিয়ে রচিত ডিকেন্সের বিখ্যাত উপন্যাসখানির 'A Tale of two Cities' নামকরণের পূর্বে ডিকেন্স উপন্যাসখানির নিম্নলিখিত নামগুলি পরিকল্পনা করেছিলেন :

"Time! The Leaves of the Forest. Scattered Leaves. The Great Wheel. Round and Round. Old Leaves. So Long Ago. Far Apart. Fallen Leaves. Five and Twenty Years. Day after Day. Felled Trees. Memory Carton. Rolling Stones. Two Generations."

অতএব উপন্যাসের নাম যাতে ভাবানুযায়ী ব্যঞ্জনাধর্মী হয় সেদিকে লেখকের দৃষ্টি রাখা প্রথমেই কর্তব্য।

তারপর ইতিহাসের এত চরিত্র ও ঘটনার ভিড়ের মধ্যে উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা নির্বাচনেও লেখককে কম বেগ পেতে হয় না।

অতএব ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের সর্বপ্রথম বিচার্য হল সার্থক উপন্যাস সৃষ্টির জন্য কি কি উপাদান গ্রহণ এবং কি কি উপাদান বর্জন করতে হবে। এ গ্রহণ-বর্জনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর না হলে লেখকের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সার্থকতা লাভ করবার স্বপ্ন সুদূরপরাহত।

এ হল ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সুনির্দিষ্ট কৌশলের কথা। কিন্তু উপন্যাস রচনা একটা যান্ত্রিক কাজ নয়, এবং উপন্যাসশিল্পীও যন্ত্রশিল্পী নন। অতীত ঘটনা বা চরিত্র উপস্থাপনে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক সুপরিকল্পিত চিন্তা নিয়ে অগ্রসর হন সত্য, কিন্তু ঘটনা যখন বিস্তারলাভ করে তখন লেখকের মৌলিক পরিকল্পনার উপর শিল্পীর অনুভূতিনির্ভর কল্পনা যে কখন প্রধান হয়ে ওঠে তা হয়তো শিল্পী নিজেই টের পান না। প্রকৃতপক্ষে এ বন্ধনহীন কল্পনাই তো অতীতের অমসৃণ জড় ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে মুক্ত হাওয়া প্রবাহিত করে দিয়ে ইতিহাসকে রূপান্তরিত করে হৃদয়গ্রাহী শিল্পকর্মে। প্রখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক স্কট নিজেই এ কথা স্বীকার করেছেন, যে পরিকল্পনা নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা শুরু করতেন, পরিসমাপ্তিতে তা ভিন্ন রূপ ধারণ করত। লিখতে লিখতে নিত্যনতুন কল্পনা এসে তাঁর পূর্বনির্দিষ্ট ছকবাঁধা উপন্যাসের কাঠামোকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত। শুধু স্কটের বেলায় নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস-শিল্পীর শিল্পরচনাপ্রয়াসেও অনুরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। (বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও এরূপ অকল্পিত কল্পনা বিস্তার সমভাবে লক্ষণীয়)। স্কট নিজে তাঁর উপন্যাসে এরূপ অচিন্ত্যপূর্ব কল্পনার আনুগত্য স্বীকার করলেও, এরূপ পন্থা অবলম্বনের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে নতুন লেখকদের সতর্ক করে দিয়েছেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে নিজের জার্নালে তিনি লিখছেন : "A perilous style, but I cannot help it. I would not have young writers imitate my carelessness, however."

উক্ত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল, ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রারম্ভে কাহিনীর যে বীজ বপন করা হয় তা ক্রমশঃ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে এমন পরিণতি লাভ করে যে পরিণতির সঙ্গে উৎসের সাদৃশ্য খুব ঘনিষ্ঠ হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। কাহিনী শুরু করেন লেখক সাধারণতঃ স্বল্প কয়েকটি কথার রেখায়, আবার অনেক সময় দেখা যায় কথারম্ভে কাহিনী কোন সুস্পষ্ট রূপই লাভ করে নি। ষ্টিভেনসনের উপন্যাসের প্রারম্ভে এরূপ ছায়াময় কল্পনার আভাস পাওয়া যায়। বঙ্কিমের

'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রারম্ভ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আবার Nathaniel Hawthorne-এর উপন্যাসে দেখা যায় উপন্যাস রচনায় তন্মাতভাবে আত্মনিয়োগ করবার আগে তিনি পরিকল্পিত উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্তসার পূর্বেই তৈরি করে নিচ্ছেন। শুধু হথর্ন নয়, স্কট, ডুমা, ষ্টিভেনসন, হার্ডি প্রভৃতি প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকই হাতের কাছে একটা নোটবুক রাখতেন যার মধ্যে থাকত তাঁদের ভবিষ্যতে লিখিতব্য উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা। রীড তো দিনের অনেকটা সময় ব্যয় করতেন এ সমস্ত নোট এবং সংগৃহীত অংশ পাঠ করতে। উপন্যাসের বিষয়বস্তু বা মোটামুটি কাঠামো যে কোন সময় যে কোন জায়গায় পাওয়া যায়, এমন কি স্বপ্নের মধ্যেও অনেক সময় উপন্যাসের কাহিনী এসে ধরা দেয়। কিন্তু স্বপ্নে যে কাহিনীকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয় দিনের আলোকে তাকে মনে হয় অর্থহীন। স্বপ্নলব্ধ কাহিনীর মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে 'ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড।' কিন্তু জনপ্রিয় হলেও কাহিনীটির উৎসমূলে একটু দুর্বলতা আছে।

লেখকের প্রিয় কোন বিশেষ স্থানের প্রতি অনুরাগ বহু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার অন্তপ্রেরণা জুগিয়েছে। জর্জ ইলিয়টের 'রমলা' এ ধরনের একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। পুষ্পসজ্জাবিভূষিতা ফ্লোরেন্সকে তাঁর কাছে বেশী আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল রোম থেকে। ফ্লোরেন্সের সে ঐশ্বর্যই তাঁর মনকে উদ্দীপ্ত করেছিল এই রোমান্সধর্মী চিত্তাকর্ষক উপন্যাস রচনায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় এরূপ অভিজ্ঞতা বহু লেখকের বেলায় ঘটেছে। বঙ্কিমের বহু ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসও এরূপ অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফল ('দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের পটভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য)। কিন্তু কোন বিশেষ যুগের পটভূমিকায় কোন স্থানের প্রাণধর্মের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে সে স্থানে শুধুমাত্র কয়েকদিন ঘুরে আসাই যথেষ্ট নয়। এরূপ ক্ষণিক অভিজ্ঞতা লেখকের সৌন্দর্যচেতনা বা ভাবোচ্ছ্বাসকে হয়তো জাগ্রত করতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের মর্মমূলে প্রবেশ করতে সাহায্য করে না। কোন কালের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানবিশেষের ইতিহাসের প্রাণমূলে প্রবেশ করতে হলে চাই সেই স্থান সম্পর্কে শিল্পীর বিস্তৃত তথ্যাভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় সে যুগের এবং স্থানের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির ফলে। এ পরিচয় সম্ভব হয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সে যুগের ইতিহাস পাঠে। জগতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকমাত্রই যে স্থান ও কালকে কেন্দ্র করে আখ্যান রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন সে স্থান ও কাল সম্পর্কে তাঁরা গভীর ইতিহাস-জ্ঞানেরও পরিচয় দিয়েছেন।

কি ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিতে পরিণত হবে এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। সাধারণতঃ পাঠকের ধারণা এই যে, ইতিহাসের প্রবল সংঘাতময় অধ্যায় বা যুগান্তরকারী ঘটনাকে আশ্রয় করেই এ ধরনের উপন্যাস সার্থকতা লাভ করে বেশী। চিন্তাশীল সমালোচক জর্জ সেইন্টস্‌বারি কিন্তু মনে করেন ইতিহাসের বড় বড় ঘটনাশ্রয় এই শ্রেণীর উপন্যাসে সার্থকতা লাভের পরিপন্থী। অবশ্য সার্ ওয়াল্‌টার স্কটের মত শক্তিমান শিল্পী উক্ত ধারণার ব্যতিক্রম। এ ছাড়া সেইন্টস্‌বারির মতে লেখকের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত এমন একটি চরিত্রসৃষ্টিতে যে চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কিংবা যে চরিত্র সম্পর্কে ইতিহাসে বিশেষ কোন বর্ণনা নেই। তা হলে উপন্যাসকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে লেখক কল্পনা-বিস্তারের অফুরন্ত অবকাশ পাবেন। ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা বা পরিবেশকে লেখক ব্যবহার করবেন কাহিনী-বিকাশের পরিপূরক হিসাবে বা চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে। এ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন ইংরাজ কথাশিল্পী ডুমা তাঁর সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে। একই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন স্কট তাঁর কোন কোন বিখ্যাত উপন্যাসে। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসেও ঔরঙ্গজীব-রাজসিংহের প্রচণ্ড সংঘাতময় ঐতিহাসিক কাহিনীকে অতিক্রম করেছে মোবারক-জেবউন্নিসার ট্রাজিক বেদনাসুন্দর কাল্পনিক কাহিনী। সাম্প্রতিক-

কালে 'কেরী সাহেবের মুন্সী'তে লেখকের বিস্তৃত ইতিহাসচেতনার উপরে কল্পলোকের মহিমা বিস্তৃত হয়েছে রেশমীর কাল্পনিক চরিত্র অবতারণায়। কিন্তু এ কথাটা এখানে স্মরণযোগ্য, কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা ঐতিহাসিক উপন্যাসকে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারে যদি সে চরিত্রের বিকাশ দেখানো হয় ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। যে মোবারক-জেবউন্নিসার কল্পিত প্রণয়-কাহিনী রাজসিংহ উপন্যাসকে লোকপ্রিয় করে তুলেছে তার পটভূমিকায় স্থাপন করা হয়েছে মোগলযুগের পরিবর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ঐতিহাসিক পরিবেশ। 'কেরী সাহেবের মুন্সীতে'ও কাল্পনিক রেশমী-চরিত্রের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশ একটি সম্পূর্ণ আজগুবী কাহিনীতে পরিণত হত যদি না সেই অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রটিকে সে-যুগের পরিবর্তমান ইতিহাসের পটভূমিকায় স্থাপন করা হত। বহু অসম্ভাব্য ঘটনার চকিত-চমক সত্ত্বেও রেশমী-কাহিনী যে উপকথায় পর্যবসিত হয় নি তার কারণ সমকালীন যুগের চিত্রাঙ্কনে লেখকের ইতিহাসনিষ্ঠা।

কাল্পনিক চরিত্রের নিপুণ অবতারণায় ঐতিহাসিক উপন্যাস জমে ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রের আশ্রয়ে যে উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করা যায় না, এ কথাও বলা চলে না। আসলে ঐতিহাসিক হোক, বা অনৈতিহাসিক হোক, জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টি নির্ভর করে লেখকের ক্ষমতার ওপর। একজন সত্যিকারের ক্ষমতাবান শিল্পী কাল্পনিক চরিত্রকে যেমন চিত্তাকর্ষক রূপ দিতে পারেন, ঐতিহাসিক চরিত্রকেও তেমনি সজীব করে তুলতে পারেন উপন্যাসে। কিন্তু স্বল্প ক্ষমতাশালী লেখকের পক্ষে ইতিহাসের বাস্তব-চরিত্রকে উপন্যাসে চিত্তাকর্ষক রূপ দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে; এই শ্রেণীর লেখকদের উচিত ইতিহাসের অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত চরিত্রকে উপন্যাসে রূপ দেওয়া। লেস্লি ষ্টিফেন একবার টমাস হার্ডির কাছে লিখেছিলেন: উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্রের অবতারণা প্রায় সব সময়ই বোকামির পরিচায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু পটভূমিকা হিসাবে ইতিহাসের আশ্রয় নেওয়া আমি খুবই পছন্দ করি। তৃতীয় জর্জের সময়ের কোন ঘটনা নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে গেলে তৃতীয় জর্জের জীবনচিত্র সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত না করে তাঁকে রাখতে হবে কাহিনীর এক প্রান্তে।

উক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বঙ্কিমের ইতিহাসাশ্রিত সামাজিক উপন্যাসগুলিও ঐতিহাসিক উপন্যাসের কোঠায় পড়ে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখক যদি বৃহৎ ঘটনার পটভূমিকায় শুধু বড় বড় চরিত্রগুলিকে উপস্থিত করেন, তা হলে সমকালীন সাধারণ লোকের জীবনচিত্র সেই উপন্যাসে উপেক্ষিত হয়, অথচ যে উপন্যাসে সমকালীন সর্বস্তরের জীবনের একটি পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় না, তাকে ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে না।

ঘটনা নির্বাচনের মত উপযুক্ত কালনির্বাচনও ঐতিহাসিক উপন্যাসের গঠনের পক্ষে অপরিহার্য। ঘটনার কাল যত দূরবর্তী যুগের হয় লেখকের পক্ষে ততই তা সুবিধাজনক; কারণ সে কাল সম্পর্কে পাঠকের ধারণা অসম্পূর্ণ এবং অস্বচ্ছ বলে লেখক সে কালকে অবলম্বন করে কল্পনাবিস্তারের সুযোগ পান বেশী। কিন্তু অস্পষ্ট অতীতের কাহিনা ভবিষ্যৎ পাঠকের কাছে বৈচিত্র্যহীন মনে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গবেষণার ফলে অতীত সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যখন বৃদ্ধি পাবে তখন সে-সমস্ত কাহিনীকে অলীক বলে মনে হতে পারে।

কালনির্বাচন শেষ হলে অতীত যুগের জীবনধারা এবং ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করার প্রশ্ন ওঠে। পুরনো যুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা বা ভাবসংঘাতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করে সে সমস্ত ভাব বা ঘটনাকে উপন্যাসের কাহিনীতে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া যে কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার, এ ধরনের কাহিনী যাঁরা রচনা করেন তা তাঁদের অজ্ঞাত নয়। যে নির্দিষ্ট কালের ঘটনা নিয়ে লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন, সেই যুগের সম্ভাব্য সকল প্রকার ইতিহাসের উপকরণের সঙ্গে তিনি

পরিচিত হবেন। তারপর এই সংগৃহীত তথ্যপুঞ্জের ভিতর থেকে উপন্যাসের জন্য কোন্ ঘটনা গ্রহণীয় বা বর্জনীয় সে সম্পর্কে স্থির করবেন। সর্বশেষে ঐতিহাসিক ঘটনাপারম্পর্যের মধ্যে যেখানে তিনি কোন ফাঁক দেখতে পাবেন তাকে নিজ কল্পনা দিয়ে ভরাট করে তুলে লিখিত ইতিহাসকে সম্পূর্ণতা দান করবেন।

এ ছাড়া যে যুগের কাহিনীকে ভিত্তি করে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়, লেখককে পরিচিত হতে হবে সে যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ, মুদ্রা, অপর রাজ্যের সমসাময়িক ইতিহাস, সমসাময়িক চিঠিপত্র, দৈনন্দিন লিপি, রাজকীয় পত্র, দলিলদস্তাবেজ, এমন কি চিকিৎসা সম্পর্কীয় বইয়ের সঙ্গে। সেই যুগের উদ্ভিদ ও কৃষি-বিজ্ঞানের সঙ্গেও তাঁর পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া ওই যুগের চিত্রশালা কিংবা প্রাচীন কীর্তির সংগ্রহশালা, কিংবা সেই যুগের মঠ মন্দির দুর্গ প্রভৃতি সব কিছুর সঙ্গে লেখক যত ঘনিষ্ঠ পরিচিতি লাভ করবেন ততই ঐতিহাসিক উপন্যাস বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে। এক কথায় যে যুগকে কেন্দ্র করে তিনি উপন্যাস লিখছেন, সেই যুগের সব কিছুর সঙ্গে যেন তাঁর মোটামুটি অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকে।

সুদূর অতীতের যে স্থানিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিত হয় তার সঙ্গে লেখকের পরিচয় না থাকলেও সে অপরিচয় খুব বড় বাধারূপে দেখা দেয় না। কারণ, আমাদের সমকালেই এমন অনেক ধ্বংসপ্রায় প্রাচীন স্থান দেখা যায় যা আমাদের প্রাচীন স্থানগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু উপন্যাসে প্রাচীন ব্যক্তিজীবনের সজীব রূপদান এত সহজসাধ্য কাজ নয়। কারণ, সে যুগের নরনারী আমাদের যুগের নরনারীর মত শরীরী জীব হলেও তাদের জীবনের গতি-প্রকৃতি ছিল আমাদের চাইতে আলাদা। সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখক হলেন তিনি যিনি বিগত যুগের নরনারীর চরিত্রের সঙ্গে নিজে একাত্ম অনুভব করেন। কিন্তু অনুভূতির প্রসারের সাহায্যে প্রাচীন যুগের মানুষের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করলেও অতীত যুগের মৃত নরনারীকে উপন্যাসে সজীব করে তোলা এত সহজ কাজ নয়। কারণ, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অদ্ভুত এবং এ যুগের চাইতে আলাদা। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল এ যুগ থেকে পৃথক, পরিবেশ ছিল ভিন্নতর। তারা যে ভাষায় কথা বলত তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। যে আইনকানুনের দ্বারা তারা পরিচালিত হত তা এ-যুগের আইন-কানুন থেকে আলাদা। পৃথিবী এবং স্বর্গলোক সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল এ-যুগের চাইতে পৃথক। যে ধরনের লোকের সঙ্গে আমরা নিত্যনিয়ত কথাবার্তা বলছি বা মিশছি তাদের সম্পর্কে লেখার চাইতে এই ধরণের অজ্ঞাত জীবন সম্বন্ধে লেখা কত কষ্টসাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। তবে বিভিন্ন যুগের মানুষের জীবনে শত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সর্বযুগের মানবমনের একত্ব উপলব্ধিই ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে অনুপ্রাণিত করে বিস্মৃত অতীত জীবনের সজীব রূপদানে।

॥ চার ॥

ইতিহাসের ভুল ও ঐতিহাসিক উপন্যাস

ঐতিহাসিক উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে থাকবে ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা। কল্পনাশ্রিত ঘটনাকে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হলে সে উপন্যাস রূপকথার পর্যায়ে পর্যবসিত হবে—এ মন্তব্য পূর্বেই করা হয়েছে। কিন্তু যে ইতিহাসকে আশ্রয় করে লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হন সে ইতিহাসই যদি ভুল তথ্যে পূর্ণ হয় তা হলে ঔপন্যাসিকের অবস্থা কি দাঁড়ায় এখন তাই হবে আমাদের বিবেচ্য। উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে—কি পাশ্চাত্ত্য দেশে কি আমাদের দেশে যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছিল সেগুলিকে কল্পনামিশ্রিত রোমান্স বলে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিচার করে দেখা দরকার, যে যুগে ওই সমস্ত ঔপন্যাসিক ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাস লিখে এই বিভাগের সাহিত্যকে

জনপ্রিয় করে তোলেন তখন ইতিহাসের প্রকৃত রূপ ছিল কী?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ইতিহাস লেখবার পদ্ধতি তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। সেজন্য সে-যুগের ঔপন্যাসিককে আশ্রয় করতে হত সমকালীন ঐতিহাসিকদের ব্যক্তিগত ধারণানির্ভর ইতিহাসের কাহিনী। যে নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে সমস্ত পৃথিবীতে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে বিবেচনা করা হয়, তাঁর সম্পর্কেও বিভিন্ন ইতিহাসে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ তাঁকে বলেছেন একজন প্রচণ্ড প্রতিভাবান ব্যক্তি, কেউ বলেছেন তিনি ছিলেন একজন মাঝামাঝি ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, আবার কেউ বলেছেন তাঁকে ভীরু। আমাদের দেশেরও ঐতিহাসিক মহলে প্রতাপ, রাজসিংহ, শিবাজী, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি চরিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা আছে দেখা যায়। মুসলমান ও ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা অনেক সময় স্বজাতিপ্রীতি ও স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে মধ্যযুগের ইতিহাসের রূপ দিয়েছিলেন। ঔপন্যাসিকেরাও তাঁদের প্রয়োজনমত সেই বিকৃত ইতিহাসের আশ্রয়ে উপন্যাস রচনা করেছিলেন। ফলে তাঁদের উপন্যাসে ইতিহাসের বহু প্রমাদপূর্ণ ঘটনা যে আত্মপ্রকাশ করবে তাতে আর বিচিত্র কী?

বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগে স্যর্ ওয়াল্টার স্কটের প্রতিভামুগ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের বরাবরই ইচ্ছা ছিল ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করে খ্যাতিমান হবেন। তাঁর কয়েকখানি সামাজিক ও গার্হস্থ্য উপন্যাস বাদ দিলে দেখা যায়, তিনি তাঁর সমস্ত উপন্যাস ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে রচনা করেছিলেন। কিন্তু 'রাজসিংহ' ছাড়া আর কোন উপন্যাসকে তিনি নিজেও ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি। তার প্রধান কারণ নিশ্চয়ই এই যে সেই সমস্ত উপন্যাসের ঘটনা তাঁর নিকট কল্পনারঞ্জিত মনে হয়েছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনাকে তিনি নির্ভরযোগ্য মনে করেন নি। তাঁর মতে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা একদেশদর্শী এবং হিন্দুদের প্রতি বিদ্বিষ্ট। সেজন্য 'রাজসিংহ' রচনায় বঙ্কিম মুখ্যতঃ গ্রহণ করেছিলেন বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের ইতিবৃত্ত। কিন্তু সে ইতিবৃত্ত যে প্রমাদশূন্য ছিল তার সাক্ষ্য দেবে কে? বস্তুতঃপক্ষে বঙ্কিমের এত সতর্কতা সত্ত্বেও 'রাজসিংহ' উপন্যাসে যে অনেক অনৈতিহাসিক ঘটনা আত্মপ্রকাশ করেছে তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন আচার্য যদুনাথ সরকার এবং ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। এ-ছাড়া হিন্দুর বাহুবল প্রতিপন্ন করার যে সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্কিম 'রাজসিংহ' কাহিনী রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন সে উদ্দেশ্য তাঁর নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে করেছিল খণ্ডিত।

এ অবস্থায় আধুনিক সমালোচক 'রাজসিংহ' উপন্যাসকে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দিতে না পারলে তাতে ক্ষুণ্ণ হবার কারণ নেই। বঙ্কিমযুগে রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিংবা রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক দৃষ্টি একনিষ্ঠ হলেও যে ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে তাঁদের উপন্যাস রচিত হয়েছিল সে সমস্ত ঘটনার অভ্রান্ততার প্রমাণ কি? বরং পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসানুগত্যের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। তার কারণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বাংলাদেশের ইতিহাস পুনর্গঠনের কাজে তিনি যেমন অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন, উপন্যাসে ইতিহাসের ঘটনাবিন্যাসে সে একই নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, বিমল মিত্র প্রভৃতি খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক এবং রমাপদ চৌধুরী, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেক উদীয়মান কথাসাহিত্যিক চমকপ্রদ ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে উপন্যাস রচনা করে তরল প্রেমনির্ভর বাংলা উপন্যাস-জগতে বৈচিত্র্য আনয়ন করেছেন। কিন্তু তাঁদের উপন্যাসের বর্ণিত ঘটনা ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে কতটা নির্ভরযোগ্য তা পরীক্ষাসাপেক্ষ।

আসলে ঐতিহাসিক উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে বাস্তব পরিস্থিতি হল এই যে,

যদি চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে উপস্থিত করা হয়, তা হলে বিচারহীন পাঠক লেখক-বর্ণিত যে কোন ঘটনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। উপন্যাসের যে কাহিনী পাঠকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, মনে নেশা ধরিয়ে দেয়, সে কাহিনী সত্য কি মিথ্যা তা সতর্কভাবে পরীক্ষা করবার অবকাশ পাঠক পায় না। অপরপক্ষে এ প্রশ্নও ওঠে, প্রাচীন ঐতিহাসিকেরা যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন সে কি সত্যিকারের ইতিহাস? যে ইতিহাসে সাধারণ মানুষের জীবন উপেক্ষিত, শুধুমাত্র রাজরাজড়াদের জীবনের উত্থান-পতনের কাহিনী যে ইতিহাসকে ভারাক্রান্ত করে সে ইতিহাস আংশিক ইতিহাস, পূর্ণ ইতিহাস নয়। ভিক্টর হুগো সেজন্য রোমান্সকে ইতিহাসের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কারণ ইতিহাসে যে সত্যের প্রকাশ তা খণ্ডিত, আর রোমান্সে যে সত্যের ব্যঞ্জনা ঘটে তা হল নৈতিক সত্য। আনাতোল ফ্রাঁসও বলেছেন, ইতিহাস রচনা হল একটা আর্ট, এবং যে ইতিহাসে কল্পনাবিস্তার আছে সে ইতিহাসের উৎকর্ষ অবশ্যস্বীকার্য। 'ওয়েভারলি' নভেলের অসম্ভাবিত সার্থকতা দেখে মেকলেও বলেছিলেন, ইতিহাসের কাজ হল প্রাচীন যুগের ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশকে জীবন্তভাবে বর্তমান যুগের পাঠকের সামনে উপস্থিত করা, এবং ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকই ইতিহাসের সে দাবি পূর্ণ করেছেন। স্বীয় যুগের ইতিহাসের উৎকর্ষ বিচার-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, যাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে ইতিহাস বলা চলে তা আমাদের দেশে বর্তমানে নেই। ইতিহাসের নামে যা আমাদের দেশে প্রচলিত তাকে বলা চলে ঐতিহাসিক রোমান্স। অবশ্য মেকলের এই মন্তব্য বর্তমান ইতিহাস সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। কারণ বর্তমান যুগে অনেক ভাল ইতিহাস লিখিত হয়েছে। এ যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক-উপন্যাসের সমালোচক এ. টি. শেপার্ড অবশ্য মনে করেন, ইতিহাস যত নির্ভুল হবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষও তত বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছেন, নিরামিষাশী ব্যক্তি মাংসবর্জিত নির্দোষ নিরামিষ আহারের সময় নিজের অজ্ঞাতে যেমন অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা খেয়ে ফেলেন, তেমনি ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি গভীর অনুরাগসত্ত্বেও ইতিহাস-লেখক নিজের অজ্ঞাতে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহু কাল্পনিক কাহিনীকেও ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করেন।

উল্লেখ্য ইংরাজ ঐতিহাসিক সম্পর্কে যদি এ মন্তব্য সত্য হয়, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য আরও অধিকতর সত্য। অতএব কাল্পনিক কাহিনী-আশ্রিত ইতিহাস অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করায় বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে বহু দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করা বিচিত্র নয়। কিন্তু কল্পনাশ্রয় সত্ত্বেও ইতিহাসের উৎকর্ষ যদি স্বীকৃত হয় তা হলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষ স্বীকৃত হবে না কেন?

এ হল ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষ বিচার-প্রসঙ্গে বাস্তব অবস্থার কথা। কিন্তু বাস্তব আর আদর্শ এক বস্তু নয়। যে কল্পনাপ্রবণ লেখক ইতিহাসকে উপন্যাসের পটভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করেন ঐতিহাসিক আবহ সৃষ্টিতে তিনি যতই স্বাধীন কল্পনার পরিচয় দিন না কেন, ঘটনা উপস্থাপনে ঐতিহাসিক সত্য থেকে বিচ্যুত হবার তাঁর কোন স্বাধীনতা নেই। এই শ্রেণীর উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনা যত যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় ততই উপন্যাসের উৎকর্ষ বাড়ে, এ মন্তব্য আগেও করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্লটের খাতিরে ছাড়া কালানুক্রম (chronology) সম্বন্ধে কোন রকম গোলযোগ সৃষ্টি করা তাঁর উচিত নয়। যেখানে লেখক কাল সম্পর্কে সুনিশ্চিত নন, সেখানে শুধু কয়েকটি ঘণ্টা বা দিনের উপস্থাপনে কিছু ভুল হতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের বড় বড় ঘটনাকে ভিন্নতর রূপে উপস্থিত করবার কোন স্বাধীনতাই ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের নেই। একটু বিশ্লেষণ করে পড়লেই দেখা যায় পৃথিবীর বড় বড় ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেরা ইতিহাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করেই এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনায় স্থায়ী যশ অর্জন করেছেন।

কালানুক্রমের যথাযথ অনুসরণ ছাড়াও আরও দুটি বিষয়ে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে সতর্ক হতে হবে:

প্রথমতঃ, যে যুগের আইনের ব্যবহার কিংবা ঔষধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে লেখক উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিচ্ছেন তা যেন সত্যনির্ভর হয়। কারণ এই দুটি বিষয়ের উপর উপন্যাসের ঘটনাগতি অনেক সময় আবর্তিত হয়। সেজন্য এই দুটি বিষয় যদি বাস্তবতাবর্জিত হয় তা হলে সেই উপন্যাস কাল্পনিক রূপকথায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। সর্প-দংশনে মৃত মোবারককে বনৌষধির সাহায্যে মানিকলাল পুনরুজ্জীবিত করল—এই ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র মনে হলেও 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। গুপ্তচরের মুখে খবর শুনে শাসনকার্য-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রকাশ্য আইনের পর্যায়ে না পড়লেও সাম্রাজ্য পরিচালনায় মোগল সম্রাটেরা বিশেষতঃ সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই উপায় অবলম্বন করতেন, কিংবা আইন প্রণয়ন করে সম্রাট ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের কাছ থেকে বিশেষ কর আদায় করতেন—একটা বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়েও উক্ত সম্রাটের সন্দেহপ্রবণতা এবং প্রজা-পক্ষপাত মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক সত্যের উপর ভিত্তি করেই বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসে একজন ক্ষুদ্র সামন্তরাজার কাছে প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শোচনীয় পরাজয়-কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ঔরঙ্গজেব-প্রবর্তিত আইনের এই ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া যদি ইতিহাস-সমর্থিত না হত, তা হলে 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাসের কোঠা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়ে নিছক কল্পনাপ্রধান রোমান্টিক কাহিনীতে পর্যবসিত হত।

ইতিহাসের রাজ্যে কাল্পনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্র বা কাল্পনিক কথোপকথনের অনুপ্রবেশ অবাঞ্ছিত। এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার তারিখের অদল-বদলও ঐতিহাসিকের অনভিপ্রেত। কিন্তু ক্ষুদ্র চরিত্রের এবং কাল্পনিক কথোপকথনের বর্ণনায় এবং ক্ষুদ্র ঘটনার তারিখকে আবশ্যকমত পরিবর্তনেও সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা সম্ভব। ইতিহাসের সত্যকে যিনি এভাবে গ্রহণ-বর্জনের ভিতর দিয়ে উপন্যাসে রূপ দিতে পারবেন ঐতিহাসিক উপন্যাসের জগতে একমাত্র তিনিই স্থায়ী যশের অধিকারী হবেন।

॥ পাঁচ ॥

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংলাপ ও ভাষা

বিগত ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হবে এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসের চরিত্রগুলি যে ভাষায় কথা বলত সে ভাষায় উপন্যাসের সংলাপ রচিত হলে কী ভয়াবহ ব্যাপার দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। বৈদিক যুগ, উপনিষদের যুগ, পুরাণের যুগ কিংবা তৎপরবর্তী হিন্দুযুগের কথা বলছি না, মধ্যযুগের ইতিহাসোল্লিখিত মুসলমান যুগের নরনারীরা যে ভাষায় কথা বলতেন সে ভাষা যদি সে যুগের নায়ক-নায়িকার মুখে বসিয়ে দেওয়া যায় তা হলে সে ঐতিহাসিক উপন্যাস স্বভাব-অনুযায়ী হলেও আধুনিক কজন পাঠকের বোধগম্য হবে?

তা হলে প্রশ্ন ওঠে, সংলাপ-রচনায় লেখক কোন্ পথে অগ্রসর হবেন? বিগত যুগের অবোধ্য ভাষা ব্যবহার করে তিনি কি সংলাপকে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করবেন, না সে যুগের নরনারীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ভাব আবেগ বেদনা এবং আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করবেন আধুনিক ভাষায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্মজ্ঞরা বলেন, এই শ্রেণীর উপন্যাসে অতীত জীবনকে সজীব রূপ দেবার অভিপ্রায়ে লেখক যদি সে যুগের নরনারীর মুখে দুর্বোধ্য প্রাচীন ভাষা বসিয়ে দেন তা হলে সে উপন্যাস আধুনিক পাঠকের কাছে হবে অপাঠ্য। সেজন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রাচীন পরিবেশ এবং বাস্তবতা সঞ্চারের জন্য শুধুমাত্র মাঝে মাঝে তিনি ইতিহাসোল্লিখিত যুগের সংলাপের ভাষা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু সংলাপে প্রাচীন ভাষা ব্যবহারে তিনি যদি মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তা হলে সে উপন্যাস আবেদন-সৃষ্টির দিক দিয়ে ব্যর্থ হবে।

সংলাপ রচনায় লেখককে আরও একটি দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। উপন্যাসে যে যুগের নরনারীর জীবনকে আশ্রয় করে লেখক শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস পান, সেই নরনারীর কথাবার্তায় যদি তিনি এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেন যাতে মনে হয় তারা আধুনিক সিনেমার নায়ক-নায়িকা বা ভাবীযুগের নরনারী, তা হলেও সে উপন্যাস ব্যর্থ হতে বাধ্য। অর্থাৎ সংলাপ রচনায় ঐতিহাসিক-ঔপন্যাসিক যদি যুগ-সচেতন না হন তা হলে সে উপন্যাস স্বাভাবিকতাবর্জিত কাল্পনিক কাহিনীতে পরিণত হবে।

উপন্যাসে উল্লিখিত যুগের কথ্যভাষা ব্যবহারে লেখকের সতর্কতা অবলম্বন আরও বেশী প্রয়োজনীয়। এটা অবশ্য-স্বীকার্য, অশিক্ষিত ইতরজনের অমার্জিত ভাষা ব্যবহারের সাহায্যে লেখক সুকৌশলে একটা স্থানের বা কালের ইঙ্গিত দিতে পারেন। কিন্তু এ ধরনের দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার যদি উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করে তা হলে সে উপন্যাস যে পাঠকের কাছে অপাঠ্য বিবেচিত হবে তা সহজেই অনুমেয়। সেজন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ ধরনের ভাষা ব্যবহারে ঐতিহাসিক-ঔপন্যাসিক 'must aim at suggestion rather than reproduction.' প্রাচীন কথ্যভাষার সঙ্গে একটু পরিচিত হলে সে স্বল্পজ্ঞানকে পাঠকসমাজে জাহির করবার জন্যে অবশ্য লেখকের ঝোঁক চাপে। সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার জন্য লেখকের এরূপ প্রবণতা সর্বদা বর্জনীয়।

॥ ছয় ॥

চরিত্রসৃষ্টি : উপন্যাসের নামকরণ

আমাদের জীবন-পরিবেশে যে সব মানুষের সঙ্গে আমাদের নিত্য পরিচয় ঘটে, সে সব মানুষের ভিতর থেকে ঔপন্যাসিক সামাজিক উপন্যাসে তাঁদের চরিত্র নির্বাচন করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক যে চরিত্রগুলি বিকাশের জন্য সযত্ন হন, সে সমস্ত চরিত্র পাঠকের বাস্তব-অভিজ্ঞতা বহির্ভূত। একটা কথা সমালোচক-মহলে প্রচলিত আছে, ইতিহাসের বৃহৎ ঘটনার রূপদান-প্রচেষ্টা যেমন সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস-সৃষ্টির প্রতিকূল, তেমনই ইতিহাসের স্মরণীয় চরিত্রের অবতারণাও উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস-সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য নয়। কিন্তু এই প্রচলিত ধারণা সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না। ইতিহাসের বৃহৎ চরিত্রের সাহায্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস-সৃষ্টিপ্রচেষ্টা যদি ভ্রমাত্মক বলে বিবেচিত হয় তা হলে স্কট থেকে শুরু করে বহু খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকই ভুল করেছেন বলতে হবে। ইতিহাসের বর্ণনা পড়ে কিংবা বহু-প্রচলিত ধারণা থেকে যে সমস্ত চরিত্র পাঠকের মনে মুদ্রিত থাকে, সে সমস্ত চরিত্রের আশ্রয়ে সার্থক উপন্যাস রচনা করা কষ্টকর সন্দেহ নেই, কারণ যে মুহূর্তে তিনি সে চরিত্রের সজীব রূপদানের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক বর্ণনা বা প্রচলিত ধারণাতীত কোন ঘটনা বা চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য কল্পনার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেন সে মুহূর্তেই পাঠকের কাছে তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঔরঙ্গজেব-চরিত্র স্মরণীয়। প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষী, সন্দেহপরায়ণ, ক্রুর প্রকৃতির ঔরঙ্গজেবের পক্ষে একটি সামান্য রাজপুত নারীর প্রতি মোহমুগ্ধ অনুরাগ ইতিহাস-সমর্থিত নয়; কিন্তু এই মানবিক স্পর্শের অবতারণায় মানবচরিত্রাভিজ্ঞ বঙ্কিম ঔরঙ্গজেব-চরিত্রের যে সজীব রূপ দিয়েছেন বাস্তব ইতিহাসের অনুস্মৃতির সাহায্যে তা সম্ভব হত না নিশ্চয়ই।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের শিল্পকৌশল সম্পর্কে সার্থক আলোচনা করেছিলেন E. B. Osborn নামক লেখক ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের (২৩শে এপ্রিল) 'মর্নিং-পোস্ট' পত্রিকায়। সে প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, চরিত্রসৃষ্টিতে, সংলাপসৃষ্টিতে বা ঘটনার অবতারণায় ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিতে পারেন সত্য, কিন্তু যে যুগের পটভূমিকায় তিনি কাল্পনিক চরিত্র সংলাপ বা ঘটনা সৃষ্টি

করবেন তা যেন সে যুগ-প্রবৃত্তি অনুযায়ী হয়। ছোটখাটো ব্যাপারে কাল্পনিকতার আশ্রয় গ্রহণ করলেও ঐতিহাসিক চরিত্রের বিকৃতিসাধনের অধিকার অবশ্য লেখকের নেই। কালানুক্রম অনুসরণে স্বাধীনতা প্রদর্শনও তাঁর অধিকার-বহির্ভূত। এ ছাড়া অতীতের বৃহৎ তাৎপর্যময় ঘটনার পরিবর্তন সাধনেও তাঁর কোন স্বাধীনতা নেই। আধুনিক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের কর্তব্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে ওসবর্ন আরও বলেছেন, "The modern novelist is expected to give historical personages fair play, not to accept every picturesque label and to be content with melodramatic convention which classes them as sheep or goats."

ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের সুবিধা এই যে তিনি কাল্পনিক চরিত্রকে জীবিতের পোশাক পরিয়ে শুধু যে তাদের মুখে কথাবার্তা জুড়ে দিতে পারেন তা নয়, তাদের সচলও করে তুলতে পারেন। ঐতিহাসিকের কিন্তু এই স্বাধীনতা নেই। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কাল্পনিক চরিত্র মানিকলালকে, কিংবা 'কেরী সাহেবের মুন্সী'র লেখক রেশমীকে যে ভাবে মুখর ও সক্রিয় করে তুলেছেন ঐতিহাসিকের পক্ষে তা সম্ভব হত না। ঐতিহাসিক এরূপ অজ্ঞাত চরিত্রের রূপ যে ইতিহাসে ফুটিয়ে না তোলেন তা নয়, কিন্তু সে রূপ তিনি অস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলেন সমষ্টিচিত্রের মধ্যে—ঔপন্যাসিকের মত কাল্পনিক চরিত্রের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বপ্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে নয়। এ ছাড়া ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক সুকৌশলে নির্বাক জনতাকেও যে ভাবে সক্রিয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে তুলতে পারেন ঐতিহাসিকের পক্ষে তা কখনও সম্ভব হয় না। বাস্তবিক-পক্ষে ঐতিহাসিক উপন্যাসকে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে হলে কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা অপরিহার্য। স্মরণীয় ইংরাজ ঔপন্যাসিক স্কট তাঁর সার্থক উপন্যাসগুলিতে সুপরিচিত ঐতিহাসিক চরিত্রের অবতারণা করলেও এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে তাঁর উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকা সাধারণতঃ কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্র। গত যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' বা এ যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কেরী সাহেবের মুন্সী'তে যে চরিত্র অত্যন্ত সজীব—সে চরিত্র ঐতিহাসিক নয়, কাল্পনিক।

ইতিহাসে আমরা যে ব্যক্তিপরিচয় পাই তার ভিতর তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু ঔপন্যাসিক হলেন মানবজীবনের রহস্য-সন্ধানী। সেজন্য অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে আলোকিত করে তোলেন তিনি ঐতিহাসিক চরিত্রের অন্তর্লোক। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ক্রুর, কপট, খল এবং বিদ্বেষপরায়ণ। হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর তিনি নানাভাবে আঘাত হেনেছেন। সেজন্য তাঁর প্রতি মনীষী বঙ্কিমের বীতস্পৃহার অন্ত নেই। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠুর প্রকৃতি এবং কঠোর হৃদয়ের অন্তরালে যে প্রেম-বুভুক্ষু একটা সজীব মানবিকসত্তা বিদ্যমান ছিল সে আবিষ্কার শিল্পী বঙ্কিমের। কিংবা কেরী সাহেবের মুন্সী রামবসুর মনে রেশমীর সৌন্দর্যমুগ্ধ রোমান্স-বিলাস একান্তভাবে ঔপন্যাসিকের মানস-পরিমণ্ডলে সৃষ্ট ঘটনা। যে রামবসুকে আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখতে পাই সে রামবসু তাঁর থেকে ভিন্নতর মানুষ। শিল্পী তাঁর সহৃদয় হৃদয়ানুভবের সাহায্যে গ্রন্থপণ্ডিত রামবসুকে সৃষ্টি করেছেন একই সঙ্গে রোমান্স ও বাস্তবপ্রিয় এ যুগের মানুষ হিসাবে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামকরণ প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেও একটু আলোচিত হয়েছে—আর একটু আলোচনার পর এই প্রসঙ্গের সমাপ্তিরেখা টানা যেতে পারে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের বহু সমালোচক এই মত প্রকাশ করেছেন, উপন্যাসের প্রধান নায়কের নামে উপন্যাসের নামকরণ করা সর্বোত্তম। এই উপায় অবলম্বন করেছিলেন চার্লস্ ডিকেন্স তাঁর David Copperfield, Oliver Twist, Nicholas Nickleby, Edwin Drood,

Pickwick Papers প্রভৃতি উপন্যাসে। স্কট এবং তাঁর ভাবশিষ্য বঙ্কিমও নায়কের নামে উপন্যাসের নামকরণ করতে ভালবাসতেন। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামকরণ চমকপ্রদ চিত্তাকর্ষক এবং ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধও হতে পারে। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের এরূপ ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ নামকরণ করেছিলেন সর্বপ্রথমে রমেশচন্দ্র দত্ত 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা', 'মাধবীকঙ্কন' প্রভৃতি উপন্যাসে। এ যুগেও কোন কোন ঔপন্যাসিক ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ নাম ব্যবহার করে ঐতিহাসিক উপন্যাসকে জনপ্রিয় করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

ব্যঞ্জনাময় উদ্ধৃতির সাহায্যেও অনেকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। মিসেস স্টীলের 'On the Face of the Waters,' রাফায়েল স্যাবাটিনির 'The Tavern Night', মার্জরী বাওয়েনের 'I will maintain' প্রভৃতি এ-ধরনের উপন্যাসের দৃষ্টান্ত। এ ভাবে উপন্যাসের নামকরণ বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের রুচি অনুযায়ী আরও বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

উপসংহারে শুধু এ কথা বলা যায় বর্তমান বাস্তবতা-প্রধান মনস্তত্ত্বনির্ভর বাংলা উপন্যাস-জগতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনরাবির্ভাব একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। বরং ইতিহাসের মুক্ত হাওয়ায় রচিত এই শ্রেণীর উপন্যাসে বাঙালী পাঠক এক নতুন স্বাদের সন্ধান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি সর্বপ্রথমে ব্যক্তিমন সমাজমন ও বিশ্বমনের গভীরে প্রবেশ করে বাংলা উপন্যাসের সীমাবদ্ধ আকাশে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেন। তাঁর সমসাময়িক শরৎচন্দ্রের রচনায় নতুন সমাজচিন্তার আশ্রয়ে বাংলা উপন্যাস অভিনব তাৎপর্য অর্জন করে। শরৎচন্দ্রের সমকালেই এ শতাব্দীর উত্তর-তিরিশের এক শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের রচনায় মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের নামে উৎকট বাস্তববিলাস প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে অবশ্য কোন কোন লেখকের রচনায় নবতর সমাজচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ ঔপন্যাসিকের রচনার বিষয়বস্তু ব্যক্তিমননির্ভর। সমাজ-চিন্তার বন্ধুর পথে বিচরণ করবার শক্তি সামর্থ্য বা রুচি মননহীন বহু লেখকেরই নেই। ফলে বেশির ভাগ সাম্প্রতিক সামাজিক উপন্যাস (?) রুচিশীল পাঠকের কাছে মূল্যহীন ও একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় ইতিহাসের ছত্রচ্ছায়ায় রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস আজ কৌতূহলী পাঠকের নিকট আবার জনপ্রিয় হতে চলেছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনরাবির্ভাব ও জনপ্রিয়তার মূলে আরও একটি গুরুতর কারণ বর্তমান। আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্লেষণী শক্তির সাহায্যে মানুষের সৌন্দর্যস্বপ্নকে তীব্রভাবে আঘাত করেছে। অথচ বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ চিরকালই অবকাশের স্বপ্ন রচনায় আনন্দ পায়। এ যুগের বিজ্ঞান দস্যুর মত মানুষের সেই অবকাশের স্বপ্ন লুণ্ঠন করায় মানুষ আজ পুনরায় ব্যাপৃত হয়েছে অতীত জীবনরাজ্য থেকে সেই বিনষ্ট স্বপ্নসম্পদ পুনরুদ্ধারের কার্যে। আধুনিক রুচিশীল লেখক ও পাঠক মহলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হল এই।

শেষটা বোঝা গেল না

ভুপেন্দ্রমোহন সরকার

১৯৬৩—

নিখিল ভারত ছাত্রসংস্থার পশ্চিমবঙ্গ শাখার কেন্দ্রীয় অফিস। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতির খাসকামরায় টেবিলের কেন্দ্রীয় আসনে সভাপতি স্বয়ং। তাঁর দু পাশে দুজন করে চারজন সম্পাদক-সদস্য। সমকোণে এক পাশে আছেন মহিলা-সম্পাদক।

বয়স সকলেরই আঠারো থেকে একুশের মধ্যে। গোঁফের রেখা স্পষ্ট হলেও দাড়ি এখনও কামানোর মত হয় নি।

সভাপতি সুইচ টিপতেই প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বেয়ারা প্রবেশ করল।

সভাপতি টেবিলের ওপর ওজন চাপা দেওয়া কাগজের একটা টুকরো তুলে বেয়ারার হাতে দিয়ে বললেন, বোলাও।

বেয়ারার সঙ্গে দুজন পঞ্চাশোর্ধ্ব ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে নমস্কার করলেন।

সভাপতির গম্ভীর ইঙ্গিতে ভদ্রলোক দুজন বসলেন।

বলুন।—সভাপতি যেন আদেশ করলেন।

একজন মাথা চুলকে বললেন, আমরা একটা দরখাস্ত করেছিলাম। তার কোন জবাব পাই নি।

সভাপতি বলে উঠলেন, জবাব পাবেন না। আমরা নির্দেশ জারি করেছি। নিশ্চয় জানতে পেরেছেন।

দ্বিতীয় আমতা আমতা করে বললেন, হ্যাঁ, সেইজন্যেই আমরা পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করতে চাই।

প্রথম যোগ করে দিলেন: আমরা দরিদ্র অধ্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

উপায় নেই।—সভাপতি বললেন, আপনারা অনেক-কাল ছাত্রদের ওপর অত্যাচার করেছেন। প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। ছাত্ররা চেয়ার টেবিল ভেঙেছে ঠিকই। কিন্তু সংবাদপত্রে সকলেই আপনাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছে। আপনারা প্রশ্নপত্রেই আপনাদের সমস্ত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন, পড়ানোর ব্যাপারে কিছু করেন নি বা পড়ানো হয়েছে কিনা কোন চিন্তা করেন নি কোনদিন। ছাত্রদের পরীক্ষা নিতে চান নি, ঠকাতে চেয়েছেন। আপনারা প্রশ্নপত্র রচনার অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছেন। কাজেই প্রশ্নপত্র এখন থেকে ছাত্ররাই রচনা করবে এ নির্দেশ আমাদের অপরিবর্তনীয়।

মহিলা-সম্পাদক বললেন, আপনারা কি ভুলে গেছেন এই প্রশ্নপত্র রচনার অধিকার অর্জন করতে আমাদের তিনটে শহীদ আর তিনশো জখম হয়েছে?

প্রথম অধ্যাপক বললেন, না, ভুলি নি। আমরা অধ্যাপকদের তরফ থেকে একটা অনুরোধ জানাতে এসেছিলাম। আমাদের আর্থিক ক্ষতির কথা যদি আপনারা একটু বিবেচনা করেন এই আশায়।

সভাপতি বললেন, উপায় নেই। আচ্ছা, আমাদের অনেক কাজ আছে।

অধ্যাপকদ্বয় নমস্কার করে উঠে চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চারজনই প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়লেন। মেয়েটির উঠতে ওদের চেয়ে একটু বেশী সময় লাগল। কিন্তু উঠলেন তিনিও।

সভাপতি টেবিলের এক কোণে চেপে বসে অধীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, আর সময় নেই, আমাদের পরবর্তী আন্দোলনের প্রস্তুতি দরকার। ভাইসচ্যান্সেলারের পদচ্যুতি চাই, আর ভাইসচ্যান্সেলার নির্বাচন অথবা নিয়োগের ক্ষমতা চাই।

সদস্যগণ সমস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, চমৎকার দাবি।

প্রথম সম্পাদক বললেন, প্রথম দিনের বিক্ষোভে আমার মনে হয় অন্ততঃ পাঁচ হাজার দরকার হবে।

মহিলা-সম্পাদক বললেন, আমার মনে হয় প্রথম

দিনেই দশ হাজার ব্যবস্থা করলে একদিনেই মীমাংসা হয়ে যাবে।

সভাপতি বললেন, না, তা ভাল হবে না। প্রথম দিনে পাঁচ হাজার থাক্‌। দ্বিতীয় দিন দশ। তারপরেও দরকার হলে তৃতীয় দিনে ত্রিশ হাজার ছেড়ে দেব। তবে আমরা আশা করছি এই সামান্য দাবির জন্যে তিন দিনের বিক্ষোভ দরকার হবে না। ওরা এবার বিলম্ব করতে সাহস পাবে না।

এক মাস পরে—

সম্পাদকমণ্ডলী সভাপতিসহ পূর্ববৎ আসীন।

ষাট বৎসর বয়স্ক ভদ্রলোক একজন প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই নমস্কার করলেন। তারপর বসলেন। বললেন, আমিই আপনাদের আন্দোলনের ফলে পদচ্যুত ভাইসচ্যান্সেলার। আপনারা কি ছাত্রদের ভেতর থেকেই ভাইসচ্যান্সেলার নিযুক্ত করবেন?

কেন, আপনি কি বলতে চান?—সভাপতি কিছু ভ্রূকুটি করে বললেন।

যদি বাইরে থেকে নেন তবে আমি একজন প্রার্থী হিসেবে দরখাস্ত রেখে যেতে চাই। আর, ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন দোষ ছিল না সেই সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আমার লিখে এনেছি।

রেখে যান।

ভদ্রলোক পকেট থেকে বার করে দরখাস্তখানার সঙ্গে লিখিত বক্তব্য পেশ করলেন।

সভাপতি বললেন, যথাসময়ে জানতে পারবেন। আচ্ছা—আমাদের সময় কম।

ভদ্রলোক নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন।

১৯৬৪—

সভাপতি বললেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদচ্যুতির দাবির আন্দোলন আমাদের অবিলম্বে আরম্ভ করা দরকার।

প্রথম দিনেই দশ হাজার ছাড়তে হবে।—টেবিলে ঘুষি মেরে একজন বললেন।

দ্বিতীয় দিনে ত্রিশ।—আর একজন।

তৃতীয় দিনে পঞ্চাশ হাজার, বাস্‌।—বললেন সভাপতি।

দু সপ্তাহ পরে—

পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্ক এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই নমস্কার করলেন। তারপর বসলেন। বললেন, রাজ্যপাল নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করবার জন্যে আমাকে আহ্বান করেছেন। কিন্তু তার আগে আমি আপনাদের সমর্থন আশা করি।

সভাপতি বললেন, আমাদের আলোচনা চলছে। সম্ভবতঃ আপনাকে আমরা সমর্থন করব। কিন্তু কয়েকটা শর্ত থাকবে।

কী শর্ত জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

কাল সকাল আটটার মধ্যে জানাব। একটা শর্ত এখনই আপনাকে জানিয়ে দিতে পারি—পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রীকে কোনক্রমেই মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করা চলবে না।

আচ্ছা বেশ। অবশ্য তেমন কোন সম্ভাবনাও ছিল না। তা হলে এখন আমি যাচ্ছি। নমস্কার—

নমস্কার।

ভাবী মুখ্যমন্ত্রী চলে গেলেন।

১৯৬৫, সেপ্টেম্বর—

নতুন সম্পাদকমণ্ডলী সভাপতিসহ ঘরের মধ্যে উত্তেজিত পদক্ষেপে পায়চারি করছেন।

সর্বকনিষ্ঠ সদস্য বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের একটা ঘুষি লাগিয়ে বললেন, আঃ, একটা অদ্ভুত কাণ্ড হবে!

সভাপতি বললেন, হ্যাঁ, এইটেই আমাদের শ্রেষ্ঠ আন্দোলন। কেন্দ্রীয় সরকারের পতন ঘটাতে পারলে সারা দুনিয়ার ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাসে একটা শ্রেষ্ঠ কীর্তি হয়ে থাকবে।

পারলে কেন? পারবই তো।

আমাদের মোট এক লাখ ছাত্র ছাড়বার কথা। আমরা লাখ দেড়েক পারব না?

লক্ষ পরিবার তৃপ্তির সাথে

ডাল্‌ডায় রাঁধা

খাবার খাবেন

আপনার পরিবারইবা
বঞ্চিত
হবে কেন?
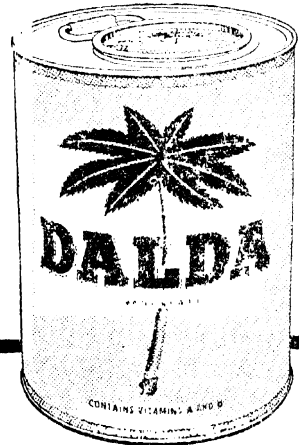
ডাল্‌ডা একটি খাঁটি জিনিষ। কারণ সবচেয়ে খাঁটি ভেষজ তেল থেকে তৈরী। এবং ডাল্‌ডা পুষ্টিকরও বটে; কারণ স্বাস্থ্যের জন্য এতে ভিটামিন যোগ করা হয়েছে। তাই মাছ মাংস, শাক-সব্জী, তরি-তরিকারী ডাল্‌ডায় রাঁধলে সত্যিই সুস্বাদু হয়। আজ লক্ষ গৃহিণী তাই তাঁদের সব রান্নাতেই ডাল্‌ডা ব্যবহার করছেন। আপনিইবা তবে পেছনে পড়ে থাকবেন কেন?

ডালডা
বনস্পতি

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

DL.53-X52 BG

কিছু বেশি আমরা দেবই। সারা ভারতে দশ লাখ ছাত্রের বিক্ষোভে আমাদের কোটা এক লাখ। লাখ দেড়েকের চেষ্টা আমরা করবই।

গুলি চলবে মনে হয়?

সাহস প'বে না। এটা গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু আর সময় নেই। এক মাস মাত্র সময়। এর মধ্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

১৯৬৮, অক্টোবর—

গোপন ঘাঁটিতে গুপ্ত কক্ষ। এক কোণে একটি রেডিও বসানো আছে। মাঝে মাঝে সেটাতে কেন্দ্রীয় গোপন ঘাঁটি থেকে খবর আসছে।

সভাপতি একা উত্তেজনায় দু হাত কচলাতে কচলাতে পায়চারি করছেন।

ছুটে ষোল বছরের একটি ছেলে প্রবেশ করল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, গুলি চলছে।

আর আমরা? হটছি?

হ্যাঁ। আমাদের দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকটার ছাত্ররা এখনও এসে পৌঁছয় নি।

ও, আমাদের ফুল স্ট্রেংথ্‌ এখনও জমায়েত হয় নি।

ছেলেটি বেগে বেরিয়ে গেল। রেডিও বেজে উঠল—

সেণ্টার বলছি—সেণ্টার বলছি। আমরা এগুচ্ছি। কয়েক রাউণ্ড গুলি হয়েছে। মাত্র ত্রিশজন হত আর পাঁচশো আহত। কিন্তু আমরা এগুচ্ছি। ওরা পিছিয়ে যাচ্ছে। গুলি আর করছে না।

রেডিও বন্ধ হল।

আর একটি ছেলে বেগে প্রবেশ করল। দম নিতে নিতে বলল, সবদিক থেকে এসে গেছে। আমরা এগুচ্ছি। গুলি করছে না আর।—ছেলেটি ছুটে বেরিয়ে গেল।

সভাপতি বসলেন। পরক্ষণে লাফিয়ে উঠলেন। ঘরের মধ্যে বেগে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। আবার বসলেন।

অকস্মাৎ রেডিও আবার বেজে উঠল, সেণ্টার বলছি—সেণ্টার বলছি। আমরা জয়ী হয়েছি। স্বৈরাচারী সরকারের পতন হয়েছে।

একটা চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন সভাপতি।

রেডিও বলে চলল, সরকারী দপ্তর আমরা দখল করেছি। পরবর্তী ঘোষণা সরকারী রেডিও স্টেশন থেকে জানানো হবে।

সভাপতি ছুটে বেরোলেন রাস্তায়। কিছুদূর গিয়েই দেখলেন অনেক ছেলে জয়ধ্বনি দিতে দিতে ফিরে আসছে। তিনি একটা প্রচণ্ড জয়হুঙ্কার দিয়ে ছুটে গিয়ে ওদের সামনে পড়লেন। আগেই নিজে খবর দিলেন, কেন্দ্রে আমাদের জয় হয়েছে। সরকার আমরা দখল করেছি।

ওরা বলল, আমরাও শুনেছি। এখানেও এরা পদত্যাগ করে পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ধরা পড়েছে। আমরা সব দখল করেছি।

সভাপতি আবার জয়ধ্বনি করলেন: তারপর, কি হল সব বলুন। আপনারা কেন্দ্রের খবর কোথায় পেলেন?

মাইকে ঘোষণা করেছে। দখল হবার পরে সরকারী ভবনের বারান্দায় মাইক বসিয়ে ঘোষণা করে বলল যে সর্বত্র আমাদের জয় হয়েছে। সরকার আমাদের দখলে এসেছে। আর বলল যে তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে—এখন তোমরা অবিলম্বে ঘরে ফিরে যাও।

কেন?

তাই তো বলল।

কিন্তু বলল কারা?

তা তো দূর থেকে বোঝা গেল না।

বোঝা গেল না?

না—আমরা নাচে অনেকটা দূরে তো!

ও। তা হলে ছাত্ররা সকলে ফিরেছে?

এখন ফিরছে। আমরা হৈ হুল্লোড় করছিলাম। কিন্তু ওরা আবার বলল যে আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না। এখনই রাস্তায় মিলিটারি ট্যাঙ্ক নিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

ট্যাঙ্ক! ট্যাঙ্ক কেন?

শান্তি রক্ষার জন্যে। বলল যে রাস্তায় লোক দেখলেই তারা গুলি করবে।

সভাপতির মুখ পাংশু হয়ে গেল। বললেন, কিন্তু ট্যাঙ্ক পাঠাচ্ছে কারা?

তা তো বোঝা গেল না।

চলুন, রেডিওতে কি বলছে শোনা যাক।

ঘরে গিয়ে রেডিও খুলে দিতেই শোনা গেল।

আবার বলছি, তোমাদের কাজ শেষ। এখন যে যার ঘরে ফিরে যাও। সরকার এখন আমাদের দখলে, তোমাদের আর কিছু করার নেই। কোন রকম রাজনীতিতে তোমাদের আর যোগ দেওয়া চলবে না। কোন ছাত্র-ইউনিয়ন চলবে না। কোন আন্দোলন চলবে না। তবে দেশের জন্যে যখন যা করতে হবে আমরা পরে বলে দেব। এই পর্যন্ত। আবার বলছি—তোমরা যার যার ঘরে ফিরে যাও। আমাদের মিলিটারি পুলিস ট্যাঙ্ক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে। লোক দেখলেই গুলি করবে।

সভাপতি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, কিন্তু এরা কারা?

কয়েকজন সমস্বরে বললেন, তা তো বোঝা যাচ্ছে না।

স্তর

সঙ্কর্ষণ রায়

ন্যাশনাল অ্যারচাইভ্সের ধূলিধূসর একটি প্রায়-অন্ধকার ঘরে বসে অঘোর আলমারিতে ফাইল সাজাচ্ছিলেন। সরকারী বিভিন্ন দপ্তর থেকে এসেছে এক-রাশ ফাইল। বিষয় অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করে সাজাচ্ছিলেন তিনি সেগুলো।

যেসব ফাইল বিশেষভাবে সংরক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয়, সেগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয় ন্যাশনাল অ্যারচাইভ্সে। ইতিহাসের উপকরণ এগুলো—ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের কাজে আসবে।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কিত মোটা মোটা ফাইলের মধ্যে একটি ছোট্ট ফাইল অঘোরের চোখে পড়ল। ফাইলটি খুলে দেখলেন যে একটিমাত্র বাদামী রঙের কাগজ গাঁথা আছে। অস্পষ্ট হিজিবিজি অক্ষরে কী সব লেখা। পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন অঘোর। খারাপ হাতের লেখা পড়ার অভ্যাস আছে তাঁর। পড়লেন। বাণিজ্যদপ্তরের কোন্ এক অফিসার অফিসের করিডরে থুথু ফেলার পাত্র রাখার প্রস্তাব করেছেন।

পড়তে পড়তে আপন মনেই অঘোর হেসে ফেলেন। এ ফাইল এখানে কেন? বুঝি বা কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। পরক্ষণে ফাইল-নোটের নীচের স্বাক্ষরটি তাঁর চোখে পড়ে। নামটা তাঁর অপরিচিত নয়। বাণিজ্যদপ্তরের মন্ত্রীমশাইয়ের ভাগ্নের নাম। এবারে বুঝতে পারেন ফাইলটা কেন এসেছে এখানে। এ ধরনের অনেক ফাইল ইতিপূর্বে তিনি পেয়েছেন।

ফাইলগুলো বিভিন্ন আলমারিতে সাজাতে সাজাতে অঘোরের সঞ্চরমাণ দৃষ্টি পুরনো সব ফাইলের স্তূপে ঘোরে-ফেরে। পুরনো কাগজের কিরকম একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ নাকে আসে। মস্তিষ্কের মধ্যে যেন নেশা ধরে যায়। সুদূরবিস্মৃত অতীত যেন সেই গন্ধ বেয়ে আসে তাঁর কাছে—তাঁর কানে কানে কথা কয়।

একটি আলমারির নীচের থাকে আঠারশো ছাপ্পান্ন সনের একটি ফাইল তাঁর চোখে পড়ল। পুরনো কাগজের ঝিম-ধরানো গন্ধের নেশায় অনেকবার পড়া ফাইলটা আবার পড়তে থাকেন তিনি। ফাইলের ওপর লাল কালিতে লেখা 'কনফিডেন্শিয়াল'। একশো বছর আগেকার লাল কালির রঙ মেটে হয়ে গিয়েছে। ফাইলটিতে লর্ড ডালহৌসীর স্বহস্তলিখিত একটি পরোয়ানা অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের নির্বাসনের। আঁকাবাঁকা নীল অক্ষরে একটি কুচক্রী মনের স্বাক্ষর বুঝি ফুটে উঠেছে।

ওয়াজেদ আলি শাহের নির্বাসনদণ্ডের সঙ্গে আজকের এই উনিশশো ষাট সনের সমন্বয় কি করা যায়? হয়তো যায়। ঐতিহাসিকরা বিবর্তনের কথা বলবেন, কার্যকারণ-পরম্পরায় অতীতকে টেনে আনতে পারবেন এই বর্তমানে ওই থুথুফেলার পাত্র রাখার প্রস্তাবের ফাইলে। কিন্তু অঘোর—যাঁর কাজ হচ্ছে আলমারিতে ফাইল সাজানো—তাঁর চোখে অতীত অতীত, বর্তমান বর্তমান—একটি অন্যটির ওপর স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়ে আছে—দুয়ের মধ্যে অন্বয় বা সমন্বয় অসম্ভব। জলের ওপর তেলের মত অতীতকে চাপা দিয়ে আছে বর্তমান। আলমারির ওই ফাইলগুলোর মত কালানুক্রমে স্তরীভূত হয়ে আছে সিপাহীবিদ্রোহের ওপর বর্মার রাজা থিবোর বিরুদ্ধে অভিযান—তার ওপর প্রথম মহাযুদ্ধ, তার ওপর রাউলাট আইন, তার ওপর অসহযোগ আন্দোলন। উপরের স্তরটির সঙ্গে নীচের স্তরের মিল খুঁজে পান নি অঘোর।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বিশ্বাস করেন না অঘোর।

বিভিন্ন জাতির ও সভ্যতার উত্থান-পতন, অনেক ভাঙা-গড়ার কাহিনী যেন ওই আলমারির থাকে থাকে শ্রেণীবদ্ধ ফাইলগুলোর মত ইতিহাসে স্তরীভূত হয়ে আছে।

ইতিহাসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে শুধু নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও অঘোর দেখেছেন বিভিন্ন সমাজ ও গোষ্ঠীতে স্তরীভূত হয়ে পড়েছে মানুষের অস্তিত্ব।

তাঁর ঠাকুরদা তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে মানুষের শ্রেণী-সচেতনতা ঘুচবে না কখনও, সভ্যতা যতই অগ্রসর হোক না কেন। ঠাকুরদার ঠাকুরদা কৌলিন্যের দাবিতে বিশিষ্ট সম্মান পেতেন, উচ্চস্তরের কুলীন ছিলেন বলে অকুলীন ব্রাহ্মণদের সঙ্গেও পঙ্‌ক্তিভোজনে বসতেন না। সামাজিক নিমন্ত্রণে বিশেষ মর্যাদা পেতেন। এসব গল্প তিনি ঠাকুরদার কাছে অনেক শুনেছেন।

তারপর দিন বদলের পালা এসেছে। কৌলীন্যের মর্যাদা দিয়ে তাঁর ঠাকুরদা নিজের দারিদ্র্যকে আড়াল করতে পারেন নি।

ঠাকুরদা অঘোরকে বলেছিলেন, দারিদ্র্য আমাদের সমাজের নিম্নতম স্তরে ঠেলে দিয়েছে, প্রাণপণ চেষ্টা করো এই হেয়তাবোধের গ্লানি থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে।

অঘোর প্রশ্ন করেছিল, দারিদ্র্য হেয়তাবোধ আনবে কেন? দারিদ্র্যের জন্য গ্লানিই বা অনুভব করব কেন?

ঠাকুরদা জবাব দিয়েছিলেন, না করে যে উপায় নেই। সামাজিক মূল্যবোধ বদলে গেছে, অর্থনৈতিক মানদণ্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সবকিছু।

ঠাকুরদা ঠিকই বলেছিলেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অঘোর অনুভব করতেন পঙ্কিল অস্তিত্ব-বোধের তিক্ততা। পাঁকের মধ্যে ফুটে-থাকা পদ্মফুলের উপমা শুনলে তাঁর হাসি পেত। তাঁর জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের পঙ্ককে অতিক্রম করতে পারেন নি কখনও।

ন্যাশনাল অ্যারচাইভসে একটি ভাল চাকরির জন্য তৎকালীন অধিকর্তা অধীর চক্রবর্তীর কাছে দরবার করতে গিয়ে অপদস্থ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর ইতিহাসের দ্বিতীয় শ্রেণীর এম. এ. ডিগ্রী বা গবেষণার অভিজ্ঞতা কোনও দিকে নজর ছিল না চক্রবর্তী সাহেবের—তিনি শুধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন তাঁর জীর্ণমলিন পোশাক-পরিচ্ছদে নগ্ন দারিদ্র্যের আত্মঘোষণা। রিসার্চ অফিসারের চাকরি তাঁর হয় নি, কনিষ্ঠ কেরানীর একটি পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

অঘোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যে কোন প্রকারে হোক দারিদ্র্যের হীনম্মন্যতা থেকে নিজেকে তুলে ধরবেন। ছোটখাটো দুঃখ থেকে নিজেকে বৃহত্তর জীবনের প্রসারে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু নিজে তিনি রিক্ত ও ব্যর্থ—নিজেকে দিয়ে কিছু করার সাধ্য ছিল না তাঁর। সরকারী দপ্তরের কনিষ্ঠ কেরানীর শক্তি নেই নিম্নতম স্তরের অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়ে আসার। তাই তিনি ছোট ভাই অতনুর চোখের সামনে মেলে ধরলেন সুদূরপ্রসারিত জীবনের আকাঙ্ক্ষা।

অতনু উচ্চাকাঙ্ক্ষী। নিজেকে বঞ্চিত করে যে সুযোগ-সুবিধা অঘোর তাকে করে দিয়েছিলেন তার ষোল-আনা সদ্ব্যবহার সে করেছিল।

অঘোর চমৎকৃত হয়ে দেখলেন যে তাঁর আঁধারঘেরা জীবনের ওপর চমৎকার আলোঝলমল একটা প্রকোষ্ঠ গড়ে তুলেছে অতনু। এই ন্যাশনাল অ্যারচাইভসেরই উপ-অধিকর্তা হয়ে বসল সে একদিন।

অন্য জীবন, অন্য স্তর। অন্ধকার কানাগলি থেকে রাজপথে উপনীত হল অঘোরের প্রসারিত জীবনবোধ।

স্তর থেকে স্তরান্তর। উপরের স্তর থেকে নীচের স্তর নজরে আসে না। মানুষের ইতিহাসে বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করেন না অঘোর।

বিগত জীবন বিস্মৃত দুঃস্বপ্ন। ন্যাশনাল অ্যারচাইভসের অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা অধীর চক্রবর্তী হাত জোড় করে সেদিন তাঁর কাছে এসেছিলেন। অতনুর সঙ্গে তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে চান তিনি।

চমৎকার কোয়ার্টার পেয়েছে অতনু। সুন্দর বাগান। আলোঝলমল অস্তিত্ব—যেখান থেকে আকাশের ছোঁওয়া পাওয়া যায়।

রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।

রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী।　　RP.165-50 BG

অতনু অঘোরকে বলে কাজ থেকে অবসর নিতে। কিন্তু অঘোরের কর্মশক্তি তো ফুরিয়ে যায় নি। দপ্তরের কনিষ্ঠ কেরানীর গোত্র নিয়েও অমিত কর্মপ্রবণতা আছে তাঁর। অতনুকে তিনি বোঝালেন যে কাজ থেকে অবসর নেওয়া মানে তাঁর পক্ষে জীবন থেকে অবসর গ্রহণ।

অতনু আর কিছু বলে নি। অঘোরের পদোন্নয়নের বিষয়ে গোপনে বিবেচনা করেছে সে। অঘোরের কন্‌ফিডেনশিয়াল রিপোর্ট খুবই খারাপ।

অতনুর উপ-অধিকর্তা থেকে অধিকর্তার পদে উন্নীত হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কনিষ্ঠ কেরানীত্ব থেকে অঘোরকে এক চুলও নড়ানো সম্ভব নয়।

অঘোরের তাতে কোন ক্ষোভ নেই। অতনু তাঁকে তাঁর জীবনের অন্ধকার থেকে টেনে তুলেছে, এতেই তিনি খুশী, আর কিছু চান না।

খুশী মনে তিনি প্রায়-অন্ধকার ফাইলঘরে আলমারিতে সাজিয়ে চলেন ফাইলের পর ফাইল। থাকে থাকে স্তূপীকৃত ফাইলগুলোর মধ্যে ইতিহাসের ধারা তাঁকে স্পর্শ করে যেন। একটি যুগের ওপর অন্য যুগ এসে জমা হচ্ছে স্তরের পর স্তরে।

একমনে কাজ করছিলেন অঘোর, অফিসের একজন চাপরাশী হঠাৎ ঘরে ঢুকল। হাতে তার ফাইল নয়, পিওন-বই। পিওন-বই কেন ভেবে পান না অঘোর।

পিওন-বইতে চিঠি—প্রাপ্তিসূচক স্বাক্ষর দিয়ে চিঠিটা নিয়ে নেন অঘোর। চিঠি নয়, অফিস-মেমোরেণ্ডাম, অতনুর দস্তখত রয়েছে নীচে।

মেমোরেণ্ডামটা লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কদের মধ্যে কোয়ার্টার্স বণ্টনের বিষয়ে পেশ করেছে অতনু। যাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে তাদের নামের একটি তালিকাও রয়েছে। তালিকার মধ্যে নিজের নামটি দেখে চমকে উঠলেন অঘোর—চোখের সামনে অন্ধকার দেখলেন যেন।

অতনু তা হলে চায় না যে তিনি তার সঙ্গে থাকেন।

কনিষ্ঠ কেরানীদের জন্য নির্দিষ্ট আবাসে গিয়ে আশ্রয় নিলেন অঘোর। তাঁর অন্ধগলির আঁধারলীন অস্তিত্বের আকাশের স্বাদ পাবার স্বপ্নের ঘোর যায় ভেঙে।

অতনুর নাগাল আর পাবেন না তিনি তাঁর স্তর থেকে। যদিও সে তাঁর ভাই, নিজের বুকের রক্ত জল করে মানুষ করেছেন তিনি—তবু সে অন্য স্তরের মানুষ।

অতনু তার স্ত্রী তনুকাকে বলেছিল, দাদা তো রিটায়ার করলেন না—তাই দিলাম তাঁকে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কদের কোয়ার্টারে পাঠিয়ে। পেটি ফাইল-ক্লার্ক হয়ে তিনি আমার সঙ্গে থাকেন, এর জন্য আমি লজ্জায় সমাজে মুখ দেখাতে পারছিলুম না।

তনুকা অধীর চক্রবর্তীর মেয়ে, চাকরির স্তর অনুযায়ী কার কোথায় স্থান সে বিষয়ে সে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। সে বলল, তা সত্যি। বাবাও বলছিলেন যে তোমার দাদা এ বাড়িতে থাকতেন বলে তাঁর আসতে অস্বস্তিবোধ হত। আচ্ছা, তোমার দাদার নতুন ঠিকানাটা কী ?

অতনু জবাব দিল, তা তো জানি নে। অফিসে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কদের কোয়ার্টার্স অ্যালটমেণ্টের ফাইল দেখলে বলতে পারব।

আশ্বিন সংখ্যায় বহু গ্রাহকের চাঁদার মেয়াদ শেষ হইল। যাঁহারা নূতন বৎসরে গ্রাহক থাকিতে চান না তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ২৫শে কার্তিকের মধ্যেই পত্রযোগে জানাইয়া দিবেন। চিঠি অথবা নূতন চাঁদা না পাইলে আমরা যথারীতি ভি. পি.পি. যোগে পত্রিকা পাঠাইয়া দিব। ভি. পি.পি. ফেরত আসিলে আমাদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকগণ ইহা স্মরণ রাখিবেন। গ্রাহকগণ যথাসময়ে মনি-অর্ডারে বা চেকে টাকা পাঠাইয়া ভি. পি. খরচ বাঁচাইতে পারেন। চাঁদার হার—বার্ষিক সডাক ১২৲, যাণ্মাষিক ৬৲ টাকা। ভি. পি. যোগে আরও ৫৬ ন. প. বেশি লাগিবে।

কার্যাধ্যক্ষ—'শনিবারের চিঠি'

রম্যাণি বীক্ষ্য

মধ্যভারত পর্ব ॥ শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী ॥

চার

মৌয়ে আমরা নামলুম না। দু-তিনটে স্টেশন পেরিয়ে ইন্দোরে এসে আমাদের যাত্রা ভঙ্গ হল।

অভিমন্যুও আমার মত ঘুমিয়ে উঠল। আমি একটা কোণায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়েছিলুম, আর সে ঘুমিয়েছিল মায়ের কোলে মাথা রেখে। মিনতি কী করেছিলেন জানি নে। তবে ছেলের জন্যে খাবার রেখেছিলেন তৈরি করে। পাঁউরুটি মাখন আর কলা। বললেন: আকাশে রোদ এখনও আছে। খোকাকে খাইয়ে বেড়াতে বেরুব।

জিনিসপত্র আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিংরুমে রাখলুম। বিরূপাক্ষ বললেন: তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর জন্যে তো ঘর নেই, চারিদিক খোলা একটা 'হল' হয়তো আছে। রাতে সেখানে থাকা চলে না?

কেন চলে না!

বিরূপাক্ষ আমার মুখের দিকে তাকালেন গভীর বিস্ময়ে।

বললুম: গাছতলায় যদি মানুষের চলে যায় তো এমন ছাদের নীচে চলবে না।

বিরূপাক্ষ হা হা করে হাসলেন, বললেন: খাঁটি কথা বলেছেন। এ দেশের কটা লোকের মাথায় এমন ছাদ আছে!

মিনতি বললেন: নিজেদের ছাদ চুঁয়ে যখন জল পড়ে, তখন তো এই আমাদের সান্ত্বনা।

বললুম: মানুষ পরশ্রীকাতর, কিন্তু পরের দুঃখ দেখে কাতর হলে পৃথিবীটাই স্বর্গ হত।

কী বললেন?

বিরূপাক্ষের প্রশ্নের উত্তরে বললুম: একদিন নিশ্চয়ই হত। এ দেশে সেদিন তেত্রিশ কোটি দেবতা ছিল।

অভিমন্যুর সঙ্গে মিনতি আমাকেও খেতে দিলেন। অভিমন্যু কিছু না বললেও দিতেন। সে শুধু জানতে চেয়েছিল, আমাকে কে খেতে দেবে। আমাকে খাবার খেতে দেখে খুশী হয়েছিল সকলের চেয়ে বেশী।

বিরূপাক্ষ বললেন: আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। শহরের খবর আমি আত্মীয়দের কাছে জেনে আসি।

আত্মীয়দের কাছে!

মিনতি হাসলেন: রেলের সব লোকই তো ওঁর আত্মীয়।

সেই সঙ্গে যোগ করলেন: রাগ হলেই আমার ভাই।

বিরূপাক্ষ বেরিয়ে গিয়েছিলেন। মিনতির শেষ কথাটি শুনতে পেলে হয়তো একটা মন্তব্য করে যেতেন। কিংবা উপভোগ করতেন।

অভিমন্যু আমাকে বলল: একটা গল্প বল।

মিনতি বলল: ভাল লোক ধরেছে।

গল্প বলা তো কঠিন নয়, এই বালকের উপযোগী গল্প বলা কঠিন। নিজের ছোট ভাইবোন ছিল না, ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে মেলামেশারও সুযোগ পাই নি। তাদের মনের কথা আমার জানা নেই, তাদের ভালমন্দ লাগানোর কৌশল আমার অজ্ঞাত। গাড়িতে যে ভোজরাজের গল্প বলেছি, অভিমন্যুর উপযোগী তা নিশ্চয়ই হয় নি। তার উপযোগী গল্প আমার সহসা মনে পড়ছে না।

অভিমন্যু তাড়া দিল : বল।

হঠাৎ আমার এক কৃষককন্যার কথা মনে পড়ল। উত্তর-জীবনে সেই কন্যাই এই শহরকে বর্তমান ইন্দোরে পরিণত করেন। বললুম : একটা মেয়ের গল্প শুনবে?

অভিমন্যু বলল : ছেলের গল্প বল।

বিপদের কথা।

মিনতির দিকে চেয়ে বললুম : এর চেয়ে ভূতের গল্প বলা সোজা দেখছি।

না না, ভূতের গল্প নয় : মিনতি যেন আর্তনাদ করে উঠলেন : ওই সব আজগুবী গল্প শুনে শুনে ছেলেরা বড় ভীতু হয়ে যায়। তার চেয়ে আপনি মেয়ের গল্পই বলুন।

ততক্ষণে আমার সেই মেয়ের শ্বশুরের কথাও মনে পড়েছে। তাঁর শৈশবটাও গল্পের মত। বললুম : বেশ তো, ছেলের গল্পই বলছি। মলহর রাও নামে একটি মহারাষ্ট্রী ছেলে। খুব গরিব। মামার বাড়িতে সে রাখালের কাজ করে। কিন্তু সে কাজ তার একটুও পছন্দ নয়। তার ইচ্ছে সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করবার। যতই সে বড় হচ্ছে ততই তার আগ্রহও বাড়ছে। একদিন তার সুযোগ মিলে গেল। শিবাজীর নাম শুনেছ?

মিনতি তাড়াতাড়ি বললেন : মারাঠা বীর শিবাজী। সেই বাঘের নখের গল্প মনে নেই?

বিজ্ঞের মত অভিমন্যু বলল : আছে বইকি!

বললুম : শিবাজী তখন মারা গেছেন, কিন্তু পেশোয়ারা খুব জোর করেছে। তাদের অনেক সৈন্য। অনেক শক্তি। সবার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে তারা সারাক্ষণ তৈরি। পেশোয়া বাজীরাওয়ের সেনাদলে মলহর রাও একটা সামান্য চাকরি পেয়ে গেল। কিন্তু যে সাহসী ও বীর, সে কি একটা সামান্য চাকরিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে! দেখতে দেখতে সবাই তার সাহস আর বীরত্বের কথা জেনে গেল। বাজীরাও মহা খুশী। বললেন, তোমাকে আমি এই মালব দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলাম। শাসনকর্তা কাকে বলে জান তো? প্রায় রাজারই মত। এই ইন্দোর তখন একটা ছোট্ট শহর, এখানেই তার রাজধানী হল।

অভিমন্যু মনোযোগ দিয়ে গল্প শুনছে। আমি থামতেই বলল : তারপর?

তারপর সেই ছোট্ট মেয়ের গল্প। চাষীর মেয়ে। কিন্তু আজ তাঁকে সবাই জানে। বলে প্রাতঃস্মরণীয়া। সকালে উঠে প্রণাম করবার মত মহারাণী।

অভিমন্যু এবার আর আপত্তি করল না। বললুম : মলহর রাও একদিন পুনা যাচ্ছিলেন। পথে একটি মন্দিরে বসে একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। সেই সময় সেই মেয়েটি এল। চমৎকার ফুটফুটে মেয়ে। তাঁর ভারি ভাল লাগল। ভাবলেন, তাঁর ছেলে খণ্ডে রাওয়ের সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ে দেবেন। বড়লোকের এক কথা—তাঁরা যা ভাবেন তাই করেন। মলহর রাও তাঁর ছেলের সঙ্গেই এই চাষীর মেয়েটির বিয়ে দিলেন।

মিনতি বললেন : কার কথা বলছেন?

বলছি।

কিন্তু আর কিছু বলবার আগেই বিরূপাক্ষ ফিরে এলেন। এসেই বললেন : চল।

অভিমন্যু বলল : গল্প?

তার জন্যে ভাবনা কি? পথেই আমরা গল্প করব।

বিরূপাক্ষ একখানা টাঙ্গা ঠিক করেছিলেন। ভাল করে অন্ধকার হবার আগে সেই-ই আমাদের সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। রেলের লোকের মধ্যস্থতায় গাড়ির ব্যবস্থা। ভাড়া নাকি সামান্যই লাগবে।

অভিমন্যুকে নিয়ে আমি টাঙ্গার সামনে বসলুম। কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে সে দিল না। চারিদিকটা ভাল করে দেখে নিয়েই বলল : বল এই বারে।

বললুম : চাষীর মেয়ের কপালে অত সুখ সইবে কেন! একটা যুদ্ধে খণ্ডে রাও মারা গেলেন। সেই মেয়েটির বয়স তখন আঠারো বছর, একটি ছোট ছেলে আর একটি মেয়ে হয়েছে তার। বলল, চিতায় উঠে আমি সহমরণে যাব। একসঙ্গে পুড়ে মরবে। কিন্তু বুড়ো রাজা রাজী হবেন কেন! তিনি বললেন, ছেলে গেছে, মেয়েও যদি যায় তো আমি কাকে নিয়ে বাঁচব! বুড়োর কান্না দেখে বউয়ের আর মরা হল না।

বিরূপাক্ষ বললেন : এ কার কথা বলছেন ?

বললুম : এক চাষীর মেয়ের কথা। সামান্য শিক্ষা পেয়ে রাজঅন্তঃপুরে এসেছিলেন। স্বামীকে হারিয়ে এবারে রাজকার্য শিখতে লাগলেন বুড়ো রাজার কাছে। যখন তাঁর তিরিশ বছর বয়স, তখন বুড়ো রাজার মৃত্যু হল। রাজা হল তাঁর ছেলে। অসচ্চরিত্র অপদার্থ ছেলে। ন মাস পরে তারও মৃত্যু হল।

এইবারে প্রজা বিদ্রোহ। প্রজারা চায় তাদের মনোনীত কোন লোক রাজা হোক, আর রাজমাতা চান রাজ্য তাঁরই হাতে থাক। এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়েই তিনি কঠিন হাতে এই বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা করলেন। প্রতিবেশী মারাঠা রাজাদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়ে নিজে বেরুলেন তাঁর সেনাদল নিয়ে। রাজমাতাকে হাতির পিঠে উঠে সৈন্য চালনা করতে দেখে সবাই মেতে উঠল। যুদ্ধ আর হল না, ভয়ে সবাই পালিয়ে গেল। ইন্দোরের রাণী হলেন চাষীর মেয়ে অহল্যাবাঈ।

মিনতি আশ্চর্য হলেন। কিন্তু বিরূপাক্ষ বললেন : চাষীর মেয়ে কথাটার ওপর আপনি বড় বেশী জোর দিচ্ছেন।

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

আপনি বোধ হয় বলতে চেয়েছেন যে প্রাতঃস্মরণীয়া হবার জন্য রাজকন্যা হবার প্রয়োজন নেই।

মীরাবাঈও সাধারণ ঘরের মেয়ে ছিলেন। আধ্যাত্মিক জগতে তিনি অবিস্মরণীয়া।

এই ইন্দোরে অহল্যাবাঈ তিরিশ বৎসর রাজত্ব করেছেন। ১৭৬৫ থেকে ১৭৯৫। বর্তমান শহরে তাঁর কীর্তি অক্ষয় হয়ে আছে। সরস্বতী ও খান নদীর তীরে এই শহর—সমুদ্র সমতলে নয়, প্রায় দু হাজার ফুট উঁচু মালভূমির উপর। প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথ, ঘরবাড়ি সবই একটা আধুনিক রুচির পরিচয় দিচ্ছে। শহরের প্রধান স্থানেই পুরাতন প্রাসাদ। পথের উপরেই তার উঁচু তোরণ। হোলকার পরিবারের স্মৃতিস্তম্ভগুলি সব নদীর ধারে। মলহর রাও হোলকারের সমাধি ছত্রিবাগে। সরস্বতী নদীর ধারে আমরা লালবাগ প্রাসাদ দেখলুম, আর দেখলুম এডওয়ার্ড হল।

আর একটি মন্দির আমরা দেখলুম। জৈনদের কাচ মন্দির। বাইরে থেকেই একটা প্রাসাদের মত সুন্দর, ভিতরে ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন। আজমীরেও আমরা জৈনদের একটি মন্দির দেখেছি। সে মন্দির আবু পাহাড়ের দিলওয়ারার মত গম্ভীর নয়, রাজা বাদশাহের শিসমহলের মত রঙিন স্বপ্নের। দেবতার প্রতি ভক্তির বদলে ঐশ্বর্য দেখে বিস্ময় জাগে। অভিমন্যু আনন্দ পেল অপরিমিত।

ফেরার পথে বিরূপাক্ষ বললেন : ইন্দোরে যা দেখলাম না, দেখেছি তা ভারতের সর্বত্র।

মিনতি বললেন : সে আবার কী ?

বিরূপাক্ষ বললেন : ভারতের সমস্ত তীর্থস্থানে অহল্যা-বাঈয়ের কীর্তির শেষ নেই। তীর্থ যত দুর্গম, তাঁর দান তত অকৃপণ। সীমাচলমের সিঁড়ি কে বাঁধিয়ে দিলেন? অহল্যাবাঈ। কাশীতে ঘাট কে বেঁধে দিলেন? অহল্যাবাঈ। গয়ার মন্দির কে সংস্কার করে দিলেন? অহল্যাবাঈ।

বিরূপাক্ষ বোধ হয় আর কিছু ভেবে পেলেন না। পেলে নিশ্চয়ই বলতেন। এ শুধু তাঁর কীর্তির একটা সামান্য পরিচয়। অহল্যাবাঈয়ের কীর্তি নেই, এমন তীর্থ বুঝি ভারতে নেই। ভারতে তীর্থ আর অহল্যার নাম বুঝি অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলে আছে।

মিনতি বললেন : তাঁর নিজের রাজধানীতে সত্যিই কিছু দেখলাম না!

তাঁর নিজের রাজধানীতে শুধু একটি কথা বেঁচে আছে।

পিছন থেকে দুজনেই আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

বললুম : তিনি বলতেন, খাজনা আমার চাই নে, চাই প্রজার সুখ। প্রজা সুখী হলেই আমি সুখী হব। এ তাঁর মুখের কথা নয়। জনৈক রাজকর্মচারীকে তিনি লিখে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের জীবন ছিল ফুলের মত পবিত্র। প্রত্যূষে স্নান-সন্ধ্যার পর তিনি ধর্মপুস্তক পাঠ করতেন। দরিদ্রকে ভিক্ষা দিয়ে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে সামান্য কিছু আহার করতেন। তারপর রাজকার্য, সে প্রায় রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত। সায়াহ্নে ঘণ্টাতিনেক সন্ধ্যাবন্দনা।

আর একটি কথা না বললে অহল্যাবাঈয়ের কথা সম্পূর্ণ হবে না। কেন তিনি তীর্থে তীর্থে তাঁর সমস্ত সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, সেই কথা। তাঁর নিজ ব্যয়ের জন্য রাজকোষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা বাৎসরিক বরাদ্দ ছিল। আর রানী হবার সময় হাতে পেয়েছিলেন দু কোটি টাকা। নিজে তপস্বিনীর জীবনযাপন করে এই টাকা তিনি ভুখা ভারতবাসীর ভোগে দিয়েছিলেন—দেহের ক্ষুধা নিরসনে নয়, আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের জন্য। গৃহে আছে বন্ধন, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা। পথে মুক্তি, উদার প্রসন্নতা। অনির্দিষ্ট পথের শেষ নেই, তীর্থের পথ এক তীর্থ থেকে অন্য তীর্থে গেছে। রানী অহল্যাবাঈ বেরতেন মুঠো মুঠো বীজ সঙ্গে নিয়ে। রাস্তার দু ধারে সেই বীজ বপন করতেন। সেই বীজ আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

একটি প্রাণ। শাশ্বত ভারতীয় প্রাণ। পথে কাঁটা আছে, তুলে ফেলে দাও। মৃত্যুভয় আছে, নিজে বুক পাত। পিছনের পথ হোক নিষ্কণ্টক, পিছনের মানুষ আসুক নির্ভয়ে। অহল্যাবাঈ ভারতের সেই আদিম পথিক। নমস্যা, প্রাতঃস্মরণীয়া।

পাঁচ

মোটরবাসের খোঁজখবর নিয়ে আমরা স্টেশনে ফিরে এলাম। যোগাযোগটা ভাল হল। স্কুল-কলেজের একদল ছেলেমেয়ে মাণ্ডু দেখতে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে কয়েকজন অভিভাবক। তাঁরা এসেছিলেন একখানা বাস রিজার্ভ করতে। সেই বাসেই জায়গা পাওয়া গেল। তাতে লাভ হল দু রকমের। পথে লোকজন ওঠা-নামায় দেরি করবে না। আর মাণ্ডুর সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। তার জন্য কয়েক আনা পয়সা অতিরিক্ত দিতে হবে। ভোর পাঁচটায় পৌঁছতে হবে বাসস্ট্যাণ্ড।

আমরা রুটি মাখন আর কলা কিনে আনলুম। এর চেয়ে নিরাপদ খাবার আর নেই। বিরূপাক্ষ বললেন: সকালে ওঠার ভাবনাও নেই। আমার আত্মীয় একজনকে বলে রাখব। রাত চারটেয় জাগিয়ে দেবে।

কাজেই খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্ত মনে শোওয়া গেল। ওয়েটিংরুমে শোবার জায়গা বেশী নেই, আমি মেঝের উপরেই চাদর বিছিয়ে শুলুম।

সহসা ঘুম এল না। মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে সোমনাথ দর্শনে গিয়ে ভেরাবলের ওয়েটিংরুমে আমরা একটি রাত কাটিয়েছি। মামা-মামী ও স্বাতির সঙ্গে আমি ছাড়াও ছিলেন কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার। যে মানুষকে মামা মামী ঘৃণার চেয়ে ভয় পান বেশী, তিনিও আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু তার পিছনে একটু ইতিহাস আছে। তার শুরু হয়েছিল দ্বারকায়।

তোতাদ্রি মঠের একটা বেঞ্চিতে বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমরা কথা বলেছিলুম। ঘরে এসে দরজা বন্ধ করতেই মামা জিজ্ঞাসা করলেন: কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

হালদারের নাম শুনে তিনি চমকে উঠলেন। মামা তাঁকে ভয় পান। লোকটা বিশেষ সুবিধের নয়। ধর্মের নামে অধর্ম করেই নাকি হাত পাকিয়েছেন। রামেশ্বরের সেই ঘটনার পর মামী এঁরই ভয়ে মরে যাচ্ছিলেন। মুখরোচক মিথ্যা এ যুগে কেউ যাচাই করে দেখে না বলেই মামীর দুর্ভাবনার শেষ নেই। মামা বললেন: কী বলছিল লক্ষ্মীছাড়া?

আমি সত্যি কথাই স্বীকার করলুম: সমুদ্রের ধারে স্বাতিকে দেখেছেন আমার সঙ্গে।

মামা ক্ষেপে উঠলেন: দেখেছে বলছে?

আর মামী তাঁর গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে উঠে বসলেন বিছানার ওপর। ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন: আমি আগেই জানতাম যে এমন একটা কেলেঙ্কারি হবে।

স্বাতি ভয় পাবার মেয়ে নয়, বলল: কেলেঙ্কারি কিসের?

কিসের কেলেঙ্কারি তা তুমি বুঝবে কেন!

মামী যেন গুমরে উঠলেন।

স্বাতি বলল: তোমরা ভয় পাও বলেই তো ও অমন পেয়ে বসেছে।

ভয় তাঁরা সঙ্গত কারণেই পান। সেবারের সম্বন্ধটা

ভেঙে গেছে। মামীর ধারণা, সে হালদারের জন্যেই ভেঙেছে। রানার সঙ্গে নতুন সম্বন্ধটাও গেল ভেস্তে। মামীর উদ্বেগের আর অন্ত নেই। কিন্তু মামা হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠলেন: ওই লক্ষ্মীছাড়াকে আমি আর ভয় পাই নাকি! কী করবে আমার! কী বলে বেড়াবে!

আশ্চর্য হয়ে মামী বললেন: তুমি কি পাগল হলে! বুঝতে পারছ না, দেশে ফিরে কী সর্বনাশ করবে!

মামা অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন রসিয়ে রসিয়ে। তারপর বললেন: সে আমি বুঝব।—তাড়াতাড়ি আমি বললুম: আপনার পয়সায় এবারে অমরনাথ যাবে বলছে।

যাওয়াচ্ছি। বাড়ি গেলেই বুঝতে পারবে যে হেঁটে ফিরতে হবে কালীঘাটে। ট্রাম ভাড়ার পয়সা যদি পায় তো আমার নাম অঘোর গোস্বামী নয়।

দু চোখ বিস্ফারিত করে মামী আমার দিকে চেয়েছিলেন। হঠাৎ এত সাহস তিনি পেলেন কোথা থেকে। স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। সে হাসি মামী দেখতে পেলেন না।

স্বাতির হাসিটি আমার অদ্ভুত লাগল। মনে হল, মামার নির্ভীক হৃদয়ের সংবাদ তার জানা আছে। স্বাতিকে সে কথা জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে।

এই হালদারের সঙ্গে জেতলসরে আবার দেখা হল। তিনিও সোমনাথ চলেছেন। আমরা জুনাগড়ে নামলুম, কিন্তু তিনি নামলেন না। শুধু খানিকক্ষণ সঙ্গ দিয়ে আমাকে বিপর্যস্ত করে গেলেন। বললেন: বুড়ি ওই বাঁদরটাকে পছন্দ করলেন, আর ভাগনে হয়ে মামীর মন ভোলাতে পারলেন না।

বুঝতে ভুল হল না যে তিনি জো রায়ের কথা বলছেন। বললুম: কিন্তু জো রায়কে আপনি চিনলেন কী করে?

একটা ভেংচি কেটে উত্তর দিলেন: কী নাম বললেন। জো রায়! জনার্দন বলতে বুঝি মান যায়! হনুমান বললেও তাকে সম্মান করা হয় যে।

এই জো রায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল ওখার পথে। দ্বারকায় যে প্রথম শ্রেণীর কামরায় মামারা উঠেছিলেন, সাহেবী পোশাকে জো রায় সেই গাড়িতেই যাচ্ছিলেন। অযাচিত ভাবে তিনি সাহায্য করেছিলেন, মামা বাধ্য হয়েছিলেন তাঁকে ধন্যবাদ দিতে।

আমি তাঁর চেয়েও বেশী পেয়েছিলুম। সেই পাওয়ার কথা আমার অনেকদিন মনে থাকবে। সবাইকে তুলে দিয়ে আমি নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। মামা ডেকে বললেন: গোপাল, এ গাড়িতেই এস।

আমি দাঁড়াতুম না, কিন্তু জো রায়ের গলা শুনে থমকে দাঁড়ালুম: আপনার লোক বুঝি?

এই লোক শব্দটির মানে বড় স্পষ্ট। রামখেলাওন মামার লোক, আমিও ওইরকম কিছু। হয়তো বাজার-সরকার, কিংবা জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তা, জমিদারের সঙ্গে প্রভেদটা বড় বেশী। আমি কেন দাঁড়িয়েছিলুম তা জানি, মামা কী জবাব দেন, সেই কথা জানবার আগ্রহ ছিল। সেই কথাটি জানা হলেই আমার ভবিষ্যৎটাও বুঝি জানা হবে। জানলার সামনে থেকে আমি সরে গিয়েছিলুম। মামা আমাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু আমি তাঁর উত্তর শুনতে পেলুম। এতটুকু দেরি না করে স্পষ্ট জবাব দিলেন: আমার ভাগনে।

তারপরেই স্বাতিকে বললেন: ধরে আন্‌তো মা। ওর চালচালিয়াতি যেন অন্যকে দেখায়।

আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। মনে হয়েছিল, এই মুহূর্তে মামা আমাকে আমার প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশী স্নেহ দিয়ে ফেললেন। সেইটুকু ঢাকবার জন্যই বাইরের এই রূঢ়তা।

গাড়িতে জো রায়ের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। একটা ফার্মের বড় অফিসার। হেডকোয়ার্টার্স বোম্বে, কাজের এলাকা কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র। বিলেত ঘুরে এসে পিতৃদত্ত জনার্দন নাম হয়েছে জো, কথায় ও কাজে পুরোদস্তুর সাহেবিয়ানা। মিঠাপুরে তাঁর কাজ ছিল, কিন্তু নামতে পারলেন না। আমাদের সঙ্গেই ওখা গেলেন, ওখা থেকে বেট দ্বারকা। ফেরার পথেও তাঁর মিঠাপুরে নামা হল না। আমাদের সঙ্গে তিনিও

সোমনাথ দেখতেন। কিন্তু স্বাতির কথায় তা হল না। ভদ্রলোককে নেমে যেতেই হল।

জো রায়কে মামীর ভাল লেগেছিল। চুপিচুপি মামাকে বলেছিলেন : বেশ ছেলেটি, তাই না!

গম্ভীর ভাবে মামা বলেছিলেন : হুঁ।

এতবড় চাকরি, অথচ অহংকার নেই এতটুকু।

হুঁ।

মামী পরামর্শ দিয়েছিলেন : ওর ঠিকানাটা লিখে রাখ। ওই সঙ্গে ওর বাপের নাম ঠিকানাও।

মামা তাতেও বলেছিলেন : হুঁ।

গাড়িতে খাওয়াদাওয়ার পর জো রায় বলেছিলেন, সোমনাথ তাঁর দেখা হয় নি।

মামী তখনি প্রস্তাব করেছিলেন : বেশ তো, চলুন না আমাদের সঙ্গে।

হাত দুটো কচলে জো রায় বলেছিলেন : আমাকে আপনি বলবেন না।

উত্তর শুনে মামী খুশী হয়েছিলেন, বলেছিলেন : তা বটে। তুমি তো আমার ছেলেরই মত।

মামীকে খুশী করবার জন্যে জো রায়কে আমি বলেছিলুম : আপনি এই গাড়িতেই থাকুন, আমিই যাব পাশের গাড়িতে।

কিন্তু স্বাতির চোখের দিকে চেয়ে মুখে আর কথা জোগাল না। বুঝতে পারছিলুম, সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল : সোমনাথ পরে দেখলে আপনার চলবে না!

মামী রুখে উঠলেন : একসঙ্গে যদি দেখতে পারা যায় তো পরে দেখবে কেন?

কাজের চেয়ে কি আর কিছু বড় আছে!

স্বাতির উত্তরে কোন উষ্মা প্রকাশ পেল না। বরং আরও নম্র, আরও মিষ্টি শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

ব্যস্তভাবে জো রায় বলেছিলেন : সে খুব ঠিক কথা। আমি তো এদিকেই আছি, আমি অন্য সময়ে সোমনাথ দেখব।

পরের স্টেশনেই জো রায় নেমে গিয়েছিলেন পাশের গাড়িতে। আর মামী অনেকক্ষণ ধরে স্বাতিকে বকেছিলেন। স্বাতি একটি কথারও উত্তর দেয় নি।

হালদারের মুখে জো রায়ের কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম : এত রাগ কেন ভদ্রলোকের ওপর?

ভদ্রলোক! কে ভদ্রলোক! আমি কোন্ ছার, ওর বাপ ওকে কুলাঙ্গার বলে। তবে কিনা—

হালদার হেঁহেঁ করে হাসলেন রসিয়ে রসিয়ে। তারপর বললেন : আমি আমার কাজ গুছিয়ে নিয়েছি। কাল রাতে যখন গাড়ি থেকে ছোঁড়া নামল, ক্যাঁক করে তার গলা টিপে ধরলুম। কালীকেষ্ট হালদারকে ফাঁকি দেবে, এমন ছেলে এখনও মায়ের পেটে আছে।

এ কথা মেনে নিতে হালদার আত্মপ্রসাদ পেলেন। বললেন : বললুম, ওখানে গিয়ে ভিড়েছ তো! দাঁড়াও সব ফাঁস করে দিচ্ছি। তবে একটা জিনিস তার দেখলুম, বিপদটা সে টক করে বুঝে নিল। বোঝাতে হল না। হাতে পায়ে ধরে বলল, বুড়োবুড়িকে রাজী করেছি, আপনি আর বাদ সাধবেন না।

সেই সঙ্গে বললেন : অঘোর গোঁসাইকে সে এখনও চেনে নি। বুড়ি ভুলতে পারে, কিন্তু বুড়ো কম সেয়ানা নয়। যে লোক কালীকেষ্টকে চিনেছে হাড়ে হাড়ে, সে ওই বাঁদরকে কি আর চিনবে না! পঞ্চাশ টাকায় পার পেতে চেয়েছিল, পাঁচশো টাকায় রফা হল। একশো টাকা দিয়েছে, বাকিটা কলকাতার ঠিকানায় পাঠাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন : কারও সম্বন্ধেই কিছু বলি না। অভাব না থাকলে ভয়ও দেখাতুম না। কালীকেষ্ট হালদারের নাম তা হলে কালীকৃষ্ণ বসু হত। এই হচ্ছে আজকের সমাজ, আজকের সভ্যতা। একটা মুখোশমাত্র। পয়সার মুখোশ। পয়সা থাকলে জানোয়ার মানুষ সাজতে পারে। কিন্তু মানুষ নিজের পরিচয় হারায় পয়সার অভাবে। লোকে চিনতে পারে না।

বললেন : গোপালবাবু, নিজের পরিচয়টা যদি দিতে পারতেন, তা হলে বুড়োবুড়ি আজ পাত্র খুঁজে বেড়াত না। চিনেছে শুধু মেয়েটা।

রাত সাড়ে নটায় গাড়ি ভেরাবলে পৌঁছতেই হালদার

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP

সুরজিৎ হেসে জবাব দেয়, সে ঔদ্ধত্য আমার নেই, আমি একধরনের কাজে বিশ্বাসী। আমাকে কাজ করতে হলে সেই ভাবে করব, আপনারা তা মেনে নেবেন কি না সেইটাই হল প্রশ্ন, আর আমার কোন বক্তব্য নেই।

সুরজিতের এ প্রস্তাব অন্য সময় হলে নিশ্চয় কেউ মেনে নিত না, হয়তো পাগলের প্রলাপ বলে হেসে উড়িয়ে দিত। কিন্তু এ যাত্রা তা হল না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিল সকলে, শুধু হৃষীকেশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে। তিনি নাকি ইতিমধ্যেই চড়া দামের নাম করা শিল্পীদের গোপনে ডেকে জানিয়ে দিয়েছেন, আগের নাটক চালিয়ে তাঁর লোকসান হয়েছে প্রচুর, অতএব পয়লা বৈশাখ থেকে নতুন বই খুলতে না পারলে তবী থিয়েটার বন্ধ করে দেবেন। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার ইচ্ছে তাঁর নেই। সুতোর কলের মুনাফার টাকা থিয়েটারের লোকসান মেটাবার জন্যে ঢালতে তিনি রাজী নন।

অগত্যা শুরু হল প্রচণ্ড রিহার্সাল। তিনতলার ঘরে বসে রিহার্সাল দিলে চলবে না। তাই যে সময় মঞ্চ খালি আছে—সে সকাল দুপুর রাত্রি যখনই হোক না কেন মহলা দেওয়া হচ্ছে সীনের পর সীন। খাবার ব্যবস্থা হয়েছে থিয়েটারেই—মাংস আর গরম ভাত।

এ কদিন অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে সুরজিৎ, বাড়িতে বলে রেখেছে কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। রিহার্সাল দিয়ে শিল্পীরা চলে গেলেও সুরজিৎকে থিয়েটারেই আটকে থাকতে হয়। সেটের কাজ চলছে, নতুন ডিজাইনের সেট, সুরজিৎকে তারও তদারক করতে হয়। স্টেজ-ম্যানেজার মুকুল নন্দী সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, পান-খাওয়া দাঁত বার করে বলে, এ আপনি এক নতুন জিনিস দেখালেন স্যর, একমিনিটের বিশ্রাম নেই, কী অমানুষিক পরিশ্রম! এ সব ছিল পুরনো কর্তাদের আমলে। সাতদিনের নোটিসে নতুন নাটক খুলত। আজকাল যে যুগ বদলেছে, তিনশো চারশো রাত্রি নাটক চালিয়ে তার ছিবড়ে বার করে তবে একটা বই বদলানো হয়। আর্টিসরাও তাই কুড়ে মেরে গেছে। এই তো দেখি হোলনাইটের বাজে দুটোর বেশী তিনটে নাটকে প্লে করতে বললেই মুখ ব্যাজার। শুধু পয়সা আর পয়সা। সত্যিকারের আর্টিস আর কেউ নেই।

সুরজিৎ লক্ষ্য করে দেখেছে আজকের দিনের ভাবটা থিয়েটারের লোকেরা কেউ দেখতে পায় না। তাই ইচ্ছে করে বলে, কিন্তু দেখুন, আমি নতুন লোক অথচ এ থিয়েটারের পুরনো আর্টিস্টরাও তো সবাই কথা শুনছেন।

দেখুন কদিন শোনে।

মেয়েদের গ্রীনরুম থেকে মন্দিরা একটা আটপৌরে শাড়ি পরে বেরিয়ে আসে। সুরজিতের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, দোতলার ঘরের জানলাটায় সবুজ রঙ দিলেন কেন?

মন্দিরাকে এসময় সুরজিৎ দেখতে পাবে মোটেই আশা করে নি। একদফা রিহার্সাল হয়ে গেছে সকাল-বেলা, আবার দুপুর থেকে ছোট আর্টিস্টদের নিয়ে পড়তে হবে। তাই তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি বাড়ি যান নি?

না। রিহার্সালের পর দুজন লোক এসেছিল, একটা ফিল্মের জন্যে। কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল। দুপুরবেলা তো আবার রিহার্সাল, তাই ভাবছি এখন আর বাড়ি যাব না।

দুপুরে তো আপনার ছুটি, ছোটখাটো পার্টগুলোর রিহার্সাল নেব।

তা হলেও রিহার্সাল দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। দরকার হলে আপনাকে সাহায্যও করতে পারি। অবশ্য আপনি আপত্তি করলে থাকব না। গ্রীনরুমে একটু ঘুমিয়ে নেব।

সুরজিৎ বাধা দিয়ে বলে, থাকলে তো ভালই, একলা কাজ করতে করতে এক এক সময় বড় বিরক্ত লাগে।

মন্দিরা ব্যাগের ভেতর থেকে পান বার করে খায়। বলে, বেশ তো, যাকে কিছুতেই সামলাতে পারবেন না আমার হাতে ছেড়ে দেবেন, পাখি পড়ার মত করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে আসব। কিন্তু বললেন না তো, দোতলার জানলায় সবুজ রঙ দিতে বলেছেন কেন?

কেন, ভাল দেখাচ্ছে না?

আপনার বুঝি চোখ নেই? ওটা এখুনি বদলে খয়ের রঙ করতে বলুন।

মুকুল নন্দী চট্ করে কথার খেই ধরে: মোনোদি কিন্তু এটা ঠিক বলেছে, আমিও ভাবছিলাম আপনাকে বলব বলে, সাহস হল না। জানলা দরজা খয়ের রঙ হলে ও সীনখানা কিন্তু খুব চোখে ধরবে।

সুরজিৎ বোঝে, এদের রঙের জ্ঞান সেই মান্ধাতার আমলের—বেগুনী রঙের দেয়াল, গেরুয়া জানালা, আর গোলাপী পর্দা যে যুগের ড্রইংরুমের একচেটে ফ্যাশান ছিল। তবু হেসে বলে, যিনি আর্ট ডিরেক্টার, তাঁকে জিজ্ঞেস করে যা হোক একটা ঠিক করা যাবে।

মন্দিরাকে সুরজিতের সঙ্গে কথা বলতে দেখে বিপিন এসে সেখানে দাঁড়ায়। বিপিন রুবী থিয়েটারের ইলেকট্রিশিয়ান, আলোকসম্পাতেরও কাজ করে। মন্দিরার কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, বাবুর কাছে আমার আরজিটা পেশ করেছেন?

মন্দিরার কথাটা মনেই ছিল, তবু বিপিনকে দেখে যেন কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেইরকম ভান করে: ওহো, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। বিপিনদার ইচ্ছে নতুন নাটক খোলা হচ্ছে, এই সুযোগে কিছু স্পট লাইট কেনা হোক।

বিপিন মিস্ত্রী সায় দিয়ে বলে, সত্যি বাবু, কয়েকটা আলো না হলে আর চলছে না। দু সারি লাইট ওপরে আর নীচে ফুট লাইট। এ ছাড়া তো আছে সবে ধন নীলমণি দুখানি আর্ক ল্যাম্প। এ নিয়ে আর আলোর খেলা কী দেখাব?

সুরজিৎ উত্তর দেয়, এ নিয়ে আমি আগেই ভেবেছি, হৃষীকেশবাবুর সঙ্গে কথাও হয়ে গেছে। আমার এক বন্ধু আছে, লাইটিং করে, তাকে নিয়ে আসব।

বিপিন ভুরু কোঁচকায়, কে বলুন তো?

অলক ঘোষ।

বেশ ছিপছিপে ফরসা চেহারা? মাঝখানে সিঁথে?

চেনেন নাকি?

চিনি বইকি, কলকাতায় কে কোথায় কি রকম লাইটিং করছে সব খবর রাখি। অলকবাবু তো এই কদিন আগেই এসেছিল, এই বোর্ডে অ্যামেচার পার্টির সঙ্গে। বেশ ভাল কাজ করে। লাস্ট সীনে এমন একটা জলের খেলা দেখাল যে আমাকেই তাজ্জব করে দিয়েছে।

সুরজিৎ মৃদু হাসে: আজকালের মধ্যেই ওকে নিয়ে আসব।

বিপিন হাততালি দিয়ে ওঠে: তা হলে আর দেখতে হবে না, এ একেবারে ফার্স্ট ক্লাস বই হবে। দুশো রাত চোখ বুজে।

ওর কথা বলার ধরন দেখে মন্দিরা হাসে: বিপিনদাকে খুব খুশী দেখছি। দাঁড়ান, আগে নাটক নামুক, পয়সা দিয়ে লোকে টিকিট কাটুক—তবে তো।

বিপিন সগর্বে বলে, হবে গো দিদি, ঠিক হবে। সবাই মিলে আমরা প্রাণ দিয়ে খাটছি, তার একটা দাম নেই। আজকাল সব ফাঁকিবাজীর কাজ হয়েছে, লক্ষ্মীঠাকুরও তাই ফাঁকি দেন।

বাড়িতে ফিরতে পারবে না সুরজিৎ তা জানত, ভেবেছিল কাছাকাছি কোন হোটেল থেকে খেয়ে এসে আবার রিহার্সাল নেবে, কিন্তু মন্দিরা তা করতে দিল না। বলল, হৃষীবাবু আমাকে বলে গেছেন, আপনার খাবার থিয়েটারে আনিয়ে দেবার জন্যে। আমি ম্যানেজারবাবুকে বলেও রেখেছি, ঠিক একটার সময় মাংসের কাটলেট, পাউরুটি আর কারি নিয়ে আসবে। আর আপনার খাবার তদারক করব বলে আমার জন্যেও ওই একই খাবার আসবে কোম্পানির পয়সায়।

সুরজিৎ মৃদুস্বরে বলে, এত হাঙ্গামা করার কিছু দরকার ছিল না।

ছিল না কেন, নিশ্চয়ই ছিল। আপনি যে এই দিন নেই রাত নেই ভূতের মত খাটছেন, কার জন্যে—না থিয়েটারের জন্যে, তবে তারাই বা আপনার সুখ-সুবিধেটা দেখবে না কেন?

যথাসময়ে খাবার এল। রমেন চৌধুরী দোতলার গ্রীনরুমে খাবার ব্যবস্থা করে ডেকে পাঠালেন সুরজিৎ

আর মন্দিরাকে। খাতির করে বসিয়ে একগাল হেসে বললেন, আপনাদের জন্যে আমি এতক্ষণ অপেক্ষা করে আছি।

মন্দিরা শুধু যেন মুখ ফসকে বলে ফেলে, তবে তো আমাদের মাথা কিনেছেন।

না, তোমার কথার ধরন দেখছি সেই একরকম রয়ে গেল। কার সামনে কী বলতে হয় তা বোঝ না। সুরজিৎবাবু নতুন লোক, উনি এ সব শুনলে কি ভাববেন বল তো।

সুরজিৎ হেসে অন্য কথা পাড়ে: আপনার বোধ হয় এখনও খাওয়া হয় নি।

কই আর হল! এখন বাড়ি যাব, স্নান করব, খাব।

মন্দিরা তার কথা শেষ করতে না দিয়ে একই সুরে বলে যায়, ঘুমব, বউয়ের সঙ্গে গল্প করব, যে খোসামোদ করবে তাকে থিয়েটারে নামাব।

রমেন চৌধুরী এবার সত্যি বিরক্ত হয়: আঃ মন্দিরা, তোমার দেখছি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই।

সুরজিৎ দুজনকে থামিয়ে দেয়: তা হলে আর আপনি দেরি করবেন না, বাড়ি গিয়ে খেয়ে নিন।

রমেন চৌধুরীর শুকনো মুখে হাসি ফোটে: আর যা দরকার হবে মন্দিরাকে বলবেন, বাইরে চাকর রইল, ডাক দিয়ে আনিয়ে নেবে। আমি তা হলে চলি।

হাত তুলে নমস্কার করে রমেন চৌধুরী চলে গেল। সেইদিকে তাকিয়ে মন্দিরা বক্রোক্তি করে, একটা ভিজে বেড়াল।

সুরজিৎ হেসে ফেলে: কেন বলুন তো, ওঁকে বুঝি আপনার ভাল লাগে না?

ভাল লাগবার মত তো ওঁর কিছু নেই।

দুজনেরই খিদে পেয়েছিল খুব, রান্নাগুলোও উতরেছে ভাল, দুজনেই তার সদ্ব্যবহার করে। মাংসের ঝোলে রুটি ডুবিয়ে মন্দিরা তারিয়ে তারিয়ে খায়। গল্পচ্ছলে বলে, আপনি এ থিয়েটারে যোগ দেওয়ায় কারা সবচেয়ে খুশী হয়েছে জানেন?

কারা?

স্টেজ-ম্যানেজার মুকুন্দদা, লাইটের বিপিনদা, ড্রেসার গোকুলদাস—এদের আনন্দের সীমা নেই। সত্যি কথা বলতে কি, রতীনদা তো আর এদের নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। পুরনো ড্রেস, পুরনো সেট এই সব দিয়েই কাজ চালাতেন। আপনি আসার পর এরা একটু কাজ দেখাবার সুযোগ পাচ্ছে।

সুরজিৎ দুষ্টুমি করে হাসে: কিন্তু আর্টিস্টরা কি বলছে?

কুচো আর্টিস্টরা মহা খুশী। তাদের নিয়ে তো আগে কোনদিন রিহার্সালই হত না। তারা আপনার ভক্ত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু প্রদীপবাবুরা?

মন্দিরা মুচকি হাসে: ওঁরা বোধ হয় একটু বিপদে পড়েছেন। এত বেশী বাধ্যবাধকতা মোটেই পছন্দ করছেন না। আপনি যখন থাকেন না রসময়দা আপনাকে নিয়ে ক্যারিকেচার করে লোক হাসায়। ও আপনার নাম দিয়েছে—

সুরজিৎ হেসে বলে, শায়েস্তা খাঁ।

মন্দিরা বিস্মিত হয়: কি করে জানলেন!

আপনারা আমাকে যতটা বোকা মনে করেন, আমি বোধ হয় ততটা বোকা নই।

মন্দিরা দুঃখিত স্বরে বলে, আপনি আমাকে কেন জড়াচ্ছেন। আমি মোটেই ওদের দলে নই। আমি তো চাই আপনাদের মত শিক্ষিত লোক আসুন, থিয়েটারের উন্নতি হোক।

সুরজিৎ অন্যমনস্ক স্বরে বলে, সত্যিই কি চান?

কেন, বিশ্বাস হয় না?

মন্দিরা তার বড় বড় চোখ দুটো তুলে নিষ্পলক দৃষ্টিতে সুরজিতের মুখের দিকে তাকায়। বড় পবিত্র সে চাউনি। তাকে অবিশ্বাস করা যায় না।

সুরজিৎ ইচ্ছে করেই অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। মন্দিরার এই ধরনের অভিমানভরা কথা শুনলে, তার ওই অচপল চোখের দিকে তাকালে অনেক সময় তাকে খুব কাছের মানুষ বলে মনে হয়—যেন বহুদিনের পরিচয়।

একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

মনের ভাব গোপন করে সুরজিৎ জিজ্ঞেস করে, পরশু সকালে আপনাদের বাড়ি যাব? দেখা হবে বাবার সঙ্গে?

মন্দিরা খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ায়: নটগুরুর কাছে যাবেন?

ইচ্ছে তাই।

বেশ তো, সাড়ে নটার সময় আসবেন। বাবা নিয়ে যাবেন। একটু থেমে বলে, হাত ধোবেন তো নীচে চলুন, সাবান আছে মুকুন্দদার কাছে।

সুরজিৎ আর মন্দিরা নীচে নেমে যায়।

মাত্র ক বছর কলকাতায় এসেই অলক ঘোষ রীতিমত নিজের প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। ছেলেবেলা থেকে সে যে আলো নিয়ে খেলা করেছে, যৌবনে যার সাধনায় লেখাপড়া পর্যন্ত করতে পারে নি, এখন তারই সঙ্গে খানিকটা ব্যবসাবুদ্ধি লাগিয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে, সেই সঙ্গে টাকাও। টাকা অনেকের সর্বনাশ করে, কিন্তু অলক ঘোষকে কিছু করতে পারে নি। নিঃস্ব থেকে বড় হয়েছে বলেই বোধ হয় টাকা রোজগারের তার একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। প্রগতিমঞ্চের মত যে সব প্রতিষ্ঠান নাটকের উন্নতির জন্য প্রাণপণে খাটে, তাদের কাছ থেকে সে টাকা নেয় নামমাত্র। এমন কি তাদের লোকসান হলে কত সময় পয়সা না নিয়েও চলে আসে। সে টাকাটা সে উসুল করে নেয় বড়লোকের বাড়ির বিয়েতে, ছেলের ভাতে কিংবা দেয়ালীতে অবাঙালীদের বাড়ি আলো দিয়ে সাজিয়ে। শুধু তাই নয়, বছর দশেক ধরে কলকাতায় যেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্লাবন বইছে। তার মধ্যে যে দু-চারটে সত্যিকারের ভাল অনুষ্ঠানও হয় না তা নয়, কিন্তু বেশীর ভাগই হুজুগের ওপর চলে যাচ্ছে। সাহেবপাড়ার বড়লোকী হল এম্পায়ারে এমন কোন রবিবার সকাল ফাঁকা যায় না যেদিন কোন না কোন নাটক হচ্ছে। সবই প্রায় খেয়ালী সংঘ, বছরে একটা অনুষ্ঠান করে। এদের ওপর কিন্তু অলক ঘোষের এতটুকু দয়ামায়া নেই, নির্দয়ভাবে টাকা আদায় করে। তবে ফাঁকি দেয় না, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আলোর চরকি ঘুরিয়ে, মঞ্চে বৃষ্টি পড়িয়ে, আকাশে মেঘ উড়িয়ে দর্শকদের কাছ থেকে হাততালি আদায় করে।

কিন্তু যা পায় না তা হল আনন্দ। যে সৃষ্টি করতে চায়, তার ভাল লাগে না মামুলী পাঁচটা কাজ করে টাকা রোজগার করতে। তাই সে, কাজ করে প্রগতিমঞ্চে কিছু সৃষ্টি করার আশায়, ঢুকতে চায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে, যদি কিছু সে দিয়ে যেতে পারে।

কদিন বাদেই সুরজিৎ হাজরাকে দিয়ে তাকে কফিহাউসে ডেকে পাঠিয়ে যখন বলল রুবী থিয়েটারে যোগ দেওয়ার কথা, অলক ঘোষ সানন্দে বলেছিল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই সুযোগ দেবার জন্য।

সুরজিৎ সব ব্যাপার পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়: হঠাৎ আমার ঘাড়ে এতরকম ঝক্কি এসে পড়েছে যে ভাল মন্দ কি হবে কিছু বুঝতে পারছি না। তাই আপনাকে পেলে আমার নিজের বড় উপকার হবে।

আমার যতদূর ক্ষমতা আপনাকে সাহায্য করব।

তবুও সুরজিৎ সহজ হতে পারে না, কি যেন ভেবে ইতস্তত করে: ওরা আপনাকে এর জন্যে কত টাকা দেবে আমি এখন কিছু বলতে পারছি না।

অলক ঘোষ প্রাণ খুলে হাসে: এজন্যে ভাবনার কিছু নেই—কাজ দেখাব, খুশী হলে ওঁরা টাকা দেবেন, বাস্‌। শুধু গোড়া থেকেই বিজ্ঞাপনে যেন নামটা আমার যায়।

সুবোধ হাজরা মাঝখান থেকে বলে, তোমাদের যে দুজনকে ভিড়িয়ে দিলাম, আমার দালালীটা চাই।

অলক ঘোষ তখুনি তিন কাপ কফির সঙ্গে সেই পরিমাণ কেক আর স্যাণ্ডউইচ আনার অর্ডার দেয়।

পরের দিন থেকেই অলক ঘোষ মেতে উঠেছে 'নূতন যুগের ভোরে'র লাইটিং চার্ট করতে। সুরজিতের কাছ থেকে নাটক চেয়ে নিয়ে পড়ে, কোথায় সাধারণ আলো পড়বে, কোথায় দিতে হবে স্পেশাল এফেক্ট তা লাল পেনসিল দিয়ে দাগ কেটে নিয়েছে। সুরজিতের অবসরমত তার সঙ্গে বসে নাটকের বক্তব্যটা পরিষ্কার করে বুঝে নিয়ে মনে মনে স্থির করে রেখেছে আলোর সাহায্যে

কতরকম আবহাওয়া তাকে সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্যে অবশ্য চাই নানা রকম আলো, তার সঙ্গে লাগোয়া ডীমার। সুরজিতের সঙ্গে গিয়ে হৃষীবাবুকে আলো সংক্রান্ত সব কথা সে বুঝিয়ে এসেছে, হাতে ধরিয়েও দিয়েছে একটা লম্বা ফর্দ—কি কি আলো রুবী থিয়েটারকে এখুনি কিনতে হবে।

হৃষীবাবু অবশ্য চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি আমাকে ফতুর করে ছাড়বেন নাকি মশায় ?

অলক ঘোষ হেসে উত্তর দেয়, দেখবেন কি খেলা দেখাই, নাটকের নাম দিয়েছেন 'নূতন যুগের ভোরে', আলোকসম্পাতেও দেখবেন নতুন যুগের সূচনা করব এই রুবী থিয়েটারে।

হৃষীকেশবাবু তখনও নাক কোঁচকান : কিন্তু খরচ যে অনেক।

তা একটু হবে বইকি। তবে নাটক চললে এক মাসে উঠে যাবে—বলেন তো প্রথম মাসটা আমি নিজের আলো নিয়েই চালিয়ে দেব, ভাড়া হিসেবে যা হয় দেবেন, তারপর নাটক ধরলে নিজেরা কিনে নেবেন।

পাকা ব্যবসাদারের মত কথাটি বলে অলক ঘোষ তীক্ষ্ণ চোখে হৃষীবাবুকে লক্ষ্য করে। যা ভেবেছিল তাই, ওষুধ ঠিকই ধরেছে। হৃষীবাবু কানের মধ্যে পালক চালিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ধরে সুড়সুড়ি দিয়ে সুরজিৎকে বললেন, আপনার বন্ধু এ কথাটি মন্দ বলেন নি, ওঁর প্রস্তাবে আমি রাজী আছি।

সুরজিৎ আশ্বস্ত হয়ে বলে, ওর নামটা কিন্তু বিজ্ঞাপনে দিতে হবে।

হৃষীবাবু জোর দিয়ে বলেন, নিশ্চয় দেব। কাল থেকেই যাতে কাগজে অলকবাবুর নাম ছাপা হয় আমি তার ব্যবস্থা করছি।

হৃষীবাবুর কথার নড়চড় হয় নি। পরদিন থেকে রুবী থিয়েটারের নতুন নাটকের বিজ্ঞাপনে নাট্যকার-পরিচালক সুরজিৎ সেনগুপ্তের সঙ্গে আলোকসম্পাতে অলক ঘোষের নামও ছাপা হয়েছে। শুধু যে নামই একত্রে ছাপা হল তা নয়, এর পর থেকে প্রায়ই এদের দুজনকে একসঙ্গে দেখা যেত রুবী থিয়েটারে, কফিহাউসে কিংবা সুরজিৎদের বাড়িতে। অলক ঘোষের পক্ষে আর একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সহজ, কারণ নিজের মতামতকে সে কখনও নির্ভুল বলে আঁকড়ে বসে থাকতে চায় না। নিজের রুচিমত সুরজিৎকে নানারকম পরামর্শ দেয় শুধু আলোকসম্পাতেই নয়, অভিনয় নাটক দৃশ্যসজ্জা সব বিষয়ে। সুরজিৎ তার কথামত কাজ করলে খুশী হয়, কিন্তু না করলে রাগ করে না—এইটেই তার বৈশিষ্ট্য।

একটা কাজের মধ্যে দিয়ে আলাপ বলেই বোধ হয় তারা এতখানি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পেরেছে—যা দেখলে কেউ বুঝতে পারে না তাদের পরিচয় অতি অল্প দিনের। পরকে আপন করে নেবার ক্ষমতা এক একজনের থাকে, অলকের তা আছে খুব বেশী মাত্রায়। সেইজন্যে সুরজিতের বাড়িতে সকলের সঙ্গে সে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। সুরজিৎ বাড়িতে না থাকলেও অলক এখন নিঃসঙ্কোচে মাধবী এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে গল্প করে।

সেদিন হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় উঠল। কদিন চাপা গরমের পর এ ঝড়কে সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানাল সকলেই। দরজা জানলা সব বন্ধ করে মাধবী সবেমাত্র নীচে নেমে এসেছে এমন সময় কে দরজায় ধাক্কা মারল। হয়তো সুরজিৎ ফিরে এসেছে ভেবে তাড়াতাড়ি মাধবী দরজা খোলে।

সুরজিৎ নয়—অলক ঘোষ। একগাদা কাগজপত্র নিয়ে ঝড়ের মতই ঘরে ঢুকে পড়ে। বলে, উঃ কি বিশ্রী ঝড়, দরজাটা বন্ধ করে দিন।

মাধবী ছিটকিনি আটকে দিতে দিতে বলে, আমি ভেবেছিলাম দাদা ফিরল।

অলক ঘোষ গা হাত পা থেকে ধুলো ঝাড়ছিল। চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, সেকি, সুরজিৎবাবু বাড়ি নেই ?

কই এখনও ফেরে নি তো। সেই সকালবেলা থিয়েটারে গেছে।

অলক হাতের ফাইলগুলো নাড়াচাড়া করে : আশ্চর্য, আমাকে যে বললেন পাঁচটার সময় এখানে আসতে ! ঝড়ের জন্যে আমার আসতে দেরি হয়ে গেল।

তা হলে হয়তো দাদা কোথাও আটকে গেছে। বলেছে যখন ও নিশ্চয় আসবে, আপনি বসুন।

অলক হেসে বলে, বসব তো নিশ্চয়, এই ঝড় মাথায় করে তো আর বেরিয়ে যেতে পারব না। তা ছাড়া ওঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে, জরুরী দরকার। যদি এখানে দেখা না হয় ছুটতে হবে রুবী থিয়েটারে।

একটু অপেক্ষা করুন, আমি মাকে বলে আসি আপনি এসেছেন।

মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অলক পকেট থেকে কলম বার করে কাগজের ওপর আঁক কাটে। সারা রাস্তা আসতে আসতে সে ভেবেছে সুরজিতের এই নতুন নাটকে কোন ঝড়ের দৃশ্যের অবতারণা করা যায় কি না। প্রথম অবসর পেয়েই ছক কেটে বোঝবার চেষ্টা করে। মঞ্চের কোথায় কি ধরনের আলো দিলে ঝড়ের সৃষ্টি করা সম্ভব।

এইভাবেই তার মাথায় এক একটা খেয়াল চাপে। বাসে করে ময়দান পেরিয়ে আসবার সময় আজ সে লক্ষ্য করেছে, পশ্চিমাকাশের কালো মেঘের ঘনঘটা। চারদিক অন্ধকার করে উঠল ধুলোর ঝড়, ফাঁকা মাঠের ওপর সে কী ধুলোর ঘূর্ণী। অন্য সবাই যখন ঝড়ের ভয়ে বাসের জানলা বন্ধ করতে ব্যস্ত, অলক তখন বাসের সিঁড়ির কাছে বেরিয়ে এসে দু চোখ ভরে দেখেছে ঝড়ের রুদ্র মূর্তি, মনে জেগেছে তার উল্লাস, নতুন কিছু সৃষ্টি করার আগে বুকের ভিতরটা কেমন যেন অজানা আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে।

পদ্মাবতী ঘরে ঢুকে দেখেন অলক তন্ময় হয়ে কাগজে ছবি আঁকছে। হেসে প্রশ্ন করলেন, কাজ করছ?

পদ্মাবতীকে দেখে অলক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। হেসে বলে, না, মাথায় এক পাগলামি চেপেছে তাই দেখছি কিছু করা যায় কিনা।

দাঁড়ালে কেন, বস। শুনি কি পাগলামি তোমার?

অলক কাগজে আঁকা নকশাটা টেবিলের ওপর মেলে ধরে: ভাবছি এই কালবোশেখীর ঝড়টা স্টেজের ওপর দেখানো সম্ভব কি না।

পদ্মাবতী পুরনো যুগের কথা ভাববার চেষ্টা করেন: আগেও যেন দেখেছি মনে হচ্ছে কোনও থিয়েটারে ঝড় উঠল, খুব বৃষ্টি।

অলক ঘোষ হেসে বলে, সেসব জানলার পেছনে তো, আমি খুব জানি। তবে ও জিনিস চাইছি না। আমি দেখাতে চাই প্রচণ্ড ঝড়, দেখাতে চাই মঞ্চের ওপর ধুলোর ঘূর্ণী—যা দেখে দর্শকরা ভয় পাবে, শিউরে উঠবে, নাকেমুখে কাপড় চাপা দেবে।

বলতে বলতে অলক ঘোষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, এ যদি করতে পারি, 'নূতন যুগের ভোরে' একেবারে 'হিট' হয়ে যাবে, কিন্তু—

মাধবী চা-জলখাবারের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল, অলকের হাত পা নাড়া দেখে না হেসে পারে না। বলে, কি হল, অভিনয় করছেন বুঝি?

মাধবীর কথা বলার ধরনে অলক হেসে ফেলে। পদ্মাবতী ট্রে থেকে কাপডিসগুলো নামিয়ে টেবিলের ওপর সাজিয়ে দেন: অলক ভাবছে একটা ঝড়—

মাধবী থামিয়ে দেয়, আমি সব শুনতে পেয়েছি, বলতে নেই গলাটা ওঁর বেশ থিয়েটারে অ্যাকটিং করার মত। শেষ রো পর্যন্ত দর্শক শুনতে পাবে।

অলক সজোরে হেসে বলে, আপনাদের ভাইবোনের কথা বলার ধরনটা এক রকমের। বেশ হিউমার আছে। তবে কি জানেন একটু মুশকিল আছে।

কিসের মুশকিল?

অলক চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে, মুশকিল আপনার দাদাকে নিয়ে। জানেন মাসীমা, আপনার ছেলের সব ভাল, কিন্তু বড় একগুঁয়ে। একবার যদি বেঁকে বসে কিছুতেই ঝড় তুলতে দেবে না।

তা হলে কি করবেন?

খুব ভাবনার কথা। থিয়েটারে নাম দিয়েছে শায়েস্তা খাঁ।

শুনেই মাধবী খিলখিল করে হেসে ওঠে: তাই নাকি, দাদা তো কই আমায় বলে নি!

অলক ঘোষ ভয় পায়: দেখবেন, আমি বলেছি আবার

বলবেন না। তা হলে আর ঝড়ের কোন চান্স থাকবে না।—একটু থেমে বলে, আমি কি ভাবি জানেন মাসীমা, লোকে কেন আমার মত হয় না।

মাধবী সকৌতুকে প্রশ্ন করে, তা হলে কি হত ?

কোন গণ্ডগোলই থাকত না। আমি হলাম কি রকম জানেন—অনেকটা মেয়েদের মত অর্থাৎ তরল পদার্থ। যে পাত্রে রাখবেন তারই আকার পাব।

দেখছ মা, অলকবাবু আমাদের ঠুকে কথা বলছেন।

অলক চট্ করে উত্তর দেয়, যদি ঠোকবার ইচ্ছে থাকত, নিশ্চয় নিজেকে জড়িয়ে কথা বলতাম না।

এদের কথাবার্তা শুনে পদ্মাবতী হাসেন : তোমার জন্যে আরও একটু চা নিয়ে আসি অলক।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে কিন্তু, আর এক কাপ গরম চা পেলে মন্দ হয় না মাসীমা।

মাধবী চা আনবার জন্যে উঠতে যাচ্ছিল, পদ্মাবতী বাধা দিয়ে বললেন, তোমরা বসে গল্প কর, আমি চা করে আনছি।

পদ্মাবতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তখনও দুর্গাশঙ্করের চোখ থেকে ঘুম যায় নি। বিছানায় শুয়ে শুয়েই এপাশ ওপাশ ফিরছেন, ঘরে পাখা নেই, বেশ গরম। কোঁচার খুঁটটা নিয়ে বুক পিঠের ঘাম মুছে ফেলেন, কানে যায় বাইরে তুমুল ঝগড়া চলছে।

মন্দিরার গলা, খন্‌খনে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর : আমাকে আর নিয়ম শেখাতে এস না, বাড়িটাকে তো আঁস্তাকুড় করে ছেড়েছ, তার ওপর যতসব লম্বা-চওড়া কথা। থাকত আজ মা বেঁচে, গলাধাক্কা দিয়ে তোমাদের বিদেয় করত।

সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে তীব্র আক্রমণ হয়—মন্দিরার দিদি গিরিবালা চিৎকার করে বলে, আমাকে রাগাস না বলছি মনো, যদি একবার মুখ ছোটাই তা হলে আর থামাতে পারবি না। বয়েস আছে তাই থিয়েটারে পার্ট পাচ্ছিস, তার জন্যে অত মেজাজ কিসের ? আমাদেরও একদিন ছিল। শেষবেশ দেখব, কিসের রোজগারে হাঁড়ি চড়ে। জামাই পুষে ভদ্রলোক হয়েছেন।

এ ঝগড়া নতুন নয়, প্রায়ই লেগে থাকে। যে কোন অছিলায় গিরিবালা ঝগড়া বাধায়, পাড়া মাথায় করে মন্দিরার পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করে। ভাবতেও দুর্গাশঙ্করের আশ্চর্য লাগে, করুণাময়ীর মেয়ে কি করে এতটা নীচে নেমে গেল। পয়সার অভাবই কি এর একমাত্র কারণ, না মন্দিরার ওপর হিংসে।

নীচে মন্দিরা থেমে গেছে, কিন্তু তখনও গিরিবালার গলা ভেসে আসে, বলি ওই মোদো-মাতালটাকে যে বাড়িতে রেখেছ, বুঝলাম না হয় তোর বাপ, কিন্তু আমার ছেলেমেয়েগুলো কি শিক্ষে পাবে শুনি। একটু বয়েস হলেই তো গিয়ে শুঁড়ীর দোকানে ঢুকবে।

এ গালমন্দও প্রায় দুর্গাশঙ্করকে রোজ শুনতে হয়, অথচ একদিন ওই গিরিবালা আর তার ভাইকে নিজের ছেলেমেয়ের মত করে তিনি মানুষ করেছেন। জ্ঞানতঃ মন্দিরার সঙ্গে কোনদিন তাদের পার্থক্য করেন নি, কিন্তু আজ! মন্দিরাই তাঁকে শুধু বাবা বলে স্বীকার করে, আর সকলের তিনি শত্রু। এক একসময় তাঁর নিজের ওপর বড় রাগ হয়, কেন রোজগারের কোন চেষ্টা না করে এই বাড়িতে এসে উঠলেন অন্যের গলগ্রহ হয়ে। অথচ এখন শরীরটাও ভেঙে পড়েছে, কাজ পেলেও বোধ হয় করতে পারবেন না। তার ওপর মৌতাত—কেমন যেন সারাদিনটাই আচ্ছন্ন করে রাখে। যতক্ষণ না বেহুঁশ হয়ে পড়েন ততক্ষণ আর শান্তি নেই।

একটু পরে মনে হল বাইরের আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়েছে। অন্ততঃ কারুর গলা শোনা যাচ্ছে না।

দুর্গাশঙ্কর আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে চারদিক দেখে নিয়ে দাওয়ায় বসে বালতি থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে বারকয়েক কুলকুচো করে মুখটা ধুয়ে ফেললেন।

মন্দিরার পাঁচ বছরের ফুটফুটে মেয়েটা দাদুর কাছে এসে গলা জড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, দাদু চা খাবে ?

নাতনীকে দেখে দুর্গাশঙ্কর খুশী হয়ে হাসেন, তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে প্রশ্ন করেন, কে জিজ্ঞেস করল।

খুকু দাদুর পৈতেটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে উত্তর দেয়, গোবিন্দর মা।

মা কোথায় রে?

চান করতে গেছে।

আচ্ছা চাটা দিতে বল্।

খুকু চলে গেলে দুর্গাশঙ্কর দাওয়াতে বসে বসেই চারদিকটা ভাল করে দেখেন। সত্যি, এক বছরের মধ্যে বাড়িটার কী অবস্থাই না হয়েছে। তবু যা হোক মন্দিরা একতলাটা সাধ্যমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে, কিন্তু ওপরের তলাগুলো এখনি মিস্ত্রী লাগানো দরকার। দেয়ালে দু তিন জায়গায় ফাট ধরেছে, বহুদিন রঙ না পড়ে জানলা-দরজার কাঠগুলোও ছাতাপড়া দেখায়। কিন্তু করবে কে? যেমন গিরিবালা তেমনই তার ভাই। না আছে তাদের ইচ্ছে, না আছে সামর্থ্য। করুণাময়ীর সময়ে এ বাড়ির বোলবোলার কথা মনে পড়লে দুর্গাশঙ্করের দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

কাল রাত্রে বোধ হয় বেশী কিছু খাওয়া হয় নি, বেশ খিদে পেয়েছে। ঘরে ঢুকে পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে দু আনা পয়সা নিয়ে বেরিয়ে এলেন একেবারে বাড়ির বাইরে। সামনের দোকানে গরম তেলেভাজা ভাজছে, পাতার ঠোঙায় খানকয়েক গরম বেগুনি নিয়ে আবার বাড়িতে ঢুকলেন। খুকুকে তেলেভাজা দিলে মন্দিরা রাগ করে, তাই নিজেই বসে বসে খেতে শুরু করলেন।

এমন সময় সুরজিৎ এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। দুর্গাশঙ্কর দেখেও যেন দেখলেন না।

সুরজিৎ তাঁকেই জিজ্ঞেস করে, এটা কি মন্দিরা দেবীর বাড়ি?

দুর্গাশঙ্কর গরম তেলেভাজা মুখে পুরে কোনরকমে সামলাতে সামলাতে বলেন, পুরো বাড়িটা নয়, এই একতলাটা।

সুরজিৎ ঠিক বুঝতে পারল না, আবার প্রশ্ন করে, উনি বাড়িতে আছেন?

চান করছে।

আমার এই সময় আসবার কথা ছিল।

অন্যমনস্ক দুর্গাশঙ্কর উত্তর দিলেন, ভাল।

সুরজিৎ ভেবে পেল না এখন সে কী করবে। ভদ্রলোক ভেতরে যেতেও বললেন না, তবে কি সে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

কিন্তু বেশীক্ষণ এ ভাবে দাঁড়াতে হল না, গোবিন্দর মা দুর্গাশঙ্করকে চা দিতে এসে বাইরে সুরজিৎকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল। মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে বলল, আপনি দিদিমণিকে খুঁজছেন তো বাবু, ভেতরে আসুন। উনি এখনই আসছেন।

গোবিন্দর মা দুর্গাশঙ্করের কাছেই একটা মোড়া পেতে দিয়ে সুরজিৎকে বসতে বলে ভেতরে চলে গেল।

দুর্গাশঙ্কর বেশ ভাল করে সুরজিতের আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। কি মনে হতে তেলেভাজার ঠোঙাটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, খাবেন নাকি?

সুরজিৎ ছোট্ট উত্তর দিল, না।

গরম তেলেভাজা। অতি উপাদেয়।

আপনি খান।

একটু চুপ করে থেকে দুর্গাশঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করেন, তেলীপাড়ার ঘুগনি খেয়েছেন?

প্রশ্ন শুনে সুরজিৎ বেশ মজা পায়। বলে, না।

তবে তো কিছুই খান নি। অবশ্য বয়েসই বাকি, খাবার সময় এখনও যায় নি।

ইতিমধ্যে গোবিন্দর মা চা দিয়ে গেল, ইচ্ছে না থাকলেও সুরজিৎ না বলতে পারল না। কাপটা হাতে নিয়ে বুঝল চা একেবারে ঠাণ্ডা।

দুর্গাশঙ্কর তেলেভাজা শেষ করে জল দিয়ে হাতটা ধুয়ে কোঁচায় মুছে ফেলেন: আপনি বুঝি স্টুডিওর লোক?

আজ্ঞে না।

তবে কি অ্যামেচারে থিয়েটার করেন?

সুরজিৎ হেসে বলে, আগে তাই করতাম, তবে এখন রুবী থিয়েটারে যোগ দিয়েছি।

দুর্গাশঙ্কর বিরাট একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলেন, যোগ দিয়েছেন বেশ করেছেন, কিন্তু কখনও পাবলিক থিয়েটারে অ্যাপ্রেনটিশ আর্টিস্ট হবেন না। তা হলেই সর্বনাশ, কোনদিন আর অ্যাক্টর হতে হবে না।

আপনার রূপ লাবণ্য
আপনারই হাতে !
মুখশ্রীকে অকারণ রোদে—ধুলোয় কালো
বা নষ্ট হতে দেন কেন? চেহারার লাবণ্যতা রক্ষার
ভার হিমালয় বুকে স্নোর ওপরই ছেড়ে দিন—
তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু খানি
হিমালয় বুকে স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কান্তি
ধীরে ধীরে আবার কেমন ফিরে আসছে !
ক্লান্ত শুষ্ক ত্বক সজীব হয়ে উঠছে !
হিমালয় বুকে স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ
বা দাগ পড়তে দেবে না। নিজের চেহারায়
দেখুন··· লাবণ্যতা এনে ধরেছে···
হিমালয় বুকে স্নো !
Erasmic
হিমালয় বুকে স্নো
HIMALAYA BOUQUET SNOW
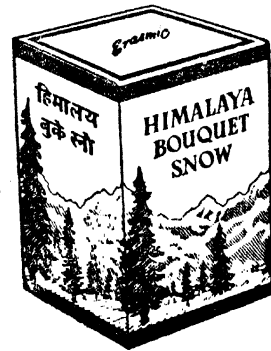
সুরজিতের শুনতে ভালই লাগছিল। তাই কথাটা চালু রাখার জন্য প্রশ্ন করে, কেন বলুন তো ?

আজকাল শুনি অ্যাপ্রেনটিশরা প্রথম থেকেই পাঁচ-সাত টাকা হাতখরচ পায়, কিন্তু আগেকার দিনে তাও ছিল না। তখন অ্যাপ্রেনটিশ আর্টিস্ট হওয়া মানে পাঁচ-সাত বছর ভূতের ব্যাগার খাটা। বড় আর্টিস্টদের ফাই-ফরমাশ খাটবে, রাস্তায় হ্যাণ্ডবিল বিলি করবে, ম্যানেজারের কলকে বদলে দেবে, এইসব হল আসল কাজ। স্টেজে মাঝে মাঝে নামতে পেলেও কথা বলতে পাবে না। বছর দুই এমনই খেটেই সব পালিয়ে যেত, যারা টিকে থাকত অন্ততঃ বছর পাঁচেক, মাইনে হত পাঁচ টাকা।

তবে আর লোকে অ্যাপ্রেনটিশ হত কেন ?

দুর্গাশঙ্কর অভিজ্ঞের মত হাসেন : নেশা মশাই, থিয়েটারের নেশা। একবার ঢুকলে আর কেউ বেরুতে পারে না। তবে তখনকার দিনে একটা সুবিধে ছিল। যদি কোন ছোঁড়ার চেহারা ভাল হত, কোন নামকরা অ্যাকট্রেসের নজরে পড়ে গেলে তার পোয়া বারো। খুঁটির জোরে ভেড়া লড়ত।

ঠিক এমনি সময় সেজেগুজে এসে মন্দিরা হাত তুলে নমস্কার করে : মাপ করবেন, আপনাকে মিছিমিছি বসিয়ে রেখেছি।

সুরজিৎ ভদ্রতা করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, না, আমিও এখুনি এসেছি। ওঁর সঙ্গে বসে বেশ গল্প করছিলাম।

মন্দিরা আলাপ করিয়ে দেয় : আমার বাবা।

সুরজিৎ নমস্কার করে বলে, সে আমি আগেই বুঝতে পেরেছি।

দুর্গাশঙ্কর মন্দিরার দিকে তাকান : আমি তো ঠিক এঁকে চিনতে পারলাম না।

মন্দিরা বিরক্ত হয়ে বলে, আহা সুরজিৎবাবু— আমাদের থিয়েটারের নাট্যকার, পরিচালক।

দুর্গাশঙ্কর একগাল হেসে ফেলেন : আরে আপনি তো তা হলে মহাশয় ব্যক্তি, আগে থেকে বলতে হয়। আমি তো ভাবছিলাম কোন অ্যাপ্রেনটিশ আর্টিস্ট।

মন্দিরা অধৈর্য হয়ে পড়ে : না বাবা, তোমাকে নিয়ে আর সত্যি পারা যাবে না। কতদিন থেকে বলে রেখেছি, সুরজিৎবাবু আসবেন, তুমি ওঁকে গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাবে।

দুর্গাশঙ্কর লজ্জিত হয়ে পড়েন : সত্যি মনো, আজকাল যে আমার কী হয়েছে, কোন কথাটা মনে থাকে না। তা হলে বলুন সুরজিৎবাবু, কবে যাবেন ?

আমি তো আজকেই যাবার জন্যে এসেছিলাম।

তাই নাকি !—দুর্গাশঙ্কর উঠে দাঁড়ান, আমি এখুনি তৈরি হয়ে আসছি।

দুর্গাশঙ্কর চলে গেলে মন্দিরা মাথা নাড়তে নাড়তে নিজের মনে বলে, বাবা যেন হঠাৎ বড় বুড়ো হয়ে পড়েছেন।

ওঁর মুখে পুরনো দিনের থিয়েটারের কথা শুনতে খুব ভাল লাগছিল।

দেখবেন, সাবধান। একবার শুরু করলে আর থামতে চান না।

সুরজিৎ পকেট থেকে রুমাল বার করতে গিয়ে একটা কাগজ হাতে ঠেকায় আগে সেইটাই বার করে আনে। অলকের আঁকা ঝড়ের লাইটিং প্লট। বলে, আর কিছু না হোক, 'নূতন যুগের ভোরে' লাইটিংয়ের জন্যে নাম করবে।

কি রকম ?

অলকের মাথায় ঢুকেছে শেষ দৃশ্যের আগে একটা কালবৈশাখীর ঝড় দেখাবে স্টেজের ওপর। ঠিকমত হলে খুব হৈচৈ পড়ে যাবে, নাটকও জমবে খুব। প্রচণ্ড ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল জীর্ণ পুরাতনকে, তারপর এল নতুন প্রভাত।

মন্দিরার চোখ আনন্দে জ্বলে ওঠে : সত্যি, খুব সুন্দর ভেবেছেন।

সুরজিৎ সেই কথা ভাবতে ভাবতেই বলে, আর যদি কটা দিন সময় পেতাম ! এ যেন শিয়রে সংক্রান্তি ৮ সেট, লাইটিং, তার ওপর অভিনয়, অতগুলো চরিত্র—

মন্দিরা মুচকি হাসে : আর কাউকে নিয়ে আপনার

ভাবতে হবে না, আপনাদের নায়িকার ওপরে একটু নজর দেবেন।

সুরজিৎ বিস্মিত হয়, কে! সুচরিতা বোস?

হ্যাঁ। ছবিতে নাম আছে ঠিক কথা, কিন্তু এটা তো পর্দা নয়, মঞ্চ। পরিচালক হিসেবে সেটা বোধ হয় আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার।

এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা আর গেল না। দুর্গাশঙ্কর হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন: আর দেরি করব না, চলুন। বেলা বেড়ে গেলে রোদের তাত অসহ্য হয়ে উঠবে।

মন্দিরার কাছে বিদায় নিয়ে সুরজিৎ দুর্গাশঙ্করের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে।

নটগুরু অনিমেষচন্দ্র এখন অতি বৃদ্ধ, বয়সের কোঠা সত্তর পেরিয়ে গেছে। বছর দশেক আগেও তিনি রীতিমত সাধারণ রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, অভিনয় করেছেন নাটকের নাম ভূমিকায়। কিন্তু তারপর তাঁকে অবসর নিতে হয়েছে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই একরকম।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের যখন সবচেয়ে বড় দুঃসময় সেই সময় অনিমেষচন্দ্র নাট্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল দুজনেই তখন ইহজগতের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। সেযুগের বড় বড় নাট্যরথীরা প্রায় সকলেই অস্তগামী। মুমূর্ষু নাট্যমঞ্চ। কয়েকজন ধনী জমিদারের খামখেয়ালীর ফলে নতুন নতুন থিয়েটারের জন্ম হলেও, কোনটিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। অত্যন্ত স্বল্পায়ু তাদের।

ঠিক সেই সময় অনিমেষচন্দ্র এলেন নতুন যুগের বার্তা নিয়ে। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপরিসীম জ্ঞান, ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নাট্যজগতে এল নতুন জোয়ার, নতুন ভাবধারা।

অনিমেষচন্দ্র কিন্তু পুরনো যুগকে অগ্রাহ্য করলেন না। উদ্ধত নবীনের মত ধুয়ে মুছে শেষ করে দিলেন না তার অস্তিত্ব। বরং পুরনো নাটকের যথাযথ সংস্কার করে আবার তাদের ফিরিয়ে আনলেন দর্শকদের সামনে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের মাধ্যমে। জয়জয়কার পড়ে গেল চারদিকে। শুরু হল তাঁর নাট্যজীবনের দিগ্বিজয়।

তারপরের ইতিহাসে কোন বৈচিত্র্য নেই। খ্যাতির শিখরে উঠলেন অনিমেষচন্দ্র। বাঙ্গালী তাঁকে মাথায় করে নাচল, নটগুরু উপাধি দিল, যে নাটকই তিনি মঞ্চস্থ করলেন তাই নিয়ে মাতামাতি করে বেড়াল। কিন্তু তারপর যা হয়ে থাকে তাই হল। এ দেশের বহু প্রথিতযশা শিল্পীর ভাগ্যে যা ঘটেছে অনিমেষচন্দ্রের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হল না। জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি প্রাণপণ করে খেটে যে দর্শকসমাজকে তিনি এতদিন আনন্দ দিয়ে এসেছেন, তারাই প্রৌঢ় অনিমেষচন্দ্রের থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ করল। ব্যবসা অচল হয়ে পড়ল, চারদিকে দেখা দিল পাওনাদার। নিঃস্ব অনিমেষচন্দ্র অপমানে লজ্জায় মলিন হয়ে বেরিয়ে এলেন রঙ্গমঞ্চ থেকে। আশ্রয় নিলেন বেহালার পৈতৃক ভাঙা বাড়িতে।

যেদিন তাঁর অতি সাধের 'মঞ্চশ্রী' থিয়েটার পাওনাদারদের হাতে তুলে দিয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় বেরিয়ে এলেন, সেদিনের কথা প্রত্যক্ষদর্শীরা কেউ বর্ণনা করতে পারে না, চোখে তাদের জল এসে পড়ে। শেষজীবনে অনিমেষচন্দ্র 'মঞ্চশ্রী'র পিছন দিকের একটি ঘরে বাস করতেন। বিদায়ের দিন সকাল থেকে লুঙ্গি পরে, হাতে একটা চুরুট ধরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সারা থিয়েটারে। মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে দেখলেন সারি সারি খালি চেয়ার। প্রত্যেকটি চেয়ারই যেন তাঁর অতিপরিচিত, কত সহস্র দর্শক ওই চেয়ারে বসে তাঁর অসাধারণ অভিনয় দেখে আনন্দে অধীর হয়ে কলরব করতে করতে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে গেছে। মঞ্চের উপর জমা রয়েছে বিভিন্ন নাটকের কত সেট, কত সীন। কত রাত জেগে তিনি শিল্পীকে দিয়ে এই সব কাজ করিয়েছিলেন। স্তূপীকৃত আসবাবপত্র। শাজাহানের ময়ূর সিংহাসনের পাশেই পড়ে রয়েছে হালফ্যাশানের সোফাসেট, কে বা তার খবর রাখছে।

অনিমেষচন্দ্রের চোখে জল আসে, বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। প্রত্যেকটি সাজঘরে ঢুকে চারদিকটা ভাল করে দেখেন। কত রাতই না কেটেছে এইসব ঘরে। কত

সুরজিৎ মনে মনে ভেবে এসেছিল নটগুরুর সঙ্গে অনেক কথা নিয়ে আলোচনা করবে, কিন্তু কোন কথাই ওর জিজ্ঞেস করা হল না। বৃদ্ধের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেকে বড় ছোট মনে হল। উঠে আসবার সময় তাঁর পায়ের ওপর মাথা রেখে ভক্তিসহকারে প্রণাম করল সুরজিৎ।

নটগুরু তার মাথায় হাত দিয়ে বিড়বিড় করে ইংরেজীতে বললেন, গড ব্লেস ইউ মাই বয়।

এ কদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম করে সকলেরই মনে হয়েছিল নাটক ক্রমশঃ বেশ দানা বেঁধে উঠছে। খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের অভিনয় অনেককেই মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু প্রথম যেদিন স্টেজ-রিহার্সালের সময় আলো সেট ও যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে মিলিয়ে পুরো নাটকটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনয় করা হল সেদিন কিন্তু অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছে এ নাটক দর্শকরা নেবে কি না। সবচেয়ে বেশী হতাশ হয়েছে সুরজিৎ। রিহার্সাল শেষ হয়ে যাবার পর একে একে সবাই চলে গেলে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের পিছনের দিকের একটা সীটে চুপচাপ বসে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদে অলক ঘোষ এসে বসল তার পাশে, এতক্ষণ সুরজিৎকেই সে খুঁজছিল। কোথাও না পেয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছে। আস্তে জিজ্ঞেস করে, কি ভাবছেন?

সুরজিৎ শুকনো গলায় উত্তর দেয়, সবটাই পণ্ডশ্রম হয়ে গেল।

মোটামুটি কিন্তু আমার বেশ ভাল লাগছে, হৃষীবাবুও বলছিলেন।

সুরজিৎ মৃদু হাসে: কে কি বলছিল জেনে আমার কোন লাভ নেই। নিজে তো বুঝতে পেরেছি, কিছুই হয় নি। এতটা গোঁয়াতুর্মি না করলে বোধ হয় ভাল করতাম। যদি নাটক না চলে, এই নবনাট্য আন্দোলন কতখানি পেছিয়ে যাবে।

অলক ঘোষ সুরজিৎকে উৎসাহিত করার জন্য জোর দিয়ে বলে, মোটেই তা হবে না, আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। এখনও আমার লাইটের কাজ কিছুই হয় নি। আপনি হৃষীবাবুকে বলে ব্যবস্থা করে দিন, আমি সারারাত লাইটের রিহার্সাল করব। এ বোর্ডের মিস্ত্রীদের আমাকে শেখাতে হবে, বিশেষ করে দেখুন না ওই ঝড়ের জায়গাটা—একেবারে ক্লাইম্যাক্সে তুলতে পারল না। আজ আমি আলোর দিকের কাজ পুরো শেষ করে দেব।

সুরজিৎ খুব যে ভরসা পায় বলে মনে হয় না। বলে, পরশু তো উদ্বোধন রজনী।

তাতে কি হয়েছে, কালকে আর একটা ফুল রিহার্সাল আমরা পাচ্ছি, দরকার হলে কাল রাত্রেও আমি আলোর কাজ করব।

সে রাত্রে রুবী থিয়েটারের সিফটাররা কেউ ঘুমোতে পারল না। সমস্ত রাত্রি অলক ঘোষ তাদের দিয়ে সীনের পর সীন আলোর কাজ করিয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে থেকে রাত্রি দেখাতে কম বেশী আলোর যে কারসাজি, তা বারবার করে করিয়ে মিস্ত্রীদের মনে গেঁথে দিয়েছে—বিশেষ করে ঝড়ের দৃশ্যের রিহার্সাল হয়েছে কম করে তিন ঘণ্টা। শেষ পর্যন্ত এলে গিয়ে মিস্ত্রীদের মুখপাত্র হিসেবে বিপিন বলে ফেলে, আর আমাদের দেখাতে হবে না অলকবাবু, কাল দেখবেন সত্যিকারের ঝড় বইয়ে দিতে পারি কিনা।

সুরজিৎও রাত্রে বাড়ি ফেরে নি, অলকের সঙ্গে বসে বসে আলোর রিহার্সাল দেখেছে। শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা করে দেখবে নাটককে জমাটি করা যায় কিনা।

মন্দিরাও এসেছিল একবার খোঁজখবর নিতে। রাত তখন প্রায় বারোটা। অলক স্টেজের ওপর মিস্ত্রী নিয়ে ব্যস্ত। সে এসে সুরজিতের পাশে বসে পড়ে। বলে, পারেনও বটে, এতক্ষণ রিহার্সাল দিয়ে এখন আবার আলো দেখা।

সুরজিৎ চেয়ারের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বসেছিল, মন্দিরাকে দেখে উঠে সোজা হয়ে বসে: এত রাত্রে যে?

মন্দিরা হাসতে হাসতে বলে, আমারও কি মরবার

সময় আছে। এখানে আপনার কাছে রিহার্সাল দিয়ে কাছেই গিয়েছিলাম মসজিদবাড়ী স্ট্রীটে। পাড়ারই একটা ক্লাব, সেখানে তিন সীন 'সরমার' রিহার্সাল দিয়ে এলাম। এ পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছি, দেখলাম থিয়েটারে আলো জ্বলছে, তাই ঢুকে পড়লাম।

সুরজিৎ পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়। প্রশ্ন করে, ফুল রিহার্সাল দেখে কিরকম মনে হল?

দু-চারদিনের মধ্যেই নাটক জমে যাবে।

পরশু তো শুরু।

মন্দিরা সুরজিতের দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমি করে হাসে: আপনি এখনও অ্যামেচারদের মত কথা বলছেন। শুরু হবে তো কি হয়েছে? দু-চারদিন পরেই সকলের পার্ট রপ্ত হয়ে গেলে দেখবেন নাটক দিব্যি জমে যাবে।

সুরজিৎ একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে: কি জানি, খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছি না।

বই খোলবার আগে ওইরকমই মনে হয়। এখন দোষগুণ কিছুই বোঝা মুশকিল। প্রথম রাত্রে দর্শক দেখার পর তাদের হাসিকান্না শুনে তবে আপনি নাটকের ছাটকাট করতে পারবেন। তবে এটুকু বলে দিচ্ছি, এই এক নাটকে আপনার নাম হয়ে যাবে।

সুরজিৎ মন্দিরার দিকে ফিরে তাকায়: কি করে বুঝলেন?

মন্দিরা আগের মতই বড় বড় চোখ দুটো তুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে সুরজিতের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলে, জানব না? আমি যে থিয়েটারের মেয়ে।

কথাটা সামান্য, কিন্তু সুরজিতের শুনতে ভাল লাগে।

পয়লা বৈশাখ। সকাল থেকে রুবী থিয়েটারে কাজের সমারোহ। নতুন নাটকের শুভ উদ্বোধন। রাস্তার ওপর নিয়নের আলো দেওয়া হয়েছে, ভেতরে গেট সাজানো হয়েছে ফুলপাতা দিয়ে। ঘরামী ধরিয়ে মেঝে সাফ করা হচ্ছে বিলিতী পালিশ দিয়ে। সীটগুলোও একদিনে অনেকটা পরিষ্কার করা হয়েছে, সকাল থেকে টিকিট-ঘরে দর্শকের আনাগোনা। বিক্রি বেশ ভালই। মনে হয় এ ভাবে চললে চারটের মধ্যেই 'হাউসফুল' বোর্ডটা টাঙাতে হবে বাইরে।

টিকিট-ঘরের লোকেরা সব খুশী। অনেকদিন বাদে তারা ব্যস্ত হবার সুযোগ পেয়েছে। সুধীবাবু মাঝে মাঝে ওপর থেকে নীচে তদারক করে বেড়াচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে রমেন চৌধুরী। সুধীবাবুর মুখ থেকে কথা বেরবার আগেই হাত পা নেড়ে হুকুম করছে অন্যদের। কারুর আজ বিশ্রাম নেবার সময় নেই।

সত্যি সত্যিই সন্ধ্যের আগে হাউসফুল হয়ে গেল। একে একে শিল্পীরা এসে জড়ো হল সাজঘরে। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় করার আনন্দের সঙ্গে প্রথম রজনীর ভয় মিশে প্রত্যেকের মনে এক বিচিত্র অনুভূতি। সকলেই আজ চুপচাপ, যে যার নিজের পার্ট নিয়ে ব্যস্ত, মুখে রঙ লাগাতে লাগাতেও বিশেষ সীনগুলো আর একবার করে দেখে নিচ্ছে।

সুরজিৎ ইচ্ছে করে এল দেরি করে। শিল্পীদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে শুভেচ্ছা জানাল। চারদিক ঘুরে দেখে নিল, সেট আলো সব ঠিকমত সাজিয়ে রাখা হয়েছে কিনা।

অলকের সঙ্গে দেখা হল আলো ফেলার মাচায়—স্পট লাইটে রঙিন কাগজ লাগাচ্ছে। সুরজিৎ তার পিঠে হাত রেখে বলল, উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক্।

অলক হেসে ফিরে তাকাল। সুরজিতের হাতটা ইংরিজী কায়দায় নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, সেম্ টু ইউ।

মন্দিরার সঙ্গে দেখা হল নাটক শুরু হবার দশ মিনিট আগে। সুরজিৎ তখন মঞ্চে আসবাবপত্রগুলো সাজিয়ে রাখছে। সেজেগুজে মন্দিরা এসে দাঁড়াল: দেখুন, সাজ ঠিক হয়েছে কিনা।—নিজেই সে চারদিকটা ঘুরে দেখাল। মন্দিরাকে দেখতে ভাল লাগল সুরজিতের, এতটা মানাবে সে আগে বুঝতে পারে নি। খুশী হয়ে বলে, আমি ঠিক এই রকমই চেয়েছিলাম।

মন্দিরা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল সুরজিৎকে। সুরজিৎ বাধা দিয়ে বলে, ওকি করছেন।

মন্দিরা হেসে উত্তর দেয়, মঞ্চের এই নিয়ম। যিনি পরিচালক তাঁকে প্রণাম করতে হয়। এর আগে প্রণাম করেছি পরমহংসদেবের ছবিকে। তারপর এই মঞ্চকে।—বলেই মন্দিরা আবার মঞ্চ থেকে ধুলো তুলে মাথায় ঠেকায়: এইখান থেকেই যে আমাদের রুটির রোজগার।

নাটক শুরু হতেই সুরজিৎ মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসে, দোতলার একটা বক্সে গিয়ে বসে থাকে। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা—তার নিজের লেখা নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হচ্ছে, সাগ্রহে দেখছে কত দর্শক। এক একবার তারা হাসছে, খুশী হয়ে হাততালি দিচ্ছে, আবার কখনও নাটকীয় করুণ মুহূর্তে বিষণ্ণ মনে চোখের জল ফেলছে। সুরজিৎ কিন্তু নাটক দেখতে পারে না, সে দেখছে শুধু দর্শকদের—তাদের মুখের হাসি বিরক্তি কান্না।

প্রথম অঙ্ক শেষ হতেই সে মিশে যায় ভিড়ের মধ্যে। চেষ্টা করে তাদের কথাবার্তা শুনতে, বুঝে ফেলতে তাদের অভিমত। পানওয়ালার দোকানের সামনে, পাশের গলিতে চতুর্দিকে সে কান খাড়া করে ঘুরে বেড়ায়। শুনতে পায় কেউ বলছে, রসময় ভাঁড়ামী করে জমিয়ে রেখেছে নাটক, কারুর মতে প্রদীপ মুখার্জীর অভিনয় অনবদ্য, কেউবা বাসুদেবের চেহারার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রথম অঙ্কের মধ্যেই মন্দিরার অভিনয় অনেকের মনে দাগ কেটেছে, নায়িকা সুচরিতা বসুর অনুরাগীর সংখ্যাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। চারদিকেই তার বিষয়ে আলোচনা।

দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হতে সুরজিৎ আর ওপরে গেল না। নীচে দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে, এককোণে। বোঝা গেল নাটক জমে উঠেছে বেশ, সকলেই শুনছে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে। কিন্তু হঠাৎ একজায়গায় বাসুদেব ভুল কথা বলায় দর্শকের মধ্যে থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল: ঘাড় ধরে বার করে দাও। শুধু রূপ দেখতে আসি নি, আমরা কথা শুনতে এসেছি।

অন্যেরা বুঝি বাধা দিতে গিয়েছিল: আ:, চুপ করুন মশাই।

সে ভদ্রলোক চিৎকার করে ওঠে: এটা প্রফেশ্যনাল থিয়েটার, যা-তা জিনিস দেখব কেন, টিকিটের পয়সা ফেরত দিন।

সুরজিৎ ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হল রমেন চৌধুরীর কথায়। সে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফিসফিস করে বলে, ও মশাই ভাড়াটে দর্শক, পয়সা দিয়ে পার্ল থিয়েটার পাঠিয়েছে, প্রথম কয়েক নাইট এরকম গোলমাল হবেই, ঘাবড়াবেন না, মনে হচ্ছে বই আপনার ধরে গেল।

বই যে সত্যিই ধরে গেছে তা বোঝা গেল ঝড়ের দৃশ্যে। বাহাদুরী আছে অলক ঘোষের। কদিন আগের সেই কালবোশেখীর ঝড় সে হুবহু বইয়ে দিল মঞ্চের ওপর। প্রথমটা দর্শকরা ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরে যখন হাততালি দেওয়া শুরু হল সে আর থামতে চায় না। আনন্দে সুরজিতের বুক ভরে ওঠে, তারপর আর কোনদিকে খেয়াল থাকে না। কখন যে নাটক শেষ হয়ে গেছে, কখন দর্শকরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে করতে তারই সামনে দিয়ে চলে গেছে, কিছুই সে দেখে নি। খেয়াল হল হৃষাবাবুর কথায়, আনন্দে উদ্ভাসিত প্রৌঢ় হৃষাবাবু সুরজিৎকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে: আমার থিয়েটারে কোন নাটকের প্রথম রজনী এত সাফল্যলাভ করে নি। ধন্য আপনি, ধন্য আপনার নাটক।

নিজের অজানতে সুরজিতের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

[ক্রমশ]
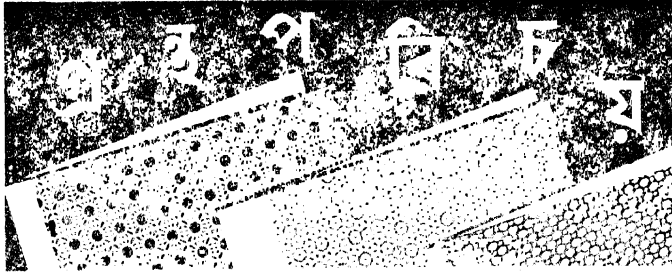
বিদ্যাসাগর-পরিচয়ঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭। দুই টাকা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মবহুল জীবনের বিস্তৃত বিবরণ বহু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—তাঁহার জীবনের নানাদিক লইয়া বিভিন্ন মনীষী আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তিকায় শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় সংক্ষেপে মনোজ্ঞভঙ্গীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশিষ্ট অবদানসমূহের পরিচয় দিয়াছেন। গল্পের মত করিয়া তিনি বিদ্যাসাগরের কৃতকার্যের বর্ণনা করিয়াছেন। পটভূমিকা হিসাবে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবকাল ও তাঁহার অব্যবহিতপূর্ব সময়ের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির দিগ্‌দর্শন বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। শিক্ষাসংস্কারে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা ও বাংলা শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই দুই প্রকার শিক্ষার পুনর্গঠন ব্যাপারেই বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনের প্রধান অংশ অতিবাহিত হয়। তাঁহার সাহিত্যসাধনা ইহার বিশিষ্ট অঙ্গ। 'সাহিত্য-সাধনায় বিদ্যাসাগর' শীর্ষক অধ্যায়ে তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 'শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগর' ও 'সমাজহিতে বিদ্যাসাগর' নামক দুইটি অধ্যায়ে বিদ্যাসাগরের জীবনের আর দুইটি প্রসিদ্ধ কর্মধারার পরিচয় পাওয়া যাইবে। সাহিত্যসাধনার বিবরণ দিতে গিয়া বাগল মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত গদ্যপদ্য রচনার উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিতমহলেও এইসব রচনা সুপরিচিত নহে। এগুলি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁহার সম্পাদিত ও সঙ্কলিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলিও আজ দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। অথচ এক যুগে এগুলি বিশেষ সমাদৃত ছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহারা অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। বাগল মহাশয় লিখিয়াছেন—সংস্কৃত কলেজের পঠনপ্রণালী সংস্কার করিতে গিয়া বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃতের মাধ্যমে অঙ্কশাস্ত্র পাঠের ব্যবস্থা তুলিয়া দিলেন' (পৃঃ ২৮)। তখনকার দিনে অঙ্ক শিখাইবার জন্য কোন্ সংস্কৃত বই পড়ানো হইত জানিবার আগ্রহ হয়। কাশীর সংস্কৃত কলেজে বিভিন্ন আধুনিক বিষয়ের পঠনপাঠনের জন্য এই সময়ে কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—কলিকাতা হইতেও কিছু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, কলিকাতা বা কাশীর সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে এখন আর এই সমস্ত পুস্তকের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তক-তালিকায় অনেকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। বর্তমান সময়ে সংস্কৃত ভাষার পূর্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে যখন বিভিন্ন প্রদেশে সংস্কৃত টোল ও পাঠশালায় সংস্কৃতের সাহায্যে বিভিন্ন আধুনিক বিদ্যা শিখাইবার প্রচেষ্টা পুনঃপ্রবর্তিত হইতেছে তখন শতবর্ষ পূর্বে সংকলিত ও প্রকাশিত এই জাতীয় গ্রন্থগুলির সন্ধান করা দরকার মনে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেন এই প্রচেষ্টাকে বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন তাহাও একবার আলোচনা করিয়া দেখা সমীচীন। বাগল মহাশয়ের পুস্তকখানি পড়িয়া আজ এই কথাটি আমার বিশেষ করিয়া মনে জাগিতেছে। একটু সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে আমরা বিভিন্ন দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া চলিতেছি এবং চলা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। সহসা সে

পথ পরিত্যাগ করিতে হইলে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, সন্দেহ নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বীরবল ও বাংলা সাহিত্য : ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। ক্লাসিক প্রেস, ৩/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য ও কাব্য সম্পর্কে, তাঁর মন ও মনন সম্পর্কে সম্প্রতি কিছু কিছু আলোচনা শুরু হয়েছে। বাংলায় প্রমথ চৌধুরীর দানের অনন্যতা সম্বন্ধে রসিকসমাজ আজ নিঃসংশয় বটেন, কিন্তু এ কথা না বলে পারি নে যে, প্রমথ-সাহিত্যে যতখানি অনুরাগ ও আনুগত্য প্রকাশ করা উচিত ছিল, বাঙালী বা বাংলাদেশ ততখানি কেন, তার সিকির সিকি অংশও করেন নি বা করতে পারেন নি। গদ্যরচনার শিল্পকৃতিত্বে প্রমথনাথ কত বড়, বুদ্ধিদীপ্ত সনেট রচনায় বাংলা তথা ভারত-সাহিত্যে তিনি একক কি না, এবং সর্বোপরি আবেগ-বিহীন অথচ বেগবান সাহিত্যের বাস্তব আদর্শ—কতখানি শক্তি থাকলে বাংলার চিন্তাশরীরে সহজ আনন্দ সঞ্চার করা সম্ভব—এসব তথ্যের সন্ধান পরীক্ষা ও নিরপেক্ষ বিচার বর্তমানে শুরু হয়েছে দেখে আমি সুখী হয়েছি।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বীরবল ও বাংলা-সাহিত্য' ক্ষুদ্রায়তন একখানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ হলেও তথ্যগর্ভ এবং যুক্তিসমৃদ্ধ। প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে যাঁরা প্রথম পাঠ নেবেন তাঁদের কাছে এ গ্রন্থ তো সমাদৃত হবেই, প্রমথ-বিশেষজ্ঞ যাঁরা, তাঁরাও এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু, বিচার-পদ্ধতি ও নিরপেক্ষ রীতির সরল বৈশিষ্ট্যে আনন্দবোধ করবেন। বীরবল-প্রতিভার যে-কটি দিক তিনি বিচার করেছেন, সংযত ও শ্রদ্ধাশীল উত্তরসাধকের মনোভাব নিয়েই করেছেন—কোথাও অযথা মুরুব্বীয়ানা অথবা অর্থহীন অসাধু মন্তব্য প্রকাশ পায় নি।

'বীরবল ও বাংলা সাহিত্য' ছাত্রদের কাজে আসবে, অধ্যাপকদেরও আসবে। 'বাংলাসাহিত্যে মোহমুক্তি' ও 'উত্তরকাল' বিষয়গৌরবে প্রণিধানযোগ্য রচনা। 'বীরবল' ও 'বীরবলের আত্মকথা' খুবই সুখপাঠ্য নিবন্ধ। 'বীরবলী সনেট' সম্বন্ধে আরও গভীর কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম—তবে যা পেয়েছি তাও নিতান্ত কম নয়। 'প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শ' ও 'রূপচেতনা' এ গ্রন্থের সবচেয়ে ভাল রচনা। এ দুটি লিপিকৌশলে ও তথ্য-বিন্যাসে ছিদ্রান্বেষী বিশেষজ্ঞদেরও প্রশংসা অর্জন করবে।

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

বহুরূপে— : শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। সাড়ে ছয় টাকা।

কতদিন আগের কথা, বয়স তখন সাত কি আট, আমি তখন এক কল্পনাপ্রবণ বালক, পরিবারের পাঁচজনের সঙ্গে চলেছি হরিদ্বারে তীর্থদর্শনে। সেইদিন থেকেই হিমালয়ের সঙ্গে হয়েছে মনের মিতালি। প্রথম প্রণয়-পরশমুগ্ধ সেই চিত্ত আজও দুলে ওঠে হর-কী-পৌড়ীর পাশে ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে, গঙ্গার নীলধারা দেখে, চণ্ডী-পাহাড়ের দিকে চেয়ে। শিবালিকের সঙ্গে যেতে যেতে সত্যিই মনে হয় ঋষিক্ষেত্রে এসে পড়লাম, শুধু অভাব যে হৃষীকেশ হৃদিস্থিত নন। পঞ্চাশ বছর আগে যে মন উদাস হয়ে উঠত তুঙ্গী নগাধিরাজের মহান্ত-রূপ দেখে, আজ সে মন হয়তো হারিয়ে গেছে সংসারের কলকোলাহলের মধ্যে, কিন্তু লছমনঝোলার নীচে দাঁড়িয়ে সেদিনও বলে এসেছি—যে গঙ্গোত্রী থেকে এই খরধারা নেমে এসেছে সেই জ্যোতির্ময় শুভ্রতার ভিতর-মহলে যদি প্রবেশ করতে পারতুম! মনে পড়ছে সেই বৈদান্তিকের কথা—ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে, মরণং গোমতীতীরে, অপরং বা কিং ভবিষ্যতি। সেই মৈত্রীতে মিথুনলগ্ন এনে দিয়েছিলেন জলধর সেন সাময়ায়ী, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল এবং আরও কত জানা-অজানা কাহিনীকারেরা। রোমাঞ্চিত হয়ে পড়েছি কেদারবদরী কৈলাসমানসের পরিক্রমার কথা, মহাপ্রস্থানের পথের কাহিনী, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর উপাখ্যান। উত্তরাখণ্ডের পথে পথে কত দীর্ঘশ্বাস, কত নিবেদন, কত প্রণাম, কত মান-অভিমান, কত আশ্বাস কত বিশ্বাস, কত প্রেম ঘৃণা ভালবাসা, কত অদ্ভুত দর্শন,

লৌকিক ও অলৌকিক অভিজ্ঞতা, আর তার পিছনে দাঁড়িয়ে শুধু একটি তুষারশুভ্র নীরবতা—পৃথিবীর মানদণ্ডের মত রক্তকল্লোজ্জ্বলাঙ্গ রজতগিরিনিভ মহান্। তাইতো আমাদের কল্পনায় হিমালয় শুধু মৃন্ময় নন, অব্যয় চিন্ময়ও বটে। এই ধূসর উষর বর্বর রুক্ষ শান্তদান্ত গিরিমালা ভৌগোলিক প্রতীকই নয়, জাতির জীবনের সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গিভাবে গ্রথিত। যুগ যুগ ধরে তারই পদচিহ্ন ধরে চলেছে যাত্রী তপস্বী মনস্বী, ভোগী ত্যাগী বিরহবিধুর মিলনচঞ্চল মানবমানবীর দল। সে যাত্রার আজও শেষ নেই। দেখেছে তারা এই রূপরসিক দেবতাকে, বলেছে 'ঠাড়ি রহো মেরা আঁখনকা আগে'।

তাই শ্রদ্ধেয় শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়ের বই 'বহুরূপে—' নতুন করে জাগিয়ে দিল পুরনো সেই স্মৃতি—অদ্যাবধি সেই লীলা করে যে গৌর রায়। লেখকের ভাষাতেই বলতে পারি—রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ আমার স্মৃতির মধুচক্র। শুধু কি তাই, মণীন্দ্রবাবুর লেখার সরসতা, ভাষার স্বচ্ছতা, আর কাহিনী বলার নিপুণতার গুণে এই ধরনের হিমালয়-ভ্রমণের সাহিত্যে বইটি যে একটি সর্বজনমান্য স্বীকৃতি লাভ করবে এর মধ্যে অত্যুক্তি নেই। তা ছাড়া তাঁর বিবরণে ঠিক চিরাচরিত এইসব আখ্যায়িকার গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি যেমন নেই, তেমনি আছে কতকগুলি নতুন ধরনের অভিজ্ঞতার ছাপ—যা তাঁর যাত্রাপথকে শুধু মনোরম করে নি, চিত্তজয়ীও করেছে।

জয় কেদারনাথজী—বলে এই ইতিহাসের আরম্ভ, খণ্ড-কালের মধ্যে সীমিত সীমানার মধ্যে অখণ্ডকে অসীমকে ধরবার চেষ্টা। মণীন্দ্রবাবু শুধু নীরস সাংবাদিক নন, সরস সাহিত্যিকও বটে; কবিধর্মী মন সংশয়বাদকে ঠেলে উঠেছে। নির্মেঘ আকাশের নিবিড় নীলিমার পটভূমিকায় কেদারনাথের অপ্রাকৃত মহিমাও তাঁর কাছে প্রকট হয়েছে। তিনি দেখছেন একটি পশুস্তীবাণীর বহিরঙ্গরূপকে, একখানি ছন্দোবদ্ধ পাথরের কবিতা। মণীন্দ্রবাবুর অতি সঙ্গত প্রশ্ন—কী আছে ওই মন্দিরে যার আকর্ষণে পথে পায়ে-চলার দুঃসহ ক্লেশ হাসিমুখে সহ্য করে দেশদেশান্তর থেকে অগণিত নরনারী এখানে আসে? তার জবাব তিনি নিজেই দিয়েছেন শেষে, যখন বাবা বদরীবিশাল ফিরিয়ে দিলেন তাঁদের। রূপও নয় অপরূপও নয়, প্রতিরূপ। মানুষ যে নিজের অজানতে প্রতি পদক্ষেপে জাগ্রত বদরীনাথকে চোখ ভরে দর্শন করছে বলেই তো রূপরসশব্দগন্ধের এত প্রাণময় স্মৃতি। হ্যাঁ, তীর্থযাত্রার সুফল তো এই—যিনি বিশাল তিনিই বলতে পারেন—আমি আছি, বহুরূপে আছি, মানুষে মানুষে মিলিয়ে যে মহাদেবতা, সেও যে আমি—তার সেবা আমারই সেবা, তাই বদরীনাথের অতি নিকটে গিয়েও হল না বিগ্রহ দর্শন, কিন্তু দেবতার দর্শন মিলল ভারবাহী একটি মানুষকে কেন্দ্র করে। লেখক বলছেন, শঙ্করাচার্য বদরীনাথে দিব্যজ্ঞান লাভ করে জীবনের শেষপূজা করতে এসেছিলেন কেদারক্ষেত্রে। একালের যাত্রীরা কেদারনাথকে দর্শন করবার পর জীবনের দেবতা বদরীনারায়ণের দেউলের উদ্দেশে যাত্রা করে।

এই আখ্যায়িকায় ফুটে উঠেছে কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র চমৎকার ভাবে। প্রথমেই আমরা পাই জিতেনকে—যার মধ্যে কঠোরে কোমলে একটা বিচিত্র বিন্যাস psychological hard core হয়ে স্পর্শকাতর মনকে মাঝে মাঝে আঘাত করছে বটে, কিন্তু তার পেছনে কাজ করছে একটা উদাসী বৈরাগী হৃদয়—যার প্রমাণ বাহাদুরের কথায়: "ছোটা বাবুজী ন মালুম কিসলিয়ে উদাস হো গিয়া"। তারপরে আছে গঙ্গোত্রী ও তার মা আর তাদের চাচাকাহিনী। শম্ভুজী ও তার কন্যাও বিচিত্র চরিত্র। শম্ভুজী কিরকম লোক, না, শাপ দিয়ে ভস্ম করে দিতে পারেন অনাচারী পাপীকে আর তার কন্যা সীতা ফুলের মত নিষ্পাপ কুমারী, তবু তার দুঃখের সীমা নেই। পনছী মহারাজ চক্রধর—আরও কত লোক ছড়িয়ে আছে কাহিনীতে।

বইটিতে সত্যিকার সাহিত্যের স্বাদ আমরা পাই শুধু একটি উপাদেয় ভ্রমণকাহিনী হিসাবে নয়, রম্যরচনা হিসাবে নয়, একটি মনোরম উপন্যাসের পটভূমিকা হিসাবে নয়, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ হিসাবেও নয়, সব মিলিয়ে একটা উচ্চতর গ্রামের সুরও জড়িয়ে আছে সমগ্র বইটিতে।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক সুর : দক্ষিণারঞ্জন বসু। এভারেস্ট বুক হাউস, ২৪ সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা-৩০। তিন টাকা।

'অনেক সুর' প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বসুর নূতন গল্প-সংগ্রহ। মোট সাতটি গল্প এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে—বুধুর মা, পটুয়া, নাগ বাসুকি, আচার্য পীঠ, পূর্ণগ্রাস, আশ্রয় এবং জনগণেশ। গল্পগুলির প্রত্যেকটিই গত দু-এক বছরের মধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; এবং সে-সময়ে পাঠকদের প্রসংশালাভেও বঞ্চিত হয় নি। কাজেই, এ-সংগ্রহ সাহিত্যামোদীর খুশীর কারণ যোগাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

দক্ষিণারঞ্জন বসু সেই জাতীয় লেখক, যাঁর রচনায় এম্‌ফ্যাসীস্ এবং স্টাণ্ট এ দুয়েরই অভাব আছে। এবং সেইজন্যই কোন-একটিমাত্র রচনায় তাঁর লেখক-সত্তার পরিচয়কে চিহ্নিত করতে যাওয়াটা মূর্খামি। বর্তমান সংগ্রহ সম্বন্ধেও এ-কথা সমান প্রযোজ্য বলেই আমার ধারণা। 'অনেক সুরে'র কোন একটি বা দুটি গল্পকে ভাল অথবা মন্দ বলে অন্যগুলি থেকে পৃথক করে নেওয়া যায় না—এর প্রত্যেকটিই সমান মনোযোগের দাবি রাখে। সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে সব মিলিয়ে লেখকের যে পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সে পরিচয় মানব-দরদীর, মানব-কল্যাণীর। বিশেষ করে বুধুর মা, পটুয়া এবং আশ্রয় গল্প সম্বন্ধে এ-কথা সুনিশ্চিতভাবেই প্রযোজ্য। জনগণেশ গল্পটির বিদ্রূপের সুর ঠিক এ-সুরের সঙ্গে খাপ খায় না। ও-গল্পটিকে লেখক বর্তমান সংগ্রহে ঠাঁই না দিলেই ভাল করতেন।

'অনেক সুরে'র প্রচ্ছদ-শিল্প আমার মনোহরণ করে নি। দ্বিতীয় সংস্করণে এটি পরিবর্তনের অনুরোধ জানাচ্ছি। এ ছাড়া, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

দেবব্রত ভৌমিক

সৈনিকের প্রাণবীণা : চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। যুগসাহিত্য মন্দির, ৬ বেনিয়াপুকুর লেন, কলিকাতা-১৪। এক টাকা।

দীর্ঘকাল পূর্বের কথা। 'শনিবারের চিঠি'তে একটি ধারাবাহিক রম্য-উপন্যাস পড়ে ভাল লাগে, লেখকের নাম চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। চুনীবাবুর রচনা পড়ে এই কারণে ভাল লাগে যে, তিনি আগে বাঙালী—তারপরে ভারতীয়। তাঁর সার্থক ফসল 'সৈনিকের প্রাণবীণা'। কাব্যে জীবনস্বপ্ন এবং মাতৃবন্দনার সুর। বাংলা ও বাঙালীর প্রাণরসে পরিপূর্ণ। যখন পড়ি—'নিত্যদিনের ভবানী বঙ্গভূমি, আজিকে জননী ছিন্নমস্তা তুমি'—তখন ব্যথার সঙ্গে অনুভব করি, বঙ্গদেশ আজ খালি খণ্ডিতই নয়, সর্বভারতীয় নেতৃবর্গের পাশাক্রীড়ার মল্লভূমি; বাঙালী জাতি আজ শুধু হৃতসর্বস্ব আর শরণার্থীই নয়, সারা ভারতবর্ষের সে অনুগ্রহের দাস; ঠিক এইসময়ে বাঙালীর মনে আত্মচেতনা উদ্রেক করার মতন রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিকের প্রয়োজন ছিল। দুঃখের কথা, আজ তাঁদের কেউ বিগত, কেউবা বিভ্রান্ত। এমন সময় চুনীবাবু যে কঠিন কর্তব্যের পথ বেছে নিয়ে আত্মসুখ জলাঞ্জলি দিয়েছেন, তার পুরস্কার হয়তো দেশবাসী আজ তাঁকে দেবে না; কিন্তু নিষ্ক্রিয় যুগে বলিষ্ঠ চেতনার উদ্বোধনের ইতিহাস যেদিন লিখিত হবে, সেদিন ঐতিহাসিকের কাছে শ্রীচুনীলাল নিশ্চয়ই সুবিচার পাবেন। তিনি যে বেদনার সঙ্গে মননকে মিশিয়ে লেখনী সঞ্চালনে ব্রতী হয়েছেন, তা বঙ্গসমাজের পক্ষে অত্যন্তই আশার কথা।

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮